আর্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বর্ষ | ১২৮৪

~~অষ্টম খণ্ড, ১২৮৮ সাল।~~

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও

১৪৮নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানি কর্ত্তৃক ৩৩ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট

বসু প্রেসে মুদ্রিত।

আর্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

চতুর্থ খণ্ড।] বৈশাখ ১২[illegible] [প্রথম সংখ্যা।

একে একে।

আমার একটী পোষা পক্ষী ছিল, সে অনেক গুলি বুলি বলিত। আমরা যেমন ইংরাজ-লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস (মনুষ্য-লিখিত সিংহের চিত্র) পড়িয়া সুখলব্ধ-ভারত-বিজয়ী ব্রিটিশ জাতিকে পৃথিবীর মধ্যে একটী বীর, ন্যায়পরায়ণ জাতি বলি, ভারতীয় ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টকে মুসলমান রাজত্ব অপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট বলি, নন্দকুমারের নিন্দা করি, উৎকোচদাতা পলাশীবিজয়ী ক্লাইবকে বীরাগ্রগণ্য বলি, ম্যালকমের সহিত ক্লাইবের ধর্ম্ম বলি, ঝান্সীর রাণীকে অভিসম্পাত করি, রাজ্ঞী ঝিন্দনকে গালি দিই, এবং সিপাহীবিদ্রোহকে ভারতের কলঙ্ক বলিয়া রাজভক্ত হই ও ইংরাজগণের নিকট হইতে মহামূল্য পুরস্কার লাভ করি; আমার পাখীটিও সেই রূপ যাহা যাহা শিখাইয়াছিলাম তাহাই সুন্দররূপে উচ্চারণ করিয়া আমার প্রীতি লাভ করিয়াছিল। ইংরাজভক্ত বাঙ্গালী জাতিকে যেমন ইংরাজগণ ভাল বাসেন, আমিও তেমনি পাখীটীকে ভাল বাসিতাম।

কাটিয়া বাটীর ছাদের উপর গিয়া বসিল। ছাদে বসিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে এমত সময়ে তাহাকে কতকগুলি কাক আসিয়া তাড়া করিল। আমি তাহাকে ডাকিতে লাগিলাম। পাখীটী ভাল উড়িতে পারিত না, সুতরাং সে ভূপতিত হইয়া আমাকে ধরা দিল। আমি তাহাকে পুনরায় শৃঙ্খলবদ্ধ করিলাম। সে আবার আমার হইল, আমার হইল বটে, কিন্তু শৃঙ্খল নির্ম্মুক্ত হইলে পাখীর তথাবিধ ভাব দেখিয়া আমার সেই অবধি মনে অনুতাপ হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম আমি তাহার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছি বলিয়া সে আর উড়িয়া বনে যাইতে পারিল না। ইহাতে কি আমার কিছু পাতক নাই? আমি না স্বাভাবিক স্বাধীনতার অনুরাগী বলিয়া সাধারণ্যে পরিচয় দিই? আমি না আত্মস্বাধীনতা লাভের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হই? পারিবারিক ও সামাজিক স্বাধীনতা পরিস্থাপনের জন্য সকলকে উত্তেজন বাক্যে উদ্বোধন করি? কিন্তু গৃহে একটি বিহঙ্গকে অকারণ অধীন করিয়া রাখিয়াছি। তবে যাহার বল আছে সে আমাকে কেন অধীন করিবে না? বাস্তবিক যদি আমি স্বাধীনতার অনুরাগী হইয়া থাকি, তবে একটী বিহঙ্গেরও স্বাভাবিক স্বাধীনতা হরণ করা আমার উচিত নহে। সেই বিহঙ্গের অধীনতার চিত্রে আমার মন নীচগামী হইয়া যাইবে। আমি সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম বিহঙ্গকে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু আবার ভাবিলাম ছাড়িয়া দিলেই সে কি তৎক্ষণাৎ বনচারী হইতে পারিবে। তবে সে যখন আপনাপনি শৃঙ্খলবিমুক্ত হইয়াছিল, বনে যাইতে পারে নাই কেন? শৈশবাবধি শৃঙ্খলবদ্ধ থাকিয়া তাহার উড়িবার শক্তি গিয়াছে; গৃহ মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ থাকিয়া এক্ষণে অনন্ত আকাশ দেখিলে সে ভয় পায়। অধীনতায় তাহার প্রকৃতি বাঙ্গালীর প্রকৃতির ন্যায় বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে সহসা বনে যাইতে পারিবে না। যাহাতে তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি হয় অগ্রে এরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। এই ভাবিয়া আমার প্রিয় পক্ষীকে একদিন তরুর নিকট লইয়া গেলাম। পক্ষী সেই বৃক্ষ দেখিয়া বরং ভয় পাইল. সে কোন মতে দাঁড় ছাড়িল না। চারিদিন পরে সে দাঁড় ছাড়িয়া একটী নিকটস্থ শাখায় বসিল। কিয়দ্দিন পরে সে এক শাখা হইতে শাখান্তরে উড়িয়া যাইতে চাহে। আমি তাহার শৃঙ্খলে দড়ি বাঁধিলাম। পাখী উড়িয়া একটী শাখার অগ্রভাগে আসিয়া বসিল। বসিয়া যেন উড়িতে চাহে। আমি তাহার দড়ি লম্বা করিয়া দিলাম। সে সেই বৃক্ষ হইতে নিকটস্থ আর একটী বৃক্ষে উড়িয়া যাইতে চাহে; আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দেখিলাম সে স্বচ্ছন্দে সেই বৃক্ষান্তরে আসিয়াছে। তখন তাহাকে আবার বাড়ীতে লইয়া গেলাম। এখন সে আর দাঁড়ে বসিয়া থাকিতে চাহে না;

কেবল উড়িয়া যাইতে চাহে। তখন আমি তাহার শৃঙ্খল কাটিয়া দিলাম সে অনায়াসে সেই বৃক্ষে উড়িয়া গেল। আমি তাড়া দিলাম, সে বৃক্ষান্তরে পলাইয়া গেল। সেখানেও তাড়া দিলাম, ডাকিলাম; ডাক শুনিল না; সে তখন তাহার স্বাভাবিক ডাক ডাকিতে ডাকিতে অনন্ত আকাশে উড়িয়া গেল।

এই বিহঙ্গের দৃষ্টান্তে আমি শিখিলাম, স্বাধীনতাই, স্বাধীনতার প্রসূতি ও শিক্ষাদাত্রী। যে চিরকাল অধীন অবস্থায় অবস্থিত, সে সহসা কখন একদিনে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে না। যে বঙ্গবধূ চিরকাল গৃহমধ্যে আবদ্ধা, তিনি একদিনে কখন স্বাধীন সমাজ মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে পারেন না। যে ব্রিটনেরা চারি শত বৎসর রোমানদিগের অধীনস্থ ছিলেন, রোমানেরা সহসা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে পারেন নাই; তখন তাঁহাদিগকে অপর জাতির অধীনতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আজি যদি ইংরাজগণ সহসা ভারতবাসিগণকে পরিত্যাগ করিয়া যান, ভারতবাসিগণ কখনই একদিনে স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আবার বিষম গণ্ডগোল ও অরাজকতা আসিয়া উপস্থিত হইবে। অরাজকতা উপস্থিত হইবে সত্য, কিন্তু সেইরূপ অরাজকতায় স্বাধীন ভাবে দাঁড়াইতে না শিখিলে তাঁহারা কখন স্বাধীন হইতে পারিবেন না। তীরে বসিয়া যিনি সন্তরণ-কৌশল উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া জলে ঝাঁপ দিবেন, তিনি নিশ্চয় জলমগ্ন হইবেন। কিন্তু যিনি সহস্র বার জলমগ্ন হইয়া সন্তরণ-কৌশল জলে পড়িয়া শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই মহানন্দে তরঙ্গ কাটিয়া তীরে উঠিতে পারেন। যে কোন বিষয়েই হউক একদিনে কার্য্যশক্তি উৎপন্ন হয় না; কার্য্যশক্তির উৎপত্তির নিয়ম এই যে, তাহা কার্য্য ব্যতীত আর কিছুতেই জন্মিতে পারে না। জ্ঞান ও ইচ্ছা কার্য্যশক্তিকে উদ্রিক্ত করিয়া দেয়, কিন্তু কার্য্য ও অভ্যাস কার্য্যশক্তিকে বলবতী করে। জ্ঞান ও ইচ্ছা কার্য্যের পূর্ব্বভাব মাত্র; কার্য্যই কার্য্যের স্থায়িত্ব বিধান করে।

অধীনতাভাব বাঙ্গালী জাতির কতদূর অভ্যস্ত ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে তাহা আমরা গতবারে "কার্য্যের সোপান" নামক প্রসঙ্গে অনেকদূর প্রদর্শন করিয়াছি। আত্মনির্ভরতার ভাব বাঙ্গালীজাতি মধ্যে একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আপনার উপর নির্ভর করিয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করা বাঙ্গালীর সাধ্যাতীত। স্বাধীন বৃত্তি ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর হস্তক্ষেপ করিতে নিতান্ত বিপদ বোধ হয়। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি হাজার মার্জ্জিত হউক না কেন, সে বুদ্ধি নিজ কার্য্যে নিয়োগ করিতে তাঁহার ভরসা হয় না। পরের চাকরী করিয়া তিনি সেই বুদ্ধি, কিরূপ কৌশলে

চাকরী রক্ষা করিতে হয় তাহাতেই প্রদর্শন করিবেন। পরে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবেন, বাঙ্গালী তাঁহার দাস হইয়া থাকিবেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা, আমি দাসত্বে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিব, আমি সর্ব্বপ্রধান চাকর হইব। তিনি কোন মতে চাকরীর গণ্ডী অতিক্রম করিবেন না। এই চাকরী করিয়া তাঁহার প্রকৃতি এরূপ নীচ হইয়া গিয়াছে যে তাঁহার হৃদয় হইতে উচ্চাশা ও উচ্চাভিলাষ সমুদায় নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। সে উচ্চাশা ও উচ্চাভিলাষ যদি কখন জাগরিত হয় তাহা চাকরীর জন্য। পরের শত সহস্র তিরস্কার তিনি অম্লানবদনে সহ্য করেন। আত্মসম্মান ও আত্মমর্য্যাদাকে তিনি একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে যে সকল উক্তি ও যেরূপ ব্যবহার এবং হতাদর সহ্য করিতে হয়, আত্মমর্য্যাদার স্ফুলিঙ্গ মাত্র থাকিলেও তিনি কখনই তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু এ সমস্ত ব্যবহারে তিনি এরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন যে তাঁহার অধীন প্রকৃতিকে একেবারে অসাড় ও নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে।

এই জাতি কি মহৎ হইবে? স্বাধীন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্য-নামের গৌরব বৃদ্ধি করিবে? যতদিন না বাঙ্গালী-জাতি এই অধীনতা পরিত্যাগ করেন, এবং অল্পে অল্পে স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিয়া আত্মনির্ভর হয়েন, আত্মমর্য্যাদা শিক্ষা করেন, এবং আত্মম্ভরী হইয়া সকল কার্য্য আত্মহস্তে গ্রহণ করেন৹ ততদিন তাঁহার অভ্যুদয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। এই অভ্যুদয়ের পথ পরিষ্কার পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার প্রথম সোপান আত্ম-স্বাধীনতা, দ্বিতীয় সোপান পারিবারিক স্বাধীনতা এবং তৎপরেই সামাজিক স্বাধীনতা বিরাজিত রহিয়াছে। বাঙ্গালী জাতির প্রত্যেকেই এই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর না হইলে তাঁহাদিগের সামাজিক স্বাধীনতা লাভের কোন আশা নাই। একে একে স্বাধীন হইতে চেষ্টা না করিলে কখন স্বাধীন হওয়া যায় না। স্বাধীন হইতে চেষ্টা করাই স্বাধীন হইবার গাঢ় উপায়। স্বাধীন ভাব অবস্থার নাম, তাহা কার্য্য নহে; এবং সেই অবস্থায় চিরদিন থাকিতে হইলে, তাহাতে ক্রমে ক্রমে অবস্থিত হইয়া আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করা আবশ্যক। যিনি স্বাধীন অবস্থায় থাকিতে চেষ্টা করেন তিনিই চিরস্বাধীন হইয়া থাকিতে সমর্থ হয়েন।

১। আত্ম-স্বাধীনতা। আপনি স্বাধীন না থাকিলে পরকে স্বাধীন করিতে যাওয়া বৃথা। আপনার মনে স্বাধীনতার ভাব এরূপ উজ্জ্বলিত থাকা চাই, যে অপরে তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেই সেই ভাবে যেন উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। আপনার কার্য্যে স্বাধীন চেষ্টা এবং আপনার কর্ত্তৃত্বে আত্মনির্ভরতার ভাব শিক্ষা না দিতে পারিলে অপরকে এই স্বাধীনতার নূতন পথে অনুসারী করা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি বলিয়াছিলেন আমি যাহা মুখে বলি তাহা কর, যাহা কার্য্যে

করি তাহা করিও না, তিনি মানব প্রকৃতির কিছুই বুঝিতেন না; তিনি নিতান্ত অবজ্ঞেয় কথা কহিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যসমাজ দৃষ্টান্তের যত অনুগামী, শুদ্ধ উপদেশের তত অনুগামী নহে। যে ভাব কেবল উপদেশেই নিঃশেষিত হয় সে ভাবের কিছুই ফল নাই, কিন্তু যে তেজ কার্য্যক্ষেত্রে উৎসাহের অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে, তাহা মানবকুলকে কার্য্যক্ষেত্রে আনিয়ন করিতে সমর্থ হয়। একা লিয়নিডাস গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষার পথে প্রথম নায়ক স্বরূপ হইয়া শত সহস্র ব্যক্তির মনে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়া দেন। একা এলেকজাণ্ডারের তেজ প্রাচীন পৃথিবীতে ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। পিলপিডাস্ একাকী থিবেব উদ্ধার সাধন করেন। টাইমোলিয়ান স্বাধীনতার অনুরাগে এতদূর পূর্ণ ছিলেন, যে তিনি একাকী শত শত স্বদেশীয়গণকে সেই ভাবে উত্তেজিত করিয়া পীড়িত সিসিলির দাসত্ব মোচন করেন*। গ্রাকাইদ্বয় যে রব রোমে ধ্বনিত করিয়াছিলেন, আজিও ম্যাট্সিনির রোমে সেই রব প্রতি বীরের সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ওয়ালেস্ এবং ব্রুসের নাম শুনিবা মাত্র পঞ্জবসীর বাঙ্গালীর শরীরও আজি লোমাঞ্চিত হয়। ইহাঁদিগের প্রতিজনের হৃদয় স্বাধীনতা ও স্বদেশানুরাগে এরূপ উৎসাহিত ছিল, যে তাঁহারা প্রত্যেকেই শত সহস্র জনকে সেই ভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। শুদ্ধ ভাবে নয়, তাঁহারা প্রত্যেকেই কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া সেই স্বাধীনতার তেজ চারিধারে বিকীর্ণ করিয়াছিলেন; এবং এক এক জন এক এক দেশকে সেই ভাবে উন্মত্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

স্বাধীনতা লাভের প্রধান উপায় আত্মনির্ভরতা। যিনি আপনার উপরই নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে না পারেন তাঁহাকে পরের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবেই হইবে, এবং যে পরিমাণে পরের আনুগত্য স্বীকার করিবেন সেই পরিমাণে পরাধীন হইয়া থাকিবেন। পরাধীনতায় মানসিক শক্তি ও প্রবৃত্তি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে না; কার্য্যশক্তি স্ফূর্ত্তিবিহীন হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি আত্ম-নির্ভরতা করিতে পারেন তাঁহার কার্য্য করিতে সাহস হয়, কার্য্য করিতে সাহস হইলে ক্রমে সর্ব্বপ্রকার মানসিক শক্তিরও স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। আত্ম নির্ভরতা করিতে পারিলে বিবেচনার উদ্রেক হয়, এবং বিবেচনার সহিত কার্য্য করিতে পারিলে সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতি সাধন হয়। এই আত্ম-নির্ভরতা নাই বলিয়া বাঙ্গালী জাতির সাহস নাই, তাহাদিগের কতদূর শক্তি আছে তাহার জ্ঞান নাই। এই আত্মনির্ভরতা নাই বলিয়া বাঙ্গালী জাতি কোন স্বাধীন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না; ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হইতে পারেন না। পরাধীনতা ও পরের চাকরী স্বীকার করিয়া চিরদিন দুঃখে ও

* vide Plutarch's life of Timolean

মনস্তাপে কালাতিপাত করেন। পরাধীনতায় ও পরের চাকরী করিয়া তাঁহাদিগের স্বাধীন শক্তি ও প্রবৃত্তি সকল ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তিবিহীন হইয়া যাইতেছে, এবং তাঁহাদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতার সহিত মানসিক দুর্ব্বলতারও বৃদ্ধি হইতেছে।

কার্য্যতেই কার্য্যের শক্তি বৃদ্ধি হয়। অল্পে অল্পে আত্মনির্ভর করিতে না পারিলে বৃহৎ কার্য্যে আত্মনির্ভর জন্মায় না। আত্মনির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে গেলে, সে কার্য্য-পথে অনেক বার পদস্খলন হইবে তাহা নিশ্চয়, কিন্তু সেই প্রকার পদস্খলন না হইলে দাঁড়াইবার শক্তি হইবে না এবং দাঁড়াইবার শক্তি জন্মিবে না। চিরদিন পরের হাত ধরিয়া চলিলে কি চলিতে শিখা যায়? স্বতন্ত্র হইয়া চলিতে শিখ অনায়াসে চলিতে পারিবে।

স্বাতন্ত্র্য আত্মনির্ভরের প্রধান অঙ্গ। বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য কোন বিষয়েই নাই। কি আত্মকার্য্যে, কি পরিবারমণ্ডলে, কি সমাজে বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য কোন খানে নাই। তিনি আজীবন মৃত্যু পর্য্যন্ত পরের হাত ধরিয়া চলিয়া বেড়ান। জীবনের অল্প কালেই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য হয়, সুতরাং তাঁহার আত্মনির্ভরের শক্তি জন্মায় না। এক্ষণে আমরা এই প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিষয়ে উপস্থিত হইতেছি,—তাহা পারিবারিক স্বাধীনতা।

২। আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা স্বতন্ত্রতার পথে বিষম অন্তরায়। যে কোন কারণে এই পারিবারিক ব্যবস্থার উৎপত্তি হউক না, আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। এই পারিবারিক ব্যবস্থায় আমাদিগকে জীবনের অধিকাংশ সময়ই পরাধীন হইয়া থাকিতে হয়, পরাধীন থাকিয়া আমরা ক্রমশঃ নিস্তেজ ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া যাই, তাহার আর সন্দেহ নাই। সেই বিষয় প্রদর্শন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। একান্নবর্ত্তি পরিবারমণ্ডলে যত সুখ, তাহা এক্ষণে সকলে জানিতে পারিতেছেন। ইহার অন্যান্য দোষের বিষয় আমরা উল্লেখ করিতে চাহি না। কিন্তু ইহাতে আমাদিগকে যে চিরকাল পরাধীন করিয়া রাখে, আমাদিগের স্বাধীন কার্য্যশক্তি বিনষ্ট করে, ক্রমশঃ আমাদিগকে পরাধীনতায় আস্তে আস্তে অভ্যস্ত করিয়া আনে, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বীর্য্য করিয়া ফেলে, ইহাই আমরা উল্লেখ করিতে চাহি; ইহাই এই একান্নবর্ত্তি পারিবারিক ব্যবস্থার একটী প্রধান দোষ, এবং এই দোষে বাঙ্গালীজাতি সমুদায় কেমন দুর্ব্বল ও পরাধীনতায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা তাহাদিগের অগ্রে দেখা আবশ্যক। যত দিন জনক জননীর অথবা অপর কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকা প্রয়োজনীয় ও বিধেয় আমরা ততদিনের অধীনতা দোষই বলি না, কিন্তু যখন স্ব স্ব ভার গ্রহণে সকলে সমর্থ হয়েন, তৎপরবর্ত্তী কাল হইতে পরের কর্তৃত্বে ও সম্পূর্ণ অধীনতায় থাকিলে নিজের স্বাধীন বৃত্তি ও প্রকৃতি এরূপ দমিত হইয়া পড়ে যে

আপনার সমুদায় তেজস্বিতা হ্রাস হইয়া যায় এবং সর্ব্ববিষয়ে পরের বশবর্ত্তীতায় আপনার স্বাধীন অস্তিত্ব সমুদায় বিনষ্ট হইয়া পড়ে। এতদূর বিনষ্ট হইয়া পড়ে যে সেই পরিবারমণ্ডলে আপনাকে জড়বৎ অবস্থান করিতে হয়। যিনি ত্রিশ অথবা চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপে অবস্থান করেন তাঁহার জীবনে স্বাধীনতা ও স্বকর্ত্তৃত্বের আর কি থাকে? একান্নবর্ত্তী পরিবারমণ্ডলে অনেকেরই কি এই দশা ঘটে না?

আমরা এই পারিবারিক অধীনতার নিতান্ত বিরোধী। বিরোধী এই জন্য, যে ইহার কুফল একটি সমগ্র জাতির তেজস্বিতা একেবারে বিনষ্ট করিয়াছে। এই কুফল এমন ধীরে ধীরে ফলে, প্রকৃতিকে ক্রমে ক্রমে এমন নীচ ও বিনম্র করিয়া ফেলে, যে কেহই প্রায় ইহা ধরিতে পারে না। আমরা যদি জাতীয় উন্নতি খুঁজি, যদি স্বাধীনতার সুখপ্রার্থী হই, তাহা হইলে সেই উন্নতি ও স্বাধীনতার পথে যতগুলি কণ্টক আছে, তাহাদিগকে একে একে ছেদন করা আবশ্যক। ইহাদিগের কেহই সামান্য নহে। নানা কারণে আমাদিগের জাতীয় অবনতি হইয়াছে। এক্ষণে একে একে সেই সমস্ত কারণ সমুৎপাটন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এবং ক্রমশঃ যেমন এক একটির নিরাকরণ হইবে, অমনি সেই শত্রু-হস্ত হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করাও বিধেয়। নহিলে এক দিনে ও একেবারে কেহ উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিতে পারে না। জাতীয় উন্নতির গতি অতি ধীরে ধীরে হয়; এবং নানা উপায়ে তাহা সংসাধিত করিতে হয়। যিনি আত্মস্বাধীনতা চাহেন, তাঁহার পারিবারিক স্বাধীনতা সংসাধন করা নিতান্ত আবশ্যক।

৩। বঙ্গদেশে কেন, ভারতবর্ষে কখন সামাজিক স্বাধীনতা ছিল না। ভারতবর্ষ চিরকাল সামাজিক অধীনতা ও দাসত্বে নিপীড়িত হইয়া উৎসন্ন গিয়াছে। ভারতবর্ষ চিরকাল কুচক্রী ব্রাহ্মণদিগের শাসনে দাসত্বের নিগড়ে নিবদ্ধ আছে। আর্য্যেরা যখন প্রথমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন এই ব্রাহ্মণেরা রাজশাসন-ব্রতে ব্রতী হইয়া প্রবল প্রতাপের সহিত প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের একাধিপত্য ও উৎপীড়ন দোষে ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারী হইলেন। নববল ও নবতেজে উন্মত্ত ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া দিলেন। পরাভূত করিয়া ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতে সেই একাধিপত্য ও উৎপীড়নের কি প্রতিবিধান হইল? ব্রাহ্মণ জাতির পরিবর্ত্তে ক্ষত্রিয়কুল সমপ্রভাবে ভারতবর্ষ শাসন করিতে লাগিলেন। রাজবংশ ব্যতীত অপর সকলেই সামাজিক দাসত্বে সমভাবে নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। পরশুরাম ক্ষেপিয়া উঠিলেন। কতিপয় জনপদ মাত্র নিঃক্ষত্রিয় করিয়া পরশুরাম জ্ঞান করিলেন সমগ্র ভারতবর্ষ নিঃক্ষত্রিয়

হইয়াছে। অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষ পুনর্ব্বার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ক্ষত্রিয়কুলে পরিপূর্ণ হইল। ক্ষত্রিয়গণ নির্ব্বিবাদে রাজত্ব ও প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু চতুর ব্রাহ্মণগণ পরাভূত হইবার নহে। তাঁহারা সিংহাসন বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহারা অন্য দিকে অন্য উপায়ে ভারতবর্ষ শাসনের পন্থা দেখিতে লাগিলেন। রাজ্যশাসনের পরিবর্ত্তে তাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যের একাধিপত্য স্থাপিত করিলেন। এই কৌশলে ব্রাহ্মণেরা আবার সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের আদেশেই রাজ-বিধান, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাবৃত্ত এবং সকলই হইল। সামাজিক আচার ব্যবহার ও নিয়মাদি তাঁহাদিগের আদেশেই পরিবর্ত্তিত, নিয়মিত ও পরিচালিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা একদিকে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন অন্যদিকে তাহার পূরণ করিয়া লইলেন। কি রাজকুল কি প্রাকৃত জনগণ সর্ব্ব সাধারণেই ব্রাহ্মণ দিগের শাসনে শাসিত হইতে লাগিল। তাঁহারা সমাজে ঘোর আধিপত্য স্থাপন করিলেন। ভারতবর্ষে দ্বিবিধ প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। ক্ষত্রিয়বর্গের রাজনৈতিক প্রভুত্ব এবং ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রীয় প্রভুত্ব। জনসাধারণ ঘোর সামাজিক দাসত্বে আবদ্ধ হইল। এই দাসত্ব আজি পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। আজি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-কৌশল-প্রবর্ত্তিত জাতিভেদ ও সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধান ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মরূপে প্রচলিত রহিয়াছে এবং জনসমাজকে প্রবলরূপে শাসন করিতেছে। ভারতে কত শত রাজকীয় পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে তবুও ব্রাহ্মণদিগের এই সামাজিক শাসনের অনুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ব্রাহ্মণ জাতির এই প্রকার অবৈধ ক্ষমতা ও শাসনে সমাজের অন্যান্য জাতি সমুদায় তাঁহাদিগের অধীনতা ও দাসত্বে নিতান্ত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। ক্ষত্রিয়কুল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের এই শাসনে ক্রমশঃ অনুশাসিত হইয়া আসিয়াছে। অবশেষে ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে ভারতে ব্রাহ্মণ জাতি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যে ক্ষত্রিয় জাতি দেশের বল ও দুর্গ স্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা ক্রমে ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপে পরাভূত হইয়া সমুদায় মানসিক তেজ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণ যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, যখন ব্রাহ্মণদিগের অধীনতায় তাঁহারা ক্রমশঃ ভীরু-স্বভাব ও মানসিক-তেজ-বিরহিত হইয়া পড়িলেন, তখন ভারতবর্ষ যে নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? ব্রাহ্মণেরা তখন তাঁহাদিগের শাস্ত্রীয় ও ধর্ম্মীয় প্রভুত্বে এত উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা অন্যবিধ প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষী হয়েন নাই। তাঁহারা বহুকাল ধরিয়া যেরূপ নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে আর অস্ত্র ধারণে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় নাই। কেবল শাস্ত্রালোচনায় এবং বৈরাগ্য ধর্ম্মে তাঁহাদিগের প্রকৃতি এরূপ দুর্ব্বল হইয়া গিয়া-

ছিল যে সেই প্রকৃতি ও জ্ঞান প্রভাবে তাঁহারা অস্ত্র ধারণে অক্ষম হইয়া ছিলেন। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষ যে অরক্ষণীয়া হইয়া থাকিবে তাহার আর সন্দেহ কি? ভারতবর্ষ সুতরাং শত্রু-হস্তে নিপতিত হইল।

সমাজে এক জাতির অবৈধ প্রভুতা থাকিলে এই রূপই ঘটিয়া থাকে। প্রাচীন সমস্ত রাজ্যে সমাজে এক জাতির এই প্রকার অবৈধ প্রভুত্ব ছিল, সুতরাং সমস্ত প্রাচীন রাজ্য অধঃপতিত হইয়াছে। মিশরে ভারতের ন্যায় পুরোহিত জাতির অবৈধ ক্ষমতা, পারস্য রাজ্যের সৈনিক একাধিপত্য, ফিনিসিয়ার ধন সম্পত্তির প্রভুতা; গ্রীশ রোম ও যুডিয়ার এক এক জাতির অযথা বিক্রম,—এই সমুদায় প্রাচীন রাজ্যের বিনাশের কারণ হইয়াছিল। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সমস্ত রাজ্যে সামাজিক অসাম্য বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। সামাজিক সকল জাতির সমান স্বত্ব ও অধিকার স্বীকৃত হইত না। এক জাতি অত্যন্ত প্রবল, এবং অপরাপর জাতি তাহাদিগের সম্পূর্ণ অধীন, সমস্ত প্রাচীন সমাজের এই নিয়ম। সর্ব্ব জাতির সমান স্বত্ব ও অধিকার—এরূপ মত কখনই গ্রাহ্য হইত না। লাইকার্গশ স্বদেশ মধ্যে সামাজিক সাম্য কিয়ৎ পরিমাণে স্থাপন করিতে গিয়া হেলট্ নামক দাস জাতি এবং অপরাপর গ্রীক্ জাতিদিগকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ, মিশর ও যুডিয়ায় জাতীয় উচ্চ নীচতা বিধাতার বিধান বলিয়া গণনীয় হইত সুতরাং সে প্রভেদ অলঙ্ঘনীয় অপরাপর প্রাচীন রাজ্যে এই প্রভেদ রাজ-শাসনে রাজনৈতিক বিধানে প্রচলিত হইয়াছিল। যে কারণেই হউক, এই সামাজিক অসাম্য থাকাতে যে প্রাচীন রাজ্য সমুদায় বিধ্বষ্ট হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রাচীন সমাজে যে ধর্ম্মাধর্ম্মের ভাব অন্যবিধ ছিল তা বলিয়া নয়, প্রাচীন সমাজে যে জ্ঞানালোকের এবং বীরত্বের অভাব ছিল তা বলিয়া নয়, প্রাচীন রাজ্যে যে সমৃদ্ধির অভাব ছিল তা বলিয়া নয়, কিন্তু এই সামাজিক অসাম্য প্রভূত পরিমাণে ছিল বলিয়া প্রাচীন রাজ্য সমুদায় একে একে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব একবার কেবল এই জাতীয় উচ্চ নীচতা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানবজাতির সকলেই সমান—এই মত বুদ্ধদেব পৃথিবীতে প্রচার করেন। বিধাতার নিকট সকল মনুষ্যই সমান, সকলই তাঁহার সন্তান সন্ততি, এ সংস্কার পূর্ব্বে কাহারও মনে উদয় নাই। বুদ্ধদেব এই মত প্রচার করিতে গিয়া জাতিভেদ বিনাশ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব এক বৈরাগ্য ও যোগ শিক্ষা দিয়া সকল শুভ উপদেশের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসী ও যোগীগণ পৃথিবীর কোন কার্য্যে আইসে নাই।

সে যাহা হউক, বৌদ্ধেরা যখন জাতিভেদ বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন, ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধধর্ম্মের ঘোর-বিরোধী হইয়া উঠিলেন। এই বিরোধের পরিণাম কি, তাহা সকলেই অবগত আছেন। আজি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত থাকিলে, ভারতের ভাগ্য কিরূপ হইত তাহা অনুমান করা যায় না।

বুদ্ধের পর খৃষ্ট এই মত প্রচার করেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভ্রাতৃভাব তাহার অমূল্য উপদেশ। এই ভাব প্রচার দ্বারা ইউরোপীয় জনসমাজ এক নূতন ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। এই ভাব প্রচার দ্বারা ইউরোপের জনসমাজে সামাজিক স্বাধীনতা এখন দাঁড়াইবার স্থল পাইয়াছে। আর্কমিডিস্ তাঁহার দণ্ড স্থাপনের ভূমি পাইলেন।

খৃষ্টের এই মত ইউরোপীয় সমাজে অল্পে অল্পে কেমন বদ্ধমূল হয় তাহা খৃষ্টধর্ম্মের ইতিবৃত্তে প্রকাশিত আছে। রোমে যখন এই মত প্রচারিত হইল, ইহার উদারতায় মোহিত হইয়া রোম তখন কৃষককেও পোপের ধর্ম্মসিংহাসনে উন্নীত করিতে লজ্জিত হয়েন নাই। জন্ হস্ এই অমৃতময় উপদেশ প্রচার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরোহিতের সহিত সামান্য লোকের প্রভেদ কি? লুথার সকলের স্বাধীন মত প্রচারের জন্য ইউরোপে কি অগ্নিকাণ্ডই না প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। ভল্টেয়ার এবং বিশ্বাভিধানিকেরা * সেই রব প্রতিধ্বনিত করিলেন। এই রব আজিও উদ্ঘোষিত হইতেছে। আজি নির্ধন ও ধনী, সকলেই রাজার সহিত সমস্বত্বাধিকারী হইতে সচেষ্ট হইতেছেন। ইহুদীরা সে দিন মাত্র রাজ্যের স্বত্বাধিকারী হইলেন। আজি তজ্জন্য ডিস্‌রেলী মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত। কিন্তু আজিও ইউরোপীয় সমাজে এই মতের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব পরিসমাপ্ত হয় নাই। সেই দ্বন্দ্ব আজিও বিলক্ষণ প্রবল। এ বিষয়ে আমেরিকা অনেকদূর অগ্রসর বলিতে হইবেক।

এই মতের অবলম্বী হইয়া ইংরাজরাজ ভারতবর্ষে ইহা প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। এতদনুসারে তাঁহারা যে একার্য্য করিতে পারিবেন আমাদিগের এমত আশা নাই। কিন্তু এতদনুসারে তাঁহারা কার্য্য করিতে না পারিলে ভারতে ব্রীটিশ রাজ্যের বোধ হয় আমাদিগের পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাচীন রাজ্যের ন্যায় ধ্বংস হইবারই সম্ভাবনা। যদি ইতিহাসের উপদেশ সত্য হয়, তবে সেই ব্রীটিশ রাজ্যের পরিণাম যে সেই প্রাচীন রাজ্যের পরিণাম হইতে প্রভিন্ন হইবে কেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু সেই প্রাচীন রাজ্যের ইতিবৃত্ত সমক্ষে বিস্তারিত রাখিয়া যদি ইংরাজরাজ তাহার উপদেশে আজিও রাজ্যতন্ত্রের সূত্রপাত করেন, আমরা আশা করি, এ রাজ্যের মূল দৃঢ়-প্রোথিত হইবে।

ক্রমশঃ।

* The Encyclopedists.

ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী।

(অষ্টম প্রবন্ধ)।

"উনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দের প্রতি উক্তির" পর ম্যাট্‌সিনি নব্য ইতালি পত্রিকায় "কসিমো ডেল্‌ ফ্যান্টের উপর বক্তৃতা," জাতিসাধারণের ভ্রাতৃভাব" "জার্ম্মাণ টিবিউন্‌," "ফরাশি ও জর্ম্মান্‌ জাতি সমূহের মিলন" "জার্ম্মান্‌ জাতি ও ফরাশি লিবারেল্‌দিগের প্রতি নব্য ইতালী সমাজের উক্তি" প্রভৃতি কয়েকটী প্রবন্ধ লিখেন।

ম্যাট্‌সিনি নব্য ইতালী পত্রিকার প্রথম কয়খানি সংখ্যা বিখ্যাত ঐতিহাসিক সিস্‌মণ্ডির নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহকারিতার প্রার্থী হয়েন। এই উপলক্ষে সিসমণ্ডির সহিত তাঁহার কিছুদিন পত্রাপত্রি চলে। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধগুলির পর সেই পত্রগুলি সিস্‌মণ্ডির অনুরোধে নব্য ইতালী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সিস্‌মণ্ডি ম্যাট্‌সিনির প্রস্তাবে সম্মত হন এবং নব্য ইতালী সমাজের উদার উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু তিনি ইহাতে নিজের নাম দেওয়ার পূর্ব্বে সম্পাদকের নিকট হইতে দুইটি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি চান। প্রথমতঃ এই যে, যে রাজ্যে এই পত্রিকার লেখকেরা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে রাজ্যের বিরুদ্ধে ইহা কখন প্রতিকূল ভাব ধারণ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ এই পত্রিকায় এমন কোন মত প্রচারিত হইবে না, যাহাতে জনসাধারণের ধর্ম্মভাবে আঘাত লাগিতে পারে।

ম্যাট্‌সিনি ইহার উত্তরে লিখেন যে "ফরাশি সাময়িক-রাজনীতিবিষয়ক প্রশ্ন সকলে ব্যাপৃত থাকা এই পত্রিকার লেখকদিগের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি যে আমরা জনসাধারণের ধর্ম্মভাবের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিব না। যখন আমি নিজে সেই ভাবে বিচ্ছুরিত, তখন আমি কোন্‌ প্রাণে ইহার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া জগতে অরাজকতার বীজ বপন করিব? কোন্‌ প্রাণেই বা মানব জীবনের একমাত্র উৎস ও অদ্বিতীয় লক্ষ্য এবং একতাসূত্রের এক মাত্র দুশ্ছেদ্য গ্রন্থি—সেই ধর্ম্ম ভাবের উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক জগতের প্রলয় সাধন করিব?"

সিস্‌মণ্ডি দ্বিতীয় পত্রে স্পষ্টাক্ষরে নব্য ইতালী পত্রিকার লেখক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে স্বীকৃত হন এবং তাহাতে আপনাকে সাধারণতঃ—বিশেষতঃ ইতালী

সম্বন্ধে—সাধারণতান্ত্রিক বলিয়া প্রখ্যাত করেন।

ম্যাট্‌সিনি তাহার পর নব্য ইতালী পত্রিকায় "স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের নিকট নব্য ইতালী পত্রিকার লেখকগণের নিবেদন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখেন। "নব্য-ইতালী সমাজের" বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষীয়েরা যে বিবিধ আপত্তি উত্থাপিত করেন, ইহাতে সেইগুলি সমালোচিত ও খণ্ডিত হয়; এবং যে সকল মত সভার সভ্যদিগের পরিশ্রমের নোদক ও যে সকল লক্ষ্য ইহার সাধনের নিয়ামক তাহা অসন্দিগ্ধরূপে পরিব্যক্ত হয়। তাঁহারা বলেন "শত্রুই হউন্ আর মিত্রই হউন আমরা তাঁহাদিগের নিকট পরিচিত হইতে এবং তাঁহাদিগেরও পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করি।"

"নব্য ইতালী" সমাজের বিরুদ্ধে **প্রথম আপত্তি** এই যে ইহা ইতালীকে "নব্য" ও "প্রাচীন" এই দুই দলে বিভক্ত করিয়া ইতালীর অন্তর্দৌর্ব্বল্য অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। এই দুই দল একত্রিত হইয়া কার্য্য করিলে ইতালীর উদ্ধার সাধন সম্ভবপর হইতে পারিত; কিন্তু এই দুই দলের এরূপ বিচ্ছিন্ন ভাব ইতালীর ভাবী অন্তর্বিদ্রোহের নিদান।

"নব্য ইতালী" সমাজের বিরুদ্ধে **দ্বিতীয় আপত্তি** এই যে ইহা ইতালীয় কার্য্যকর জাতীয় প্রশ্নে নিরবচ্ছিন্নরূপে সংরুদ্ধ না থাকিয়া, কল্পনাবিজৃম্ভিত ভবিষ্য ইউরোপীয় সম্মিলনের আশায় বৈদেশিক জাতিসমূহের সহিত সম্মিলন-প্রার্থী হইয়া, ইতালীর লক্ষ্য সাধন ব্যাহত করিয়া তুলিয়াছে। উক্ত সমাজের কর্ত্তব্য যে বৃথা মত-বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে কার্য্যতঃ ইতালীর প্রকৃত হিত সাধন হয় তাহাতেই নিরবচ্ছিন্নরূপে ব্যাপৃত থাকে। অবশিষ্ট সমস্তই আপাততঃ ভবিষ্যতের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট হইতে ইতালীর উদ্ধার সাধন হইলে সে সকল তখন বিচার করা যাইবে।

ম্যাট্‌সিনি—**দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে এই বলিয়াছেন**ঃ—"যে যদি এই সমাজ হইতে ইতালীর প্রকৃত হিত সাধনের কোন যৌক্তিক আশা থাকে, তাহা হইলে তাহার মূল এই জানিতে হইবে যে এই সমাজের কার্য্যকলাপ এরূপ বিশ্বপ্রয়োগসহ নিয়মাবলী দ্বারা সঞ্চালিত ও সংযমিত, যে তাহা ইউরোপীয় জাতিমাত্রেরই প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে।

"একতা—ভৌতিক ও নৈতিক উভয় জগতেরই নিয়ন্ত্রী। যদি সামাজিক জীবনের ঘটনানিচয় কোন এক অব্যভিচারী মূল নিয়ম দ্বারা পরিচালিত ও সংযমিত না হয়, তাহা হইলে অচিরাৎ ঘোরতর ব্যক্তিগত মত-বৈষম্য উপস্থিত হইবে এবং বলই সেই বৈষম্যের একমাত্র মীমাংসক হইবে; সুতরাং যথেচ্ছাচারের পথ পরিষ্কৃত হইবে। বিবিধ বৈষম্যপূর্ণ

বলের সামঞ্জস্য করণের দিকেই সমাজ মাত্রের স্বাভাবিকী প্রবণতা। সেই বিষম বল-নিচয়ের অন্যোন্য-সংঘর্ষই সামাজিক পীড়ার নিদান।

"সামাজিক উন্নতির কারণ-নিচয়ের আপেক্ষিক সম্বন্ধ নির্ণয় ও স্থাপন করাই প্রত্যেক বিপ্লবের লক্ষ্য।

"নব্য ইতালী সমাজের সভ্যদিগের বিশ্বাস যে—যাঁহারা ইতালীর উদ্ভব সাধনের প্রকৃত অভিলাষী তাঁহাদিগের পক্ষে উদ্ধার-সাধনোপযোগী উপাদান-কারণ সামগ্রীর আলোচনা একান্ত আবশ্যক; কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে সেই উপাদানকারণ-সামগ্রীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ সম্ভবপর এবং কিরূপ মূলভিত্তির উপর নূতন রাজনৈতিক প্রাসাদ প্রতিষ্ঠাপিত হইবে এ সকলের পর্য্যালোচনাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

"স্বাধীনতা শব্দের লক্ষ্য ও অর্থ না বুঝিয়া শুদ্ধ "স্বাধীনতা!" "স্বাধীনতা!—" রব করা উৎপীড়িত দাসের কার্য্য বই আর কিছুই নয়।

"প্রতিষ্ঠাপিত শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে লক্ষ্য-শূন্য প্রতিঘাতমাত্রে সংরুদ্ধ থাকিলে আমরা স্বাধীনতা শব্দের মহৎ উদ্দেশ্যের মর্ম্মভেদ করিতে পারিব না। এরূপ অর্থে অনুসৃত স্বাধীনতা আমাদিগকে উৎসর্গীকৃত-জীবন (Martyr) মাত্র করিতে পারিবে, বিজয় প্রদান করিতে কখনই সমর্থ হইবে না।

এইজন্য ইতালীয়দিগের অভ্যুত্থানের লক্ষ্য কি তাহা অগ্রে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

"আমরা চাই কি?

"আমরা জাতীয় অস্তিত্ব চাই। আমরা জাতীয় নাম চাই। আমরা আমাদিগের দেশকে প্রভুশক্তি-সম্পন্ন, সর্ব্বসম্মানিত, স্বাধীন ও সুখী দেখিতে চাই।

"আমরা (জাতীয়) স্বাধীনতা একতা ও (ব্যক্তিগত) স্বাতন্ত্র্য চাই।

"আমরা জানি প্রথমটী সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। কারণ ইতালীয় মাত্রেই সমস্বরে ইতালীয় গগণ বিদারিয়া বলিবে—বৈদেশিক উৎপীড়কদিগকে দূরীকৃত কর।

জাতীয় একতা বা জাতীয় সম্মিলন সম্বন্ধে মতান্তর ছিল বটে, কিন্তু ম্যাট্‌সিনির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এ মতান্তর সহজেই অপনীত হইতে পারে। কাহারও কাহারও এরূপ ইচ্ছা যে সমস্ত ইতালী এক জাতীয় প্রভুশক্তির অধীন হয়, আবার কাহারও কাহারও বা ইচ্ছা যে ইতালীয় প্রদেশ সকল বিভিন্ন বিভিন্ন প্রভুশক্তির অধীন থাকিয়াও এক প্রকাণ্ড জাতীয় সম্মিলনসূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু এই প্রভেদ অতি সূক্ষ্ম, ইহার অভ্যন্তরে ঘোরতর মত-সংঘর্ষ নাই। সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে জাতীয় একতায় জাতীয় বলের পরমা কাষ্ঠা সংসাধিত হয়; সুতরাং জাতীয় একতা সম্ভবপর হইলে তাহাই সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। জাতীয় একতা সম্ভবপর কিনা এই বিষয় লইয়াই মতা-

ম্ভব; কেহ কেহ বলেন ইহা অসম্ভব: আবার কেহ কেহ বলেন ইহা সম্ভব। এই শেষোক্ত দলের মধ্যে আবার দুই দল আছে এক দল বলেন ইহা সম্ভব বটে, কিন্তু ইহা সময়-সাপেক্ষ; আর একদল বলেন ইহার সময় আসিয়াছে। কিন্তু কিরূপ শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুরক্ষিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে ঘোরতর মতবৈষম্য আছে। এক দল বলেন বিধিনিয়ন্ত্রিত স্বদেশীয়-রাজাধিষ্ঠিত রাজতন্ত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পরিরক্ষণের সবিশেষ উপযোগিনী শাসন-প্রণালী; আর এক দল বলেন ইতালীতে এক্ষণে এরূপ প্রভুশক্তিসম্পন্ন ও প্রাচীন রাজবংশ-সম্ভূত রাজপুরুষ নাই, যাঁহার নিকট সমস্ত ইতালীবাসী নতশির হইতে পারেন, এই জন্য ইউরোপের কোন প্রাচীন রাজবংশ হইতে একটী রাজকুমার আনাইয়া ইতালীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে। আর এক দল বলেন যে, যে ইতালীয় সৈনিকপুরুষ বৈপ্লবিক সমরে বিজয়লক্ষ্মীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম প্রেমাস্পদ হইবেন, তাঁহাকেই ইতালীর রাজচক্রবর্ত্তী করিতে হইবে; আবার সংখ্যায় বহুল আর এক দল বলেন যে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী ব্যতীত আর কোন প্রকার শাসনপ্রণালীরই অধীনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পূর্ণ প্রতিভূ নাই। ইহা অপেক্ষা লঘুতর প্রশ্ন লইয়াও নানা-প্রকার তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে প্রধান, নির্ব্বাচন-রাজনীতির (Elective-system) প্রয়োগ-প্রণালী। যথা—প্রতিনিধি সভা একটী, দুইটি বা ততো-ধিক হইবে? বিচার বিভাগে কি পরিমাণে প্রভুশক্তি সন্ন্যস্ত থাকিবে? ইত্যাদি। এবং এই সকল বিবাদ বিসম্বাদ ও দলাদলি বৈদেশিক শত্রুদিগের সমক্ষেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শত্রুরা এই অন্তর্বিচ্ছেদের সুবিধা লইয়া এক এক করিয়া সমস্ত দলেরই মস্তক চূর্ণ করেন।

এই ঘোর অন্ধকার ও ভীষণ মত-বিসম্বাদের নিবারকরণ মানসে কেহ কেহ এরূপ প্রস্তাব করেন যে "যতদিন না ইতালীয় জাতি ইহাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব উপলব্ধ করিতে পারিতেছেন, আইস ততদিন আমরা সমস্ত মতভেদ পরিত্যাগ করি। যেহেতু বৈদেশিক অধীনতা হইতে ইতালীর উদ্ধার সাধন বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই, আমরা এক্ষণে শুদ্ধ ইহারই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই; জাতীয় স্বাধীনতা পুনঃ-স্থাপিত হইলে সে সকল মতভেদের তখন মীমাংসা করা যাইবে।"

এরূপ প্রস্তাব অন্তর্দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক; নব্য ইতালী সমাজ দুর্ব্বলতা-প্রদর্শনে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বাধাবিপত্তি বা সন্দেহের পরিবর্জ্জন ও পরিহরণ ইহার ইচ্ছা নহে; প্রত্যুত: সন্দেহের নিরসন ও বাধাবিপত্তির উল্লঙ্ঘনই ইহার দৃঢ় ব্রত।

"বাধাবিপত্তি ও সন্দেহের পরিহরণ করিয়া এবং কোথায় যাইব কিছুই না জানিয়া কেবল "অগ্রসর হও! অগ্রসর হও।" বলিয়া রব করা কাপুরুষের

কার্য্য—স্বদেশের সঞ্জীবন-কার্য্যে ব্রতী মহাত্মাদিগের কার্য্য নহে।

"বিশেষতঃ লোকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিনিময়ে জাতীয় স্বাধীনতার প্রার্থী নহে। যদি তাহারা জানিতে পারে যে জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাপিত হইলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুরক্ষিত হইবে, তবেই তাহারা বৈদেশিকদিগের শৃঙ্খল হইতে ইতালীকে উন্মুক্ত করিতে অগ্রসর হইবে।

"শুদ্ধ প্রতিষ্ঠাপিত শৃঙ্খলার প্রলয়সাধনে একটী সমগ্র জাতিকে বিপ্লবে উত্থাপিত করা অসম্ভব। তাহারা প্রাচীন যথেচ্ছাচার স্থলে নব যথেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য দেহের রুধির, গৃহের ধন, এবং যথাসর্ব্বস্বই বিসর্জ্জন করিতে কখনই প্রস্তুত হইবে না। যদি জনসাধারণকে বিপ্লবে উত্তেজিত করিতে চাও, তবে অগ্রে তাহাদিগের নয়ন-সমক্ষে একটী সংক্ষিপ্ত, অসন্দিগ্ধ ও পূর্ণ কার্য্যপ্রণালী ধারণ কর।

"কিপ্রকার শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে, বিপ্লবের কৃতকার্য্যতার পর এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে বরং নূতন নূতন দুর্গমতা উপস্থিত হইবে।

"সেই ভীষণ ঝটিকার পর যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, তাহাতে জন সাধারণের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিয়া উঠা ভার হইবে। তখন যিনি কৌশলী তিনিই প্রজাসাধারণকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকে বিভক্ত করিতে পারেন। সুতরাং বিপ্লবের উদ্দেশ্য বিফল হইতে পারে।

"বিপ্লবের পর এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করার পরীক্ষা কার্ব্বোনারী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক একবার অনুষ্ঠিত হইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে। অন্তর্ব্বিচ্ছেদের মৌলিক অনিষ্ট বিপ্লবের পর দ্বিগুণতর ভীষণ আকার ধারণ করে; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আবার লক্ষ্যের একতা ও কার্য্যপ্রণালীর ঐকতানিকতার বিশেষ ও অপরিহার্য্য আবশ্যকতা। কারণ লক্ষ্য স্বতন্ত্র হইলে, কার্য্যপ্রণালীও স্বতন্ত্র হইবে। যেহেতু যাঁহারা বিধিনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সমুদ্যত, তাঁহাদিগকে সাধারণতান্ত্রিকদিগ হইতে স্বতন্ত্র কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। নতুবা ফলবৈষম্য ঘটিবে কেন? বিভিন্ন কারণ হইতেই বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয়।

"সাধ্য ফলের স্থিরতা ও পূর্ণ অবগতিই প্রত্যেক বিপ্লবের মূল ভিত্তি স্বরূপ।

"কি সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিলে সেই সাধ্য ফলের উপলব্ধি হইবে তাহা দ্বিতীয় বিবেচনার স্থল। কিন্তু সাধ্যের সিদ্ধান্ত হইতে সাধনার সিদ্ধান্ত আপনিই প্রসূত হয়। এই জন্য অগ্রে সাধ্যের—বিশ্বাস ও লক্ষ্যের—সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

"আমরা সাধারণতন্ত্রকে আমাদিগের সাধ্য স্থির করিলাম।

"যে সকল কারণে এই সিদ্ধান্তে

বলিয়াছি। এক্ষণে আবার সংক্ষেপে বলিতেছি। "১ম সাধারণতন্ত্র কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের অপরিহার্য্য ও ন্যায়-সঙ্গত ফল; ২য় প্রকৃত স্বাধীনতা ও বিশ্বজনীন একতার সহিত রাজতন্ত্রের সামঞ্জস্য নাই; ৩য় অসংখ্য রাজপুরুষের বিশ্বাসঘাতকতা; ৪র্থ কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নামে প্রাদেশিক ঈর্ষানলের নির্ব্বাণাসম্ভবতা; ৫ম এমন একটী ধার্ম্মিক, যশস্বী ও প্রতিভাশালী লোকের অসম্ভব, যিনি ইতালীর সঞ্জীবন কার্য্যের অধিনেতা হইতে পারেন। ৬ষ্ঠ সাধারণ-তন্ত্রের অতীত মহতী অবদান-পরম্পরা অদ্যাপি ইতালীয়দিগের স্মৃতিপটে জল-দক্ষরে লিখিত আছে; ৭ম ইতালীয়-দিগের মধ্যে রাজতন্ত্রের অনেক গুলি উপাদান-সামগ্রীর অভাব আছে: ৮ম এবং বিপ্লবেই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করার ইচ্ছা—এ সমস্ত কারণই রাজতন্ত্রের প্রতিকূল; কিন্তু সাধারণতন্ত্রের অনুকূল।

"এই জন্যই আমরা সাধারণ-তন্ত্রকে আমাদিগের সাধ্য স্থির করিলাম। সুতরাং যখন আমরা লৌকিক পতাকা গগণে উড্ডীন করিলাম, তখন আমাদিগের সমস্ত আশা লোক সাধারণের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। তাহাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। আমরা তাহাদিগের স্বাধীন কার্য্যের প্রতিরোধ করিব না, কিন্তু তাহা-দিগের কার্য্যাবলীকে সৎপথে লইয়া কিক, জাতীয় গেরিলা যুদ্ধ খ্যাপন করিব, যে কোন শত্রুরই এরূপ সাধ্য হইবে না যে তাহার প্রমুখীন হয়। এই জন্য আমরা সর্ব্বপ্রকার মর্য্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করিব; সাম্যবাদকে একটী নূতন ধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষা দিব; এবং সর্ব্ব-প্রকার শ্রেণী-বৈষম্য পদদলিত-করিয়া একটী প্রকাণ্ড জাতীয় সম্মিলন সংস্থাপিত করিব।

"এই জন্য আমরা কেবল রাজার সাহায্য-প্রার্থী হইব না, অথবা বৈদেশিক রাজ-নীতি ও কূট মন্ত্রণাজালের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির বৃথা আশায় প্রবঞ্চিত হইব না, আমরা বৈদেশিক মন্ত্রিদল ও বৈদেশিক রাজদূতের নিকট মুক্তি ভিক্ষা চাহিব না; কারণ আমরা জানি যে যখন আমরা সাধারণতন্ত্রের নামে বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিয়াছি, তখন আমরা ইউ-রোপীয় রাজনীতির সহিত অনিবার্য্য ও অপরিসংহরণীয় বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি; এ বিপ্লব কূট মন্ত্রণাজালে বা মুগ্ধ সন্ধিতে সংসাধিত হইবার নহে, শাণিত বেয়নে-টের সূক্ষ্মাগ্রেই ইহা সংসাধিত করিতে হইবে। জনসাধারণেরই সহিত আমা-দিগের সম্বন্ধ, সুতরাং তাহাদিগকে লইয়াই আমরা লড়িব। তাহারাই আমা-দিগকে বুঝিবে।"

ম্যাট্‌সিনি প্রথম আপত্তির উত্তরে এইরূপ বলিয়াছেন:—

কার উপর "নব্য ইতালী" এই সঙ্কেত অঙ্কিত করিয়াছি তাহার কারণ এই যে ইহাই আমাদিগের মতে সঞ্জীবিত ও অভ্যুদয়োন্মুখ ইতালীয় জাতির জাতীয় নামের উপযুক্ত সঙ্কেত।

"যাঁহারা সামাজিক বিপ্লবের অভিমুখে জনসাধারণের বলবতী ইচ্ছাকে সঙ্কীর্ণ সংস্কার-সীমায় আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন; যাঁহারা মর্য্যাদা বা সম্ভ্রান্তি (Aristocracy) রূপ প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষকে লোকতান্ত্রিক নবীন প্রাসাদের সোপান প্রস্তর করিতে চান; যাঁহারা অতীত বন্ধুদর্শনের অখণ্ডনীয় প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও, বংশপরম্পরাগত রাজতন্ত্রের প্রচারে অস্খলিত-যত্ন; যাঁহারা জন সাধারণের মৃত দেহের উপর নবীন যথেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য জন সাধারণকে মৃত্যুমুখে উত্তেজিত করিয়া থাকেন; যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক মর্য্যাদা ও অসমতার বিরুদ্ধে উচ্চরব হইয়াও, অধ্বষ্যশরীর রাজা, বংশপরম্পরাগত সভ্য-সমাকুল সভা এবং নির্ব্বাচনী শ্রেণী রূপ রাজনৈতিক মর্য্যাদা ও অসমতার মূলভিত্তির উপর নূতন শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চাহেন; যাঁহারা একটী প্রণালীর সমূলোৎপাটন করিবেন বলিয়া লোকের নিকট ভান করেন, অথচ সেই প্রণালীর ফলগুলি সযত্নে সংরক্ষিত করেন; যাঁহারা একটী সমগ্র জাতির অদৃষ্টনেমির পরিবর্ত্তনের অধিকার আপনাদিগেরই হস্তে রাখিতে চান, অথচ বিপৎ ও মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে কম্পিত-কলেবর হয়েন; যাঁহারা ষড়্‌বিংশতি মিলীয়ান্ ইতালীয়কে বিপ্লবে সমুত্থিত করিতে চাহেন, অথচ কোথায় যাইতে হইবে এবং কি করিতে হইবে তাহা জানেন না; যাঁহারা আপনাদিগকে এত দূর নিরবচ্ছিন্নরূপে ইতালীয় বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন যে, বৈদেশিক অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্যেও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, অথচ বৈদেশিক মন্ত্রিসভার অনুগ্রহের উপরই যাঁহারা সমস্ত বিজয়াশা নির্ভর করেন, এবং জাতীয় সেনা লইয়া বিপ্লবপতাকা উড্ডীন করা অবিমৃষ্যকারিতা বলিয়া খ্যাপন করেন; যাঁহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়াও সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার প্রতিকূল—তাঁহাদিগকেই—তাঁহারা যে বয়সেরই হউন, যে অবস্থারই হউন, যে প্রদেশেরই হউন—কেবল তাঁহাদিগকেই আমরা "প্রাচীন ইতালী" নামে অভিহিত করিলাম। তাঁহারা অতীত যুগের লোক, তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি জাতীয় উন্নতির ভীষণ শত্রু।

ইহাঁদিগের হইতে আমরা "নব্য ইতালী"—যাহাদিগের মন অনন্ত উন্নতি, অসীম ভবিষ্যৎ ও অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার দিকে প্রবলবেগে প্রধাবিত—যে বয়সেরই, যে অবস্থারই এবং যে প্রদেশেরই হই না কেন—আমরা চিরকালের জন্য আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ [illegible] স্থাপন করিলাম।

আমরা ব্যক্তিমাত্রেরই জন্য সার্ব্ববিষয়িক স্বাধীনতা চাই।

আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও কর্ত্তব্যনিচয়ের অবৈষম্য চাই।

আমরা জগতের উন্নতিসাধন-ব্রতে ব্রতী যাবতীয় লোক লইয়া, সমস্ত জাতি একত্র মিলিত হইয়া, একটী প্রকাণ্ড মানবসমাজ গঠন করিতে চাই। ইহাই আমাদিগের সঙ্কেত, ইহাই আমাদিগের লক্ষ্য, ইহাই আমাদিগের কঠোর ব্রত।

যিনি আমাদিগকে ইহা অপেক্ষা কিছু ভাল শিখাইতে পারেন তিনি অগ্রসর হউন। তাঁহারই কর্ত্তব্য তাহা খ্যাপন করা।

যিনি আমাদিগ অপেক্ষা কিছু ভাল না জানেন, আসুন্ তিনি আমাদিগের সহযোগী হউন্, আমাদিগের ভ্রাতা হউন।

যাঁহারা এ উভয়ের অন্যতর কিছুই করিবেন না, তাঁহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকুন্ তাহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নহে; কিন্তু তাঁহারা যেন আমাদিগের নিকট নিস্তব্ধতা ও জড়তার উপদেশ দান রূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ না করেন।

জনসাধারণই আমাদিগের এই নবীন ধর্ম্মের মূলমন্ত্র; ইহাই সামাজিক পিরামিডের ভিত্তিভূমি; ইহাই মানবসম্মিলনের মধ্য বিন্দু; ইহাই সেই সংহিত মানব—যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আমরা ইতালীয় বিপ্লব বা সঞ্জীবন কার্য্যের বিষয় বলি বা চিন্তা করি।

জনসাধারণ শব্দে আমরা সেই জনসমষ্টি বুঝি যাহাদ্বারা এই জাতিটী সংগঠিত।

কতকগুলি লোক হইলেই একটী জাতি হয় না। তাহাদিগের মধ্যে যদি একটী সাধারণ লক্ষ্য না থাকে, যদি তাহারা এক সাধনায় সিদ্ধ না হয়, যদি এক প্রকার বিধিমালা দ্বারা তাহারা সংযমিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে একটী জাতি বলিতে পারি না। জাতিশব্দ একতা-বাঞ্জক। মতের একতা, লক্ষ্যের একতা এবং অধিকারের একতাই কতকগুলি বিসংশ্লিষ্ট লোককে পরস্পর সম্বদ্ধ ও একটী সমগ্র জাতিতে পরিণত করিতে পারে।

যথন সেই মত, সেই লক্ষ্য, সেই অধিকার নিচয়, কোন অবিচলিত ও চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত হয়, তখনই সেই জাতিকে প্রকৃত জাতি বলিয়া পরিগণনা করিব।

যে মতে তাহাদিগের সাধারণ বিশ্বাস, সে মত অখণ্ডনীয় ও উন্নতিশীল হওয়া চাই; যেন তাহা সময়ে বা মানুষের খেয়ালে বিনষ্ট না হয়।

আর সেই লক্ষ্য নৈতিক লক্ষ্য হওয়া চাই; কারণ ভৌতিক লক্ষ্য মাত্রই সঙ্কীর্ণ, সুতরাং প্রকৃতিতঃ চিরস্থায়ী সম্মিলনের মূলভিত্তি হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

আর সেই অধিকারনিচয় যেন মানব প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ সত্ত্বের নিকর্ষ হয়; কারণ তাদৃশ অধিকারনিচয়ই কালের করাল চক্রে সংঘৃষ্ট ও উৎখাদিত হয় না।

মতসাম্য অনিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছা প্রসূত হওয়া চাই; বলে ও কৌশলে যে মতসাম্য তাহা বালুকানির্ম্মিত সেতুর ন্যায় ভারসহনাসমর্থ।

আত্মোন্নতি ও আত্মবৃত্তিনিচয়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিণতিই যেন ব্যক্তিমাত্রের সাধারণ লক্ষ্য হয়।

কিন্তু জাতির লক্ষ্য হইবে সামাজিক বলনিচয়ের বর্দ্ধনশীল পরিণতি ও ক্ষিপ্রকারিতা সাধন। সমাজ-বন্ধন এই উদ্দেশ্য সাধনের একটী প্রধান উপায়।

স্বত্ব ও কর্ত্তব্যে যাহাদিগের সমান অধিকার, তাহাদিগের মধ্যেই প্রকৃত সমাজ বন্ধন সম্ভব।

যেখানেই স্বত্বের সাম্য অব্যভিচারী নিয়ম নহে, সেই স্থানেই শ্রেণী বৈষম্য, আধিপত্য, মর্য্যাদা, দাসত্ব এবং অধীনতা বর্ত্তমান; সেখানে স্বাধীনতা, বা সমাজ-বন্ধন সম্ভবপর নহে।

সাম্য, স্বাধীনতা, এবং সমাজবন্ধন— এই তিনটী উপাদানেই একটী প্রকৃত জাতি গঠিত।

যে স্বাধীন-নাগরিক-স্বত্বভোগী অধিবাসিগণ এক ভাষায় কথা কহে, এক প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বত্বের অধিকারী, এক সাধারণ লক্ষ্যের অনুসরণে ব্রতী—তাহাদিগের সমষ্টিকেই একটী জাতি বলি।

সমাজবন্ধনের ও সম্বন্ধ সভ্যদিগের সাম্যের প্রথম পরিণাম এই হইবে যে কোন পরিবার-বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ সেই সামাজিক বলনিচয়ের অংশের বা সমগ্রের উপর একাধিপত্য করিতে পারিবেন না।

সমাজবন্ধন ও সম্বদ্ধ সভ্যগণের মধ্যে সাম্য-সংস্থাপনের দ্বিতীয় পরিণাম এই হইবে যে;—

কোন শ্রেণীবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ জাতির নিকট হইতে অব্যবহিত আদেশ না পাইয়া সেই সামাজিক বলনিচয়ের সঞ্চালন কার্য্যের গুরুভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

এইরূপে সর্ব্বপ্রকার পুরুষ-পরম্পরাগত মর্য্যাদা বা আধিপত্যের তিরোধান হইবে। সুতরাং যে সকল ব্যক্তির উপর রাজ্যের শাসনভার অর্পিত থাকিবে, তাঁহারা জাতির নিয়োজিত ভৃত্য হইবেন; তাঁহাদিগের আদেশ জাতি দ্বারা প্রতিসংহরণীয় হইবে; কারণ তাঁহারা পদমর্য্যাদা, স্বত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু পাইয়াছেন তাহা জাতি হইতেই।

স্বয়ং জাতিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা।

যে সকল ক্ষমতা জাতি হইতে প্রসূত হয় নাই, তাহা হঠহৃত ও অবৈধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

যে কোন ব্যক্তি জাতি-নির্দ্দিষ্ট প্রভুতা-সীমা উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনিই একজন বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

নব বিধিমালার প্রতিষ্ঠাপন এবং প্রতিষ্ঠাপিত বিধিমালার যখন জাতীয় অভাব

ও [illegible] বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতির সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিপুষ্টি সাধন রূপ অনুল্লঙ্ঘনীয় স্বত্ব কেবল জাতিরই হস্তে নিহিত আছে।

কিন্তু যে হেতু জাতিস্থ ব্যক্তিমাত্রেই সাধারণ সভায় অধিবেশন করিয়া জাতীয় বিধিমালার আলোচনা ও তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে অক্ষম, এইজন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; ইহাঁরা—যাঁহাদিগের উপর বিশ্বাস আছে—এরূপ কতিপয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। তাঁহাদিগকে জাতীয় অভাব ও জাতীয় ইচ্ছা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দেন, এবং সেই জাতীয় অভাবের অনুসরণে সেই জাতীয় ইচ্ছাকেই বিধির আকারে গঠিত করিতে আদেশ করেন।

জাতিনিয়োজিত প্রতিনিধি কর্ত্তৃক পরিব্যক্ত জাতীয় ইচ্ছাই সেই জাতির প্রত্যেক সভ্যের অলঙ্ঘ্য বিধি হইবে।

জাতি অভিন্ন, সুতরাং জাতীয় ইচ্ছার পরিব্যক্তিও অভিন্ন। একের অভেদের অভ্যন্তরে অপরের অভেদ নিহিত আছে।

এই প্রকাণ্ড জাতীয় সম্মিলনের অভ্যন্তরে সর্ব্বপ্রকার জাতীয় উপাদান ও বল অন্তর্নিহিত আছে, যে প্রতিনিধি সর্ব্বপ্রকার জাতীয় প্রণালী এই সকল জাতীয় উপাদান ও জাতীয় বলের ইচ্ছার অভিব্যক্তির মুখযন্ত্রস্বরূপ, তাহাকেই আমরা প্রকৃত জাতীয় প্রতিনিধি প্রণালী বলি।

যেই খানেই সেই সকল বলের কোনটী উপেক্ষিত হয়, সেই খানেই প্রতিনিধি প্রণালী অসম্পূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং প্রতিনিধি দ্বারা সেই বলের যথাযথ অভিব্যক্তি করিতে স্বভাবতই বলবতী ইচ্ছা ও প্রবণতা জন্মে; এই জন্যই আবার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া উঠে। সুতরাং বিবাদ ও বিপ্লব—শান্তি ও নিস্তব্ধ পরিণতির স্থলাভিষিক্ত হয়।

আমাদিগের অধিনয়নে জাতীয় প্রতিনিধিনির্ব্বাচন প্রণালী সম্পত্তির উপর সন্ন্যস্ত না হইয়া জনসংখ্যারূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইবে।

প্রতিনিধি মনোনীত করণ কালে প্রত্যেক অধিবাসীর মত গ্রহণ করা যাইবে। যিনি প্রতিনিধি মনোনীত করণে আত্মমত প্রদান না করিবেন, তিনি স্বাধীন নাগরিকের স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হইবেন।

শিক্ষা ও ক্ষমতার বৈষম্য হেতু যাঁহারা প্রতিনিধিমনোনীত করণে বিশ্বব্যাপী অধিকারের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের আপত্তি খণ্ডনের জন্য আমরা প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের দুইটী অঙ্গ করিব; প্রথমতঃ বিশ্বব্যাপী অধিকারের বলে প্রত্যেক অধিবাসী কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক লোককে প্রতিনিধি নির্ব্বাচক মনোনীত করিবেন; দ্বিতীয়তঃ জাতীয় সভার সভ্যনির্ব্বাচনের ভার তাঁহাদিগেরই উপর অর্পিত হইবে।

এই সভ্যগণের উপরই জাতীয় শাসনভার ন্যস্ত থাকিবে; তাঁহারা জাতীয়

কোষ হইতে বেতন পাইবেন; এবং যতদিন তাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী থাকিবেন, ততদিন তাঁহারা রাজ্যের অন্য কোন পদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন না।

এই জাতীয় সভার সভ্যসংখ্যা যত অধিক হয় ততই ভাল; সভ্যসংখ্যা অধিক হইলে উৎকোচপ্রথা আপনিই কমিবে, কারণ সভ্য মনোনীত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক থাকিলে উৎকোচদ্বারা সভ্য মনোনীত হওয়ার তত প্রয়োজন থাকিবে না। এই জাতীয় সভার সভ্যসংখ্যার হ্রাসের সহিত ফ্রান্সে স্বাধীনতার হ্রাস পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

প্রতিনিধি-নির্ব্বাচকেরা একত্র মিলিত হইয়া জাতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন; প্রতিনিধিনির্ব্বাচনে তাঁহাদিগের ক্ষমতা অপরিসীম থাকিবে; কারণ সে ক্ষমতা সবাধা হইলে জাতীয় রাজত্বের গৌরব নষ্ট হইবে।

সামাজিক বলনিচয়ের পরিণতি, উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল উন্নতি ও কার্য্যপরতাই সমাজ-বন্ধনের মূলভিত্তি ও অলঙ্ঘ্য জাতীয় বিধি।

সাধারণ হিতের অনুসরণে সেই সামাজিক বলনিচয়ের সুশাসন, সুনিয়মন, ও পরিপুষ্টিসাধনই জাতীয় প্রতিনিধিদিগের প্রধান কার্য্য। তাঁহারা রাজনৈতিক সাম্যের পরিরক্ষক, সুতরাং তাঁহাদিগকে বিধিমালা এরূপ ভাবে গ্রথিত করিতে হইবে যে সামাজিক সাম্যেরও যেন ক্রমে পরিপুষ্টি সাধন হয়।

এইজন্য দারিদ্র-দুঃখ-প্রপীড়িত অসংখ্য নিম্নশ্রেণীর দুঃখাপনোদনে তাঁহাদিগের অনেক সময় ও অনেক যত্ন ব্যয়িত করিতে হইবে।

এইজন্য দায়, উইল্‌ এবং দানাদি বিষয়ক বিধিগুলি এরূপ ভাবে গঠিত করিতে হইবে যেন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে অতিশয় টাকা না জমিতে পারে এবং পরিবার বিশেষের অধীনে অতিরিক্ত সম্পত্তির সঞ্চয় না ঘটিতে পারে।

সমস্ত বিধিমালার লক্ষ্য এই হওয়া চাই যে যাঁহারা রাজ্যের যে পরিমাণ উপকার সাধন করিবেন তাঁহারা সেই পরিমাণই পুরস্কার পাইবেন।

কর-প্রণালী এরূপে সংগঠিত করিতে হইবে যেন যে সকল বস্তু জীবিকা সাধনের অপরিহার্য্য উপযোগী সে সকলের উপর কোন প্রকার কর সংস্থাপিত না হয়; কিন্তু যে সকল বস্তু শুদ্ধ বিলাস-সাধন সে সকলের উপর পরিমাণানুরূপ ও ক্রমিক-বর্দ্ধনশীল কর সংস্থাপিত হয়।

স্বসমান ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিচারের অধিকার হইতে সমুৎপন্ন জুরি-বিচার-প্রথা প্রতিষ্ঠাপিত হইবে।

সম্ভবতঃ অধিকতম ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত সম্ভবতঃ অধিকতম জাতীয় সৌভাগ্যের সামঞ্জস্য সাধন করাই জাতীয় স্বাধীনতার পরিরক্ষক, জাতীয় প্রতিনিধিদিগের প্রধান কর্ত্তব্য।

তাহা হইলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিরক্ষণের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার

বিরুদ্ধে যত প্রকার অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার গুরুতর দণ্ড বিধান করিতে হইবে।

তাহা হইলেই ব্যক্তিগত-বিবেক বিষয়ক স্বাধীনতা অস্পৃশ্য রাখিতে হইবে; এবং ধর্ম্মবিষয়ক সর্ব্বপ্রকার প্রশ্ন ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও বিচারের মীমাংসায় অর্পণ করিতে হইবে।

তাহা হইলেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ও সুরক্ষিত হইবে।

কিন্তু আমাদিগের জাতি এক্ষণে ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে না। সম্মিলিত সমাজে ক্রমিক উন্নতি সাধনের দিকে ইহার বলবতী ইচ্ছা। সামাজিক বন্ধনিচয়ের পরিরক্ষণ মাত্রে ইহার পরিতৃপ্তি হইবে না, তাহার পরিবর্দ্ধন করা ইহার প্রধান লক্ষ্য হইবে। সুতরাং ইহার প্রতিনিধিদিগের ভবিষ্যতের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে; ভবিষ্য যুগে যে উচ্চতর শ্রেণীর সভ্যতার আবির্ভাব হইবে তাহার অনুসরণে সতত নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

সুতরাং সমাজ বন্ধনের স্বাধীনতা সর্ব্বথা পরিরক্ষিত করিতে হইবে, এবং সুশিক্ষা দ্বারা সাধারণ মনোবৃত্তির যাহাতে বিশেষ পরিপুষ্টি সাধন হয় তদ্বিষয়ে যথাসম্ভব সর্ব্বপ্রকার উপায় বিধান করিয়া দিতে হইবে; এরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে যাহাতে জাতিস্থ সমস্ত ব্যক্তিই অন্ততঃ সামান্য শিক্ষাও পাইতে পারে।

যাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তির এবং পারিবারিক ও সামাজিক নীতির উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই সাধারণ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

অপরাধীর উন্নতি ও সংস্কার সাধনরূপ ভিত্তির উপরই দণ্ডবিধি সন্ন্যস্ত হইবে।

নানা স্থানে যাহাতে সাধারণ পুস্তকালয়, সাময়িক পত্রিকা, বিশ্ব বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাপিত হয় তাহার নানাপ্রকার উপায় করা যাইবে।

স্বাধীন ও সুশৃঙ্খল রাজ্যের মূলভিত্তি স্বরূপ এই গুলি প্রতিষ্ঠাপিত হইলে ইতালীর সেই সভ্যতাশৈলের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবার পথ পরিষ্কৃত হইবে, যাহার জন্য আমরা এতদিন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলাম; এবং যে গবর্ণমেণ্ট প্রজাসাধারণের আহ্বানে প্রভুতায় আহূত হইয়াছেন, সে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই এই লক্ষ্য সাধনে সরলভাবে ও প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন, নতুবা উহা কখনই প্রজাসাধারণের প্রীত ও বিশ্বাস ভাজন হইতে পারিবে না।

বিশ্বব্যাপী ভোটে যে প্রকার শাসনপ্রণালী নির্ব্বাচিত হইবে, তাহারই নিকট আমরা নতশির হইব; কারণ জাতীয় ইচ্ছার অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত ইচ্ছার অন্তর্ধান সর্ব্বথা প্রার্থনীয়; কিন্তু যদি এ সকল মত আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের মূলভিত্তি না হয়, তাহা হইলে আমরা কাতর অন্তরে দেখিব আরও কতদিন মানব দুর্ব্বলতা ও মানব প্রলোভন—মানবজাতি

ও উহার ভবিষ্য সৌভাগ্যের অন্তর্বর্ত্তী হইয়া নব নব বিপ্লবের নিত্য আবশ্যকতা সৃষ্টি করিবে।

আমাদিগের উত্তর এক্ষণে সম্পূর্ণ হইল। আমাদিগের অভিপ্রায় সকল এক্ষণে জগতের নিকট বিদিত হইল; যিনি ইচ্ছা করেন এই সকলের সমালোচনা করিতে পারেন। "নব্য ইতালী" সমাজ এক্ষণে ইহার পথে অগ্রসর হইবে; ইতালীয় ভবিষ্য সৌভাগ্যের ন্যায় ইহা স্থির ও অবিচলিত; যে স্বাধীনতার চিন্তা হইতে ইহার উৎপত্তি তাহার ন্যায় ইহা অবিনাশী।

"নব্য ইতালী" সমাজের বিনাশ নাই, যে হেতু বর্ত্তমান যুগের বিশ্বব্যাপী হৃদয়বেগের সহিত ইহার সামঞ্জস্য আছে; গবর্ণমেণ্ট বা সম্প্রদায় বিশেষের নির্যাতনে, অথবা ব্যক্তি-বিশেষের সন্দেহে ইতালীয় যুবকমণ্ডীর উন্নিনমিষা (Aspiration) কখনই দমিত হইবে না।

যদি আমাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে নব্য ইতালী সমাজ কাহার নিকট হইতে এই ক্ষমতা, এই কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন? তাহার উত্তরে আমরা বলিব :—

"আমাদিগের হৃদয়-প্রতীতির পবিত্রতা এবং আমাদিগের আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস ও নৈতিক বল হইতেই আমরা এই কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছি; যাঁহারা জনসাধারণের স্বত্ব ও স্বাধীনতার রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন, অনন্ত মানব স্বত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং প্রকৃতি দেবীই তাঁহাদিগের হস্তে এরূপ কার্য্যভার অর্পণ করেন।

যে সকল মনীষী স্বদেশের উন্নতির সহিত মানবজাতির সামঞ্জস্য বিধানে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা প্রকৃতিদেবীর নিকট হইতে যে কার্য্যভার ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট হইতেও তাহার অনুমোদন গ্রহণ করিব।"

যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপ্লবের পতনের মূল কারণ, অথবা সভ্যতা ও জ্ঞানালোক যাঁহাদিগের হৃদয়ে অর্দ্ধপ্রবেশ মাত্র করিয়াছে, এবম্ভূত লোকেই ম্যাট্‌সিনির সেই অকাট্য সত্য সকলের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত করেন—তাঁহাদিগের মতে ইতালীয় একতা অসাধ্য কল্পনা মাত্র এবং ইতালীয়দিগের ঐতিহাসিক প্রবলতার সম্পূর্ণ বিপরীত।

কিন্তু কালে প্রকৃত ঘটনা দ্বারা ম্যাট্‌সিনির মতের সত্যতা প্রমাণীকৃত হইল; সুতরাং ইহাঁদিগের আপত্তির স্বতই খণ্ডন হইয়া আসিল।

ক্রমশঃ।

বৈজ্ঞানিক পদার্থবাদ।

ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেন্দ্র মণ্ডলের তুষার ও শীত, গ্রীষ্ম মণ্ডলের গ্রীষ্ম, আফ্রিকার মরুভূমি ও স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য ভূমি, দক্ষিণ আমেরিকার সানুময় প্রদেশ ও রুসিয়ার সমতল ভূমি, নায়াগ্রার জল প্রপাত ও আইসলণ্ডের উষ্ণ প্রস্রবণ সকলই এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল প্রাকৃতিক-অবস্থাভেদের আধারত্ব ভিন্ন ও বর্ত্তমান অবস্থায় আর একটী কারণে ইহার পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। গ্রীস ও রোমের পৌত্তলিকতা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মানবীয় চিন্তা স্রোত নানা বিধ আকারে প্রবাহিত হইয়া নানা শাখা প্রশাখায় কখন মিলিয়া কখন বিচ্ছিন্ন হইয়া যেরূপ অবস্থায় নীত হইয়াছে—প্রায় সেই সকল অবস্থা গুলিরই চিত্র বর্ত্তমান ভারতে দেখা যায়। দুই সহস্র বা ততোধিক বৎসরে ইয়ুরোপ কোম্তের মানব জ্ঞানের দুই অবস্থা কাটাইয়া তৃতীয়ে পড়িয়াছে, পৌত্তলিকতা হইতে দার্শনিক অবস্থার ভিতর দিয়া বৈজ্ঞানিক সোপানে উঠিয়াছে। ইউরোপে দুই সহস্র বৎসরে যাহা ঘটিয়াছে ইয়ুরোপীয় চিন্তার প্রতিবিম্ব পড়িয়া অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে আমাদের দেশে তাহা ঘটিয়াছে এবং তজ্জন্য এক সময়েই সকল প্রকার অবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই দ্রুত পরিবর্ত্তনে সমাজ একদিকে কতক উপকৃত হইয়াছে বটে আবার অন্য দিকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। একদিকে যেমন সমগ্র সমাজকে বৈজ্ঞানিক অবস্থার দিকে অগ্রসর করিয়াছে অপর দিকে তেমনি সমাজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অধুনাতন সমাজের অবস্থা দেখ কতকগুলি লোকের পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ় আছে, কতকগুলির পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইয়াছে আর কতকগুলির কিছু নাই। শেষোক্তের মধ্যে কতকগুলির পূর্ব্ববিশ্বাসের স্থানে ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় শক্তিতে অপর একটি বিশ্বাস আসিয়াছে আর কতকগুলির অল্প অল্প আসিয়াছে। আর কতকগুলির কিছুই আসে নাই। এইরূপে সমাজের ঐক্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ও আর একটী কারণে অধিক ক্ষতি হইয়াছে। যখন কোন পুরাতন সংস্কার বা বিশ্বাসের শক্তির হ্রাস হয় সেই সঙ্গে সঙ্গে যে সকল হৃদ্বৃত্তি তাহার সহিত মিশ্রিত থাকিয়া তাহাকে কার্য্য প্রবণ রাখিয়াছিল সেগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অপর একটি বিশ্বাস গ্রহণ করিলে ও হৃদ্বৃত্তি সকলের সে বিশ্বাসের সহিত মিশ্রিত হইতে ও

পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ হইতে সময় লাগে। এইরূপ মানসিক অবস্থার ফল অনাস্থা ও উদ্যম-হীনতা। একটি কার্য্য করিতে হইলে শুদ্ধ সেই কার্য্যটি বুদ্ধি শক্তির সাহায্যে ভাল বলিয়া জানিলেই যথেষ্ট হয় না, সেই 'ভাল' বিশ্বাসের সহিত হৃদ্বৃত্তি মাখাইতে হয় তবে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। মনে কর তুমি বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে বুঝিলে যে বিধবা-বিবাহ দেওয়া উচিত, কিন্তু তোমার এক বিধবা ভগিনী আছেন তুমি তাঁহার বিবাহ দিতেছ না এবং তজ্জন্য কোন কষ্টও অনুভব করিতেছ না। এরূপ অবস্থায় তোমার বিশ্বাস কেবল বুদ্ধিবৃত্তির উপর স্থাপিত, উহাতে হৃদ্বৃত্তি আদৌ মিশ্রিত হয় নাই। কিন্তু যখন দেখিবে যে ভগিনীর বিবাহ না দেওয়ায় তোমার অন্তর ব্যথিত হইতেছে, তখন বিশ্বাসে হৃদ্বৃত্তির মিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছে। এই মিশ্রণ যখন পূর্ণতা লাভ করিবে তখন তাহার বেগ অনিবার্য্য হইবে, তখন তুমি সমস্ত বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া ভগিনার বিবাহ দিবে। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখ, দেখিবে প্রাচীন সংস্কার সকল প্রায় আর নাই, তাহার স্থানে নূতন নূতন সংস্কার আসিয়াছে, কিন্তু এই সকল সংস্কারের সহিত আজিও হৃদ্বৃত্তি সকলের মিশ্রণ হয় নাই। এই জন্যই বাঙ্গালি জাতির এত অনাস্থা, নিস্তেজতা ও উদ্যম-হীনতা। মুসলমানদিগের মধ্যে প্রাচীন সংস্কার সকল প্রায়ই অক্ষত আছে এইজন্য তাহাদের এত সতেজতা ও উদ্যমশীলতা। ফলতঃ বর্ত্তমান সমাজের এ অবস্থা—পরিবর্ত্তন সময়ে অবশ্যম্ভাবী হইলেও—প্রার্থনীয় নহে। হৃদ্বৃত্তি সকল যাহাতে সজীব হয় তাহার প্রয়োজন হইয়াছে।

আপাততঃ দেখা যাইতেছে যে দুইটি কারণ ইহার বিপক্ষতা করিতেছে। প্রথমতঃ—কোন সংস্কারের সহিত হৃদ্বৃত্তি সকলের মিশ্রণ হইতে হইলে উক্ত সংস্কারের বুদ্ধিরূপ ভিত্তিতে দৃঢ়গ্রথিত হওয়া চাই। এখন আর অন্ধ বিশ্বাসের কাল নাই, যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস কর নতুবা পরিত্রাণ নাই বলিলে আর কেহ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে না। যে বিশ্বাস বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে না পারে সে বিশ্বাস এখন আর কার্য্য-প্রবণ হয় না। কিন্তু এক্ষণে অনেককে দেখা যায় তাঁহারা প্রামাণিকবাদী, হিতবাদী বা পদার্থবাদী বলিয়া পরিচয় দেন কিন্তু বাস্তবিক প্রামাণিক দর্শনে বা হিতবাদ দর্শনে কি বলে তাহার অল্প আভাস পাইয়াছেন মাত্র বা কোন স্থলে পান ও নাই। 'আহার কর, পানকর ও আমোদ কর' এই তিন কথায় যেমন এপিকিউরস দর্শনের সার উদ্ধৃত হইয়াছিল অনেক স্থলে তাঁহাদের আভাসও সেই প্রকারের হইয়া থাকে। ফলতঃ ওরূপ বিশ্বাস মনকে ভিজাইতে পারেনা, পদ্ম-পত্রে জলের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে থাকে। এই সকল কারণে সকল প্রকার নূতন মত যাহাতে সুস্পষ্টরূপে প্রচারিত হয় তাহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—বর্ত্তমান সময়ের অনুদারতা ও পরস্পর সহানুভূতির অভাব সদ্বৃত্তি সকলকে সতেজ ও সজীব হইতে দিতেছে না। আমি যাহা বুঝি তাহাই সত্য, সুতরাং যে আমার অনুবর্ত্তন না করে তাহার কথা শুনিব না, সে যাহা করিবে, ভাল হউক মন্দ হউক, তাহাতে কখন যোগ দিবনা বরং বাধা দিব এরূপ আচরণ অত্যন্ত আত্মাভিমান ও সঙ্কীর্ণতার কার্য্য। ফলতঃ অধীরতা ও আত্মাভিমান এবং পূর্ব্বোক্তরূপ আভাস গ্রহণ এই অনুদারতা ও সহানুভূতির অভাবের কারণ। এপিকিউরস-দর্শনের পূর্ব্বোক্তরূপ সার গ্রহণ করিলে হয়ত তাহার সহিত আমার সহানুভূতি হইবে না, কিন্তু একটু ধীরতার সহিত যদি আর একটু ভিতরেপ্রবেশ করি হয়ত তাহাতে এমন অনেক দেখিতে পাইব যাহাতে আমার সহানুভূতি আছে, এবং অনেক সময় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় যে যাঁহারা ঈশ্বর বাদী তাঁহারা হিতবাদী, প্রামাণিক বাদী, পদার্থ বাদী সকলকেই নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে দেখা যায় প্রামাণিক বাদী বা পদার্থ-বাদী নাস্তিক হইতে যতদূরে ঈশ্বরবাদী হইতে ততদূরে নয়। এইরূপে যে সকল অণুতে সমাজ গঠিত অকারণ তাহাদের পরস্পর আকর্ষক বলের নাশ হওয়া অত্যন্ত অপ্রার্থনীয়। এই দুই কারণে আজি এ প্রস্তাবের অবতারণা। একটী মতের ভাব নিঃসন্দিগ্ধরূপে ব্যক্ত করা, তাহার প্রীতিকর অপ্রীতিকর সকল পার্শ্ব ভাল করিয়া দেখান ও তাহার পক্ষ সমর্থকদিগের উপর যে সকল অযথা দোষ অর্পিত হইয়া থাকে তাহার ক্ষালন করা এবং তাঁহারা পূর্ব্বে যাঁহাদের অপ্রীতিকর ছিলেন তাঁহাদের নিকট সহানুভূতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

পদার্থ বাদ কি? পদার্থ বাদ কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিতে হইলে একেবারে সকল বক্তব্য গুলি বলা সম্ভব নয়। সম্ভব হইলে ভাল হইত। কিন্তু তাহা না হওয়ায় যেমন এক দিক বলিতে যাইব অমনি অনেকের সহানুভূতি হারাইব, পরে অপর দিক দেখাইলে আর কি হইবে তাঁহারা কি আর শুনিবেন? যাহা হউক আমি পাঠকদিগের ধৈর্য্যের উপর আশা করিলাম এবং তাঁহারা একটু ধীরতার সহিত শেষ পর্য্যন্ত দেখেন ইহাই আমার প্রার্থনা

পদার্থ * কি? বোধোদয়ে পড়িয়াছি 'আমরা ইতস্ততঃ যাহা দেখিতে পাই সকলই পদার্থ' আমরা আর ও পড়িয়াছি যে 'পদার্থ সকল তিন প্রকার চেতন অচেতন ও উদ্ভিদ'। পদার্থ সম্বন্ধে এই সাধারণ সংস্কার ভ্রম-মূলক নহে। সামান্য বালুকাকণাটী ও পদার্থ আর ঐ উদ্যান-শোভা পুষ্পটী ও পদার্থ, ঐ বালিকার কেশ-ন্যস্ত পুষ্পটী ও পদার্থ এবং তাহার

* ইংরাজিতে Matter শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় পদার্থ শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইল।

বিমল মুখকমল ও পদার্থ ইহাতে মতদ্বৈধ নাই। তিনটীই যদি পদার্থ হইল তবে অচেতন, উদ্ভিদ ও চেতন এই তিনটী পদে ঐ তিনটীর পার্থক্য কর কি জন্য? যদি বল, প্রাঙ্গণ-নিক্ষিপ্ত পদ-দলিত অঙ্গার খণ্ড ও ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটোজ্জ্বলকারি হীরকখণ্ড, গহ্বরস্থিত পঙ্কিল জলরাশি ও পর্ব্বতচূড়শোভী ধবল তুষাররাশি একই পদার্থ হইলেও যেমন অবস্থা ভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন নামে অভিহিত হয় এখানে ও সেই রূপ পদার্থের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সংযোগ বিয়োগ হইতে এই তিন প্রকার রূপ দৃষ্ট হয় ও তাহারা চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ এই তিন সংজ্ঞায় অভিহিত হয়—তাহা হইলে জানিব যে তুমি পদার্থবাদ দর্শনের সার বুঝিয়াছ তোমাকে বলিবার আর কিছু নাই।

কিন্তু যদি বল, যে একটী বৃক্ষ আর সেই বৃক্ষেরই এক গাছি যষ্টি উভয়ে একই উপাদানে নির্ম্মিত হইলে ও উভয়ে এক বিশেষ প্রভেদ আছে, যষ্টি গাছটী যতদিন রাখ তাহার আর বৃদ্ধি হইবে না কিন্তু বৃক্ষটী বাড়িবে, সুতরাং যষ্টি গাছটীতে কেবল পদার্থ আছে কিন্তু বৃক্ষটীতে পদার্থ ছাড়া আর ও একটু কিছু আছে যাহাতে তাহার বৃদ্ধি সম্পন্ন হয়—সেই টুকু তাহার জীবন ইহা পদার্থ হইতে বিভিন্ন এবং ঐশ্বরিক শক্তি হইতে প্রাপ্ত। আর বৃক্ষ হইতে একটী প্রাণীর প্রভেদ এই যে যেমন পদার্থে জীবন সংযোগে বৃক্ষের উৎপত্তি, সেই রূপ পদার্থে জীবন ছাড়া আর একটু কিছু সংযোগ না করিলে প্রাণী হয় না, সেই টুকু ও পদার্থ হইতে বিভিন্ন এবং ঐশ্বরিক শক্তি হইতে প্রাপ্ত এবং তাহারই বলে প্রাণিবর্গ আপনাদের শরীর সঞ্চালন করিতে পারে এবং ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারে—যদি ইহা বল তাহার উত্তরে আমি বলিব যে আমি যদি দেখাইতে পারি যে পদার্থ অবস্থা বিশেষে আপনার গঠন আপনি করিতে পারে, আপনার গতি আপনারই বলে সম্পাদন করিতে পারে তাহা হইলে তোমার "ঐশীশক্তির কল্পনায় প্রয়োজন কি?" প্রমাণ ছাড়িয়া অনুমানে যাইবার আবশ্যকতা কি? ফলতঃ আমি যাহা বলিলাম পদার্থবাদী ও তাহাই বলেন এবং বিজ্ঞান তাহা দেখাইয়াছে।

পাঠক! কখন একটী স্ফটিকের (Crystal) নির্ম্মাণ আনুপূর্ব্বিক দেখিয়াছ? * কিরূপে তাহার আরম্ভ, কিরূপে তাহার বৃদ্ধি ও কিরূপে তাহার সমাপন হয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছ? যদি করিয়া থাক তবে তাহার সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিবে। পাঠকদিগের মধ্যে অনেকে বোধ হয় মিছরীর দানা বাঁধিতে দেখিয়াছেন তাহা হইতেও ইহার কতক উপলব্ধি করিতে পারেন। সামান্যাকারেইহা সকলেই দেখিতে পারেন। একটু লবণ জলে দ্রব করিয়া কিছু ক্ষণ রাখিয়া

* See Tyndall's Fragments of science p—115

দেখ। জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে উক্ত তরল দ্রব এমন অবস্থায় আসিল যে আর তখন তরল অবস্থায় থাকিতে পারে না, তাহার অণুদিগের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে দেখিতে একটী দুইটী তিনটী অসংখ্য অঙ্কুর জন্মিল, তাহাদের চতুঃপার্শ্বে অণু সকল আসিয়া মিলিতে লাগিল। এই মিলনের ফল এক একটী স্ফটিক। এই নির্ম্মাণ প্রণালী ও এক একটী স্ফটিকের গঠন একটী অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখ ত সে বিস্ময় আর রাখিবার স্থান থাকিবে না। এক একটীর গায় যেন ধাপে ধাপে সোপানশ্রেণী উঠিতেছে। বস্তুতঃ যদি গঠন-সৌষ্ঠব কি জানিতে চাও, তবে নানাবিধ স্ফটিক দেখ। এত পরিষ্কার এত সুন্দর, এত জটিল গঠন জ্যামিতির কল্পনায় ও আসে না। এ গঠন-সৌষ্ঠব ঈশ্বরের নির্ম্মাণ কৌশলেই উৎপন্ন হউক বা পদার্থ-গুণ হইতেই উৎপন্ন হউক আমার নিকট ইহার মোহিনী শক্তি অব্যাহত রহিবে। ফলতঃ হীরক খণ্ড অঙ্গারের রূপান্তর মাত্র জানিয়া ও কি কেহ হীরকের প্রতি হতাদর হইয়া থাকে ?

সে যাহাহউক, অণু সকলের এরূপ মিলন কিরূপে হইল ? কে ইহাদের এরূপ সংযোগ করিল ? এক একখানি করিয়া ইষ্টক সাজাইয়া একটী সুন্দর বাড়ী হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে ইষ্টক গুলির সংযোজন মানবে করিয়া থাকে, কিন্তু অণুদের এ সংযোজন কে করিল ? তুলনায় তুমি ভাবিতে পার যে ইহা কোন দেব-যোনির কার্য্য। তবে তুমি বৃক্ষের ন্যায় (ঐশীশক্তি প্রভাবে) বৃদ্ধিশালী হইলেও সে স্ফটিকটীকে জড় পদার্থ বলিতে ছাড় না কেন ? সে যাহাহউক বিজ্ঞান ইহার মীমাংসা করিয়াছে। বিজ্ঞান জানিয়াছে যে আকর্ষণ ও বিয়োজন এই দুই বলে অণুদিগের ঐরূপ মিলন। প্রত্যেক অণুই চৌম্বক ধর্ম্মপ্রাপ্ত, উহার এক দিকে আকর্ষণ ও আর দিকে বিয়োজন। এই দুই বলের সামঞ্জস্যে উক্তরূপ গঠন সৌষ্ঠবের উৎপত্তি। শুদ্ধ যে লবণের মত একরূপ পদার্থ থাকিলে স্ফটিকের উৎপত্তি সম্ভব তাহা নয় দুই বা ততোধিক দ্রব্য মিশ্রিত থাকিলেও স্ফটিক তাহা হইতে আপনার বর্দ্ধনোপযোগী দ্রব্য বাছিয়া লইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

অপর দিকে দেখ। একটী বীজ মাটিতে রোপণ করিলে। অনুকূল তাপক্রমে কিছু দিন থাকিয়া বীজটী অঙ্কুরে পরিণত হইল, মাটি ভেদ করিয়া উঠিল। সেই অঙ্কুর সূর্য্যালোকের সাহায্যে বায়ু হইতে আপনার বর্দ্ধনোপযোগী দ্রব্য সকল গ্রহণ করিতে লাগিল ক্রমে ক্ষুদ্র বৃক্ষের আকার ধারণ করিল এবং অবশেষে ফল পত্রাদি-বিভূষিত হইয়া অপরূপ শোভা বিস্তার করিল। স্ফটিকের উৎপত্তির সহিত ইহার তুলনা কর ঠিকই একরূপ দেখিবে। স্ফটীকে ও অনুকূল তাপক্রমে অঙ্কুর বা মধ্যবিন্দুর প্রথম সঞ্চার, এখানে ও সেই রূপে অঙ্কুরের সঞ্চার। স্ফটিকের অঙ্কুরও

যেমন দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্য হইতে নিজের নির্ম্মাণোপযোগী বস্তুর অণু সকল বাছিয়া লইয়া আপনাকে আপনি গড়িল, বৃক্ষের অঙ্কুর ও সেইরূপ নানাবিধ পদার্থের মিশ্রণ বায়ু হইতে অঙ্গার বাষ্প, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি আপনার প্রয়োজনীয় বাছিয়া লইয়া আপনার গঠন আপনি সম্পাদন করিল। নানা স্ফটিকের যেমন নানা প্রকার আকার হইয়া থাকে সেইরূপ নানা বৃক্ষের নানা রূপ আকার হইয়া থাকে। স্ফটিকেও যেমন আণবিক আকর্ষণ ও বিয়োজনই গঠনের মূল, বৃক্ষেও তেমনি। সুতরাং যদি স্ফটিকে পদার্থ ভিন্ন আর কিছুরই কল্পনা প্রয়োজন না হয় বৃক্ষেই বা কেন হইবে?

আবার দেখ। প্রাণী শরীর ও ঠিক ঐরূপ আণবিক শক্তির ফলে গঠিত। কি বৃক্ষে কি প্রাণীশরীরে কোথাও এক বিন্দু পরমাণুর সৃষ্টি নাই। বৃক্ষ যেমন বায়ুতে পরিবৃত হইয়া সেই বায়ু হইতে অণু লইয়া আপন শরীর পরিপুষ্ট করে, প্রাণিশরীরও সেইরূপ রক্ত রাশিতে পরিবৃত থাকিয়া তাহাতে আপনার পুষ্টি সাধন করে। সেই রক্ত আপনা হইতে আইসে না, খাদ্য দ্রব্যের উপর রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে ইহার উৎপত্তি। প্রাণিদিগের যে গতিবিধি তাহা বাষ্পীয় যন্ত্রের গতিবিধির ন্যায়। ইয়ুরোপে ঠিক মানবাকৃতি যন্ত্র আছে তাহা ষ্টীমের সাহায্যে মানবের মত চলিতে পারে। ফলতঃ বিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে যেমন কেহ একটু পরমাণুরও সৃষ্টি করিতে পারে না সেইরূপ অণুমাত্র বলেরও সৃষ্টি করিতে পারে না। আমরা যে গতিবিধি করি, যে বলে কার্য্য করি সে কেবল অন্য বলের রূপান্তর মাত্র। কলের গাড়িতে পাথুরিয়া কয়লার দহনরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে তাপের উৎপত্তি, তাপ হইতে জলীয় বাষ্পের বিততিষা, বিততিষা হইতে গতির উৎপত্তি হয় সেইরূপ আমাদের খাদ্য দ্রব্যের পরিপাক রূপ রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে তাপের উৎপত্তি এবং সেই তাপ হইতেই আমাদের কার্য্যকলাপ, গতিবিধি সকলের উৎপত্তি। পরিশ্রম করিলে তোমার ক্ষুধা হয় কেন? পরিশ্রমের অর্থ কি?—শরীর সঞ্চালন, শরীর যে পরিমাণে সঞ্চালিত হয়, সেই পরিমাণে শরীর হইতে তাপ শোষিত হয় সে তাপ রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে আইসে, সে রাসায়নিক ক্রিয়ার কার্য্য খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক। সুতরাং যে পরিমাণে শরীর সঞ্চালিত হয় সেই পরিমাণে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক হয়। ফলতঃ একটী হাত নাড় তোমার পাকস্থলীস্থ খাদ্যদ্রব্যের একটু হ্রাস হইবে। শুদ্ধ শারীরিক কেন মানসিক কার্য্যে ও ইহার হ্রাস হয়। বর্ত্তমান শারীরতত্ত্ববিদদিগের মতে প্রত্যেক মানসিক চিন্তায় মস্তিষ্কের আণবিক অবস্থান পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং মানসিক কার্য্য ও শারীরিকের মত গতিবিশেষ, অতএব ইহার সম্পাদনে ও তাপের আবশ্যক। অতএব প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ায় ও যে [illegible]-

দ্রব্যের পরিপাক রূপ রাসায়নিক ক্রিয়া আবশ্যক তাহা আশ্চর্য্য নয়। খাদ্য-দ্রব্যের রাসায়নিক ক্রিয়া আর কিছুই নয় খাদ্যদ্রব্য মাত্রেই অঙ্গার, যবক্ষারজান ও উদজান প্রভৃতি আছে এই সকলের প্রশ্বাস গৃহীত অম্লজানের সহিত মিলনই খাদ্যের পরিপাক। এই রাসায়নিক সংযোগোৎপন্ন অঙ্গার বাষ্প ও জলীয় বাষ্পই আমরা নিঃশ্বাস দ্বারা বাহির করিয়া থাকি।

আমরা এতক্ষণে যাহা বলিলাম তাহাতে ইহা প্রতিপন্ন হইল চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকলই অণু-সমষ্টি পদার্থ হইতে কেবল আণবিক বলের সাহায্যেই উৎপন্ন। চেতন শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ স্থানীয় মনুষ্য ও এই নিয়মে উৎপন্ন। এই মানব শরীরের চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের নির্ম্মাণ প্রণালীর জটিলতা অথচ প্রত্যেক জটিলাংশের অভিপ্রায় ও কার্য্যকারিতা দেখিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন এমন কি জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ পর্য্যন্ত অনুমান করিয়াছিলেন যে এ সকল অভিপ্রায়ের নিশ্চয় কোন অভিপ্রেতা আছে। কিন্তু যাঁহারা এরূপ বিশ্বাস করেন তাঁহারা যদি জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের মত বিজ্ঞানবিদ্ হইতেন তাহা হইলে তাঁহারই মত সে অনুমানকে মন হইতে দূর করিতে পারিতেন। স্ফটিকের নির্ম্মাণ প্রণালী ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই দুইটী ভাবিয়া মিল্ সে অনুমানকে মন হইতে দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্ফটিকের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অর্থ এই যে জগতে যাহা ভাল অর্থাৎ কার্য্যকর তাহাই থাকিবে যাহা অকার্য্যকর তাহার ধ্বংস হইবে। দুইটী জাতি আছে এক জাতি অত্যন্ত প্রবল অপরটী অত্যন্ত দুর্ব্বল। যে জতি প্রবল সেই জাতি থাকিবে অপর জাতির ধ্বংস হইবে। এই রূপ স্বাভাবিক উৎকর্ষ সাধন বহুকাল চলিলে যে সকল বস্তুরই অভিপ্রায় থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কোন বস্তুর অভিপ্রায় বা কার্য্য না থাকিলে, সে বস্তু অকার্য্যকর হইলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বলে এতদিন তাহার ধ্বংস হইত। সে যাহা হউক ইহা দেখান হইয়াছে বিজ্ঞান বিদেরা একটী স্ফটিক, উদ্ভিদ ও প্রাণী শরীরের গঠন ভৌতিক ঘটনা বলিয়া দেখেন এবং নীচ হইতে উচ্চ, সরল হইতে জটিল সকলই ভৌতিক নিয়মে সম্ভব মনে করেন।

এতক্ষণ আমরা কেবল বিজ্ঞানের ক্ষমতা কতদূর তাহাই বলিলাম, পদার্থবাদ দর্শনের এক পার্শ্ব কি তাহাই দেখাইলাম। এক্ষণে বিজ্ঞান কোথায় অক্ষম তাহা ও বলিব, পদার্থবাদ দর্শনের অপর পার্শ্ব কি তাহাও দেখাইব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অধুনাতন শারীর তত্ত্ববিদেরা স্বীকার করেন যে প্রত্যেক সংজ্ঞার * (Consciousness)

* আমি কোন বস্তু দেখিতেছি, বা কিছু চিন্তা করিতেছি কিন্তু আমি জানিতেছি যে আমি দেখিতেছি, আমি জানিতেছি যে আমি চিন্তা করিতেছি এইরূপ ভাবই সংজ্ঞা। ইহার বিপরীত সংজ্ঞাহীনতা।

ভৌতিক মূল (Physical basis) আছে। একটি শিরা যদি এক বিশেষ ভাবে কম্পিত হয় তাহা হইলে তাপের সংজ্ঞা হয়। যখনই সেই শিরা সেই ভাবে কম্পিত হইবে তখনই সেইরূপ তা-পের সংজ্ঞা হইবে। সে কম্পন ভৌতিক উপায়ে সাধিত হইলেও সেই সংজ্ঞা হইবে। চক্ষুতে আঘাত লাগিয়া হঠাৎ আলোকের অনুভূতি হইতে পারে কেননা চাক্ষুষ শিরার যেরূপ গতি মস্তিষ্কে চালিত হইলে উক্তরূপ আলোকের সংজ্ঞা হয় হয়ত ঐ আঘাতে তাহা হইয়াছিল। ফলতঃ মস্তিষ্কের অণু সকলের সংস্থান ভেদে সংজ্ঞার প্রভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু এই আণবিক সংস্থান ও সংজ্ঞায় সম্বন্ধ কি? একটি হইলেই কেন অপরটী হয়?

এই অবশ্যম্ভাবী পৌর্ব্বাপর্য্য হইতে ত ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কিছুই বুঝা যায় না। দিন গেলেই রাত্রি হয়, রাত্রি ও দিন সম্বন্ধে যদি আর কিছু না জানিয়া শুদ্ধ ইহাই জানিতাম, তাহা হইলে রাত্রির সহিত দিনের যে কি সম্বন্ধ কে বুঝিতে পারিত? কিন্তু পৃথিবীর গোলত্ব ও তাহার আবর্ত্তনের বিষয় জানি, জানিয়া যেন উভয়ের বন্ধনী সূত্র পাই। এ আণবিক সংস্থান ও সংজ্ঞা উভয়ের বন্ধনী সূত্র কোথায় পাইব? এ উভয়ের একটি বহু উচ্চে ও অপরটী নিম্নে, মধ্যে সোপান নাই কেমন করিয়া একটি হইতে অপরটিতে উঠিব?

যদি আমাদের ইন্দ্রিয় সকল এতদূর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় যে তাহাদের সাহায্যে আমরা মস্তিষ্কের অণু সকল দেখিতে পাই—শুধু তাহা নয় প্রত্যেক সংজ্ঞায় তাহাদের যেরূপ গতি বিধি ও সংস্থান হয়, তাহাদের মধ্যে যে তাড়িতস্রোত চলে সকলই দেখিতে পাই তাহা হইলে ও ত একটী হইতে অপরটীতে যাইতে পারিব না। কেহ কেহ সংজ্ঞাকে পদা-র্থের শেষ নিষ্কর্ষ (Ultimate essence) বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা হইলেইও মীমাংসা হইল কই? এরূপ কল্পনায় ও যে ঠিক্ পূর্ব্বের মত যুক্তিতে পূর্ব্বের মত বাধা আইসে।

সে যাহা হউক, যে পদার্থ হইতে আমরা এত গড়িতেছি সে পদার্থের সে ত্রিষষ্টি ভূতের সৃষ্টি কে করিল? কেই বা তাহাদিগকে অণু সকলে বিভক্ত করিল? কেই বা সেই অণুতে আকর্ষণ, বিয়ো-জন প্রভৃতি বল দিল? এ বিষয়ের উত্তর কে দিবে? বিজ্ঞানের সাধ্য নাই, বিজ্ঞান ইহাতে অন্ধ। মানবের সে শক্তি নাই, সে শক্তির অঙ্কুর ও নাই যাহা হইতে এ প্রশ্নের মীমাংসা আশা করা যাইতে পারে। তবে আইস আস্তিক, নাস্তিক, আচার্য্য, উপাচার্য্য, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক সকলে নত মস্তকে এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতা স্বীকার করি।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে এ অজ্ঞতা কি কখন দূর হইবে না? এ অন্ধ-কারের ভিতর কি কখন আলোক দেখি-বনা? ইহার উত্তরে আমি এই বলি যে

কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে জগতের ক্রমোন্নতি দেখিয়া ইহা আশা করা যাইতে পারে যে মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থাতেই উন্নতির শেষ নয়, কালে মানবের ক্ষমতার আধিক্য হইতে পারে, এক্ষণে প্রতিভাশালী লোকেরা মনের যেরূপ সতেজ ও সজীব অবস্থা হইতে সময়ে সময়ে নূতন নূতন আলোক দেখিতে পান, নূতন নূতন তত্ব আবিষ্কার করেন, সেই সতেজ ও সজীব অবস্থা মানব মনের স্থায়ী অবস্থা হইতে পারে। তখন মানবের চক্ষু এ অন্ধকার ভেদ করিলেও করিতে পারে। অথবা মানব চক্ষু না পারুক পৃথিবীতে এমন কোন জীবের আবির্ভাব হইতে পারে যাহার নিকট এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ সম্ভব। এতক্ষণে আমরা দেখাইলাম পদার্থবাদির পক্ষে কতটুকু পরিষ্কার ও কতটুকু অন্ধকার দেখাইলাম যে তাঁহার কল্পনায় ত্রিষষ্ঠি ভূতের সংযোগ বিয়োগে সকলই হইতে পারে কিন্তু ত্রিষষ্ঠি ভূত কোথা হইতে আসিল বা ইহাদের এক তম ফস্ফরসের কার্য্যের সহিত সংজ্ঞার উৎপত্তির কি সম্বন্ধ তাহা তাঁহার কল্পনায় আসে না।

যখন বিজ্ঞান ইহার নির্ণয় করিতে না পারিল তখন যদি কোন ধর্ম্মযাজক আসিয়া বলেন যে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে সকলই ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাহাতে প্রশ্ন হইতে পারে ঈশ্বরের সৃষ্টি কে করিল? তিনি উত্তর করিবেন ঈশ্বর স্বয়ম্ভু। কিন্তু যদি স্বয়ম্ভু কল্পনা করিয়া স্রষ্টার অভাব দূরকরা যায় তবে ত্রিষষ্ঠি ভূত আপনা হইতে হইয়াছে ইহা মনে করিলেইত সকল মীমাংসা হইয়া যায়। ফলতঃ এরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। আবার অপরদিকে যদি নাস্তিক আসিয়া বলেন যে আমি প্রমাণ করিতে পারি ঈশ্বর নাই তিনিও যে তাঁহার ক্ষমতার অতিরিক্ত বলিতেছেন ও অনধিকার-চর্চ্চা বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন ইহা বলা বাহুল্য। চন্দ্র লোকের অধিবাসীদিগের মধ্যে কিরূপ শাসন-প্রণালী আছে এরূপ প্রশ্ন লইয়া আন্দোলন করা যেমন বৃথা উহাও সেইরূপ। এ প্রশ্নের উত্তরে যদি একজন বলে 'আমি জানি যথেচ্ছাচার প্রণালী' আর যদি আর একজন বলে 'আমি জানি প্রজাতন্ত্র প্রণালী' এ বিবাদ যেরূপ হাস্যকর, আস্তিক ও নাস্তিকের বিবাদও সেইরূপ।

এরূপ অবস্থায় পদার্থবাদীর ঈশ্বরবাদীর সহিত সহানুভূতি কতদূর আর তাঁহার ধর্ম্মভাব কিরূপ তাহা পর সংখ্যায় লিখিত হইবে।

শ্রীমঃ—

শৈবলিনী।

চন্দ্রশেখর গ্রন্থাকাশের উজ্জ্বল তারা শৈবলিনী। এ তারাও গোপনে গোপনে এক চন্দ্রের প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। শৈশব হইতেই এই চন্দ্রের প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ আকৃষ্ট হইয়া দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছিল। তাঁহারা একত্রে ক্রীড়া করিতেন, মালা গাঁথিতেন, জলকেলি করিতেন, সর্ব্বদাই একত্রে থাকিতেন। তারার অন্ধ অনুরাগ ক্রমশঃই প্রগাঢ়তর হইতে লাগিল। চন্দ্র সকলই বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু জানিয়াছিলেন এ তারার সহিত তাঁহার পরিণয় হইবার যো নাই। যে সম্বন্ধে তাঁহারা পরস্পর-মিলিত, সেই সম্বন্ধই তাঁহাদিগের অন্তরায়। চন্দ্র এই জন্য সরিয়া গেলেন। কিন্তু তারার মন কাঁদিতে লাগিল। প্রতি সন্ধ্যাকালে তারা গগণ দেশে নিয়মিত উদিত হইয়া চন্দ্রের জন্য সমস্ত গগণক্ষেত্রে সহস্র চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বসিয়া থাকিতেন। চন্দ্র যখন রোহিণীর (রূপসীর) পার্শ্বে হাসিতে হাসিতে উদিত হইতেন, তারার সহস্র চক্ষু একে একে নিমীলিত হইত। তবুও তারা দূরদেশ হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া উজ্জ্বল ও স্থির নয়নে চন্দ্রের প্রতি তাকাইয়া থাকিতেন। একদিন চন্দ্র একেবারে অদৃশ্য হইলেন, কয়েক দিন গগণক্ষেত্র মেঘময় হইয়া রহিল, তারার সহিত চন্দ্রের সাক্ষাৎ নাই। তারা ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। তারা গৃহত্যাগিনী হইয়া সন্ধ্যাবধি চন্দ্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শেষ প্রহরে একদিন চন্দ্রের সহিত তারার সহসা সাক্ষাৎ হইল। তারা পূর্ব্বদিকে সরিয়া গিয়া চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন রূপসী মেঘের আড়ালে ছিল। চন্দ্রের কোল দিয়া তারা হঠাৎ রূপসীকে দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, চন্দ্র রূপসীকে কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। তখন তাঁহারা পৃথক হইলেন. চন্দ্র রূপসীকে সঙ্গে করিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তারা অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে একাকিনী আর এক দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

চন্দ্রশেখর গ্রন্থে দুইটী পৃথক্ উপন্যাস একত্র গ্রথিত করা হইয়াছে; কিন্তু ইহাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিছুই নাই। যে সূক্ষ্মসূত্রে ইহারা পরস্পর-আবদ্ধ-তাহাতে এত গুরুভার সহিতে পারে না। বিশেষতঃ শৈবলিনীর সহিত দলনীর কোন সম্পর্ক নাই; তাহারা কখন কোন সূত্রে সম্বদ্ধ ও মিলিত হয় নাই। অথচ শৈবলিনীর অন্যদিকে এরূপ একটী স্নেহময়ী তারা উদিত না হইলে, গ্রন্থের শোভা সম্পাদিত হয় না। শুধু শোভা নয়,

পাঠক শৈবলিনীর সহিত কাহারও তুলনা করিতে পারেন না। একদিকে শৈবলিনীর গৌরব, অন্যদিকে দলনীর মহত্ব। দলনীর মৃত্যুকালে একদা তাঁহার মহত্ত্বে শৈবলিনীর গৌরব পরাজিত হইয়াছিল। শৈবলিনীর প্রণয়স্রোত প্রাবৃটকালীয় প্রবাহিনীর ন্যায় প্রবলবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে; সম্মুখে কোন বাধা মানিতেছে না, এবং স্রোতো-বেগে প্রবাহ পথ সরল হইয়া যাইতেছে। শতবাধা আসিয়া দলনীর প্রেমস্রোত ফিরাইয়া দিতেছে; তথাচ দলনীর প্রেম সেই সমুদ্রমুখেই যাইতে চাহে; অথচ কোন স্রোতস্বিনীর সহিত তাহা মিলিতে চাহে না। সেই সমুদ্রের সহিত মিলিতে পারিল না বলিয়া আপনি বালুকাভূমিতে বিশুষ্ক হইয়া গেল, তথাপি এক পঙ্কিল প্রবাহিনীর সহিত মিশিল না। প্রেমের প্রাবল্য শৈবলিনীকে যথেচ্ছ লইয়া যাইতেছে, এবং ঘটনাজালকে আপন অনুকূল পথে ফিরাইয়া আনিতেছে। ঘটনা দলনীকে প্রেমপথ হইতে লইয়া যাইতেছে। একজন কুটীর বাসিনী বনসুশোভিনী, অন্যজন প্রাসাদসুন্দরী রাজোদ্যানপ্রমোদিনী। একজনকে যে দেখে সেই বিমুগ্ধ হয়, অন্যজন এমত এক নবাবের মন মোহিত করিয়াছিল যাহার মন শত শত সুন্দরীতেও মুগ্ধ হয় নাই। একজন কলঙ্কিনী হইয়াও নিরপরাধিনী, অন্যজন কলঙ্কিনী না হইয়াও অপরাধিনী। একজন দুরবস্থা হইতে প্রেম-গৌরবে উচ্চে উঠিতেছেন, অন্যজন ঐশ্বর্য্যের উচ্চ শিখর হইতে দুরবস্থায় নিপতিত হইয়া প্রকৃত প্রেমমহত্ত্বেই সকলকে বিমোহিত করিতেছেন। যিনি বলেন, কুটীরের দুঃখ-বিপণিতে প্রকৃত প্রেম ও স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রীত হয়, তিনি শৈবলিনীকে দেখুন; যিনি বলেন, ঐশ্বর্য্যের বিলাসধামে প্রকৃত পবিত্র প্রেম অতি দুর্ল্লভ, তিনি দলনী বেগমের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। একজন পূর্ব্বানুরাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, অন্যজন বিরহে কাতরা হইয়া প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিয়াছেন। একজনের ভাগ্যে প্রেমবৃক্ষের ফল অতি তিক্ত বোধ হইল, অন্যজনের ভাগ্যে সেই ফল বিষাক্ত হইয়া প্রাণনাশক হইল।

অনেক বঙ্গ-রমণী শৈবলিনীর ন্যায় অনেক চন্দ্রশেখরকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছেন। কি করিবেন, ইহা তাঁহাদিগের জাতীয় বিবাহ-প্রণালী। তাঁহাদিগের এমত সাধ্য নাই, এমত বিবেচনা ও সাহস নাই, যে সেই প্রণালী ভঙ্গ করিয়া অন্যবিধ পরিণয় সংস্কারে আবদ্ধ হয়েন। যখন তাঁহাদিগের বিবাহ হয়, তখন তাঁহারা পিতা মাতার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তিনী। তাঁহাদিগের যে বয়সে বিবাহ হয়, সে বয়সে স্বাধীন কার্য্যশক্তি জন্মে না। সে বয়সের বিবাহ কি জন্য ধর্ম্মানুমত হইয়াছে ইহা আমরা ভাবিয়া ঠিক পাইনা। যাহা হউক, এ প্রণালী যে সম্পূর্ণ দূষণীয় তাহা আমরা বলি না। ইহার বিস্তর দোষ এবং সেই দোষ হেতু অনেক দম্পতী পৃথিবীতে

চিরকাল অসুখী হইয়াছে। ইহার গুণে কোন কোন বঙ্গবামা সুখিনী হইয়াছেন। শুদ্ধ প্রণয়ের উপর বিবাহ নির্ভর করিলেও অনেক দোষ ঘটে। যৌবনের অন্ধপ্রেম অনেক সময় প্রতারিত হয়। ইউরোপীয় সভ্য সমাজে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক প্রণালীতে বলে, বিবাহ কর, প্রণয় তৎপরে আপনাপনি সমাগত হইবে। অন্য প্রণালী বলে প্রণয় হইতেই বিবাহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এই মতদ্বয়ের যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেও মিথ্যা হইয়া যায়। যেখানে অগ্রে প্রণয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, সেখানে সে প্রণয়কে দমন করিয়া বিবাহ দিলে বিবাহ কেবল অসুখেরই কারণ হইয়া থাকে। জুলিয়েট সুন্দরী প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলেন তবুও এমত বিবাহে সম্মত হইলেন না। তখন তাঁহার বয়স অতি অল্পই ছিল। কিন্তু বয়সে কি করে, তিনি সেই তরুণ বয়সেই সাহসে ভর দিয়া গোপনে গোপনে রোমিওকে বিবাহ করিলেন। প্রণয়ের প্রতিকূলে বিবাহ দিতে গেলে কতদূর বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, সেক্‌সপিয়ার এই জুলিয়েটের দৃষ্টান্তে তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। শৈবলিনীও দেখাইয়াছেন, প্রণয়ের প্রতিকূলে বিবাহ হইলে বঙ্গবামা একদিন সেই প্রণয়ে উত্তেজিত হইয়া কতদূর দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইতে পারে। সেই প্রণয়ে তাড়িত হইয়া শৈবলিনী সংসার-ত্যাগিনী হইয়াছেন, মৃত্যুকে শতবার আহ্বান করিয়াছেন, এবং সর্ব্বপ্রকার বিপদে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন। এই প্রেম-আবেগে তিনি এতদূর অন্ধ হইয়াছিলেন, যে তজ্জন্য একজন ইংরাজের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেও শঙ্কিত হয়েন নাই।

শৈবলিনী প্রণয়-আবেগের উত্তেজনায় যেরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভবনীয় করিবার জন্য, বঙ্কিম বাবু দেখাইয়াছেন যে শৈবলিনী ও প্রতাপের প্রণয় অতি শৈশব হইতে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাহা রোমিও এবং জুলিয়েটের প্রণয়ের মত সদ্যোজাত নহে। তাহা পরস্পরের সৌন্দর্য্যদর্শনেও উৎপন্ন হয় নাই। এ প্রণয়ের মূল বাল্য-সখ্যভাব। বয়স-ক্রমে এই সখ্যভাব দাম্পত্য-প্রণয়ে পরিণত হইয়াছিল। শৈবলিনীর হৃদয় প্রতাপের হৃদয়ের সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই মিলন ও প্রণয় দিন দিন পরস্পরের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছিল। প্রণয়ের প্রকৃতি এই, যে ইহার প্রথম প্রাবল্যের সময় বাধা পাইলেই সাঙ্ঘাতিক হইয়া পড়ে। প্রতাপ এবং শৈবলিনী যখন জলমগ্ন হইয়া মরিতে যান, তখন আমরা এই প্রণয়ের প্রথম প্রাবল্য দেখিয়াছিলাম। তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রণয়াবেগ অত্যন্ত প্রবল। সেই প্রণয় তখন তরুণ কালের রিপুর ন্যায় কার্য্য করিতেছিল। ক্রমে এই প্রেমের প্রগাঢ়তা জন্মিল। প্রেমের প্রগাঢ়তার সহিত স্নেহ আসিয়া যোগ

দিল। প্রেম পুরাতন হইলেই স্নেহ আসিয়া তাহার সহিত যোগ দেয়। মায়া প্রণয়কে শতবন্ধনে বদ্ধ করে। মায়ার সহিত সহানুভূতি এবং আসঙ্গলিপ্সা অজ্ঞাতসারে উদয় হয়। প্রণয়, মায়া, সহানুভূতি এবং আসঙ্গলিপ্সা সকলই শৈবলিনীকে প্রতাপের সহিত সুদৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল। শৈবলিনী একদণ্ড প্রতাপকে না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না। প্রতাপকে দেখিলেও শৈবলিনীর সুখোদয় হইত। ইহাঁরা যখন এইরূপ প্রেমে পরস্পর আবদ্ধ, তখন চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ হইল। এ বিবাহ শরীরের বিবাহ মাত্র, হৃদয়ের মিলন নহে। তরুণ কালের তরুণ প্রণয়ের সময় যখন প্রতাপ এবং শৈবলিনী জানিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বিবাহ হইবার যো নাই, তখন সেই নৈরাশ্যে তাঁহারা জলমগ্ন হইতে গিয়াছিলেন। তরুণ প্রণয়ের সম্মুখে বাধা পড়িলে প্রণয় কিরূপ কার্য্য করে তাহা এই স্থলে প্রতীত হইয়াছিল। সেই প্রণয়ের গাম্ভীর্য্য জন্মিলে—সেই প্রণয়ের সহিত স্নেহ, সহানুভূতি এবং আসঙ্গলিপ্সার প্রাবল্য জন্মিলে তাহা বাধা পাইয়া কিরূপ কার্য্য করে, চন্দ্রশেখরের সহিত বিবাহ হইলে আমরা তাহাই দেখিতে পাই। চন্দ্রশেখরের নিকট শৈবলিনী দায়ে কুমড়া কাটিতেন। একি তাঁহার দোষ, তাঁহার হৃদয়ের দোষ, মানব প্রকৃতির দোষ; না তাঁহাদিগের সেরূপ বিবাহের দোষ? চন্দ্রশেখর ভালবাসায় শৈবলিনীর শৈথিল্য আপনার দোষে আরোপ করিতেন। প্রতাপ যদি নিকটে না থাকিতেন, শৈবলিনী বোধ হয় তাহা হইলে বহুদিন পরে চন্দ্রশেখরের সহিত মিলিয়া যাইতেন। কিন্তু তাহা ঘটিল না। প্রতাপ নিকটে থাকিয়া শৈবলিনীর প্রণয়-আবেগ উদ্দীপ্ত রাখিয়াছিলেন। প্রতাপ দেখিলেন, শৈবলিনীর নিকটে তাঁহার অন্তর্দ্দাহ দ্বিগুণিত হইতেছে। যে শৈবলিনী চিরকাল নয়নের আনন্দদায়িনী ছিলেন, এখন চন্দ্রশেখরের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়াতে, তিনি অক্ষিশূল হইয়া পড়িলেন। এখন তাহার নিকট হইতে দূরে যাওয়াই ভাল। প্রতাপ এই স্থির করিয়া দূরে গেলেন। শৈবলিনী নয়ন-তারা হারা হইলেন। বিচ্ছেদের প্রথম আবেগ অত্যন্ত ভয়ানক। শৈবলিনী অনুক্ষণ পন্থা দেখিতে লাগিলেন কিরূপে প্রতাপকে পুনরায় দেখিতে পাইবেন। এমত সময় ফষ্টর আসিয়া জুটিল। শুনিলেন ফষ্টরের কুটী হইতে প্রতাপকে দেখা যায়। স্ত্রীসুলভ অজ্ঞানতাবশতঃ তিনি ফষ্টরকে ধরা দিলেন।

শৈবলিনী যখন চন্দ্রশেখরের বাটীতে ছিলেন, তখন বোধ হয় অনেক দিন সুন্দরীর সহিত একত্রে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। আমরা ইহার দৃশ্যমাত্রও চন্দ্রশেখর মধ্যে দেখিতে পাই নাই। সুন্দরীর নিকট শৈবলিনী কেমন অকস্মাৎ অজ্ঞাতভাবে আধ আধ হৃদয় খোলেন, এবং তৎক্ষণাৎ চতুরতার সহিত তাহা কেমন আধ আধ ঢাকিয়া লয়েন, এই

সুন্দর দৃশ্যটি বঙ্কিম বাবু গোপন রাখিয়াছেন। গোপন রাখিয়াছেন এইজন্য, পাছে পাঠক প্রতাপের প্রতি আজি পর্য্যন্তও শৈবলিনীর প্রগাঢ় অনুরাগের আভাস পান। আভাস পাইয়া বুঝিতে পারেন, কেন শৈবলিনী ফষ্টরের সহিত গৃহত্যাগিনী হইলেন। বুঝিতে পারিয়া, সুন্দরীর সহিত যখন শৈবলিনী গৃহে ফিরিলেন না, তখন শৈবলিনীর উপর যেরূপ রাগান্ধ হইয়াছিলেন, পাছে সেই রাগ, সেই অসন্তোষের কিছু প্রশমতা হয়। এইজন্য গ্রন্থকার প্রথমে শৈবলিনীর হৃদয় পাঠকের নিকট প্রকাশিত করেন নাই। প্রকাশিত করেন নাই বলিয়া, পাঠক যেরূপ কৌতুহল-পরতন্ত্র এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শৈবলিনীর ভাগ্য দেখিতেছিলেন, সেরূপ ভাব কখনই উদ্রিক্ত হইত না। প্রকাশিত করেন নাই বলিয়া, শৈবলিনীর প্রতি যেরূপ ক্রোধের উদয় হইয়াছিল, সেই ক্রোধ হেতুই ;যখন উদ্ধৃতা শৈবলিনী প্রতাপের সমক্ষে হৃদয়-কবাট খুলিয়া দিলেন, তখন শৈবলিনীর হৃদয় অধিকতর সুন্দর বোধ হইল ; যখন পাঠক শৈবলিনীকে কলঙ্কে নিরপরাধিনী অনুতাপিনী রূপে দেখিলেন, তখন তাঁহার যতদূর সন্তোষ ও আনন্দ বোধ হইল, ততদূর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এইখানে শৈবলিনীর হৃদয়-সৌন্দর্য্য অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করিলাম। ভাবিলাম এইরূপ হৃদয় লইয়া স্যাফো, ফেয়নের জন্য সিসিলী পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। ভাবিলাম এই হৃদয়ে এনজেলিনা, এডউইনের জন্য বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন।

প্রণয় মানবকে সাহসী করে। প্রেম যখন রিপুতে পরিণত হয়, উৎসাহ ও সাহস তখন প্রেমের সহিত যোগ দেয়। অন্ধ প্রেম একাকী দুস্তর সাগর পার হয়, বিপদাকীর্ণ অরণ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করে, এবং শঙ্কাকুল অভিসার-পথে অনায়াসে গমন করে। সেই প্রেম শৈবলিনীকেও সাহসিনী করিয়াছিল। শৈবলিনী প্রেমের অনুরোধে ফষ্টরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, প্রেমের অনুরোধে ফষ্টরের সহিত গৃহ-ত্যাগিনী ও হইয়াছিলেন ; প্রেমের অনুরোধে একাকিনী প্রতাপের উদ্ধারের জন্য ইংরাজের নৌকাতেও প্রবেশ করিয়াছিলেন। শৈবলিনী বুঝিয়াছিলেন, ফষ্টর ইংরাজ হউক না কেন, প্রেম তাহার জাতীয় রূঢ়তা হরণ করিয়াছিল। তিনি দশ দিন দেখিয়াছিলেন, ফষ্টর তাহার নিকট বিনয়ী, প্রেমভিখারী, নিরীহ ভালমানুষ মাত্র। ক্রমে পরিচয় এবং অভ্যাস শৈবলিনীকে ভয়ভাঙ্গা করিয়াছিল। তিনি আর ফষ্টরকে ভয় করিতেন না। ভয় করিতেন না এই জন্য, যে তিনি ফষ্টরের অগ্রে প্রতাপকে দেখিতেন ; কল্পনাময় প্রতাপ তাঁহার ভয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। যখন ফষ্টরের সহিত বহির্গত হন, তখন তিনি ফষ্টরকে দেখেন নাই, সম্মুখে প্রতাপকে দেখিয়াছিলেন। শৈবলিনীর এখনকার হৃদয়ভাব পাঠকের অগোচর থাকাতে, ফষ্টরের সহিত শৈবলি-

নীর সম্মিলন ঘটনায় তিনি চকিত হইয়া যান। বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের সহিত ইংরাজের সম্মিলন ঘটনাকে তিনি নিতান্ত অসম্ভবনীয় জ্ঞান করেন। অন্য অবস্থায় বাস্তবিক ইহা নিতান্ত অসম্ভব হইত। কিন্তু শৈবলিনী এক্ষণে যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সে অবস্থায় ইহা অসম্ভবনীয় নহে। আমরা তাঁহার অবস্থা তাঁহার নিজকথায় ব্যক্ত করিব। প্রতাপ বলিলেন " ইদানীং আমি তোমাকে সর্পিণী মনে করিয়া ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি ?"

শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিলেন—বলিলেন, "তুমি কি করিয়াছ ? কেন তুমি, তোমার ঐ দেবতা মূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে ? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কালে, ও রূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে ? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে ? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম, দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন ? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন ? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল ? তুমি কি জান না, যে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি ? নহিলে ফষ্টর আমার কে ?—কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে ? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া, কুপথ সুপথ-জ্ঞানশূন্য হইয়াছি ? তোমার জন্য। কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি ? তোমার জন্য। কাহার জন্য আমি গৃহধর্ম্মে মন রাখিতে পারিলাম না ? তোমারই জন্য। নহিলে ফষ্টর আমার কে ?"

এই অন্ধকারময় জীবনে শৈবলিনী যে দিকেই একটু আলোক দেখিতে পাইলেন সেই দিকে ধাবিত হইলেন। প্রতাপের জন্য তাঁহার গৃহধাম যখন শ্মশান তুল্য হইয়াছিল, যখন তিনি সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ সুপথ-জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট ফষ্টরই বা কে আর অন্য লোকই বা কে ? উভয়ই সমান। যে উপায়ে হউক প্রতাপকে লাভ করাই তখন তাঁহার প্রবল ইচ্ছা। এই বলবতী ইচ্ছার অনুসারিণী হইয়া তিনি ফষ্টরকে উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈবলিনী অন্য উপায়েও প্রতাপের নিকট আসিতে পারিতেন। কিন্তু শৈবলিনীর প্রকৃতি এরূপ ছিল না, যে তিনি কোন গোপনীয় ষড়যন্ত্রে এ কার্য্য সিদ্ধ করেন। সাহস কখন লুকাইয়া কার্য্য করে না, কোন নীচবৃত্তি অবলম্বন করিতে অগ্রসর হয় না। সাহস যে শৈবলিনীর একটি প্রধান গুণ ছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সেই সাহস বরং তাঁহাকে প্রকাশ্য পাপ-পথে যাইতে দিবে, তথাচ গোপনীয় পথে যাইতে

দিবে না। যৌবনের ধর্ম্ম এই যে যৌবন গোপনীয় বিজ্ঞতার পথে বড় যাইতে চাহে না। সেই যৌবন ও প্রেম শৈবলিনীর সাহসকে দ্বিগুণিত করিয়াছিল। সেই সাহস ভরে, যে উপায় প্রথম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি প্রতাপের নিকট যাইতে অগ্রসারিণী হইলেন। বঙ্কিম বাবু যথার্থই বলিয়াছেন, এক এক জন বালকের প্রকৃতি এইরূপ যে তাঁহারা জুজু বলিবা মাত্র ভয় পায়, এক এক জন আবার সেই জুজু দেখিতে চাহে। আমরাও দেখিয়াছি এক এক জন নারীর প্রকৃতিই এইরূপ যে তাহারা গুপ্ত অপ্রকাশ্য পথে যাইতে চাহে না। শৈবলিনীর প্রকৃতি এইরূপ ছিল। এই জন্য তাঁহার প্রকৃতিতে ফষ্টরের সহিত বহির্গমন নিতান্ত অসম্ভবনীয় বলিয়া আমাদিগের নিকট প্রতীত হয় নাই।

শৈবলিনী যাঁহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিলেন, সেই প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে প্রতাপ হর্ষোৎফুল্ল না হইয়া তাঁহাকে পাপিষ্ঠা বলিয়া গালি দিল, তাঁহার প্রণয় এবং কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিল। এই সমস্ত বাক্যে শৈবলিনীর হৃদয় শেলবিদ্ধ হইল। তখন তিনি একান্ত ক্ষুব্ধা হইলেন। ভাবিলেন :—

"প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে? কে তাহা জানি না—সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জলন্ত বহ্নি—সে এই সংসার-প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহত্যাগ করিলাম, ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম, কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না?"

এইরূপ অনুতাপে শৈবলিনী এখন দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এখন বুঝিতে পরিলেন যে দুর্দ্দমনীয় প্রেম তাঁহাকে এতদূর আনিয়াছে সে পাপ-প্রবৃত্তিকে তাঁহার দমন করাই উচিত ছিল। প্রতাপের জন্য যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, এখন স্বাভাবিক তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িল। শৈবলিনী তখন "কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল" সেই সঙ্গে সেখানকার সকল সুখ একবার স্মৃতিপটে উদয় হইল। প্রতাপকে মনে পড়িল। চন্দ্রশেখরের চিন্তায় এখন তাঁহার মনে শত সহস্র বৃশ্চিক দংশিতে লাগিল। ভাবিলেন :—

"আমি তাঁহার যোগ্যা নহি বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাহাতে কি তাঁহার কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন? না—আমি তাঁহার কেহ নহি। পুঁথিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয় সেই কথাটি আমাকে কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি কখন ভাল বাসি নাই—কখন ভাল-বাসিতে পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে

যদি কোন ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল। আর একটি কথা তাঁহাকে বলিতে সাধ করে,—কিন্তু ফষ্টর মরিয়া গিয়াছে, সে কথার আর সাক্ষী কে? আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?"

শৈবলিনী-হৃদয়ের এই চিত্রখানি কেমন স্বাভাবিক! কেমম সুন্দর! শৈবলিনী প্রতাপকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন, তাঁহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া তাঁহার নিকট শান্তিলাভের জন্য উপস্থিত হইলেন; কিন্তু উপস্থিত না হইতে হইতেই সেই ভালবাসার জন্য ভর্ৎসিতা হইলেন সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। যে তাঁহাকে ভালবাসিত, কিন্তু যাঁহার ভালবাসা তিনি তুচ্ছ করিয়া মনোদুঃখ দিয়া আসিয়াছেন, এখন হৃদয় স্বাভাবিক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি চন্দ্রশেখরের জন্য একবার কাঁদিতে লাগিলেন।

কিন্তু তৎপরেই ভাবিলেন যে, প্রতাপ আমাকে যাহাই বলুক, সেই প্রতাপ আমাকে ফষ্টরের হাত হইতে উন্মুক্ত করিয়া আনিয়াছেন। প্রতাপ অবশ্যই আমাকে ভাল বাসে। যে ভালবাসর জন্য প্রতাপ বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই ভালবাসা তাঁহার হৃদয়ে এখনও সমপ্রভাবে অবশ্য উদ্দীপিত রহিয়াছে। সেই জন্য তিনি ইংরাজের নৌকা হইতেও সাহস করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। উদ্ধার করিয়া আমার সম্মুখেই ইংরাজ-হস্তে বন্দী হইলেন। শৈবলিনী ভাবিলেন যিনি আমার জন্য এতদূর কষ্ট করিয়াছেন, এমন বিপদে পড়িলেন তিনি, আমাকে কি ভালবাসেন না? শৈবলিনী স্বচক্ষে দেখিলেন, প্রতাপ তাঁহার সম্মুখ হইতে তাঁহারই জন্য ইংরাজ-হস্তে বন্দী হইলেন। তাঁহার হৃদয় আবার প্রতাপের জন্য মায়ায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, এবং প্রতাপও গেল তিনি আর কিসের জন্য সংসারে থাকিবেন। সেই প্রতাপকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইল। এমত সময় নবাবের লোক আসিয়া দলনী বেগম ভ্রমে তাঁহাকে নবাবের নিকট লইয়া গেল।

কবি, শৈবলিনীর চরিত্রে দেখাইয়াছেন যে, কামিনী-হৃদয়ে প্রেম-আবেগ কত প্রবলরূপে প্রভুত্ব করে। প্রণয় যে যে হৃদয়কে একত্র বন্ধন করে, সে হৃদয়-মিথুন একত্র চিরদিনের জন্য উদ্বাহ-বন্ধনে মিলিত হওয়াই ভাল। নহিলে তাহাতে যে কতদূর কুফল ফলিতে পারে, শৈবলিনী তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শৈবলিনী দেখাইয়াছেন যে, যে রিপুকে সুশাসনে রাখিতে হইবে, তাহাকে সুশাসনে না রাখিতে পারিলে সাধ্বী কুলাঙ্গনারও কতদূর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অন্যদিকে প্রতাপ দেখাইয়াছেন, সেই রিপুকে কি প্রকারে দমন করিয়া রাখিতে হয়। শৈবলিনী স্ত্রীহৃদয়ের চরিত্র, প্রতাপ পুরুষের মনঃসংযমের

চরিত্র। শৈবলিনীর হৃদয়ে প্রেমের প্রবলতা ও অধীরতা, প্রতাপের হৃদয়ে প্রেমের শাসন ও ধৈর্য্য। শৈবলিনী ছুরিকা হাতে করিয়াও হৃদয় শাসন করিতে পারেন নাই, গঙ্গার তরঙ্গসম্মুখিনী হইয়াও হৃদয় শাসন করিতে পারেন নাই, এবং বিপদের উপরে বিপদে পড়িয়াও হৃদয় শাসন করিতে পারেন নাই। তিনি প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যেখানে গিয়াছেন, সেই খানেই প্রেমতরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে বিষম তুফানে ফেলিয়াছে। প্রতাপ মনে করিলেই প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসিতে পারিতেন, কিন্তু যতবার সেই প্রবৃত্তি-স্রোত তাঁহার নিকট প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, ততবারই তিনি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বেদগ্রামে দেখিলেন, শৈবলিনীর জন্য তাঁহার হৃদয় বিষম দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতেছে, তিনি সেই হৃদয়কে দমন করিবার জন্য বেদগ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। বৈশলিনী প্রতাপের জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত, প্রতাপ তখনও তাঁহাকে পাপিষ্ঠা বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। শৈবলিনা তাঁহাকে ইংরাজহস্ত হইতে বিমুক্ত করিলেন, প্রতাপ তখন দ্বিগুণতর দৃঢ়তার সহিত হৃদয়কে সংযত করিয়া অনতিবিলম্বে শৈবলিনীকে বিদায় দিলেন। শৈবলিনীর চরিত্রে প্রকৃতির ধর্ম্ম, প্রতাপের চরিত্রে লোকধর্ম্মের তেজস্বিতা। এক জন ইহলোকের সাক্ষ্য, অন্য জন পরলোকের গৌরব।

শৈবলিনীর যখন বিবাহ হইল, প্রতাপ ভাবিলেন, এইবারে শৈবলিনী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু শৈবলিনী তথাপি প্রতাপকে পরিত্যাগ করিলেন না। শৈবলিনী যদি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে না আসিতেন, সর্ব্বদাই যদি প্রতাপ লইয়া তিনি সুখী না হইতেন, যদি প্রতাপকে দেখিলে তাঁহার নয়ন বিস্ফারিত ও প্রফুল্ল না হইত, যদি প্রতাপের প্রতি তাঁহার মলিনমুখের কটাক্ষ না পড়িত, যদি তিনি চন্দ্রশেখরকে লইয়া সুখসচ্ছন্দে সংসার-ধর্ম্ম করিতেন, তাহা হইলে প্রতাপের বেদগ্রাম ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু প্রতাপ বেদগ্রামে দেখিলেন যে শৈবলিনীর বিষদংশনে তিনি একদণ্ড বেদগ্রামে আর তিষ্ঠিতে পারেন না। সুতরাং তিনি বেদগ্রাম পরিত্যাগ করিলেন এবং ভাবিলেন শৈবলিনীকে বিসর্জ্জন দিলাম। চন্দ্রশেখর তাঁহার যে যে উপকার করিয়াছিলেন তাহারই প্রত্যুপকার সাধনার্থ প্রতাপ শৈবলিনীকে ইংরাজের নৌকা হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিমুক্তা শৈবলিনী যখন তাঁহার নিকট হৃদয়-কবাট খুলিয়া দেখাইলেন, যে তাহাকেই লাভ করিবার জন্য তিনি আপনিই ফষ্টরের সঙ্গে গৃহত্যাগিনী হইয়া আসিয়াছেন, তখন প্রতাপ আবার সেই বিষধরীর দংশনে জর্জ্জরিত হইলেন। ইংরাজেরা যখন প্রতাপকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তখন কি প্রতাপ অহোরাত্র ভাবিতেন না কিরূপে শৈবলিনীর হাত হইতে তিনি বিমুক্ত

হইবেন? এক এক দিন নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতেন, আর এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইত। তিনি সেই খানেই ভাবিয়াছিলেন, এবারে শৈবলিনীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহাকে এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইব, যাহাতে তিনি আমাকে ভ্রাতৃরূপে অথবা পুত্রবৎ ভাবেন। তিনি এই চিন্তায় ব্যাকুল থাকেন এমত সময়ে সহসা একদিন সেই শৈবলিনী তাঁহাকে ইংরাজ-বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। প্রতাপ সাঁতারিয়া পলাইয়া গেলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন আর কেহ তাঁহার অনুসরণ করেন নাই। কিন্তু সম্মুখে দেখিলেন—শৈবলিনী। অমনি সহসা সিহরিয়া উঠিলেন। তীরে উঠিয়াই ত আবার এই বিষধরীর হাতে পড়িতে হইবে, তৎক্ষণাৎ এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল। পলাইবার উৎকণ্ঠাব কথঞ্চিৎ তিরোভাব না হইতে হইতে এই ভাবনা তাঁহার মনে প্রবল হইল। তখন তিনি তাড়াতাড়ি সেই উৎকণ্ঠার সময়েই সুযোগে গঙ্গার উপরে শৈবলিনীকে পূর্ব্বকল্পিত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিবার জন্য প্রিয় সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে শৈ বলিয়া সম্বোধন করাতে, শৈবলিনীর হৃদয়, গঙ্গার-তরঙ্গ অপেক্ষাও ফুলিয়া উঠিল। যে চন্দ্র গঙ্গার বক্ষে ভাসিতেছিল তদপেক্ষা শোভনতর চন্দ্র শৈবলিনীর হৃদয়ে সহসা উদিত হইল। তৎক্ষণাৎ স্মৃতির জ্যোৎস্না তাঁহার হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিল। কিন্তু কে জানে, ইহা শরতের জ্যোৎস্না মাত্র, ইহা নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের শেষ শিখা। যে ঘোর নৈরাশ্য ও বিষাদের অন্ধকার ইহার পরেই শৈবলিনীর হৃদয় আচ্ছন্ন করিবে, তাহার গাঢ়তা বাড়াইবার জন্যই কবি পূর্ব্বে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে গঙ্গার শোভা বর্ণন করিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণ——

ভারতে দুর্ভিক্ষ।

হায়! কি কুদিনে বৈদেশিক চরণ ভারতবক্ষে অর্পিত হয়। সেই দিনই ভারতবাসিদিগের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। সেই দিন হইতেই ভারতবাসিদিগের দুঃখ যন্ত্রণা আরব্ধ হইয়াছে। „ছিদ্রেষনর্থা বহুলীভবন্তি” একটী ছিদ্র ধরিয়া অনর্থরাশি জলপ্লাবনের ন্যায় ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিতেছে। আজ সাইক্লোন (ঝড়), আজ জলপ্লাবন, আজ দুর্ভিক্ষ, আজ মহামারী—এইরূপ প্রতিবৎসরই শুনা যাইতেছে। আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থ সকলে, অস্মদ্দেশীয় প্রচলিত

জনশ্রুতিতে এরূপ ধারাবাহিক দৈবী আপৎ-পুরুম্পরার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা যে কখন ঘটিত না এরূপ বলিতেছি না, শত বা সহস্র বর্ষে এক আধ বার ঘটিত মাত্র। তাহাও যে রাজপাপ বিনা সংঘটিত হইত না আর্য্যেরা তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। রাজ্যে কোনপ্রকার দৈবী আপৎ উপস্থিত হইলে, তখনকার রাজারা আপনাদিগকে দুরাচার বলিয়া আশঙ্কা করিতেন। তাঁহারা ভাবিতেন অবশ্যই রাজ্যের শাসন-কার্য্যে তাঁহাদিগের কোনপ্রকার স্খলন হইয়া থাকিবে, নতুবা এরূপ ঘটিবে কেন। অধিক কি প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন-জনিত অকালমৃত্যু প্রভৃতিকেও রাজারা তাঁহাদিগের দুঃশাসনের ফল বলিয়া মনে করিতেন। উত্তররামচরিতের একস্থলে লিখিত আছে—"ততোন রাজাপচারমন্তরেণ প্রজায়ামকালমৃত্যুশ্চরতীতি আত্মদোষং নিরূপয়তি করুণাময়ে রামভদ্রে**" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বালকের অকালমৃত্যু শুনিয়া করুণাময় রামচন্দ্র মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে রাজদোষ বিনা কখনই এরূপ অকালমৃত্যু সম্ভবে নাই। বস্তুতঃ প্রজাদিগের দুঃখ সুখের মূল যে রাজা তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। রাজা ভাল হইলে প্রজাদিগের অশেষ সুখ, রাজা মন্দ হইলে প্রজাদিগের দুঃখের সীমা নাই। রাজা ভাল হইলে প্রজাদিগকে সর্ব্বপ্রকার দৈবী আপৎ হইতেই রক্ষা করিতে পারেন, এরূপ আমরা বলি না। তবে আমরা বলি এই যে রাজা ভাল হইলে সে গুলির অনেক স্থলে পরিহরণ করিতে পারেন। যেখানে নিতান্ত অনিবার্য্য, সেখানে তজ্জনিত প্রজাদিগের দুঃখের অনেক উপশমন করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট ঝটিকা নিবারণ করিতে পারেন না বটে, কিন্তু ঝটিকা-জনিত প্রজাদিগের অশেষ যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বাঁধ নির্ম্মাণ দ্বারা জলপ্লাবনের পরিহরণ করিতে পারেন, এবং যেখানে বাঁধভঙ্গ বা জলোচ্ছ্বাসের অসাধারণ উচ্চতা নিবন্ধন জলপ্লাবন নিবারণে একান্তই অসমর্থ হয়েন, সেখানে আন্তরিক চেষ্টা করিলেই জলপ্লাবন-জনিত অনিষ্টের অনেক পরিমাণে নিরাকরণ করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট উৎকৃষ্ট পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ দ্বারা অনাবৃষ্টি-জনিত দুর্ভিক্ষের পৌনঃপুন্যে আবির্ভাব দূরপ্রসারিত করিতে পারেন; এবং জল-প্রসরণ-পথ পরিষ্কৃত রাখিয়া ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া অনেক পরিমাণে মহামারী নিবারণ করিতে পারেন। যেখানে সেই সেই উপায়ে, সেই সেই দৈবী আপৎ অনিবার্য্য, সেখানে রাজকর্ম্মচারিদিগের যত্নে সেই সেই অনিবার্য্য-আপৎ-জনিত প্রজাদিগের অশেষ দুঃখের নিরাকরণ হইতে পারে। ইংলিস গবর্ণমেণ্ট যে সেই সকল দৈবী আপৎপরম্পরার নিরাকরণে অথবা নিরাকরণ অসম্ভব হইলে তজ্জনিত প্রজাদিগের শোচনীয় দুরবস্থার উপশমনে বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেন না, একথা আমরা বলিতে

পারিনা। তবে আমরা এই বলি যে ইংলিস গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের দুরদৃষ্টবশতঃ বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট; সুতরাং আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও বৈদেশিক কর্ম্মচারিদিগের স্বার্থপরতাবশতঃ চেষ্টা করিয়াও ফলে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না।

কোন বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট যে ইংলিস গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা ভারতের অধিকতর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। এই জন্য আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যতদিন আমাদিগকে বৈদেশিক শাসনের অধীনে থাকিতে হইবে, ততদিন যেন আমাদিগকে অন্য কোন গবর্ণমেণ্টের অধীনে যাইতে না হয়। আমরা বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টনিচয়ের মধ্যে ইংলিস গবর্ণমেণ্টকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবর্ণমেণ্ট বলি। সুতরাং আমরা বিশেষরূপে তাহারই পক্ষপাতী। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? বৈদেশিক শাসনের বিষময় ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। বৈদেশিক শাসনের বিষময় ফল কি, তাহা বর্ণনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। তবে কথা তুলিয়া দুই একটী না বলিয়া ক্ষান্ত থাকা অনুচিত বোধে, যথাস্থানে সংক্ষেপে এ প্রস্তাবের উপযোগী দুই একটী বলা যাইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক দুর্ভিক্ষের কারণ কি, এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায়ই বা কি। দুর্ভিক্ষের কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে— খাদ্যাভাবই দুর্ভিক্ষের কারণ অথবা খাদ্যাভাবই দুর্ভিক্ষ। এক্ষণে দেখিতে হইবে খাদ্যাভাব কতপ্রকারে ঘটিতে পারে। যে সকল দেশের শস্যাদির উৎপত্তি পর্জ্জন্যদেবের দয়ার উপর নির্ভর করে, সে সকল দেশে বৃষ্টি না হইলেই শস্যাদি উৎপন্ন হয় না। ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ নহে, এজন্য মধ্যে মধ্যে ইহার স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যাদি জন্মে না, এবং তজ্জনিত খাদ্যাভাব সংঘটিত হইয়া সেই সেই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী কে? আমরা বলি দৈব ও রাজা। কিন্তু দৈবের প্রতি আমাদিগের কোন অভিমান ও কোন অনুযোগ চলে না বলিয়া, আমরা রাজস্কন্ধেই সমস্ত দোষ চাপাই। দুর্ভিক্ষ ঘটিতে না দেওয়া ও ঘটিলে তাহার তৎক্ষণাৎ নিরাকরণ করা এ দুইই অনেক পরিমাণে রাজার করায়ত্ত। যাহা তাঁহার করায়ত্ত ও যত্নসাধ্য, তিনি যদি তৎসাধনে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তিনি ধর্ম্মের নিকট ও মানবজাতির নিকট পতিত।

আমরা দেখাইব দুর্ভিক্ষের অত্যন্তাভাবসাধন ও উপশমন রাজার করায়ত্ত ও যত্নসাধ্য কিরূপে। ভারতবর্ষত কোন কালেই নদীমাতৃক দেশ নহে, সুতরাং অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্যাদির অনুৎপত্তি বা ধ্বংস ত চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। তথাপি পূর্ব্বেই বা কালেভদ্রে কখন দুর্ভিক্ষের নাম শ্রুত হইত কেন, আর এক্ষণই বা বৎসরে বৎসরে ভারতের কোন না কোন

প্রদেশ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হইতেছে কেন? দেবতারা কি এক্ষণে ভারতের উপর অধিকতর কুপিত হইয়াছেন? তাহা নহে। ইহার অভ্যন্তরে মানব কারণই নিহিত আছে। ভারতবর্ষের ন্যায় শস্যশালী দেশ পৃথিবীতে আর নাই। ইহাতে এত অপর্য্যাপ্ত শস্য জন্মে যে এক বৎসরের অনাবৃষ্টিতে ও তজ্জনিত অজন্মায় কখন শস্যাভাব ও তন্নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হইতে পারে না। পূর্ব্বে অধিবাসিদিগের আহারযোজনা করিয়াও ইহা এত শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত, যে উপর্য্যুপরি তিন চারি বৎসর অনাবৃষ্টি হইলেও, শস্যাভাব বা তজ্জনিত দুর্ভিক্ষ ঘটিতে পারিত না। কিন্তু এক্ষণে সুসভ্য রাজার অধীনে স্বাধীন বাণিজ্যের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে! খাদ্য-সঞ্চয় এ সভ্যতার অনুমোদিত নহে। তোমার এ বৎসরের খোরাক চলিতে পারে এরূপ রাখিয়া তুমি অবশিষ্ট সমস্ত বিক্রয়ার্থ বিদেশে প্রেরণ কর। বিদেশের খাদ্যসৌকর্য্য ঘটুক, কিন্তু তুমি আগামী বৎসরে কি খাইবে তাহা ভাবিও না। আগামী বৎসর আসিল বৃষ্টি হইল না, শস্য জন্মিলনা, তুমি রাজার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে কি খাইব? রাজা বলিলেন তুমি কি খাইবে, তাহার ভাবনা ভাবিতে আমি বাধ্য নহি। তবে তোমাদিগের সমূহ বিপৎ দেখিতেছি, আচ্ছা! কিঞ্চিৎ সাহায্য করা যাইবে। রাজা বস্তাকত চাউল আনিয়া সেই অগণ্য মানবমণ্ডলীর সম্মুখে ধারণ করিলেন। তাহারা অনাহারের জ্বালায় অস্থির হইয়া দুইচারিটী করিয়া দানা খুঁটিয়া খাইল। আবার ক্রন্দন-রোল উঠিল! আবার গগণবিদারিয়া এই চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইল—আমরা খাই কি, অনাহারে মরি যে! অনাহারে অসংখ্য প্রজার মৃত্যু হইতে আরম্ভ হইল। তখন রাজকর্ম্মচারিদিগের চৈতন্য হইল! রাজ্ঞীর সিংহাসন টলিল! হুকুম হইল যে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী প্রেরিত হয়। রাজকোষ হইতে প্রচুর অর্থ প্রদত্ত হইল। তাহার অর্দ্ধেক বৈদেশিক রিলীফ্ কর্ম্মচারিদিগের উদরস্থ হইল। অবশিষ্ট অর্দ্ধেকের কিয়দংশ দেশীয় রিলীফ্ কর্ম্মচারিদিগের পাপ ধনলিপ্সা চরিতার্থ করিল। যে যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের দুঃখের উপশমন হইল না। তাহারা দলে দলে মরিতে লাগিল! উপশমনশিবির সকল তাহাদিগের সমাধিমন্দিররূপে পরিণত হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাকাইয়া রহিলেন।

প্রতি দুর্ভিক্ষের সময়ইত এইরূপ প্রহসন অভিনীত হইয়া থাকে। ইহার জন্য দায়ী কে? আমরা বলি রাজা। রাজা ইচ্ছা ও যত্ন করিলে দুর্ভিক্ষের পরিহরণও করিতে পারেন, উপশমনও করিতে পারেন।

স্বাধীন বাণিজ্য ভাল বটে, কিন্তু তাহার নিয়ন্ত্রন ও নিয়মন একান্ত প্রয়োজনীয়। সেই নিয়মনের শক্তি রাজহস্তে নিহিত

আছে; সুতরাং রাজা যদি তাহার পরিচালন না করেন, এবং সেই পরিচালনাভাবে রাজ্যের যদি কোন অমঙ্গল ঘটে, তাহার জন্য দায়ী রাজা।

এস্থলে রাজার কর্ত্তব্য কি তাহা আমারা বলিতেছি। উদ্বৃত্ত শস্য বিদেশে প্রেরণ করিয়া তাহার বিনিময়ে মুদ্রা বা বৈদেশিক পণ্য আনয়ন করা প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু কি পরিমাণ শস্য বিনা বিপদে প্রেরণ করা যাইতে পারে তাহা নির্ণয় করা ও তদতিরিক্ত বিদেশে যাইতে না দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের অকরণে রাজার গুরুতর প্রত্যবায় আছে। প্রত্যেক প্রদেশের, প্রত্যেক জেলার লোকসংখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক জেলার লোকসংখ্যা অনুসারে, তত্তৎপ্রদেশের ও তত্তৎজেলার খাদ্যপরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে। সেই পরিমাণ অনুসারে দুই তিন বৎসরের খাদ্য রাখিয়া, অতিরিক্ত অংশ প্রদেশান্তরে জেলান্তরে বা দেশান্তরে যাইতে দিতে হইবে। যদি কোন প্রদেশ বা জেলায় শস্য কম জন্মে, তাহা হইলে অন্য প্রদেশ বা জেলা হইতে শস্য আনিয়া সেই অভাব পূরণ করিয়া রাখিতে হইবে। যখন রাজা জানিতে পারিবেন যে ভারতের সমস্ত প্রদেশে সমস্ত জেলায় এইরূপে দুই তিন বৎসরের খাদ্য মজুত হইয়াছে, তখন তিনি অতিরিক্ত শস্য বিদেশে চালিত করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারেন। এরূপ চালানী কার্য্যে ভারতের কোন অমঙ্গল না হইয়া সৌভাগ্যসীমা পরিবর্দ্ধিত হইবে; এবং দুর্ভিক্ষেরও পরিহরণ হইবে।

কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন যাঁহাদিগের ইষ্ট, ভারতের মঙ্গলসাধন যাঁহাদিগের একমাত্র ও প্রধান লক্ষ্য নহে, তাঁহারা যে ভারতের ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। এইজন্যই বলিতেছিলাম বৈদেশিক শাসনের বিষময় ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে।

অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের অনুৎপত্তি জন্য দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনার পরিহরণ করার ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্যের অনুৎপত্তি যাহাতে না ঘটে, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার উৎকৃষ্ট উপায় সর্ব্বত্র পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ। এইটী ভারতবর্ষের বিশেষ অভাব। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে ইহার আবশ্যকতা বুঝেন না তাহা নহে। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্বেত ইঞ্জিনীয়ারগণের উদরের আয়তন এত বিস্তৃত হইয়াছে, যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণের জন্য গবর্ণমেণ্ট যত কেন অর্থব্যয় করুন না, অধিকাংশই শ্বেত ইঞ্জিনিয়ারদিগের উদরসাৎ হইবে। অবশিষ্ট অর্থে যাহা সম্পন্ন হইবে, তাহাতে এই গুরুতর অভাবের কণা মাত্র বিদূরিত হইবে। সুতরাং পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ দ্বারা অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্যের অনুৎপত্তি নিবারণের

আশাও সুদূরপরাহত। তবে যদি আমরা এক টাকার কায লইতে পাঁচ টাকা খরচ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের সে আশা পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু আমরা এত দীন ও দুঃস্থ যে এক টাকা ব্যয় করাই আমাদিগের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার, পাঁচ টাকার ত কথাই নাই। সুতরাং ধরিয়া রাখিতে হইবে যে পয়ঃ-প্রণালী নির্ম্মাণ দ্বারা দুর্ভিক্ষ নিবারণের আমাদিগের কোন আশাই নাই।

এই জন্যই বলিতেছিলাম বৈদেশিক শাসনের বিষময় ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে।

দুর্ভিক্ষের পরিহরণের দুইটি উপায় বলিলাম। এক্ষণে দুর্ভিক্ষের উপশমনের দুই একটী উপায় বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

দুর্ভিক্ষে যদি প্রজানাশ হয়, তাহার জন্য দায়ী কে? আমাদিগের মতে রাজা। যদি ঘোর বিপাকের সময় রাজা তাহাদিগের প্রাণরক্ষা না করিবেন, তাহা হইলে রাজার সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ কি? কি জন্য তাহারা রাজাকে কর দিবে? কি জন্যই বা তাহারা স্বাধীনতার বিনিময়ে তাঁহার নিকট অধীনতা কিনিবে? প্রজাদিগের প্রাণরক্ষা যখন রাজার কর্ত্তব্য স্থির হইল, তখন দেখা যাউক দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইলে, রাজা কি কি উপায়ে তাহার উপশমন করিতে পারেন।

খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সেই অভাব দূর করিলে দুর্ভিক্ষের উপশমন হয়। এক্ষণে এই অভাবের দূরীকরণ বণিক-বৃন্দ দ্বারাও হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট দ্বারাও হইতে পারে। বণিকেরা নানা দেশ হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশে আনয়ন করেন, গবর্ণমেণ্টও ইচ্ছা করিলে তাহা আনিতে পারেন। উভয়ই যদি দ্রব্যাদি আনিয়া উচ্চ মূল্যে বেচিতে বসেন, অতি অল্প লোককেই ভারতে ক্রেতা পাইবেন। কারণ অর্থপ্রাচুর্য্য থাকিলে দুর্ভিক্ষের-প্রভাব কখনই অনুভূত হয় না। দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষের একটী গৌণ কারণ। এই জন্য আজ কাল ভারতের এত দুর্ভিক্ষ। সুতরাং সে স্থলে বাণিজ্যের স্বাধীনতার যদি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ না করা যায়, যদি মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দেওয়া যায়, তাহা হইলে দ্রব্যাদি বিক্রীত হওয়ার কোন আশা থাকে না। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজেই সংযোজক (Supplier) হউন, আর বণিক্‌বৃন্দই সংযোজক হউন, গবর্ণমেণ্টকে একটা সম্ভবতঃ ন্যূনতম মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। সম্ভবত ন্যূনতম মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে ক্রেতার সংখ্যা বাড়িবে, মৃত্যু-সংখ্যার হ্রাস হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধেও অল্পসংখ্যক কাঙ্গালীর ভার পড়িবে। কিন্তু ইংলিস্ গবর্ণমেণ্টের একটী গুরুতর রোগ আছে। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ হইবে সেও ভাল, তথাপি ইঁহারা বাণিজ্যের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না।

দুর্ভিক্ষ প্রশমনের দ্বিতীয় উপায় দুর্ভিক্ষ-

প্রপীড়িত প্রদেশে দুর্ভিক্ষের সময় গুরুতর রূপে পূর্ত্তকার্য্যের অনুষ্ঠান। যত লোক উপস্থিত হউক না কেন, পূর্ণ অশনে বা উপযুক্ত বেতনে, তাহাদিগ দ্বারা কায লইলে অনাহার-জনিত মৃত্যু প্রায় ঘটিতে পারে না। অনুপযুক্ত বেতনে বা অর্দ্ধ অশনে তাহাদিগ দ্বারা ভাল কায লওয়া সম্ভব নহে, এবং অধিক দিন তাহাদিগকে জীবিত রাখাও সহজ নহে। লীটন্ ও টেম্পল্ এই অর্দ্ধ-অশন নীতি অবলম্বন করিয়া অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ করিয়াছেন।

যাহা হাউক্ আমরা আর শুদ্ধ বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টকে গালি দিয়া দেশহিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইব না। মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের অবস্থা ও সেই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আমাদিগের কি কর্ত্তব্য—এবং ভবিষ্য দুর্ভিক্ষ সকলের যথাসাধ্য পরিহরণ করিতেই বা আমাদিগকে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমরা সেই সমস্তের আলোচনা করিব।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

চিতোরের বীরগান।—শ্রীদৈবকীনন্দন সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা। কবিতাগুলি বীররসোদ্দীপক বটে।

প্রিয়-বিলাপ।—বিরহবিধুর শ্রীনারায়ণদাস তপস্বী প্রণীত। প্রিয়মিত্র বিয়োগে এরূপ বিলাপে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট সহানুভূতি পাওয়া সম্ভব।

বিশ্রাম-লহরী।—প্রথম খণ্ড। তাঁতিবন্দ নিবাসী শ্রীশ্রীগোবিন্দ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। করপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ আনা। ইহাতে কতকগুলি তানলয়বিশুদ্ধ গীতি সন্নিবেশিত আছে। গীতিগুলি প্রায়ই শৃঙ্গার-রসাত্মক। ইহার দুই এক স্থলে কবিত্ব শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

চিকিৎসা-সূত্র।—(হোমিওপ্যাথিক)। ডাক্তারের সাহায্য ভিন্ন হোমিওপ্যাথিক মতে গৃহচিকিৎসার উপযোগী পুস্তক। শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইণ্ডিয়ান্ মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহা বিজ্ঞানবিশুদ্ধ হইয়াছে কি না আমরা জানি না; কিন্তু প্রতি গৃহস্থের গৃহেই যে এরূপ একখানি পুস্তকের অস্তিত্ব প্রার্থনীয় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী।

(নবম প্রবন্ধ ।

অসাধারণ অধ্যবসায় ও অশ্রান্ত আত্ম-ত্যাগের শক্তি দুর্নিবার্য্য। নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মের বেগ অসম্বরণীয়। নিঃস্বার্থ সত্যের প্রচার রোধ করে কাহার সাধ্য ?

অসংখ্য প্রতিবন্ধক, অসংখ্য বাধা-বিপত্তি স্বত্বেও ম্যাট্‌সিনির অধ্যবসায় ও ম্যাট্‌সিনির কার্য্যপরতার বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইল না। ভবিষ্যতের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস নিবন্ধন তাঁহার উৎসাহোন্মাদ বরং দিন দিন অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার লেখনী হইতে একটী প্রবন্ধের পর আর একটী প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার উত্তেজনায় চতুর্দ্দিকে অসংখ্য গুপ্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হইতে লাগিল। ম্যাট্‌সিনি জেনোয়া ও লেগ্‌হরণে যে সকল সহযোগী বন্ধুগণকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট বিবিধ নিয়মাবলী ও উপদেশমালা পাঠাইতে লাগিলেন। জেনোয়ায় রুবিনী ভ্রাতৃগণের যত্নে এবং লেগ্‌হরণে বিনি ও গোয়েরাট্‌জির উদ্যোগে দুইটী সর্ব্বপ্রথম সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। এই দুইটীই ইতালীতে গুপ্ত সমাজ বিস্তারের কেন্দ্রীভূত হইল।

নব্য ইতালী সমাজের গঠন-প্রণালী।

সমাজের গঠনপ্রণালী যতদূর সরল ও সঙ্কেতশূন্য করা সম্ভব তাহা করা হইল। কার্ব্বোনারোদিগের গুরুপরম্পরার অসংখ্য শ্রেণী-বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া ইহাতে দীক্ষাগুরু ও দীক্ষিত এই দুইটিমাত্র সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপিত হইল। যাঁহারা দীক্ষাগুরু, এই সম্প্রদায়ে নব নব শিষ্য দীক্ষিত করিবার অধিকার তাঁহাদিগেরই হস্তে প্রদত্ত হইল; কিন্তু যাঁহারা কেবলমাত্র দীক্ষিত তাঁহাদিগের হস্তে সে অধিকার প্রদত্ত হইল না। নব্য ইতালী সমাজের ভিত্তিভূত মতসকলে যাঁহাদিগের প্রগাঢ় অনুরাগ, এবং যাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিজ্ঞতা যথোচিত পরিপুষ্ট, তাঁহাদিগকেই দীক্ষা-গুরু করা হইতে লাগিল।

ইতালীর বহির্ভাগে মার্সেলিসে একটি মাধ্যমিক (Central) সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। এই সমাজ ইউরোপীয় লোকতান্ত্রিক মতাবলম্বীদিগের পরস্পর মিলনের সন্ধিস্থল ও "নব্য ইতালী" সমাজের বিজয়পতাকার কেন্দ্রস্বরূপ হইল। এই

সভা দ্বারাই নব্য ইতালীসমাজের শাখা প্রশাখার নিয়মন ও তত্ত্বাবধান কার্য্য চলিতে লাগিল।

ইতালীর প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান প্রধান নগরের প্রত্যেক উপ বিভাগে নব্য ইতালী সমাজের এক একটী গুপ্তশাখা প্রতিষ্ঠাপিত হইতে লাগিল। একজন দীক্ষাগুরু ও কতিসংখ্যক দীক্ষিত শিষ্য লইয়াই এক একটী শাখা নির্ম্মিত হইল। সকলের সমবেত কার্য্যের বিশৃঙ্খলা না ঘটে, এইজন্য প্রত্যেক নগরের শাখা গুলির উপর এক এক জন তত্ত্বাবধায়ক (Director) নিযুক্ত হইলেন। এবং প্রত্যেক প্রদেশের তত্ত্বাবধায়কদিগের কার্য্যপ্রণালী দেখিবার জন্য একজন করিয়া সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। এই সকল শাখার উপর চিঠিপত্র লেখা, পত্রিকা বিতরণ করা, নব নব শিষ্য দীক্ষিত করা প্রভৃতি কার্য্যভার অর্পিত হইল।

মাধ্যমিক সমাজে কোন সংবাদ পাঠাইতে হইলে এই পর্য্যায়ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে। দীক্ষিত শিষ্য হইতে দীক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু হইতে তন্নগরস্থ তত্ত্বাবধায়ক, নগরস্থ তত্ত্বাবধায়ক হইতে প্রাদেশিক তত্ত্বাবধায়ক, প্রাদেশিক তত্ত্বাবধায়ক হইতে মাধ্যমিক সমাজের সভাপতির নিকট সংবাদ পাঠাইতে হইবে।

নিত্যপরিচায়ক সর্ব্বপ্রকার সঙ্কেতচিহ্ন বিপৎসঙ্কুল বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। মাধ্যমিক সভা হইতে প্রাদেশিক সভায়, অথবা প্রাদেশিক সভা হইতে মাধ্যমিক সভায় কোন দূত যাইলে, তাঁহাকে এক-প্রকার সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ করিয়া, বিশেষ প্রকারে কাটা এক টুক্‌রা কাগজ দেখাইয়া, এবং এক বিশেষরকমে হস্ত-মর্দ্দন করিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে হইত। রাজ-নির্যাতনভয়ে এই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন আবার প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবর্ত্তিত করা হইত।

প্রত্যেক সভ্যকে নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক চাঁদা দিতে হইত। এইরূপে সংগৃহীত অর্থের দ্বিতৃতীয়াংশ প্রাদেশিক ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রাদেশিক ধনাগারেই সঞ্চিত থাকিত; অবশিষ্ট একতৃতীয়াংশ সাধারণ শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মাধ্যমিক সভার ধনাগারে প্রেরিত হইত। এবং পত্রিকাদির বিক্রয়ে যে টাকা উঠিত তদ্দ্বারা ইহার মুদ্রাঙ্কন ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত।

উৎসর্গীকৃত-জীবন মনীষিগণের স্মরণার্থ একটী করিয়া সাইপ্রেস বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা নব্য ইতালী সমাজের পরিচায়ক চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। নব্য ইতালী সমাজের মটোয় (Motto) এই কথাগুলি লিখিত ছিল— (Ora e Sempre ie Now and for ever) এক্ষণে এবং চির-জীবনের মত—অর্থাৎ "আমরা নব্য ই-তালী সমাজের সভাগণ এখন হইতে চির-জীবনের মত স্বদেশের কার্য্যে জীবন উৎসর্গীকৃত করিলাম"।

নব্য ইতালী সমাজের পতাকা ইতালীর ত্রিবর্ণে রঞ্জিত হইয়া একদিকে স্বাধীনতা সাম্য ও মানবপ্রেম এবং আর এক

দিকে একতা ও স্বাতন্ত্র্য এই পদগুলি ধারণ করিয়াছিল। প্রথম পদগুলি ইতালীর জাতিমধ্যগত (Itnernational) ব্রতের পরিচায়ক, দ্বিতীয় পদগুলি জাতীয় ব্রতের পরিচায়ক।

নব্য ইতালী সমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠাপন দিন হইতে বহিশ্চর রাজ্য সকলের সহিত সম্বন্ধে ঈশ্বর ও মানবজাতি এবং স্বদেশের সহিত সম্বন্ধে ঈশ্বর ও জনসাধারণ—ইহার মূলসূত্রস্বরূপ গৃহীত হইল।

এই দুই মূলসূত্র—যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে এক মূল সূত্রেরই প্রয়োগদ্বয়মাত্র—এই দুই মূল সূত্রই নব্য ইতালী সমাজের যাবতীয় নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি।

ম্যাট্‌সিনি সমাজস্থাপনের সেই প্রথম যুগে বিভিন্ন বিভিন্ন সভার সভাগণ ও তত্ত্বাবধায়কদিগকে, এবং যে সকল ইতালীয় যুবকমণ্ডলীর সহিত তিনি কোন প্রকারে সংস্রবে আসিতেন, তাহাদিগকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিতেন তাহা শুদ্ধ রাজনৈতিক নহে, প্রধানতঃ নীতিমূলক।

সেই সকল নীতিমূলক উপদেশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"আমরা শুদ্ধ ষড়যন্ত্রকারী নহি; বিপ্লব সাধনই যে আমাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য এরূপ নহে; নূতন ও অদ্ভুত সৃষ্টির অবশ্যম্ভাবিতায় এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর মূর্ত্তিতে আমাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস। ইতালীর সঞ্জীবন সাধনই আমাদিগের একমাত্র ব্রত।

"আমাদিরের প্রথম লক্ষ্য জাতীয় শিক্ষা বিধান। কিন্তু আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অস্ত্র ও বিদ্রোহই সেই জাতীয় শিক্ষা বিধানের একমাত্র উপায়; এইজন্যই আমরা তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব। কিন্তু আমরা আমাদিগের বেয়নেটের সূচ্যগ্রে কোন গভীর লক্ষ্য না রাখিয়া কখনই তাহার ব্যবহার করিব না।

"সে ধ্বংসের কোনও উপকারিতা নাই, যাহার স্থলে আমাদিগের রমণীয়তর প্রাসাদ নির্ম্মাণের কোনও আশা নাই। সে স্বত্ব ও কর্ত্তব্য কেবল মাত্র পত্রাঙ্কিত করার ফল কি, যাহা লোকের হৃদয়ে অঙ্কিত করিব বলিয়া আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় ও দৃঢ় বিশ্বাস নাই।

"আমাদিগের পিতৃপিতামহেরা এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কায করেন নাই বলিয়াই আজ আমাদিগের এই দুর্দ্দশা; এইজন্য আরও প্রতিমুহূর্ত্তেই ইহা আমাদিগের হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখা উচিত। শুদ্ধ বিবিধ প্রদেশ সকলকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না। আমাদিগকে একটী জাতি প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে।

"ইহা আমাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস যে ইহজগতে ইতালীর জীবন অদ্যাপি ভস্মসাৎ হয় নাই। তাহার ললাটে অদ্যাপি লিখিত আছে যে সে আবার বর্দ্ধনশীল মানব-

পরিণতির উপাদান-সামগ্রীর সংযোজনা করিবে। আবার সে তৃতীয় জীবনের সৌভাগ্য-দোলায় লালিত হইবে। সেই তৃতীয় জীবনের অবতারণা করাই আমাদিগের এই উদ্যমের এক মাত্র লক্ষ্য।

"ইতালীয় জাতির অন্তরে আমাদিগকে একটী প্রবল ও অকৃত্রিম বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে; তাঁহাদের অন্তরে জাতীয় অতীত অবদান-পরম্পরার জলন্ত ভাব পুনরুদ্দীপিত করিতে হইবে; তাঁহাদিগের অন্তরে আমাদিগের কঠোর ব্রতের উপযোগী আত্মত্যাগ, অবিচলিততা এবং একচিত্ততা উত্তেজিত করিতে হইবে।

রাজনৈতিক উপদেশ।

"শিষ্যদিগের অন্তরে শুদ্ধ বৈপ্লবিক ভাব উদ্দীপিত করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিলে চলিবে না; নির্লক্ষ্য বা অনির্দ্দিষ্টলক্ষ্য উদার মতের প্রখ্যাপনায় জগতের অনিষ্ট বই ইষ্টের সম্ভাবনা অল্প। প্রত্যেক সভ্যকে জিজ্ঞাসা করিবে তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস কি; যাঁহাদিগের সহিত হৃদয় ও প্রতীতি মিলিয়া যাইবে, তাঁহাদিগকেই সভ্য মনোনীত করিবে। সংখ্যার বহুত্বের উপর বিজয়াশা নির্ভর করিও না; যদি কখন বিজয় লাভ হয়, তাহা সংখ্যার বহুত্বে নহে, সামাজিক বলনিচয়ের একীভাবে।

"আমাদিগের পরীক্ষা ইতালীয় জাতির উপরই অনুষ্ঠিত হইবে। আমাদিগের আশা ভরসা পূর্ব্ব হইতেই প্রতারিত ও বিধ্বস্ত হউক তাহাতেও আমরা প্রস্তুত আছি, তথাপি আমরা বৈপ্লবিক বিজয়ের পর দিনই শিবিরাভ্যন্তরে ঘোরতর অন্তর্বিচ্ছেদ দেখিতে প্রস্তুত নহি।

"তোমাদিগকে একটী নবীন পতাকা উড্ডীন করিতে হইবে, সুতরাং তোমাদিগকে যুবকমণ্ডলী হইতেই তাহার পক্ষসমর্থক বাছিয়া লইতে হইবে; কারণ যুবক-মণ্ডলীরই হৃদয় উৎসাহোন্মাদ, কার্য্যদক্ষতা ও আত্মত্যাগের আধার। তাহাদিগের নিকট পূর্ণ সত্য খ্যাপন কর। আমাদিগের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় তাহাদিগকে সমস্ত জানিতে দেও। যদি আমাদিগের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় জানিয়া তাহারা তাহাতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তাহাদিগের উপর নির্ভর করিতে পারিব।

"অতীত বিপ্লবের প্রধান ভ্রম এই হইয়াছিল যে ইতালীর অদৃষ্ট কোন অপরিবর্ত্তনীয় মহতী নীতির উপর সন্ন্যস্ত না হইয়া, শুদ্ধ ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছা ও সাধুতার উপর সমর্পিত হইয়াছিল।

"এই ভ্রমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ খ্যাপন কর; ব্যক্তি-বিশেষের নাম পরিত্যাগ কর; ইতালীয় জাতিতে, আমাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্বে, এবং ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস প্রচার কর।

"শিষ্যদিগকে শিক্ষা দাও, যাঁহাদিগের হৃদয় বৈপ্লবিক ভাবে অনুপ্রাণিত তাঁহাদিগের মধ্য হইতেই যেন অধিনেতা মনোনীত করে; এবং অতীত পদার্থ ও

অতীত প্রণালীর সহিত তাহারা যেন সর্ব্বপ্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করে। ১৮৩১ সালের ভ্রম সকল তাহাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেও, পূর্ব্ব অধিনেতৃবৃন্দের দোষ সকল তাহাদিগের নিকট গোপন করিয়া রাখার প্রয়োজন নাই।

"বারম্বার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে ইতালীর জন-সাধারণ ভিন্ন ইতালীর উদ্ধার সাধন আর কাহারও দ্বারা হইবে না। সেই জনসাধারণের কার্য্যপরতা—অশ্রান্ত কার্য্যপরতা—হইতেই এরূপ গুরুতর ব্যাপার সংসাধিত হইবে; যেন প্রথম পরাজয়ে জন-সাধারণের হৃদয় ভীতিসমাকুল বা হতাশাপ্রপীড়িত না হয়।

"সর্ব্বপ্রকার মত-সঙ্কোচ (Compromise) পরিত্যাগ করিবে, কারণ ইহা নীতিবিগর্হিত ও বিপৎসঙ্কুল।

অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ—অতি প্রচণ্ড ও রুধির-কর্দ্দমিত যুদ্ধ—পরিহার্য্য বলিয়া আত্মবঞ্চনা করিও না। বরং যে মুহূর্ত্তে আপনাদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রবল বলিয়া মনে করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে রণ খ্যাপনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হও। বৈপ্লবিক সমরে প্রত্যাক্রমণ অপেক্ষা আক্রমণই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কারণ তুমি প্রথমে আক্রমণ করিলে শত্রুদিগের হৃদয়ে ভীতি উদ্দীপিত হইবে, এদিকে তোমার বন্ধু বান্ধবদিগের অন্তর সাহস ও উৎসাহে পরিপূরিত হইবে।

"বৈদেশিক রাজ্য সকলের নিকট হইতে কোন সাহায্যের আশা করিও না; তাহাদিগের সাহায্য ব্যতীতও তোমরা বিজয় লাভে সমর্থ—এইটী তোমরা যতক্ষণ দেখাইতে না পারিতেছ, ততক্ষণ তাহারা কখনই তোমাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না।

"কূট মন্ত্রণার উপর কোনও বিশ্বাস স্থাপন করিও না; একবারেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া এবং তোমাদিগের লক্ষ্য ও সাধন মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া কূট মন্ত্রণার মূলোচ্ছেদ করিবে।

"ইতালীয় জাতির ভিন্ন অন্য কাহারও নামে বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিও না। কোন একটী অবিচলিত নীতির নামে, জাতীয় বল লইয়া তোমরা যদি প্রথম যুদ্ধে জয় লাভ কর, তাহা হইলে জন-সাধারণে তোমাদিগকে আপনাদিগের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে; এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহারা তোমাদিগের সহিত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। আর যদি নিতান্তই তোমাদিগের পতন হয়, তাহা হইলেও তোমাদিগের মনে এই সান্ত্বনা থাকিবে যে তোমরা স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে কিরূপে জাতীয় সমরের অধিনয়ন করিতে হয় তদ্বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছ; এবং তোমরা যে কার্য্য-প্রণালী প্রখ্যাত করিয়াছ, তাহা অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে ভবিষ্য পুরুষ অবশ্যই ইতালীর উদ্ধার সাধন করিতে পারিবেন।"

ম্যাট্‌সিনির পরীক্ষা ফলবতী হইল। জন-সাধারণের বিশ্বজনীন সহানুভূতি বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের মুখে কালিমা অর্পণ করিল।

অচিরকাল মধ্যেই টস্‌কানীর প্রধান প্রধান নগরে অসংখ্য সভা সংস্থাপিত হইতে লাগিল। জেনোয়ায় রুবিনি ভ্রাতৃগণ ক্যাম্পানেলা বেন্‌জা প্রভৃতি কতিপয় সভ্যের যত্নে চতুর্দ্দিকে সভা প্রতিষ্ঠাপিত হইতে লাগিল। এই সকল যুবকবৃন্দের নাম সম্ভ্রম কিছুই ছিলনা সুতরাং সামাজিক আধিপত্য লাভের কোনওপ্রকার উপায় ছিল না। তথাপি ইহাঁদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় ও অশ্রান্ত যত্নে ছাত্র হইতে ছাত্র এবং যুবক হইতে যুবক—সকলেই তাড়িত বেগে এই নবোদ্ভাবিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। নব্য ইতালী সমাজের প্রথম-প্রচারিত পত্রিকা সকল ইহার প্রবর্ত্তক-দিগের নাম সম্ভ্রম ও সামাজিক আধিপত্যের অভাব বিদূরিত করিল। যাহারাই সে সকল পড়িতে লাগিল, তাহারাই ইহাতে যোগ দিতে লাগিল। এতদিন লোকে নামের মোহিনী শক্তিতে ভুলিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু আজ সত্যের নিকট,—অখণ্ডনীয় মতের নিকট—তাহারা পরাজিত হইল। আজ ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি কতিপয় নির্নাম যুবকের মন্ত্রে সমস্ত ইতালী সায় দিল। বোধ হইল যেন ইতালীয় জাতির নিদ্রিতপ্রায় উচ্চ-নমিষা (Aspiration) এই কাপালিক সমাজের ভীষণ শবসাধনে পুনরুন্মীলিত হইল।

এই কৃতকার্য্যতায় সেই কাপালিক সমাজ নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। যে সকল গুরুতর কর্ত্তব্যভার তাঁহারা মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরিশ্রম ও আত্মত্যাগে যতদূর সম্ভব, তাহাদিগের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

যে সকল যুবকমণ্ডলী দ্বারা সেই কাপালিক সমাজ সংগঠিত ছিল,—যাঁহাদিগের ন্যায় উৎসর্গীকৃতজীবন, পরস্পরের প্রতি অবিচলিত ও গভীর অনুরাগপরায়ণ, এবং প্রতি দিনের ও প্রতি মুহূর্ত্তের নিত্য নৈমিত্তিক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই একান্ত উদ্যোগশীল, ব্যক্তি সেণ্ট্ সাইমোনীয়গণ ব্যতীত ইউরোপে আর ছিল না—সেই প্রাতঃস্মরণীয়দিগের নাম করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ম্যাট্‌সিনি, লাম্‌বার্ত্তী, ইউ-সিগুলিয়ো, লুস্ত্রিনি এবং রুবিণি ভ্রাতৃগণের নাম করিতে হয়, ইহাঁদিগের অনেকেই মডেনাবাসী। ইহাঁরা একাকী, রীতিমত আফিস নাই, সাহায্যকারী কর্ম্মচারী নাই, এরূপ অবস্থায় রাত্রি দিবা ঘোরতর পরিশ্রমে নিমগ্ন; কখন পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন; কখন চিটিপত্র লিখিতেছেন; কখন পত্রিকা পত্রাদি পাঠাইবার জন্য পরিব্রাজকের অনুসন্ধান করিতেছেন; এবং এই উদ্দেশে কখন বা নাবিকদিগকেও নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন; কখন বা বিদেশে পাঠাইবার জন্য পত্রিকাগুলি তাড়ায় তাড়ায় বাঁধিতেছেন; এইরূপে যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির গভীর আলোচনার প্রয়োজন সেই সকল কার্য্য হইতে সামান্য কার্য্য পর্য্যন্তও তাঁহারা অম্লানবদনে করিতে লাগিলেন।

লা সিসিলিয়া নামক একজন কম্পজি-

টরের কার্য্য করিতে লাগিলেন; লাম-বার্তী প্রুফ্‌সংশোধনের ভার গ্রহণ করিলেন; এবং আর একজন সভার খরচ বাঁচাইবার জন্য পত্রিকাদির বাহকের কার্য্য স্বীকার করিলেন।

এই মনীষিগণ সোদরের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে সমভাবে একত্র কালযাপন করিতে লাগিলেন; তাঁহারা এক আশা ও এক লক্ষ্যে দীক্ষিত ছিলেন; এবং লক্ষ্যের অবিচলিততা ও পরিশ্রমের অশ্রান্ততা হেতু সকলেরই প্রীতি ও ভক্তির ভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অনেক সময় নিজ নিজ দৈনন্দিন খরচ হইতে বাঁচাইয়া এই সকল খরচ চালাইতে হইত, এই জন্য তাঁহাদিগকে দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইতে হইয়াছিল। তথাপি তাঁহারা সতত প্রফুল্ল থাকিতেন, এবং ভবিষ্যতে অবিচলিত বিশ্বাস হেতু বিজলীর ন্যায় হাস্যরেখা তাঁহাদিগের অধরোষ্ঠে সতত বিরাজমান থাকিত।

সেই প্রথম দুই বৎসর (১৮৩১-১৮৩৩) নব্য ইতালী সমাজে শৈশবের সরলতা ও পবিত্রতা, তারুণ্যের স্ফূর্ত্তি ও তেজ, প্রৌঢ়াবস্থার ধীর ও প্রশান্ত প্রফুল্লতা ও বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্য ও আত্মত্যাগ- এ সমস্তই যুগপৎ বিদ্যমান ছিল। এই সময় সেই কাপালিক সমাজ চতুর্দ্দিকে দুর্দ্দমনীয় শত্রুবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়াও অসংখ্য বিপৎপরম্পরার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে সত্যের পথে—বিজয়ের পথে—অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে যে সকল শত্রুমণ্ডলী এই সময় তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহারা পরিচিত ও প্রকাশ্য শত্রু। স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে—অনেক সময় আপনাদিগেরই মধ্যে—পরস্পরের নিন্দা, পরস্পরের গ্লানি, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, পরস্পরের প্রতি কৃতঘ্নতা; পূর্ব্ব বন্ধুগণ কর্ত্তৃক অকারণে তাঁহাদিগের সংসর্গত্যাগ; অধিক কি ইতালীয় বর্ত্তমান পুরুষের প্রায় সমস্তই—যাঁহারা ঈশ্বরসাক্ষী করিয়া শপথ করিয়াছিলেন কখনই তাঁহাদিগের বিশ্বাস ভঙ্গ করিবেন না—তাঁহাদিগ কর্ত্তৃকও—কোন নুব বিশ্বাস বশতঃ নহে, শুদ্ধ আত্মদৌর্ব্বল্যবোধে বা প্রতিহত অভিমানভরে—তাঁহাদিগের পতাকাত্যাগ; এ সমস্ত ঘটনা সেই কাপালিক সমাজের হৃদয় কুসুমকে অদ্যাপি বিশোষিত করে নাই; এ সমস্ত ঘটনা অদ্যাপি গতাবশিষ্ট কতিপয় শবসাধককে হতাশাপ্রপীড়িত হইয়াও কর্ত্তব্যপ্রণোদিত পরিশ্রমের বোঝা বহন করিতে শিক্ষা দেয় নাই—কর্ত্তব্য, যাহার শাসন দুর্লঙ্ঘ্য, মূর্ত্তি ভীষণ, স্পর্শ শীতল! যে মহাত্মাগণ এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, যেন অনন্ত কালের জন্য তাঁহাদিগের প্রাতঃস্মরণীয় নাম জগতের স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকে।

কিরূপে গুপ্তভাবে তাঁহাদিগের পত্রিকা-সকল ইতালীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে পারে, সেই কাপালিক সমাজ এক্ষণে এই প্রশ্নের মীমাংসায় আন্দোলিত হইলেন। ষ্টীমবোট্ কোম্পানীর এজেণ্ট, বন্দরোয়ারী

নামক কোন যুবাপুরুষ নিয়োপলিতীয় বাষ্পীয়পোতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেন। তিনি এবং আর কতিপয় ফরাশি নাবিক—এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন।

যতদিন তাঁহাদিগের দিকে গবর্ণমেণ্টের চক্ষু উন্মীলিত বা তাঁহাদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ক্রোধ উদ্দীপিত না হইয়াছিল, ততদিন তাঁহারা যে প্যাকেট্ জেনোয়ায় পাঠাইবেন তাহা লেগ্ হরণের কোন অসন্দিগ্ধ বাণিজ্যাগারের নাম দিয়া পাঠাইয়া দিতেন, আবার যাহা লেগ্হরণে পাঠাইবেন তাহা সিভিটা ভিচিয়া প্রভৃতি সাঙ্কেতিক স্থলের নাম দিয়া পাঠাইতেন। এইরূপে কিছুদিন তাঁহারা যেখানে যেখানে জাহাজ লাগিত, তথাকার পুলিশ ও কষ্টম-হাউস্ কর্ম্মচারিদিগের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের হস্ত হইতে প্যাকেট্গুলিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন জাহাজ অভীষ্ট বন্দরে পৌঁছিত, তখন প্যাকেট্গুলি যাঁহার নাং প্রেরিত হইত তাঁহারই জিম্মায় থাকিত, যতক্ষণ না কাপালিক সমাজের পূর্ব্বেই প্রাপ্তসম্বাদ কোন গুপ্তচর আসিয়া অতি সংগোপনে তাহাদিগকে লইয়া যাইত।

কিন্তু যখন গবর্ণমেণ্টের চক্ষু সম্পূর্ণরূপে উন্মীলিত হইল, তখন গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিলেন, যে যাহারা নব্য ইতালীসমাজের পত্রিকাদি ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া যাইবে, এবং যাহারা সে সকল পত্রিকার ইতালীতে প্রচারিত হওয়া বিষয়ে কোনপ্রকার সাহায্য করিবে তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ড প্রদান করা যাইবে; যখন চার্লস অ্যাল্বার্টের ক্যাসিয়া পেল্মা প্রভৃতি মন্ত্রিগণ স্বাক্ষরিত আজ্ঞালিপি ঘোষণা করিল—যে যাহারা নব্য ইতালী সমাজের পত্রিকাদি প্রচারের সহায়তা করিবে তাহাদিগের প্রতি গুরুতর অর্থদণ্ড ও দুইবৎসর কারাবাসরূপ শারীর দণ্ড প্রদত্ত হইবে, কিন্তু যাহারা সম্বাদ দিবে তাহাদিগকে সেই অর্থদণ্ডের অর্দ্ধেক পারিতোষিক দেওয়া যাইবে অথচ তাহাদিগের নাম অপ্রকাশিত থাকিবে; তখনই ইতালীর নীচাশয় গবর্ণমেণ্টের সহিত কাপালিক সমাজ প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন; এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে যদিও কাপালিক সমাজের অনেক শ্রম, অনেক অর্থ বৃথা ব্যয়িত হইয়াছিল, তথাপি বিজয়লক্ষ্মী পরিশেষে তাঁহাদিগেরই অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন।

এখন হইতে পত্রিকাদি পাঠাইতে তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; পাঠকদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই সকল কৌশলের একটী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নানা স্থানে কমিসন্ এজেণ্ট নিযুক্ত হইল; চোঙের ভিতর করিয়া নব্য ইতালী সমাজের পত্রিকাসকল তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইতে লাগিল। সে সকল চোঙের অভ্যন্তরে কি আছে, কমিসন্ এজেণ্টেরা তাহা জানিতেন না। এদিকে

সমাজের গুপ্তচরদিগকে চতুর্দ্দিকে লিখিয়া পাঠান হইত, তাঁহারা যেন যথা সময়ে সেই সেই কমিসন্ এজেণ্টের নিকট গিয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সেই সকল চোঙ খরিদ করেন। গুপ্তচরেরা সেই সকল চোঙ খরিদ করিয়া তদভ্যন্তরস্থ পত্রিকাগুলি দীক্ষিতদিগের মধ্যে প্রচারিত করিতেন।

পত্রিকাদির গুপ্ত প্রচারে কাপালিক সমাজ ফরাশি সাধারণতান্ত্রিকদিগের ও ইতালীয় বাণিজ্যতরির নাবিকদিগের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইতেন। সাহায্য পাইবেন বলিয়া তাঁহারা ইতালীয় নাবিকদিগকে বৈপ্লবিক শিক্ষায় দীক্ষিত করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের চেষ্টা অনেকাংশে সফলও হইয়াছিল।

ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং ইতালীতে কাপালিক সমাজের পত্রিকাদি প্রচার রহিত করিতে অসমর্থ হইয়া, মার্সেলিস্‌স্থিত কাপালিকদিগের স্বর রোধ করিবার জন্য ফরাশি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন, ফরাশি গবর্ণমেণ্টও সে অনুরোধ রক্ষা করেন।

কাপালিক সমাজের বিরুদ্ধে উভয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ নির্য্যাতন-প্রণালী অবলম্বন করেন, তাহা পরে সবিশেষ বিবৃত হইবে। এক্ষণে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে উভয় গবর্ণমেণ্টের ভয়ঙ্কর নির্য্যাতন সত্ত্বেও কাপালিক সমাজের গতি বিন্দুমাত্রও প্রতিহত হইল না।

অচিরকাল মধ্যেই ইতালীর প্রায় সর্ব্বত্র সমাজের প্রভাব অনুভূত হইতে লাগিল। শাখাসমাজের সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অধিক কি নিয়োপলিতান্ সীমা পর্য্যন্তও গুপ্ত মন্ত্রণা নির্ব্বিঘ্নে প্রচারিত হইতে লাগিল। কাপালিকসমাজের উপদেশ সংক্রামিত করিবার জন্য, এবং দীক্ষিতদিগের উৎসাহবহ্নি ইন্ধনসন্ধুক্ষিত রাখিবার জন্য, কাপালিক সমাজের পরিব্রাজক গুপ্তচর সকল সর্ব্বদা ইতালীর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

সমাজের পত্রিকাসকল পাঠ করিবার ইচ্ছা এতদূর বলবতী হইয়া উঠিল, যে যত সংখ্যা পত্রিকা ইতালীতে প্রেরিত হইত, তাহাতে সাধারণ আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না। সুতরাং জাতীয় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য চতুর্দ্দিকে সে সকল পত্রিকার গুপ্ত পুনর্মুদ্রাঙ্কন এবং গুপ্ত ও বিস্তৃত প্রচার আরম্ভ হইল।

নব্য ইতালী সমাজের আবির্ভাব এইরূপে সমস্ত ইতালীয় জাতি কর্ত্তৃক সোৎসাহে ও সাদরে পরিগৃহীত হইল। অনধিক বর্ষকালের মধ্যেই ইহার প্রভাব ইতালীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এ জয় ব্যক্তিবিশেষের জয় নহে, মতের জয়, সত্যের জয়। নীচকুলোদ্ভব, অজ্ঞাতনামা, কপর্দ্দকশূন্য, অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় কতিপয় মাত্র যুবাপুরুষ—যখন জনসাধারণের বিশ্বাসপাত্র ও অধিনেতা, সম্ভ্রান্ত, মান্য, গণ্য, পলিতশ্মশ্রু ব্যক্তিদিগের চিরলালিত মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান

হইয়াও, এত অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ এক প্রবল সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইলেন, যাহাকে দমন করিতে সপ্তরাজ্যকে বদ্ধপরিকর হইতে হইয়াছিল—তখন নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, তাঁহারা যে পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, তাহা সত্যের পতাকা।

যখন ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দ ইতালীয় জাতির অন্তরে জাতীয় সমর ও সাধারণতান্ত্রিক জীবনের ভাব উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন ফরাশিরাজ লুই ফিলিপ ও তদীয় সম্ভ্রান্তবর্গ ইতালীয় জাতির মনে বিপ্লব ও সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব উত্তেজিত করিতে অশেষ প্রয়াস পাইতেছিলেন।

মানবজাতির দুর্ভাগ্য যে, ফ্রান্সের উন্নতি স্থিতিশীল নহে। ফ্রান্সের অদৃষ্টচক্র নিয়তিপথে অনবরত অতিবেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই দেখিলাম ফ্রান্স জগতে স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক, সভ্যতামার্গের উপদেশক, মানবপ্রেমের প্রচারক, ; পর মুহূর্ত্তেই আবার দেখিলাম ফ্রান্স সে মোহিনী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। যে ফ্রান্স একদিন স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক ছিলেন, সে ফ্রান্স আজ যথেচ্ছাচারের আবাসভূমি, জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রতিকূল। যে ফ্রান্স একদিন সভ্যতামার্গের উপদেশক ছিলেন, সেই ফ্রান্স আজ বর্ব্বরজাতির ন্যায় সভ্যতার মূলমন্ত্র স্বরূপ স্বাধীনতা প্রচারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত, যে ফ্রান্স একদিন মানবপ্রেমের প্রচারক ছিলেন, সেই ফ্রান্স আজ মানবদ্বেষী। সেই ফ্রান্স আজ সর্ব্বপ্রকার সঞ্জীবন, সর্ব্বপ্রকার নব শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বদ্ধ-পরিকর।

ফ্রান্স উন্নতিশৈলের যে শিখর অবলম্বন করিয়া উঠিতেছিলেন, আমরা জানি তিনি তাহার উচ্চতম বিন্দুতে উঠিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার আর তাহার উপর উঠিবার শক্তি নাই। কিন্তু তাঁহারা উঠিতে পারিবেন না বলিয়া, যাহারা উন্নতিশৈলের অন্যান্য শিখর ধরিয়া তাহার উচ্চতম বিন্দুতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, নামিয়া তাহাদিগের গতিরোধ করিবার প্রয়োজন কি? ইতালীর নবীন অভ্যুত্থানের প্রতিকূলে তাঁহার দাঁড়াইবার প্রয়োজন কি ছিল? উন্নতিশৈলের উচ্চতর শিখরে অন্য কোন জাতি উঠিতেপারে, সে ত তাঁহারই গৌরব, তাহাতে ত তাঁহারই মুখ উজ্জ্বল; কারণ তিনি অতদূর উঠিয়াছিলেন বলিয়াই আর একজাতি তাঁহা অপেক্ষা উচ্চতর উঠিল। ফ্রান্স! আমরা তোমায় বড় ভাল বাসি, এই জন্য এ সংবাদে—তোমার এ নীচতায়—তোমার এ অবনতিতে—আমাদের হৃদয় ফাটিল।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট আসে ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের সন্তোষ বিধানার্থ ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা ম্যাট্‌সিনির প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ড প্রযুক্ত করিলেন। ম্যাট্‌সিনি মার্সেলিস্‌কে তাঁহার কার্য্যকেন্দ্র করিয়াছিলেন। নব্য ইতালী সমাজের সমস্ত পত্রাদি তথায় মুদ্রিত ও তথা হইতে প্রচা-

রিত হইত, এবং ইতালীর সমস্ত নগর গুলি মার্সেলিসের সঙ্গে যেন তারে তারে গাঁথা ছিল; এই জন্য ম্যাট্‌সিনি মার্সেলিস্ পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পার্য্যমাণে মন্ত্রিসভার আদেশ প্রতিপালন করা হইবে না, সুতরাং তিনি এরূপ ভাবে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন যাহাতে লোকে মনে করে যে তিনি ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন।

সেই সময় বৈদেশিক নির্ব্বাসিতগণ ইতালীর প্রদেশ সকলে (Departments) প্রতিষ্ঠাপিত হইতেন এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ করিয়া বৃত্তি পাইতেন। বৃত্তিভোগী বলিয়া তাঁহাদিগকে কতকগুলি বিশেষ বিধির অধীন হইতে হইত। ম্যাট্‌সিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই বৃত্তি লইতেন না, সুতরাং তিনি তাদৃশ বিশেষ বিধির অধীন ছিলেন না। এই জন্য তিনি পুলিশের প্রখর পর্য্যবেক্ষণ হইতে দূরে অবস্থিত ছিলেন। তিনি সাধারণতান্ত্রিকদিগের মুখযন্ত্রস্বরূপ ট্রিবিউন্ নামক পত্রিকার ১৮৩২ খৃ ২০ এ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় মন্ত্রিদলের বিরুদ্ধে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া এইরূপ একখানি প্রতিবাদ পত্র প্রচারিত করিলেন—

"যে রাজ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ও বিদেশবাসের প্রাকৃতিক প্রণালীয়া গর্হিত বিধি ও অধিকতর গর্হিত বিধিপ্রয়োগ দ্বারা উল্লঙ্ঘিত হয়; যে রাজ্যে অভিযোগ, বিচার ও দোষনির্ণয় একই প্রভুশক্তি হইতে প্রসূত হয় এবং আত্মদোষক্ষালনের কোন প্রকার সম্ভাবনা প্রদত্ত হয় না; যেখানে যথেচ্ছাচার ও অধীনতাস্বীকার ভিন্ন আর কিছুরই দৃষ্টান্ত নয়নগোচর হয় না;—সেস্থলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই, যাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও আত্মগৌরব জ্ঞান আছে, প্রকাশ্যে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য।

"এরূপ প্রতিবাদের উদ্দেশ্য বৃথা আত্মদোষক্ষালণ চেষ্টা নহে, অথবা যাঁহারা সেই অত্যাচারে প্রপীড়িত তাঁহাদিগের মনে সহানুভূতি উদ্রিক্ত করার অভিলাষে নহে। যে প্রভুশক্তি আত্মবলের অপব্যবহার করিয়াছে তাহার দুর্ণাম ঘোষণা করা; যে রাজ্যে তাদৃশ ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অপরাধ সকল একটী একটী করিয়া লোকের নয়নসমক্ষে ধারণ করা; তাদৃশ প্রভুশক্তি যে জনসাধারণের বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে, তাহাদিগকে যে অবমানিত ও পদদলিত করিয়াছে, তাহার অসংখ্য প্রমাণের সহিত আর একটী প্রমাণের যোগ সাধন করার ঐকান্তিক আবশ্যকতার উপলব্ধি হইতেই এরূপ প্রতিবাদের উৎপত্তি।

"এই জন্যই আমি প্রতিবাদ করিতেছি।

"ফরাশি মন্ত্রিসভা আমার নিকট যে অনুজ্ঞা পত্র পাঠাইয়াছেন, দেখিলাম সংবাদ-পত্র সকলে তাহা, এবং যে সকল

কারণ হইতে তাদৃশ অনুজ্ঞা পত্র উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাও প্রচারিত হইয়াছে।

"দেখিলাম স্বদেশের উদ্ধারসাধনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা এবং পত্র ও পত্রিকাদির প্রচার দ্বারা ইতালীয়দিগকে সেই লক্ষ্যে উদ্দীপিত করার অপরাধ আমার প্রতি আরোপিত করা হইয়াছে।

"আমার স্কন্ধে দ্বিতীয় অপরাধ এই সন্ন্যস্ত হইয়াছে যে আমি—একজন কপর্দ্দক-শূন্য ও বন্ধুবান্ধব-বিরহিত মার্সেলিসের অস্থায়ী বৈদেশিক অধিবাসী—আমি পারিসের সাধারণতান্ত্রিক সভার সভ্য-দিগের সহিত চিটিপত্র লেখালিখি করি, এবং সেণ্ট্ মেরী ক্লইষ্টারের বীরগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে পত্রাপত্র লিখি।

"আমি প্রথম অভিযোগের দায়িত্ব মস্তকে লইতে নিশ্চয়ই ভীত হইব না। যদি মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে স্বদেশে অপরিহার্য্য স্বত্বের প্রচার করার চেষ্টা ষড়যন্ত্র হয়, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি-তেছি যে আমি ষড়যন্ত্রী। দাসত্বে সুখে নিদ্রা যাওয়া অপেক্ষা, দাসত্বের বিরুদ্ধে সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ—স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে এই সত্যে উদ্দীপিত করার উদ্যম যদি ষড়যন্ত্র হয়, তাহা হইলে আমি শতবার ষড়যন্ত্রী। স্থির ও দৃঢ়ভাবে সেই সময়ের অপেক্ষা করিয়া থাক, যে সময়ের সুবিধা লইলে একটী জাতি ও একটী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সংস্থা-পন করিতে পারিবে—যদি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রয়াস ষড়যন্ত্র হয়, তাহা হইলে আমি সহস্রবার ষড়যন্ত্রী।

"মানব ভ্রাতার গৌরব রক্ষা ও উদ্ধার সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে গবর্ণমেণ্ট আপনাকে উদার বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহার তাদৃশ পবিত্র চরিত্র ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তির প্রতি অপরাধীর ন্যায় ব্যবহার করার কোনও অধিকার নাই। নিতান্ত যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্ট না হইলে আর এ মতের অবমাননা করিবে না।

"দেখিলাম মন্ত্রিসভার কার্য্য-বিবরণে পুলিশ কর্ত্তৃক অপহৃত কতিপয় পত্র হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে; তাঁহারা বলেন যে সেই পত্রগুলি আমি দেশের অভ্যন্তরিত কতিপয় বন্ধুকে লিখিয়াছিলাম।

"মন্ত্রিসভা বলেন 'যে সেই সকল পত্রে ৫ই ও ৬ই জুনের অভ্যুত্থান-ব্যাপা-রের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাতে এরূপ লিখিত আছে যে 'এই অভ্যুত্থানে ফরাসী সাধারণতান্ত্রিক দলের কোন ও ক্ষতি হয় নাই; ফরাশি দেশহিতৈষিগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত প্রতিশ্রুতি অনুরূপ প্রদেশ সকল হইতে পারিসে উপস্থিত না হওয়াই এই অভ্যুত্থানের পতনের কারণ; আর একটী অভ্যুত্থানের উপাদান-সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে, তাহাও অদূরে অনুষ্ঠিত হইবে; এইরূপে চতুর্দ্দিক্ হইতে লুই ফিলিপের সিংহাসনের অন্তর্ভেদ

করা হইয়াছে; এবং অবশেষে, করাসী সাধারণতান্ত্রিক সভা হইতে ইতালীয় বৈপ্লবিকদিগের সহকারিতার জন্য পাঁচ ছয় জন দূত প্রেরিত হইবে' ইত্যাদি।

"এই চিটিগুলি কোথায়? পারিসে? ফরাশি গবর্ণমেণ্ট কি সেগুলি নিজে ধৃত করিয়াছিলেন? সে পত্রগুলির নকল কি অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কখন প্রেরিত হইয়াছিগ? আমার চরিত্রে, আমার কার্য্যে, এবং আমার চিটিপত্রে কি পূর্ব্বে কখন এমন কিছু দৃষ্ট হইয়াছে, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত চিটিগুলি আমা কর্তৃকই লিখিত হইয়াছে এই প্রস্তাবনার সমর্থন হইতে পারে?

"না!—সেই চিটিগুলি হইতে যে সকল ভাগ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে সার্ডিনীয় পুলিশেরই মহিমা; মূল পত্রগুলি তাহাদিগেরই হস্তে রহিয়াছে। ফরাশি মন্ত্রিসভা প্রেরিত পত্রাংশ হইতেই পংক্তি সকল উদ্ধৃত করিতেছেন; সেই পত্রাংশ যে মূল পত্রের প্রকৃত অংশ তাহা তাঁহারা সার্ডিনীয় পুলিশের কথাতেই বিশ্বাস করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের কথা যে বিশ্বাসযোগ্য তাহার প্রমাণ কি? ফরাশি পুলিশ কি ফরাশি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমার ষড়যন্ত্র করার কোন প্রমাণ পাইয়াছেন? ফরাশি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিপ্লব খ্যাপন বা অভ্যুত্থান করার অপরাধে কখন কি আমি ধৃত বা দণ্ডিত হইয়াছি?

"যখন এরূপ অবস্থা, তখন আমি কি উপায় অবলম্বন করি?

"কোন বিশেষ ও নির্দ্দিষ্ট অভিযোগের অসত্যতা প্রমাণ করা সম্ভবপর। কিন্তু যে অভিযোগ অনির্দ্দিষ্ট ও সাধারণ, এবং সমস্ত জীবনের চিন্তা ও কার্য্যের উপর সন্ন্যস্ত, সে অভিযোগের অসত্যতা প্রমাণ করা অসম্ভব। যে অভিযোগের স্বাপক্ষ্যে কোন প্রকার প্রমাণ প্রদত্ত না হয়, সে অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মসমর্থন করা সম্ভব নহে।

"আমি চাহিয়াছিলাম যে মন্ত্রিসভার সমস্ত চিটিপত্র গুলি যেন আমার নিকট প্রেরিত হয়, কিন্তু আমার সে প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় নাই। সুতরাং সে সকল অপরাধ অস্বীকার করা ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর নাই, এই জন্য আমি তাহাই করিলাম। আমার কোনও পত্রে মুদ্রিত পংক্তি সকলের অস্তিত্ব আমি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলাম।

"১লা আগষ্ট আমি মন্ত্রিবরকে যে পত্র লিখি, তাহাতেই সেই অস্বীকার ব্যক্ত থাকে। আমি মদীয় পত্রে উদ্ধৃত পংক্তি সকলের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি; এবং সাহস করিয়া বলিতেছি যে ফরাশি ও সার্ডিনীয় পুলিশ কখনই ইহা প্রমাণ করিতে পারিবে না। আমি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুসন্ধান প্রার্থনা করি। আমি বিধি অনুসারে বিচার ও দণ্ডের প্রার্থী হইতেছি।

"কিন্তু মন্ত্রিবর আমার সে পত্র উত্তরযোগ্য মনে করিলেন না। মার্সেলিসের প্রিফেক্ট—যিনি আমাকে মন্ত্রিবরের প্রত্যু-

ন্তরের অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন—আমাকে সহসা মার্সেলিস্ পরিত্যাগ করিতে দ্বিতীয় আদেশ প্রদান করিলেন; আমি অগত্যা তাহাতে স্বীকৃত হইলাম।

"প্রকৃত ঘটনা যাহা তাহা বলিলাম।

"প্রভুশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি তোমরা কি আশা কর? তোমাদিগের কপটাচারী পবিত্র সম্মিলনের (Holy alliance) নিকট লজ্জাকর অধীনতা স্বীকার করিয়া, আমরা কি স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিব? অথবা তোমাদিগের অশ্রান্ত নির্যাতনে হতাশ ও ক্লান্ত হইয়া, অভ্যুদয়ে উঠিয়া তোমরা যে স্বাধীনতার বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছ, সেই পবিত্র স্বাধীনতার ভাব কি আমরা হৃদয় হইতে বিদূরিত করিব? তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, তোমরা এক্ষণে যে অবনতিব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তোমাদিগের যথেচ্ছাচারী কার্য্য-পরম্পরায় সে ব্রতের উদ্যাপন হইবে? অথবা তোমরা কি বিশ্বাস করিয়াছ যে, যে আমাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে, তোমরা সেই আমাদিগের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বীজ বপন করিয়া আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিবে? অথবা যে ফ্রান্স জগতে স্বাধীনতা স্থাপিকারূপ ব্রত গ্রহণ করিয়া আপনিই তাহাতে ভঙ্গ দিয়াছেন, বৈদেশিক স্বজাতিপ্রেমিক ব্যক্তিগণের অন্তরে সেই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রতিঘাত ভাব উদ্দীপিত করাই কি তোমাদিগের অভিপ্রায়?

"অথবা তোমরা কি জঘন্য কাপুরুষতার বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ আশা কর যে, যাহাদিগকে তোমরা বিপৎসাগরের কূলে আনয়ন করিয়া বিপদের সময় ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছ—সুতরাং যাহারা ফ্রান্সে বর্ত্তমান থাকিতে তোমাদিগের গভীর অনুতাপ ও প্রখর আত্মগ্লানির মুহূর্ত্তমাত্র বিরাম নাই—সেই আমাদিগকে ফরাশিভূমি হইতে বিদূরিত করিয়া, তোমাদিগের ললাটাঙ্কিত কলঙ্করেখা অপনীত করিবে? বৃথা প্রয়াস। সে কলঙ্করেখা—সে অপযশকালিমা—আটলাণ্টিক সাগরের জলরাশিতেও বিধৌত হইবার নহে। তোমাদিগের রাজত্বের প্রতিদিনে, নির্ব্বাসিতের প্রতি অভিসম্পাতে, প্রতি ক্রন্দনরবে—সে কলঙ্করেখা গভীরতর ও সে কালিমা গাঢ়তর হইতেছে।

"কর তোমরা! কর যতপার! তোমরা আমাদিগের নিকট হইতে প্রিয় স্বাধীনতা, ততোধিক প্রিয়তর জন্মভূমি, এবং জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী কপর্দ্দকপর্য্যন্তও কাড়িয়া লইয়াছ; এক্ষণে আমাদিগের নিকট হইতে আর কি লইবে? প্রাকৃতিক স্বত্বজাতের মধ্যে একমাত্র বাক্‌শক্তির স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছা হয় তাহাও হরণ কর; গন্ধবহ ইতালীক্ষেত্র হইতে গন্ধ আনিয়া আমাদিগের নাসারন্ধ্রে যোগাইতেছে, যদি পার তাহাও হরণ কর; আর নির্ব্বাসিত ইতালীয়ের একমাত্র সান্ত্বনা—সুদূর সুনীল সাগরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে বলা, ঐ পুণ্যভূমি

ইতালী দেখা যাইতেছে—যদি ইচ্ছা হয় তাহাদিগকে সে সান্ত্বনা হইতেও বঞ্চিত কর। আবার বলি, কর তোমরা যত পার! ধ্বংসের পথে অবমাননার পথে—এইরূপে দিন দিন অগ্রসর হও। তোমরা যে বিকট নগ্নাবস্থায় জনসাধারণের সমক্ষে তোমাদিগের অদৃষ্টপূর্ব্ব নীচতা ও প্রতারণা অবতারিত করিতেছ, জানিও তাহা জনসাধারণের মঙ্গল ও উদ্ধারের অনুকূলেই। তোমরা যে তোমাদিগের আত্মকার্য্য দ্বারাই প্রতিপন্ন করিতেছ যে রাজগণের মঙ্গলের সহিত জনসাধারণের মঙ্গলের সামঞ্জস্য অসম্ভব, ইহা সেই পবিত্র সত্যেরই জয়ের অনুকূলে।

"কিন্তু যখন তোমাদিগের পাপ পরিমাণ পূর্ণ হইবে, যখন জনসাধারণের বিজয়ভেরী স্বাধীনতার রাজ্য উদ্‌ঘোষিত করিবে, যখন ফ্রান্স এক বাক্যে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে—এতদিন তোমাদিগের হস্তে যে প্রভুশক্তি ন্যস্ত ছিল, তোমরা তাহার কি ব্যবহার করিলে ?—তখনই তোমাদিগের আর দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না—জানিও তখন রাজা প্রজা সকলেই তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে।

"তোমরা তোমাদিগের কৃতবিশ্বাস নিরুপায় মাতৃভূমিকে যথেচ্ছাচারী রাজবৃন্দের প্রতারণাজালে আবদ্ধ করিয়াছ। তোমরা তাঁহার মস্তকে অপমানের বোঝা অর্পণ করিয়াছ। তোমরা বিশ্বজনীন সম্মিলনের পরিষ্কৃত পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছ। তোমরা 'পবিত্র সম্মিলনের' করাল কবলে জনসাধারণের স্বাধীনতা-রত্ন নিক্ষেপ করিয়াছ। বিগত জুলাইএর অভ্যুত্থান—স্বাধীনতা-পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের অন্তরে যে পবিত্র ভ্রাতৃভাব উদ্দীপিত করিয়াছিল, তোমরা তাহার গতি প্রতিহত করিয়াছ; মানুষের মনকে তোমরা বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছ; সাধুদিগেরও হৃদয়কে তোমরা অবিশ্বাস-তিমিরে আচ্ছন্ন করিয়াছ।

"কিন্তু যখন তোমাদিগের কূট রাজনীতি ও বিশ্বাসঘাতক রচনাবলীর বলিগণ কঙ্কালাবশিষ্ট ভূতগণের ন্যায় তোমাদিগের নিকট আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করে, তখন তোমরা তাহাদিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দাও; তখন তোমরা আতিথ্য ও দারিদ্র্যের অলঙ্ঘ্য স্বত্ব তোমাদিগের বিধিগ্রন্থ হইতে একবারে উঠাইয়া দাও।

"কিন্তু তোমরা যাহাই করনা কেন কিছুতেই আমাদিগের মনকে বিচলিত করিতে পারিবে না। আমরা ভাবী বিপ্লবের কতিপয় অগ্রদূত, সংখ্যায় স্বল্পমাত্র, দারিদ্র্য ও বিপৎপরম্পরার পবিত্রবন্ধনে দৃঢ়সম্বদ্ধ—আমরা যে দিন হইতে উৎপীড়িতদিগের উদ্ধার সাধনব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছি, সেই দিনই জীবনের সমস্ত সুখও সমস্ত আনন্দে জলাঞ্জলি দিয়াছি। অনিষ্টকারী বিপক্ষের সন্দেহ ও প্রচণ্ডক্রোধে আমাদিগের হৃদয়

কলুষিত হইবার নহে। যে দল জনসাধারণের অনুমতি না লইয়া স্বহস্তে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন, সে দলের সহিত জনসাধারণের কোনও সহানুভূতি হইতে পারে না। আমরা জনসাধারণের সহিত সমান কষ্ট পাইতেছি, সুতরাং জনসাধারণের সহিত আমাদিগের পূর্ণ সহানুভূতি। আমরা সেই জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের দল পরিপুষ্ট করিব এবং যাহাতে যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তি তাহার ছায়া ও স্পর্শ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব। এমন দিন অবশ্যই আসিবে যে দিনে সকলেরই কার্য্য কলাপ ন্যায়ের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে পরিমাপিত হইবে।

জোসেফ্ ম্যাট্সিনি"

জাতীয়তা।

মানুষের জাতীয়তা ভাবোৎপত্তির দুইটি মাত্র প্রকার ভেদ দেখা যায়। একটি, বিভিন্ন স্থানের স্থানীয় বাহ্যশক্তির বৈচিত্র প্রভাবে মানব-শরীর ও প্রকৃতির যে বিভিন্ন বিচিত্র ভাব—তাহা হইতে গণ্য; অপরটি মানবের ব্যবহারিক কার্য্য সম্পাদন সৌকর্য্যার্থে যে বিভিন্ন সংযোগ বা একতা সম্বন্ধ—তাহা হইতে গণ্য হইয়া থাকে। আমরা প্রথমোক্ত কারণটিকে 'প্রাকৃতিক' ও শেষোক্ত কারণটিকে 'ব্যবহারিক' সংজ্ঞা প্রদান করিলাম। জাতীয়তা উৎপত্তির এই দুইটি প্রাকৃতিক ও ব্যবহারিক কারণের অভ্যন্তর বহুবিধ সমবায়ী কারণে বিচলিত। প্রাকৃতিক কারণ, স্থানীয় শীত, গ্রীষ্ম, উর্ব্বর, অনুর্ব্বর, নৈসর্গিক দৃশ্যের প্রাচুর্য্য, স্বাল্পির্য্য, বিরলত্ব প্রভৃতির তারতম্যে বিচলিত হইয়া থাকে। ইহাদের বিবিধ বৈচিত্রের আয়ত্ত্যাধীন মানবের শারীর ও মানসিক প্রকৃতির যে বিভিন্ন ভাব তাহা হইতে মানব এক একটি জাতিরূপে গণ্য। এতদনুসারে ককেসিয়, মোঙ্গলিয়, ইথিয়োপিও প্রভৃতি তিন হইতে এগার পর্য্যন্ত জাতিবিশেষ—পণ্ডিত বিশেষের মতে গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল জাতি গণনা কেবল মাত্র স্থান বিশেষ নিবাসে মানবের শরীর, গঠন ও বর্ণের প্রভেদানুসারে গণ্য হইয়া আসিতেছে, স্থানীয় নৈসর্গিক শক্তি ও দৃশ্যের প্রভাবে মানসিক প্রকৃতির প্রভেদানুসারে জাতি গণনা অদ্যাপি সূক্ষ্মরূপে কিছুই দাঁড়ায় নাই। তাহা দাঁড়াইলে হয়ত আমরা সমস্ত পৃথিবীর মানবমণ্ডলীকে, শরীর, গঠন ও বর্ণের বিভিন্নতা পরিত্যাগ করিয়া, প্রধানতঃ তিন জাতি

বলিয়া উল্লেখ করিলাম। পৃথিবীর যে যে স্থলে শীতের অত্যাধিক্য বা গ্রীষ্মের অত্যাধিক্য, এবং ভূমি অনুর্ব্বরা, নৈসর্গিক দৃশ্য বৈচিত্র্য-বিহীন, এবম্বিধ স্থান-নিবাসী মানববৃন্দ প্রায়ই সর্ব্বত্রই সমপ্রকৃতি। তাহারা দরিদ্র এবং দরিদ্র হেতুক নিষ্ঠুরাচারী; হিংসা দ্বেষাদির বশবর্ত্তী; প্রবঞ্চনা, শঠতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি যাবদীয় অনৈতিক কার্য্যের দাস। উদরান্নের সংস্থান হেতুক শীকারাদি দুঃসাহসিক কার্য্যে সতত ব্যাপৃত থাকায় তাহারা, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, সবল ও সাহসিক; এবং নৈসর্গিক শোভার বৈচিত্র্য অভাবে, তাহাদের কল্পনা ও বুদ্ধিশক্তি স্ফূর্ত্তিবিহীন। এবম্বিধ স্থানীয় জাতিরাই বর্ব্বর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যত কাল না ইহাদের অপর কোন সভ্য জাতির সহিত সংমিশ্রণ হয় ততদিন যাবৎ উহারা প্রায় একই ভাবাপন্ন থাকে। আমি এই স্থলে বকল সাহেবের অনুমোদিত মতের আশ্রয় লইলাম। আফ্রিকার মধ্য ও দক্ষিণ বিভাগের মানব সমূহ; মধ্য আসিয়ায় তিব্বত, তাতার, প্রভৃতি অনেক দেশবাসী মানব সমূহ; কেন্দ্র-সন্নিহিত তীব্র শীত স্থলের যাবতীয় মানব, এইরূপ প্রকৃতির। সুতরাং ইহাদিগকে সমগ্র মানবমণ্ডলীর উন্নতি বা শ্রীর হিসাবে ধরিতে গেলে সর্ব্ব নিম্ন সোপানের শ্রেণী বা জাতি বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। এই শ্রেণীর মানবেরা শীতোত্তাপের সমতা, ভূমির উর্ব্বরতা ও নৈসর্গিক শোভা এই তিন প্রকার সুবিধার কোন প্রকারেরই প্রাচুর্য্য উপভোগ করিতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতি বা মানব-মণ্ডলী উক্ত ত্রিবিধ সৌকর্য্যের আংশিক বা কোনটির পূর্ণ কোনটির অপূর্ণভাব মাত্র উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আত্ম-চেষ্টার উন্নতি সেই পরিমাণ আংশিক মাত্র হইয়া অবস্থিতি করে। পরে অপরদিকের কোন প্রকার উন্নতি বা সৌভাগ্যের দৃষ্টান্ত পাইবা মাত্র অমনি দুর্দ্দম্য অধ্যবসায়ে আত্ম-অবস্থা-উন্নতির প্রতি সকল ব্যাঘাতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। কারণ ইহাদের আংশিক সৌভাগ্যের আস্বাদনে পূর্ণ সৌভাগ্যের লালসা অতীব বলবতী হইয়া উঠে। তখন সামান্য উর্ব্বর ভূমির প্রতি উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধির যাহাকিছু উপায় অবলম্বিত হয়, তাহাতেও অভিলষিত সৌভাগ্য আয়ত্ত না হইলে দূরগত দেশে বাণিজ্যের আয়োজন, বিভিন্ন প্রকার শিল্পের চেষ্টা, দেশীয় ফল ফুলে ও সুদৃশ্য তরুলতায় রচিত মনোহর উদ্যান সকল নির্ম্মিত হইতে থাকে। তখন বুদ্ধি তত্ত্বানুসন্ধায়ী ও মন কল্পনা-পূর্ণ হইতে থাকে।

ইউরোপের অধিকাংশ দেশবাসীরাই প্রায় এইরূপ অবস্থার অন্তর্গত। ইহাঁদেরই আজ কাল নব অভ্যুত্থান, নব উৎসাহে ইহাঁরা জ্ঞান ও সৌভাগ্যকে আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে প্রকৃতিগত বিভিন্নতা বিস্তর। যে দেশবাসী-

দিগের সৌভাগ্য অধিকাংশ বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের প্রকৃতি বাণিজ্যকার্য্যোচিত—মুখে আপ্যায়িত-পূর্ণ, অন্তরে শোষণ-লালসার কূটজাল, হৃদয় সংকীর্ণ,বদান্যতা—কষ্টকর, মৃদু ও নিস্তেজ, দুর্দ্দম্য লোভহেতু লাঞ্ছনা-সহিষ্ণু—কঠোর-অধ্যবসায়শালী। এরূপ প্রকৃতির মানব সর্ব্বত্র প্রবেশক, সর্ব্বত্র কার্য্যোদ্ধারের স্থান লাভে পটু, এবং কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত নীচতা ও লাঘব স্বীকারেও অসঙ্কুচিত। এরূপ জাতির সুন্দর দৃষ্টান্ত-স্থল ইহুদী। ইংরাজ প্রভৃতির দাস ইহুদী জাতি পৃথিবীর প্রায় সকল স্থলেই প্রবেশ করিয়াছে, এবং এককালে ইহারা দরিদ্র ইউরোপকে ঋণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া, তাহাদের কিরূপ ঘৃণিত দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল। ইংরাজ প্রকৃতির কথা আমরা অধিক কিছুই বলিব না, তাঁহারাও ধন-লালসায় প্রায় পৃথিবীর বহুতর দেশে প্রবেশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষ আগমনের নূতনপথ আবিষ্কারের নিমিত্ত তাঁহাদের কঠোর অধ্যবসায়, ভারতবর্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার পর যে সকল উপায়দ্বারা তাঁহারা বহুতর রাজদরবারে প্রবেশ ও ক্রমে ভারতের একাধিপত্য লাভ করেন, তাহার বিস্তীর্ণ কার্য্যকলাপের অংশ যাহা কিছু ইতিহাসে প্রকাশ আছে তাহাতেই তাঁহাদিগের প্রকৃতিগত গুণের পরিচয় সকলেই প্রাপ্ত হইতে পারেন। যাহা হউক, এরূপ প্রকৃতির মানবেরা একবার প্রভূত সৌভাগ্যের অধিপতি হইয়া পড়িলে, তখন সৌভাগ্যের অনুগামী যে সকল মহৎ গুণ উহা ও কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদিগের প্রকৃতিগত দোষের আধিক্য অপনোদন হয় না। পক্ষান্তরে যে সকল দেশবাসী লোকেরা বাণিজ্যের উপর তত নির্ভর না করিয়া কৃষির প্রাবল্যে সৌভাগ্য আয়ত্ত করিয়াছেন তাঁহাদের প্রকৃতি উহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ক্ষেত্রের কর্ষণে স্বদেশের প্রতি আস্থা, শস্যের পালনে এবং নিত্য তাহাদের বর্দ্ধিষ্ণু শোভা সন্দর্শনে স্নেহ মমতা প্রভৃতি হৃদ্‌বৃত্তি সকলের প্রশস্তি এবং গৃহের আহারীয় সামগ্রীর প্রাচুর্য্যে অতিথি-পরায়ণ বদান্যতার আবির্ভাব তাঁহাদের হৃদয়ে হইয়া থাকে। এরূপ জাতির দৃষ্টান্ত স্থল—ইউরোপে ফরাসী, জর্ম্মন প্রভৃতিরা এবং আমেরিকায় উহার অধিকাংশ নবাধিবাসীগণ। আমেরিকার মেক্‌সিকো প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য অধিবাসীগণের প্রকৃতির কথা আমরা বিশেষ কিছুই বলিতে পারি না, যেহেতু ইউরোপীয়গণের সহিত উহাঁদের প্রথম সাক্ষাতের পর হইতেই উহাঁদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ক্রমে সেই অবস্থার চরম নীচতায় দাঁড়াইয়াছে। তবে মানব-প্রকৃতির উপর স্থানীয় শক্তির প্রাদুর্ভাব দেখাইতে হইলে আমরা ইহা দেখাইতে পারি যে, যে ব্রিটনবাসীদিগের প্রকৃতি ব্রিটন ক্ষেত্রে একরূপ, উহা আমেরিকার ক্ষেত্রে পরিচালিত হইয়া

বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ব্রিটন তাঁহাদের অধিকৃত দেশ সমূহের দাসত্ব-শৃঙ্খল ক্রমে দৃঢ় ও দৃঢ়তর করিতে নিয়ত যত্নবান্, তথাকার অধিবাসীদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য, বিবিধ-বিষয়ক স্বাধীন প্রবৃত্তি ও মনুষ্যত্বের চিহ্ন যাহা কিছু লোপ করিয়া তাহাদিগকে নির্জ্জীব কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিজের ইচ্ছার ক্রীড়া-পদার্থ করিয়াছেন। মহা মহাপ্রদেশের কোটি, কোটি নিস্তেজ নির্জ্জীব মানব সমূহকে দুর্দ্দশায় ধুলি-অবলুণ্ঠিত দেখিয়া শ্মশানের সুখদৃশ্যে পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছেন। ওঃ! এরূপ জাতির ব্যাপক নিষ্ঠুরতা ও ক্রূর প্রবৃত্তির আয়তন কে পরিমাণ বা অনুভব করিতে সমর্থ? ঘোর বর্ব্বর জাতির নিষ্ঠুরতা ইহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বা কিছুই নয়। আবার দেখ, সেই ব্রিটন প্রকৃতি আমেরিকার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া, মাতৃভূমির হাত হইতে নিজের স্বাধীনতা উদ্ধার করিয়া এক্ষণে জগৎস্থ যাবতীয় দাস জাতির দুঃখে দুঃখী। ইহাঁদের আভ্যন্তরীণ কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলেও উদারতা ও মহত্ত্বের প্রশস্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রকার মত-বিভিন্নতা এখানে অবিদ্বেষে কার্য্যে পরিচালিত হইতেছে, ইহা উদারতার মহৎ পরিচয়। আবার যে কোনজাতীয় প্রপীড়িত ব্যক্তি উহাঁদের আশ্রিত হইলে উহাঁরা তাহার সহিত আত্ম-সৌভাগ্য ও জাতীয়তার সমভোগী হইতে প্রস্তুত, ইহা উহাঁদিগের মহত্ত্বের মহৎ দৃষ্টান্ত। এই সকল বিষয়ের বাহুল্য আলোচনা আমাদের এ প্রস্তাবের প্রয়োজনীয় নহে। আমরা এক্ষণে প্রাকৃতিক জাতীয়তার তৃতীয় পদবীর বিষয় আলোচনা করিব।

এই পদবীর মানবমণ্ডলী, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত শীত গ্রীষ্মের সামঞ্জস্য, ভূমির উর্ব্বরত্ব ও নৈসর্গিক শোভার প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য উপভোগ করিতেছেন। এমত স্থলের মানব হৃদয়েই প্রথমে আদর্শগুণের বীজ সমস্ত অঙ্কুরিত হয়, এবং তাহারই বর্দ্ধিত বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বর্ত্তমান পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান। দুর্দ্দম্য শীত গ্রীষ্মের তেজে যাঁহাদের অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত বা ম্রিয়মাণ নয়, কিন্তু উহার সুমন্দ ভাবে মন বহির্মুক্ত ও স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট, প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রাচুর্য্যের সহিত মন উদার ও মহৎ, সৌন্দর্য্যের বিচিত্র বিকাশে মন কল্পনা-পূর্ণ ও সুখী; এমন ক্ষেত্রের মানব-প্রকৃতি স্বাভাবিক উন্নতির উপযোগিতা আর কি আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল প্রাচীন ভারত, প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন ইতালী প্রভৃতি। কিন্তু এই সকল স্থানীয় মানব প্রকৃতির সে দশা আর নাই; নাই তাহার কারণ আছে। সে কারণ, আমরা যে কারণের কথা কহিতেছি তাহারই অন্য রূপ মাত্র। অবস্থার পরিবর্ত্তনে ঐ সকল সুভগ মানব-মণ্ডলীর পূর্ব্বদশা অন্তর্হিত হইয়াছে। আবাস ভূমির পরিবর্ত্তন না হইলেও উক্ত আবাস স্থলেই তাঁহাদিগকে অসমপ্রকৃতি বৈদেশিক

ব্যক্তিগণের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। এবং কালে সেই বৈদেশিক শক্তি তাঁহাদের অদৃষ্টের নেতা হইলে, তাঁহাদের স্বকীয় স্বাভাবিক স্রোত নিবৃত্ত হইয়া তাঁহারা অপর নূতন স্রোতের ভাসমান জঞ্জাল হইয়া পড়িলেন। সেই দিন হইতে তাঁহাদের জাতীয়তা গেল; নব জাতীয় মানব তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাঁহারা তখন হইতে সেই নিজ ক্ষেত্রেই অপর জাতীয়-প্রকৃতির পরিবর্দ্ধনের অসার গলিত ভূমি-সার হইতে চলিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে গ্রীস ও ইতালী, উপযুক্ত সময়ে আপনার সর্ব্বনাশী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভের দৃঢ় ব্রত করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কালে ইহাঁরা আবার আপন লাঘব পূরণ করিয়া শীঘ্রই উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। ভারতের অদৃষ্টে কি আছে কে বলিতে পারে? শতাব্দীর উপর শতাব্দী চলিয়া-গেল, তবু ভারতের সেই একই দশা! ভারত এখন এমন নিকৃষ্ট অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, যে ভারতের আর হৃদয় নাই। যে ভারতের উচ্ছ্বসিত হৃদয় একদিন উদ্বেল তরঙ্গায়িত সাগরের ন্যায় প্রতীয়-মান হইত, আজি উহা মরুভূমি! ভারতের হৃদয় নাই বলিয়াই ভারত আত্ম-অবস্থার উদ্ধার করিতে পারিতেছে না। যাহার হৃদয় নাই তাহার শক্তি নাই, তাহার সাহস নাই। হৃদয়ই শক্তি ও সাহস; যাঁহারা বলেন ক্রমিক নিষ্ঠুরাচারে সাহস বৃদ্ধি হয়, তাঁহারা ইহার বিশেষ তত্ত্ব অনুধাবন করেন না, নিষ্ঠুরাচারী বর্ব্বর ব্যক্তি আত্ম-বিপদে সর্ব্বদা অন্ধ, এই অন্ধতাই তাহা-দিগের সাহস; যে মাত্র তাহাদিগকে তাহা-দের বিপদের ভাব অনুভব করাইতে পারা যায়, সেই মাত্রই তাহাদের সর্ব্বসাহস অন্তর্হিত হইয়া, ঘোর ভীরুতায় ললাট আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু হৃদয়-বিশিষ্ট ব্যক্তি আপনার বিপদ জানিয়াও আত্মত্যাগ করিতে সক্ষম; মাতা পুত্রের বিপদ্ দেখিলে জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিতে পারেন, দুরারোহ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করিতে পারেন। অতএব হৃদয়-বিশিষ্ট ব্যক্তির তুল্য প্রকৃত সাহসী ও শক্তিবান্ কেহই নাই। তাই আমরা বলিতেছি ভারতে হৃদয় নাই, সেই হেতু ভারতের শক্তি ও সাহস নাই। ভারত নিজ সমগ্র বংশের বিনাশ সমুপস্থিত দেখিয়া আত্ম-নাশের ভয়ে কাতর ও কম্পিত; সবংশের প্রতি ভারতের মাতৃস্নেহ কই? ভারত ক্রমে পিশাচী-মূর্ত্তি নির্ম্মম-হৃদয় হইতে চলিতেছে। ভারতের অবস্থা-পরিবর্ত্তন যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কেবল ভারতের হৃদয় জাগরুক করণের চেষ্টা করুন, তাহা হইলে জ্বলন্ত অনলও তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। এই কার্য্য কেবল ভারতের কবিকুলের হস্তেই ন্যস্ত রহি-য়াছে। ভারতে মুসলমান প্রবেশের পর ক্ষণ হইতেই তাহার প্রাচীন জাতীয়-ভাব লোপ হয়; কিন্তু মুসলমানেরা ক্রমে

ভারতে অধিবাস করিলে, এবং জেতৃ বিজেতৃভাব ভুলিয়া গিয়া ভারতবাসীগণের সহিত সমস্বত্বে ভারত উপভোগে নিযুক্ত হইলে সেই দিন হইতে হিন্দু মুসলমান লইয়া ভারতে এক নব জাতীয়তার উৎপত্তি হয়। আভ্যন্তরীণ বহুবিধ গোলযোগ লোপ পাইয়া কালে এই জাতীয়তার শ্রীবৃদ্ধি হইবার উপক্রম হইতেছিল, এমন সময়ে ইউরোপীয় শক্তি ইহার উপরে পতিত হইল এবং ইহার অদৃষ্টের নেতা হইল, সুতরাং সে জাতীয়তারও লয় হইয়া গেল। ইংরাজেরা এদেশের অধিবাসী নহেন, সুতরাং তাঁহাদের লইয়া অপর নূতন জাতীয়তার সূত্রপাত সম্ভবপর নহে। তবে তাঁহারা আমাদের জাতীয়তার স্বাভাবিক বর্দ্ধনের স্রোত গুলির প্রতি যদি প্রতিবন্ধক না হয়েন; এবং নিস্বার্থপর হইয়া ক্রমে যদি আমাদিগকে প্রকৃত একটি বিশিষ্ট জাতীয় ভাব প্রদানার্থ ইহা হইতে অপসৃত হন, তাহা হইলে তাঁহারা জগতে অতুল্য কীর্ত্তিলাভ করিতে পারিবেন এবং চিরকাল আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেন। আমরা মূল প্রস্তাবের শাখা অবলম্বনে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি।

আমরা যে এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিক জাতীয়তার কথা বলিলাম হয়ত ইহার তাৎপর্য্য আশু কেহই অনুধাবন করিবেন না, কিন্তু আমাদিগের নিশ্চয় বোধ হয় যে বর্ত্তমান কালে যত প্রকার জাতীয়তার কারণ বর্ত্তমান আছে, সমস্ত লোপ হইয়া একমাত্র এই প্রাকৃতিক কারণে লয় পাইবে, এবং ত্রিবিধ প্রাকৃতিক কারণও এক কারণে পরিণত হইবে। আমরা ইহার আভাস প্রস্তাবের উপসংহার কালে কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ করিব। আপাততঃ আমরা ব্যবহারিক কারণের বিষয় কিছু বলিতেছি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কার্য্য-সাধন-সৌকার্য্যার্থে মানুষের সহিত মানুষের যে বিভিন্ন সংযোগ বা একতা তাহাই ব্যবহারিক জাতীয়তার কারণ। ইহার আভ্যন্তরীণ কারণ, প্রতিবাসিত্ব, ভাষা, ধর্ম্ম প্রভৃতি। প্রতিবাসীর প্রতি প্রতিবাসীর আনুগত্য ও আলাপ পরিচয়ে এক প্রকার সহানুভূতি ও বিশ্বাস জন্মে, এই সহানুভূতি ও বিশ্বাস বলে সর্ব্বপ্রকার মহৎকার্য্য-সাধন নিমিত্ত প্রতিবাসীরা পরস্পর মুতদূর পারে স্থায়ী সংযোগ বা একতাসূত্রে বদ্ধ হয়, তাহাই ব্যবহারিক জাতীয়তা। সহানুভূতি ও বিশ্বাসই এই জাতীয়তার ভিত্তি। এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, এক মত, বা এক বংশ প্রভৃতি বিবিধ কারণে এই সহানুভূতি ও বিশ্বাস উৎপত্তি হইতে পারে। আমরা বলিয়াছি প্রয়োজন সাধন নিমিত্তই এই একতা বা জাতীয়তা। এই প্রয়োজন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যত প্রকারের কেন হউক না, তাহারা প্রধানতঃ দুই প্রকৃতির; সংবর্দ্ধন ও সংরক্ষণ; এই সংবর্দ্ধন ও সংরক্ষণ কার্য্য পরিচালন করিতে গেলে শক্তি ও বলের সৃষ্টি চাই; সুতরাং শক্তি রচনাই এই ব্যবহারিক

জাতীয়তার অস্থি-মজ্জা। আমি দেখিলাম, আমরা পরিচিত একস্থলবাসী যাবদীয় মানুষ, অথবা এক ভাষা-ব্যবহারী, এক ধর্ম্ম বা মতাবলম্বী যাবদীয় মানুষ যে ভূমি খণ্ড উপভোগ করিতেছি, উহা আমাদিগের পোষণের পক্ষে সংকীর্ণ, উহা অপেক্ষা অধিক ভূমি খণ্ড আয়ত্ত করিতে পারিলে আমার এবং তৎসঙ্গে আমি যাহাদের সহিত সহানুভূতি করি সকলের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতে পারে, আমরা সকলে মিলিত হইয়া এমন একটি শক্তি রচনা করিলাম, যাহাতে আমরা আকাঙ্ক্ষিত ভূমি খণ্ডের অধিবাসীগণকে দূরীভূত করিয়া উহা অধিকার করিতে পারি। আমরা সংবর্দ্ধন প্রয়োজনের অধীন হইয়া জাতীয়তার সৃষ্টি করিলাম। অপরদিকে যাহারা আক্রান্ত হইবে তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে এই সমবেত মহৎশক্তির উদয় দেখিয়া এক অবস্থার যাবদীয় মানব যাহারা বিবিধ কারণে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি বা বিশ্বাস করে একত্রে সম্মিলিত হইয়া উক্ত আক্রমণকারী মহৎশক্তির বাধা দেওন উপযোগী অপর একটি মহৎশক্তির সৃষ্টি করিল। ইহারা সংরক্ষণ প্রয়োজনের অধীন হইয়া জাতীয়তার সৃষ্টি করিল। এইরূপ সংবর্দ্ধন ও সংরক্ষণ প্রবৃত্তি হইতেই যাবদীয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জাতীয়তা বা রাজ্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। একজন মানুষের সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও রক্ষা জ্ঞান হইতে বহুতর মানুষের সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও রক্ষা জাতীয়তার অধিকার বৃদ্ধি হইতে চলিল। সাধারণ লোকে যে এক ভাষা-ব্যবহারী বা একধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকে এক জাতি বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, সেটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ভাষা, ধর্ম্ম বা মত একাকী কখন জাতি সৃষ্টি করিতে পারে না; এবং তাহাদের অভ্যন্তরে জাতীয়তা সৃষ্টির কোন বীজও নাই। তবে সংবর্দ্ধন ও সংরক্ষণ প্রবৃত্তির বীজ হইতে জাতীয়তা অঙ্কুরিত হইলে, ভাষা ধর্ম্মমত প্রভৃতি ইহারা তাহার প্রসরণের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায় মাত্র। মনে কর, শাক্যসিংহ মুসা বা মহম্মদ মানবজাতির পরিত্রাণ নিমিত্ত কোন ধর্ম্মমত আবিষ্কার করিলেন, কতকগুলি লোকের তাহাই ন্যায়সঙ্গত বা সত্য বলিয়া প্রত্যয় হইল; কিন্তু এই প্রত্যয়ে একতা বা জাতীয়তা সৃষ্টির কারণ কি আছে? প্রত্যয় হইল ভালই, আমি তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহা হইতে পারে না; সংসারের বর্ত্তমান অবস্থায় এখনও তাহা হইতে পারে না। বর্ত্তমান মানব সমাজে এখনও হিংসা দ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতা প্রবল। আমি যে মত বহন করি তোমার হয়ত তাহার প্রতি অতিশয় ঘৃণা, এবং তুমি যে মত বহন কর, আমার হয়ত তাহার প্রতি বিষম বিদ্বেষ, এমত স্থলে ক্রমে শত্রুতার আশঙ্কা হইতে নিজ মত সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন জন্য বল সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, এবং তাহা হইতে একতা এবং উক্ত একতা সর্ব্বপ্রকারে স্থায়ী রূপ ধারণ করিলেই

জাতীয়তা সমুৎপন্ন হইল। এখানে দেখা যাইতেছে, যে স্বয়ং ধর্ম্ম তবে জাতীয়তা সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে; ধর্ম্মই বল, আর ভাষাই বল, ইহাদের অভ্যন্তরে জাতীয়তা সৃষ্টির বীজ নাই, কোথায় উহার বীজ তাহা আমরা বলিয়াছি।

এক্ষণে অনুধাবনে দেখা যাইতেছে এই ব্যবহারিক জাতীয়তা মানব প্রকৃতির দুইটি বিরুদ্ধ ভাব হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। একটি সখ্য সংবর্দ্ধন অপরটি বৈর সমুৎপাদন। এক দিকে জাতীয়তায় কতকগুলি মানব-সাধারণ স্বার্থে সম্বদ্ধ হইয়া এক একটি মানব বহুতর মানবের সহিত সহানুভূতি ও প্রণয় পরিচালন ও অভ্যাস করিতে চলিল। অপর দিকে অবশিষ্ট পৃথিবীবাসী মানবগণের সহিত পৃথক্ ও বিদ্বেষ ভাব রক্ষা করিতে লাগিল। প্রণয় ও বিদ্বেষ এই উভয়ই ব্যাপক সীমায় ধাবিত হইল। যে পরিমাণে বহিস্থ ব্যক্তিসকলের সহিত বিদ্বেষ গাঢ়তর, সেই পরিমাণে জাতীয় সীমার আভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগণের সহিত প্রণয় ও সহানুভূতি। বহিস্থ বিদ্বেষ টুটিলেই এদিক্ ও শিথিল হইতে থাকে। এবং জাতীয়তাবন্ধনও শিথিল হইয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সুসভ্য মানব মণ্ডলীর মধ্যে এবম্প্রকার যাবতীয় জাতীয়তার লোপ করিয়া পৃথিবীস্থ যাবতীয় মানবকে লইয়া একটি জাতি রচনা করণের মহান্ ভাব উদিত হইতেছে। এবং এই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া সেই কার্য্য সুযোগ্য রূপে আরম্ভ হউক বা না হউক কিন্তু প্রকারান্তরে উহার অঙ্কুর মানব সমাজে প্রকাশ পাইয়াছে। উন্নতিশীল মানবসমাজ সকলে আজকাল মত-সহিষ্ণুতা ও সাম্যভাব দেখা দিয়াছে, কালে এই দুই ভাব সংসারে যত প্রবল হইতে থাকিবে, ততই ইহাদের সম্মুখে বর্ত্তমান জাতীয়ভাব সকল বিলীন হইতে থাকিবে। বর্ত্তমান জাতীয়তা সকলের এত প্রকারভেদ কেবল বৈষম্য ও বিদ্বেষ হেতুক। ভাষাগত ধর্ম্মগত অবস্থাগত, বিবিধ প্রকার বৈষম্যের সহিত মত-সহিষ্ণুতারভাব না থাকায় ঘোর বিদ্বেষ বর্ত্তমান। কিন্তু আজকাল মানবের পৃথিবীস্থ সর্ব্বস্থলে গতিবিধি হওয়ার সুবিধা হওয়ায় বহুমিশ্রনে ভাষাগত বৈষম্যের অনেক পরিহার পাইয়া আসিতেছে। মানব বহুতর ভাষা বুঝিতে ও বলিতে শিখিতেছে, এবং ভূয়োদর্শনে মন উদার হওয়ায় মতগত বা ধর্ম্মগত বৈষম্যে আর বিদ্বেষ উৎপাদন করিতেছে না। অপরদিকে বিভিন্ন জাতির সহিত সহবাস-জনিত তাহাদের সহিত সহানুভূতি ও প্রণয় পরিবর্দ্ধন হইতে চলায় প্রত্যেক মানব ক্রমে বিশ্ব-নাগরিক হইতে চলিল। কালে এইরূপ কার্য্যের বহু-পরিচালনে পৃথিবীর সমস্ত মানব-মণ্ডলী একস্বার্থে সম্বদ্ধ একজাতি হওয়ার সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। অপর দিকে মানবের বহুমিশ্রণ যদি বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে এবং সাম্যের প্রভাবে অহঙ্কার বিদ্বেষ টুটিয়া যায়, তাহা হইলে

কালে বর্ণ এবং শরীর গঠনের তারতম্য ভুলিয়া গিয়া মানুষ মানুষের সহিত সাধারণ্যে মিলিত হইয়া যে সন্তান উৎপন্ন করিবে, তাহাদের মধ্যে বর্ণ গঠনের তারতম্যও কালে ভাংচুর হইয়া এক হইতে পারে, আরো বিভিন্ন স্থানে অধিবাসের নিমিত্ত স্থানীয় শক্তির প্রভাবে যে বর্ণ গঠনের তারতম্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, কালে মানুষ যখন জ্ঞান প্রভাবে স্থানীয় শক্তির প্রভাব সকল, কৌশল প্রভাবে দমন করিতে শক্ত হইবে, তখন সমস্ত পৃথিবী একরূপ উর্ব্বরা, একরূপ বিচিত্র নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ ও একইরূপ শীতোষ্ণতার স্থল হইয়া উঠিবে। তখন আর বর্ণ গঠনের এবং উহার সহিত মানসিক প্রকৃতির তারতম্য কিছুই থাকিবেনা, তখন জগতস্থ মানুষের ভাব, মানুষ একটি মানুষ দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, ইহাই জাতীয়তার মনসিজ পরিণাম।

এক্ষণে আমরা বর্ত্তমান জাতীয়ভাব সম্বন্ধে বাঙ্গালীদের যে যে কুসংস্কার আছে এবং জাতীয়তাগঠন সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল ভ্রমাত্মক মত অনুধাবন করিতেছেন, আমাদের মূল প্রস্তাবের মত লইয়া আমরা তাহার বিষয় কিছু আলোচনা করিব।

প্রস্তাবের উপসংহারে, আমরা যে জনসাধারণকে লইয়া এক জাতি রচনার মহতী কল্পনার কথা বলিলাম, দেখা যাউক আশু সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিবার অধিকার ভারতবাসীদিগের আছে কি না। শুধু ভারতবাসীদিগের কেন, সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অধিকার পৃথিবীস্থ কোন দাস জাতিরই নাই। যাহারা আত্ম-অবস্থা উদ্ধারে নির্জ্জীব, তাহাদের জগতের অবস্থার প্রতি হস্তক্ষেপের বাসনা অসঙ্গত। দাস জাতি নির্জ্জীব। যদি তাঁহারা জীবন ধারণ করিতে পারেন তবে তাঁহাদিগকে আগে সামাজিক প্রথম সোপানে পাদবিক্ষেপ করিয়া উত্থান করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে আগে সংবর্দ্ধন ও সংরক্ষণ স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া ব্যবহারিক জাতীয়তাই সার লক্ষ্য করিতে হইবে। এবং যখন তাঁহারা একবার এই অবস্থাগত কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবেন তখন তাঁহারা সর্ব্ব জাতীয়তার লোপান্তে এক বিশ্বজনীন জাতীয়তার অনুপম সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাইবেন। তখন তাঁহাদের তাহা লক্ষ্য করা সঙ্গত হইতে পারিবে; যেহেতু স্বাধীন ব্যক্তির হৃদয়ই উচ্চাভিলাষের যোগ্য।

এখন তবে ভারতবাসীদিগের অবস্থা কি; এই অবস্থায় তাঁহারা সংবর্দ্ধন ও সংরক্ষণ প্রবৃত্তির অনুসরণে জাতীয়তার সৃষ্টি করিতে পারেন কি না। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র লইয়া "আর্য্য" নামধেয় যে বিশালতর জাতীয় মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছিল, যাহার গুরুভার পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বাঙ্গে উপলব্ধি হইত, সেই ভগবৎমূর্ত্তি যখন বাহ্য বিপৎ ও অভাব পরাজয় করিয়া রুদ্রভাব পরিহার পূর্ব্বক প্রশান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তিতে যোগাসনে ধ্যান

মগ্ন ছিলেন, যবনরূপী নিষাদ সেই সময়ে তাঁহাকে লক্ষ্য করে, এবং পরাজয় করে। কিন্তু যবন তাঁহার জীবন নাশ করিতে আসে নাই, তাঁহার শোভন মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অঙ্কে স্থান পাইবার নিমিত্ত আসিয়াছিল। এবং তাহা পাইয়া তাঁহার সহিত অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া এক শরীর হইবার বাসনা করিয়াছিল, এবং সেই দিন হইতে প্রকাণ্ড আর্য্য শরীরে মুসলমানরূপী অপর এক অঙ্গ সংলগ্ন হইল। পূর্ব্বে যেমন আর্য্যেরা শূদ্র জাতিকে পরাজয় করিয়া নিজ শরীরের একাঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন, এখন তেমনি পরাজিত হইয়া মুসলমানকে অপরাঙ্গ করিয়া লইতে হইল। ক্রমে এই অঙ্গের সহিত বহুবিধ শিরায় রক্ত সঞ্চার আরম্ভ হইতেছিল মাত্র, এমন সময় সাগর পার হইতে নানা জাতি শ্বেত মূর্ত্তি আসিয়া ভারত উপকূলে অবতীর্ণ হইলেন। ইহাঁদের সকলের তখন, ভিষক্ বেদিয়ামূর্ত্তি। ঝুলি কাম্থা সার, সাগরকূলে, নদীকূলে, পথে পথে, দ্বারে দ্বারে "বাত ভাল করে, সোঁত ভাল করে," মুখে এই রব। ভারত তখন ঐশ্বর্য্য সেবায় কিঞ্চিৎ রসবাতগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বেদিয়ারা গিয়া দ্বারে দরবার করিল, আমরা আপনার রোগের কথা শুনিয়া সাত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি। আমাদের আর কোন অভিপ্রায় নাই, কেবল আপনার রোগ শান্তি করিয়া আপনার অনুগ্রহের পাত্র হই, এবং আপনার চরণ প্রান্তে এক একটু স্থল পাইয়া, করিয়া কর্ম্মিয়া খাই। আমরা কেবল আপনার সন্ধিস্থলগুলিতে চুঙ্গি বসাইয়া আপনার আধিক্য রস মাত্র শোষণ করিব এবং আমাদের যে ঝুলির সম্বল এই ছাই ভস্ম দেখিতেছেন, ইহার আশ্চর্য্য গুণ, ইহা আপনাকে সেবন করাইয়া শীঘ্র আপনার শরীরের শোভা সাধন করিব। ভারত যেন অবহেলায় ঈষৎ হাসিয়া বেদিয়ার চিকিৎসায় রাজি হইল। রাজি হইবামাত্র বেদিয়াদলসকল মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল; কোন দল বলে, আমরা বক্ষে চুঙ্গি বসাইব, অপর দলও তাহারি প্রার্থী; দলে দলে তখন কাটাকাটি করিয়া মরিতে লাগিল। কালে অপরাপর দল বিবাদে পরাস্ত হইয়া নগত বিদায়ে স্বদেশে প্রস্থান করিল। ইংরাজের তখন একা প্রভুত্ব। ইংরাজ কালে এক একটি করিয়া ভারতের শিরায় শিরায় চুঙ্গি বসাইলেন, প্রথমে আধিক্য রস শোষণকালে ভারতের আরাম বোধ হইয়াছিল, কিন্তু এখন ক্রমে জীবনীশোষণ আরম্ভ হইয়াছে; এখন ভারত ক্রমে দুর্ব্বল অবসন্ন মুমূর্ষ; জীবনরক্ষার নিমিত্ত চীৎকার করিতেছেন। জীবনীর অভাবে আজ বাঙ্গালা, কাল বোম্বাই, পরশ্ব মাদরাজ হাহাকার করিতেছে, ইংরাজ সাহস দিয়া কহিতেছেন ভয় নাই শীঘ্রই আরাম করিতেছি; সন্ধিস্থল সকলে অস্ত্র করিতে হইবে; ইংরাজ সন্ধিতে সকল চ্ছেদ করিয়াছেন। ভারত এক্ষণে উত্থানশক্তি-রহিত। ভারত এক্ষণে শ্মশানের শব,

কিন্তু ইংরাজের আজিও এই শ্মশানের শব হইতেও ভয় ঘুচে নাই। তিনি শুনিয়াছেন সঞ্জীবনী মন্ত্র বলে নাকি শবও পুনর্ব্বার জীবিত হয়। এই নিমিত্ত তিনি প্রত্যেক অঙ্গকেই অনিমেষে লক্ষ্য করিতেছেন, কখন কোন অঙ্গে তাপ হয়, কখন উহাতে স্পন্দন হয়। কিন্তু এই ভয় ইংরাজের অকারণ। ভারত জাতীয় জীবনে যদি কখন জাগ্রত হইয়া উঠেন, তবে তিনি ইংরাজের প্রতি সদত কৃতজ্ঞই থাকিবেন, এ্‌হীন অবস্থাতেও বাস্তবিকই তিনি ইংরাজ হইতে বহুবিধ অমূল্য উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতের সম্পত্তি যতই কেন শোষিত হউক না উহার ভূমি যদি বজায় থাকে, তবে উহা হইতে কয়েক বর্ষেই পূর্ব্ব সমৃদ্ধি দেখা দিবে, আর্য্যজাতির শ্বাসও যদি কঙ্কালাবশেষ দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে উহা স্বাধীন হইয়া আর একবার মুক্ত হইলে অনতিবিলম্বেই পূর্ব্ব বল ও স্ফূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিবে। আমরা এ সকল ক্ষতিকে ক্ষতি বিবেচনা করি না, কিন্তু ইংরাজ কর্ত্তৃক আমরা যে ঊনীশ শতাব্দির পাশ্চাত্য উন্নতির অংশভাগী হইয়াছি উহা আমাদিগের অমূল্য রত্ন। ইংরাজ সহবাস ব্যতিরেকে আমাদিগের ঐ রত্ন আহরণে বহু শতাব্দি অতিবাহিত হইয়া যাইত। এখন বোধ হয় সকলে ভারতের বর্ত্তমান দশা বুঝিয়াছেন, এখন বোধ হয় কোন্ অধ্যায়ে ভারতের সঞ্জীবনীমন্ত্র আছে তাহাও সকলে লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন। এখন ভারতকে জাতীয় জীবন প্রদান করিতে হইলে কোন্ অধ্যায় খুলিতে হইবে? আমাদের যাহা সিদ্ধান্ত তাহা এই—

আমরা বলি মানব তত্ত্ব হইতে এমনি একটি বীজমন্ত্র বাছিয়া লওয়া চাই, যাহার উচ্চারণ মাত্রেই চৌম্বকী ক্রীয়ার ন্যায় সমস্ত ভারতের ধাতুকে একত্র আকৃষ্ট ও আবদ্ধ করিবে। অনেকে বলেন, ধর্ম্মাধ্যায় ব্যতিরেকে অন্যাধ্যায়ে এই বীজমন্ত্র নাই, কিন্তু সেইটী ভ্রম। সত্য, ধর্ম্মাশ্রয়েই এক দিন ভারতের জাতীয় জীবন অবস্থান করিয়াছিল, কিন্তু মুসলমানদিগের এখানে আগমন ও অধিবাসের পর হইতেই, জাতীয়তা ধর্ম্মাশ্রয় ছাড়িয়াছেন; সেই দিন হইতেই হিন্দুধর্ম্ম ও ভারতবর্ষের মুসলমানধর্ম্ম ইহলৌকিক কার্য্যকারিতায় বঞ্চিত হইয়া পারলৌকিক বিষয় চিন্তা করিতেছেন। ভারতক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের এমন সংমিশ্রণে অধিবাস, যে তাঁহাদের মধ্যে জাতীয় জীবন্ত বিদ্বেষ (যবন ও কাফর) জ্ঞান জাগরূক থাকিলে উভয় কুলেরই নাশ। সেই জ্ঞান একরূপ জাগরূক থাকিতেই পারে না। সকলেরই প্রয়োজনে সমতা হইয়া যায়; হিন্দু মুসলমানে সহানুভূতি ও প্রণয় ব্যতিরেকে ভারতের সামান্য প্রয়োজনও সংসাধিত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত প্রয়োজনে বাধ্য হইয়াই বিদ্বেষ লয় পাইয়াছে, যদি এই বিদ্বেষ পুনর্ব্বার জাগরিত হয় তবে ভারতের প্রতিপলী পর্য্যন্ত ছিন্ন

ভিন্ন হইয়া যাইবে। এই নিমিত্ত আমরা বলি, যাঁহারা স্বার্থ বা প্রয়োজন ধ্বংসকারী ধর্ম্মবিদ্বেষ পুনর্ব্বার প্রবল করিতে চান, তাঁহারা আমাদের মতে ভারতবাসীদিগের পরম শত্রু! এক অবস্থায় প্রয়োজন ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সাধিত হইয়াছিল, অপর অবস্থায় সেই ধর্ম্ম প্রয়োজনকে ধ্বংস করিতে পারে। মুসলমানেরা ধর্ম্ম-বিদ্বেষ বলে ভারতাধিকার-প্রয়োজন সাধন করিলেন, এবং যখন দেখিলেন এখন ধর্ম্মবিদ্বেষ প্রয়োজন-ধ্বংসকরী হইতেছে, অমনি উহা পরিত্যাগ করিয়া সাঞ্জস্যে মনোনিবেশ করিলেন। যাঁহারা প্রয়োজন সাধনে উপস্থিত-বুদ্ধি-শূন্য, তাঁহারাই মূর্খ, প্রাচীন সংস্কারের দাস। প্রাচীন হিন্দুগণের এই বুদ্ধি অতিশয় প্রবল ছিল। এই নিমিত্ত ভারতের অবস্থা প্রায় পঞ্চবিংশ শতাব্দি যাবৎ পূর্ণ সমৃদ্ধিতে বিরাজ করিয়াছিল। উপস্থিত প্রয়োজন সাধনে ধর্ম্ম, নীতি, ও সংস্কার পরিবর্ত্তনে তাঁহারা কেমন পটু, তাহা তাঁহাদের পুরাবৃত্ত অনুশীলনে বিশেষ উপলব্ধি হয়। বংশ বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে, অমনি, স্ত্রীলোক যে কোন অবস্থায় কেন সন্তান উৎপন্ন করুন না তিনি ও তাঁহার পুত্র সামাজিক মর্য্যাদা হারাইবেন না, ইহার দৃষ্টান্ত মহাভারতের কালেও দেখ। বৌদ্ধদিগের সহিত বিবাদে সাধারণ প্রয়োজন ধ্বংস হইতেছে, অমনি হিন্দুরা ক্রমে বৌদ্ধকে আপনাদের একটি অবতার মধ্যে স্থান দিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের ভাব সমঞ্জস্য করিয়া লইলেন। এখন আমাদের সেই প্রয়োজনসাধিনী উপস্থিত বুদ্ধির বিশেষ আবশ্যক; এই সময় নূতন জাতীয় জীবন প্রদানের সময় আগত, এখন যাঁহারা এই কার্য্যের নেতা হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার অন্ধ সংস্কার বিবর্জ্জিত হইয়া উপস্থিত সূত্র সকল ধারণে সুসন্ধানী হওয়া চাই। আমরা দেখাইলাম ধর্ম্মসূত্র যাঁহারা ধরিতেছেন, তাঁহারা কেমন ভ্রান্ত। এখন আমাদের সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন সংস্কার সকল যত শিথিল হয় ততই ভাল। যাঁহারা এই সাম্প্রদায়িকতা প্রজ্বলিত করিতে উদ্যত, অথবা ইহার উপর নূতন সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করিতে উদ্যত, তাঁহারা ছিন্ন ভিন্ন ভারতকে উচ্ছিন্ন দিবার পথ ধরিতেছেন। হইতে পারে তাঁহাদের অভিপ্রায় ভাল, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যের ফল, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে মন্দ দাঁড়াইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ হয়ত মনে করিতেছেন, হিন্দু ধর্ম্মের ধূলি মুষ্টি লইয়া, মন্ত্রপূত করিয়া তাহাতে ফুৎকার দিব, অমনি তাহা হইতে সেই শোভনশীল প্রাচীন হিন্দু সৌভাগ্য জাগিয়া উঠিবে। অপর কেহই হয়ত এমন মনে করিতেছেন এই যে নূতন মত সৃষ্টি করিতেছি ইহার জ্যোতির আলোকে সমস্ত ভারত অন্ধকার ছাড়িয়া ইহার আশ্রয়ে মিলিত হইবে, কিন্তু সকল কার্য্যই অবস্থা বিশেষে ফল প্রসব করিয়া থাকে। আজকাল ভারতের যে অবস্থা তাহাতে ইহা কিছুতেই সুফল উৎপন্ন করা দূরে থাকুক, ইহা কুফল উৎপন্ন করিবে।

এক্ষণে তবে ভারতের পক্ষে কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে? ভারতের এখন মূলমন্ত্র 'মনুষ্যত্ব' 'এবং "ভারতের গৌরব" এই দুই বাক্যে। এই দুই বাক্যে সমস্ত ভারতবাসীর সহানুভূতি আছে। এই দুই বাক্যের আঘাতে সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয় কম্পিত হইবে। হিন্দু এবং মুসলমান যুগে, এই দুই বিষয়ে ভারত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আজকাল আমাদের ইহাই নাই। ইহার সমুৎপত্তির নিমিত্ত আমরা সমস্ত ভারত একত্র হইব, এবং যাহা কিছু ইহার প্রতিবাদী আমরা উহার রক্ষার নিমিত্ত সমস্ত ভারত তাহার অপনোদনে প্রাণপণ করিব। এইরূপে সংবর্দ্ধন ও সংরক্ষণ প্রবৃত্তির অনুসরণে আমরা পুনর্ব্বার নূতন জাতীয় জীবন প্রাপ্ত হইব। সর্ব্বপ্রকার বৈবম্যের ধ্বংস করিয়া তাহা হইতে এই নূতন জাতীয় মূর্ত্তি সমুত্থান করাইব। এই নিমিত্ত নিত্য নূতন রায়বাহাদুর রাজা মহারাজার সৃষ্টি দেখিয়া নব্য ভারত আহ্লাদিত হইবে না, এই নিমিত্ত গুইকুমারের পতন দেখিয়া নব্য ভারত কাতর হইবে না। নব্য ভারতের ইচ্ছা, ভারত চূর্ণ বিচূর্ণিত হইয়া এক অবস্থাগত হউক। কি ধর্ম্ম কি রাজনৈতিক কি সামাজিক কি আচারব্যবহারিক ভারতের যাবদীয় শৃঙ্খল দূরীভূত হউক, ইহা হইলে ভারত অবস্থাগত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে, সর্ব্বপ্রকার অবস্থার বন্ধন অপনীত হইলে ভারতর মুক্ত অন্তর তখন সাগরবৎ উহার উপরে ভাসিতে থাকিবে এবং তখন তাহার উচ্ছ্বাস, তাহার তরঙ্গ সকল বিপত্তিকে হেলায় লয় করিতে সমর্থ হইবে। এইরূপ না হইলে ভারতের সম্পূর্ণ আমূল সংস্কার সমাধান হইবে না। আমাদের এই উদ্ধত কথার তাৎপর্য্য যিনি না বুঝেন, তিনি প্রাচীন শয্যায় সুখে নিদ্রা যাউন, নূতন ভারত তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত করিবে না। তাঁহারা এখন আবার মুণ্ডিত শিরে শিখা, নাকে তিলক, উলঙ্গ গাত্রে, চটির চটকে আমাদের সম্মুখে জাতীয়তা দেখাইতে আসুন, আমরা তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া প্রাচীন ভারতের পারলৌকিক পথ দেখাইয়া দিব।

এখন আবার পূর্ব্ব কথা। ইংরাজ বলিয়া থাকেন, আমাদের উন্নতির সকল পথে তাঁহারা সহায় হইবেন, কোন পথের ব্যাঘাতক হইবেন না, এবং আমাদিগকে যে যে বিভাগে উপযুক্ত দেখিবেন সেই সেই বিভাগের কর্ত্তৃত্ব তৎক্ষণাৎ প্রদান করিবেন। কিন্তু ইংরাজ পূর্ব্বে তাহার সূচনা করিয়া এখন তাহা হইতে বিরত হইতেছেন। ইংরাজ দেশীয় উচ্চ বিচার কার্য্য সকল আমাদের হস্তে না পতিত হয় তাহার পথে কতই প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করিতেছেন। স্পষ্টাক্ষরে সে দিন বলিয়াছেন দেশীয়দিগের হস্তে রাজ্যতন্ত্রবিষয়ক গুরুতর বিষয় কিছুই অর্পিত হইবে না, এইত হইল আমাদিগের রাজ্য পরিচালন বিষয়ক দক্ষতা প্রাপ্তির পথ-

রোধ। দ্বিতীয়ত, আমাদিগের সাহসিকতা ও রণনৈপুণ্য শিক্ষার নিমিত্ত যে ভলণ্টিয়ার লওনের ব্যবস্থা আছে তদনুসারে এ পর্য্যন্ত কেন আমাদিগকে সেই কার্য্যে লওয়া হইতেছে না, অধিকন্তু আমাদের অন্য অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের পক্ষে একখানি বৃহৎ ছুরিকাও গৃহে দর্শনের অধিকার নাই। ইহাতে ইংরাজ আমাদের সাহসিকতার পথ রোধ করিয়া ফেলিতেছেন। অপর আর একদিকে আমাদিগের সাহিত্যের স্বাধীন স্ফূর্ত্তির পথ ছাড়িয়া দিতেছেন না। সুতরাং এখন আমরা দেখিতেছি ইংরাজ আমাদিগের জাতীয় জীবন প্রাপ্তির ব্যাঘাতক। ইংরাজ আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির প্রত্যেকের প্রতি এক একটির ওজর দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, যে আজ কাল রাজ্যতন্ত্র বিষয় এমন রূপ ধারণ করিতেছে যে, তাহাতে তাঁহারা দেশীয়দিগের হস্তে রাজ্যের গুরুতর-বিষয় সকল সমর্পিত করিতে পারেন না। একথার আভ্যন্তরীণ অর্থ কি তাহা তাঁহারা আমাদিগকে খুলিয়া বুঝাইয়া দেন না, এবং ইহার অভ্যন্তরে কোন সৎ অভিপ্রায় থাকিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদিগের নিকট উহা গোপন থাকিবে ততক্ষণ আমরা তাহার বিরুদ্ধ ভাব গ্রহণ করিতেই বাধ্য। এইরূপে অপর সকল বিষয়েরও অপরিষ্কার ওজর দেখাইয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদের সমস্ত ভারত মিলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট এই সকলের মর্য্যাদা পাইবার প্রার্থনা করার প্রয়োজন হইয়াছে। মনে কর না গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, আমরা তাহা হইলে কাঁচা ছেলের ন্যায় ম্রিয়মাণ মুখে ফিরিয়া আসিব না, উপযুক্ত সন্তানের ন্যায় বিতণ্ডা করিব, এবং আমরা যে এখন আর অবহেলার পাত্র নহি এরূপ যোগ্যতা দেখাইব, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়াই আমাদিগের কথায় কর্ণপাত করিতে হইবে। যোগ্যতার অনুরূপ কলেবর ধারণ করাই এখন আমাদিগের কর্ত্তব্য হইয়াছে এবং সেই কলের পরিচালনোপযোগী শক্তি তাহাতে সমাবেশ করাই কর্ত্তব্য হইয়াছে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট আর আমাদিগকে অপগণ্ড শিশুর ন্যায় অবহেলা করিবেন না।

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলী।

রাধিকার শয়ন-মন্দির।

সময় অপরাহ্ণ।

রাধিকা একাকিনী;—গবাক্ষের উপর শরীরের ভার বিন্যস্ত করিয়া চিন্তায় নিমগ্না।

রাধিকা—অহ কি সুন্দর সুদূর পশ্চিমে
চঞ্চল তরল শত সুষম শেখর
ধবল কাঞ্চনসম রঞ্জিত সহস্র রাগে!—
রাঞ্জিত শেখরে মোহন তপন-রাজ!—
কিরীটে যইসন অতুল
অমরনাথ মোহন মস্তকে!—
অথবা চাঁদিমা খণ্ড রাঞ্জিত যৈসন
শিখি পুচ্ছে চূড়ায়মে তায়!—
—রাধানাথ চূড়ায়মে!—এ মোহন নাম—
(রাধা-মনমোহন)—দিন হয় তায়!
এনামে অন্তরে হয় নিত নিত তায়
(রাধানাথ নামে আহা)—জপব নীরবে!
প্রতিধ্বনি স্থির ভব!—না ধ্বনবি তুই!—
ধ্বনই কি লাভ ধনি লভবি গোকুলে
রাধা কি কলঙ্ক বিনা? সে কলঙ্কে ভয়
লো মধুর প্রতিধ্বনি! কি ফল ফলব?—
সুমধুর কহি তোয় ওলো প্রতিধ্বনি—
সুমধুরই বট তোম রাধা কি শ্রবণে!
কানে কানে কহ যদি কহ তবে মোয়
নতুবা নীরব ভাল—হব বিপরীত!—
অনর্থ ঘটব হায় জাগব যদ্যপি
এধ্বনি!—সহস্র মুখে গাব গোকুল মে!
নহে দূরে ননদিনী ডাকিনী কি হেন—
তিলে গঠয়ত তাল তৃণে মহীধর!
কঁদলে আনন্দ তার নারদ ভরায়
নিশ্বাসে লভত জন্ম আকাশ-কুসুম!
গাব এ কলঙ্ক গীতি কত বদন মে
এক বদন মে হয় নারি কহইতে!—
(ক্ষণকাল চিন্তা)
কিন্তু এ কলঙ্ক কাঁহে?—কলঙ্ক কইসনে
ভৈরব সাধনে মোর পরমেষ্ট ধনে?
মথই জলধি কিবা ভাগ যে হমার
উঠইবে হলাহল?—হা মোর কপাল!—
কাঁহে কলঙ্কিনী রাধা?—গোমুখী-নিঃসৃত
পবিত্র জাহ্নবী বারি সদৃশ মহায়
অনুরাগ কৃষ্ণপদে!—যদ্যা যদি অপি
পরিণয় পাশে পাপ পর পুরুখমে—
(পরই বটে নহে মোর) নহে নিজ দোষে!
বাঁধয়ল পিতা মোর—নহি বাঁধা হয়!—
সে বাঁধ রহিব কাঁহে—সাগর-গামিনী
রহব কি প্রবাহিনী যদ্যা গহ্বরে?
কৃষ্ণগত প্রাণ মোর—কৃষ্ণ পদে মন
কৃষ্ণ ধ্যানে রতা হয় জনম অবধি!
কৃষ্ণ-প্রতিমূর্ত্তি মোর প্রতি লোমকূপে
অসার সংসার হেরি কৃষ্ণপদ বিনা!—
তবে কলঙ্কিনী কাঁহে?—নহি কলঙ্কিনী
কলঙ্কিত হোয় সেই দুর্ব্বার নিয়ম
যার অনুরোধে পাপ—রাধা কলঙ্কিনী!
পার্থিব না হোয় প্রেম স্বর্গীয় বিমল!

সে প্রেম সাধনে কাঁহে কলঙ্ক ভেয়ব!
সুর-পুরী-প্রবাহিনী মন্দাকিনী সম
চির পূত প্রেম তার নীর পরশিয়া
ভেয়ব কি কলঙ্কিনী?-হা মোর কপাল!—

(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ও ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস;—সম্মুখস্থ বকুলকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ।—(স্বগত)—

হিয়া মোর তিরপত ভেয়ও
নয়ন উনমলি স্বরগ নিরখও!
কিবা শ্যামল অলকা যুগলমঞ্জরী
দোলত মধুরিমে অনিল হিলোলে!
আ!—ভেয়তু যদি হম মলয় অনিল
(তার জনম সফল!)—
চিরবাস মলয় যুগল সুন্দর
নিচোল মাঝারে খেলতু রে!
ঋতুরাজ আগমে আগমনী তার
গায়তু সুধু হম দুকুল মাঝারে!—
বসন্ত-রূপিনী রাই—
নন্দন কানন মন্দার মই!
ঋতুরাজে সাধই—(সাধন না লাগে—
সেত নাহি ত্যজত নন্দন বাসরে!)
মলয় নিবাস মোর মলয় ত্যেয়াজি
কদাচ গিয়তু হম বিদেশ বিহারে!—

রাধিকা—আও শ্যামা পাখি মোর হৃদয়-পিঞ্জরে! কাঁহে যমুনা কিনারে?

হিয়া পিন্জর মোর মুকত নিয়ত
শ্যামা রাজতুয়া তরে!
চুমকি চুমকি তোয় নিত বোলায়ত
আও অন্তর-পিঞ্জরে!
এ যৌবন কাননে কত অমৃতের তরু—
তার সুমধুর ফলে
লভে অমরতা বর—ওহে রাধানাথ
রাধা পিঞ্জর কি পাখি
রাধা তুয়া তরে সুধু রাখা যতনমে!—
পূত প্রবাহিনী প্রেম-গঙ্গা অবিরত
বহতরে মৃদু নাদে একানন দিয়া!—
আও রাধানাথ—ইহ মহাতীর্থ নীরে
—মহাযোগময়ী—লভ অবগাহি বপু
মহা ফল!-মহা সাধে সাধে রাধা তোয়!—

শ্রীকৃষ্ণ।—(প্রকাশে)—

তীর্থযাত্রী হম রাধে মহাতীর্থময়ী!
দুরাশা কি মহা মরু বহু আয়াসমে
উতরি আয়লু অব সরসী কি কূলে!—
বহুত পিয়াস মোর কুতীর্থ তৃষিতে!

(রাধিকা লজ্জিত হইয়া গবাক্ষ হইতে প্রস্থান)

অতিথি দাঁড়াই দ্বারে!—
কাহে নিরদয়া দয়াবতী?
মরীচিকা ভই কিলো ছললি হমারে?—

(গবাক্ষে উঠনাভিলাষে বকুল বৃক্ষে আরোহণ)

(সলজ্জ ভাবে গবাক্ষ নিকট পুনরাগমন)—

রাধিকা।—শরমমে মরে মুরলীমোহন ক্ষমতায়!—শরমমে সরত না তার

সে পোড়া রসনা!—পূর্ব্ব সুকৃতি কি ফলে
তব পদার্পণ আজি দাসি কুটীর মে!
আও নাথ!—রাধানাথ—রাধা বোলায়ত!
নয়ন কি নীর পাদ্য অর্ঘ্য এ যৌবন!
সাজাই রাখল রাধা কতদিন হতে

তুয়া লেও হে অতিথি!
হৃদি কুশাসন দুঃখিনীর
প্রস্তর রে তুয়া লাগি বিশ্রাম বৈঠই!—
—(শ্রীকৃষ্ণের গবাক্ষে আগমন; রাধিকা লজ্জাবনতা ও বস্ত্র সম্বরণ)—

শ্রীকৃষ্ণ।—সম্বরে অম্বরে অরবিন্দমুখী
কাঁহে সম্বর অম্বরে মুখ?
কাঁচলি কষণ কাঁহে কষ লো সঘন?
আঁচলে কি ভেল—কাহে আঁচল
আছাড় রাধে?
এরূপ সাগরে যুগল চটুলা
নয়ন তোর!
এ গভীব নীরে সে কাঁহে শিহরে
পরাণ সহিত মোর?
(লজ্জাবনতা রাধিকার চিবুক ধরিয়া)
এমুখকমল আঁচলে আবরি
ভাসুক কান্দালি কাঁহে?
নিরখ নয়নে অস্তাচল পানে
তার নয়ন মে নীর বহে!
নিচোল মে ঠাঁই অনিল না পাই
দুলায় আঁচল ধীরে!
আঁচলে কিভেল?—বুঝল বুঝল
আঁচলে লুকাই রহে!
শরম কুম্ভীর এ রূপ-সাগরে
আলোড়ি তরগ খেলে!
নয়ন চটুলা সভয়ে চঞ্চলা
সাগর আলোড়ি ফিরে!
কাঁহা অরে স্মর হান ফুলশর
কুম্ভীর পলাব ডরে!
নয়ন চটুলা নীরব উতলা
আবার খেলব ধীরে!—

রাধিকা।—শরমে মরি কম অবলায়—
(লজ্জায় নিস্তব্ধা)—

শ্রীকৃষ্ণ।—অতিথি ভিকারী তোহার দুয়ারে
কলপ অটবী রাই!
দুরাশা মরুভূ আয়লু উতরি
পিয়াসে পরাণ যায়!
বহুদিন হতে হিয়া কানন মে
এ আশা যতনে পুষণু হম!
রাধা কর দয়া ক্ষুধিত অতিথে
নতুবা বিদরে প্রাণ!—
ইহ বৃন্দাবনে অন্নদা তু'বিনে
কে তোষব মোরে রাই?
তুই লো অন্নদা প্রেমান্নে পূরিতা
প্রেমের পাগল মই!
কাঁহে কৃপণতা কর মৌনবতী
ক্ষুধার্ত্ত অতিথি দ্বারে?
কাঁহে মৌনবতী কহ রসবতী
বিষাদি গণত কাঁহে?
তব এ যৌবন নশ্বর নবীন
যক্ষক দ্রবিণ প্রায়!
অক্ষয় কি রব কাল নাহি ছোব?
তোহারে সুধাই তাই!
গরিমায় যদি রাধে মৌনবতী
গরিমাত রাধে উচিত নয়!
গরিমায় গিরি না রব উন্নত
হব ধরাগত জেন লো নিচয়!—
(রাধিকা অঞ্চলের কোণ ধারণ পূর্ব্বক নাসিকা পর্য্যন্ত উত্তোলন করত ছাড়িয়া দেওন ও তৎপ্রতি দৃষ্টি—)

শ্রীকৃষ্ণ।—(রাধিকার বাম হস্ত বদন হইতে অপসৃত করিয়া)

মুখের কথাটী রাধে!
শুধু মুখের কথাটী রাধে!—
যদি কথাটী কহিলে এদাস সন্তোষ
সে কথা কহ না কাঁহে?
শ্রীমুখ-কমল আঁচলে ঝাঁপই
রাহু কি গ্রাসল চাঁদে?
মুখের কথাটী রাধে!
শুধু মুখের কথাটী রাধে!—
কথাত কহিলে আকাশ ধরব
অনিল নাচাব আয়!
কোকিল শুনব ভ্রমর মাতব
ঝঙ্কারি বৈঠব ফুলে!
শুধু মুখের কথাটী রাধে!—
ভুবন মোহিত সে রবে ভৈরব
নীরব কাঁদে লো তবে!
শুধু মুখের কথাটী রাধে!—
পাপী বলি যদি নিরদয়া অতি
অধমক প্রতি রাধে!
পাপী নহি আর এ দেহ পবিত
তব দরশনে ভেল!
মুক্তি দরশনে—পরশনু যদি
জীবন মুকতি মোর!
মাথা খাও রাধে মাথা খাও মোর
মোর কিরা লাগে তোয়ও!
কিছু নাহি চাই এক ভিক শুধু
মুখের কথাটী কও!—
রাধিকা।—শরমমে মরি ক্ষম অবলায়
কি কব তুহায় ঠাকুরবর!
হিয়া মে না রহে উছলনে চাহে
বাক্যক তরগ মোর!—
আমোদ-সমীরে নাচত তরগ
অধীর হিলোলে তার!
ভারত অম্বুধি হিয়ার ভিতরে
আলোড়ে পালড়ে মোর!
শরম-জাঙাল সুমেরু বিশাল
রোধত তরগ তার!
বাহরিতে নারে আলড়ই ফিরে
বিদরে পরাণ মোর!
কিন্তু আমোদে ভুলিয়া যতন করিতে
রতনে ভুললু হায়!
ক্ষম রাধিকায় রাধিকা-জীবন
রাধিকা গিরত পায়!—

(শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে গবাক্ষ হইতে পালঙ্কে উপবেশন করণ ও তৎপার্শ্বে স্বয়ং উপবেশন)—

ছিছি লাজে মরি ছোড় অবলায়
কর দয়া ক্ষম কুল-বিহঙ্গিনী!
জীবন যাপন কুল পিঁজরামে
কিয়নু কৈসন সংসার না জানি!
বৃন্দাবন মাঝে হম উন্মাদিনী
কাঁহে উন্মাদিনী কহব কমনে?
নাচি গাই হাসি যব দিল চায়?
প্রাণ ভরে রোই যব আসে মনে!—
যব আয়ে হাসি একলাই হাসি
কত হাসি হাসি কেহ নাহি জানে!
যমুনামে যাই একলাই রোই
জীবন মিলাই যমুনা-জীবনে!
একলাই নাচি একলাই গাই—
একলাই দেখি একলাই শুনি!
মন-মাতঙ্গিনী যেই দিকে যায়
সেই দিকে যাই হম পাগলিনী!

সধবা না হই বিধবাও নই
কুমারীও নই বিবাহিতা বটি!
সংসার পাথারে চিনিনা কাহারে
সুধু চিনি এই শ্রীচরণ দুটী!—

(শ্রীকৃষ্ণের চরণ মূলে উপবেশন)

বহুদিন হ'তে রাখলু গোপনে
এ সাধ যতনে হিয়ার মাঝে
আজ ভাগ-বলে চাঁদ করতলে
নয়ন কি মূলে স্বরগ বিরাজে!
তুলসীর মূলে প্রদীপ যৈসন
উজলি বৈঠই চরণ তলে!
নয়ন-আসারে দুকরে পাকরি
ধোয়য়ব সাধে চরণ-যুগলে!

(শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধারণ, শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার হস্ত ধারণ)

আসেনাত আজি নয়ন মে বারি
এত সাধনেও কাঁহে নাহি জানি!
বিনা সাধনেও বেগে প্রবাহিনী
বহয়ত আগে প্রবোধ না মানি।—

(নেপথ্যে শব্দ—রাধিকা সশঙ্কিতা ও দণ্ডায়মানা;—শ্রীকৃষ্ণ গবাক্ষের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ; পরক্ষণেই রাধিকার প্রতি ত্রস্তে দৃষ্টি)

রাধিকা।—(দক্ষিণ হস্তে শ্রীকৃষ্ণের মুখাবরণ ও বাম হস্তে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া)

গরজত গভীরে অই বনয়ারী
সঙ্গিনী ননদিনী বাঘিনী সমান
দিবা অবসান আগত যামিনী
আয়ব আয়ান অলপমে গেহে—
অব্ যাও বনয়ারী
রাধা-হৃদয় আঁধারি—
হম আছলু পাসরি রাধা-মন-মোহন
নিরখি তব চন্দ্র-মুখ-মাধুরী!
অব আয়ল যামিনী ভেয়ল কাল!
অব আয়ব গেহ মে আয়ান কাল!

(শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে হস্ত অপসৃত করণ এবং দ্বারের প্রতি দৃষ্টি)—

শ্রীকৃষ্ণ।—কাঁহে ডর রাধে?
পবন চতুর দুয়ার পাকড়ি
দুলাই ঈষদ মাতত তোয়!
আঁচল নিচোল অলকা-যুগল
অঙ্গের দুকূল নাচাব চায়!
মাথা খাও রাধে না যাবি তাতে
কপট চতুর পবন চোর!
কপট অন্তরে বোলায়ত তোরে
দাগব অধরে বাসনা তার!

রাধিকা।—কহ মোয় কইসে আয়লি হরি?
দুয়ারমে মোর বাঘিনী প্রহরী
কাল ননদিনী!—তুঙ্গ প্রাচীরে
রোধিত এ পাপ কুল অবরোধ!
কইসে উতরিলি তায়?

শ্রীকৃষ্ণ।—ভুজ পাকড়ই আপনি মদন
উতরিল মোয় প্রাচীর পারে!
প্রেমিক-পথ সতত প্রসর
আপনি হিমাদ্রি রোধইতে নারে!—

রাধিকা।—পেখব যদি অব কুটিলা ভুজগী?—
আয়ব যদি অব আয়ান অধম?
শিহরি প্রাণ হরি পরিণাম স্মরই
মিনতি করি হম অবতু যাই!—

শ্রীকৃষ্ণ।—রাধে!
ডরত নহি হম খর তরবারে
শাল শেল শূল খরতর শরে!

তব যুগ মোহন নয়ন সন্ধানে
পেখতু বিপদ ভারি।—
কইসে কহ রাধে বিপদ উতরি ?
রাধিকা।—কহ মোয় শ্যাম কইসনে আয়লি ?
হরি আজি মোয় তুই বিস্মিত করলি !
কুল অবরোধে বদ্ধা বিহঙ্গিনী
পবন না জানত বটে !
দ্বারে ননদিনী কইসনে আয়িলি
কহ মোয় ?—মোর কিরা না করবি ঠাঠ !—

শ্রীকৃষ্ণ।—গুরু মোর পীরিত তোহার
উপদেশ দিয়ল হমারে !
সাধনা ভেয়ল সদয়া !
গিরি বন সাগর কন্দর প্রান্তর
বুক পাতি সবে দিল বাট মোয় !
তব রূপ জ্যোছনে উজলিত ভেল
বাট হমারি !
জল আশে আয়লু মরুভূ উতরি !
সুর-নর দুর্লভ যদি এ মালিক
রহইত দূর সুমেরু-শেখরে !
সপত সাগর সাঁতারি তথাপি
যায়তু নিচয় এমনি প্রয়াস !—
রাধিকা।—(শ্রীকৃষ্ণের গলার বনমালা ধরিয়া)
হরি এ বনমালা কে দিল তোহারে ?
কে এ ভাগবতী গোকুল মাঝারে ?
অনন্ত প্রফুল প্রসূনে গাঁথন
রতি-পতি-রতি প্রতি থরে থরে !
অনন্ত নন্দন সৌরভে পূরিত
বৃন্দাবন বুঝি ভেল !—
কহ হরি
কে এ ভাগবতী গোকুল মাঝারে
দাসি ভই রাধা পূজব তাহারে !—
শ্রীকৃষ্ণ।—(বাম হস্তে রাধিকার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা রাধিকার এক একটী অঙ্গুলি স্পর্শ করিতে করিতে)—
রাধে !
বৃন্দাবনে এক বালা নিরুপম ত্রিভুবন
মাঝারে !
যোগীন্দ্র-যোগ-ভঙ্গিনী রূপিনী !
মম হৃদি-আসন-বাসিনী দেবী—
ভকত জানি মোয় দিল উপহার !
অনন্ত প্রফুল কাঁহে নাহি ভেব ?
এক নহে—(ইশারায় রাধিকার নখ চন্দ্রে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া)—
এহি দশ সুধাকর মিলই
সঞ্জীবনী সুধা মাখল তায় !—
সে কাঁহে মলিন ভেব ?
অনন্ত নন্দন-সৌরভে পূরিত
বৃন্দাবন কাঁহে ত্রিভুবন ভেল !—
(রাধিকার চক্ষু পরিত্যাগ করত বক্ষে কটাক্ষপাত)—
যদি অধম আয়সী
মলয় বাসে চন্দন হোয়ও !
সুর-নর-দুর্লভ ও যুগ মলয়
মন্দরে বাসি চির চন্দন সৌরভ
কাঁহে নাহি ভেয়ব ?
(নেপথ্যে শব্দ, উভয়েই সশঙ্কিত)
রাধে চরণমে দিও মোরে ঠাঁই—
পাসরিবি নাহি অব হম যাই !
যামিনী আয়ল
চাঁদিমা উদয়ল

সিদাম ধোঁড়ত মোয়।
বলাই বিথাদিত সুবল ঘোমত
রোয়ত ধেনুদল তৃণদল ত্যজই!
চরণে কোকনদে রেথ মোর ঠাই
বিদায় দেহ মোরে অব হম যাই!—
(দীর্ঘ নিশ্বাস)

(রাধিকা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ)

:—এক বাত ভালা আছলু পাসরিউ
মিনতি রাধে দেহি মোর বাঁশরী!

রাধিকা।—(উপাধানের নিম্ন হইতে বাঁশরী গ্রহণ)—

বাঁশরী কাল হমারি
হরি বাঁশরী না দিব তোহারে!
তাল মান-হীন নিলাজ বাঁশরী
বাজত যব দিল চায়!
কাল অকাল নাহি তার জ্ঞান
দিবা রাতি নাহি ভেদ!
শাশুড়ি ননদিনী মাঝারে রহত
বাঁশরী পসত শ্রবণে!
পরাণ ব্যাকুলিত ভেয়ত অমনি
কুটিলা চাহত মুখ পানে!
তার কুটিল বিলোকন-ফণিনী দংশন
হৃদে গুরুতর বাজে!
শরম মরম বিছার জ্বলন
জ্বলত অন্তর মাঝারে!
কাল বাঁশরী আর না দিব তোহারে!—

(শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে বাঁসরীর প্রতি দৃষ্টি)

কহ শুনি বনয়ারী
তব বাঁশরি হাম সমজিতে নারি!
সম্মোহন উন্মাদন শোষণ তাপন
স্তম্ভন ভীষণ বাণ লহরী
কহ কোন বাট দিয়া কেবা বাহিরায়?
কোন বাট দিয়া নিশির সমীর
যমুনা উজন বহায়ও?
কোন বাট দিয়া কেবা কিবা কয়ও?
সচল চাঁদিমা অমনি অচল ভেয়ও!—

(নেপথ্যে শব্দ রাধিকা চমকিতা সেই অবসরে শ্রীকৃষ্ণ বংশী গ্রহণ)—

শ্রীকৃষ্ণ।—সিদাম বোলায়ত মোয়
অব যায়ব রাধে অনুমতি দেহ!
মন প্রাণ মোর রাখি তুয়া পাশ
শূন দেহ লই যায়ব গেহে!
মিনতি রাধে কহ মোর প্রাণ
শূন দেহে পুন আয়বে কব?

(নেপথ্যে শব্দ, উভয়েই বিচলিত চিত্তে গবাক্ষের নিকট পুনরাগমন)

রাধিকা।—পাপ পুরে পুন আয়বি না হরি
বিপদ ভীথণ স্মরইলে শিহরি!
বৃন্দাবন কি দূর বিপিনমে
যুগল তমাল-রাজ বিরাজে!
তথা
বকুল-বেঠিত বিরাজিত মাঝারে
কুসুমে রচিত কুঞ্জ হমারি!
দুয়ারে দুয়ারী যুগল তমাল
তার শ্যামল শেথরে বইঠি
কোকিল-দম্পতী কুহরই মধুরে
বোলায়ত ঋতুনাথে!—
রাধানাথ তুই যায়বি তাতে!
সাধভরি তোয় পূজব রাধে!—
(দীর্ঘ নিশ্বাস)
ধীরে সাবধানে!
অব আনব কি আলা?

আঁধার ভেয়ল ভারি!—
হরি তব বিরহে অব মোর
অন্তর যইসন ভেল!—
শ্রীকৃষ্ণ।—তু' রহ এই ঠাঁই!
তবরূপ জোছনে উজলিত মোর
অন্তর বাহির!
অন আলা না লাগে হমারে!
তবরূপ জোছনে বকুল প্রাচীর
উতরিয়া যাই।
কিন্তু এচাঁদ বিরহে
কইসে জীয়ব ভাবই না পাই—
অব চলব রাধে—(দীর্ঘ নিশ্বাস)—
হম দুরভাগ
সুধাকরে লভি সুধা নাহি পিয়লু—
(রাধিকার মুখচুম্বন)
রাধিকা।—ধীরে •সাবধানে—তরকিত
চরণে—
শ্রীকৃষ্ণ।—(বকুল বৃক্ষের তলায় নামিয়া)
হম সাবধান—তু ভেয়বি রাধে!
অই হের ভ্রমর বকুল প্রসূন
তেয়াজই গুঞ্জরি চলয়ত মন্থরে
তব সুধা-আকর অধর-কমলে
মধুর প্রয়াসে—রোধ তার রাধে
শেল সম মোর নয়নকে রাধে—
(ধীরে ধীরে গমন)
রাধিক।—(দীর্ঘ নিশ্বাস)—
মলয়ানিল তোয় প্রণমত রাধা—
রাধা-হৃদি-পঙ্কজ-মোহন কেশবে
নিরাপদে লহ প্রাচীর পারে।
ধোয়য়ব রাধা তব পদকমলে
নিরমল সিনচধ নয়নকি জলে।
(শ্রীকৃষ্ণ অদৃশ্য ;—রাধিকা দীর্ঘ নিশ্বাস)
(গবাক্ষের উপর বক্ষভার বিন্যস্ত করিয়া
চিন্তা)

নেপথ্যে গীত।
বেহাগ। আড়াঠেকা।
এক কনকবীরণ।
নবীন যুবতী এক কনকবরণী
নিরমল পয়োধরে
রতন আবলি থরে
নিবিড় নিতম্ব ভরে
অধীর মেদিনী।
যৌবন জোয়ার জলে
রূপের তরঙ্গ খেলে
যেন বরিষার কালে
অচল-নন্দিনী।
বঙ্কিম-নয়ন-শরে
বিন্ধিল অন্তরে মোরে
ফুটিল মানস-সরে
কনক-নলিনী
প্রেম-কনক-নলিনী।
নবীন যুবতী এক—ইত্যাদি]
যবনিকা পতন।
ক্রমশঃ—

যৌবনে সন্ন্যাসী।

সুখের বাল্যকাল কাটিয়া গেল। সরল ভাব, উদার ব্যবহার, খোলাখুলি প্রণয়, উচ্চ হাস্যের দিন শেষ হইল। ইস্কুল ঘর, টানা পাখা, পুস্তক-ভার বহন, অধ্যাপকের মিষ্ট প্রিয় উৎসাহ বাক্যের সহিত সম্পর্ক উঠিয়া গেল। ইস্কুলের লোক আমায় ভুলিয়া গেল। আমি তাহাদিগকে, কিন্তু, ভুলিতে পারিলাম না। সেই সেই সুখ-সময়ের স্মৃতি আমায় দিবানিশি কষ্ট দিতে লাগিল। সমপাঠীগণের ভাব বিকৃত হইয়াছে। যে ভাবে তাহাদিগের সহিত বেঞ্চের উপর বসিয়া মাষ্টারকে ফাঁকি দিয়া আস্তে আস্তে গল্প করিয়া এত পরিতোষ লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের এখনআর সে ভাব নাই। কেমন নীরস, কেমন কপট, কেমন এক রকম কেমন কেমন ভাব হইয়াছে, তাহাদের সহবাসে আর তৃপ্তি হয় না।

সুখের বাল্যকাল কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু যে কালে পড়িয়াছি ইহাতে ত তৃপ্তি হইতেছে না। আবার সেই কালে ফিরিয়া যাইতে চাই। কিন্তু পারি না। কেন? আবার ইচ্ছা করে সেই রকম গঙ্গার ধারে বসিয়া সুরেন অমৃত মন্মথ ললিত প্রভৃতির সঙ্গে গল্প করি, আর এক বার প্রাণ ভরিয়া হাসি। তখন কত হাসিতাম, তখনত হাসির এত দরকার ছিল না। এখন দুঃখ-দুর্ভর হৃদয়ে প্রাণ-ভরা হাসি আসিলে অনেক হৃদয়ের দুঃখ লাঘব হয়; কিন্তু এখন হাসিতে পারি না কেন? সেকালের যাহারা ছিল, তাহাদের সঙ্গেতে আর হাসিবার যো নাই; একালের বালকদিগের সঙ্গে মিশি না কেন? মিশিলাম কিন্তু সিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকিলাম মাত্র, তাহারা ত আমার জন্য সেকালের সুরেন নবীন অমৃতের মত সহানুভূতি অনুভব করে না। তাহারা তাহাদের মত লোক চায়; আমি চাই আমার সেকালের মত, আমার সঙ্গে তাহাদের কেন মিল হইবে? বিষ্ণুঘোষাল বুড়া কালেও বলিত "আমার ইয়ার আজিও জন্মায় নাই" আমিও তাহাই শুনিয়া ছেলের দলে মিশিলাল। কি জানি কেন? কি জানি কোন অভিমানে বা কোন্ কারণে আমি বিষ্ণু ঘোষালের মত হইতে পারিলাম না। ছেলের দলে মিশা হইল না। তাহারা আমার ভাব বুঝিল না, তাহারা আমায় দলে লইল না।

কবিরা যৌবন সুখের কাল বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাবা মাথা মুণ্ড বকিয়া গিয়াছেন মাত্র, কই আমারত পূর্ণ যৌবন, আমার কিছুই ভাল লাগে না কেন? যৌবন প্রেমের সময়, প্রণয়ের সময়, ভাল বাসার সময়; যৌবন কার্য্যের সময়

সংসার প্রবেশের সময়, উন্নতির সময়, বড় বড় কাজ করিবার সময়, যশোলাভ ও বিদ্যালাভের সময়। ছাই কিছুই নহে, যৌবন অভুক্ত উৎকট লালসার সময়। এই সেই কাল, যে সময়ে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।

যাই ধরি, যাই করিতে যাই, তৃপ্তি হয় না। কাজ করিয়া তৃপ্তি হয় না, ভাবিয়া তৃপ্তি হয় না, ভাল বাসিয়া তৃপ্তি হয় না, যশোলাভে তৃপ্তি হয় না, বিদ্যা লাভে তৃপ্তি হয় না, ধন লাভে তৃপ্তি হয় না। লালসা ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আরও চাই, এই টুকু আরও চাই, মন কেবল এই একমাত্র জবাব দেয়। আজি একটী কার্য্যে সফল হইলাম; মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল, ভাবিলাম স্বর্গ হাতে। রাত্রি প্রভাত হইল, কালিকার আনন্দ স্মরণ হইল। কারণ অনুসন্ধান করিলাম—দেখিলাম এই টুকু—এই রূপ নৃত্যকর আনন্দের সঙ্গে কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় না? মনে কর তাই হইল। আনন্দ ইহা অপেক্ষা কি ঘনতর হয় না? তাহার পর এই কথা মনে হয়, তৃপ্তি কিছুতেই হয় না। যৌবন অতৃপ্ত লালসার সময়, উহাতে সুখের লেশ মাত্র নাই।

যৌবনে লোককে পাগল করিয়া তুলে। যিনি সুখী তিনি সুখের ভাবনায় পাগল, তাঁহার কিছুতেই সুখ হয় না। যিনি দুঃখী, তিনি দুঃখের ভাবনায় পাগল, যিনি প্রণয়ী তিনি প্রণয়ের জন্য পাগল, যিনি প্রণয়-শূন্য তিনিও প্রণয়ের জন্য পাগল, তোমার আছে তুমি বাড়াইবার জন্য পাগল, আমার নাই আমি পাইবার জন্য পাগল। কোম্পানি বাহাদুর পাগল শাসিত করিবার জন্য বাতুলালয় স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত দেশটা যখন পাগলময় তখন ভবানীপুরে একটী বাতুলালয় করিলে কি হইবে? বাতুলালয়ের ডাক্তার সাহেব! তুমি যৌবনের বুক চিরিয়া দেখ দেখি তোমার কত বাতুল রোগী দেশে আছে? এই যে আমি নবীন পুরুষ কলম ধরিয়া যৌবনে সুখ নাই প্রতিপন্ন করিতে বসিয়াছি, যদি আমার মনের সব ভাব গুলি তুমি টের পাও, তবে কি তুমি আমায় এই খানে বসিয়া থাকিতে দাও? কখনই না। তবে তোমার বাতুল আরাম করার চেষ্টা সকল বিফল।

যৌবনে সকল ইন্দ্রিয়ই প্রবল হয়। সকল ইন্দ্রিয়ই আহার চায়। সকলেই উদ্দাম হইয়া উঠে। কেহই আহার পর্য্যাপ্ত হইল বলিয়া তৃপ্ত হয় না। যদি পর্য্যাপ্ত হয় আরও তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, যদি না হয় পর্য্যাপ্তির জন্য ব্যস্ত হয়। কিন্তু আসঙ্গলিপ্সা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী হয়, আবার কাহারই সহবাসে তৃপ্তি হয় না। ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে। ভাল বাসি কিন্তু সুখ হয় না। আজি একটী সুন্দর মুখ দেখিলাম, ভাবিলাম, এই মুখের কাছে থাকিলেই তৃপ্তি হইবে। তাহার কাছে গেলাম, সে হয়ত অতি পাষণ্ড, না হয় সে আমার সঙ্গ ভাল বাসিল না;

কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলাম। আজি তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়া তোমায় ভাল বাসিলাম। কালি তোমার দোষ দেখিয়া তোমায় ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলাম। আমার ভাল বাসা চিরস্থায়ী হইল না, আসঙ্গলিপ্সা ফলবতীও হইল না, সুখেরও হেতু হইল না।

হয়ত আর একজন—মনের বিচিত্র গতি —আমায় ভাল বাসিল; যখন জানিলাম মন কৃতজ্ঞতা রসে পূর্ণ হইল; কিন্তু কেমন আবার মনের গতি—তাহাকে ভাল বাসিতে পারিলাম না। সযৌবন সঙ্গীগণের সঙ্গে তৃপ্তি হইল না; নিকট গেলাম বৃদ্ধগণের, আমার সমবয়স্ক লোক ভাল বাসিতে জানে বৃদ্ধদিগের সে প্রবৃত্তির ধার মরিয়া গিয়াছে। হয়ত একজন বৃদ্ধের নাম যশ সদ্‌গুণ শুনিয়া তাঁহার নিকট গেলাম, যাইবার সময় ভরসা করিয়া গেলাম নিশ্চয়ই সহানুভূতি পাইব। হয়ত তাহার মুখ দেখিয়াই চটিয়া উঠিলাম। না হয় তাহার নীরস নিঃস্নেহ আমন্ত্রণে তৃপ্তি হইল না। ফিরিলাম, আসঙ্গলিপ্সা কোথাও সুখকরী হইল না। রমণী-সন্নিধান যৌবনের প্রধান সুখের কারণ; গেলাম তথায় কিন্তু সকলেই আমায় দেখিয়া ঘোমটা দিয়া পলায়ন করিল। বাল্যে কৈশোরে যে কাদম্বিনী কত হাসিত কত গল্প করিত, একটী ছেলেকে দিয়া আজ বাহিরে জলখাবার পাঠাইয়া দিল। কাদম্বিনী দিয়াছে ফেলিতে পারি না; কিন্তু তাহার স্বাদ লবণাক্ত।

পাঠক মনে করিলেন লেখক বিবাহিত নহেন, সে কথায় কাজ নাই। মনে কর শেষ কোথাও স্থান না পাইয়া গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইলাম। গৃহিণী—আমার ছাড়া আর কাহাকে ভাল বাসা দেখাইলে দোষ হয় এই জন্য ভাল বাসা দেখাইলেন কিন্তু আমি কি জানি না যে উভয়ে স্বাধীন না হইলে ভাল বাসা হয় না। যত দিন বিবাহ বন্ধন থাকিবে, ততদিন স্ত্রী-প্রণয় প্রণয়ই নহে, একবারের চুক্তিমত কাজ করা মাত্র। চুক্তি যদি কাহার কপালে ভগ্ন হয় তবে সেত সন্ন্যাসী, আর অতৃপ্ত-আসঙ্গলিপ্স আমিও সন্ন্যাসী।

ভাল বাসিলাম সে ক্ষণিক, সঙ্গ করিলাম সে ক্ষণিক, ভক্তি করিলাম সে ক্ষণিক, স্নেহ করিলাম সেও ক্ষণিক, আশা মিটিল না, তৃপ্তি হইল না। চিরস্থায়ী কিছুই হইল না। মানুষের চঞ্চল স্বভাব, উহাদের খামখেয়ালি মেজাজের উপর আমার সুখের ভিত্তি নির্ম্মাণ কখনই উচিত নহে। অতএব যে প্রণয় লইয়া যৌবন কবি কল্পনায় পরম সুখের সময় বলিয়া পরিগণিত, সে প্রণয় অতি তুচ্ছ পদার্থ। তাহারও আবার মূল্য অত্যন্ত অধিক—স্বাধীনতা-বিনিময়—এবং সেও অতি দুর্লভ। এই জ্ঞানটী জন্মিল, আর সন্ন্যাসীতে আমাতে প্রভেদ কি?

মানুষ খামখেয়ালি, মানুষ চঞ্চল, মানুষ নশ্বর, মানুষের প্রণয়ের মূল্য অধিক, কিন্তু আমি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। এমন কোন জিনিস পাইতে চাই যে

কাজ কর্ম্ম করিয়া তাহাকে লইয়া সুখে সময় কাটাইতে পারি। সে জিনিসটী কি? তবে আকাশকে ভালবাস, আকাশ যখনই দেখ নয়ন জুড়ায়, প্রাণ প্রফুল্ল হয়। আকাশ চঞ্চল নয়, অব্যাপাবৃত্তি নহে—অনন্তকালস্থায়ী চন্দ্র ভাব, চন্দ্রকে ভাল বাস। মলয় পবন! তোমায় অনেক দিন হইল বড়ই ভাল বাসিতে লাগিয়াছি। তুমি যখনই আইস শরীর জুড়ায়, উষ্ণ মস্তক শীতল হয়, মনের অৰ্দ্ধেক যন্ত্রণা দূর হয়। যখন ধীরে ধীরে ধীরে রাত্রি দশ-টার সময় গাঢ় চিন্তার সময় তুমি আমার বক্ষে ও মুখে লাগ তখন তোমায় ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি নাই; কিন্তু যখন তুমি চাঁদ আর আকাশ আমার ভাল বাসার পাত্র হইলে তখন আমার গৃহে কাজ কি? আমিত সন্ন্যাসী—নবীন যৌবনে আমি সন্ন্যাসী।

যখন ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়, যখন অন্তর্জগতে সদসৎ প্রবৃত্তিতে ঘোরতর গৃহ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, যখন নৈরাশ্য হৃদয়ের প্রতি কন্দর শূন্য করিয়া ফেলে, যখন দারুণ অভুক্ত লালসা সফল করিবার জন্য পরিশ্রম ও ভাবনায় শারীর ও মানস বৃত্তি সকল একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে,—তখন এক উপায়—এক সুখের উপায়—স্বভাব-সৌন্দর্য্য পর্য্যালোচনা। আমাদের মনে এমনই একটী শক্তি আছে যে যাহা কিছু বৃহৎ প্রকাণ্ড, যাহা কিছু নূতন ও যাহা কিছু সুন্দর, আমাদিগের সুখ সমুৎপাদন করে। কারণ উহা প্রকাণ্ড অনন্ত অনন্তকালব্যাপী ঈশ্বরের আভাস মাত্র।

তবে ভাল কথা সেই ঈশ্বরকেই ভাল বাস না কেন? দেখ আকাশ মেঘাবৃত হয়, মলয়-মারুত ঋতুমাত্রস্থায়ী, চন্দ্রেরও পদে পদে বিপৎ, অতএব এমন এক জন লোক লও না, যিনি তোমার মন হইতে অপনীত হইবার নহেন। তাঁহার চিন্তা কর না কেন? যখন ক্লান্ত হইবে, যখন নিরাশ হইবে, তখন সেই প্রকাণ্ড অনন্ত সর্ব্বকালব্যাপী ঈশ্বরের চিন্তা কর না কেন? জানু পাতিয়া বা কর উত্তোলন করিয়া অথবা করযোড়ে ঘাড় হেঁট করিয়া বল না কেন:—

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগতাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥

যে হৃদয় এখন শূন্যময় ভাবিতেছ, যেখানে কেবল দুঃখ দুর্ভরতা মাত্র দেখা যাইতেছে, সেইখানে আনন্দ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিবে। সে আনন্দ—অক্ষয়—অনন্ত—পবিত্র; যেহেতু যাঁহার সহবাসে সে আনন্দ লাভ করিতেছি, তিনি সৎ—চিৎ—আনন্দ!

নলিনী।

শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত, কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অধর বাবুর ললিতাসুন্দরী ও মেনকা তাঁহাকে অনেকের নিকট পরিচিত করিয়াছে। এই তিন খানি পুস্তক ক্রমানুসারে তাঁহার ক্রমোন্নতির পরিচয় দিতেছে। 'নলিনী'তে তাঁহার ভাষার প্রাঞ্জলতা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। ইহাতে তিনি নিরাশ প্রণয়ের এক নূতন চিত্র দেখাইয়াছেন। যে নিরাশ-প্রণয় হইতে

কেন দেখিলাম
বিস্তৃত সরসীমাঝে, বেষ্টিত শৈবাল-রাজে
রক্ষিত ভুজঙ্গ-দন্তে ফুল্ল-কমলিনী
কেন দেখিলাম সেই সর-সোহাগিনী?'

এইরূপ চিন্তায় যে মন অনুতপ্ত হয় ও যে পার্থিব মনে 'রক্ষিত ভুজঙ্গ-দন্তে' এই বাক্য শেল সম বিদ্ধ হয় সে প্রণয়ের বা সে মনের চিত্র ইহাতে দর্শিত হয় নাই। আবার

'যে মনে তোমায় ভাল বাসিয়াছি আমি
নিরমল, পাপশূন্য—পাপ আকাঙ্ক্ষায়
নহে কলুষিত তাহা, তুমি কি জাননা আহা
ভালবাসা তরে ভাল বেসেছি তোমায়'

সে মনের পরিস্ফুট, নিঃস্বার্থ ও নির্ম্মল ভাবের চিত্রও ইহা নহে। আয়েসার নিরাশ-প্রণয়ে যে গভীর, নিভৃত, নিঃস্বার্থ, স্বর্গীয় আধ্যাত্মিক ভাব আছে ইহা তাহারও চিত্র নহে। ইহার প্রণয়ী নলিনীকে ভাল বাসিলেন, তাহার জন্য উন্মত্ত হইলেন, কিন্তু নলিনী ভাল বাসিল না। নলিনীর প্রণয়ে হতাশ হইয়া প্রণয়ী নিরাশসাগরে ভাসিলেন। ভাসিলেন, কিন্তু ডুবিলেন না। ভাসিতে ভাসিতে এমত এক স্থানে গিয়া উঠিলেন যেখানে সুখ দুঃখ আপনার অধীন, কাহারও অনুরাগ বিরাগ বা অবস্থার অনুকূলতা প্রতিকূলতার উপর নির্ভর করে না। প্রণয়ী বহির্জগতে নলিনীকে পাইলেন না, না পাইয়া বহির্জগতের প্রতি তাঁহার অনাস্থা জন্মিল, উহার অসারতা ও অনিত্যতা বুঝিলেন, বুঝিয়া অন্তর্জগতের আশ্রয় লইলেন। এ আশ্রয় লইয়া শান্তি পাইলেন। দেখিলেন এখানে তাঁহার নলিনী আছে, আরও দেখিলেন এখানে যাহা কিছু আছে সকলই আয়ত্ত, দেখিয়া অন্তর্জগতের প্রতি তাঁহার আস্থা হইল, ক্রমে তিনি অন্তর্জগতের লোক হইয়া পড়িলেন, তাঁহার জীবন 'ভাবনার সমাহার' বলিয়া বোধ হইল; এবং বহির্জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। 'মানসসরসে নলিনীর প্রায়' যাহাকে দেখিলেন সে পার্থিব নলিনী হইতে গঠিত হইলেও ইহার মত দুঃখময় বলিয়া তাঁহার বোধ হইল না। পার্থিব নলিনী তাঁহার নিকট

কণ্টকাবৃত কমল, যখনই তাহার জন্য হস্ত বাড়াইয়াছেন কণ্টকে ব্যথিত হইয়াছেন। কিন্তু মানস-নলিনী-কণ্টক শূন্য কমল, যখনই তাহা ধরিতে যান তাহার কোমল দল-স্পর্শে সুখী হন।

এমত অবস্থায় যখন নলিনী আসিয়া তাহার ভালবাসা জানাইল তখন তিনি তাহাকে বলিলেন

"থাকুক তোমার
অকলঙ্ক তনু শশী ; লোহিত অধরে
যদি কিছু সুধা ধরে, অন্য কোন মধুকরে
করুক তা পান, আমি হ'ব না তোমার
ওরে নলিনী আমার"
"কে আনিতে পারে আর কে এনেছে কবে
যে প্রেম ডুবিয়ে গেছে বিরাগের জলে"
ইত্যাদি

কিন্তু আবার সেই অবস্থায় 'মানস-সরসে' যে নলিনীকে দেখিলেন তাহাকে কহিলেন

"চিন্তার সাগরে তুমি একই লহরী
আশার অমরাপুরী, তাহে এক বিদ্যাধরী
একই কুসুম তুমি ভাবনা শোভার
ওরে নলিনী আমার
"এস, এস সেই তব রূপের তরঙ্গে
ধীরে ধীরে পরশিয়ে, সুতনু, তোমায়,
রাখিয়া মস্তক তব কোমল উৎসঙ্গে
দেখিব, কেমন এই যামিনী পোহায়
"পোহাবে যামিনী
পোহাবে না সে যামিনী তুমি যার শশী
রখিব একাকী বসি, অবিরাম পৌর্ণমাসী
অনন্ত শশাঙ্ক তসে অনন্ত যামিনী
অয়ি আমার নলিনী"

অন্তর্জগৎ-সর্ব্বস্ব প্রণয়ীর নিকট বহির্জগতের নলিনী আদর পাইল না, সে প্রণয়ী আপনার ভাবেই আপনি বিভোর, বহির্জগতের কোন বস্তুর নিকট ভাবের আকাঙ্ক্ষা করেন না ; তাঁহার অন্তর্জগতে সকল বস্তুই রহিয়াছে, সেইখানে যে নলিনী আছে, সেই নলিনীই তাঁহার যত্নের ধন। বঙ্কিম বাবুর 'রজনী'তে এক স্থানে এইরূপ মানসিক ভাব দেখা যায়। অমরনাথ বলিতেছেন

"সুখ দুঃখ পরের হাত না আমার নিজের হাত? পর, কেবল বহির্জগতের কর্ত্তা—অন্তর্জগতে আমি একা কর্ত্তা। আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারি না কেন? জড়জগৎ জগৎ, অন্তর্জগৎ কি জগৎ নয়? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না? তোমার বাহ্য জগতে কয়টী সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কিবা নাই? আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তোমার বাহ্যজগৎ দেখাইবে, সাধ্য কি? যে কুসুম এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগনে উঠে, যে সাগর এ অন্ধকারে আপনি মাতে তোমার বাহ্যজগতে তেমন কোথায়?"

অন্তর্জগতে এইরূপে মিশাইয়া যাওয়া ভাল কি মন্দ তাহা আমরা বলিতে চাহি না। কিন্তু প্রকৃতি পুরুষের এইরূপ বিচ্ছেদই এক সময়ে মোক্ষ প্রাপ্তির এক মাত্র

উপায় বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু সে সময় গিয়াছে অধুনাতন হিতবাদ, সুখবাদ দর্শন মোক্ষকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মানে না। সুতরাং ঐরূপ মানসিক অবস্থার সহিত এক্ষণকার সহানুভূতি নাই আমাদেরও সহানুভূতি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা উহার মহত্ত্ব, উহার উচ্চতা ও উহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে অক্ষম নই: এবং ইহাতে যে যথেষ্ট ক্ষমতার আবশ্যক তাহাও স্বীকার করি। যে সে মনে করিলে অন্তর্জ্জগতে রাজত্ব করিয়া সুখ ভোগ করিতে পারে না। ইয়ুরোপীয় শিক্ষায় যে সকল ভাব, যে সকল ইচ্ছা অন্তরে উঠিয়াছে আমাদের সমাজের অবস্থায় তাহাদের অধিকাংশের তৃপ্তি সম্ভব। এই সকল স্থলে আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে অন্তর্জ্জগতে রাজত্ব করিয়া থাকি এবং ইহা করি বলিয়াই আমরা অনেক স্থলে অসুখী হইয়াও সুখী, নীচ হইয়াও উচ্চ, কিছু নাই তবু রাজা। বহির্জ্জগৎ সঙ্কীর্ণ হইয়াও আমাদিগকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। তবে যিনি অন্তর্জ্জগতের ও বিস্তারঅন্তর্জ্জগতের সুখ বহির্জ্জগতের বিস্তার ও বহির্জ্জগতের সুখের উপায় স্বরূপ মনে না করেন; পরন্তু তাহাকেই লক্ষ্য ভাবিয়া তাহাতেই সকল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি করেন তাঁহার সহিত আমাদের সহানুভূতি হইতে পারে না। কিন্তু অনেক দগ্ধ হৃদয়ের আবার এই অন্তর্জ্জগৎই লক্ষ্য, ইহাই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির একমাত্র স্থল। যে মূর্ত্তি যে হৃদয় এক সময় সে দগ্ধ-হৃদয় পূরণ করিয়াছিল এবং এক্ষণে শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে মূর্ত্তি সে হৃদয় আর কখন বহির্জগতে দেখিবে না, অন্তর্জ্জগতে ভিন্ন আর কোথাও তাহার অস্তিত্ব নাই; সুতরাং এই অন্তর্জ্জগৎই তাহার এক মাত্র সান্ত্বনার স্থল এবং এক মাত্র সুখের উপায়।

পরিশেষে বক্তব্য এই অধর বাবু চিত্রটী তত পরিস্ফুট ও সুন্দর করিতে পারেন নাই। এবং এক দিকে যেমন প্রণয়ীকে তুলিয়াছেন অপর দিকে তেমনি নামাইয়াছেন। নলিনীর প্রণয়ে উপহাস ও নলিনীর অবস্থায় ঈষৎ আহ্লাদ ভাব তাঁহার মত প্রণয়ীর উপযুক্ত হয় নাই। আর অনেক স্থলে অনেক ভাবের অসঙ্গতি ও অনাবশ্যকতা দেখা যায়। এই কয়টী দোষ পরিহার করিলে চিত্রটী অতি সুন্দর হইত। তাঁহার ভাব সকল অতি মনোহর ও স্থানে স্থানে মধুর-কবিত্ব-পূর্ণ। যে দুই একটী কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, বিশেষতঃ 'পোহাবে যামিনী...' ইত্যাদি কবিতা হইতেই পাঠকবর্গ ইহা বুঝিতে পারিবেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আর্য্য দর্পণ।—(অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ঐতিহাসিক উপন্যাস)। শ্রীবৈদ্যনাথ বরাট কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥৹ আনা মাত্র। ইহাতে ঈশ্বরতত্ত্ব, সৃষ্টি-প্রকরণ, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ প্রভৃতি কতকগুলি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বিষয়ের, এবং মানবজাতির আদিম পুরুষ ও আদি বাসস্থান, জাতিসৃষ্টি, সমুদ্রমন্থন, আর্য্য-জাতির জগতে ক্রমিক বিস্তৃতি, পৌত্তলি-কতার মূল তত্ত্ব প্রভৃতি দুজ্ঞের্য় বিষয়ের কথোপকথনচ্ছলে গবেষণা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে বিশেষ পাণ্ডিত্য ও গভীর অনুসন্ধিৎসা দেখাইয়াছেন। কিন্তু আমা-দিগের বোধ হয় যেন অনেক স্থলে পণ্ডশ্রম করা হইয়াছে। কারণ যে সকল বিষয়ে অদ্যাবধি তত্ত্ব নিরূপিত হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই, তাহাতে আর বৃথা মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত করিবার প্রয়োজন কি? কোন স্থলে আবার তর্কগুলি অস্ফুট ও ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা নিম্নে দুই একটী উদাহরণ প্রদান করিলাম।

ঈশ্বর স্বয়ং জন্মিয়াছেন কি না ইহার মীমাংসা স্থলে লিখিত আছে "মনে করুন যদি তিনি স্বয়ং জন্মাইতেন, তবে তিনি বাস করিবার নিমিত্ত ও জীবন ধারণ জন্য এই সমস্ত পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, অগ্নি ও সর্ব্বপ্রকার আহারীয় দ্রব্য ফল মূল শস্যাদি তাঁহার স্বয়ং জন্মাইবার পূর্ব্বে যে প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন তাহা অস-ম্ভব। অতএব তিনি স্বয়ং জাত নন্ প্রতি-পন্ন হইল।" এই তর্কটী নিতান্ত অস্ফুট। তথাপি ইহা হইতে এই অর্থ নিষ্কৃষ্ট করা যাইতে পারে:—যিনিই জাত, তিনিই আহারাদি-সাপেক্ষ। ঈশ্বর জাত, সুতরাং তিনিও আহারাদি-সাপেক্ষ; সুতরাং আত্ম-জন্মের পূর্ব্বে তাঁহাকে আহারাদি সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল; কিন্তু আত্মজন্মের পূর্ব্বে আত্মকৃত সৃষ্টিক্রিয়া অসম্ভব; সুতরাং তিনি স্বয়ং জাত নন্।—ইহা ভ্রান্তিসঙ্কুল। কারণ 'ঈশ্বর স্বয়ং জাত নন্' ইহা এ তর্কে প্রমাণীকৃত হইল না। আমরা স্বীকার করিলাম—জাত জীবমাত্রই পঞ্চভূত চন্দ্র সূর্য্য ও ফল মূল শস্যাদি আহারীয় সাপেক্ষ। ঈশ্বর যদি জাত হন, তাহা হইলে তিনিও তৎসাপেক্ষ—ইহাও স্বীকার করিলাম। কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং জাত হইলে, তাঁহাকে যে আত্মজন্মের পূর্ব্বে সমস্ত সৃষ্টি করিতে হইবে তাহারই বা আবশ্যকতা কি? যে সময়ে তিনি স্বয়ং সৃষ্ট হইলেন, সেই সময়ে তাঁহার উপযোগী পৃথিব্যাদিও স্বয়ং সৃষ্ট হইতে পারে। সুতরাং আত্মজন্মের পূর্ব্বে ঈশ্বর কর্ত্তৃক পৃথিব্যাদি সৃষ্টি অসম্ভব হই-লেও যে ঈশ্বর স্বয়ং জাত নন্ তাহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইল?

ঈশ্বরের অনাদিত্ব বিষয়ে লিখিত

আছে:—"যদি বলেন তিনি অনাদি, তাহা হইলে, তিনি অনন্ত হইতেন। কারণ যাহার আদি নাই তাহার অন্তও নাই, এবং যাহার আদি আছে তাহার অন্তও আছে। যখন তাঁহার অন্ত (দেহ-ত্যাগ বা মৃত্যু) হইয়াছে, তখন অবশ্যই তাঁহার আদি আছে, কখনই অনাদি নহেন, অতএব তিনি আমাদিগের আদি জাত পুরুষ।"

সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে ঈশ্বর আমাদিগের আদি জাত পুরুষ। কিন্তু গ্রন্থকার যে পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা হইতে এ সিদ্ধান্তে কিরূপে উপনীত হওয়া যায় বলিতে পারি না। গ্রন্থকার বিনা প্রমাণে ও বিনা ভূয়োদর্শনে এই সিদ্ধান্ত অবতারিত করিলেন যে—যাহার আদি নাই তাহার অন্তও নাই, এবং যাহার আদি আছে তাহার অন্তও আছে। আবার কোথা হইতে আনিলেন যে—তাঁহার অন্ত হইয়াছে। তাহা হইতে আবার সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে যখন অন্ত হইয়াছে তখন অবশ্যই আদি আছে, সুতরাং তিনি অনাদি নহেন। এরূপ ভ্রান্ত প্রতিজ্ঞা-পরম্পরা হইতে গম্ভীরভাবে এরূপ অপসিদ্ধান্ত-অবতারণা করা দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার আর্য্যদিগের পুরাবৃত্ত ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেক নূতন আলোক বিকীর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আত্মমত সমর্থনের জন্য কোন প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। তিনি ঔপমিক ভাষাতত্ত্বের সাহায্য লইয়া শব্দ-সাদৃশ্য মাত্র অবলম্বন করিয়া অনেক নূতন মত অবতারিত করিয়াছেন। দুই চারিটি উদাহরণ দিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

Jove or Jehova যবা দেবতার উপাসকদিগকে যবন কহে।

যবা দেবতা হইতেই যে যবন শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে তাহা তিনি জানিলেন কিরূপে? কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা যাওনিয়ান্ (Ionian) দিগকেই যবন শব্দে অভিহিত করিতেন, আবার এক দল বলেন সিন্ধু নদীর পশ্চিম পারবর্ত্তী সকলকেই হিন্দুরা সাধারণ্যে যবন শব্দে নির্দ্দেশ করিতেন। নূতন মত অবতারণ করার সময়ে এই মতদ্বয় খণ্ডন করা তাঁহার উচিত ছিল।

Moloch মলিক্ষ দেবের উপাসকেরা ম্লেচ্ছ জাতি। ইহা তিনি কোথায় পাইলেন? ইহার প্রামাণ্য সংস্থাপনের জন্য গ্রন্থকার একটী কথাও বলেন নাই।

(৩) পুরু—পৌরব—Pharaoh.

মিসর দেশের পুরাবৃত্ত লিখিতে গিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেনঃ—"অনন্তর কিছু দিন অতীত হইলে মনু নামে এক জন পুরুবংশোদ্ভব রাজপুত্র পিতা কর্ত্তৃক অভিসম্পাতিত হইয়া অনেক অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় পলায়ন করেন। এ দেশীয় ভারতীয় নাবিক ও বণিক্‌গণ যাহারা মিসরে ইতিপূর্ব্বে বাস করিয়াছিল, তাহারা দেশীয় রাজপুত্র দর্শনে পুলকিত হইয়া

তাঁহাকে তথাকার রাজসিংহাসনে অভিষেক করিলেন। এইরূপে আর্য্যরাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া মনু তথাকার স্বাধীন রাজা হইলেন এবং তাঁহার বংশোদ্ভব রাজন্যেরা পৌরব নামে বিখ্যাত হইলেন।”

ইহা শুনিতে অতি মিষ্ট লাগিল; কিন্তু গ্রন্থকার কি কি প্রমাণ অবলম্বন করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না।

আবার এক স্থলে Babylon শব্দের ব্যুৎপত্তিতে লিখিয়াছেঃ—

(8)বি=বৈষম্য, বলন=বাক্য, বিবলন=বৈষম্যযুক্ত বাক্য—Babylon or Babel—means confusion of the tongue.

তিনি বলেনঃ—

“জলপ্লাবনের প্রায় দুই শত বৎসর পরে যখন পুনরায় মনুষ্য জাতিতে ধরা পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, তখন কালডিয়াবাসিরা পাছে পুনরায় ঐরূপ জলপ্লাবনে বিনষ্ট হয় এই ভয়ে অগ্রে সাবধান হওয়াই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া এক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু বহুসংখ্যক লোকের কোলাহল জন্য সকলেই পরস্পরের বোল বুঝিতে পারিল না। অতএব সকলে বিবোল অর্থাৎ পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর দিতে অসমর্থ হওয়াতে ঐ মন্দির সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইল না। সেই অবধি সেই স্থানের নাম বিবোল অথবা বিবলন হইল।”

এরূপ অনুমানে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রকাশ পাইতেছে সত্য, কিন্তু বিনা প্রমাণে আমরা এরূপ অনুমানের সত্যতা স্বীকার করিতে পারি না।

বেদ-প্রকাশিকা বা ঋগ্বেদসংহিতা।—ভাষা, সংক্ষিপ্ত টীকা, বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাঙ্গালা টীপ্পনীর সহিত শ্রীরমানাথ সরস্বতী এম, এ কর্ত্তৃক বিশদীকৃত, ব্যাখ্যাত, ভাষান্তরীকৃত ও প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড। প্রাচীন আর্য্যদিগের অতুল কীর্ত্তি এই ঋক্‌বেদ। এই ঋগ্‌বেদ কতকগুলি ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র। এই মন্ত্রগুলি যে কোন্ সময় সংরচিত হয়, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। বোধ হয় ইহার কতকগুলি প্রাচীন আর্য্যদিগের ভারতে আগমনের পূর্ব্বে এবং কতকগুলি তাহার পরে সংরচিত হয়। যাহা হউক ইহাদিগের সংরচন কালের নির্ণয় অসম্ভব হইলেও, ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পরাশর-তনয় ব্যাসদেব তাহাদিগের সঙ্কলন করেন। এই সকল মন্ত্র ইন্দ্রাদি দেবগণকে উদ্দেশ করিয়া বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইয়াছিল। এই সকল মন্ত্র পাঠ করিলে প্রাচীন আর্য্যদিগের পুরাবৃত্ত, সুরীতি, নীতি, চরিত, সমাজবন্ধন এবং আচার ব্যবহার জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। এই জন্য এই ঋগ্বেদসংহিতার বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রচার একান্ত আবশ্যক। সরস্বতী মহাশয় এই মহৎ ব্রতে ব্রতী হইয়া বঙ্গবাসী হিন্দুমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণের সাহায্য

ব্যতীত এরূপ মহৎ ব্রতের উদ্যাপন অসম্ভব। এই জন্য আমরা বঙ্গবাসী হিন্দু মাত্রকেই ইহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে অনুরোধ করি। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন অবিলম্বে ২৩নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট মৃজাপুরে সরস্বতী মহাশয়ের নিকট আপন আপন নাম ধামাদি প্রেরণ করেন। ঋগ্বেদ বিষয়ে আমাদিগের অনেক বক্তব্য আছে, ইহার সমালোচন উপলক্ষে পরে আমরা তাহা বলিব।

রামায়ণ—মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত। মূল সংস্কৃত হইতে শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত। সটীক। কলিকাতা আল্‌বর্টে প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ।৶৹ ছয় আনা।

মহাভারত—আদিপর্ব্ব। মূল সংস্কৃত হইতে শ্রীনিমাইচরণ সিংহ কর্ত্তৃক পদ্যে অনুবাদিত। শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিশেষ আনুকূল্যে প্রকাশিত। হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য অগ্রিম, বাৎসরিক ৩ টাকা, প্রতি খণ্ডের ।/১০।

সংস্কৃত-সাহিত্য-ভাণ্ডারের দুই অমূল্য রত্ন রামায়ণ ও মহাভারত। পৃথিবীতে যে কয়খানি মহাকাব্য আছে, রামায়ণ ও মহাভারত তাহার যে কোন খানিরও অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে তাহা বৈদেশিক পণ্ডিতমণ্ডলীই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। আর্য্যগণের সেই দুই প্রকাণ্ড কীর্ত্তিস্তম্ভের পদ্যময় প্রতিবিম্বগ্রহণে রাজকৃষ্ণ বাবু ও নিমাই বাবু প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের উভয়েরই অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। উভয়ে যেরূপ গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার উদ্যাপনে যে শুদ্ধ অসাধারণ কবিত্ব, অসামান্য পাণ্ডিত্য ও অবিচলিত ধৈর্য্য চাই এরূপ নহে; সাধারণের উৎসাহ ও ধনিকবৃন্দের বিশেষ অর্থসাহায্য চাই। সাধারণের উৎসাহে ও ধনিকবৃন্দের অর্থসাহায্যে তাঁহারা যে বঞ্চিত হইবেন তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ অল্প। সাধারণের উৎসাহ ও ধনিকবৃন্দের অর্থসাহায্যে বঞ্চিত ও নিরাশ হওয়ার পর ও তাঁহাদিগের ধৈর্য্য যে কত দিন অবিচলিত থাকিবে বলিতে পারি না। আর অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য রক্ষা করা স্বভাবতই দুরূহ ব্যাপার, আবার ছন্দোবন্ধে সেই সৌন্দর্য্য রক্ষা করা আরও কঠিন। আবার বাল্মীকি ও ব্যাসের অসাধারণ কবিত্বের ছায়া মাত্রও প্রতিবিম্বিত করাও বড় সহজ নহে। এই সকল কারণেই বলিতেছিলাম যে রাজকৃষ্ণ বাবু ও নিমাই বাবুর অবস্থা অতি শোচনীয়। যাহা হউক আমরা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতেছি তাঁহাদিগের এই উদার উদ্যম যেন সফল হয়, তাঁহাদিগের ধৈর্য্য যেন অবিচলিত থাকে, তাঁহারা যেন বাল্মীকি ও ব্যাসের কবিত্বের ভাবে অনুপ্রাণিত হন। অবিকল শাব্দ অনুবাদে কখন কোন দেশের মঙ্গল নাই। সুতরাং তাঁহারা যেন অবিকল শাব্দ অনুবাদের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, যে গভীর ও উদার ভাবে সেই মহাপুরুষদ্বয় উন্মাদিত হইয়াছিলেন, সেই ভাবের প্রতিবিম্বনে যত্নপর হয়েন। ছন্দোবন্ধের চাতুর্য্য যেন তাঁহাদিগের কবিতার এক মাত্র লক্ষ্য ও এক মাত্র প্রশংসার বিষয় না হয়। এই দুই প্রকাণ্ড গ্রন্থ আরব্ধমাত্র হইয়াছে, এই জন্য আপাততঃ এই গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিলাম না। কেবল কিরূপ প্রণালীতে ইহাদের অনুবাদ-কার্য্য সম্পাদিত হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে বন্ধুভাবে দুই চারিটী উপদেশ দিয়া, এবং ধনিকবৃন্দকে ও সাধারণ জনগণকে অনুবাদকদ্বয়ের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ আহ্বান করিয়া আমরা অদ্য নিবৃত্ত হইলাম।

বিদ্যাপতি বিহ্লণ।

সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার মধ্যে কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের নাম বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং তাঁহাদিগের কাব্য ও নাটকনিচয় একাল পর্য্যন্ত বিদ্যার্থীগণ অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতেছেন; কিন্তু কবিবর বিহ্লণের নাম গন্ধও অনেকের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে নাই। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকগণের গ্রন্থ মধ্যেও উল্লিখিত কবিনিচয়ের কাব্য হইতে বহুল পরিমাণে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কদেব চরিত মহাকাব্য হইতে কোন উদাহরণ উদ্ধৃত হয় নাই—এমন কি অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি এই গ্রন্থের নাম পর্য্যন্তও শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। সম্প্রতি জশলমীর জৈন ভাণ্ডার হইতে সংস্কৃত বিদ্যা-বিশারদ বুলার মহোদয় একখানি প্রাচীন হস্ত-লিখিত "বিক্রমাঙ্কদেব চরিত" প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই বিশেষরূপে পরিদর্শনান্তর মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। তিনি এতাদৃশ যত্ন করিয়া প্রচার না করিলে কিছু কাল পরে উহার নাম পর্য্যন্ত সাহিত্যসংসার হইতে লোপ হইত। আমরা ঐ মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে কবি-বৃত্তান্ত নিম্নে সঙ্কলন করিলাম।

"বিহ্লণ-পঞ্চাশিকা" এই নামে ৫০ টী কবিতা-পূর্ণ একখানি ক্ষুদ্র কাব্য কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই কবিতা গুলি চোর-কবিকৃত "চোর পঞ্চাশত" বলিয়া এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ। "বিহ্লণ-পঞ্চাশিকায়" একটী ক্ষুদ্র পূর্ব্বপীঠিকা আছে। তাহা কোন আধুনিক পণ্ডিতের কৃত। তাহাতে লিখিত আছে, বিহ্লণ গুজরাটাধিপতি বীরসিংহ-তনয়া চন্দ্রলেখা বা শশিলেখাকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন এবং কিছুকাল পরে রাজকুমারী তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করেন। রাজা এই গোপনীয় বিবাহ ব্যাপার অবগত হইয়া এক কালে ক্রোধে অধীর হওত বিহ্লণের শিরশ্ছেদনের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিহ্লণ বধ্য স্থলে নীত হইলে এই "পঞ্চাশিকা" দ্বারা স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রাজা দূত দ্বারা এই কবিতা প্রাপ্ত হইয়া, পাঠান্তে পরম সুখী হওত বিহ্লণের প্রাণ দান করিয়া চন্দ্রলেখাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। চোর-কবি সম্বন্ধেও এইরূপ গল্প কবিবর ভারত চন্দ্র বিদ্যাসুন্দরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পঞ্চাল দেশে এই গল্পটী ভিন্ন অবয়বে প্রচলিত আছে। যাহা হউক এগুলি গল্পমাত্র, ইহাতে অণুমাত্র সত্য নাই। বিশেষতঃ অনিহীলবারা পত্তনের নৃপতি বীরসিংহ বিহ্লণের একশত বৎসর পূর্ব্বে

(৯২০ খৃষ্টাব্দে) রাজ্য করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নাম উল্লিখিত গল্প মধ্যে প্রচারিত হওয়াতে সমুদায় অলীক সপ্রমাণ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন সুকবি বিহ্লণ বিক্রমাঙ্ক কাব্যে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে "পঞ্চাশিকা" কাব্যের উল্লেখ মাত্র করেন নাই; এবং তিনি যে নানাগুণ-সম্পন্না নৃপতি-তনয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, এ বিষয়েরও উল্লেখ তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না, কাজেই "পঞ্চাশিকা" * চোর-কবি কৃত বলিয়া বোধ হইতেছে এবং ইনি বিহ্লণ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি; সেই কারণেই বিহ্লণ সম্বন্ধে যে গল্প পূর্ব্ব পীঠিকায় লিখিত আছে, তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা সপ্রমাণ হইতেছে।

বিক্রমাঙ্কদেব-চরিতের শেষ (১৮শ সর্গে) কবিবর বিহ্লণ স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই সর্গের প্রারম্ভে কাশ্মীরদেশের প্রকৃতি, জল, স্থল, হ্রদ, নদী (বিশেষতঃ বিতস্তা), পর্ব্বতের ও উত্তম বর্ণন আছে। তাহাতে লিখিত আছে কাশ্মীর মধ্যে "প্রবর" নামক পুরীই শ্রেষ্ঠ; তৎপরে বিতস্তার পুণ্য সলিলের মনোহারিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। কাশ্মীর ললনাগণ ভূবিদ্যাধরী বলিয়া সংস্কৃত ভাষা মাতৃভাষার ন্যায় জানিত। যথা—

"যত্র স্ত্রীণামপি কিমপরং জন্মভাষেব দেব।
প্রত্যাবাসং বিলসতি বচঃ সংস্কৃতং প্রাকৃতঞ্চ॥"

পুনরায় কবি কাশ্মীর রমণী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"দৃষ্টা যস্মিন্নভিনয়কলা কৌশলং নাটকেষু
স্মেরাক্ষীণাং মসৃণকরুণাসঙ্গদত্তাঙ্গহারম্।
রম্ভাস্তম্ভং ভজতি লভতে চিত্রলেখা ন রেখাম্
নূনং নাট্যে ভবতি চ চিরং নোর্ব্বশী গর্ব্বশীলা॥"

অর্থাৎ যে কাশ্মীর-সুন্দরীদিগের অঙ্গভঙ্গী দেখিলে রম্ভা লুক্কায়িত হন, চিত্রলেখার রেখাও থাকে না, উর্ব্বশীর গর্ব্ব ও খর্ব্ব হয়।

তিনি কাশ্মীরীয় কাব্যের অত্যন্ত সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন "যে স্থান হইতে প্রকৃতি-সুন্দর কাব্য ও কুঙ্কুম উৎপন্ন হইয়া জগতের বল্লভ ও দুর্লভ হইয়া আছে" যথা—

"কাব্যং যেভ্যঃ প্রকৃতি-সুভগং নির্গতং

---

* "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" মধ্যে "পঞ্চাশিকা" বিহ্লণকৃত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহার রচনার সহিত বিক্রমাঙ্ক-চরিত কাব্যের রচনার কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য নাই। বিশেষতঃ ভোজদেব "সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে" "পঞ্চাশিকা" হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে বিক্রমাঙ্ক চরিতের একটী শ্লোকও উদ্ধৃত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চোর-কবিকৃত "পঞ্চাশিকা" তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিহ্লণ তাঁহার পরবর্ত্তী কবি, এজন্য তাঁহার গ্রন্থের উদাহরণ "সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে" প্রদত্ত হয় নাই।

কুঙ্কুমঞ্চ। ছায়োৎকর্ষান্তবর্তি জগত্যাং বন্নভং দ্রুল ভঙ্ক॥”

কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ সৌধনিচয়ের মধ্যে ভট্টারক মঠ, হলধর-নির্ম্মিত অগ্রহার, ক্ষেম-গৌরীশ্বরের মন্দির, সংগ্রাম-ক্ষেত্র মঠ, রাজ-প্রাসাদ প্রভৃতির এই সর্গে উল্লেখ আছে। বিহ্লণ নগরের বর্ণন করিয়া তাঁহার সমসাময়িক কাশ্মীরাধিপতিগণের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথমে কাশ্মীরের রাজা অনন্ত দেবের বিষয় লিখিয়াছেন। অনন্তদেব রামবংশীয়। তিনি অসীম পরাক্রম প্রভাবে দারদ ও শকগণকে দমন করিয়া গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন এবং চম্পা, দর্ভ্বিসর, ত্রিগর্ত্তে স্বীয় শাসন-প্রণালী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্ঞীর নাম সুভট। ইনি অতি পুণ্যশীলা ছিলেন। তাঁহার দ্বারা একটী বিদ্যালয় ও বিতস্তার তীরে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজ্ঞী-ভ্রাতা লোহরাখণ্ডল বা ক্ষিতিপতি ক্ষত্রির মধ্যে অতি তেজস্বী এবং ভোজের ন্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদা বৈষ্ণবগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন।

নৃপতি অনন্ত দেবের ঔরসে ও রাজ্ঞী সুভটের গর্ভে কলশরাজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৌর্য্যবীর্য্যশালী নৃপতি ছিলেন এবং জয়পীড়ের ন্যায় কাশ্মীর-মণ্ডলে খ্যাত হইয়া কুরুক্ষেত্র পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার হর্ষ, উৎকর্ষ, ও বিজয়মল্ল নামক নানাগুণ-সম্পন্ন তিন পুত্র ছিল। তাহার মধ্যে হর্ষদেব বীরত্বে পিতার সদৃশ এবং কবিত্বে শ্রীহর্ষকেও পরাভব করিয়াছিলেন। যথা—

“শ্রীহর্ষাদপ্যধিককবিতোৎকর্ষবান্ হর্ষদেবঃ।” তাঁহার ভ্রাতা উৎকর্ষ দেব ক্ষিতিপতির লোহার রাজ্য স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করিয়া, দুরন্ত ম্লেচ্ছ রাজাকে পরাভূত করিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই প্রবর পুরের রাজসিংহাসনে আসীন ছিলেন। এইরূপ কাশ্মীর-রাজগণের বিষয় বর্ণন করিয়া বিহ্লণ আপনার বংশ বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন প্রবরপুরের দুই ক্রোশ দূরে ‘জয়বন’ নামে এক স্থান আছে। এস্থানে নাগরাজ তক্ষকের এক কুণ্ড ছিল। তৎসন্নিকটে ‘খোনমুখ’ নামক গ্রাম আছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কুঙ্কুম ও দ্রাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গ্রামে কৌশিক গোত্রে মুক্তিকলশ নামক এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজ-কলশ জগৎমান্য মহা ভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য ছাত্র ছিল। ইহাঁর স্ত্রীর নাম নাগদেবী, তাঁহারই গর্ভে বিহ্লণের জন্ম হয়। বিহ্লণ দেব, বেদাঙ্গ, শব্দশাস্ত্র ও সাহিত্যে বিশেষরূপে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বিদ্যা সম্বন্ধে এইরূপ দর্প প্রকাশ করিয়াছেন—

সাঙ্গো বেদঃ ফণিপতিদৃশা শব্দশাস্ত্রে বিচারঃ।

প্রাণা যস্য শ্রবণসুভগা সাচ সাহিত্যবিদ্যা॥

কোবাশক্তঃ পরিগণয়িতুং শ্রূয়তাং তচ্চমেতৎ।
প্রজ্ঞাদর্শী কিমিতি বিমলে নাম্নাসংক্রান্তমাসীৎ ॥”

বিহ্লণ বিদ্যা শিক্ষার পর নানাদেশ পরিভ্রমণ করত বহু দর্শন লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যুবকগণ যেরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গ্রীস, ইটালী, ও সুইজরলণ্ড, পরিভ্রমণ করত প্রাচীন কীর্ত্তি তথা স্বভাবের মনোহর শোভা সন্দর্শনে, মনকে উন্নত করিতে চেষ্টা করেন, এতদ্দেশেও পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ চতুষ্পাটী পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যার গৌরব বৃদ্ধি জন্য নানা রাজ্য পরিভ্রমণ করিতেন ও বিবিধ জনপদের আচার ব্যবহার অবগত হইয়া বহু দর্শন লাভ করিতেন। শ্রীহর্ষচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় কবি বাণভট্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি হইয়াও কেবল বহুজ্ঞতা লাভের জন্য বিদ্যা শিক্ষার পর নানা রাজ্য ও অনেক রাজ-সভায় গমন করিয়াছিলেন। বিহ্লণ সেইরূপ আপনার হৃদয়কে উন্নত করিবার মানসে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে মথুরা, কান্যকুব্জ প্রয়াগ ও বারাণসী গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার কর্ণরাজের সহিত সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁহার রাজ-সভায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া সভাপণ্ডিত গঙ্গাধরকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কর্ণরাজার আশ্রয়ে থাকিয়াই তিনি ‘রামস্তুতি’ গ্রন্থ রচনা করেন এবং এই খানিই তাঁহার প্রথম রচনা-কুসুম।

বিহ্লণ কর্ণরাজের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ধারাধিপ ভোজরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন দৈব দুর্বিপাক বশতঃ তাঁহার মানস সফল হয় নাই। এই ভোজ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ-প্রণেতা ভোজরাজ নহেন, তিনি বিহ্লণের অনেক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বিহ্লণ অনিহীলবারা পত্তনে গমন করিয়া তথাকার লোকদিগের আচার ব্যবহার ও ভাষার বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। তিনি সোমনাথ পত্তনে গমন করিয়া ভক্তিসহকারে মহাদেবের মূর্ত্তি উপাসনা করিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে, কতিপয় নিকটবর্ত্তী গ্রাম সন্দর্শন করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে গমন করেন। এইরূপে ভারতবর্ষের অনেক প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বিক্রমের রাজধানী কল্যাণ নগরে আগমন করিয়াছিলেন, এবং এই খানেই থাকিয়াই তাঁহার বিদ্যার গরিমা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কল্যাণ রাজধানীতে ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে তাঁহার জীবনের শেষকাল অতিবাহিত হয়। তাঁহাকে চালুক্যরাজ ত্রিভুবনমল্লদেব বিক্রমাদিত্য ‘বিদ্যাপতি’ খ্যাতি প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—

“চালুকেন্দ্রস্ত্রাদপতত্ত্বতী যোহস্র বিদ্যা-
পতিত্বম্।”

এই নৃপতিই পুনরায় পার্মাড়ি নামে রাজতরঙ্গিনীতে উল্লিখিত হইয়াছেন।

রাজতরঙ্গিনীতে বিহ্লণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"কাশ্মীরেভ্যো বিনির্যান্তং রাজ্যে কলশভূপতেঃ।
বিদ্যাপতিং যংকর্ণাটশ্চক্রেপর্ম্মাড়িভূপতিঃ॥
প্রসর্পতঃ করটিভিঃ কর্ণাটকটকান্তরং।
রাজ্যোগ্রে দদৃশে তুঙ্গং যস্যোবাতপবারণম্॥
ত্যাগিনংহর্ষদেবং স শ্রুত্বা সুকবিবান্ধবং।
বিহ্লণো বঞ্চনাং মেনে বিভূতিংতাবতামপি॥"

অর্থাৎ কলশরাজের রাজ্যে গমনার্থ কাশ্মীর হইতে নির্গত হইলে, কর্ণাট পার্ম্মাড়িরাজ যাঁহাকে বিদ্যাপতি করিয়াছিলেন; কর্ণাট সৈন্যের মধ্যে গমনকারী রাজার সম্মুখে যাহার আতপত্র দৃষ্ট হইয়াছিল;

সেই বিহ্লণ কবিবান্ধব হর্ষদেবকে ত্যাগধর্ম্মী শ্রবণ করিয়া আপনার তাবৎ ঐশ্বর্য্যকে বিড়ম্বনা মনে করিলেন।

ত্রিভুবন-মল্লদেব কল্যাণের সিংহাসনে ১০৭৬ হইতে ১১২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উপবিষ্ট ছিলেন, সুতরাং বিহ্লণও এই সময় মধ্যে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিলেন, স্থির হইতেছে। পুনরায় বিহ্লণ স্বয়ং লিখিয়াছেন কাশ্মীরাধিপতি অনন্ত ও কলশ উভয়েই তাঁহার সমসাময়িক।

রাজতরঙ্গিনীতে লিখিত আছে অনন্ত ৩৫ বৎসর রাজ্য করিয়া তাঁহার পুত্র কলশকে রাজ্যাভিষিক্ত করত তাঁহার সহিত এক যোগে পুনরায় পঞ্চদশ বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন; তৎপরে কলশের অসচ্চরিত্রতা প্রযুক্ত বিরক্ত হইয়া দুই বৎসর ৬ মাস বিজয়-ক্ষেত্রে বাস করেন। অবশেষে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন।" স্বামীর মৃত্যু সম্বাদে সূর্য্যমতী বা সুভট জ্বলন্ত চিতায় আত্ম সমর্পণ করত বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। জেনেরেল কণিংহাম সাহেব কহেন ১০৮০ খৃষ্টাব্দে অনন্তদেব আত্মহত্যা সম্পাদন করেন এবং তাঁহার পুত্র কলশরাজ ১০৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি বিহ্লণ তাঁহার আশ্রয়-পাদপ চালুক্য-বংশীয় কর্ণাট-রাজের (বিক্রম) সন্তোষের জন্য তচ্চরিত্র "বিক্রমাঙ্কদেব চরিত" রচনা করিয়াছিলেন যথা—

"তেন প্রীতয়ে বিরচিতমিদং কাব্যমব্যাজকান্তং।
কর্ণাটেন্দোর্জগতি বিদুষাং কণ্ঠভূষাস্বমেতু॥"

পণ্ডিতবর বুলার সাহেব অনুমান করেন এই কাব্য ১০৮৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে, তাহা হইলে বিহ্লণের প্রাচীন বয়সে এই কাব্য লিখিত হয়।

বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত কাব্যের প্রথম সর্গে চালুক্য বা চৌলুক্য বংশের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে; তাহাতে লিখিত আছে ব্রহ্মার চুলুক অর্থাৎ আচমনীয় জল-গণ্ডূষ হইতে এক বীরপুরুষ জন্মিয়াছিলেন। দেবতার হিতের জন্যই ব্রহ্মা ইঁহাকে সৃজন করেন। যথা—

"অথ চিরাসীৎ সুভটস্ত্রিলোকত্রাণপ্রবীন শ্চুলুকাৎ বিধাতুঃ।"

ক্রমে ইহাঁর বংশ-পরম্পরা পৃথিবীতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই বংশে হারীত প্রভৃতি মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন।

তৎপরে মালব্য। ইনি অসাধারণ রাজা ছিলেন।

তাঁহার নাগরখণ্ড (গুজরাট) রাজধানী ছিল। যথা—

"চক্রপদং নাগরখণ্ড চুম্বি পুগন্দ্রমায়াং দিশি দক্ষিণস্যাম্।"

ক্রমে মাল্যব্যের অধস্তন বংশে শ্রীতৈলপ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই চালুক্য চন্দ্র। এতৎপরে ইহাঁর সর্ব্ববিজয়-রাজ সিংহাসনে জয়সিংহ দেব উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র, আহব মল্লদেব, তাঁহার অপর নাম ত্রৈলোক্য মল্লদেব। কবিরা ইহাঁকে দ্বিতীয় "রাম" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইনি মহিষীর সহিত পুত্র-কামনায় তপস্যা করিয়াছিলেন। একদিন দৈব-বাণী হইল "চুলুক্য-রাজ! আর শ্রম করিতে হইবে না। কর্কশ তপ পরিত্যাগ কর অচিরে পুত্র-মুখ দেখিতে পাইবে" তৎপরে তাঁহার পুত্র জন্মিল। ইহাঁর নাম সোমদেব রাখিলেন। কিছু কাল পরে দ্বিতীয় পুত্র জন্মিলে, তাঁহার নাম বিক্রম দেব রাখিলেন। বালক কালেই ইহার শৌর্য্য সন্দর্শনে, রাজা ও পুরোহিত তাঁহার বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমাঙ্ক নাম প্রদান করিলেন। ইহাঁর বিবরই বিক্রমাঙ্কদেব চরিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য অষ্টাদশ সর্গে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম সর্গে বিক্রমের বংশ—দ্বিতীয়ে জন্মাদি—তৃতীয়ে দিগ্বিজয় ও যৌবরাজ্য ইত্যাদি ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যে নৈষধের ন্যায় পদবিন্যাস দৃষ্ট হয় এবং ইহার আদ্যোপান্ত রচনায় গ্রন্থকার বিলক্ষণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা বৈদর্ভী রীতিতে রচিত।

"শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" মধ্যে বিক্রমাঙ্কদেব চরিত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। অধ্যাপক আফ্রেক্ট কহেন, শার্ঙ্গধর চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিদ্যাপতি বিহ্লণের কালিদাসের ন্যায় সম্রদ্ধতা ছিল না; তিনি আপনার কবিত্ব সম্বন্ধে অনেক গর্ব্বোক্তি করিয়াছেন। যথা—

"সহস্রশঃ সন্তু বিশারদানাং
বৈদর্ভলীলানিধয়ঃ প্রবন্ধাঃ।
তথাপি বৈচিত্র্যরহস্যলুব্ধাঃ
শ্রদ্ধাং বিধাস্যন্তি সচেতসোঽত্র॥"

অর্থাৎ যদিও নিপুণ ব্যক্তিদিগের বৈদর্ভ (রীতি বিশেষ) লীলার আধার স্বরূপ অনেক প্রবন্ধ আছে, তাহা থাকিলেও যাঁহাদের চিত্ত আছে এবং যাঁহারা রহস্য-লুব্ধ, তাঁহাদিগকে আমার এই গ্রন্থে অবশ্য শ্রদ্ধা করিতে হইবে।

পুনরায়—

"রসধ্বনেরধ্বনি যে চরন্তি
সংক্রান্তবক্রোক্তিরহস্যমুদ্রাঃ।
তেঽস্মৎপ্রবন্ধানবধারয়ন্তু
কুর্ব্বন্তু শেষাঃ শুকবাক্যপাঠম্॥"

অর্থাৎ যাঁহারা রস ও ভাব রূপ পথে বিচরণ করেন, বক্রোক্তির রহস্যোদ্ভেদ

করিতে পটু, তাঁহারাই আমার প্রবন্ধ ধারণ করিবেন, তদ্ভিন্ন ব্যক্তিরা শুকপক্ষীর ন্যায় পাঠমাত্র করিবে। ইত্যাদি।

বিল্হণ "বিক্রমাঙ্কদেব চরিত" ও "রামস্তুতি" রচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক আফ্রেকট কহেন ইহা ভিন্ন তিনি একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীরামদাস সেন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

প্রস্তাবনা।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চ্চা জগতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। দিন দিন নূতন নূতন প্রাকৃতিক ঘটনা সকল আবিষ্কৃত হইতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ যন্ত্র সৃষ্ট হইয়া নবাবিষ্ক্রিয়ার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যত দূর জানা ছিল এক্ষণে তাহার দশ গুণ জানিতে পারা গিয়াছে, বোধ হয় পঞ্চাশ বৎসর পরে আরও দশ গুণ জানা যাইবে। পণ্ডিত-প্রবর কোমৎ বলিয়া গিয়াছেন যে পরিণামে পৃথিবী বৈজ্ঞানিক অবস্থা লাভ করিবে, সে কথা নিতান্ত অসম্ভব নয়। সভ্য দেশ মাত্রেই যত্ন কিরূপে তদ্দ্বারা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয়। প্রতি দেশেই বড় বড় পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান-বিষয়ক আবিষ্ক্রিয়া করণার্থ রাজকোষ হইতে বৃত্তি পাইতেছেন। ইহাতে যে বিজ্ঞানশাস্ত্র ক্রমশই উন্নতি-সোপানে পদার্পণ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনা ভারতবর্ষেও উপস্থিত হইয়াছে। বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত স্থানে স্থানে বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইতেছে, এবং অসংখ্য লোক মনোযোগ ও পরিশ্রমের সহিত তথায় অধ্যয়ন করিতেছে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রস্তাবিত বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনাকালে তিনি দেশস্থ বড় বড় লোকের যেরূপ যত্ন ও সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের বিজ্ঞানের প্রতি যথেষ্ট আদর প্রদর্শিত হইয়াছে। দুই চারি জন শিক্ষিত যুবক একত্র হইলে প্রায়ই বিজ্ঞানের কথা কহিয়া থাকেন এবং কিরূপে ভারতে ইহার আলোচনা আরও বৃদ্ধি লাভ করে সেই বিষয়ের আন্দোলন করেন। বোধ হয় সকল ভদ্রলোকের গৃহেই অন্ততঃ দুই পাঁচ খানি বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক মিলিতে পারে। এমন কি অনেক কৃতবিদ্য যুবক সামাজিক এবং অন্যান্য বহুবিধ প্রতিবন্ধক তুচ্ছ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করতঃ ইহার অধ্যয়ন করিতেছেন, কেহ বা অর্থাভাবে অথবা অন্য কোন অখণ্ডনীয় বাধা বশতঃ

যাইতে পারিতেছেন না। ফলতঃ আজ কাল যে অনেকেই বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত সমধিক যত্নবান্ হইয়াছেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে মনোবিজ্ঞানের বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল। বড় বড় পণ্ডিতগণ বড় বড় বুদ্ধিমান্ শাস্ত্রকারগণ সকলেই মানসিক তত্ত্বের অনুসন্ধানে ফিরিতেন। তাঁহাদিগের আজীবন পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ আমরা ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক পরস্পর-বিরোধী বিবিধ ও অসংখ্য দর্শন শাস্ত্র লাভ করিয়াছি। ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিলে গ্রন্থকর্ত্তাদিগের অপরিসীম বুদ্ধি-বৃত্তি অধ্যবসায় এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনের সম্বন্ধে যে যে মত প্রকাশ করিতেছেন তাহার অধিকাংশই আমাদের দর্শন সমূহে প্রকটিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁহারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর ততদূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। যাহা তাঁহারা স্থির করিয়াছেন তাহা অতি সামান্য এবং প্রায়ই স্বকপোলকল্পিত সুতরাং ভ্রম-সঙ্কুল। বস্তুতঃ এরূপ ঘটাতে তাঁহাদিগকেও তাদৃশ দোষ দিতে পারা যায় না। কোন বিষয় প্রথম অনুসন্ধান কালে কখনই সম্পূর্ণ এবং সুপ্রকৃত রূপে নির্ণীত হয় না। বিশেষতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি কাল-সাপেক্ষ। কিন্তু আমাদের সুর্ব্ব-প্রাচীন পণ্ডিতেরা তাহার অতি অল্প মাত্রই নিরূপণ করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধি করণাভিলাষে তাহাকে শাস্ত্রগত করিলেন। যাঁহারা পরে আসিলেন তাঁহারা আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি অনাস্থাই প্রাচীন ভারতের পতনের এক প্রধান কারণ। যদি আর্য্যেরা কেবল মানসিক তত্ত্ব লইয়া পড়িয়া না থাকিতেন, যদি ভৌতিক ঘটনা সকল দৃষ্টি করিয়া নূতন নূতন প্রাকৃতিক বলের আবিষ্কার করতঃ তৎসাহায্যে স্বকীয় বাহুবলের ন্যূনতা পূরণ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে ভারতের এত শীঘ্র অবনতি হইত না। শাস্ত্রে আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র প্রভৃতি অস্ত্রের উল্লেখ আছে। যতদিন এই সকল অস্ত্র নির্ম্মাণ ও ব্যবহার করিতে ভারত-বর্ষীয়েরা জানিতেন ততদিন তাঁহারা বিশ্বজয়ী ছিলেন। কাল ক্রমে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি অনাদর বশতঃ ইহাদের লোপ হইল। ভারতীয়েরাও মুসলমানদিগের নিকট পরাজিত হইলেন।

উপরিলিখিত মত অনেকের অসম্ভব ও আশ্চর্য্য বলিয়া অনুমান হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা ইতিহাসের অতি সামান্য সামান্য ঘটনা গুলিও অবগত আছেন তাঁহারা আমাদিগের প্রতিপোষকতা করিতে ত্রুটী করিবেন না। কিন্তু খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করিবার দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রোমীয়েরা সিরাকিউজ নামক একটী নগর অবরোধ করেন। রোমীয়দিগের অর্ণবপোতের সংখ্যা এত অধিক ছিল, যে তাঁহারা অনায়াসেই নগরের সামুদ্রিক

পার্শ্বে আগমন করিয়া জয় করিতে পারিতেন। কিন্তু সিরাকিউজস্থ আর্কিমিডিজ্ নামক এক জন পণ্ডিত বিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাদিগকে দুই তিন বৎসর কৃতকার্য্য হইতে দেন নাই। আর্কিমিডিজ্ কতকগুলি কাচের লেন্স্ (Lens) সৃষ্টি করেন এবং তদ্দ্বারা সূর্য্যের উত্তাপ সহায় করিয়া যেমন রোমীয় অর্ণবপোত বন্দরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল অমনি তাহা ভস্মসাৎ করিয়া দিতে লাগিলেন। বারুদের গুণে ছয় সহস্র ইংরাজ ষষ্ঠি সহস্র ফরাসিস্ সৈন্যকে এজিন্‌কোর্টের যুদ্ধে পরাজিত করেন। সে দিন প্রুসীয়েরা নীড্‌ল-গন্ (Needle-gun) এর সাহায্যে অষ্ট্রীয়ানদিগকে উপর্য্যুপরি সাতটী যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া তাঁহাদিগের হস্ত হইতে মোরেভিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটী দেশ কাড়িয়া লন। এরূপ উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া আমরা ক্ষান্ত রহিলাম।

কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গেলে চারিটী বিষয় দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ মাহাত্ম্য, দ্বিতীয়তঃ নিশ্চয়তা, তৃতীয়তঃ উপকারিতা এবং চতুর্থতঃ মনোরঞ্জনকারিতা। কোন শাস্ত্র মনোরঞ্জনকারী এবং প্রয়োজনীয় হইলেও তাহাতে মাহাত্ম্য না থাকিলে সুশিক্ষিত লোকদিগের পাঠোপযোগী হয় না। সেই রূপ কোন মাহাত্ম্যযুক্ত, প্রয়োজনীয় এবং মনোরঞ্জনকারী কিন্তু অনিশ্চয় শাস্ত্রের আলোচনা কেবল কাল হরণ মাত্র। আর্য্যদিগের ন্যায়শাস্ত্র ইহার একটী উদাহরণ স্থল। বিষয়টী উচ্চ বটে। এবং তাহার পাঠেও মনে আমোদ জন্মে সত্য; কিন্তু তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই সুতরাং উপকারিতা ও নাই। তৈলের আধার পাত্র কিম্বা পাত্রের আধার তৈল এইরূপ বিষয় লইয়া অনর্থক আন্দোলন করা সময় নষ্ট করা বৈ আর কি? তাহাতে পৃথিবীর কোন উপকার হইতে পারে না। এবং তাহার মীমাংসাও কিছু নাই। তত্রাচ পূর্ব্বপণ্ডিতগণ এইরূপে নিষ্ফল তর্ক লইয়া সমস্ত জীবন অতিবাহন করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে আমাদের দেখা উচিত যে বিজ্ঞান শাস্ত্র উপরি-লিখিত চারিটীর কোন অংশে ন্যূন কি না যদি ন্যূন না হয় তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার আলোচনা করাতে বুদ্ধিমান্ লোকদিগের অপমান হয় না। আমাদের এইরূপ বলার কারণ এই যে অনেকেই ভৌতিক পদার্থ এবং বাহ্য প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধানে বহুমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে সঙ্কুচিত হন। তাঁহারা ভাবেন যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ অপেক্ষা মনুষ্যজীবনের মূল্য অধিক, সুতরাং সমস্ত জীবন বিজ্ঞানানুসরণে ক্ষয় করাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। যাঁহারা এরূপ মত প্রকাশ করেন তাঁহারা সকলেই প্রায় মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের পক্ষপাতী। এই জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গুণ কীর্ত্তন কালে মনোবিজ্ঞানের বিষয় দুই একটী কথা বলিতে আমরা ইচ্ছুক রহিলাম।

১—মাহাত্ম্য। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মাহাত্ম্যের বিষয় বোধ হয় অধিক কথা বলিতে হইবে না। বিশ্ব-সংসারের তথ্য নির্ণয় করা ইহার কার্য্য। পরমাণু সকল কি কি নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে, গ্রহ নক্ষত্রাদি কেমন করিয়া সুন্দর ভাবে ও নির্ব্বিবাদে আপন আপন পথে গমন করিতেছে, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান-বিদ্ সেই সকল জানিতে যত্ন করেন। শব্দ কি, তড়িৎ কি, ঝঞ্ঝা হয় কেন, পর্ব্বত সকল কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, ভূমিকম্পের হেতু কি, পৃথিবী কিরূপ, সূর্য্যাদি কিরূপ, উত্তাপই বা কি, আলোকই বা কি, মানব কিরূপে বাঁচিয়া থাকে, কেনই বা মরিয়া যায় এই সকল নির্দ্ধারণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। গত কল্য পৃথিবী যেরূপ ছিল, আজ সেরূপ নাই; আজ যেরূপ আছে, কাল সেরূপ থাকিবেক না, সম্মুখস্থ, পার্শ্বস্থ, পশ্চাৎ স্থিত সকল দ্রব্যই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবে, অথচ তাহাতে ঈশ্বরের মহা নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না এবং কখন ঘটিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। এই সকল জানিতে পারা, এই সকল বুঝিতে পারা বড় সামান্য ব্যাপার নহে। ক্ষুদ্র মনুষ্য-বুদ্ধি নিযুক্ত থাকিবার জন্য ইহা অপেক্ষা আর কি উচ্চতর বিষয় পাইবে? সকল স্থানে, সকল সময়ে অতি সামান্য কীট পতঙ্গ প্রভৃতি জন্তুগণের মধ্যেও ঈশ্বরের হস্তাক্ষর প্রকাশ পাইতেছে। তাহা পড়িয়া লওয়া এবং তাঁহার অনন্ত মহিমা মূর্খ ও পণ্ডিত, নির্ব্বোধ ও বুদ্ধিমান্, ধনী ও নির্দ্ধন সকলকেই বুঝাইয়া দেওয়া বিজ্ঞান-বিদের ভার। কেনা এইরূপ লোক হইতে ইচ্ছা করেন? কে ঈশ্বরের মহিমার কিয়দংশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা পৃথিবী শুদ্ধ বিস্তার করিতে ইচ্ছুক নহেন?

ঈশ্বরকে হৃদয়ঙ্গম করা বড় সহজ নহে। যোগী ঋষিরা বহু কষ্টে বহু যত্নে বহুকাল পরিশ্রম করিয়াও তাঁহাকে যথার্থ বুঝিতে পারিতেন না। এই জন্যই পৃথিবীতে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি নির্ব্বিকার, নিরাকার, কেবল মাত্র তাঁহার সৃষ্টিতে তাঁহার সত্বার কিয়দংশ উপলক্ষিত হয়। অতএব সকল লোকই যে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া মনে উপলব্ধি করিতে পারিবে ইহা আশা করা বৃথা। ব্রাহ্মণগণ ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিয়াছিলেন যে মূর্খ লোকেরা ঈশ্বরের মাহাত্ম্য অতি অল্প পরিমাণেও গ্রহণ করিতে অসমর্থ। এরূপ অবস্থায় পৌত্তলিকতার সৃষ্টি না করিলে পৃথিবীতে সর্ব্বনাশ হওয়ার সম্ভব। এই জন্য তাঁহারা ঈশ্বরকে হস্ত পদ দিলেন, সামান্য বুদ্ধির ইন্দ্রিয়াধীন কর্ম্ম এবং গুণ তাঁহাতে সংযোগ করিলেন। আজ কাল বিদ্যার প্রভাবে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করিবার উপায় বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং পৌত্তলিকতারও হ্রাস হইতেছে। আমরা এই হেতু বলি যে ঈশ্বরের মহিমা অনুধাবন করিবার উপায় যত বৃদ্ধি হয় ততই পৃথিবীর মঙ্গল।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দ্বারা এই উপকার সাধিত হয়, ইহা দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা অধিক পরিমাণে উপলব্ধি হয়। অতএব প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যে সামান্য নয় তাহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন?।

উল্লিখিত বিষয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেহ কেহ বলিবেন যে সামান্য পদার্থ-কার্য্য অপেক্ষা হৃদয়-কার্য্যে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য অধিকতর প্রতীয়মান হয়। যেমন আধ্যাত্মিক বিষয় বাহ্যিক প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ মনুষ্য-হৃদয় সামান্য পদার্থ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উচ্চ। কিন্তু তাঁহারা একটী বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করেন না। মনুষ্য-হৃদয় বাহ্যিক ঘটনা দ্বারা এরূপ বিকৃত হইয়া যায় যে তাহাতে ঈশ্বরের হস্ত আর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পদার্থ বিষয়ে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা জড়, সুতরাং ঈশ্বর যেরূপ করিয়াছেন ঠিক সেই রূপ আছে।

মনোবিজ্ঞান-বিদেরা বিবেচনা করেন যে জ্ঞান-সম্বন্ধে মনঃশাস্ত্র-জ্ঞান প্রাকৃতিক জ্ঞান অপেক্ষা অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা তর্ক করেন পৃথিবী মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্য সম্বন্ধীয় যাবৎ দ্রব্যের মধ্যে মন শ্রেষ্ঠ। সুতরাং মনুষ্যের মনের বৃত্তি সকলের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি নির্ণয় করা অপেক্ষা আর উত্তম কার্য্য মনুষ্যের থাকিতে পারে না। এরূপ তর্ক যে নিতান্ত অসঙ্গত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ভাষায় কবিদিগের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ, কালিদাসের গ্রন্থ মধ্যে অভিজ্ঞান-শকুন্তলা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহা বলিয়া সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে যে শকুন্তলা ভিন্ন আর পাঠ্য পুস্তক নাই ইহা বলা নিতান্ত মূর্খের কার্য্য। বরং আর আর পুস্তক পড়িয়া অভিজ্ঞান শকুন্তলা না পড়াতে তাদৃশ ক্ষতি নাই, কিন্তু কেবল মাত্র শকুন্তলা পড়িয়া সমস্ত জীবন নষ্ট করা অপেক্ষা আর অন্যায় কার্য্য হইতে পারে না! সেই জন্য আমাদের মত বলি যে কেবল মাত্র মনোবিজ্ঞানের শ্রাদ্ধ করা বড় যুক্তিযুক্ত নয়। মনোবিজ্ঞানও পড়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও পড়। কিন্তু যদি দুইটীর মধ্যে বাছিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে বরং শেষোক্ত শাস্ত্রটী পড়িতে বলিব, তথাপি শুদ্ধ মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রটী পড়িতে বলিব না।

২—নিশ্চয়তা—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে কিছু মাত্রও অনিশ্চয়তা নাই। ইহাতে কোন গোলযোগ নাই, কোন ফাকী নাই, সকলি সরল, সরস, সুমিষ্ট। যাহা কিছু মীমাংসা হয় তাহা অনায়াসেই পরীক্ষা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও ভুল থাকে তবে সে ভুল অনায়াসেই লক্ষিত হয় এবং কোন ভ্রান্ত মত কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আপাততঃ কিছু কালের জন্য তাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে বটে, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরেই হউক আর দশ বৎসরের পরেই হউক তাহা ধরা পড়িবেই পড়িবে। এই কারণে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

শাস্ত্র ক্রমশই উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। আজ যেটুকু লাভ হইল, তদ্দারা কেবল আর ও নূতন নূতন সামগ্রী লাভ করিবার উপায় বৃদ্ধি হইল। চলিত কথায় শুনিতে পাওয়া যায় 'যে মাছের তেলে মাছ ভাজে'; এই কথাটী প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ভাল করিয়া না দেখিলে সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারেই অনেক গোলমাল দৃষ্ট হয়। এই বিশ্বের কিছুই মুহূর্ত্তের জন্য ও কখন স্থির ভাবে নাই, সকলই আপাততঃ পরস্পর বিরোধী বোধ হয়। আকাশে কখন মেঘ উঠিতেছে, কখন বা বৃষ্টি হইতেছে, আবার কখন নির্ম্মল গগণে পূর্ণ চন্দ্রের শোভা জগজ্জনের নয়নানন্দ জন্মাইতেছে। বায়ু সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইতেছে, কখন মলয়-সমীরণ মৃদুমন্দ সঞ্চালনে মানবগণের শরীর স্নিগ্ধ করিতেছে, কখন বা ভীষণ ঝঞ্ঝা রূপে পরিণত হইয়া দেশকে দেশ উৎসন্ন করিয়া দিতেছে। সমুদ্র কখন স্থির, কখন উত্তাল তরঙ্গমালায় পরিশোভিত; কখন দিন, কখন রাত্রি; নদীতে কখন জোয়ার, কখন ভাঁটা—এইরূপ সর্ব্বদাই জগতে অশেষরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে। অধিক কি যে পৃথিবীতে আমরা সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিতেছি, যাহা সর্ব্বক্ষণ নিশ্চল বলিয়া অনুমান হয়, তাহাও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বিপর্য্যয় গতিতে ভ্রমণ করিতেছে। আবার সূর্য্যদেব একটী নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছেন, সেই নক্ষত্র আবার আর একটী নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, এইরূপে সমুদায় বিশ্বমণ্ডল অনবরত শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু কি আকাশ, কি বায়ু, কি কি সমুদ্র, কি নদী, কি পৃথিবী, কি সূর্য্য, সকলেই কতকগুলি সামান্য সামান্য নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলে। এই নিয়ম অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই, কাহারও চেষ্টা নাই। বস্তুতঃ জগতের সমস্তই নিয়মবদ্ধ এবং কার্য্যকারণতার অধীন, তবে মনুষ্য বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই বিশৃঙ্খল বোধ করে। বিজ্ঞান শাস্ত্র পাঠ করিলে এই নিয়ম গুলি শিক্ষা করা যায় এবং প্রাকৃতিক পদার্থজাত বলনিচয়কে ইচ্ছাধীন করিতে পারা যায়।

নিশ্চয়তা বিষয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। মনোবিজ্ঞানে কিছুই নিশ্চয়তা নাই এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে যখন কোন ব্যক্তি এমন কথা কহে যে স্বয়ংও তাহা বুঝিতে পারে না, তখন সে মনোবিজ্ঞান কহে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে মনোবিজ্ঞানের কোন প্রাঞ্জলতা নাই, সুতরাং শ্রোতাগণ বক্তার ভাব গ্রহণ করা দূরে থাকুক, বক্তাও সময়ে সময়ে নিজের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন না। যে ব্যক্তি কোন কালে মনোবিজ্ঞান পাঠে যত্ন করিয়াছেন তিনি ইহার যাথার্থ্য সহজেই বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা তাহাও করেন নাই তাহাদিগকে এই কথা

বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সমগ্র সুধী ব্যক্তিরা শত শত বৎসর মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াও এতাবৎকাল কিছুই মীমাংসা করিতে পারেন নাই। আজিও বহু প্রকার দর্শন শাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু কোন্টী প্রকৃত তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। ভাবিয়া দেখিলেই ইহাতে বড় আশ্চর্য্যের বিষয় ও লজ্জার কারণ বোধ হয় না। মন ভৌতিক পদার্থ নয়, অতএব ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নহে। কেবল মাত্র বুদ্ধি এবং জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ইহার তথ্য নিরূপণ করিতে হয়। একে মনুষ্য-বুদ্ধি সামান্য; তাহাতে আবার পরীক্ষার দ্রব্য এক দণ্ডের জন্যও স্থির নয়। বাহ্যিক ঘটনা দ্বারা বিকৃত হইয়া মন কোন স্থানেই সহজ অবস্থায় দৃষ্ট হয় না। তোমার মন একপ্রকার, আমার মন অন্যপ্রকার, আবার উভয় মনেরই দণ্ডে দণ্ডে পরিবর্ত্তন হইতেছে। যদি মন সহজে অনুগম্য হইত তাহা হইলেও কতক সুবিধা থাকিত, কিন্তু কেবল বাহ্যিক লক্ষণের অবলোকনে সমস্ত নির্দ্ধারণের আবশ্যকতা হেতু আর একটী ভ্রমের কারণ ঘটিয়া উঠিয়াছে। নিজ মনের দ্বারা অপরের পরিবর্ত্তনশীল মন পরীক্ষা করা বড় কঠিন। সুতরাং মনোবিজ্ঞানের কোন উন্নতি নাই।

৩—উপকারিতা। উপকারিতাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সহিত মনোবিজ্ঞানের তুলনাই হইতে পারে না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রধান গুণ উপকারিতা। ইহার দ্বারা পৃথিবীর প্রকৃত উপকার করা যাইতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়মাবলী বুঝিতে পারিলে ভৌতিক দ্রব্য এবং শক্তিনিচয় অনায়াসেই হস্তগত হয়. কারণ তাহারা সকলেই ঐ নিয়মের অধীন। সুতরাং এই পদার্থ এবং শক্তিগণের দ্বারা অনায়াসেই নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারা যায়। যেমন গবাদি জন্তুরা আমাদিগের অধীন হইয়া আমাদিগের কার্য্য করিয়া দেয়, তদ্রূপ ভৌতিক দ্রব্য এবং প্রাকৃতিক শক্তি মানবের পরতন্ত্র হইয়া দাসত্ব করে। পৃথিবী হইতে সমগ্র খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত পাওয়া যায় না, অধিকাংশই মানবকে নিজে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। যদি আমরা ভৌতিক নিয়ম না জানিতাম, তাহা হইলে ঐ সমুদায় খাদ্য দ্রব্য কদাপি প্রস্তুত করিতে পারিতাম না। লবণ সমুদ্রের জলে আছে; কিন্তু সমুদ্রের জল শুষ্ক করিয়া যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা আমাদিগের খাদ্যোপযোগী নহে। তাহাতে অনেক গুলি অখাদ্য এবং অনেক গুলি বিষাক্ত দ্রব্য আছে। তাহা হইতে ব্যবহার্য্য লবণ পরিষ্কার করিয়া লওয়া রসায়ন বিদ্যার ক্ষমতা। গো, মহিষ, প্রভৃতি আমাদিগের দ্রব্যাদি বহন করে; ঘোটকাদি আমাদিগকে এস্থান হইতে ওস্থানে লইয়া যায়; কিন্তু জীব জন্তুদিগের সামর্থ্যের অল্পতা হেতু তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটে। প্রাকৃতিক বাষ্পযান অনায়াসেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে অশেষ-

বিধ একা দূর দেশে লইয়া যায়। পূর্ব্বে অতি অল্প দূরে সত্বর সম্বাদ পাঠাইবার নিতান্ত প্রয়োজন থাকিলেও বিস্তর সময় লাগিত, বিস্তর অর্থনাশ হইত, কিন্তু তড়িৎ-বার্ত্তাবহ দ্বারা দুই সহস্র ক্রোশ অন্তরে এখন এক সেকেণ্ডের মধ্যে সম্বাদ প্রেরণ করা যায়। পূর্ব্বে বস্ত্রাদি হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইত; এক জন লোক অতি কষ্টে, যথেষ্ট পরিশ্রমের সহিত প্রস্তুত সুতা লইয়া, দুই দিনেও একখানি বস্ত্র বয়ন করিতে পারিত না। কিন্তু এক্ষণে সামান্য কলের দ্বারা এক জন লোক এক দিনে ৫।৬ খানি বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দ্বারা পৃথিবীর যে সকল উপকার সাধিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। যে কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া গেল তাহাতেই যথেষ্ট হইবে। বস্তুতঃ যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সুখময় ফল উপলক্ষিত হয়।

মেকলে (Macaulay) সাহেব এক স্থলে অতি চমৎকার রূপে মানসিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রভেদ দেখাইয়া গিয়াছেন। মনে কর একজন লোক জ্বরে ভুগিতেছে, কষ্টে প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম। মনোবিজ্ঞান-বিদ্ আসিয়া বলিলেন যে মনের প্রবৃত্তি-গণকে দমন করা উচিত। পৃথিবীতে সুখ দুঃখ বাস্তবিক কিছুই নাই, তবে মনের অবস্থা ক্রমে সুখ দুঃখ রূপে প্রতীয়-মান হয়; মনকে দমন কর, তোমার আর কোন কষ্ট থাকিবে না। প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান-বিদ্ কোন কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে ও বিনা আড়ম্বরে ঔষধ প্রস্তুত করিলেন এবং তাহা সেবন করাইয়া রোগীকে রোগের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন। লোকের সমুদায় সম্পত্তি জল-গর্ভে মগ্ন হইয়া গেল, ঐ সম্পত্তি হয় ত তাহার সর্ব্বস্ব ধন, সুতরাং তাহার বিনাশে সে অধৈর্য্য হইয়া রোদন করিতে লাগিল। মনোবিজ্ঞান-বিদ্ তাহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অসারতা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিদ্ তৎক্ষণাৎ মজ্জন-যন্ত্র (Divind-bell) সৃষ্টি করিয়া জলে ডুবিলেন এবং সাগর-গর্ভ-নিহিত সম্পত্তির কতক অংশ তীরে আনয়ন করিলেন। মেকলে সাহেব এইরূপ আরও অনেক গুলি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক গুলি যুক্তি নিতান্ত পক্ষপাতী দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তিনি যে নিতান্ত অন্যায় বলেন নাই তাহা এস্থলে সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

আমরা বলি না যে মানসিক বিজ্ঞান দ্বারা জগতে কিছু সাধন হয় না। লোকের সহিত ব্যবহার করিতে গেলেই কিঞ্চিৎ পরিমাণেও মনের বিষয় জানা আবশ্যক করে। মানসিক কোন বৃত্তির স্বাভাবিক অথবা বহুকালব্যাপি-কারণ-ঘটিত অবস্থা-ন্তর হইয়া অনেক সময়ে বহুবিধ ভয়ঙ্কর বিপ্লব ঘটিতে থাকে। মনের বিষয় উত্তম-রূপে জানা থাকিলে তাহার নিরাকরণ

অনায়াসেই করা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল। তুলনা করিলে মনোবিজ্ঞান-জনিত উপকার প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান-জনিত উপকারের শতাংশের একাংশও হইবেক না।

৪—মনোরঞ্জন-কারিতা—অস্মদ্দেশীয়গণ অনর্থক কথোপকথন ও অন্যান্য নিষ্ফল কার্য্য দ্বারা কাল কাটাইতে বিলক্ষণ পটু। ইহাতে যে কেবল কাল নাশ হেতু অশেষ ক্ষতি হয় তাহা নহে; লোকের কোন কর্ম্ম না থাকিলে হৃদয়ের মন্দ প্রবৃত্তি সকল সুবিধা পাইয়া যথেচ্ছাচারী হইবার চেষ্টা করে, সুতরাং বহু প্রকারে দেশের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ কার্য্যাভাবে নাটকোপন্যাসাদি গল্পের পুস্তক পড়িয়া কাল কাটান তাহাতে এক বিষম অনিষ্ট উৎপাদন হয়, লোকে গভীর চিন্তা করিতে অপারগ এবং এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এরূপ লোকের পক্ষে যে বিজ্ঞানের আলোচনা বিশেষ হিতকর হইবে তাহা বলা বাহুল্য। বিজ্ঞান শাস্ত্র মনোরঞ্জন করিবার ক্ষমতাতে কিছুতেই এই সকল পুস্তকের অপেক্ষা ন্যূন নহে। এই অসীম বিশ্ব কিরূপ এবং কিরূপে চলিতেছে ইহা জানা অপেক্ষা আর কি অধিক সন্তোষকর বিষয় হইতে পারে? বিজ্ঞানের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া অনেক পণ্ডিত সমস্ত জীবন পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তথাপি সমগ্র জানিয়া উঠিতে পারেন নাই। মহাজ্ঞানী নিউটন (Newton) বলিয়াছেন যে আমি এতকাল মস্তের সাধন অথবা শরীর পাতন করিয়া পরিশ্রম করিয়া মরিলাম বটে, কিন্তু অনন্ত বিজ্ঞানার্ণবের গর্ভস্থ একটী মাত্রও রত্ন পাইলাম না; কেবল তীরের কতকগুলি প্রস্তর কুড়াইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইল। বস্তুতঃ বিজ্ঞান অসীম, তাহার যে কোন অংশেরই হউক আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিলে জীবন নদীর স্রোতের ন্যায় বহিয়া যায়। কর্ম্মাভাবে বৃথা সময় নষ্ট করিতে বাধ্য হওয়া দূরে থাকুক, লোকের আয়ুর স্বল্পতা হেতু দুঃখ প্রকাশ করিতে হয়।

বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে যে মনুষ্যবুদ্ধির কোন অপমান করা হয় না, তাহা বোধ হয় যথেষ্ট দেখান গিয়াছে। বরং এরূপ প্রমাণ করা গেল যে ইহ লোকে মনুষ্যের যত গুলি উত্তম কার্য্য থাকিতে পারে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানালোচনা তাহার মধ্যে একটি প্রধান। কিন্তু এই জানিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে কোন ফল লাভ হইবে না। যাহাতে ভারতে বিজ্ঞানের চর্চ্চা বৃদ্ধি হয়, যাহাতে সমগ্র ভারতবাসী বিজ্ঞানের অত্যল্প পরিমাণেও আস্বাদ প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ে যত্ন করা উচিত। সর্ব্ব স্থানে সর্ব্বলোকের হৃদয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বীজ রোপণ করিতে পারিলে ভারতে অনেক দুঃখ হ্রাস হইয়া আসিবে।

কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার অনেক গুলি ব্যাঘাত আছে। প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষায়

ভাল রূপ এতদ্বিষয়ক পুস্তক পাওয়া যায় না। তজ্জন্য ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞদিগের আগ্রহ থাকিলেও ও বিষয়ে অজ্ঞ হইয়া থাকিতে বাধ্য হইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকের অভাব। কোন বিষয়ের স্থূলাংশ জানা থাকিলে লোকে অনায়াসেই স্বযত্নে অনেক শিখিতে পারে। কিন্তু মোটামুটি কতক জানা না থাকিলে পরের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং চেষ্টা করিয়া শিক্ষা করা বড় কঠিন ব্যাপার। এই কারণ বশতঃ বিজ্ঞান-বিষয়ক গুটী কতক প্রস্তাব আর্য্যদর্শনে মাসে মাসে প্রকাশ করিবার নিতান্ত ইচ্ছা রহিল, তবে তাহাতে আমাদিগের কত দূর অভীষ্ট-সিদ্ধ হইবে তাহা পাঠকবর্গই জানিবেন। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিব, তাহাতে যদি কোন উপকার সাধিত না হয় তাহা হইলে এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব যে "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ"।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

প্রতাপ সিংহ।*

যদিও প্রতীচ্য জ্ঞানালোকে ভারতবর্ষ ক্রমেই উদ্দীপ্ত হইতেছে, যদিও প্রতীচ্য বিজ্ঞান মহিমায় ভারতবাসী ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে; তথাপি আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রকৃত অভাবের মোচন হয় নাই। ভারতবর্ষ ক্রমে উদ্দীপ্ত হইলেও অনেক স্থলে ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; ভারতবাসী ক্রমে উন্নত হইলেও অনেক বিষয়ে কেবল প্রতীচ্য ভাবে মুগ্ধ হইয়া আপনার অবনতি প্রদর্শন করিতেছে। ভারতবর্ষে ক্রমান্বয়ে হিন্দু, পাঠান ও মোগল রাজত্বের অবসান হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ভারবর্ষের একখানি প্রকৃত ইতিহাস প্রণীত ও প্রচারিত হয় নাই। যে বাঙ্গালী আপনাকে সুসভ্য ও সমুন্নত বলিয়া অভিমানে স্ফীত হইতেছে, সভায় সভায় জলদ-গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিয়া আপনার বাগ্মিতা ও তেজস্বিতা দেখাইতেছে, করে হংসপুচ্ছ রূপ দুর্ব্বার অস্ত্র গ্রহণ করিয়া অবলীলা ক্রমে কত রাজ্য কত রাজাকে রসাতলে দিতেছে, সেই বাঙ্গালীর কোনও ধারবাহিক বিবরণ বর্ত্তমান নাই। বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে অনেক সময়ে উত্তর পাওয়াই দুর্ঘট হইয়া উঠে; কেহ কেহ বা ঐরূপ জিজ্ঞাসা অন্তঃসার-শূন্যতার পরিচায়ক বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন। কোন বিদ্যালয়ের বালককে জিজ্ঞাসা করিলে সে অম্লান মুখে উত্তর দিবে, স্বর্ণাক্ষরেণ ক্ষেত্রের

* Tud's Rajsthan.

(Field of the cloth of gold) মহলাক্ষর বা [illegible] অধিকাংশ কোন্ [illegible] কোন্ রাজ্যে কাহার অনুজ্ঞায় [illegible] হইয়াছিল এবং কে এলাকেশ্বীন বা জাবমায়ের জীবন হরণ করিয়া আপনার [illegible] পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল ? কিন্তু যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যায়, কে হলদি ঘাটে অতুল বীরত্ব দেখাইয়া ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন ? আবদুল আলি খাঁ অযোধ্যায় না ভূপালে রাজত্ব করিতেন ? অথবা সুজা হিন্দু না মুসলমান ছিলেন ? তাহা হইলেই তাঁহার চক্ষুঃ স্থির ও আকুঞ্চিত হইয়া উঠে। স্বদেশীয় ইতিহাসের প্রতি এরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন অল্প ক্ষোভ ও অল্প বিস্ময়ের বিষয় নহে !

স্বদেশের ইতিহাস ধারাবাহিক রূপে নিবদ্ধ না থাকাতে অনেকে তদ্বিষয় জানিতেও সমুৎসুক হয়েন না ; এই ঔৎসুক্যের হ্রাস হওয়াতে স্বদেশের অনেকটা অবনতি হইয়া পড়িয়াছে। স্বদেশের পুরাবৃত্ত সমালোচন ও পুরাবৃত্তের গবেষণাই জাতীয় মনুষ্যত্ব ও জাতীয় সমবেত বলের মূল ; এই মূল বিনষ্টপ্রায় হওয়াতে জাতীয় উন্নতির পথও অবরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতের পুরাবৃত্ত সমালোচনে অনেক যত্ন প্রদর্শন [illegible] বদ্ধ না থা- [illegible] সিংহের বিবরণ অদ্য পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে, ইউরোপীয় পণ্ডিতের চেষ্টা ও অনুসন্ধিৎসা না থাকিলে সেই প্রতাপ সিংহ আজও বাঙ্গালী সমাজে একরূপ অপরিচিতের ন্যায় থাকিতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চিলিয়ান্ ওয়ালা নির্ব্বাণোন্মুখ ভারতীয় তেজের অসাধারণ বিস্ফুরণ-ক্ষেত্র। গুরুগোবিন্দ সিংহ শিখ জাতির শিরায় শিরায় যে মহাতেজ প্রসারিত করিয়াছিলেন, যবনের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া শিখদিগকে যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, সেই মহাতেজ ও মহামন্ত্রের ফল ১৮৪৯ অব্দের চিলিয়ানওয়ালা। যে স্থানে ব্রিটীষ সৈন্য পলায়িত, ব্রিটীষ কামান অধিকৃত ও ব্রিটীষ বৈজয়ন্তী শত্রুর করগত হইয়াছে, সে স্থান অনন্তকাল ইতিহাস পত্রে লীলা করিবার যোগ্য, যে স্থানে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ-ওয়াটার্লু-জয়ি দুর্ব্বার ব্রিটীষ তেজও বিধ্বস্ত হইয়াছে, সে স্থান অনন্তকাল রসময়ী কবিতায় নিবদ্ধ থাকিবার উপযুক্ত। এই চিলিয়ান ওয়ালার ন্যায় হলদি ঘাটও অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের অতি আদরের ধন—এই চিলিয়ান ওয়ালার ন্যায় হলদিঘাটের বীরত্বও ম- লীলাময়ী কবিতা দেবীর অতি প্রিয়তম বিষয়। যে ক্ষত্রিয় ষোড়শ শতাব্দীতে দুর্দ্দির-পরাক্রম রাজপুত জাতির [illegible] ভূমী হইতে উন্নত হইয়া হলদিঘাটে অসাধারণ [illegible] প্রদর্শন করে, সেই [illegible] শতাব্দীতে

চিলিয়ানওয়ালায় বিকশিত হয়। ফলে হলদিঘাট ও চিলিয়ানওয়ালা ভারতের অসাধারণ বীরত্বের বিলাস ক্ষেত্র। গ্রীশে যে থর্ম্মাপোলি ও মারাথনের জন্য আজ পর্য্যন্ত বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, সেই থর্ম্মাপেলি ও মারাথনের সহিত ভারতের হলদিঘাট ও চিলিয়ানওয়ালা অনায়াসে এক শ্রেণীতে নিবেশিত হইবার উপযুক্ত, আর থর্ম্মাপোলীর অধিনায়ক লিওনিদাস ও মারাথনের অধিনায়ক মিলতাইদিসের ন্যায় হলদিঘাটের অধিনায়ক প্রতাপ সিংহ ও চিলিয়ানওয়ালার অধিনায়ক সেরসিংহও অনন্তকাল স্বর্গস্থ দেব-সমিতিতে অপ্সরোদিগের বীণা-নিন্দিত মধুর স্বরে স্তুত হইবার যোগ্য। লিওনিদাস যে রূপ থর্ম্মাপোলিতে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অলোকসামান্য পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন, প্রতাপ সিংহও সেইরূপ হলদিঘাটে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য শৌর্য্য বীর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। উভয় গিরি-সঙ্কটই উভয় যোদ্ধার জন্য ইতিহাসে পরম পবিত্র পুণ্যভূমি বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে, উভয় দেশই উভয় যোদ্ধার জন্য পৃথিবীতে বীর-লীলা-ক্ষেত্র বলিয়া সম্মানিত ও সমাদৃত হইতেছে।

এই সুযোদ্ধা, স্বদেশ-হিতৈষী ও স্বকর্ত্তব্য-পরায়ণ প্রতাপ সিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, দুরন্ত যবন-গ্রাস হইতে মাতৃভূমির উদ্ধার সাধনার্থ যে সমস্ত মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, রাজস্থানের ইতিহাসে অনন্তকাল তাহা স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। শতাব্দের পর শতাব্দ অতীত হইয়াছে, অদ্যাপি রাজস্থানের লোকের স্মৃতিতে এই সমস্ত বিবরণ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষের এই বৃত্তান্ত বলিবার সময়, রাজপুতের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব তেজের আবির্ভাব হয়, ধমনী মধ্যে রক্তের গতি প্রবল হয়, এবং নয়নজলে গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া থাকে *। বস্তুতঃ প্রতাপসিংহের কার্য্য পরম্পরা রাজস্থানের অদ্বিতীয় গৌরব ও অদ্বিতীয় মহত্বের স্থল। কোনও ব্যক্তি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ও সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য-সম্পত্তির ক্রোড়ে লালিত হইয়া প্রতাপের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হয়েন নাই, কোনও ব্যক্তি স্বদেশ হিতৈষণায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার্থ বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া প্রতাপের ন্যায় কষ্টভোগ করেন নাই। আর্ব্বলী পর্ব্বতমালার সমস্ত দরীপথই প্রতাপসিংহের গৌরবস্তম্ভে উদ্ভাসিত

* রাজস্থানের ইতিহাস লেখক কর্ণেল টড্ লিখিয়াছেন :—"আমি প্রতাপসিংহের কার্য্যক্ষেত্র শৈলশিখরে আরোহণ করিয়াছি, তরঙ্গিণী উত্তীর্ণ হইয়াছি এবং প্রান্তরভূমি অতিবাহন করিয়াছি। যখন জয়মল ও পুত্তের বংশধরদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কার্য্যকলাপের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তখনই তাঁহারা সে সকল বলিতে বলিতে অনেকবার অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে।

রহিয়াছে। অনন্তকাল এই গৌরবস্তম্ভ উন্নত থাকিয়া রাজস্থানের মহিমা প্রকাশ করিবে। ভারত মহাসাগরের সমগ্র বারি-তেও ইহা নিমগ্ন হইবে না, হিমালয়ের সমগ্র অভ্রংলিহ শৃঙ্গপাতেও ইহা বিচূর্ণ হইবে না।

প্রতাপসিংহ মিবারের রাজবংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। মিবারের রাজবংশীয়দিগের সাধারণ উপাধি "রাণা"। রাণাগণ সূর্য্য-বংশীয় বলিয়া পরিচিত। ইঁহারা বলিয়া থাকেন, রামচন্দ্রের পুত্র লব ইঁহাদের বংশের আদিপুরুষ। লব পঞ্জাবে লবকোট (আধুনিক লাহোর) নামে একটী নগর স্থাপন করেন। এই লবকোট বা লাহোরই রাণাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি আবাস স্থল। এই সূর্য্যবংশীয়গণ বহুকাল লাহোরে অবস্থান করেন; পরে ইঁহাদের অধিনেতা কণক সেন ১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর হইতে দ্বারকায় যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৪৪ অব্দে কণক সেন কর্ত্তৃক বীরনগর নামে একটী নগর সংস্থাপিত হয়। কণক সেনের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ বিজয় সেন বিজয়পুর নামে আর একটী নগর স্থাপন করেন। বর্ত্তমান ধোলকা একণে যে স্থলে আছে, অনেকে অনুমান করেন, বিজয়পুর সেই স্থলে অবস্থিত ছিল। বিজয় সেন বিজয়পুর ব্যতীত বিদর্ভ নামে আরও একটী নগরের প্রতিষ্ঠাতা। বিদর্ভের পরিবর্ত্তে পরিশেষে এই নগরের নাম সিহোর হয়। সৌরাষ্ট্রের বল্লভীপুরও ইঁহাদের রাজ-ধানী ছিল। অনেকের মতে ভাউনগরের দশ মাইল উত্তর পশ্চিমবর্ত্তী বল্লভীই বল্লভীপুর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যেও এই নগরের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কালক্রমে অসভ্য-জাতির আক্রমণে বল্লভীপুর বিনষ্ট হইলে অধিবাসীগণ ইতস্ততঃ পলায়িত হয়। বল্লভীপুর-রাজ এই বিপ্লবে বিনষ্ট হয়েন, রাণীগণ ভর্ত্তার সহিত চিতানলে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। কেবল অন্যতম পুষ্পবতী ঘটনা ক্রমে স্থানান্তরে ছিলেন বলিয়া এই ভীষণ বিপ্লবের হস্ত হইতে রক্ষা পান। জৈনদিগের গ্রন্থানুসারে এই বিপ্লব ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

বল্লভীপুর ধ্বংসের সময় পুষ্পবতী গর্ভ-বতী ছিলেন। বল্লভীপুরের শোচনীয় সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি একটী পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গুহায় তাঁহার একটী পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পুষ্পবতী কমলা-বতী নাম্নী একটী ব্রাহ্মণ-পত্নীর হস্তে তনয়ের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া ভর্ত্তার উদ্দেশে চিতাধিরোহণ করেন। গুহায় জন্মিয়াছে বলিয়া পুষ্পবতী-তনয় গুহ নামে অভি-হিত হয়। কালক্রমে গুহ পার্ব্বত্য প্রদেশের ভিলদিগের অধিনায়ক হইয়া উঠেন। এই গুহ হইতে "গোহিলোট্" (সাধারণতঃ গেহ্লোট) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

গুহের বংশধরগণ অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত এই পার্ব্বত্য প্রদেশে আধিপত্য করেন।

অষ্টম ভূপতির নাম নগদিত্য। একদা অসভ্য ভিলগণ বিদেশীয় রাজার শাসনে উত্যক্ত হইয়া নগদিত্যের প্রাণসংহার করে। নগদিত্যের বাপ্পানামে তিন বৎসর-বয়স্ক একটী পুত্রসন্তান ছিল। জনৈক ভিল দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে ভাণ্ডিরাব* দুর্গে আনিয়া রক্ষা করে। ভাণ্ডিরাব হইতে বাপ্পা অধিকতর নিরাপদ স্থল পরাশর অরণ্যে আনীত হয়েন। এই অরণ্যের নিকটেই ত্রিকূট পর্ব্বত শির উত্তোলন করিয়া বিরাট পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বতের পাদদেশে নগেন্দ্র † নগর অবস্থিত। নগেন্দ্র নগর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণগণ এইস্থলে বেদগানে ও ধর্ম্মোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। এই পর্ব্বত-পাদদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আশ্রয় ক্ষেত্রে বাপ্পার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

এই সময়ে চিতোর রাজ্য প্রমরাবংশীয় মোরী ভূপতিদিগের শাসনাধীন ছিল। গুহের গর্ভধারিণী পুষ্পবতী প্রমরাবংশীয় চন্দ্রবতীরাজের দুহিতা। এই গুহের বংশে বাপ্পা রাওর জন্ম; সুতরাং বাপ্পার সহিত প্রমরাবংশের সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধের বিষয় অবগত হইয়া বাপ্পা চিতোরে উপস্থিত হয়েন। চিতোরের তদানীন্তন নৃপতি বাপ্পাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাপ্পা এইরূপে চিতোরের সেনাপতি হইয়া কিছুকাল যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। এই যুদ্ধে তাঁহার অসাধারণ বিক্রম প্রকাশিত হয়। কালক্রমে নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট কারণবশে মোরী কুলের পতন হয়। বাপ্পা ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোরের সিংহাসন গ্রহণ করেন। কথিত আছে, যখন বাপ্পা রাও চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র হইয়াছিল।

এই বাপ্পা রাও চিতোরে গোহিলট-বংশের সংস্থাপয়িতা; এই বাপ্পারাও "হিন্দুকুল-সূর্য্য" বলিয়া রাজস্থানে সম্মানিত। চিতোরভূমি যে অদ্যাপি বীরকুলধাত্রী ও বীরকুলপ্রসবিনী বলিয়া সজ্জদয় ঐতিহাসিক ও সহৃদয় কবির হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া আসিতেছে; এই বাপ্পারাওই তাহার মূল। বাপ্পারাওর বংশধরগণ অনেকবার যবনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন, অনেকবার যবনদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজপুত নামের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন পাণীপথ ক্ষেত্রে গোহিলবংশের গৌরব ও মোগলাধর্মের

---

* এই স্থান ভারতবর্ষের [illegible] প্রদেশবর্ত্তী [illegible] ১৩ মাইল [illegible] পশ্চিমে অবস্থিত।

† অন্যতর নাম নগদা। উদয়পুরের প্রায় দশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে কর্ণেল টড গোহিলোট বংশের কতিপয় পুরাতন খোদিত লিপি প্রাপ্ত হয়েন।

অভ্যুদয় হয় তখন বাপ্পারাওর বংশধরগণ মেওয়ারের মধ্যে বিশেষ পরাক্রমশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই প্রসিদ্ধ বংশের রাণাসঙ্গের ঔরসে উদয় সিংহের জন্ম হয়। রাণাসঙ্গ পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া যাইতে পারেন নাই; উদয় সিংহের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই ঘোর চক্রান্তজালে তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হয়। যাহা হউক, উদয় সিংহের বয়স যখন ছয় বৎসর; তখন চিতোরের অন্তর্বিপ্লবে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। উদয় সিংহ স্নেহময়ী ধাত্রী ও জনৈক বিশ্বস্ত ক্ষৌরকারের কৌশলে এই অন্তর্বিপ্লবের অধিনায়ক করাল শত্রু বানবীরের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন*। রাণাসঙ্গের বংশধরের জন্য রাজপুত-ধাত্রীর এই কৌশল জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। যে চিতোরের জন্য, হিন্দু-কুল-সূর্য্য বাপ্পারাওর বংশ রক্ষার নিমিত্ত অবলীলা ক্রমে অম্লানবদনে বাৎসল্যের শৈশব-দোলা, স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন, প্রীতির এক মাত্র পুত্তলী শিশু সন্তানকে মৃত্যু-মুখে সমর্পণ করে, তাহার ত্যাগ স্বীকার কতদূর মহান্ ও কতদূর উচ্চভাবের পরিচায়ক! যে স্বদেশের গৌরব রক্ষার্থ হৃদয়-রঞ্জন কুসুম কলিকাকে বৃন্তচ্যুত দেখিয়াও কর্ত্তব্যহারা না হয়, তাহার হৃদয় কতদূর তেজস্বিতা ও কতদূর স্বদেশহিতৈষিতার পরিপোষক, প্রকৃত তেজস্বী ও প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যতীত অন্য কেহ এই তেজস্বিনী নারীর হৃদয়-গত মহান্ ভাব বুঝিতে পারিবেন না। ভীরু-প্রকৃতি, ধাত্রীকে রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে, কিন্তু তেজস্বিনী প্রকৃতি তাহাকে মূর্ত্তিমতী হিতৈষিতা বলিয়া অনন্তকাল যত্নের সহিত হৃদয়ে রক্ষা করিবে। বস্তুতঃ ধাত্রীর

* বানবীরের সহিত গোহিলোট বংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। তিনি অন্যায় করিয়া চিতোরের সিংহাসন অধিকার করেন। রাজত্ব নিরাপদ করিবার জন্য রাণাসঙ্গের পুত্র উদয় সিংহকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। একদা রাত্রিকালে উদয় সিংহ আহার করিয়া নিদ্রিত আছেন, এমন সময় এক জন ক্ষৌরকার উদয় সিংহের ধাত্রীকে এই ভয়ানক সংবাদ জানায়। ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটি ফলের চাঙ্গাড়ির মধ্যে নিদ্রিত উদয় সিংহকে রাখিয়া এবং তাহার উপরিভাগ পল্লবাদিতে আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষৌরকারের হস্তে সমর্পণ করে। বিশ্বস্ত ক্ষৌরকার সেই চাঙ্গাড়ি লইয়া নিরাপদ স্থানে যায়। এমন সময় ঘাতকগণ আসিয়া ধাত্রীর নিকট উদয় সিংহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল, ধাত্রী বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের প্রতি অঙ্গুলি প্রদর্শন করে। ঘাতকগণ উদয় সিংহ বোধে সেই ধাত্রী পুত্রেরই প্রাণ সংহার পূর্ব্বক প্রস্থানপর হয়। এদিকে ধাত্রী স্বীয় পুত্রের প্রেতকৃত্য সম্পন্ন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ক্ষৌরকারের সহিত মিলিত হয়। এই ধাত্রীর নাম পান্না।

নিস্বার্থ হিতৈষণা তাহার রাজনী ভাবকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। সাধারণে এরূপ অসাধারণ ভাব মনেও ধারণা করিতে পারে না। যাবৎ হিতৈষণা ও তেজস্বিতার সম্মান থাকিবে, তাবৎ এই ত্যাগ স্বীকার ও তেজস্বিনী পান্নার নাম কখনও ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

চিতোর হইতে পলায়নের পর উদয়সিংহ বহুকাল পান্নার তত্ত্বাবধানে দেশান্তরে রক্ষিত হয়েন। কালক্রমে মেওয়ারের সর্দ্দারগণ উদয়সিংহকেই চিতোরের বিধিসঙ্গত রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। উদয় সিংহের অনুকূলে মেওয়ারের প্রধান প্রধান লোক সমবেত হইয়া যুদ্ধ উপস্থিত করাতে বানবীর চিতোর পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতে অনুমত হয়েন, সুতরাং উক্ত রাজ্য উদয় সিংহের করায়ত্ত হয়। এইরূপে মহাপরাক্রান্ত সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বহুকাল দেশান্তরে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া উদয় সিংহ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে বাপ্পারাওর সিংহাসনে সমাসীন হয়েন। রাজ্যপ্রাপ্তির কিছু পূর্ব্বে তিনি শালোর-রাজদুহিতার পাণিগ্রহণ করেন, এই দম্পতী মিলন হইতেই প্রতাপ সিংহের উৎপত্তি হয়।

প্রতাপসিংহ কোন্ সময়ে জন্মপরিগ্রহণ করেন, রাজস্থানের ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তবে তাঁহার জন্মকালে রাজস্থানের নিতান্ত শোচনীয় দশা উপস্থিত হয়। মোগলদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণই এই দশাবিপর্য্যয়ের একমাত্র কারণ। এই আক্রমণের ক্রম ধরিলে প্রতিপন্ন হইবে, প্রতাপ সিংহ ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ভূমিষ্ঠ হয়েন। যাহা হউক, যে সময়ে বাপ্পারাওর টীকা প্রতাপের ললাট-দেশ সুশোভিত করে, সে সময়ে বীর-প্রসবিনী চিতোরভূমি কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

রাজস্থানের প্রসিদ্ধ কবি চাঁদ বর্দ্দে বলিয়াছেন, "যে স্থানে নাবালক রাজত্ব করে, কিম্বা স্ত্রীলোক শাসনকার্য্য চালায় সে স্থানকে ধিক্।" যে স্থলে এই উভয়ের সমাবেশ হয়, সে স্থলের দুর্দ্দশার আর ইয়ত্তা থাকে না। চিতোর রাজ উদয় সিংহ এই নাবালক ও নারী উভয়েরই প্রকৃতি ও ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যে তেজস্বিতা ও বীরত্বের আধার ছিলেন, সেই তেজস্বিতা ও বীরত্বে উদয় সিংহের প্রকৃতি সমুন্নত হয় নাই। উদয় সিংহ প্রকৃতপক্ষে নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষ ছিলেন। প্রতাপ সিংহের জন্মদাতার এরূপ নিস্তেজ নারী-প্রকৃতি বীরভূমি চিতোরের ইতিহাসে নিতান্ত দুর্লভ। এই সময়ে আকবরের ন্যায় এক জন সুযোদ্ধা ও দিগ্বিজয়-পটু সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না থাকিলে উদয়সিংহ চিতোরে সংযতচিত্ত অপবীর ন্যায় কালাতিপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতা উদয় সিংহের ললাটে এরূপ শান্তি লিখেন নাই। সুতরাং চিতোরে প্রতি-

রাই তিনি কোমল-প্রকৃতি শারীরমনোচিত সুখের অধিকারী হইতে পারিলেন না। এই সুখ লাভের আশায় তাঁহাকে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল। তবে কি রাজপুত বিলাস-সুখের জন্য লালায়িত? তবে কি রাজপুতের আত্মা বিকৃত ও রাজপুতাত্মা পূর্ব্বগৌরব-ভ্রষ্ট? রাজস্থানের পর্ব্বা-গৌলী ও কাঙ্গু। (দুর্গ-প্রাকার) তবে কি আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক? অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের অনুসরণ কর, এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইবে।

যে বৎসর উদয় সিংহের রাজ্য প্রাপ্তিতে কমল মিররের প্রাসাদ হইতে আনন্দ-কোলাহল সমুত্থিত হয়, সেই বৎসরই ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে অমরকোটে একটী বালক জন্মগ্রহণ করে। কমল মিররের আনন্দস্বর সমস্ত চিতোরে পরিব্যাপ্ত হয়। অমরকোটের শোকস্বর নগর-প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া বৃক্ষলতা-শূন্য বিজন মরুভূমির বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। উদয় সিংহ সিংহাসনে অধিরোহণ করাতে কমল মিররের অনুগত ব্যক্তিদিগকে [illegible] করে, অমরকোটের বালক জন্মগ্রহণ করাতে তাহার পিতা [illegible] একটী [illegible] খণ্ড খণ্ড করিয়া [illegible] বিতরণ করেন। [illegible] চিতোরের উদয় সিংহের সহিত অমরকোটের বালকের [illegible] [illegible] [illegible]

বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল সময়ের সহিত পরিশেষে এই মরুপ্রান্তবর্ত্তী বালকের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হয়। কালে এই বালকের কীর্ত্তি প্রতাপ হিমালয় হইতে সুদূর কুমারীকা পর্য্যন্ত ছাইয়া পড়ে, এবং কালে এই বালকের উদ্দেশে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনি ইন্দ্রপ্রস্থের বিচিত্র আমখাস হইতে সমুত্থিত হইয়া সুদূর গগণতলে পরিব্যাপ্ত হয়। এই বালকের নাম আকবর সা। হেমায়ুন যখন রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট হইয়া দেশান্তরে পলায়িত, তখন বিস্তীর্ণ ভারত-মরুর এক খণ্ড ওয়েসিসে প্রাচীন সগদি *

* অন্যতর নাম সোডা। ইহা প্রমরা বংশের শাখা। এরিয়ান, ইহা সগদি নামে ও দাইওদোরস্ সোগ্রি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কানিংহামের মতে, সগদি বংশীয়গণ সিরোহীর অধিবাসী। Cunninghams Ancient Geography of India h 254.

এস্থলে ইহাও বক্তব্য; কর্ণেল টডের মতে বল্লভী নগর ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিনষ্ট হয়, কিন্তু কানিংহাম বলেন, সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্ থসাং ৬৪০ অব্দে এই নগর পরিদর্শন করেন; সুতরাং গণনা অনুসারে ইহা ৬৪০ অব্দের পরে বিনষ্ট হইয়াছে। Vide Ancient Geography h318.

অনেকের মতে বল্লভী মুসলমানদিগের আক্রমণে বিনষ্ট হয়। [illegible] একটী কিংবদন্তী আছে, তাহা এই—একদা [illegible]

বংশীয়গণের মধ্যে ভারতের এই ভাবী সম্রাট জন্ম গ্রহণ করেন। হোমায়ুন যেরূপে রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দুরবস্থায় পড়েন তাহা ইতিহাসে সবিশেষ বর্ণিত আছে। এস্থলে তদ্বিষয় উল্লেখের কোন ও প্রয়োজন নাই; কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পুত্রের জন্ম সময়ে হোমায়ুনের ললাট হইতে রাজটীকা বিচ্যুত হইয়াছিল, হস্ত হইতে রাজদণ্ড অপহৃত হইয়াছিল এবং দেহ হইতে রাজপরিচ্ছদ অপসারিত হইয়াছিল, দিল্লীর অর্দ্ধচন্দ্র-সুশোভিত পতাকা মোগলের পরিবর্ত্তে সুর বংশের শাসন-চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল, দিল্লীর রত্ন-খচিত সিংহাসন মোগল বংশধরের পরিবর্ত্তে সুর বংশধর সের সাহের দেহ মহিমায় সুশোভিত হইতেছিল।

হোমায়ুন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দ্বাদশ বর্ষকাল দেশান্তরে অতিবাহিত করেন। এই অনতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সুরবংশীয় ছয় জন নৃপতি ক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সর্ব্বশেষ নৃপতির নাম সেকন্দর। ১৫৫৪ অব্দে আকবরের পরাক্রমে সেকন্দর সুর পরাজিত ও রাজ্যতাড়িত হয়েন। এই সময়ে আকবরের বয়স দ্বাদশ বৎসর। এই বয়সেই তাঁহার পিতার সহ কর্ণনার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। সেকন্দরের পর হোমায়ুন পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল এই রাজত্বসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির ছয় মাস পরে তিনি একদা স্বীয় পুস্তকালয়ের সিড়ি হইতে পতিত হইয়া দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। এই আঘাতেই তাঁহার প্রাণ-বায়ুর অবসান হয়। প্রাচ্য ভূপতিগণ পুস্তকালয়ে থাকিয়া পুস্তক পাঠে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদের নিকট লক্ষ্মীর ন্যায় সরস্বতীর ও সমাদর ছিল, তাঁহাদের সভা পণ্ডিত-মণ্ডলীতে সর্ব্বদা সমুজ্জ্বল থাকিত। ফ্রান্সের চতুর্থ হেনরী অথবা ইংলণ্ডের এলিজাবেথও এ বিষয়ে প্রাচ্য ভূপতিদিগকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। জর্ক্‌তিস্ হইতে মোগল বংশ পর্য্যন্ত সকলের সভাতেই বিদ্যার সমাদর ছিল। প্রাচ্য সভামণ্ডপ যে সমস্ত কবি, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও গণিতবিদ্ প্রভৃতিতে গৌরবান্বিত থাকিত, ইতিহাস হইতে তাঁহাদের নাম ও কীর্ত্তিকলাপ কখনও বিলুপ্ত হইবে না।

হোমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এ সময়ে সাম্রাজ্যের অবস্থা নিতান্ত শোচ-

ব্রাহ্মণ বল্লভীতে আসিয়া আশ্রয় স্থান প্রার্থনা করেন; কিন্তু নগরবাসিগণ এই প্রার্থনা পূরণে অসম্মত হয়। ব্রাহ্মণ এতন্নিবন্ধন রোষপরবশ এক মুষ্টি ধূলি মন্ত্রপূত করিয়া নগর-প্রাচীরে নিক্ষেপ করিয়া গমন করেন। অচিরাৎ প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সমস্ত নগর বিনষ্ট হইয়া যায়। Vide Journal of the Royal As. Society —volX. IIIp. 151.

নীয় ছিল। হোমায়ুনের রাজ্য-চ্যুতির পূর্ব্ব অধিকাংশ প্রদেশই একে একে দিল্লীর শাসন-ভ্রষ্ট হইয়া স্বাধীন হইয়াছিল।

আকবর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সেই এইরূপ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল সাম্রাজ্যের অধিনায়ক হইলেন। কিন্তু বাইরাম খাঁর সাহস ও কার্য্যপরায়ণতায় অচিরাৎ দিল্লীর সাম্রাজ্য পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থাপন্ন হইল। বাইরাম কাল্পী, চান্দরী, কলিঞ্জর, বুন্দেলখণ্ড ও মালব দিল্লীর অধীনস্থ করিলেন। ভারতীয় সলি* এইরূপে ভারত-হৃদয়ে মোগল-শাসন বদ্ধমূল করিয়া পরিশেষে এই মোগল-শাসনের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করেন। কিন্তু বাইরামের এইরূপ বিদ্রোহভাবে আকবরের কোন অনিষ্ট হইল না। আকবর অচিরাৎ অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

* আকবরের সহিত চতুর্থ হেন্‌রীর ও বাইরামের সহিত সলির (Sully) অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইঁহারা প্রায় এক সময়ের লোক। বাইরাম বিদ্রোহ ভাব পরিত্যাগ করিয়া আকবরের শরণাপন্ন হয়েন। আকবর তাঁহার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে মক্কায় যাইতে অনুমতি দেন। বাইরাম সুরাটে উপস্থিত হইয়া জাহাজে আরোহণের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক জন ঘাতক আসিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করে। এক সময়ে বাইরামের হস্তে এই ঘাতকের পিতার প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইলে আকবর দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। মালদেবের শত্রুতার † প্রতিশোধ জন্যই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক রাজপুত রাজ্য তাঁহার লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠে। আকবর মারোয়ারের একটী নগর নষ্ট করিয়া ১৫৬৭ অব্দে চিতোরের বিরুদ্ধে সৈন্য চালন করেন।

যে রাজ্যে রাজত্ব আইনে নিবদ্ধ, রাজা কেবল প্রধান মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় আইনের অনুগামী, সেই রাজ্য কি সুখময়! রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে সেই রাজ্য উন্নতির শিখরে সমারূঢ় হয়, রাজা পাপ-পরায়ণ হইলে সেই রাজ্য অবনতির চরমসীমায় পতিত হইয়া থাকে। রাজা শৌর্য্য, বীর্য্য ও সাহস সম্পন্ন হইলে সেই রাজ্য অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে, রাজা ভীরু-স্বভাব হইলে সেই রাজ্য শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত ও উৎসন্ন হইয়া যায়। চিতোরের উদয়সিংহ ক্ষত্রিয় ছিলেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রোচিত বিধির অনুবর্ত্তী হইতে পারেন নাই। এজন্য তদীয় রাজত্ব বিধির অনুসরণ না করিয়া তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছিল।

† মোগল ঐতিহাসিকগণ বলেন, হোমায়ুন যখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মালদেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন মালদেব তাঁহাকে কোন রূপ সাহায্য করেন নাই। প্রত্যুত তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

উদয় সিংহ যে বয়সে চিতোরের অধিপতি হয়েন, আকবরও সেই বয়সে দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। উভয়ের এইরূপ বয়ঃক্রমের সাদৃশ্য থাকিলেও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বৈসাদৃশ্য ছিল। হোমায়ুন বাবরের নিকট যেরূপ সহিষ্ণুতায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন, আকবরও হোমায়ুনের নিকট সেইরূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতা অভ্যাস করেন। পিতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আকবর ক্রমে কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রমশীল হইয়া উঠেন। এ দিকে বাইরাম খাঁ আবুল ফজিল ও তোডর মল্লের ন্যায় বিচক্ষণ যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞগণ শাসন-কার্য্যে আকবরের সাহায্যকারী হয়েন। যে সৌভাগ্য-নক্ষত্র তাঁহার জন্ম সময়ে অমরকোটের মরু প্রান্তর উদ্ভাসিত করিয়াছিল, দিল্লীর রাজত্ব সময়ে ক্রমেই তাহা উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে। উদয় সিংহ এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই। এরূপ কষ্ট সহিষ্ণু হইয়াও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। মোগল ও রাজপুতের মধ্যে এই রূপ সৌভাগ্য ও শাসনোচিত ক্ষমতার ইতর বিশেষ ছিল। এক জন অদৃষ্টের বিপাকে পড়িয়া নানাস্থানে যাইয়া মানব চরিত্রে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, অপর জন প্রাকার-বেষ্টিত পর্ব্বতদুর্গে জন্মিয়া সঙ্কুচিত বিষয়ের সঙ্কুচিত সীমায় আবদ্ধ ছিলেন; অবারিত সংসার এক জনের বৈষয়িক জ্ঞান প্রসারিত করিয়াছিল, সঙ্কীর্ণ গিরিকন্দর অপরের বৈষয়িক জ্ঞান সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

আকবরই মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত সংস্থাপয়িতা রাজপুত স্বাধীনতার প্রথম গৌরবহারী। সাহেব উদ্দীন ও আলার ন্যায়, ইনিও রণমত্ত রাজপুতদিগকে তরবারির আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড করেন। ইনিও মূর্ত্তিমান্ ধ্বংসের ন্যায় রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে ধাবমান হয়েন। যে ধর্ম্মান্ধতা পাঠান-রাজত্বে আধিপত্য করিয়াছিল, তাহা মোগল সাম্রাজ্যের শিরোভূষণ আকবরের রাজত্বেও পরিস্ফুট হয়। আকবর অন্ধ-বিশ্বাসী আলার ন্যায় রাজপুতের আরাধ্য একলিঙ্গের মন্দিরের উপকরণ দিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মপুস্তক কোরাণের জন্য মঞ্চ * নির্ম্মাণ করিতেও ত্রুটী করেন নাই। এরূপ অন্ধবিশ্বাসী হইলেও এক সময়ে আকবরের কীর্ত্তিতে মোগল সাম্রাজ্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল; এক সময়ে আকবর ঈশ্বর-পদবাচ্য হইয়া চতুর্দ্দিকে আপনার মহিমা বিস্তার করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)।

* বেদী (পুলপিট্)।

সেনবংশীয় নৃপতিগণের জাতি নিরূপণ।

সপ্তশত বর্ষ অতীত হইল বঙ্গ দেশের গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বঙ্গদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এতদূর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে ভাবিতে গেলে হৃদয় শোকে ও ক্ষোভে অবসন্ন হইয়া আইসে। যে সেনবংশীয় নৃপতিগণের অখণ্ড প্রতাপে একদা সমস্ত বঙ্গ কম্পিত হইত, যাঁহাদের মহতী গৌরবধ্বজা ও দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি দ্বারা একদা সমস্ত বঙ্গ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত, কালের বিষম চক্র-পেষণে তাহা এক্ষণে লোক-লোচন ও স্মৃতির বিশাল সাম্রাজ্য অতিক্রম করিয়াছে। সময়-স্রোতঃ কখন কি ভাবে খেলিতে থাকে তাহা কে বলিতে পারে? বিচিত্র নৈশগগণে নক্ষত্ররাজির আলোকপুঞ্জে মোহিত হইয়া কেহ কখন কি তাহাদিগকে গণিয়া উঠিতে পারে? যে গৌড়নগরের অভেদ্য দুর্গ একদিন গগণমার্গে মস্তকোত্তলন করিত, এক্ষণে তাহা ভগ্নাবশিষ্ট হইয়া নিবিড় অরণ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। যে রামপাল নামক স্থানে মহারাজ বল্লালসেনের স্বর্ণ-মুকুট শোভা পাইত, যাহার সৌধমালার সমস্ত দিঙ্মণ্ডল এক অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিত, এক্ষণে সেই ভূমি একাও শ্মশানময় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যদি এতদিন হিন্দুকুলসূর্য্য অস্তমিত না হইত, যদি ভারত অধীনতারূপ দৃঢ়তর নিগড়ে নিবদ্ধ না হইত, যদি দেখিতে দেখিতে মহম্মদের জয়-পতাকা পৃথিবীর এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তারিত না হইত, তাহা হইলে বঙ্গদেশের অনেক উন্নতি হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! অষ্টশত বর্ষ অতীত হইল যে রাজকুল-চক্রবর্ত্তী মহারাজ বল্লালসেনের নাম বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইত, যাঁহার শাসন-সময়ে গৌড়দেশ সভ্যতার আদর্শ-ভূমি বলিয়া সমগ্র ভারতে পরিগণিত হইত, যাঁহার অখণ্ড প্রতাপে বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ কৌলীন্য-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, সেই বিখ্যাতনামা গৌড়াধিপতির অতীত ইতিহাস এপ্রকার অজ্ঞানান্ধকারে জড়িত হইয়া রহিয়াছে, যে এক্ষণে বহু কষ্ট ও আয়াস স্বীকার করিয়াও সম্পূর্ণ রূপে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না। আমরা যতদূর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস জানিতে সক্ষম হইয়াছি তাহা যথাক্রমে বিবৃত করিতেছি এবং যদি উহা কোন স্থানে-ভ্রম-সঙ্কুল হয় তাহা হইলে সহৃদয় পাঠকগণ আমাদিগের

ভ্রম সংশোধন করিয়া বাধিত করিবেন।

বহু দিবসাবধি আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে যে সেনবংশীয় রাজারা বৈদ্যকুল-সম্ভূত ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে এতদ্দেশস্থ অনেকানেক সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্যগণ (কয়েটী প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া) তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহাদের প্রমাণ গুলি কতদূর সত্য ও ইতিহাসমূলক তৎসমালোচন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সূক্ষ্মদর্শী পাঠক তাহার বিচার করিবেন। আমরা সেনবংশীয় রাজাদিগের জাতি-বিষয়ক যে কয়েকটী প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিব। কেবল স্থানে স্থানে প্রমাণ ও মত * বিশেষের প্রকৃত পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে যে সিদ্ধান্ত হয় তাহাই পাঠকবর্গের নিকট জ্ঞাপন করিব।

১। যিনি অভিনিবেশ সহকারে এই বিষয় একবার পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহার মনে প্রথমেই এই প্রশ্ন উদিত হইবে "যদি সেনবংশীয় রাজারা ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা হইলে 'তাঁহারা বৈদ্য' এই প্রবাদ কোথা হইতে অস্তিত্ব লাভ করিল?" বিশেষতঃ বঙ্গদেশ মহম্মদের অনুচরবর্গের করাল হস্তে পতিত হওয়া পর্য্যন্ত বৈদ্যজাতির সামাজিক রীতি নীতির এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মানসিক তেজস্বিতা তাঁহাদের শোণিতে এতদূর হীনভাবে প্রবাহিত হইতেছে যে তদ্বিষয় লিখিতে গেলে একটী বৃহৎ প্রবন্ধ হইয়া উঠে। যে বৈদ্যগণ পূর্ব্বে উপবীতধারী হইয়া ব্রাহ্মণগণের সমকক্ষ ভাবে চলিতেন এক্ষণে তাঁহারা সামান্য শূদ্রের ন্যায় বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিকে বাস করিতেছেন। বিশ্বপ্রকাশ-অভিধান-প্রণেতা মহেশ্বর কবীন্দ্র, মেদিনীকর, সাহিত্য-দর্পণ-প্রণেতা, চক্রপাণি দত্ত প্রভৃতি বৈদ্যবংশীয় গ্রন্থকারগণ ভারতের সুখশশী অস্তমিত হইবার পূর্ব্বে তনুত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসী হইয়াছিলেন। বাস্তবিক ভারতে মুসলমান জাতি আসিবার পূর্ব্বে বৈদ্যদিগের যে প্রকার মান সম্ভ্রম ও অন্তঃকরণের স্ফূর্ত্তি ছিল ভারত মুসলমানদিগের হস্তগত হইলে তাহার শতাংশের একাংশ প্রস্তারও তাঁহাদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। তবে লোকে সেনবংশীয় রাজাদিগকে বৈদ্যকুল-সম্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করার কারণ কি? সহায় সম্পত্তির আধিক্য হইলে অমূলক প্রবাদ লোকের মনে স্থান পাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাও তাঁহাদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় নাই? যদি কেবল মাত্র প্রবাদ থাকিত তাহা হইলেও আমরা অম্লান চিত্তে লেখনীকে এখানেই বিশ্রাম দিতাম। কিন্তু যখন কয়েকটী প্রমাণ আমাদিগের নিকট বর্ত্তমান রহিয়াছে, যখন বঙ্গদেশের যে কিছু ইতিহাস আছে তাহাই সেনবংশীয় নৃপতিগণকে

* See Dr. Rajendra Lal Mitra's paper on the Sen family, also কায়স্থ-কৌস্তুভ newly published.

বৈদ্যবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, তখন এবিষয়ের সমালোচনা যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও অসাময়িক হইবে না তদ্বিষয়ে আমাদের অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশে কেহ কখনও প্রকৃত ইতিহাস লিখেন নাই। জয়দেব ও বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়াই মত্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব ধর্ম্মেরই বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন, জীমূতবাহন প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভূত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। দেবীবর কুলীনদিগকে ৩৬ "মেলে" বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহ কোন সময়ে ইতিহাস লিখিতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সুতরাং বঙ্গের অতীত ইতিহাস অতিশয় নিবিড়-কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে আবৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এক্ষণে এই অরণ্য পরিষ্কার করিতে অনেকের কোমল শরীর স্থানে স্থানে ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, তথাপি ইহা সম্যক্‌রূপে পরিষ্কৃত হইতেছে না। আমাদিগের বিবেচনায় বঙ্গদেশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত না থাকিলেও প্রত্যেক জাতিরই (Caste) সামাজিক এক একখণ্ড ইতিহাস আছে। এক্ষণে যিনি সমাজ বন্ধন করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কুলগ্রহ সমূহ কি বলিতেছেন তাহা একবার দেখা যাউক।

[illegible] বল্লালসেনঃ প্রকৃতিমহত্তরঃ গুণ-রাজৈকধাতা।

[illegible] বৈদ্যবংশঃ প্রথিত [illegible]ঃ

[illegible]

মর্য্যাদা স্থাপিতাচ দ্বিজকুলতিলকৈরাম্বষ্ঠ্য-বর্ণস্য যেন।

রাজাধিরাজঃ জয়তি জয় মহারাজঃ কার্য্যপ্রবীণঃ।

বারেন্দ্রশ্রেণীয় ব্রাহ্মণের কুলগ্রন্থ।

৩। বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকার অন্য এক স্থানেও "বল্লালসেন বৈদ্যবংশীয় বলিয়া লিখিত আছে। যথা—

প্রতাপেন শূরো মহানাদিশূরো নৃপঃ পঞ্চগোত্রান্ দ্বিজান্ কান্যকুব্জাৎ।

সমানীতবান্ পঞ্চ পঞ্চাননাভান্ সতাং সৎক্রিয়াসিদ্ধয়ে গৌড়দেশে।

ততো বহুতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্য-কুলোদ্বহঃ।

বল্লালসেন নৃপতিরজায়ত গুণোত্তমঃ॥

বায়ারাং গৌড়-বারেন্দ্র-পৌণ্ড্র-বঙ্গোপ-বাঙ্গকে।

অধিকারো ভবেত্তস্য বলবীর্য্যপ্রভাবতঃ।

অর্থাৎ মহারাজ আদিশূর সৎক্রিয়া অনুষ্ঠানের জন্য কান্যকুব্জ হইতে অনলসমান যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাহার বহুকাল পরে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্ভব গুণশ্রেষ্ঠ মহারাজ বল্লাল সেন রাজা হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বলবীর্য্য প্রভাবে রাঢ়, গৌড়, বারেন্দ্র, পৌণ্ড্র, বঙ্গ ও উপবঙ্গ প্রদেশ সমূহ আপন রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

(৪) কবি-কণ্ঠহার নামক বৈদ্যদিগের কুলগ্রন্থেও বল্লাল সেনকে বৈদ্য-জাতীয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। যথা—

পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূতবল্লালেন মহীভুজা।

ব্যবস্থাপিতে কৌলীন্যে দুহিসেনাদি-
বংশজে॥

অর্থাৎ পূর্ব্বে বল্লাল সেন নামক নৃপতি বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুহিসেন প্রভৃতি বৈদ্যগণের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত করিয়া যান।

(৫)। অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুল-নন্দনঃ।
অকরোদতিযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণং।
আদিশূরানীতান্ বিপ্রান্ শূদ্রাংশ্চৈব তথা-
পরান্।
এতেষাং সন্ততীঃ সর্ব্বা আনয়স নিজালয়ে।

শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত কায়স্থ,কুলাচার্য্য-কারিকা।

অর্থাৎ অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) কুলসম্ভূত রাজা বল্লাল সেন অতি যত্ন সহকারে কুল শাস্ত্রের নিরূপণ করিয়াছিলেন। তিনি আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সন্তানগণকে নিজালয়ে আনয়ন করিয়া কুলমর্য্যাদা দিয়াছিলেন।

(৬) একদা বল্লালসেনেন একাং নিকৃষ্ট-জাত্যুদ্ভবাং পদ্মিনীং কন্যাং উদ্বোঢ়ুং মনশ্চক্রে। ততস্তৎপুত্রেন লক্ষ্মণসেনেন তন্নিবারয়িতুমশক্তেন ক্রুধা বহুতর বৈদ্যৈঃ সহ গঙ্গাতীরং গত্বা তং পিতরং প্রতি পত্রিকা প্রেষিতা—তদ্যথা—

একদা বল্লাল সেন নিকৃষ্ট-জাতীয়া এক পদ্মিনী কন্যাকে বিধিপূর্ব্বক বিবাহ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। রাজকুমার লক্ষ্মণ সেন তাঁহাকে এই দুরভিসন্ধি হইতে বারণ করিতে অশক্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধপূর্ব্বক বহুতর বৈদ্যসহ গঙ্গাতীরে আসিয়া পিতার নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহা এই

* শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভা-
বিকী স্বচ্ছতা
কিংব্রূমঃ শুচিতাং ? ভবন্তি শুচয়ঃ
স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে গুণকথাং ? ত্বং
জীবিনাং জীবনং
ত্বঞ্চেন্নীচপথেন যাস্যসি পয়ঃ কস্ত্বাং
নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ।

'আপনি শৈত্য গুণে বিভূষিত, আপনার স্বভাব অতি নির্ম্মল, আপনার পবিত্রতার বিষয় অধিক কি কহিব, অশুচীরাও আপনার স্পর্শে শুদ্ধ হয়। আপনি দেহীদিগের জীবন স্বরূপ, অতএব ইহা হইতে আপনার পরম স্তুতিবাদের বিষয় আর কি আছে ? হে মহাত্মন্! আপনি যদি সলিলের ন্যায় নীচ পথে গমন করেন তাহা হইলে কে আপনার গতিরোধ করিতে সক্ষম হয় ? ততো বল্লাল-পত্রং যথা—

তাপোনাপগতস্তৃষা নচকৃশা ধৌতা ন ধূলী
তনোঃ
ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলং কা নাম কেলী-
কথা।
দূরোৎক্ষিপ্তকরেণ হন্ত করিণা স্পৃষ্টা নবা
পদ্মিনী
প্রারব্ধোমধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কার-কোলা-
হলঃ॥

* See also কাব্যসংগ্রহ, Edited by Jibananda Vidyasagara, page 52.

তাপ অপগত হয় নাই, তৃষ্ণা দূর হয় নাই ও শরীরের ধূলি ধৌত হয় নাই, জলকেলীর কথা কি কহিব, একগ্রাস মৃণালও স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করি নাই। হস্তী দূরোৎক্ষিপ্ত কর দ্বারা নব পদ্মিনীকে স্পর্শ করিয়াছে মাত্র, অহো! অমনি মধুকরগণ অকারণে ঝঙ্কার কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে।

পুনর্লক্ষ্মণসেনস্য পত্রং যথা—

পত্নীবাদস্তথ্যোভবতি বিতথোবেতিমহতাং
তথাপ্যুচ্চৈর্দ্ধারাং হরতি মহিমানং জনরবঃ।
তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকর মিহতা শেষতমসো
রবেস্তাদৃক্তেজো নহি ভবতি কন্যাং গত-
বতঃ॥

মহদ্ব্যক্তিদিগের অপবাদ সত্যও হয় মিথ্যাও হয়। জনরব সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক মহিমা হরণ করে। সূর্য্য কন্যারাশি-গত হইয়া তুলা রাশিতে উত্তীর্ণ হইলে সমুদয় অন্ধকার বিনাশ করে, কিন্তু তখন তাহার তাদৃশ তেজ থাকে না।

ততোবল্লালসেনস্য পত্রং যথা—

সুধাংশোর্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য
কণিকা
বিধাতুর্দোষোয়ং নচ গুণনিধেস্তস্য কিমপি।
সকিং নাত্রেঃ পুত্রো ন ভবতি হরচূড়ার্চ্চনমণিঃ
নবান্ধকারধ্বংসং জগদুপরি কিম্বা ন বসতি॥

চন্দ্রের যে কলঙ্ক-কণিকা জন্মিয়াছে তাহা বিধাতার দোষ। সেই গুণনিধির কিছুই দোষ নাই। তিনি কি অত্রিমুনির পুত্র নন? অথবা তিনি কি হরচূড়াচলে মণি স্বরূপ নন? তিনি কি অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন না? তিনি কি জগতের উপর বাস করিতেছে না।

ততো বল্লালে স্বর্গংগতে লক্ষ্মণসেনেন বল্লালাশ্রিতবৈদ্যানাং স্বপক্ষানলবিনাং ক্রোধেন যজ্ঞোপবীতাদিকং দূরীকারিতং। তস্যৈব ভয়তঃ প্রায়োবৈদ্যা নির্বলবুদ্ধয়ঃ শূদ্রাচাররতা আসন্ স্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিতমনা।

অনন্তর মহারাজা বল্লাল সেন স্বর্গবাসী হইলে তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন পূর্ব্বজাত ক্রোধবশতঃ বল্লালপক্ষীয় বৈদ্যের অপমান করেন ও তাহাদিগের যজ্ঞসূত্র ছিন্ন করেন। তাঁহার ভয়ে সমস্ত বৈদ্যেরা দুর্ব্বল ও হীনবুদ্ধি হইয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রদিগের ন্যায় আচার ব্যবহার করিতেছেন।

ইতি কেনচিৎ কবিনা বিরচিতায়ামষ্টাচারচন্দ্রিকায়াং পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

আদিশূর মহারাজা জগতে বিখ্যাত।
তাঁর দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরের সুত॥
দেব অংশে জন্ম বল্লাল নৃপমণি।
যে করিল সেই হইল আচরণি॥
জাতিমালা আদি নির্দ্দিষ্ট করিল।
বিশেষিয়া ব্রাহ্মণের কুলজী বর্ণিল॥
যে দেশে যেখানে স্থানে স্থানে ছিল।
সেই দেশী গ্রামবাসী তাহাকে লিখিল॥
বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন জান।
পিতাপুত্র অন্যে ছিল বিরোধ কারণ॥
দেখি মন্দ আচরণ বল্লালে কহিল।
ভাল মন্দ ব্যবহার আমি না রহিল॥

পিতাপুত্রে বিসম্বাদ উচিত না হয়।
বিশেষতঃ রাজা তুমি নাহিক আশ্রয়॥
দেশত্যাগ যুক্তি মাত্র উপায় কেবল।
তাহা ভিন্ন অন্য যে সবই নিস্ফল॥
এই বলি ভিন্ন দেশে তখনি যে গেল।
পূর্ব্বমত ব্যবহার সে দেশে করিল॥
কিছুদিন এই ভাবে থাকে দুই জন।
পশ্চাতে উঠিল এক অশুভ লক্ষণ॥
লক্ষ্মণ বলিল বৈদ্যে ডাক দিয়া সবে।
ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র এবে॥
লক্ষ্মণ-অনুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল॥
বৈদ্যোতে মহারাজা রাজবল্লভ নাম।
শাকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান।
সবে আনি জিজ্ঞাসে শাস্ত্রের প্রমাণ॥
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত।
পুনর্ব্বার দ্বিজভাব যথা পূর্ব্বরীত॥
তদবধি কতগুলি করি প্রায়শ্চিত্ত।
পক্ষ মাত্র প্রায় শুদ্ধি করে বৈশবৃত্ত॥
সংস্কার দশবিধ লয় পূর্ব্বমত।
তখন পতীত জনে কহে কত শত॥

সম্বন্ধ নির্ণয়োদ্ধৃত রামজীবন
কৃত কুলপঞ্জিকা।

(ক্রমশঃ)

শৈবলিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে; চন্দ্রমা গঙ্গার বক্ষে নৃত্য করিতেছেন। গঙ্গায় প্রসন্ন হিল্লোল সেই চন্দ্রকরে নাচিতে নাচিতে মৃদুমন্দ গমন করিতেছে। সেই জ্যোৎস্নাময়ী গঙ্গার বক্ষে সুন্দরী শৈবলিনী সাঁতার দিয়া বহিতেছেন; প্রতাপের মুখচন্দ্র শৈবলিনীর দিকে ধাবিত হইতেছে। গঙ্গার আর এক চন্দ্র মোহিনীকে লইয়া যেন ক্রীড়া করিতেছেন। এই দৃশ্যটি কি সুন্দর, কি মনোহর! ইহা কবির সুন্দর কল্পনা। চিত্রকর এমন সুন্দর দৃশ্যে বর্ণপ্রয়োগ করিতে পারেন কি না সন্দেহ! বেলমণ্টের পথে সুন্দরী জেসিকার সহিত লোরেঞ্জোর কথা গুলি আমাদিগের স্মরণ-পথে উদিত হয়, এবং আমরাও বলি এই-রূপ চন্দ্রমাশালিনী রজনীতে শৈবলিনী প্রাণসম প্রতাপকে মুক্ত করিয়া গঙ্গার জলে সাঁতার দিয়া পলাইয়াছিলেন।

এই সুন্দর দৃশ্যে মোহিত এবং প্রতাপের মুক্তিতে আনন্দিত হইয়া আমরা শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের প্রিয় কথা-বার্ত্তা শুনিতেছিলাম; "শৈ" বলিবা মাত্র আমাদিগের মনে এক কোমল ভাবের উদয় হইল। শৈবলিনীর শৈশব কাল মনে পড়িল, এবং তৎসঙ্গে সহস্র মধুময় ভাব একে একে সঞ্চারিত হইল। তাহি-

আজ এত দিন প্রতাপের মন বুঝি শৈবলিনীর দিকে বিরক্ত হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যাখ্যানে শৈবলিনীর হৃদয়ে ব্যথিত হইয়া আমরা প্রতাপকে প্রীত নয়নে দেখিতে ছিলাম। এমত সময়ে সহসা প্রতাপের কঠোর বজ্র-বাক্য শৈবলিনীর নিকট ব্যক্ত হইল; অমনি সহসা পূর্ব্বকার অনুরাগ তিরোহিত হইল। শৈবলিনীর সহিত আমাদিগেরও মনে সহসা কাদম্বের বজ্রনিনাদ ধ্বনিত হইল। আমরাও শৈবলিনীর সহিত কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইলাম। কি নিদারুণ বাক্য! শৈবলিনী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। তিনি অনেক পৃথিবীকে শূন্যময়ী দেখিলেন। আলোক তারা, চন্দ্র; সকলই নিবিয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ শিথিল বোধ হইতে লাগিল। নীরবে নিশার বায়ু হৃদয়ভার বহন করিয়া গঙ্গার জলে পতিত হইতে লাগিল। তখন শৈবলিনী মৃদু মৃদু রবে বলিলেন :—

"এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে প্রতাপ? তোমার ঐশ্বর্য্য আছে—রূপ আছে,—কীর্ত্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ?—আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখ—আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছ। আমি তোমাকে ছাড়িব না—তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব? আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি। আজি হইতে আমি মনকে সংযত করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

অল্প দিনের পরে শৈবলিনীর হৃদয়ে মনোভঙ্গ জন্মিল। এতক্ষণে 'তাঁহার জীবন-নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল।' তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না, প্রতাপ তাঁহাকে এতদূর নৈরাশ্যে ফেলিবে। যদি জানিতেন, তবে প্রতাপের জন্য তিনি এতদূর করিতেন না। এত দিনের পর তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন প্রতাপ তাঁহাকে কখনই গ্রহণ করিবেন না। প্রকৃতির প্রবলতা ধর্ম্মের কঠোরতার নিকট পরাজিত হইল।

শৈবলিনী যে আশাবৃক্ষের উচ্চশিরে উঠিয়াছিলেন, অকস্মাৎ এক প্রবল বাত্যায় তাহা হইতে বহুদূরে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষণেক চৈতন্যবিরহিতের ন্যায় হইয়া রহিলেন। প্রতাপের জন্য তিনি সর্ব্বসংসার পরিত্যাগ করিয়া এক বিষম সুবিস্তার সিকতাময় প্রান্তর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। এই প্রান্তরে যে মরীচিকার প্রতি তিনি এতকাল ধাবিত হইয়াছিলেন, নিকটে গিয়া দেখিলেন, সে মরীচিকার মনোহর দৃশ্য সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাঁহার পূর্ব্বের পিপাসা বর্দ্ধিত হইয়াও পূর্ব্বের ন্যায় অতৃপ্ত রহিল; অথচ প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া দ্বিগুণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। মরীচিকার দৃশ্য হরিৎক্ষেত্র বিলুপ্ত হইল। চতুর্দ্দিক্ বালুকাময়। পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া ভাবিলেন, কেন—তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! সংসারে যদি সুখ না থাকে, তবে সুখ আর কোথাও নাই।

কিন্তু হায়, সে সংসারকে তিনি অন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছেন! তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি সংসারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন সংসার সুখের উল্লাসে হাসিতেছে। তাহার প্রতি বৃক্ষশাখে পক্ষিগণ সুমধুর স্বরে প্রণয়-গীত গাহিতেছে। ধর্ম্মের স্বচ্ছ সরোবর প্রতি আশাবৃক্ষকে জীবন দান করিতেছে। আশা-বৃক্ষে শান্তির শত শত সুবর্ণ ফল সুরঞ্জিত হইয়া শাখীর শোভা সম্পাদন করিয়াছে। সুখের সমীরণ সুমন্দ হিল্লোলে সরোবরে সুশীতল হইয়া শাখীগণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আন্দোলিত করিতেছে। সংসারীগণ ভাবনা চিন্তার আতপ-তাপে তাপিত হইয়া যখন এই সুরম্য কাননে প্রবেশ করে, বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া মধুর প্রণয় গীত শুনিলে তাহাদিগের শ্রবণ যুগল পরিতৃপ্ত হয়, সরোবরের সুশীতল বায়ু শরীর সুস্নিগ্ধ করে এবং শান্তির সুস্বাদ ফল আস্বাদনে সন্তুষ্ট হইয়া যায়।

এত দিনের পর শৈবলিনীর কল্পনা সংসারকে এইরূপ অনুরঞ্জিত করিয়া দেখাইল। সেই মনোহর দৃশ্য দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন, এই মরুভূমি হইতে কি ঐ সুখধামে আবার প্রবেশ করা যায় না? ভাবিয়া নিরাশ হইলেন। দেখিলেন সেই সুখধাম ত্যাগ করিয়া তিনি এই সিকতাময় প্রান্তরের অনেক দূর আসিয়াছেন। চন্দ্রশেখর তাঁহার স্বপ্নে উদিত হইলেন, কিন্তু সেই স্বপ্নেই আবার বিলীন হইলেন। তাঁহার সংসার-ধাম মনে মনে চিন্তা করিলেন, কিন্তু সে চিন্তা নিতান্ত ক্লেশকর হইল। সুন্দরীর কথা মনে হইতে লাগিল, কিন্তু সুন্দরীর কথা ভাবিতে গিয়া আপনাকে শত বার ধিক্কার দিলেন, লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন, এবং দারুণ অনুতাপ তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল। কেন তিনি সুন্দরীর কথায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, এখন কি বলিয়া তাহাকে মুখ দেখাইবেন। সুন্দরীর শাপ-বাক্য এখন স্নেহ-বাক্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আহা, আর কি তিনি সে সুন্দরীকে পাইবেন; পাইলে কি সুখী হইবেন? ফষ্টরকে তিনি শতবার অভিসম্পাত করিলেন। নিজ বুদ্ধিকে ধিক্কার দিলেন। কিন্তু কিছুতেই সংসারে প্রবেশ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। ঘোর নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহার কল্পনাকে অন্ধকার করিল।

এত দিনের পর শৈবলিনী আপনাকে ঘোর পাপীয়সী বলিয়া স্থির করিলেন। একণে তাঁহার পূর্ব্বকৃত্য সমুদায় দুষ্কৃতি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখরকে পরিত্যাগ করিয়া আসা তাঁহার ভাল হয় নাই, বুঝিতে পারিলেন। তিনি এত দিনে বুঝিতে পারিলেন "যৌবনমদ" নারীর পক্ষে বিষম বিপদ; তখন 'প্রেমের পুলক' গদ্গদ থাকিলে নারী সকলপ্রকার দুষ্কৃতিতে প্রবৃত্ত হইতে

পারে। তিনি আরও ভাবিলেন, ফষ্টর যদি জীবিত থাকিত তাঁহার ভাগ্যে আরও কত অনিষ্টলাভ হইত। ফষ্টর হয়ত তাহার জীবন স্রোতকে আর এক দিকে ফিরাইয়া দিতেন; তিনি হয়ত এক জন কুলাঙ্গনার মধ্যে পরিগণিত হইতেন। কি মহাপাপই করিয়া তিনি সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রেমের উন্মত্ততা রমণীগণকে অন্ধ করিয়া কোথায় লইয়া যায় তাহার ঠিক নাই। রমণীর হৃদয় তাহার প্রধান শত্রু। শৈবলিনী আর সে হৃদয়কে বিশ্বাস করিবেন না। ভাবিলেন, হৃদয় যে দিকে ইচ্ছা যাউক, তিনি অদ্য হইতে চন্দ্রশেখরকে ধ্যান করিবেন; চন্দ্রশেখরের মূর্ত্তি অন্তরে স্থাপন করিবেন, চন্দ্রশেখরকে পূজা করিবেন; আর প্রতাপকে ভাবিবেন না। চন্দ্রশেখরকে পদে পদে অন্তর্বেদনা দিয়া তিনি যে দুষ্ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহার মনে মহা আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি গঙ্গার উপকূলে বসিয়া সুশীতল সমীরণেও এইরূপ আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছিলেন। সে ভুজঙ্গম যদি তাঁহাকে আশ্রয় না করিত, তিনি সুখিনী হইতেন, পরম সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এক দিকে প্রতাপের ব্যবহার দেখিয়া ঘোর মনস্তাপ, অন্য দিকে চন্দ্রশেখরের জন্য বিষম মনস্তাপ। এই দ্বিবিধ তাপে তাপিত হইয়া তিনি যথেচ্ছ চলিয়া গেলেন। "যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। প্রাণভয়ে শৈবলিনী সুখ, সৌন্দর্য্য, প্রণয়াদি পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ, সৌন্দর্য্য প্রণয়, প্রতাপ, এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই,—আশা নাই,—আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য্য--নিকটে থাকিলে কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে? শৈবলিনী যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। মনে তাহার ভয় ছিল, প্রতাপ তাহার পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই নিজ স্বভাব গুণে তাহার সন্ধান করিবে। এজন্য নিকটে কোথাও অবস্থিতি না করিয়া যতদূর পারিল ততদূর চলিয়া গেল।"

যে আন্তরিক অন্ধকার এখন শৈবলিনীর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, যে ঘোর আত্মগ্লানি ও চিন্তা তাহার হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করিতে ছিল তাহার গাম্ভীর্য্য প্রচণ্ডতা, ও ভীষণতা দেখাইবার জন্য কবি শৈবলিনীকে পর্ব্বতোপরি লইয়া গেলেন। তথায় পার্ব্বতীয় মেঘ, ঝড় ও অন্ধকারে তাহাকে প্রক্ষিপ্ত করিলেন এবং পরিশেষে শৈবলিনীর আন্তরিক চিত্র প্রকাশিত করিয়া দেখাইলেন, যে সেই চিত্র প্রকৃতির এই বাহ্য বিভীষণ মূর্ত্তি হইতেও গভীর, প্রচণ্ড ও ভীষণতর। গ্রন্থের এই ভাগটী যেমন গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, মহান্ ও ভয়ঙ্কর এমত আর কোন স্থল নহে। আমরা একদা বাহ্য ও আন্তরিক জগতের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হই।

সম্মুখে দেখি প্রকাণ্ড পর্ব্বত। পার্ব্বতীয় দেশ, মেঘ ও অন্ধকারে পরিপূর্ণ, এবং প্রবল ঝটিকায় লণ্ড ভণ্ড হইতেছে; পর্ব্বতের মধ্যে মহান্ধকারময় গুহা; এবং গুহার মধ্যে ভীষণতর মহাকায় পুরুষ। এইখানে শৈবলিনী একাকিনী প্রস্থিতা হইয়াছেন। শৈবলিনী একাকিনী এই পর্ব্বতের সানুদেশে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। তাঁহার হৃদয় অন্ধকারময়, হৃদয়ে তামসীর প্রবল ঝঞ্ঝা বহিতেছে। এমত সময় দেখিতে দেখিতে পৃথিবীও অন্ধকারময়ী হইল। নিবিড় কাদম্বিনীজাল গগণদেশ আচ্ছন্ন করিল, প্রবল বাত্যা উঠিল, মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই অন্ধকার ও ঝটিকার সময় শৈবলিনীর পৃষ্ঠদেশ কে যেন স্পর্শ করিল। শৈবলিনী শিহরিয়া না উঠিতে উঠিতে তাঁহাকে কে যেন ধরাধরি করিয়া অন্ধগুহা মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিল। এ সমুদায় দৃশ্যই ভয়ঙ্কর। কিন্তু তদপেক্ষা ভীষণতর দৃশ্য পরে প্রকটিত হইবে। তাহা শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত; অশান্ত কম্পনা; ভীষণ আত্মগ্লানি; আত্মকৃত নরকের চিত্র, এবং হৃদয়ের মাহাত্ম ও যন্ত্রণা। এক দিকে বাহ্যপ্রকৃতির খেলা, অন্যদিকে ধর্ম্মপ্রকৃতির মহাদণ্ড। এসকল বর্ণনা বাহ্যজগতের শাসন অপেক্ষা গুরুতর হইয়া উঠিল। দৃশ্য গভীর হইতে গভীরতর, এবং ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল। এরূপ গভীর গাম্ভীর্য্যের গৌরব, যদি প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য্যের দ্বারা চিত্রিত না হইত, তাহা হইলে সেই প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য্যচিত্রের লোক রঞ্জিত হইত না, এবং ধর্ম্মেরও গৌরব তাদৃশ উজ্জ্বল বর্ণে প্রকাশিত হইত না।

শৈবলিনী যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিলেন, কল্পনায় রাত্রিদিন নরক দেখিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর দেখিলেন তাঁহার ইহলোকেই নরকভোগ হইতেছে। শৈবলিনীর সহিত যাহাতে চন্দ্রশেখরের একবার সাক্ষাৎ হয় তজ্জন্য শৈবলিনী যথা কষ্টেপ্রায়শ্চিত্ত করিলেন। চন্দ্রশেখরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। চন্দ্রশেখর তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। বলিতে গেলে, এইখানেই এই উপন্যাস ভাগ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পর শৈবলিনী-বিষয়ক উপাখ্যানাংশের সম্প্রসারণ তত মনোজ্ঞ বোধ হয় নাই। এই প্রবৃদ্ধভাগ অধ্যয়ন কালে আমাদিগের রামায়ণ মনে পড়ে। মনে হয় আবার সীতা পরীক্ষার পালা আরম্ভ হইল। শুদ্ধ তাহাই নহে, অনেক কাল আমরা Spiritualism এবং যোগ সাধন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আবার দেখি সেই ভূতের আবির্ভাব। এই জন্য উপাখ্যানের এই অংশে ক্রমশঃ বিরক্তি ধরিতে লাগিল। নবাবের সভায় আবার দশ জনের সমক্ষে শৈবলিনীর পরীক্ষা হইল। চন্দ্রশেখর তখন সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

বঙ্কিম বাবু শৈবলিনীকে বরাবর সতী সাধ্বী রাখিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে শৈবলিনীকে দুশ্চরিত্রা করিতে পারেন নাই।

তিনি অন্য অলঙ্কারে পাঠকের মনে উদয় হয়। শৈবলিনীর চরিত্রের ধর্ম্মনৈতিক ভাব পর্য্যালোচনা করিলে উহা বিশিষ্ট রূপে প্রতীত হইবে। আমরা শৈবলিনীর প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বাংশে প্রশংসা করিতে পারি না।

অনেক উপন্যাস-লেখক মনে করেন, যে মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র দেখাইতে হইলে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র দেখান উচিত নহে। এই জন্য তাঁহারা সেই মানবপ্রকৃতির দোষগুণ উভয়ই একত্র প্রদর্শন করেন। তাঁহারা যে ঔপন্যাসিক পাত্র ও পাত্রিগণের চরিত্র চিত্র করেন, তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে সাধুভাব এবং কিয়ৎপরিমাণে অসাধুভাব প্রদান করেন। প্রদান করিয়া এই দোষগুণ উভয়ই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করেন। কিন্তু ইহাতে এই দোষ ঘটে, যে পাঠক সেই চিত্রকে এতদূর প্রশংসা করিতে শিখে, যে তজ্জন্য তাহার দোষাংশ অনেক পরিমাণে ভুলিয়া যায়। হয় ত সেই দোষ সমুদায়কে নিন্দা ও ঘৃণা না করিয়া অনেকে তাহার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। এক পৃষ্ঠায় আমরা দেখি, নায়ক অথবা নায়িকা, সমাজের অতি পবিত্র নিয়ম সকল ভঙ্গ করিয়া যথেচ্ছা কার্য্য করিতে দেন; কিন্তু পর পৃষ্ঠায় আবার সেই নায়ক এবং নায়িকাকে এরূপ সদ্গুণে বিভূষিত করা হয়, যে তাহাকে ভালবাসিয়া এবং তাহার চরিত্রের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। তিনি হয় ত এরূপ কোন সাধু কার্য্য করিলেন যাহাতে মনুষ্য নামের গৌরব বৃদ্ধি হইল, এরূপ ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন, যাহাতে হৃদয় আপনি সাধুবাদে উৎসাহিত হইল। এরূপ চরিত্র পাঠের সংস্কার কখন সাধু হয় না। যে পাপ চিত্র দর্শনে পাপের প্রতি অপরুচি এবং ঘৃণা না জন্মায়, সে পাপ-চিত্র অঙ্কিত না করাই ভাল। এরূপ পাপ-চিত্রের ধর্ম্মনৈতিক ফল কখন সাধু বলিতে পারা যায় না। যাঁহারা বলেন উহা চিত্রের দোষ নহে মানব-প্রকৃতির দোষ, তাঁহারা ঔপন্যাসিক কাব্য এবং প্রকৃত ইতিহাসের প্রভেদ জানেন না। রামায়ণের পাত্র এবং পাত্রীগণের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে আমাদিগের কথার মর্ম্ম প্রকাশিত হইবে *।

শৈবলিনী সতী, সাধ্বী, প্রেম অনুরাগে পরিপূর্ণ, সাহসিনী, এবং পূর্ব্ব পাপের যথোচিত অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় চন্দ্রশেখরের গৃহে প্রবেশ করিলেন। এ সমুদায় গুণের জন্য আমরা শৈবলিনীকে সাধুবাদ দিই। তাঁহার প্রণয়ানুরাগের মহত্ব উপলব্ধি করি; কিন্তু পূর্ব্বেই তিনি সমাজের অতি পবিত্র নিয়ম ভঙ্গ করিয়া এরূপ কলুষিত ভাবে আমাদিগের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছেন, যে সেই অপবিত্র সংস্কার কিছুতেই অপনীত হইবে না। শৈবলিনীর চিত্রে

* Vide Lounger, paper No 20. and Rambler paper No. 4.

আমরা একটী কুলটা* রমণীর চিত্র এরূপ উজ্জ্বল বর্ণে বর্ণন করি, যে তাহার সাধুভাবের সংস্কার আমাদিগের মনে ভত প্রতীত হয় না। শৈবলিনীর ন্যায় কোন রমণীর চিত্র, আমাদিগের তরুণীগণের সমক্ষে ধরিতে আমরা সাহসী হই না; পাছে তাহারা শৈবলিনীর দৃষ্টান্তে আপন আপন চন্দ্রশেখর ত্যাগ করিয়া এক এক জন প্রতাপের জন্য ফষ্টরের সঙ্গে বাহির হইয়া যান। শৈবলিনী যদি প্রতাপকে ভুলিতে পারিবেন না, তবে চন্দ্রশেখরকে বিবাহ করিলেন কেন? জুলিয়েট সুন্দরী প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তবুও ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা এরূপ বিবাহে সম্মত হন নাই। যদি চন্দ্রশেখরকে বিবাহ করিলেন, তবে সেই বিবাহে সন্তুষ্ট হইয়া কেন প্রতাপকে ভুলিলেন না, কেন চন্দ্রশেখরের পার্শ্বে চিরদিন আবদ্ধা রহিলেন না? ইহাই শৈবলিনী-চরিত্রের প্রধান কলঙ্ক; এবং এই কলঙ্কের জন্য তাঁহার চিত্রকে নিতান্ত কলুষিত করিয়াছে। যে চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী ব্যতীত সংসারে আর কেহই ছিল না, যে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন, যাহার নির্ম্মল চরিত্রে কোন দোষ ছিল না, সেই চন্দ্রশেখরকে ত্যাগ করিয়া যেরূপ শৈবলিনী ফষ্টরের সহিত চলিয়া গেলেন, সেই ঘটনাটি আমাদিগের কল্পনাকে নিতান্ত চমকিত করিল। রূপা এবং শৈশবে চন্দ্রশেখর সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করাতে সেই ঘটনাকে অধিকতর বিপ্রিয়ঙ্কর করিয়া তুলিল। আবার সুন্দরীর কথায় যখন শৈবলিনী গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হইলেন না, তখন আমাদিগের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ইচ্ছা হইতেছিল আমরা শৈবলিনীকে বলপূর্ব্বক তুলিয়া আনি। কিন্তু কি করি, এ উপন্যাস মাত্র; আমাদিগের কল্পনা ব্যথিত ও প্রজ্বলিত হইয়াই রহিল। কিন্তু সেই যে কল্পনা ব্যথিত ও প্রজ্বলিত হইয়া রহিল, আর কিছুতেই শান্ত হইল না। শৈবলিনীর সতীত্ব, প্রেমানুরাগ, মনস্তাপ প্রভৃতি কিছুতেই তাহাতে শান্তিবারি দিয়া শীতল করিতে পারিল না। তাহার কারণ এই, কল্পনা প্রথমেই এরূপ বিষম বিদ্রোহিণী হইলে তাহাকে শীঘ্র ফিরান যায় না। শৈবলিনীর পাপচিত্রে আমাদিগের কল্পনাকে প্রথমেই এইরূপ বিদ্রোহিণী করিয়া তুলিয়াছিল। এই উত্যক্ত কল্পনা দলনীকে ভাবিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হয়।

দলনী এবং শৈবলিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে আমাদিগের একটি সুন্দর ইংরাজি লিখিত গল্প মনে পড়িল। সেরূপ গল্প আমরা অন্যত্র দেখি নাই বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম। একদা মহারাজ আকবর মৃগয়ায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া একটী সামান্য কৃষক ...

* সম্পাদকের সহিত মতের ঐক্য না থাকিলেও সকলেই স্বাধীনরূপে এই পত্রিকায় আপন আপন মত ব্যক্ত করিতে পারেন। স,

মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রান্ত হইলে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তূণীর হইতে শরকলাপ বিক্ষিপ্ত হইল। তিনি জানিতেন না, ঐ গুহা যমরাজের আশ্রয় স্থান। সায়ক সকল বিক্ষিপ্ত হইলে যমসঙ্গিগণ মৃত্যু সায়কের সহিত তাহাদিগকে মিশাইয়া দিলেন। অনতিকাল পরে মদনরাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সম্মুখে দেখিলেন যমরাজ। অমনি শশব্যস্তে তূণীর মধ্যে নিকটস্থ কতিপয় সায়ক প্রক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। কতকগুলি মৃত্যু শর তূণীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিল; এবং মদনেরও কতকগুলি সায়ক সেই যমগুহায় পড়িয়া রহিল। দলনী বেগমের সহিত যখন নবাবের মিলন হইয়াছিল, আমাদিগের অনুমান হয়, তখন মদনরাজ ভ্রমক্রমে দলনীর প্রতি একটী মৃত্যু-সায়ক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এবং শৈবলিনী যখন প্রতাপের সহিত জলে ডুবিয়া মরিতে যায়, তখন বোধ হয়, যমরাজ তাহার প্রতি একটী মদন-শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই জন্য মরিতে গিয়া, তিনি প্রেমসাগরে হইতে ডুবিয়া উঠিলেন। মদন-শর মৃত্যুহস্ত-স্পৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তাহার প্রণয় যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণার কারণ হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে চন্দ্রশেখরের সহিত তাহার মিলন হইয়া গেল। দলনীর ভাগ্য সেরূপ হইল না। মৃত্যুশর মদনহস্ত-স্পৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া দলনী কিছুদিন সুখসম্ভোগ করিলেন; কিন্তু অবশেষে প্রণয়ই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। দলনী সংসার অন্ধকার করিয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিলন।

শ্রীপূঃ—

মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ।

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে রাজার উপর অভিমান করিয়া অনেক তিরস্কার করিলাম—অনেক কাঁদিলাম। কিন্তু তাহাতেই আমাদিগের জাতীয় কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হইল না। আমাদিগের জানা উচিত যে ইংরাজেরা আমাদিগের জেতা অথবা জেতৃত্বাভিমানী। যাহাদিগের মনে জেতৃত্বাভিমান প্রবল রহিয়াছে, তাঁহারা যে বিজিত দেশের প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্য সাধন—বিজিতদিগের সুখ দুঃখে পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ—করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায় না। যতদিন ইংরাজদিগের মন হইতে সেই জেতৃত্বাভিমান অপনীত না হইবে, যতদিন তাঁহারা আমাদিগকে অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য বিজিত দাসজাতি বলিয়া ঘৃণা করিবেন, ততদিন

* এই প্রস্তাবটী কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিত হয়। এই জন্য স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ অসাময়িক বলিয়া বোধ হইলেও হইতে পারে।

তাঁহাদিগের কাছে সমদুঃখসুখতা আশা করা বাতুলতামাত্র। স্বাধীন জাতি তাঁহাদিগের গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সকল দাবী দাওয়া করিতে পারেন, আমাদিগের তাহা করিবার অধিকার নাই। আজ লর্ড লীটন ও টেম্পল সাহেব অর্দ্ধাশননীতি অবলম্বন করায় মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষে পাঁচ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইল। এ সংবাদে কেন আজ ভারত নীরবে নির্জ্জনে কাঁদিল? ইহার একই উত্তর—ভারত পরাধীন—ভারত বিজিত।

মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষে সহস্র সহস্র ভ্রাতা-ভগিনী মরিতে লাগিল, আর আমরা অম্লানবদনে দেখিতেছি—নির্ভাবনায় থাইতেছি! এমন সহৃদয় ব্যক্তি আমাদিগের মধ্যে কয়জন আছেন, যাঁহারা দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও সেই হতভাগ্য ও হতভাগিনীদের জন্য ভাবিয়া থাকেন বা একবিন্দুও অশ্রুজল ফেলেন? ইতিহাসের অতীত ঘটনা ও নবন্যাসের কল্পনা-সম্ভূত উপাখ্যান আমরা যেরূপ নির্লিপ্ত ও নির্জ্জীবভাবে পাঠ করি, মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের শোচনীয় অবস্থাও আমরা সেইরূপ ভাবে পাঠ করি। তাহাদিগের দুঃখে আমাদিগের জীবন্ত ও জলন্ত সহানুভূতি নাই। তাহা থাকিলে আমরা এরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না; আমরা গবর্ণমেণ্টের উপর সমস্ত ভার—সমস্ত দায়িত্ব—চাপাইয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতাম না; আমরা শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টকে গালি দিয়া স্বজাতি-প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে চাহিতাম না। গবর্ণমেণ্টের স্খলনে—গবর্ণমেণ্টের অনবধানে—গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের অকরণে—যদি দুর্ভিক্ষের ভীষণ পরিণাম ঘটে, পূর্ব্ব হইতেই তাহার উপায় স্থির না করিয়া, এরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না।

যদি স্বজাতির বিপদে—সহোদর সহোদরার দুঃখে—আমরা কাতর না হইলাম, তবে বিজাতিতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভগিনীকে—কেন তাহাদিগের দুঃখে, তাহাদিগের বিপদে কাতর হইবে? আমরা সহোদর-স্নেহের অভাবের জন্য আপনাদিগকে তিরস্কার করিব না, কিন্তু বিজাতীয়দিগের অন্তরে প্রবল মানবপ্রেমের অভাব দেখিলে তাহাদিগকে তিরস্কার করিব। আমরা রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি পাইবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিব, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভ্রাতা ভগিনীর প্রাণরক্ষার্থে তাহার বিন্দুমাত্র দিতে পারিব না। কোন সম্ভ্রান্ত লোক মরিলে আমরা তাঁহার স্মৃতি চিরস্থায়িনী করিবার জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা চাঁদা দিতে পারিব, কিন্তু সহস্র সহস্র সহোদর, সহোদরার জীবন রক্ষার্থে তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিতেও কুণ্ঠিত হইব। অতএব আইস অগ্রে আমরা নিজের দোষ সংশোধন করি, তাহার পর পরকে গালি দিব। অগ্রে আমরা কার্য্যতঃ দেখাই যে আমরা সমস্ত ভারতবাসী মিলিয়া মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য

প্রাণ পণ চেষ্টা করিতেছি, তখন যদি দেখি গবর্ণমেণ্ট তৎপক্ষে উদাসীন, আমরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইব।

এক্ষণে এতৎসম্বন্ধে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে দেখা যাউক মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের অবস্থা কি। আমরা স্বচক্ষে কিছুই দেখি নাই, সুতরাং পরোক্ষে যাহা শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি, তাহা হইতেই আমাদিগকে প্রকৃত ঘটনার একটী চিত্র, একটী প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা পাঠকদিগের গোচরার্থে মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষনিবারণী সভায় দীনবন্ধু মহাত্মা ডিউক্ অব্ বকিমহাম্ মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিলাম :—"পূর্ব্বে যেরূপ অনুমান করা গিয়াছিল, দুর্ভিক্ষ এক্ষণে তাহা অপেক্ষা অন্যতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এরূপ মনে করা গিয়াছিল যে সাময়িক জলবর্ষণে জনসাধারণ এই আকস্মিক বিপৎপাতের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবে; এবং যে সকল লোক উপশমনকেন্দ্র সকলে সমবেত হইয়াছে, তাহারাও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। তাহারা এক্ষণে দুর্ভিক্ষের এমন একটী নবকলায় উপনীত হইয়াছে, যাহার প্রতাপ কৃষ্ণা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত প্রদেশে অনুভূত হইতেছে। দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণার পরিসর দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। খাদ্যসংযোজনা কমিতেছে, গো মেষাদি [illegible] পশুগণ মরিতেছে; শস্য সকল শুকাইয়া যাইতেছে, অধিক কি এই প্রদেশ সকলের কষ্ট যন্ত্রণা বাক্যে বর্ণনা করা অসাধ্য। প্রাদেশিক কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যবিবরণে অবগত হওয়া গিয়াছে যে এক কোটী অশীতি লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়াছে। তাহাদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহাদিগকে এক্ষণে প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টের দাতব্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। কইম্বাটুর, আর্কট ও নীলগিরি প্রভৃতি প্রদেশে অনেক সপ্তাহ ধরিয়া যৎসামান্য শস্যসংযোজনার উপর নির্ভর করিয়া লোকের প্রাণ ধারণ করিতে হইয়াছিল। এত শস্যের প্রয়োজন, যে যাহা সংগৃহীত হইয়া প্রেরিত হয়, তাহা আসিতে না আসিতেই যেন কোথায় চলিয়া যায়। যদিও এক্ষণে দিন দিন শস্যসংযোজনা বাড়িতেছে, তথাপি এখনও এত শস্যের প্রয়োজন, যে ইহাতেও পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। মহীসুরেরও অবস্থা এত শোচনীয় যে এখান হইতে শস্য না পাঠাইলে চলিতেছে না। প্রাদেশিক কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যবিবরণে আরও জানা গেল যে মান্দ্রাজের কৃষিজীবী প্রজাগণ এই দুর্ভিক্ষে এতদূর ভগ্ন-হৃদয় হইয়াছে, যে তাহারা কৃষিকার্য্যে সম্পূর্ণরূপে অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এই শোচনীয় অবস্থা যতদূর সাধ্য নিবারণ করা এবং যাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের সংযোজন ও বিতরণ হয় তাহার বন্দোবস্ত করা। যদিও এই কার্য্য নিতান্ত লঘু নহে, তথাপি কর্ম্মচারীদিগের যত্নে ও ভারত-বাণিজ্যের

গৌবরে, বৎসরের প্রথমার্দ্ধে অতিকষ্টে কথঞ্চিৎ শস্য সংযোজন করা গিয়াছিল। কিন্তু এক মাস পূর্ব্বে হঠাৎ দেখা গেল যে এক সপ্তাহের বই খাদ্যসামগ্রী নাই। শস্যের মূল্য সুতরাং অসম্ভব বাড়িয়া উঠিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হওয়ায় বাঙ্গালা এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে বণিক্‌দিগের অসাধারণ অধ্যবসায়ে প্রচুর শস্য আসিয়া পড়িল। কিন্তু খাদ্যাভাবই এখানকার প্রজাদিগের একমাত্র কষ্ট নহে। আমি একবার প্রদেশের অভ্যন্তরে নির্গত হইয়া দেখিলাম যে প্রজাদিগের পরিধান বস্ত্র নাই, চালের খড় দিয়া অনাহারে মরণোন্মুখ গোমেষাদির উদর পূরণ করা হইয়াছে। এ শোচনীয় দৃশ্যে পাষাণও বিগলিত হয়। গবর্ণমেণ্ট-সাহায্যে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রজাদিগের সমস্ত অভাব পূরণ হওয়া দুষ্কর। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, কোন খানেই প্রফুল্লতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না, প্রত্যুত সর্ব্বত্রই দুঃখ-যন্ত্রণা ও অভাব উপলক্ষিত হয়। দীন ও দরিদ্র প্রজাদিগের তৈজসপাত্র বিক্রীত হইয়াছে, তাহাদিগের শেষ আশা—শস্যভাণ্ডার—ফুরাইয়াছে, তাহারা সমীপবর্ত্তী উপশমন-শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদিগকে স্ব স্ব গ্রামে রাখিবার কোনপ্রকার প্রলোভন বস্তুই নাই। নূতন তৈজস পাত্র, গো মেষাদি, অঙ্গাচ্ছাদন ক্রয় করিতে ও ঘরের চাল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে প্রজাদিগের যে ব্যয়ের প্রয়োজন, গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার সমস্ত নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব। এই জন্য আমরা ইংলণ্ডীয় জনসাধারণের নিকট অর্থ-সাহায্য চাহিতেছি। তাঁহাদিগের নিকট দুর্ভিক্ষের প্রকৃত অবস্থা ও প্রজাদিগের দুঃখ যন্ত্রণা শুদ্ধ ব্যক্ত করিলেই প্রচুর অর্থ-সাহায্য আসিবে। যখন ইংলণ্ডের জনসাধারণ শুদ্ধ জানিতে পারিবেন যে ভারতের যে খণ্ড দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়াছে তাহার পরিসর ইংলণ্ড অপেক্ষাও অধিকতর; যখন তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে ইংলণ্ডে ভীষণতম দুর্ভিক্ষের সময়ও শস্যের মূল্য যেরূপ বাড়িয়াছিল, এখানে শস্যের মূল্য তাহা অপেক্ষাও অধিকতর দাঁড়াইয়াছে, এবং ভারতেও পূর্ব্বে কখন শস্যের মূল্য এতদূর বাড়ে নাই, তখন সাহায্য আপনিই আসিয়া জুটিবে। বিগত দুর্ভিক্ষের সময় বঙ্গদেশে শস্যের মূল্য যেরূপ বাড়িয়াছিল মান্দ্রাজে এ বৎসর তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক বাড়িয়াছে। সমস্ত মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির তিন ভাগের একভাগ এই ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়াছে। এই অভাব বিদূরিত করা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সাধ্যাতীত, এই জন্য আমাদিগের অন্যান্য প্রেসিডেন্সির নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইতেছে।"

আমরা ডিউক্ অব্ বকিংহমের হৃদয়-বিদারক বক্তৃতার সারমর্ম্ম প্রদান করিলাম; এক্ষণে মান্দ্রাজের সুবিখ্যাত ডাক্তার কর্ণিস বেল্লারী ও কার্ণুল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট যে বিবরণ দিয়াছিলেন, পাঠকদিগের গোচরার্থ তাহার এক স্থানের

মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:--তিনি প্রজাদিগের সাধারণ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছেন। তাহারা কঙ্কাল-মাত্রে পরিণত হইয়াছে, এবং দলে দলে উপশমন-শিবিরে বা অনাথনিবাসে গমন করিতেছে। দুর্ভিক্ষের ভীষণতার এই আরম্ভ মাত্র। দিন দিন দুর্ভিক্ষের পরিসর বাড়িতেছে। শুষ্ক শস্যের অবস্থা আরও শোচনীয় হইতেছে। শীঘ্র যে উপশমন হইবে তাহারও কোন আশা নাই। প্রজাসাধারণ এখন প্রদেশান্তরানীত শস্যের উপরই নির্ভর করিতেছে, এবং আগামী জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এই প্রদেশান্তরানীত শস্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। অদ্যাপি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হয় নাই, এবং অচিরাৎ পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি না হইলে কৃষ্ট ভূমিতে চাষের আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে। আগামী পাঁচ ছয় মাস দুর্ব্বহ কষ্ট যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে। সেই ভীষণ সময়ে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগকে শমন-সদন হইতে রক্ষা করিবার জন্য, গবর্ণ-মেণ্টকে ও জনসাধারণকে বদ্ধপরিকর থাকিতে হইবে।

সিবিল্ এবং মিলিটেরী গেজেটের মান্দ্রাজ পত্রপ্রেরক মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহারও মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"চতুর্দ্দিকে খৃষ্ট উপাসকমণ্ডলী বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারা উপাসনায় বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করিতেছেন না। অথচ তাঁহারা এই দুর্ভিক্ষের ও এই মহামারীর অভ্যন্তরে উদ্দীপনার যথেষ্ট সামগ্রী পাইতে পারেন। এই উপাসকমণ্ডলীর স্তোত্রে অদৃশ্য মানব-শত্রু শয়তানের কথা অনেক শুনা যায়; কিন্তু মানবজাতির প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান শত্রু যে পীড়া, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু প্রভৃতি—তাঁহাদিগের স্তোত্রসকলে তাহাদিগের ত কোন উল্লেখই দেখিতে পাই না।

"উৎকৃষ্ট চাউলের অভাবে ও শস্যের উচ্চ মূল্য নিবন্ধন চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠিয়াছে। কোচিন হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা সাতিশয় মর্ম্মোপঘাতী। বেঙ্গালরস্থের অবস্থা আরও শোচনীয় এবং ইহা অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা। সমস্ত মান্দ্রাজের অবস্থা ইহা অপেক্ষা আরও শোচনীয়তর দাঁড়াইবে। ইহা ভাবিতে গেলেও হৃদয় ফাটিয়া যায়। আমি একজন উপশমন-কর্ম্মচারীর মুখে শুনিলাম যে লোকে অনাহারে এরূপ উন্মত্ত ও কাণ্ডাকাণ্ডশূন্য হইয়াছে যে দুই সহস্র কুলি অকারণে তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি অতিকষ্টে তাহাদিগের হস্ত হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া আসিয়াছেন, তিনি বলিলেন 'একদিন আমি ভ্রমণে যাইবার সময় দেখিলাম দ্বাদশ জন ব্যক্তি মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের মাংসাদি শৃগাল কুক্কুরে ভক্ষণ করিয়াছে কেবলমাত্র কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় শৃগাল

কুক্কুরে সমাধিনিহিত মানবদেহ উত্তোলিত করিয়া ভক্ষণ করিতেছে।' কল্য প্রত্যুষে মান্দ্রাজনগরে অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম গবর্ণমেণ্ট-প্রাসাদের রেলে পৃষ্ঠ দিয়া একটী কঙ্কাল মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।"

এইরূপ অসংখ্য লোমহর্ষণ বিবরণ পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমরা ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জড়ের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছি।

আমরা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলাম যে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ কিঞ্চিৎ উপশমিত হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগত আমাদিগের একজন বন্ধুর নিকট অন্যপ্রকার শুনিয়া শোকে অধীর হইলাম। তিনি দুর্ভিক্ষ-চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়া মান্দ্রাজে গমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন যে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ কিছুমাত্র উপশমিত হয় নাই। যতদূর দৃষ্টি চলে চতুর্দ্দিকেই মৃতদেহ অথবা অর্দ্ধমৃত কঙ্কাল পরিদৃষ্ট হয়। শয্যাগত না হইলে পরিশ্রমের বিনিময় ব্যতীত উপশমন-শিবিরে কোনপ্রকার সাহায্য পাইবার আশা নাই। পরিশ্রমের বিনিময়েও যে সাহায্য পাওয়া যায় তাহাও অতি সামান্য—প্রত্যেক ব্যক্তি ছয় পয়সা পরিমাণে। আমরা আশ্চর্য্য হইলাম যে টেম্পেল সাহেবের অর্দ্ধাশন-নীতি অদ্যাপিও পরিত্যক্ত হয় নাই। যেখানে চাউল টাকায় আড়াই সের করিয়া, সেখানে ছয় পয়সায় এক পোয়া পরিমিত চাউলও পাওয়া যায় না। অর্দ্ধ সের চাউলের কমে দুই বেলা এক জনের চলিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন কিছু উপলক্ষ চাই। সুতরাং ন্যূনতঃ চারি আনার কমে ঐরূপ দুর্ভিক্ষের সময় একজনের চলিতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধাশনে মান্দ্রাজবাসিদিগকে কঙ্কালাবশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। এক্ষণে তাহারা এরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, যে ইংলণ্ডের অসামান্য বদান্যতাও বুঝি তাহাদিগকে আর রক্ষা করিতে পারিল না। যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আর ছয় মাস পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় ও ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের নিকট আপনাদিগের অক্ষমতা জানাইয়া সাহায্যপ্রার্থী হইতেন, তাহা হইলে মান্দ্রাজ আজ মরুভূমি হইত না। ইংলণ্ডীয় জনসাধারণের অলোকসামান্য বদান্যতা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই অক্ষালণীয় পাপের যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে বটে, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও পূর্ব্বকৃত পাপের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতদিগের অতি অল্পই উপকার হইতেছে। আমরা প্রত্যাগত বন্ধুর মুখে শুনিলাম যে দুর্ভিক্ষপীড়িতগণ এরূপ অবস্থায় আনীত হইয়াছে যে কোন দৈবী শক্তির সাহায্য ব্যতীত তাহাদিগের জীবনরক্ষা কিয়ৎপরিমাণে অসাধ্যসাধন হইয়া উঠিয়াছে। বহুকালের অনশনে বা অর্দ্ধাশনে তাহাদিগের পাকস্থলী এরূপ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, যে শুষ্ক অন্নও তাহারা জীর্ণ করিতে

পারে না। অন্ন পাইতেছে আর ওলা উঠা রোগে আক্রান্ত হইতেছে, উপশমন-শিবিরে এইজন্য প্রধানতঃ অন্নের কাঁজি বিতরিত হইতেছে। অন্ন জীর্ণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু ইহাদিগের অন্নস্পৃহা এতদূর বলবতী হইয়াছে, যে কোন পথিক অন্নাহার করিতেছে দেখিলে অসংখ্য দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করে এবং তাঁহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করে। আমাদিগের মান্দ্রাজ-প্রত্যাগত বন্ধু একদিন কোন রেলওয়ে ষ্টেসনের সমীপবর্ত্তী বাজারে গমন করিয়া দেখেন যে তথায় অর্দ্ধ-কাঁকর-মিশ্রিত মোটা চাউল টাকায় আড়াই সের করিয়া, কাঁচা লঙ্কা ও পাঁাজ মাত্র রহিয়াছে, আর কিছুই নাই। তিনি সে সকল লইয়াই কথঞ্চিৎ আহারীয় প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে বসিয়াছেন এমন সময় অসংখ্য দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত আসিয়া তাঁহার অন্নাগারের দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদিগের কাতরস্বরে ব্যথিত হইয়া তিনি অন্ন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। অমনি তাহাদিগের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সকলেই সেই অন্নের প্রার্থী। পরস্পর সংঘর্ষে সেই তণ্ডুলরাশি ধূলায় পতিত হইল। অবশেষে সেই ধূলিবিমিশ্রিত তণ্ডুল সকলেই এক একটী করিয়া খুঁটিয়া খাইতে লাগিল। আমাদিগের বন্ধু অভুক্ত ও অনিদ্রিত অবস্থায় অতিকষ্টে সেথায় রাত্রিযাপন করিয়া প্রত্যুষে উঠিয়া দেখিলেন যে রাত্রিতে যে সকল কঙ্কাল তাঁহার আহার কাড়িয়া লইতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ধরায় পতিত রহিয়াছে। এইরূপ ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার নয়নগোচর হইত। উপশমন-শিবির সকল এত দূরে দূরে অবস্থিত যে এই সকল অর্দ্ধমৃত দুর্ভিক্ষপীড়িতগণ যে তথায় হাঁটিয়া গিয়া সাহায্য লইবে তাহার কোন আশা নাই।

এইরূপ ভীষণ অবস্থায় আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য? ইংলণ্ড অসামান্য বদান্যতা প্রদর্শন করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি ও পরলোকে অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়েরা সে বদান্যতার এখনও একাংশও দেখাইতে পারেন নাই।* কোন শ্বেতাঙ্গের উপাসনার জন্য আহূত হইলে তাঁহারা এতদিন অজস্র মুদ্রা বর্ষণ করিতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু আজ তাঁহারা অসংখ্য ভ্রাতা ভগিনীগণকে কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার শতাংশের একাংশ পরিমাণেও অর্থব্যয় করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। গবর্ণমেণ্ট যদি এই কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগের নিকট অর্থসাহায্য চাহিতেন, তাহা হইলে এতদিনে স্রোতঃসহস্রে চতুর্দ্দিক্ হইতে অর্থরাশি আসিয়া উপস্থিত হইত; কারণ তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিশ্চয় বিশ্বাস হইত যে সে অর্থের বিনিময়ে তাঁহারা অবশ্যই রাজা বাহাদুর রায় বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি ও রাজসম্মান পাইতে পারিবেন। কিন্তু অনাহূত দানে তাঁহাদিগের সে আশা

পূরণের সম্ভাবনা কোথায়? আজ সে আশা নাই বলিয়াই ভারত নিশ্চেষ্ট, ভারত জড়পিণ্ডের ন্যায় এই ভীষণ লোম-হর্ষণ ব্যাপার স্থিরভাবে দেখিতেছে। রাজ-সম্মান পাইবার জন্য বা গবর্ণমেণ্টের প্রীতিভাজন হইবার জন্য দিল্লীর দরবার ও যুবরাজের আগমন উপলক্ষে প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে ও প্রতি গৃহে উৎসবে কত লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে; কিন্তু আজ লক্ষ লক্ষ ভ্রাতা ভগিনী মরিতেছে, আর আজ কিনা ভারত নীরব, ভারত নিশ্চেষ্ট।

ভ্রাতা ভগিনীর মৃত্যুতে সমস্ত তুরস্ক ও সমস্ত রুশিয়া গভীর শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়াছে; আবাল বৃদ্ধ বনিতা কৃষ্ণ পরি-চ্ছদ পরিধান করিয়াছে; রমণীরা বসন ভূষণ ও বিলাস-দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়াছে; বীরবৃন্দ অধরে হাস্য পরিহার করিয়াছেন; সমস্ত উৎসব আনন্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে—তথাপি রুশ্ রুম্ যুদ্ধে মৃত্যুসংখ্যা অদ্যাপি এক লক্ষ অতিক্রম করে নাই। কিন্তু আজ সমস্ত মান্দ্রাজবাসী মৃত বা অর্দ্ধমৃত—স্থাবর বা জঙ্গম কঙ্কাল—কিন্তু ভারত কি শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন? আমরা দুর্গোৎসবের উৎসাহ ত এবৎসর কিছু কম দেখিতেছি না। সমস্ত ভারতবাসী দুর্গা-পূজার উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা যদি এক দিনও মান্দ্রাজের জন্য এরূপ শোকোন্মাদ দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও ভাবিতাম ভারতের আশা আছে; তাহা হইলেও ভাবিতাম স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের স্ফুলিঙ্গও ভারত-শরীরে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কিন্তু যখন এক অঙ্গে এরূপ গুরুতর আঘাত লাগাতেও ভারতের চৈতন্য হইল না, অন্তরে যাতনা অনুভূত হইল না, তখন আর ভার-তের কি আশা?

ভারতবাসীগণ! এখনও মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করুন্। যে শ্বেতাঙ্গ জাতিকে আপনারা বিজেতা বলিয়া অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন, তাঁহাদিগের উদার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন্। মান্দ্রাজের সহিত তাঁহা-দিগের জেতৃবিজিত ভাবে মাত্র সহানুভূতি। তাহাতেই তাঁহাদিগের বদান্যতা সহস্র স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। যে জাতি শত শত যোজন দূরে সাগর-পারে অবস্থিত, এবং জাতি ধর্ম্ম বর্ণে বিভিন্ন হইয়াও, বৈদেশিক বিজিতগণের দুঃখে এতদূর কাতর হইতে পারেন, সে জাতি জগতের আরাধ্য, সুতরাং সে জাতির চরণে আমাদিগের কোটী কোটী নমস্কার। কিন্তু যে জাতি অদূরে অবস্থিত, এক মাতৃভূমির ক্রোড়ে লালিত, এবং জাতি ধর্ম্ম বর্ণে অভিন্ন, ভ্রাতা ভগিনীগণের দুঃখে ও মরণে উদাসীন—সে জাতি জগতের ঘৃণার পাত্র, সে জাতির ভার বসুন্ধরার ও অসহ্য। স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ! যদি দুরপনেয় কলঙ্কের অপনয়ন করার ইচ্ছা থাকে, তবে আসুন আমরা সমস্ত ভারতবাসী অসংখ্য মান্দ্রাজী ভ্রাতা ভগিনীদিগের অন-শনের জ্বালা অনুভব করিবার জন্য অন্ততঃ এক দিনও উপবাস করি, তাহা হইলে আমাদিগের অন্তর্নিহিত সহানুভূতি উদ্দী-

পিত হইবে এবং সমস্ত ভারতবাসীর এক দিনেরও আহার মান্দ্রাজে প্রেরিত হইয়া অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করিবে।

মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিলেও ভারতে প্রায় ১৬ কোটী লোকের অধিবাস। প্রত্যেক ব্যক্তির এক দিনের আহারের মূল্য গড়ে ।০ আনা করিয়া ধরিলেও ষোল কোটী লোকের আহারের মূল্য চারি কোটী হয়। চারি কোটী টাকা যদি প্রকৃত প্রস্তাবে উপশমনে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। বেতনভুক অর্থগৃধ্নু গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর হস্তে সেই অর্থভার সন্ন্যস্ত না করিয়া যদি কতিপয় অবৈতনিক ধৃতব্রত মনীষীর হস্তে এই কার্য্যের ভার অর্পণ করা যায়, তাহা হইলেই প্রকৃত ফল লাভের সম্ভাবনা। এই বিশাল ভারতক্ষেত্রে—যেখানে পারলৌকিক ধর্ম্মের জন্য অসংখ্য মনীষী সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেছেন, অসংখ্য মনীষী অতীত-মানব আত্মত্যাগ করিতেছেন—সেই বিশাল ভারতক্ষেত্রে কি এমন এক সহস্র মনীষীও দুর্ল্লভ, যাঁহারা ঐহিক ধর্ম্মের জন্য—অসংখ্য ভ্রাতা ভগিনীর প্রাণরক্ষার জন্য—অন্ততঃ তিন মাসের জন্য দুর্ভিক্ষ উপশমনরূপ পবিত্রতম ও গুরুতম ব্রত গ্রহণ করেন? শাক্যসিংহ ও চৈতন্যের জন্মভূমি কি সন্ন্যাসি-শূন্য হইবে? একথা বিশ্বাস হয় না! একথা ভাবিতেও কষ্ট হয়!

আর্য্য ভগিনী বিধবাগণ! আপনাদিগের চির-ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্যাপনের এমন সুযোগ আর কখন ঘটিবে না। আপনারা পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য কখন অভিভাবক-দিগেরও মুখাপেক্ষা করেন না। কাশী, গয়া, জগন্নাথ প্রভৃতি গমনের সময় সহস্র২ বাধা বিপত্তিও আপনাদিগের গতি রোধ করিতে সক্ষম হয় না। তীর্থ পর্য্যটনের জন্য আপনারা মৃত্যু মুখে পতিত হইতেও সঙ্কুচিত হন না। মান্দ্রাজের ন্যায় তীর্থস্থল আপনাদিগের ভাগ্যে আর কখন জুটিবেক না। আপনারা দলে দলে চির-সঞ্চিত সম্বল সহ তথায় উপস্থিত হউন্। আপনাদিগের স্নেহময় করস্পর্শে অসংখ্য বালক বালিকা, অসংখ্য যুবক যুবতী, ও অসংখ্য বৃদ্ধ বৃদ্ধা অনুপ্রাণিত হইবে। আপনাদিগের দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত-দিগের অন্তরে আবার জীবনাশা উদ্দীপিত হইবে। তাহারা যে এক্ষণে শুদ্ধ আহার-প্রার্থী এরূপ নহে, শুশ্রূষা এক্ষণে তাহা-দিগের জীবন-রক্ষার প্রধান উপযোগী। যখন বিংশ সহস্র তুরস্ক রমণী আহত তুরস্ক সৈন্যগণের শুশ্রূষার নিমিত্ত সমরক্ষেত্রে গমনে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসের আদর্শ-ভূমি ভারতক্ষেত্রে কি অন্যূন এক সহস্রও ব্রতধারিণী পাওয়া যাইবে না? পাওয়া যাইবে না—আমা-দিগের এরূপ বিশ্বাস হয় না। আমাদিগের বিশ্বাস এই ব্রতের গুরুত্ব তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলেই তাঁহারা অকুতোভয়ে ইহাতে আত্ম-সমর্পণ করিবেন।

এইরূপ অসংখ্য ব্রতধারিণী মনীষিণী ও অসংখ্য ব্রতধারী মনীষী দেশীয় কোষ

হস্তে মান্দ্রাজ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে আর মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ উপশমনের কোন আশা নাই। গবর্ণমেণ্ট নিজ কর্ম্মচারী-দিগের রিপোর্টের উপর বিশ্বাস করিয়া প্রচার করিতেছেন যে মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ অনেক পরিমাণে উপশমিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে দুর্ভিক্ষের কিছু মাত্র উপশমন হয় নাই। উপশমন-কেন্দ্র সকল এত দূরে দূরে অবস্থিত, যে অভ্যন্তরস্থিত অধিবাসীরা সে সকলের কোনও সাহায্য পাইতে পারে না। তাহারা অনশনে ও বিনা শুশ্রূষায় আপন আপন কুটীরে সমাধিনিহিত হইতেছে। এইরূপে কত লোক মরিতেছে গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার সংবাদ পর্য্যন্তও আসিতেছে না। উপশমন-কেন্দ্র সকলের মৃত্যু-সংখ্যা লইয়াই প্রায় গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের মৃত্যু-সংখ্যা নির্ণয় করিতেছেন।

আমাদিগের অভীপ্সিত ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীগণ জাতীয় ভাণ্ডার হস্তে সেই সকল অভ্যন্তরবাসী দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের শুশ্রূষায় নিরত হউন। যদি তাঁহারা এক শতের মধ্যে একজনকেও বাঁচাইতে পারেন তাহা হইলেও তাঁহাদিগের পুণ্যের ইয়ত্তা নাই।

ভারতবাসী ধনিবৃন্দ! আপনারা গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ মুমূর্ষু সময়ে নিদ্রিত থাকিবেন না। অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয়ের এমন সুবিধা সহসা পাইবেন না। আপনাদিগের অর্থের সদ্ব্যয়ের এরূপ সুযোগ সহসা জুটিবে না। আপনারা ইংলণ্ডের ধনিবৃন্দের অত্যুদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করুন্। আর্য্যনামের গৌরব রক্ষা করুন্। ভারতের একাঙ্গ রসাতলে যাইতেছে—তাহার উদ্ধার সাধন করুন্।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ঋগ্বেদ-সংহিতা।—শ্রীরমানাথ সরস্বতী এম্. এ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত, ভাষান্তরীত ও প্রকাশিত। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আশা করি আসমাপ্তি ইহা এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে ও নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

প্রবন্ধমালা।—শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। রজনী বাবু একজন প্রসিদ্ধ লেখক। সুতরাং এস্থলে তাঁহার পরিচয় অনাবশ্যক। তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ আর্য্যদর্শনে ও বান্ধবে প্রকাশিত হয়। তাহার মধ্যে মাইনর ও ভার্ণাকুউলার ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী কয়েকটী প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমাদিগের বিশ্বাস যে এই প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বোল্লিখিত ছাত্রবর্গের পাঠনায় বিশেষ উপযোগী হইবে।

কি শিখিলে।

"মহাজনে আচরণে দেন উপদেশ—
আমরাও হতে পারি সাধু সদাচারে;
ত্যজিয়া পৃথিবী তাঁরা রেখে যান শেষ,
নিজ নিজ পদচিহ্ন কালের প্রান্তরে।"
লং ফেলো।

ভাসকোডি গামার আবিষ্কার অবধি ইউরোপীয় জাতির সহিত ভারতবর্ষীয়গণের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট হইয়াছে। প্রায় দুই শত বৎসর হইতে এই সম্বন্ধ ক্রমশঃ ঘনিষ্টতর হইয়া আসিতেছে। ইউরোপীয়গণ বাণিজ্যের জন্য এদেশে ভিক্ষুকের মত আসিয়া ক্রমশঃ এখানকার রাজা হইয়াছেন। সূচীর মত ভারতে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা এক্ষণে এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে সেই ভারতকে লাঙ্গলের ফল স্বরূপ হইয়া বিদারণ করিতেছেন। সেই বিদারণে এখন ভারতের বক্ষ শোণিতশূন্য হইতেছে। তাঁহারা বহুকাল ধরিয়া ভারতরাজ্য নিজ করতলস্থ করিবার জন্য পরস্পর যেরূপ বৈরতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদিগের চরিত্রের অনেক অসাধুভাব আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতে ইংরাজ জাতির বল বিক্রম বৃদ্ধি হইলে তাঁহারা অপরাপর ইউরোপীয় জাতিকে পরাভূত করিয়া এতদ্দেশীয় রাজন্যগণের সহিত বৈরতাসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। যে উদ্যোগ, সাহস, ও বীর্য্যের পূর্ব্বে আবশ্যক হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। চাতুরী, জাল ও কৌশলে সমুদায় ভারতরাজ্য অধীনস্থ করিলেন। সে দিন মাত্র তাঁহারা ভারতের একাধীশ্বর হইয়াছেন। সে যাহা হউক, এই দুই শত বৎসর আমরা ইউরোপীয়গণের সহিত একত্রে বাস করিয়া আসিতেছি। আমরা এতকাল তাঁহাদিগের চরিত্রের অনেক অসাধুভাব লক্ষ্য করিয়াছি। গৌরাঙ্গগণকে দেখিলেই ভয়ে কম্পিত হইয়াছি। তাঁহাদিগের চরিত্রের সাধুভাব দেখিতে সাহসও হয় নাই, দেখিবার অধিক অবসরও ঘটে নাই। এক্ষণে ইংরাজ জাতি নির্ব্বিঘ্নে প্রভুত্ব করিতেছেন। যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান হইয়া ভারতে শান্তির রাজ্য বিস্তার হইয়াছে। এখন তাঁহাদিগের উৎকণ্ঠা ও ভয়ের সময় বিগত হইয়াছে। সবাই নির্ব্বিঘ্নে সংসার ধর্ম্ম করিতেছে, শাস্ত্রালাপ ও বিদ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং নানাবিধ সুখসম্ভোগ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে। পূর্ব্বকালের বিষয় এখন ভাবিতেছি; কি বর্ত্তমান আছে, কি কি মহামূল্য ধন হারাইয়াছি তাহাও সমুদায় দেখিতেছি। ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষা করিয়া

আমাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া এই মহারত্ন লাভ করিয়াছি। ইংরাজী বিদ্যালাভে একটী নূতন পৃথিবী আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে এতকাল আমরা কেবল ভারতেই আবদ্ধ ছিলাম। তাহারও কিছুই জানিতাম না। আপনাদের জন্মস্থান ব্যতীত সমুদায় পৃথিবী আমাদিগের নিকট অন্ধকারময়ী ছিল। কলম্বস এক মাত্র নূতন পৃথিবী ইউরোপীয়গণের নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন; ইংরাজী সাহিত্য শত শত নূতন পৃথিবী আমাদিগের নিকট প্রকাশিত করিয়াছে। কলম্বস এক অসভ্য জাতির বিবরণ ইউরোপীয়গণের নিকট প্রকাশিত করিয়াছিলেন, ইংরাজী সাহিত্য এক সুসভ্যতম জাতির বিষয় আমাদিগের নিকট প্রকাশিত করিয়াছে। আমরা এই সভ্যতম জাতির চরিত্রে যে সমস্ত সদ্গুণের পরিচয় পাই, পৃথিবীর আর কোন জাতির চরিত্রে তাহা পাই না। যে সমস্ত সদ্গুণের প্রভাবে ইউরোপীয় জাতি পৃথিবীতে সভ্যতম জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, এবং সর্ব্বজাতির অগ্রগণ্য হইয়াছেন, সে সমস্ত সদ্গুণ ইংরাজ জাতিতেও বর্ত্তমান। আমরা সেই ইংরাজ জাতির সহবাসে এতকাল অবস্থান করিতেছি। সেই সগুদ্গণ সমুদয় লক্ষ্য করিবার আমাদিগের শক্তি জন্মিয়াছি। এত কাল সেই জাতির সহবাসে থাকিয়া যদি আমরা তাঁহাদিগের সদ্গুণ সমুদায় গ্রহণ করিতে না পারি, তবে আমরা নিতান্ত অসার ও অপদার্থ। তাঁহাদিগের দোষ সমুদায় গ্রহণ করিতে আমরা যেরূপ তৎপর, গুণভাগ গ্রহণ করিতে যদি তদ্রূপ হইতাম তাহা হইলে আজি আমদিগের অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন হইত। ইংরাজি সাহিত্য পাঠে এখন আমরা ইউরোপীয় জাতির বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিতেছি; কিন্তু আমাদিগের সেই জ্ঞান কি কেবল জ্ঞান মাত্রই থাকিবে? সেই জ্ঞানের কি সাধুফল আমাদিগের চরিত্রে প্রকাশিত হইবে না? আমরা কি চিরকাল জড়ভাবাপন্ন থাকিব, একটু উঠিয়া হাটিয়া পৃথিবীর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব না? এই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে ইউরোপীয় জাতির কতদূর বলক্ষয় হইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহারা পৃথিবীর কতদূরদেশে অসহ্য ক্লেশ বহন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন, কষ্টের পর কষ্ট, এবং দুঃখের পর দুঃখে নিপতিত হইয়া সর্ব্বশেষে কেমন জয় লাভ করিয়াছেন—এই লোমহর্ষণ বৃত্তান্তপাঠ যদি আমাদিগকে উদ্বোধিত না করিতে পারে, যদি আমাদিগের জড়তা অপনয়ন করিতে না পারে, যদি আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে আকর্ষণ করিতে না পারে তবে আমাদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় বলিতে হইবে। তবে আর কিছুতেই আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে পারিবে না। আমরা চিরকালের জন্য অধঃপাতে গিয়াছি। ইউরোপীয় মহাজনগণের জীবন-বৃত্ত, বিজ্ঞানের ইতিহাস, এবং

আবিষ্ক্রিয়ার বিবরণ পাঠে আমাদিগের এখন যত উপকার দর্শিবে, দর্শনাদির পর্য্যালোচনায় তত দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সমস্ত বিবরণে যাহাতে আমাদিগের অভিনিবেশ জন্মে, আমাদিগের প্রবৃত্তি ও রুচি হয়, এক্ষণে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দর্শনাদির আলোচনা এক্ষণে কিছুকাল স্থগিত রাখা আবশ্যক। ভারতবর্ষ এই গূঢ় শাস্ত্রাদির আলোচনায় কার্য্যশক্তি হারাইয়াছে। সে আলোচনা এখন কিছুকাল ভুলিয়া থাকা আবশ্যক হইয়াছে। এখন যাহাতে ভারতবাসিগণের কার্য্যশক্তির বৃদ্ধি হয়, যাহাতে তাহাদিগের উৎসাহের উদ্রেক হয়, যাহাতে সেই উৎসাহ কার্য্যে ও সুফলে পরিণত হয়, এক্ষণে এমত বিবরণ, ইতিবৃত্ত, ও গ্রন্থাদির আলোচনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিতে না পারিলে কখন উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যে সমস্ত লোক সমাজের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা গৃহে বসিয়া কেবল সুখ সম্ভোগ করেন নাই, কেবল দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন নাই, কেবল গৃহভার্য্যিনীর অঞ্চল ধরিয়া বেড়ান নাই; কিন্তু তাঁহারা উৎসাহে পূরিত হইয়া নানা দেশে দুর্বিষহ কষ্টে পড়িয়া কার্য্য করিয়াছেন, ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান করেন নাই, এমত কি অনেকে কর্ত্তব্য সাধনে উৎসাহিত হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কলম্বস এই রূপে একটি নূতন পৃথিবী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন; সুমহৎ পিটার কতিপয় গণ্ডগ্রাম-পূর্ণ দেশকে বৃহৎসমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন; বিশ্ব-প্রেমিক হাউআর্ড পীড়িত ও আতুরের দুঃখ মোচন করিতে করিতে রুসিয়ার বিদূর প্রান্তরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। অসভ্য জাতির একটী লক্ষণ এই যে, অসভ্যেরা সাহস করিয়া কোন বিঘ্ন বিপত্তির সম্মুখীন হইতে পারে না, কার্য্যক্ষেত্রে বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইলে অমনি অনুষ্ঠান হইতে বিরত হয়; আর সে দিকে যাইতে চাহে না। সুতরাং তাহাদিগের অবস্থারও উন্নতি হয় না। আমরা এই রূপ অসভ্যের মধ্যে এখন গণনীয় হইয়া আছি। পূর্ব্ব সভ্যতা আমাদিগকে যে খানে রাখিয়া গিয়াছে, আমরা ক্রমশঃ বরং তাহা হইতেও অবনত হইয়াছি। পাছে কোনরূপ বিঘ্ন বিপত্তি ও কষ্ট ঘটে বলিয়া আমরা আর উন্নতির দিকে যাইতে চাহি না। যে সভ্যতার আমরা উত্তরাধিকারী হইয়াছি তাহার গৌরব আমাদিগের নহে। আমাদিগের হস্তে বরং সে সভ্যতার অনেকাংশে বিধ্বংস ঘটিয়াছে। অসভ্যের আর একটী লক্ষণ এই যে, সে নিজ অবস্থা সহসা পরিত্যাগ অথবা পরিবর্ত্ত করিতে চাহে না। অষ্ট্রেলীয়ার কোন শাসনকর্ত্তা এক জন দেশীয় অসভ্যকে বিলাতে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় সেই অসভ্য

বহুকাল সভ্য হইয়াছিলেন। তাহার পরিচ্ছদ ও আহারীয় সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অনেক বড় লোক তাহাকে ভাল বাসিতেন। কিন্তু কিছু কাল অতীত হইলে আবার তাহাকে অষ্ট্রেলীয়ায় আনয়ন করা হইল। স্বদেশে পদার্পণ করিয়া সে সমুদায় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিল, আম মাংশ ভক্ষণের জন্য ব্যস্ত হইল এবং সর্ব্বাংশে পুনরায় সেই অষ্ট্রেলীয়ার অসভ্য রূপে পরিদৃষ্ট হইল। আর একবার অষ্ট্রেলীয়ার দুইটী শিশুকে বিলাতে আনয়ন করা হয়। বারবৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সভ্য প্রণালী মতে যথাবিহিত শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল, তাহারাও সর্ব্বাংশে বিলাতী হইয়া গিয়াছিল। বার বৎসর পরে তাহাদিগকে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে স্বাধীন ভাবে থাকিতে বলা হইল। অমনি তাহারা পূর্ব্ব পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করিল এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বজাতীয়ের মত অসভ্য নগ্ন হইয়া দাড়াইল।

বিঘ্ন বিপত্তিতে পড়িয়া যে স্থলে সুসভ্য জনগণ যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়া উদ্ধার হয়েন, সে স্থলে অসভ্যেরা নিরাশ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসে। আবার অসভ্যের শারীরিক বল কিছুমাত্র ন্যূন নহে। এ দুই জনে প্রভেদ এই যে তাহাদিগের মানসিক প্রকৃতি সমান নহে। যে মানসিক বল ও বিক্রম, যে অধ্যবসায় ও সাহস, যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও সহিষ্ণুতা সহকারে এক জন ইউরোপীয় বিঘ্ন বিপত্তির উপর জয় লাভ করিবেন, অসভ্যের তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারিবে না। বৃহৎ কার্য্যের জন্য বৃহৎকায় পুরুষের আবশ্যক নাই। তজ্জন্য বৃহৎ অন্তরের প্রয়োজন। ইউরোপীয়েরা এই মানসিক ধর্ম্মে ভূষিত হইয়া কত অবদান-অরম্পরায় সিদ্ধিলাভ করিতেছেন। যে সমস্ত মহাজনেরা এই প্রকার অবদানে প্রবৃত্ত হয়েন; তাঁহারা কেমন সামান্য সুখ সচ্ছন্দতা অবজ্ঞা করিয়া একান্ত মনে সামাজিক মঙ্গলোদ্দেশে কার্য্য করিতে করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া থাকেন। ইঁহারাই প্রকৃত বীর পুরুষ ও মহোদয় ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত হইবার যোগ্য পাত্র। তাঁহাদিগকে দেখিলেই তুমি চিনিতে পারিবে। উৎসাহ তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গকে অগ্নিপরীত করিয়াছে। তাঁহারা দীন বেশে মহৎ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন। তাঁহাদিগের অভিমান নাই, অহংকার নাই; কিন্তু তাঁহারা উৎসাহে পরিপূর্ণ, কার্য্য উদ্ধারের জন্য সর্ব্বদা চিন্তা-পরায়ণ, এবং কার্য্যের প্রতি একান্ত অভিনিবিষ্ট, ভাবনা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁহাদিগের ললাটদেশ কুঞ্চিত করিয়াছে। তাঁহারা আতপ-তাপে ঘর্ম্মাক্ত হইতেছেন, নিজ হস্তে রজ্জু ধরিয়াছেন, অর্দ্ধ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং ধূলায় ও কর্দমে মহা কষ্ট ভোগ করিতেছেন। মহৎ অনুষ্ঠান তাঁহাদিগকে মহৎ করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালি বাবু এত দূর অপমান স্বীকার করিতে, এত কষ্টভোগ

করিতে, এবং মজুরের মত খাটিতে নিতান্ত লজ্জিত হইবেন। তিনি দিব্য কার্পেটের জুতা পরিয়াছেন, ২৫০ নম্বর সুতার দিব্য ফিন ফিনে কালাপেড়ে ধুতি গায়ে বুক-মসলিনের কেয়ারি কাটা পিরাম, এবং ফুলকোঁচান উড়ানি পরিধান করিয়া ও হাতে একগাছি হাল্‌কি ছড়ি লইয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার শরীর নিতান্ত কোমল, অবয়ব সমস্ত গোল ও পূরিত, মুখে কামিনীর লাবণ্য প্রকাশিত হইতেছে। তিনি সেই বেশে কেশ বিন্যাস করিয়া বাহিরে বহির্গত হইয়াছেন। দেখিলে ভ্রান্তি জন্মে, কোন কামিনী পুরুষ বেশে পুরবাসের ভ্রান্তি দূর করিতে বাহিরে আসিয়াছেন। এই সুকুমার বাঙ্গালি বাবু আবার মহৎ হইতেচাহেন!

১। মানব যখন অসভ্যাবস্থায় বনে বাস করিতেন, তখন বনবাসী ভয়ঙ্কর জীব জন্তু সকল তাঁহার শত্রু ছিল। এই সমস্ত জীব জন্তুর উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে তাঁহার প্রথম বল ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি বাহুবলে উন্মত্ত হস্তীকে আপন অধীনে আনিয়াছেন, এবং ঘোটককে বাহন করিয়াছেন। কিরূপে বিড়াল কুকুর প্রথমে মনুষ্যের বশীভূত হয়, কিরূপে মত্ত মাতঙ্গের মত জন্তু তাঁহার অধীনে আইলে, কিরূপে বন্য হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে—এসমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশিত থাকিলে, তাহার অধ্যয়নে নিশ্চয় সুখবোধ হইত। অথবা পূর্ব্বে মনুষ্যগণের একটী যাপন করিয়া বন্য হইত। আদিম ইউ-রোপীয়গণ মধ্যে মধ্যে পশুশীকারে যাত্রা করিয়া, কখন ব্যাঘ্রকে কখন বন্য হস্তীকে বধ করিয়া আনিয়েছেন। যখন পল্লী-গ্রামে ব্যাঘ্রের ভয় হয়, এবং গ্রামস্থ সকল লোকে সর্ব্বদাই কম্পিত হয়েন, তখন কাহারা সাহসে ভর করিয়া সেই জনপদ-বাসিগণেরজন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েন? এরূপ স্থলে গ্রামবাসিগণ কি দৌড়িয়া গিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অগ্রে সংবাদ দেন না? তাঁহারা জানেন বাঘমারা ও বাঘের মুখে যাওয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্য্য; এবং মাজিষ্ট্রেটের কোন ত্রুটি অথবা অত্যাচার হইলে জজ সাহেবের কাছে তাহার নালিষ করা প্রজাগণের কার্য্য। কিন্তু এমত সময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অকুতোভয়ে কেমন ব্যাঘ্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, এবং তাহাকে বধ করিয়া দেশবাসিগণকে আপনার সাহসের ও বিক্রমের পরিচয় দেন। কিন্তু যাঁহাদিগের দায় ও বিপদ তাঁহারা মাজি-ষ্ট্রেট সাহেবকে বাঘের মুখে পাঠাইয়া "যায় শত্রু পরে পরে" ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। যে বঙ্গদেশ নানা বন্য ভয়ঙ্কর পশুর আশ্রয়-স্থান, তাহার দেশবাসি-গণের মধ্যে কয় জন সেই পশুশীকার করিতে সক্ষম আছেন? এবং কয়-জনই বা উদ্যোগ করিয়া তাহাদিগের বধের জন্য অগ্রসর হয়েন? ইউরোপীয়-গণের মধ্যে কেহ কেহ অক্ষম হইলেও তাঁহারা বন্ধু বান্ধবগণকে তৎকার্য্যে ডাকিয়া আনেন, এবং যাঁহারা শীকারে

সক্ষম তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। ইউরোপীয়গণের নিকট হইতে এই প্রকার উদ্যোগ ও সাহস কি আমাদিগের শিক্ষার বিষয় নয়? এতদিন ইউরোপীয়গণের সহবাসে থাকিয়া আমরা কি তাঁহাদিগের এই উদ্যোগ ও সাহস গ্রহণ করিতে পারিয়াছি? আমরা বোতল বোতল মদ খাইতে শিখিয়াছি, গোমাংস অস্থি সমেত ভক্ষণ করিতে শিখিয়াছি, কিন্তু বাঘ মারিবার বেলা অন্দরের জানালার ভিতর হইতে উকি মারিতেও সাহসী হই না। একজন মাতাল বলিয়াছিলেন যদি ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধটা বাড়ীর কাছে হইত তাহা হইলে বেস জানালায় চিক ফেলিয়া মজায় মজায় যুদ্ধটা দেখিতাম। এ বাঙ্গালীর মত মেয়েমানুষের কথাই বটে।

২। ইউরোপীয়গণ যখন স্বদেশের অনেক দূর উন্নতি সাধন করিলেন, যখন তাঁহাদিগের জ্ঞান-তৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠিল, সসাগরা ধরিত্রীর অন্যান্য দেশে কোথায় কি আছে জানিবার জন্য যখন তাঁহারা কৌতূহল-পরতন্ত্র হইলেন, তখন তাঁহারা নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারে বহির্গত হইলেন। কি কি মুখ্য অথবা গৌণ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা এই কার্য্য ও অবদান-পরম্পরায় প্রবৃত্ত হয়েন তাহার আলোচনা করা আমাদিগের প্রয়োজন নহে। কিন্তু তাঁহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কতদূর, অধ্যবসায়, সাহস এবং সহিষ্ণুতার সহিত বিপদের মাঝে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও নিজ নিজ কার্য্যসাধন করিয়াছেন, তাহার প্রতি যাহাতে স্বদেশের লক্ষ্য ফিরে তাহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। ইহাঁরা পৃথিবীর নানা দেশ বিদেশ আবিষ্কার করিয়া যে শুদ্ধ ভূগোলের জ্ঞান-রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন এমত নহে, তদ্দ্বারা ইউরোপকে সর্ব্ববিষয়ে সভ্যতার চরম শিখরে উন্নত করিয়াছেন, ধন ধান্যে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং সর্ব্বপ্রকার সুখের ভাগী করিয়াছেন। ইহাঁরা বাস্তবিক্ যেরূপ সম্মানভাজন তত দূর সম্মান আজিও ইহাঁদিগকে প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, বড় বড় যুদ্ধবীর অপেক্ষাও ইহাঁরা অধিকতর সম্মানের পাত্র। কুক এবং ভ্যানকাউভার, প্যারি এবং রস, মঙ্গো পার্ক এবং আউডনে, কক্রেন্ এবং হম্বোল্ট—ইহাঁদিগের ধীর বীরত্ব দেখিলে রণবীরের মদমত্ত বীরত্বও লঘু বোধ হয়। রণবীর রক্ত হস্তে পৃথিবীকে কেবল দুঃখে নিমজ্জিত করেন; কিন্তু ইহাঁরা যেখানে গিয়াছেন, সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য, উন্নতিশীল বিজ্ঞান এবং সুখদাতা সভ্যতা সেই খানে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যেখানে ইহাঁদিগের জয়-পতাকা রোপিত হইয়াছে, চিরদিনের জন্য সেই দেশের উদ্ধার সাধন হইয়াছে। যে উদ্যোগ, উৎসাহ, সাহস, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং প্রাণপণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এই জয়-পতাকা রোপণের প্রধান সাধন, সেই সমস্ত মহার্ঘ-গুণ-পরম্পরা যত দিন আমরা

অর্জ্জন করিতে না পারিব ততদিন আমাদিগের উন্নতি নাই, ততদিন আমরা সভ্য জাতি বলিয়া গণ্য হইব না, ততদিন আমরা জ্ঞান করিব ইউরোপীয় গণ আমাদিগের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদিগের নিকট এখনও অনেক বিষয় শিখিবার আছে। যতদিন না আমরা আত্মপরতা পরিত্যাগ করিয়া সমাজের এবং মানবকুলের ইষ্টসাধন জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব ততদিন কিছুতেই আমাদিগের উন্নতি হইবে না। একদিকে স্বার্থপরতা, অন্য দিকে সামাজিক ইষ্ট ; ইহার মধ্যে সকল জাতি, সকল ব্যক্তিই অবস্থান করিতেছেন। যাঁহারা স্বার্থপর হয়েন তাঁহারা সমাজকে ভুলিয়া যান। এতকাল আমরা বরাবর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বদেশ ও সমাজকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তজ্জন্য স্বদেশ হারাইয়াছি, পথের ভিখারী হইয়াছি, অথচ আমাদিগের প্রকৃত স্বার্থ সাধন হয় নাই। যতদিন না আমরা বুঝিতে পারিব, সামাজিক সুখই প্রকৃত স্বার্থপরতা, মানব জাতির মঙ্গলেই প্রতি ব্যক্তির মঙ্গল সাধন হয়, ততদিন আমরা যে অবনতি ও দুঃখের অধঃস্থলে নিপতিত রহিয়াছি তদ্রূপই থাকিব, আমাদিগের অণুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে না।

কাপ্তেন বর্কেন্ সাইবিরিয়ার ভ্রমণ বৃত্তান্তের এক স্থলে বলেন—"আমার খুব বিশ্বাস এই যে, মানব জীবনের পরিশ্রমের [illegible] প্রকৃত [illegible] ক্ষমার অভাব, করুণাময় ঈশ্বরের পালন গুণে দৃঢ় বিশ্বাসের অভাব, অধ্যবসায়ের অভাব, শ্রান্তি এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় ধৈর্য্যের অভাব, এবং কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অভাব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন ও শ্বাস থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণ পণে কর্ত্তব্য সাধনে চেষ্টা করা বিধেয়। আমি অনেক বার অনেক কষ্টে পড়িয়াছি, অনেক দুরবস্থায় পরীক্ষিত হইয়াছি, শীতে জর জর, ক্ষুধায় কাতর এবং শ্রান্ত কলেবর হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছি ; কিন্তু আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে নিশ্চয় বলিতে পারি যে আমি যখন এই সমস্ত দুঃখ ক্লেশ ও বিপত্তির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছি তখন যত দূর সুখী হইয়াছি সেরূপ কখনই হই নাই।" এই ভীমকায় ভ্রমণকারী যে অসহ্য ক্লেশে আসিয়ার উত্তরাংশে ভ্রমণ করিয়াছেন তাহার বিবরণ পড়িলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তিনি মঙ্গোপার্কের ভ্রমণ-রীতি অবলম্বন করিয়া একাকী সেন্টপিটর্সবর্গ হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর দারুণ শীতে নগ্ন গাত্রে নানাবিধ অসভ্য রাক্ষস জাতির মধ্য দিয়া বেয়ারিং প্রণালী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। মঙ্গোপার্ক এক দল অসভ্য লোকের হস্তে নিহত হইয়াছেন ; কিন্তু এই পরম সহিষ্ণু কাপ্তেন কৌশলপূর্ব্বক রাক্ষসজাতীয় আক্রটাগণের হস্ত হইতেও উদ্ধার পাইয়াছেন। তিনি কতবার দস্যু-হস্তে লুণ্ঠিত হইয়াছেন, তথাপি এক বৎসর ক্ষুধায় কাতর হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন।

আফ্রিকার মরুভূমে এবং অরণ্য দেশে যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহাদিগেরও বৃত্তান্ত পড়িলে উৎসাহে পূর্ণ হইতে হয়। লিয়ো আফ্রিকেনস হইতে মেজর ডেনহ্যামের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত বিস্তর গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, মেজরডেনহ্যাম একবার কাপ্তেন ক্রেণের মত ফিলাটাজাতীয়ের একদল লোক কর্ত্তৃক বিলুণ্ঠিত হইয়া যেরূপ দুঃসহ কষ্টে পড়িয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি তিনি সহর্ষচিত্তে ডাক্তার আউডনে এবং ক্ল্যাপার্টনের সহিত ভ্রমণ করিয়া আফ্রিকার নানা গুহ্য প্রদেশ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন এবং তথাকার অনেক অসভ্য জাতির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্ত বিবরণ পড়িতে পড়িতে উষ্ণপ্রধান-দেশীয় অরণ্য ও মরুদেশের সহিত একদা তুষার মণ্ডিত আমেরিকার উত্তরাংশের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, এবং মনে হয় এই দুই বিপরীত দেশ বিভিন্নপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তিতেও ইউরোপীয় ভ্রমণকারীকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। তাঁহারা সমান উৎসাহে এই দ্বিবিধ দেশেই পর্য্যটন করিয়া বেড়াইয়াছেন।

৩। নূতন দেশ আবিষ্কারের জন্য যেমন একদল দুঃসাহসিক ইউরোপীয়গণ নিরতিশয় কষ্ট সহ্য করিয়াও দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, আর এক দল সমোৎসাহী ইউরোপীয়গণ পুরাতন রাজ্য এবং নগরীর ভগ্নাবশেষ মধ্যে দারুণ কষ্টে নানা প্রাচীন বিষয়ের সমুদ্ধার করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে এরূপ কার্য্যে কেহ কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই; ইদানীন্তন কালে যেমন বিজ্ঞানের আলোচনা হইয়াছে, প্রাচীন ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য যেমন মানবের লালসা জন্মিয়াছে, পূর্ব্বতন শিল্প কৌশলের প্রতি যেমন সভ্যজাতির অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ প্রাচীন স্থানের ভগ্নাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য দেশ বিদেশে বহির্গত হইয়াছেন। সুবিখ্যাত বেল্‌জোনী এই মহৎ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া যেরূপ দৃঢ় অনুরাগ, উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের সহিত মিশরদেশীয় প্রাচীন রাজ্যের ভগ্নাবশেষ রাশি সমুদ্ধার করিয়াছেন, তাহার বিবরণপাঠে একদা সকলেরই বেল্‌জোনীর মত কার্য্য করিতে ইচ্ছা জন্মে। ব্রিটিশ-মিউজিয়মে মেম্‌ননের যে প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি অবস্থাপিত আছে, তাহা বেল্‌জোনীর মহোদ্যোগে মিশর হইতে ইংলণ্ডে আনীত হইয়াছে। হোমরের শত-তোরণ-বিশিষ্ট থীব নাগরীর রাশি রাশি ভগ্নাবশেষ হইতে এই প্রকাণ্ড দেবমূর্ত্তি সমুদ্ধৃত হইয়াছিল। বেলজোনী নিজে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন, তিনি নিজ বাহুবলে কতিপয় আরবীয়ের সহায়তায় অনেকগুলি মিশর-দেশীয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্নমূর্ত্তি উত্তোলন করিয়া আনিয়াছিলেন। গোর্ণুর পর্ব্বতগুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে একবার তাঁহার জীবন হারাইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। ইহাতে দুইসহস্র-বৎসর-সঞ্চিত প্রকাণ্ড বালুকারাশি ভেদ করিয়া তাঁহাকে ইতস্ততঃ-

বূলের মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সকল স্থানান্তরিত করিয়া নৃপগণের সমাধিদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গিজার পিরামিডে প্রবেশ-পথ লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে যেরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহার বিবরণ পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই রূপ পরিশ্রম ও কষ্টে নিনিভার প্রস্তর সকল উত্তোলিত হয়। যে মহোদয়গণ নিনিভার ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছিলেন, যত্ন ও চেষ্টা করাই তাঁহাদিগের মহামন্ত্র ও সিদ্ধিলাভের প্রধান উপায় হইয়াছিল। যত্ন ও চেষ্টা করিলে সর্ব্বার্থই সিদ্ধ হয়, তাঁহারা এই আশায় যেরূপ দুঃসহ ক্লেশ বহন করিয়া আপন আপন কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পাঠ করিলে বাঙ্গালীর ও শীতল শোণিত একদা উৎসাহে উষ্ণ হইয়া উঠে। এই আশায় যদি তাঁহারা উৎসাহিত ও সুরক্ষিত না হইতেন, তাহা হইলে বেল্‌জোনি, বোটা, এবং লেয়ার্ডের মত উদ্যোগী পুরুষসিংহগণকেও বিফল হইতে হইত।

৪। সভ্যতার উন্নতির সহিত ইউরোপীয়গণের কার্য্য-ক্ষেত্র অধিকতর বিসারিত হইয়াছে এবং এই কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতির সহিত তাঁহাদিগের উৎসাহ, বল, উদ্যোগ এবং সাহসের ও দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে ইউরোপীয়গণ পর্ব্বত কাটিতেছেন, বিস্তীর্ণ অরণ্যানী সমভূমি করিতেছেন, সহস্র-হস্ত-গভীর খনি খনন করিয়া খনিজ দ্রব্যাদি উত্তোলন করিতেছেন, শত ক্রোশ বিস্তৃত রাজপথ এবং লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত করিতেছেন, বৃহৎ বৃহৎ সেতু এবং উচ্চ উচ্চ আলোকাগৃহ সকল নির্ম্মাণ করিতেছেন, পৃথিবীর যে দিকে যাও এবং যে যে দিকে চাও, সেই দিকেই ইউরোপীয়গণের বাহুবল, উদ্যোগ, সাহস এবং অধ্যবসায়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নিদর্শন সকল বিদ্যমান দেখিতে পাইবে। তাঁহাদিগের অর্ণবযান এবং লৌহ ঘোটক সর্ব্বদেশে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে; উপস্থিত হইয়া উদ্যম এবং যত্নে পৃথিবীর যুগান্তর ঘটাইয়াছে। পূর্ব্বকালের সপ্ত অদ্ভুত কাণ্ড এখন আর তত অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয় না। ইউরোপীয়গণের উদ্যোগে পৃথিবীর চারিদিক্ শত শত অদ্ভুত ব্যাপারে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ভৌতিক সৃষ্টিকাণ্ডের ভিতর তাঁহারা আর একটী নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সকলই তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য বুদ্ধি, অসামান্য কৌশল, এবং অপরিমিত উদ্যোগ সাহস ও অধ্যবসায়ের সাক্ষ্য দিতেছে।

ভারতেরও এক সময়ে সকলই ছিল। তাহারও উৎসাহ ছিল, বল ছিল, সাহস যত্ন সকলই ছিল। তাহারও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কীর্ত্তি-কলাপ তাহার সর্ব্ব গাত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন তাহার এই সমস্ত গুণ দোষ ছিল, তখন তাহার স্বাধীনতা, বল, বীর্য্য সকলই ছিল। ব্রাহ্মণগণের একাধিপত্যে তাহার সকলই গেল। তাঁহাদিগের নিপীড়নে সর্ব্বত্র মূর্খতা পরিব্যাপ্ত হইল। সামাজিক অধীনতায় তাহার

বল বীর্য্য সকলই গেল এবং ভারত কেবল ব্রাহ্মণ-সেবায় নিরত হইলেন্। সেই অবধি ভারত একেবারে অধঃপাতে গেলেন। এখন ভারতের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিলে আমাদিগের লজ্জা বোধ হয়। আমরা কি সেই আর্য্যজাতি যাঁহাদিগের সংকীর্ত্তি-কলাপ ভারতের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য, এবং উদ্যোগিতার পরিচয় দিতেছে! তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমরা কি অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি! কত উচ্চপদ হইতে কত অধস্তলে নিপতিত হইয়াছি! কি শোচনীয় কি লাঞ্ছনীয় আমাদিগের অবস্থা! হায় স্বাধীনতার সহিত আমরা সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছি!” অথবা ঐ সমস্ত গুণ গিয়াছে বলিয়াই স্বাধীনতা-লক্ষ্মীও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন! এক্ষণে ভারতের পূর্ব্বতন অবস্থা আমাদিগের বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। ইহার পূর্ব্বতন ইতিহাস আমাদিগের সর্ব্বদাই অধ্যয়ন করা আবশ্যক। আবশ্যক এই জন্য যে, আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবে আত্মাকে পূর্ণ করিয়া ভাবিব, “যে আর্য্যজাতি এক কালে আত্মগরিমায় পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই আর্য্যজাতির শোণিত আমাদিগের শিরায় অদ্যাপি প্রবাহিত হইতেছে, সেই আর্য্যজাতির মনীষা আমাদিগের অন্তরে অবস্থান করিতেছে। আমরা এত কাল মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলাম।” এখন আমরা সেই মোহনিদ্রা হইতে উত্থান করি, উত্থান করিয়া নব বলে, এবং নব উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া কীর্ত্তি কলাপের গৌরবে আর একবার পৃথিবীকে চমৎকৃত করি।

বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলী।

সময় নিশীথ।

নেপথ্য বংশীধ্বনি;—লতা পুষ্পাভরণে বিভূষিতা বনদেবীর আবির্ভাব;—স্বর্গীয় সৌরভে চারি দিক্ পূর্ণ—

বনদেবী।—সখী!—

(মুকতাভরণে বিভূষিতা নীলাম্বর পরিধানা যমুনা দেবীর উত্থান;—বনদেবী যমুনা দেবীর হস্ত ধারণ করিয়া)

এস সখী কুঞ্জনায় বসি তরুতলে—
ব্রজলীলা নিরখিতে আসি নিত নিত
রতিনাথ সহ রতি বসেন যেখানে;—
আসিবেন নাথ আজি—এস কুঞ্জনায়
মুরলীর ধ্বনি শুনি বসি তরুতলে—

(উভয়ের উপবেশন)

যমুনা দেবী।—কেন সখী?—নিত নিত আসেন মন্মথ—

বনদেবী।—শুন নাই নাকি কালি

কহিলেন যবে রতি চাহি ঋতুনাথে ?—
অনুরোধ করিলা তাঁহারে
তেঁই ঋতুনাথও আজি গিয়াছেন সুরপুরে-
যমুনা দেবী।—বটে বটে !—হাসি হাসি
হাসি অনঙ্গ-রঙ্গিনী
কি যেন কহিতেছিলা চাহি ঋতুনাথে—
রতিনাথ পরম আদরে
চ্যুত পারিজাতদলে তুলি সযতনে
সাজাতে আছিলা পুন রতির কবরী ;
সহসা সমীর
ফেলাইলা মম নীরে একটি মন্দার
মন্মথের কর হতে উপহাসচ্ছলে—
উতরিলা মৃদু হাসি অমনি মন্মথ
হানি ফুল-শর দৃঢ় চতুর সমীরে !
অধীর হইলা দেব !—কৈলা আলিঙ্গন
কিঙ্করী আমার যত তরঙ্গিনী দলে !—
করতালি দিয়া রতি উঠিলা নাচিয়া
রতিনাথ ঋতুনাথ লাগিলা হাসিতে !—
লাজে তরঙ্গিনী যত আবরিলা মুখ
হেরি মোরে !—মৃদু হাসি হইনু অন্তর !—
তাই সখী কি কহিলা ফুল-কুলেশ্বরী
অন্য মনে ছিনু বলি নারিনু শুনিতে—
বনদেবী।—মন্দারের তলে বসি, রম্ভা
তিলোত্তমা
সুহাসিনী চন্দ্রচূড়া উর্ব্বশী মেনকা—
চিকনি গাঁথিতে ছিলা মোহন আবলি
দেব-দম্পতীর তরে—
হেনকালে মীনধ্বজ উতরিলা তথা।
হাসি রম্ভা আসারিলা ফুল পারিজাতে
রতিনাথে ,—হাসি রতিনাথ সখী
বসাইলা ফুল শর ফুল শরাসনে !—
(কথায় কথায় তাঁর ফুল-শর চলে)
—চমকিলা হেরি বালা ফুল শরাসনে !—
ফুল-শর !—গুরুতর বাজে হৃদয়েতে
ফণীর দংশন চেয়ে !—
—পড়ি পদে কান্দি বালা কহিলা মন্মথে
" ক্ষম দেব পরিহাসে পরাণ বিদরে !
ত্রিপুরান্তক যায় নারেন সহিতে
কেমনে সহিবে দাসি ?—দোহাই রতির !—
রতির শপথ লাগে মার যদি মোরে !—"
হাসিলেন ফুল সখা
শরদেন্দু বিমলিন হেরি
উছলিল দয়াসিন্ধু !—কহিলা মধুরে
" অব্যর্থ সন্ধান মোর
কোথা তেয়াজিব এবে কহ রম্ভা মোরে ?"
হাসি কহিলা উর্ব্বশী
"শ্রীঅঙ্গে হানিয়া দেব বুঝুন আপনি !—"
হেন কালে আসি রতি উতরিলা তথা
পসারি যুগল বাহু আলিঙ্গিলা কামে !—
অবশ হইলা দেব !—ছুটিল অমনি
ফুল-শর !—দৃঢ়তর বাজিল মন্দারে !—
নীরবে কাঁপিলা তরু !—নীরবে ঝরিলা
অশ্রু-বিন্দু !—
প্রভাতিল মুক্তা-বিন্দু নব দুর্ব্বাদলে !
শুভ্র পুষ্প শ্যাম পর্ণ দেখিতে
রক্ত পুষ্প রক্ত পর্ণে হল পরিণত !—
(রক্তিম বর্ণ পারিজাত দেখাইয়া)
এই দেখ চিহ্ন তার—
কামেশ্বরী দিয়াছেন মোরে !
যমুনা দেবী ।—তাইত !—
মন্দার কি সেই ভাবে আছে ?
বনদেবী !—আছে সখী সুরনাথ শুনিলেন যবে

আসিলেন শচীসহ
নিরখিতে তরুবরে!
আইলা কুমার স্কন্ধ চিত্ররথ রথী
দেব সভাসদ যত!—
রতিনাথ সহ রতি হইলা লজ্জিত!
হাসিয়া সুরেন্দ্র মৃদু করিলা ইঙ্গিত
কুমারে, অমৃত-ধারা বরষিয়া বাণে
বাঁচাইলা তরুবরে সুর সেনাপতি!—
রতি পানে চাহি শচী হাসিলা গোপনে!
হাসিলা বাসব মৃদু চাহি রতিনাথে!—
কহিলা উর্ব্বশী হাসি মনমথে চাহি
"কুল বালা কুল-বধূ কুল বিহঙ্গিনী
তরুলতা ফুল দলে বিক্রম তোমার
ফুল-সখা—দৃঢ় দেহ পরশ না তুমি!—"
কহিতে কহিতে বালা হাসিয়া মুকুচি
গোপন বঙ্কিম ঠারে স্কন্ধে দেখাইলা!
চাহিলা মদন মৃদু হাসি শচী পানে—
হাসি সুরেন্দ্রাণী সায় দিলেন ইঙ্গিতে!—
বুঝিলেন সুরনাথ
কহিলা প্রকাশে সেনানাথে—
"বিষম কুসুম শরে সবাই ডরাই
আমরা!—দুরূহ মানি পরিহারি তারে!—
শচীর নিতান্ত ইচ্ছা নিরখিতে তাহে
—পারে কি না পারে শর অধীরিতে তাঁহে
দুরন্ত তারকাসুর নাশিল যাঁহারে।—
হাসিলেন কার্ত্তিকেয়—কহিলা গম্ভীরে—
"হাসি পায় সুরনাথ শুনিলে এ কথা
বৃত্রাসুর শরজালে অবহেলে যেই
ডরে নাকি সেই তুচ্ছ
কোমল তরল কাম ফুলশর দলে?
ফুলাঘাতে মেরু-শৃঙ্গ বিপতিত হয়
দেখিলেও সুরনাথ করি না প্রত্যয়!!—"
যমুনা দেবী।—বটে!—(হাস্য)—
বনদেবী।—তূণ হতে সম্মোহন তুলিয়া মদন
কহিলেন মৃদু হাসি—"দেহ অনুমতি
সেনানাথ ফুল-শর দেখাই তোমারে!—"
হরষে উর্ব্বশী রতি রম্ভা সুরেন্দ্রাণী
পরম উৎসাহে সবে করিলা ইঙ্গিত
রতি নাথে!—সুরনাথ নিবারি কহিলা—
"নহে অদ্য—দিক্‌পাল আদি
কালি আসিবেন সবে দেবালয়ে—
সবার সমুখে
কালি দেখা যাবে কুমার কি কাম হারে!—
কিন্তু এক কথা—সাবধান সবে!
নগেন্দ্র-নন্দিনী যেন না পান শুনিতে!—
শরমের কথা!—সাবধান!—
বালকের খেলা বলি হাসিবেন উমা!—"
তাই সখী রতিনাথ এবে সুরপুরে
সুর-সেনাপতি সহ বল বিচারিতে;
আসিবেন নাহি আজি—এস দুজনায়
মুরলীর ধ্বনি শুনি বসি তরুমূলে—
(উভয়েই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ও বংশী শ্রবণ—ক্ষণকাল বংশী নিস্তব্ধ—পরে পঞ্চমে বংশী ধ্বনি—২)
যমুনা দেবী।—সখী!—
হের মম হৃদে প্রতি তরঙ্গিণী-শেখরে
সুধাংশুর অংশু প্রতি মুক্তা বিম্বে বিহরে!
তরল প্রবাহ ভরে
মধুরিমে থর থরে
সমীরণ আলিঙ্গনে সোহাগেতে শিহরে!—
দেখ সখী!—

রজতের হাসি হাসে শশী বসি শেখরে !
তীরে লতা তরুরাজে জড়াইয়া আদরে
প্রেম পাশে—হেরে মুখ নিরমল মুকুরে !
প্রেম ভরে ঢলে পড়ে ;
ফুল ছড়া ছড়ি করে !—
ফুলে খাটাইয়া পাল প্রফুলিত অন্তরে
অই সখী
সুরসিক সমীরণ তরঙ্গেতে বিহারে !
সখীরে !—
নিরমল নীল নভে নিশানাথ হাসিছে !
তুষার অম্বুধি মাঝে চন্দ্রিকা চমিছে !—
মধুর পঞ্চম তারে
তরঙ্গিণী তান ছাড়ে—
কানন ছাপিয়া তান গগণেতে উঠিছে
অই সখী ব্রজ বেণু দূর বনে বাজিছে !—
সখীরে !—
বিমোহিত বেণু রবে সমীরণ মেতেছে !
তরল তরঙ্গ অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পড়েছে !
তরঙ্গিণী লাজভরে
হেসে হেসে যায় সরে
ঘেঁসে গিয়ে সমীরণ তবু তায় ধরিছে—
অই দেখ !—
প্রণয়ের কথা তার কাণে কাণে কহিছে !—
অচল হইয়া চাঁদ বেণু-রব শুনিছে !
অচল তারার দল মৃদু মৃদু হাসিছে !
রজত দশন পাতি
বিতরে রজত-ভাতি
রজত জোছনা-রাজি ছড়াইয়া পড়েছে !
সখীরে !
অসীম মুরলী অই মোহনিয়া বাজিছে !
বনদেবী !—সখীরে

বসন্তের প্রিয়পাখী কুহরিছে তমালে
তান-তরঙ্গিণী তার ভাসিতেছে অনিলে !
সুরভিত বায়ুভরে
তরুলতা থর থরে
ঝঙ্কারিছে অলি নব প্রফুলিত বকুলে !
দেখ দেখ
ভরিয়াছে ফুল-বালা পরিমলে গোকুলে !
হের সখী !
ব্রজ জলদ ছটা গোবর্দ্ধন শেখরে !—
বিমল মুকুতা ধারা তরুদল আসারে !
সুরভিত ফুল দলে
মুক্তাবিন্দু ঝলমলে !
নব রসে বিভাষিত বিকসিত অন্তরে—
হের হের !
বসন্তের অনুচর ফুলে ফুলে ঝঙ্কারে !
সখীরে !
হের কিবা নিরুপম বেল যুঁই ফুটেছে—
ফুলে ফুলে মধুকর মধুপানে মেতেছে !
মুখে আরোপিয়া মুখ
উছলে সহস্র সুখ
উচ্ছ্বাসে মলয়ানিল বৃন্দাবন মোহিছে !
দেখ কিবা
তমালের পাতে পাতে খদ্যোতিকা নাচিছে।—
মোহনিয়া ব্রজ-বেণু পঞ্চমেতে বাজিছে
মোহনিয়া পীকবধূ পঞ্চমেতে কুজিছে
মোহন পঞ্চম তারে
নূপুরের ঝঙ্কারে
কুলত্যজি গোপবধূ ব্রজবনে পসিছে !
অই সখী
রূপে উজলিয়া বন কেবা যেন আসিছে !—
(উভয়ের অন্তর্দ্ধান)—

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতার।—হম করব কি সুধাব কাহারে?
সুধাইলে কই না কয় হমারে!—
বিফল সাধন অরণ্যে রোদন
রোই রোই হম উত্তর না পাই!—
তপন তনয়া-তটে যাই
তরল তরঙ্গিণী দল কি সুধাই—
খল খল হাসই নিলাজ তরঙ্গিণী
গায়ে গায়ে পড়ি ঢলিয়ে পড়য়!
পরিহাসে সারে উত্তর না দেয়ও!
গম্ভীর ভাবই গোবর্দ্ধন রাজে
করপুটে নমই সুধাই তাহারে—
নীরব গিরিবর উত্তর না দেয়ও
দুরভাগিনী জানি মোরও!—
চাহত শেখরে নব জলধর পানে
সে যদি কহইতে পারে—
যই হম চাহত গোবর্দ্ধন তাজত
ছুটি পলায়ত নীল অনম্বরে!
দুরভাগিনী জানি না কয় হমারে!—
করযোড়ে যদি সজল নয়নে
তাকায়তু পুন নভ নীলিমায়
হায় রে কপাল
সৌদামিনী ক্ষণে হাসিয়া পলায়!—
উপায় না পাই বৈঠই ভূতলে
কহত মরমে—"করব কা?—"
সতিনী প্রতিধ্বনি অমনি সুধায়ত
উপহাসি মোয়—"করব কা?"—
করব কা কই নাহি কি উপায়?
বৃন্দাবন মাঝে সুধাব বা কায়?—
(ক্ষণকাল চিন্তা)—
মুখ ফুটি যদি কই
চপলা হাসত জলদ পলায়ত
সমীর স্বনত হায়!
পাপ প্রতিধ্বনি উপহাসে মোয়!—
কহব না বাত রোধব হৃদয়ে
জলব ধিকিধিকি অন্তর মাঝারে
চিতা বানায়ব আপন অন্তরে!—
অযুত আশা লতা নিত জনমত
নিত শুকায়ত যই
ইন্ধন ভেয়ব দিন রাতি জলব
রহব না যব যায়ব ফুরাই—
শীরায় শীরায় অনল পাকড়ব
হাড় মাস ভেব ছাই!
কহব না তবু—অনন্ত দহনে
দহব—মরব—ফুরাব বালাই!—
(নখ দ্বারা বৃক্ষে লিখন;—ক্ষণকাল পরে বিসখাকে দেখিয়া)—
বিসখা আয়ত—(বৃক্ষান্তরালে অবস্থান)—
(বিসখার প্রবেশ)
বিসখা।—বিসখা দুঃখ কবে কায়?
বিসখাকি দুঃখ কহা নাহি যায়!
আগনেয় গিরি গহ্বর মাঝারে
অনন্ত অনল যইসন জলত!
অনন্ত অনল ধিকি ধিকি ধিকি
জলত অইসন অন্তর মাঝারে!
এ দুঃখ কহব কাহারে?
যমুনা সুশীতল নীলিমা মাঝারে
যৌবন ভাসি—
যদি জ্বালা নিবারণ হোয়ও!
যায়ত না জ্বালা বাড়ত দ্বিগুণ
হায়রে দুরভাগ হমার!—
নীল নীরে হেরি নীল নটবর—

স্মৃতি-সমীরণ বহে!—
স্মৃতি-বায়ু ভরে হৃদয় গহ্বরে
অনল উছলিত হোয়ও!
সে জ্বালা কহরব কায়ও?
নীরে নিবারণ সে জ্বালা না হোয়ও!—
—(নখ দ্বারা বুকে লিখন)—
হৃদি টুটি বাত যদি বাহিরায়
বৃন্দাবন মাঝে রহা হব দায়!
ললিতা চন্দ্রাবলী বৃন্দা কালামুখী
উপহাস সবে করবে মোয়ও
রাই যদি শুনে ভেয়বে প্রলয়!—
(দীর্ঘ নিঃশ্বাস)—
সম দুঃখী যদি পাই
নিবে যদি জ্বালা
তার গলা ধরি রোই এ জ্বালা নিবাই!—

ললিতা।—(বৃক্ষান্তরাল হইতে অগ্রসর হইয়া)
আয় লো বিসখে তবে দোহা মেলি রোই
নিবে যদি জ্বালা আয় লো নিবাই!—

বিসখা।—নিবিবে না জ্বালা বাড়বে দ্বিগুণ উপহাস যদি সই!—

ললিতা।—আন ছুরী তবে বুক চিরি তোয়
দেখায়ব আজি যো জ্বালা সই!
সম দুঃখী সখী তুই
বৃন্দাবন মাঝে কাহারে কহব
এ দুঃখ আর?
যদি প্রকাশব সব সখী হাসব
বৃন্দা বাজায়ব ঢোল!

(সম্মুখস্থ লতাকুঞ্জ হইতে বৃন্দার অগ্রসর হওন।)

বিসখে পেখলি?
বৃন্দাবনময় ভেয়ল রোল!—

বৃন্দা।—মোয় নাহি ডরবি
ভিষকক রোগ নাহি ছিপায়বি!—
মিছা ছিপায়বি রোগ বাড়ায়বি
কুপথো মরবি শেষ!
অনর্থ ঘটব অসাধ্য ভেয়ব
হাড়ে হাড়ে রোগ পসব যব!
যদি
ধন্বন্তরি আয়ব সেহ নাহি শকব
কঠিন ভেয়ব তব!—

(নাড়ী দর্শন অভিলাষে ললিতার হস্ত ধরিতে হস্ত প্রসারণ,—পরে বিসখার হস্ত ধরিতে হস্ত প্রসারণ,—উভয়েই হাসিয়া দূরে অবস্থান)—

রোগীয়ক ছল সব মই জানি
মুখ পেখি হম রোগ পচানি!
এ ব্যাধি বিধান বহুদিন পঠলু
বহুদিন হতে ভোগলু আপনি!
এ ব্যাধি বিষম নাহি উপশম
যদি লাজ উপসগ হোয়ও!
শুন যদি বাঁচবি নাহি ছিপায়বি—
কায় ছিপায়বি?—ছিপায়বি মোয়ও?—
আঁচলে আবরবি নভ চাঁদিমায়?—

ললিতা।—কি রোগ পেখলি—কইসে জানলি?
আগ লাগাই তুয়া ভালে!
কোন আঁখে পেখলি—আঁখ কি খোয়ালি?
বাজ গিরক তুয়া আঁখে!

যদি গগণ অমল বিকসিত কমল
নিথর জলনিধি শোল হানে তুহা আঁখে—
মর মর তবে!—

আঁখি দুটা যেন,গিরয়ে নরকে!—

বিসখা।—বৃন্দে!—

এত বিধি পড়িলি এত ব্যাধি জানলি

নিজ ব্যাধিয়ত নাহি চিনলি!—

নিজ ব্যাধি-বিধান নাহি জানলি!

হম তোয় কহব ঔষধ বিধায়ব

কড়ি লাগব দুই চারি!

কলসী কিনবি গলায়মে বাঁধবি

গিরবি যমুনা-সলিলে!

অলপমে যায়বি শমন-নিকেতনে!

(বৃন্দা অর্দ্ধ বিকসিত অধরে উভয়ের দিকে তীব্র দৃষ্টি)—

ললিতা।—মর মর—তুহু কই সে জানলি?

কোন আঁখে তুহু রোগ পছানিলি?—

বৃন্দা।—হায় রে কপাল!—হেরি হাসি পায়ও

রোগী ভই এরা ওঝায়ে ভুলায়ও!—

এ রোগ বিষম অন্তর মাঝারে

অনল নিছন জ্বলে!

ঘুণ দল যৈসন তরুবর অন্তরে

—অন্তর তৈসন কাটে!—

বৃন্দা অন্তর পেখত

টনক বাতমে নাহি ভুলয়ত!—

হায় রে সে কাল কবে ফুরায়ল—

(আজিও না মিলল দাগ!)

সে কালে অইসন কত রোগ ভেয়ল

প্রতি হাড়ে তার রহল নিশান!

সখী যদি পুছতু নাহি বাতায়তু

রখিতু আপন অন্তরে!

চিন্তা জালায়তু আপন অন্তরে!

ললিতে!

সেদিনে অইসন সবই আছলু

এ খেলা সে দিনে সবই খেললু।

বিকসিত ষোড়শে নবীন পিয়াসে

বারি পেখি ভেত ভয়!

সেদিন না রহল সেহ দিন গয়িল

পিয়াস ভেয়ল পিছুভারি!

ষোড়শ উতরলু নিদাঘ আয়ল

পিয়াসে না রহল জ্ঞান!

বাপী কূপ সর হ্রদ নদ সাগর

জলধরে যাচি পিয়লু জল!

পিয়াস না তবুও ভেয়ল লাঘব!—

সেহ দিন গয়িল বিংশতি উতরলু

নব ঋতু ভেয়ল উদয়!

তৃষা লঘু ভেয়ল মনমত ঢোঁড়লু

বাপী সর সাগর চিনলু তব!

কিন্তু

মনমত নাহি মিলল আর!

সেহ দিন গয়িল পিয়াস ফুরায়ল

মিটল জনম কি সাধ!

পাঠ সমাপই ইহ বৃন্দাবনে

টোল বানায়লু অব!

অধ্যাপক ভই তুহা সবে শিখাই

পীরিতি চূড়ামণি হম!—

মোয় লাজ করবি আপনি মরবি

ছিপাইতে চাহবি শকবি না!

তৃণে আগ গুপত রহব না!—

(ললিতা ও বিসখার হাস্য)

বিসখা।—গুরু যদি বৃন্দে তোহারে সুধাই

এহি পাঠ আজি হমারে শিখাই!—

নিজ মন যদি নাগরে দিই—

প্রতিদান তার কইসে লভই?—

বৃন্দা।—আগে নাহি দিয়বি প্রথমে লয়বি
প্রতিদান করবি শেষ!
আগে যদি দিয়লি তবেত ঠকলি
প্রমাদ ভেয়ব শেষ!—
পুরুখে চিনি দিবি মন
ভুবপ্রাপ ভবে নিথাদ রতন!
তাম রাঙ গিলটি থাটি দরে বিকত
নবীনা না চিনত তায়!
অঙ রঙ ওজন সবই সমান
আশল পছান দায়!
পুরুখ পরকন সহজত নয়ও!—
বিরহ হুতাশনে পরিখা তোয়ও!—
যদি তিন পোড়ে ঠিকল তবেত আসল
নকল না সহব পোড়!
এক পোড়ে চটব বিবঙ ভেয়ব
দুই পোড়ে ভেব ছাই!
তিন পোড় বেলি নকলে না পাই!—
বিসখে কহি তোয় তাই—
আগে মন দিলে ভেয়ব বালাই!
হাসি হাসি কহব বড় মিঠি নাখব
পুরুখ চতুরক শেষ!
পায়ে ধরি সাধব ঠেলিলে না টলব
মুখ পেখি ভেব দুঃখ!—
আসলে শুধু ফাকি কেবল ভোজ বাজি
বিনা মুলে লভবে মন!
প্রতিদানে নাহি করব অর্পণ!—
বিসখা।—হম পুছত এক
শত মুখে তুহ উতরত আর!—
আগে যদি মন দেই
[illegible]
[illegible]

বৃন্দা।—মনে মনে থাকবি গুমার না ভাঙ্গবি
বেড়া নাড়ি বুঝবি গৃহত কি মন!—
তায় যদি বুঝলি সফল ভেয়লি
গুমার বাড়ায়বি তব!
আপনি সাধব বাড়াবাড়ি করব
মনে মনে রহবি তুই!
ধীরে ধীরে সহলে—সহল ভেয়বি
বদনে না তবুও কহবি তব!
আঁখ মুদি রহবি সেহি চালায়ব
ঘাটে গই উঠবি যব
নয়ন উনমলি তখন পেখবি
স্বভাব করল স্বভাব কি কায়!—
বেড়া নাড়ি কিন্তু গৃহতক মন
সর্ব্বনাশ যদি বুঝলি অন!
রোই রোই মরবি বাটে বাটে ঘোমবি
ফিরবি তাহারে চাহি!
যদি ভাগ বলে দরশন মিলব
লাজে দুঃখে চাবি মুখ পানে!
সে যদি চাহব অন্তর করবি
ঈষদ হাসই যদি হাসি আয়ে!
আয়ে বা না আয়ে হাসি নাহি লাগে
নীর ধারা বহায়বি আঁখে!
আবার চাহবি নীর ধারা ঝরবি
আঁচল আবরবি মুখে!
আবার খোলবি কমলে দেখায়বি
নিস্কিত নয়ন নিহারে!
দয়া উদয়ব তাহারঅন্তরে!
ধাপে ধাপে উঠবি সুবিধা না ত্যজবি
সুবিধা আনবি আপন ভাণ্ডারে!
তবে যদি মীন পহুছে চারে!—
(নেপথ্যে বংশী নীরব)

ললিতা।—বিসখে!
বেণুরব অব নীরব ভেয়ল
তটিনী বুঝি আয়ি সাগরে মিসল!—
বৃন্দে অব মোরা যাই
তুহ কি করবি?—বাতাসে বোলাই?
বাতাসে বাতাই বাতাসে বোলাই
ঘন দেই হাত নাড়া!
তরুদলে পেখাবি—পেখব তারা!—
(ললিতা ও বিসখার প্রস্থান)

বৃন্দা।—(দূর হইতে চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া)
অব চন্দ্রাবলী আয়ত!
শুনব এ ভালা যদি কছু কহত!—
(বৃক্ষান্তরালে অবস্থান)
(চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী।—(মালা গাঁথিতে গাঁথিতে—)
এমালা সহব কইসে?
সহব বা কাঁহে?—
নাহি কি মাধুরী?—নাহি কি যৌবন?—
নাহি কি পীযূষ অধর ভাণ্ডারে?—
প্রেম তরঙ্গিণী
খেলত কি নাহি এরূপ সাগরে?—
—মদন প্রবাহন সতত আলোড়নে
শীরণ ভেয়ল রোধ!
কোমল লাজ রোধ কতইবা সহব?
অবিরত বহত বাসনা তুফান—
—ভাগবতী রাধা গোকুল মাঝারে!
কি রূপবতী রাধা গোকুল-মাঝারে?
কুরূপা অভাগিনী—কি হুয় ভাগিনী
কোন কহি দিব মোয়?—

বৃন্দা।—(অগ্রসর হইয়া)
শুন চন্দ্রাবলী হুয় কব তোয়ও!—

চন্দ্রাবলী।—স্থিরভাবে)—
লাজবতী লতা নহে চন্দ্রাবলী
সঙ্কোচিতা নহে ভেত।
চন্দ্রাবলী নহে রাই—
সমীরণে নাহি হেলিয়ে পড়ই!—
তুহ কি শিখাবি হমারে?
কাঁচা মেয়ে রাই শিখাবি তাহারে!
তোর এক হাটে বেচব আর হাটে কিনব
চন্দ্রাবলী মোর নাম!
তুহ পেখত কি? ষোড়শে বিংশতি উত্তরলু
হুয়!—
(প্রস্থান)

বৃন্দা।—চন্দ্রাবলী আজি অবাক করল
মোর!
—বহবারে চন্দ্রাবলী!—বহবা তোয়!—
(প্রস্থান)

(বনদেবী ও যমুনা দেবীর পুন আবির্ভাব)

বনদেবী।—নীরব হয়েছে বেণু
রাধানাথ সহ বুঝি রাধা মিশিয়াছে!—
একে একে ব্রজাঙ্গনা সবাই চলিছে
রাধা কুঞ্জে—চল সখী আমরাই যাই
সমীরে মিশায়ে দেহ দেখিব দুজনে
নব নীল জলধরে অচল দামিনী!—

যমুনা দেবী।—কিবা ব্রজাঙ্গনা বেশে—
যা ইচ্ছা তোমার—চল যাই!—
(উভয়ের অন্তর্দ্ধান)
যবনিকা পতন।

ক্রমশঃ—

সমালোচন সম্বন্ধে কোন সমালোচকের * মত।

আজি কালি সমালোচনার ভারি ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। প্রতি সম্বাদপত্রের প্রতিবারে বিস্তর গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি সাময়িক পত্রের প্রতিবারেই বিস্তৃত এবং সংক্ষিপ্ত সমালোচনা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। রঙ্গভূমিতে সমালোচনা, নাটকে প্রহসনে সমালোচনা, বক্তৃতায় সমালোচনা এবং বালকবৃন্দের ক্রীড়াস্থল স্বরূপ সমাজগৃহেও সমালোচনার রবে তিষ্ঠিতে পারা যায় না। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ এক্ষণে সমালোচনায় পরিপূর্ণ। গ্রন্থ নাই, সমালোচনা আছে, এই বড় আশ্চর্য্য। এত সমালোচনার ধূমধাম দেখিয়া অনুমান হয় যেন আমাদিগের কৃতবিদ্যগণ মনে করিয়াছেন, সমালোচনাই ভাষার পুষ্টিসাধনের প্রধান উপায়। কিন্তু সমালোচনায় বাস্তবিক ভাষার উন্নতি কি অনুন্নতি সাধিত হয় তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত সমালোচনা দ্বারা জগতের বাস্তবিক কতদূর হিতসাধন হইয়াছে। ইহা দ্বারা যদি জগতের হিতসাধন হইয়া থাকে তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, সমালোচনায় প্রতিভার উদ্রেক হয়, প্রতিভাকে মার্জ্জিত এবং সন্মার্গে নিয়োজিত করে, প্রতিভার সহিত রুচির সম্মিলন করিয়া দেয়, কুলেখকগণকে দমনে রাখে এবং যাহা সুন্দর ও সাধু তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করিয়া পাঠকের হৃদয় মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট করে। এক্ষণে দেখা যাউক, সমালোচনা দ্বারা বাস্তবিক জগতের এই প্রকার উপকার সাধিত হইয়াছে কি না।

১। সমালোচনায় যে প্রতিভার উদ্রেক হয় না তাহার প্রমাণের আবশ্যক করে না। পূর্ব্বকালে যখন কবিকুলচূড়ামণিগণ উদিত হইয়াছিলেন তখন সমালোচনা কোথায় ছিল। বাল্মিকী ও ব্যাসের পূর্ব্বে অলঙ্কার শাস্ত্রের বিদ্যমানতা প্রমাণিত হয় না। কবিগণ প্রতিভাভাবে যে সমস্ত সুশোভন সৃষ্টিকাণ্ড এবং সুদৃশ্যনিচয় রচনা করিয়া গিয়াছেন, সমালোচকগণ কি তাহার কিছু সহায়তা করিয়াছিলেন? কবিগণ কেবল প্রতিভার যাদুবলে মুহূর্ত্ত মধ্যে আলাডিনের রাজপ্রাসাদ সকল সৃজন করিয়াছেন—যাহার সুন্দর সৃষ্টিকৌশল আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে, আজিও তাহাদিগের আশ্চর্য্য সৃষ্টি শক্তির পরিচয় দিতেছে। আরিষ্টটেল, আরিষ্টার্কাস এবং লঙ্গাইনসের বহুকাল পূর্ব্বে

* T. N. Talfourd, author of "Ion"

গ্রীশের উৎকৃষ্ট কবিগণ (Rhapsodists) দেশে দেশে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা সমালোচনার ধার ধারিতেন না, সমালোচনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ভয় রাখিতেন না এবং আলঙ্কারিকগণের সাধুবাদের ও প্রত্যাশা করিতেন না। তাঁহারা যেখানে যাইতেন, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে এবং গাম্ভীর্য্যে মোহিত হইয়া সঙ্গীত ধ্বনিতে জগৎ পূর্ণ করিতেন। ধীর মহীধরের প্রকাণ্ডতায় তাঁহারা প্রকৃতির বল ও গাম্ভীর্য্য দেখিতেন, গগণের প্রসারে প্রকৃতির বিস্তীর্ণতা দেখিতেন, স্থির জলাশয়ের মধ্যে তরুলতার সৌন্দর্য্য দেখিতেন, এবং মেঘমালার সুবর্ণ ছবিতে প্রকৃতির রম ণীয়তা অনুভব করিতেন। প্রকৃতির মহাকাব্য গ্রন্থ তাঁহাদিগকে অলঙ্কারের নিয়মাবলি শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃতির বীণাধ্বনি শুনিয়া যে সুমধুর রবে গান গাহিয়া গিয়াছেন, তাহাতে চিরদিন জগৎ মোহিত হইয়া আছে। সেই প্রকৃতির বরপুত্রগণ যাহাদিগকে আপনাদিগের কবিতা শুনাইতেন তাহারাই মোহিত হইত, মোহিত হইয়া ভাবিত, ইহারা দৈববলেই এমত সুধারবে গান গাহিতে পারেন। তাহারা যেখানে যাইতেন, সেইখানেই অবি— ধ্বনি ঢালিয়া দিতেন, সকলেই তাঁহা—ভাগ— সমাদর করিত। তরুণ বয়স্কেরা কি রূপব— গর গান শুনিতে, শুনিতে অজ— কুরূপা অজ— ত, বৃদ্ধগণ ক্ষণিকের জন্য বয়— স্তা পরিহার করিয়া যৌবন— বুন্দা।—(অগ্র— উৎসাহিত হইতেন। সক-লেই তাঁহাদিগের সম্মান করিত—এই জন্য যে, তাঁহাদিগেরই মুখে বীরগণের যশ, বীরের বীরত্ব প্রচার করিতে তাঁহারা সমর্থ, তাঁহারাই সর্ব্বজাতির গৌরববৃদ্ধি করেন, ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন, সাধুপথে মনকে আকর্ষণ করেন, সৎকীর্ত্তিকলাপ পৃথিবীময় প্রচার করেন এবং পূর্ব্বকালের ইতিহাস ও জ্ঞান কেবল তাঁহারাই অবগত আছেন। যে ধনে তাঁহারা সম্পন্ন ছিলেন, গ্রন্থকোষে সে ধন রক্ষিত হয় নাই। সাধারণ জনগণের স্মৃতিমন্দিরে তাহা চিররক্ষিত হইত। লোকে অতি যত্নে তাহা দিবারাত্রি রক্ষা করিত। কতকাল ধরিয়া এইরূপ পূর্ব্বকবিগণের ধনসম্পত্তি রক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহারাও লোকের মুখে মুখে রক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পুরুষানুক্রমে কত কাল ধরিয়া প্রাচীন কাব্য নিচয় মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে। কতকাল ধরিয়া তরুণবয়স্কেরা আশ্চর্য্য হইয়া পিতামহের কাছে তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। প্রাচীনকালের এই মহার্ঘ কাব্যনিচয় কোন পূর্ণপদ্ধতিক্রমে রচিত হয় নাই। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়দে যে বিচিত্র সৃষ্টি কৌশল, যে চমৎকার কল্পনা এবং যে মনোহর চিত্রাবলি পরিদৃষ্ট হয় এক্ষণকার মার্জ্জিত রুচি-সম্পন্ন এবং অলঙ্কার-পরিশুদ্ধ কাব্যাবলিতেও তাহা লক্ষিত হয় না। বাস্তবিক এই প্রাচীন কাব্যনিচয়ের যাহা যাহা ধর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহাই এক্ষণকার কাব্যশাস্ত্রের নিয়ম রূপে পরিগণিত

হইয়াছে। পরবর্ত্তী সমালোচকগণ সেই নিয়মের অনুযায়ী হইয়া অন্য কাব্যের পরীক্ষা করিতে যান। ইদানীন্তন কবিগণ সেই প্রাচীন কবিগণের অনুকরণ করিতে যান। প্রাচীন কবিগণ যে প্রকৃতির আদর্শ ধরিয়া নিজ নিজ কাব্যাবলি রচিয়া গিয়াছেন, আশ্চর্য্য এই, ইদানীন্তন কবিগণ সেই প্রকৃতিকেও তুচ্ছ করিয়া প্রাচীন কাব্যসমূহের আদর্শে নিজ নিজ কাব্য লিখিয়া থাকেন। যেন এক দিন প্রকৃতি ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে তথাপি এই প্রাচীন কাব্যনিবহ সেরূপ হইতে পারে না। এমত কি তাহাদিগের দোষাবলি ও গুণরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, পূর্ব্বরচিত অলঙ্কার শাস্ত্র কি এই সমস্ত প্রাচীন কবিগণের প্রতিভাকে উদ্রিক্ত করিয়া দিয়াছিল, না তাহা স্বতঃই বিস্ফূরিত হইয়াছে? প্রাচীন কবিগণের উৎকৃষ্ট প্রতিভা এবং চমৎকার কল্পনা যে স্বতঃই বিস্ফূরিত হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। স্বতঃই বিস্ফূরিত হইয়া তাহার যে ফল ফলিয়াছে, এই মার্জ্জিত আলঙ্কারিক সময়ের ফল সেরূপ হইতে দেখা যায় না।

য়ুনানী দৃশ্যকাব্য ও স্বতঃই বিস্ফূরিত হইয়াছে। এস্কাইলস, ইউরিপাইডিস, সফোক্লিস প্রভৃতি গ্রীসের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নাটককারগণ সকলেই আরিষ্টটেলের পূর্ব্বে উদয় হইয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যেও এইরূপ ঘটিয়াছে। ড্রেমিন্স, রাইমার, [illegible] প্রভৃতি সমালোচকগণের বহুকাল পূর্ব্বে অমর সেক্সপিয়ারের দৃশ্যকাব্য সমুদায় বিরচিত হয়। আরিষ্টটেল প্রভৃতি সমালোচকগণের গ্রন্থাবলি তিনি যে কখন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এমত প্রতীত হয় না। যদি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তবে যে তাঁহাদিগের গ্রন্থ-নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়মের বশীভূত না হইয়া নিজ কাব্যাবলি বিরচন করিয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার পূর্ব্বে কুইন্টিলিয়ন ও হোরেস, লঙ্গাইনস ও আরিষ্টটেলের থাকা আর না থাকা, সমান হইয়াছিল। তাঁহাদিগের গ্রন্থাবলি যদি পড়িয়া থাকেন, সে অধ্যয়নে কোন ফল দর্শে নাই। তিনি আপনার জন্য এক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিলেন। অলঙ্কার শাস্ত্র তদীয় প্রতিভার বিস্ফূরণ পক্ষে কিছুই সহায়তা করে নাই। যদি তাঁহার প্রতিভার বিস্ফূরণ পক্ষে কেহ কিছু সহায়তা করিয়া থাকে, তবে মার্লো প্রভৃতি তদীয় পূর্ব্ব নাটককারগণ একদিন সে সম্মান পাইলে ও পাইতে পারেন। কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্রে ও সমালোচনায় যে তাঁহার প্রতিভার কিছুই স্ফূর্ত্তি হয় নাই তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। য়ুনানী বিয়োগান্ত নাটককারগণ এবং সেক্সপিয়ার যে সমস্ত চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, কোন সমালোচক তাহার মাহারেখা পূর্ব্বে অঙ্কিত করেন নাই, এই সমস্ত চিত্র এবং তাহাদিগের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলি সেই নাটককারগণের ভাবময়ী সৃষ্টি। তাহারা এই সকল সৃষ্টিকাণ্ড রাখিয়া গেলে

তবে সমালোচক তাহাদিগের কৌশল এবং গুণাগুণ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

২। এক্ষণে বোধ হয় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে সমালোচনা দ্বারা প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা প্রতিভা মার্জ্জিত এবং সৎপথে নিয়োজিত ও হয় না। কারণ প্রতিভা চিরকাল নিজ পথ নিজেই আবিষ্কার করিয়া কত শত সুবর্ণময় প্রদেশ লোকলোচনের সমক্ষে ধারণ করিয়াছে। যে নিয়মে এবং যে পথে প্রতিভা চলে, তাহা অন্য কেহ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে না; কবির হৃদয়ে যে সৌন্দর্য্যের বীজ রোপিত আছে তাহা সময় ক্রমে নিজেই কুসুমিত হইয়া পড়ে। অগ্নি হইতে ধূম যেমন সহস্র তরঙ্গরঙ্গে সুন্দরভাবে উত্থিত হয়, কল্পনার অসংখ্য ভাবসমূহ এবং সৃষ্টিকাণ্ড সেইরূপ মোহনীয় বেশে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। কবি যাহা দেখেন, সমালোচকের সাধ্য কি যে তাহা অনুমান করিয়া আনেন। কবি যে কল্পনা বলে স্বর্গের উপর স্বর্গ সৃষ্টি করেন, সমালোচকের সামান্য কল্পনায় তাহার কি পরিমাণ হয়? সমালোচক সে দৃষ্টি কোথায় পাইবেন, যে দৃষ্টি প্রভাবে কবি মানব প্রকৃতির অতি গূঢ়তম বিষয় সকল আলোকিত করিয়া দেন, যে দৃষ্টি স্বর্গের দিকে উত্থিত হইয়া ইন্দ্রধনুর রঞ্জিত বরণে এবং মেঘমালার সুন্দর আকারে স্থাপিত হয়, যে দৃষ্টি প্রভাবে কবি এমন কত শত আলোরঞ্জিত সুবর্ণময় দেশ, কত নূতন নূতন জগৎ আবিষ্কার করেন,—ঐ তারামণ্ডিত গগণক্ষেত্র যাহা মানবচক্ষু হইতে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। কবির কল্পনা-দর্পণে যে সমস্ত নিত্য এবং চিরস্থায়ী রাজ্যের ছায়া আসিয়া পতিত হয়, সমালোচক কি তাহা দেখিতে পান? কবি যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেন, সমালোচক কেবল তাহারই সহিত অন্য চিত্রের তুলনা করিয়া দেখিতে পারেন মাত্র। বর্ত্তমান দেখিয়া সমালোচক ভবিষ্যৎ গণনা করিতে বসেন। কিন্তু প্রতিভা সে গণনায় আবদ্ধ থাকিবার নহে। সমালোচক যে ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া দেন, প্রতিভা হয়ত সেদিক দিয়াও যায় না। সমালোচক ইলিয়দ দেখিয়া বলিয়া দিলেন যে ভবিষ্যৎ মহাকাব্য সমুদায়, ইলিয়দের নিয়মে প্রস্তুত হইলে তাহা সুন্দর হইবে। কিন্তু যে সমালোচক রামায়ণ ও মহাভারত দেখিয়াছেন তিনি বলিবেন ভারতের নিকট ইলিয়দ অতি সামান্য কাব্য; সকল মহাকাব্য রামায়ণ এবং মহাভারতের মত হওয়া আবশ্যক; নাহিলে তাহা মহাকাব্য বলিয়া গণ্য হইবে না। হোমর, ব্যাসের নিয়মে চলেন নাই। ইহাঁরা স্বতন্ত্র ভাবে স্বতন্ত্র দেশে বিভিন্ন পথে বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাসের বর্ত্তমানে হোমরের ভবিষ্যৎ নিরূপিত হয় নাই। আবার হোমর যে নিয়মে চলিয়াছিলেন, য়ুনানী বিয়োগান্ত নাটককারগণ

সে নিয়মে দৃশ্যকাব্যসমূহ বিরচিত করেন নাই। তাহাদিগের কাব্যপ্রণালী বিভিন্ন নিয়মে প্রচলিত হইয়াছিল। আরিষ্টটেল বলিয়া উঠিলেন সকল বিয়োগান্ত কাব্য সফোক্লিশের ছাঁচে প্রস্তুত হইলে, তবে সুন্দর হইবে। তিনি অনুমান করিতে পারেন নাই, সেক্সপিয়ার এবং কাল্দেরণ যে প্রণালীতে নাটক লিখিবেন, তাহাও সুন্দর হইবে। সফোক্লিশের বর্ত্তমানে কাল্দেরণের ভবিষ্যৎ অনুমিত হয় নাই। আরিষ্টটেলের সৃষ্টি সফোক্লিশের নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে নাই। কিন্তু লোপ-ডিভেগা এবং কাল্দেরণ, সফোক্লেশের নিয়মে প্রচালিত হয়েন নাই। তাঁহা-দিগের প্রতিভা এক স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কার করিয়াছিল। কিছু কাল পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সকল সমালোচন পত্রে এই নিয়ম স্থিরা-কৃত হয় যে, ইতিহাস কখন উপন্যাসের সহিত মিশিতে পারে না। ইতিহাস এবং উপন্যাস, ইহারা স্বতন্ত্র পথে চলিবে। কিন্তু স্কট যখন ওয়েভার্লীর একটী সরল উপন্যাস্ সুন্দর ভাবে বর্ণিত করিলেন, তখন সমালোচকের নিয়ম চিরদিনের জন্য একেবারে বিভগ্ন হইল। স্কট অনা-য়াসে উপন্যাসের সহিত ইতিহাসের বিবাহ দিলেন। সমালোচকগণ আশ্চর্য্য হইয়া স্কটের প্রতিভার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তদবধি সহস্র উপন্যাস ওয়ে-ভার্লীর ছাঁচে প্রস্তুত হইতে লাগিল। সমা-লোচক কি অনুমান করিতে পারিয়া-ছিলেন স্কটের প্রতিভা কোন্ পথে চলিবে। স্কট্ এক দিন জেমস্‌কে (স্কটের গ্রন্থ প্রকাশক) জিজ্ঞাসা করিলেন, "জেমস্, আমার লর্ড অব্‌দি আইল্‌সের বিষয় লোকে কি বলে?" জেমস্ কথা কহিলেন না। স্কট্ আবার বলিলেন, "কেন জেমস্, আজি তুমি নীরব হইয়া রহিয়াছ? বল লোকে কি বলে, আমার কাছে তোমার গোপন কি? অথবা আমি বুঝিতে পারিতেছি, কি রূপ হইয়াছে; আচ্ছা তার জন্য ভাবনা কি? তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি সব ছাড়িয়া দিব? এ পথে সুবিধা হইল না, আমি আর এক নূতন পথ বাহির করিব।" স্কট্ যে নূতন পথ কল্পনা চক্ষে বাহির করিলেন, তাহা যাদুবিৎ টমাস্ দি রাইমার এবং মাইকেল স্কট ও যাদুবলে অনুমান করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

৩। সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণে দিন দিন বিস্তর গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। যাহা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, তাহার বিস্তর ফেলা যায়। গ্রন্থ সম্বন্ধে ও এ নিয়ম প্রতিদিন প্রতিপাদিত হইতেছে। এজন্য কুলেখকগণকে তিরস্কার করা এবং প্রতি-ভাকে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া এক্ষণে সমা-লোচনার এক সুপ্রধান কার্য্য হইয়াছে। বিলাতী প্রধানতম সমালোচন পত্রের মূলমন্ত্র কিরূপ কঠিন বাক্যে প্রচারিত হইয়াছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এডিন্‌বরা রাক্‌ণের (Review) সেই মূল-সূত্রে যেন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে, নীরস গ্রন্থ প্রকাশ করা আর দুষ্কৃতি করা

সমান কথা। পাপের দমনের জন্য এবং কুগ্রন্থের দমনের জন্য যদি কাহার ও মনে বেদনা দেওয়া হয়, সে বেদনা ধর্ত্তব্য নহে। তাহা সমাজের মঙ্গলেরই জন্য। একদা এডিন্‌বর্গ রিভিউ কি কথা কলিয়াছেন দেখুন :—

"There is nothing of which nature has been more bountiful than poets. They swarm like the spawn of the codfiish, with a vicious fecundity that invites and reqiures destruction. To publish verses is become a sort of evidence that a man wants sense; which is repelled not by writing good verses, but by writing excellent verses;—by doing what Lord Byron has done; by displaying talents great enough to overcome the disgust which proceeds from socpiety, and showing that things may become new under the reviving touch of gienus"—Ed. Rev. No 43p. 68.

এ কথা স্বীকার্য্য; স্বীকার্য্য যে লোকে লিখিতে শিখিয়াই অগ্রে কবিতা লিখিয়া একবার তাহাদিগের কবি হইতে সাধ যায়। ডাক্তার ব্রাউন অগ্রে বিস্তর কবিতা লিখিয়া পরে দার্শনিক তত্ত্বে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার কবিতা কলাপ এক্ষণে কেহই আর দেখে না, কিন্তু তাঁহার দার্শনিক বক্তৃতা গুলি চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ডাক্তার ব্রাউনের মনে যে কবিত্ব ছিল তাহা তাঁহার দার্শনিক রচনায় স্থানে স্থানে বিলক্ষণ বিকশিত হইয়াছে।

কত নবীন লেখক কবিতা প্রচার করিয়াই চিরবিস্মৃতি নীরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে এই সমস্ত অপরিণত লেখকগণকে তাড়াইবার জন্য এডিন্‌বর্গ রিভিউ যে সম্মার্জ্জনীর আবশ্যকতা নিয়োগ করিয়াছেন, আমরা বলি তাহার কিছুই আবশ্যক নাই। আমাদিগের এমত আশঙ্কা হয় না যে কুলেখকগণ কখন জগতের প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন। সমাদর না পাইলে তাঁহারা আপনারাই মরিয়া যাইবেন। জগতে সমস্ত সুলেখকেরই সম্যক্ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করা যখন দুঃসাধ্য হয় তখন কুলেখকের কথা উল্লেখ করাই অন্যায়। মিল্টন ও একদা দুঃখ করিয়া গিয়াছেন ;—

"Fit readers find, but few."

অমর সেক্সপিয়রের পূজা কত কাল পরে আরম্ভ হয় তাহা কাহারই অবিদিত নাই। বড় বড় কবিগণের প্রতিষ্ঠা যখন জগতে সহজে স্থাপিত হয় না, তখন সামান্য লেখকের সমাদর হওয়া কেমনই কঠিন তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে।

কিন্তু সমালোচকগণ বলিবেন, আমরা যে কেবল পাঠকগণকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য [illegible]

গ্রন্থকারগণেরও মঙ্গল সাধন করা আমাদিগের অন্যতর উদ্দেশ্য। একথাও ভ্রান্তিমূলক। তাঁহাদিগের সমালোচন প্রভাবে যতদূর অহিত সাধন হইয়াছে, ততদূর মঙ্গল সাধন হয় নাই।

মানবের জীবন সুখদুঃখময়। এই জীবনের দিবাভাগ আছে; সুখসূর্য্য উদিত হইলে মানব হাসিতে থাকে। জীবনের রজনীও আছে; কিন্তু সেই রজনীর ও আবার জ্যোৎস্না আছে। মানব এই জ্যোৎস্নায় বসিয়া কবির সমুদায় আনন্দ ভোগ করেন। এক এক দিন এমত সময় উদিত হয় যখন তাঁহার জীবন, মন ও হৃদয় কবিত্বে পরিপূর্ণ হয়। কবির ভাব প্রবাহ ও কল্পনা তাঁহার মনাকাশে ক্রীড়া করিতে থাকে। কে না এক এক দিন সন্ধ্যাকালে বৃক্ষ-মূলে বসিয়া কত সুবর্ণময় কল্পনারাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন? তখন এই মর্ত্যধাম পৃথিবী কত কল্পনায় পরিপূর্ণ বোধ হয়, তখন ঐ সুবর্ণরঞ্জিত সন্ধ্যা-গগণকে স্বর্গ রাজ্যের আভাস মাত্র বোধ হইতে থাকে, তখন বিহঙ্গগণ মধুর রবে অন্তরে এক মধুরতর সুখের লহরী উৎপাদন করিয়া দেয়! সকলেরই জীবনে এক একবার এইরূপ বসন্তকালের উদয় হয়। তরুণ বয়সে যখন কল্পনা এইরূপ অনুরঞ্জিত হয়, যখন সবাই একবার কবির ভাবে প্রকৃতিকে এবং নিজ জীবনকে অবলোকন করেন, তখন তাঁহার হৃদয়ের ভাব সমূহে কি কবিত্ব নাই? সেই ভাবের স্ফূর্ত্তি একদিনে হয় না। কত চিন্তা, কত ভাব, কত কল্পনা, এক একবার একত্রে দলে দলে হৃদয়-গগণকে আচ্ছন্ন করে। হৃদয় এক একবার ভাবে উছলিয়া পড়ে। কত সুবর্ণচিত্র দূর হইতে প্রলোভন দেখাইতে থাকে। কত চিত্রের উপর চিত্র, কত সুখস্বপ্ন হৃদয়ে নাচিতে থাকে। সে সকল কি ঠিক আঁকা যায়, না তাহাদিগের চঞ্চল ছায়া হৃদয়ে পতিত হয়। সে ছায়া কেমন মনোরম, সকলে ঠিক বুঝিতে পারে না। আঁকিতে গেলে তুলিকায় ঠিক তাহার বর্ণ আইসে না। ভাব জড়িত হইয়া যায়; চিত্র বিচিত্রিত হইয়া পড়ে। চিত্র যতদূর আইসে, তরুণ লেখক তাহাই কল্পনায় পূর্ণ করিয়া লয়েন; ভাবেন, তাহাই অনুরূপ ছায়া। সমালোচক ইহার কি বুঝিবেন। তিনি সেই সমস্ত অনুছায়ার অনুরূপ চিত্র মনোমধ্যে কল্পনা করিতেই অক্ষম। তাঁহার নিকট সকলই জড়িত এবং বিশৃঙ্খলা বোধ হয়। তিনি সমুদায় চিত্র দোষপূর্ণ বলিয়া কলঙ্কিত করেন। তাঁহাদিগের এই গঞ্জনায় কত তরুণ কবি হৃদয়বেদনায় ব্যথিত হইয়া আর কল্পনা-পথে ভ্রমণ করিতে সাহসী হন না। সেরূপ ব্যথিত না হইলে তাঁহাদিগের তরুণকালের ভাব সমূহ ক্রমশঃ হয় ত বিস্তারিত হইত, হৃদয়ে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি হইত এবং তরুণ চিন্তা ও কল্পনা ক্রমশঃ পরিস্ফুটতা লাভ করিত। কিন্তু অনেকে হয় ত কঠিন সমালোচনার তীব্র বাক্যে এরূপ বিমর্দ্দিত হইয়া যান, যে আর কবিতার নামোল্লেখ করিতেও চাহেন না।

কবির হৃদয় কেমন কোমল পদার্থ, তাহা সমালোচকগণ বুঝেন না। না বুঝিয়া তাঁহারা অতি তীক্ষ্ন তীক্ষ্ন বিষাক্ত বাণ বর্ষণ করেন। সেই বাণে কত সুকুমার-হৃদয় তরুণ কবি চিরদিনের জন্য নিহত হইয়াছেন। এইরূপ বাণ কাউপারের এবং কার্ক হোয়াইটের কোমল হৃদয়ে বর্ষিত হয়। বিশুদ্ধরুচি, ভাবপূর্ণ কাউপার সেই বাণের ব্যথায় পাগল হইয়া যান। কার্ক হোয়াইটের হৃদয় এরূপ কোমল পদার্থ ছিল যে সে হৃদয়-কুসুম বিকশিত-প্রায় হইতেছিল এমত সময়ে এক প্রচ্ছন্নদেশ হইতে বিদ্রূপ বাণ তৎপ্রতি বর্ষিত হইল। কার্ক হোয়াইট সেই যে ভগ্নহৃদয় এবং ভগ্নোদ্যম হইলেন আর তিনি উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়কমল, কোরকেই ভগ্নবৃন্ত হইয়া পড়িয়া গেল। লর্ড বাইরণও যখন একখানি ক্ষুদ্র কাব্য লইয়া প্রকাশ্যে উদিত হন, তখন সমালোচকগণ অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বাইরণকেও চিনিতে পারেন নাই। না পারিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বাইরণের মনে সকলপ্রকার বিপরীত দোষ গুণ একত্র মিলিয়াছিল। যে তেজ বাইরণের হৃদয়ে ছিল, তাহা সহসা নির্বিবার নহে। বাইরণ উঠিলেন, উঠিয়া তীব্রতর বাণে সমালোচকগণকে পরাস্ত করিলেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইল, বাইরণ মনুষ্যদ্বেষী হইলেন এবং তাঁহার উচ্চতর মানসিক শক্তিনিচয় এক ভিন্ন রসে বিষাক্ত হইয়া গেল। কিন্তু আর কিছুতেই চাপা রহিল না।

সমালোচনা কার্য্য নিরপেক্ষ ভাবে প্রচলিত হইলেও যে সমস্ত দোষ ঘটে এতক্ষণ তাহাই উল্লেখ করিলাম। কিন্তু সমালোচনা নিরপেক্ষ ভাবে সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। সমালোচকগণ প্রায়ই পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। পক্ষপাতী সমালোচনার যে কত দোষ তাহা বর্ণনাতীত। যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে সমালোচকের ভূষিত হওয়া আবশ্যক পোপ এবং আডিসন তাহা উল্লেখ করিয়াছেন *। কিন্তু কয়জন সমালোচককে সে সমস্ত গুণে ভূষিত দেখা যায়। সমালোচন কার্য্য যেরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা অনেকেরই জ্ঞান নাই, অথচ বলিতে গেলে, এমন লোক নাই যিনি সমালোচনার সাহসী না হন। বড় বড় লেখকের উপর সকলেই দুই এক কথা বলিতে চান। সকলেই এক একবার বিচারাসনে বসিয়া মনের অহঙ্কার পূর্ণ করিতে চান। বিদ্যা বুদ্ধি যেমন তেমন হউক, সমালোচন স্থলে দুই এক কথা বলিতে কেহই সঙ্কুচিত হয়েন না। কিন্তু সেই দুই এক কথায় যে কতদূর অপকার সাধিত হয় তাহা তাঁহারা বুঝেন না।

শুদ্ধ তর্ক এবং বিচারপূর্ণ প্রস্তাবেও সমালোচনা অনেক পণ্ডিতে সুসম্পন্ন

* Vide Spectator No. 291 and Pope's essay on criticism.

করিতে পারেন। কিন্তু যে সমস্ত প্রস্তাবের সমালোচনা লোকের রুচি, কবিত্বানুভবকতা এবং কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করে, তাহা পণ্ডিত কর্তৃক সুসম্পন্ন হওয়া বড় সুকঠিন বিষয়। তর্ক এবং বিচারের সঙ্গতি ও অসঙ্গতি অনেক লোকেই বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারেন। কিন্তু যাহার বিচারে বুদ্ধির কার্য্য অতি অল্প, তাহার বিচার করিতে সাধারণ জনগণ সমর্থ নহেন। সেক্সপিয়ার এবং মিল্টনের কবিত্ব লোকে বহুকাল বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহারা বহুকাল অনাদৃত হইয়াছিলেন। কোন নবীন লেখকের রচনা অথবা প্রস্তাব প্রথম প্রকাশিত হইলে অনেকেই তাহা অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দেন। লোকের সেই অবজ্ঞা ভাবের মধ্যে যতপ্রকার প্রচ্ছন্ন ভাব থাকে তাহার সকল প্রকাশিত হইলে সেই অবজ্ঞাকারিদিগের উপরেই অবজ্ঞা জন্মে। যাঁহারা সুখ্যাতি করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেক অসার লোক থাকেন। কেহ কেহ অখ্যাতি করা ভাল দেখায় না বলিয়া সুখ্যাতি করেন, কেহ কেহ বা অখ্যাতি করিবার বিচার শক্তি নাই বলিয়া সুখ্যাতি করেন। অনেকে বিদ্বেষী হইয়া হতশ্রদ্ধা করেন। সমালোচনার কার্য্য এই রূপেই সর্ব্বদা সম্পন্ন হয়। [illegible] ইতিহাস লিখিয়া [illegible] দেখাইলে সকলেই [illegible] কথা [illegible] লোকের

এই সমস্ত উক্তি শুনিয়া আমি মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিতাম না। "অনেকে আমার খাতিরে প্রশংসা করিতেন, অনেকে অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া বিস্তর দোষ বাহির করিতেন।" কবি টম্‌সনের বন্ধুগণও তাঁহার তরুণ বয়সের কবিতাবলির মধ্যে দোষ ভিন্ন আর কিছুই দেখেন নাই, অথচ এই কবিতাবলির মধ্যে তাঁহার উৎকৃষ্ট শীতঋতু বর্ণনও পরিদৃষ্ট হয়। সমালোচকগণ যখন আবার কোন নূতন বিষয় অথবা নূতন প্রণালী দেখেন, তখন তাঁহারা বিচার-মূলীয় সাদৃশ্যের অভাবে অথবা কুসংস্কার প্রভাবে এরূপ বর্দ্ধিত হইয়া যান, যে তাঁহারা ঠিক বিচার করিতে না পারিয়া সেই নূতন বিষয় অথবা প্রণালীর উপর কেবল গালি বর্ষিতে থাকেন। রেনল্‌ডস্ যখন ইতালীয় চিত্র-প্রণালীতে ব্যুৎপন্ন হইয়া গৃহে ফিরে আসিয়া সেই প্রণালী মত একখানি চিত্র আঁকিলেন তাঁহার পূর্ব্ব শিক্ষক হড্‌সন সেই চিত্রখানি দেখিয়া বলিলেন "রেনল্‌ডস্, তুমি পূর্ব্বে যখন ইংলণ্ডে ছিলে, তখন ত এতদপেক্ষা ভাল রূপে চিত্রিত করিতে পারিতে!" আর এক জন চিত্রকর যিনি নেলারের চিত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন তিনি ঐ ইংলণ্ডের র‍্যাফেলকে নিতান্ত অবজ্ঞাবাক্যে উক্তি করিয়াছিলেন। কেকনের দার্শনিক প্রস্তাব সকল বহুদিন লোকে বুঝিতে পারে নাই। তদীয় জীবিতকালে তদ্বিরচিত ইতিহাস এবং তাঁহার নানাবিষয়ক প্রবন্ধ

গুলিরই সমাদর হইয়াছিল। ধূমকেতু সম্বন্ধে কেপ্‌লার যখন তাঁহার প্রস্তাব সকল প্রথম প্রচারিত করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে গাঁজাখোর বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। কোপার্নিকস পণ্ডিতের এই প্রকার বিদ্রূপ ভয়ে, তাঁহার গ্রন্থাবলি প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া গোপন রাখিয়াছিলেন, কোন মতে প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। অধ্যাপক সিজেস্‌বেকের বিদ্রূপে লিনিয়স একদা উদ্ভিদ বিদ্যার শাস্ত্রালোচনা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যার পরমোন্নতিসাধক সুবিখ্যাত সিডিন্‌হাম কলেজে অধ্যাপকের পদ হইতে বহিষ্কৃত হন *।

ইতিহাসের সমালোচনা যে নিরপেক্ষ ভাবে সম্পন্ন হওয়া একেবারে অসম্ভব, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজি পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক প্রস্তাব পরিদৃষ্ট হয় নাই। হ্যালাম, তোমারও লেখনীতে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে!

অনেক সমালোচককে নিতান্ত উপহাস-প্রিয় বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহারা মনে করেন যেন হাস্য ও বিদ্রূপ না করিতে পারিলে সমালোচনকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। উপহাস-প্রিয়তা বিচারকের একটি দোষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, কিন্তু সাহিত্য-সংসারে সে নিয়ম খাটে না কেন আমরা বুঝিতে পারি না। যিনি নিতান্ত উপহাস-প্রিয় তিনি সকল প্রকার প্রসঙ্গ লইয়াই রহস্য করিয়া থাকেন। অতি গভীর প্রসঙ্গ হইতেও তিনি উপহাসের বিষয় খুঁজিয়া বাহির করেন। এবং যে স্থলে কোন দোষ নাই, সে স্থলেও উপহাস গুণে দোষ বলিয়া লোকের নিকট প্রতীয়মান করেন। এরূপ আমোদ নিতান্ত দোষার্হ বলিতে হইবে। সমালোচকের এরূপ দোষ থাকা নিতান্ত নিন্দনীয়। এপ্রকার সমালোচকেরা সর্ব্ববিধ গ্রন্থকারেরই মাথা খাইয়া বেড়ান। আজি কালি বঙ্গ দেশে এরূপ সমালোচকের অভাব নাই। আশ্চর্য্য এই, রঙ্গপ্রিয় পাঠকগণ ইহাদিগেরই স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া থাকেন।

এক্ষণে বোধ হয় অনেক দূর প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে প্রতিভার পথ প্রদর্শন কার্য্যে এবং গ্রন্থের বিচার কার্য্যে সমালোচনা কত শুভফল সমুৎপাদন করিয়াছে। নবীন লেখকের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়া ইহা সাহিত্যসংসারে বিলক্ষণ ক্ষতি করিতেছে। এমত কি, সমালোচনা যে কাব্যের প্রশংসা করে তাহারও সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয়। সে কাব্যের সৌন্দর্য্যের নবীনতা যায়। পাঠক পড়িতে পড়িতে কেবল সমালোচক-প্রদর্শিত সৌন্দর্য্য মাত্র উপলব্ধি করেন। সে সৌন্দর্য্যও একজন দেখাইয়া দিয়াছেন বলিয়া তাহার উপলব্ধিতে তত আনন্দ বোধ হয় না। সে সৌন্দর্য্য আর নূতন বোধ হয় না;

* For more insances, see Disraeli, liteary character chapter vi and vi 1

কবিত্বও পুরাতন বোধ হইলে তাহার আদর কমে। অনবরত নূতন সৌন্দর্য্য বাহির করা দুষ্কর হয়। কারণ সে কাব্যকে অন্য আলোকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিতে গেলেই সেই সমালোচন প্রোক্ত পুরাতন ভাব মনে আইসে। এই প্রশংসাবাদ আবার অধিকতর হইলে লোকের মনে বিপরীত ফল হয়। লোকে অতদূর প্রশংসা সহিতে পারে না। সুতরাং খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাব্যের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে যায়। ইহার ফল এই দাঁড়ায়, প্রশংসা করিয়া যাহার আদর বৃদ্ধি করিতে যাওয়া যায়, তাহার ক্রমশঃ পাকচক্রে অনাদর ঘটিয়া উঠে। এই প্রকারে অনেক অনেক উৎকৃষ্ট কবিও হতাদর হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের প্রতি লোকের ভক্তি কমিয়া যায়। কিন্তু যে সকল মহাকবিগণের আজিও সমালোচনা লিখিত হয় নাই তাঁহাদিগের প্রতি মানবের ভক্তি চিরকাল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাঁহারা আজিও সকলের মনে সমান পূজ্য হইয়া রহিয়াছেন। বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এই ভাগ্য। যে কাল হইতে আধুনিক সমালোচনা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিবে, সেই কাল হইতে তাঁহারা মানবের বিচারণীয় হইবেন, এক্ষণে তাঁহারা মানবের ভক্তিভাজন হইয়া রহিয়াছেন। বিচারণীয় হইলেই তাঁহাদিগের দোষ গুণ লইয়া নানা অখ্যাতি ও সুখ্যাতি প্রচারিত হইবে। তখন মানব আর তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবেন না, তাঁহাদিগের বিচারক হইয়া দাঁড়াইবেন। কতকগুলি লোক তাঁহাদিগের পক্ষপাতী হইবেন, আর কতকগুলি তাঁহাদিগের বিপক্ষে দাঁড়াইবেন। শিষ্যের পরিবর্ত্তে এখন মানবকুল সাহিত্যের বিচারক হইয়া আনন্দের বৃদ্ধি করিয়াছেন, কি এক্ষণে সেই সাহিত্যসুখের হ্রাস হইয়াছে তাহা অনায়াসে প্রতীত হইতেছে। বিচারকের পদে অভিষিক্ত হইয়া এক্ষণে মানবকুল অনেক সাহিত্যসুখ বিনষ্ট করিয়াছেন। প্রাচীন কালের মত গ্রন্থকারগণও এখন আর হৃদয় খুলিয়া অবারিতভাবে লিখিতে পারেন না। এখন তাঁহাদিগের লেখনী কাঁপিতে থাকে তাঁহারা একবার লিখিয়া সাতবার বিচার করিয়া দেখেন। এই বিচারে অনেক সরল ভাব ও সৌন্দর্য্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ভয়ে হৃদয়ের এখন সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হয় না। সুতরাং তাহার ফল স্বরূপ গ্রন্থ সকলও এখন তত উৎকৃষ্ট হইয়া উঠে না। কিন্তু প্রাচীনকালে যখন ঋষিগণের মনে এরূপ ভয়ের কিছুই ছিলনা, তখন তাঁহারা কেমন সরল অন্তরে হৃদয় খুলিয়া সুস্বর সঙ্গীতে গান গাহিয়া গিয়াছেন! তাঁহারা জানিতেন আমাদিগের এই গান সবাই ভক্তি সহকারে শুনিবেন। যাহাতে সকলের মনে ভক্তির উদয় হয় তখন তাঁহারা এরূপ প্রগাঢ়ভাবে সঙ্গীতের রচনা করিতেন। তাঁহারা জানিতেন, আমরা পৃথিবীর উপদেশক ও গুরু, পৃথিবীর বিচার-প্রার্থী, বাদী বা প্রতিবাদী নহি। তাঁহারা জানি-

তেন, আমাদিগের পক্ষ সমর্থনার্থ কোন সমালোচকের আবশ্যক হইবেনা। আমাদিগের বাক্য আপনার গুণ আপনি গাহিবে। ব্যাস ভাবিতেন, আমি কি রূপে বাল্মীকির মত লোকের ভক্তি-ভাজন হইব। লোকের মনে ভক্তি সঞ্চারের জন্য তাঁহারা ব্যগ্র হইতেন। এখন ইচ্ছা হয়, আবার সেই কাল আইসে যখন আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি সহকারে বটবৃক্ষমূলে কোন বাল্মীকির গান শুনিতে বসি; গান শুনিয়া মোহিত হই; এবং মোহিত হইয়া তাঁহাকে পূজা করিতে করিতে উঠিয়া আসি। রামচন্দ্র এই রূপে বার বৎসর, বনবাসের ক্লেশ হরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বনবাসও স্বর্গ-তুল্য বোধ হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ ঋষিগণের সহবাসে যে আনন্দভোগ করিতেন, অযোধ্যার স্বর্ণসিংহাসনেও তৎপরে সেরূপ সুখ আর ভোগ করিতে পারেন নাই।

শ্রীপূঃ—

মেলমালা বা দোষমালা।

অদ্য পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে রাঢীয় কুলীনগণের ছত্রিশ মেল লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের কৌতুকী পাঠকগণ ইহা দেখিয়া কত উপহাস ও কত খেদ করিবেন বলা যায় না। কিন্তু কি করি সামাজিক ইতিবৃত্তের মূলান্বেষণ জন্যই আমাদিগকে অলীক ও পরিহাস-জনক বাক্যকেও এখানে স্থান দিতে বাধ্য হইতে হইল। যেমন আকাশ মধ্যে সমস্ত বস্তু আশ্রয় পাইয়াছে, সেইরূপ ইতিবৃত্তের নিদান গুলি অলোকিক ও অদ্ভুত বর্ণনায় আচ্ছাদিত আছে। সুতরাং আমাদিগের ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নিতান্ত অল্প, তথাপি যতদূর সম্ভব ততদূর অলীক বিষয় পরিত্যাগ করিতে বিশেষ যত্ন করা যাইবে।

মেলবন্ধন দিন হইতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের একতা ভঙ্গ হইয়াছে, পরস্পর বিচ্ছেদ জন্মিয়াছে এবং পরস্পর পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইয়াছে। ইহাই রাঢ়ীয়গণের উৎসন্ন যাইবার একতম কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যদ্দ্বারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের এত দুর্গতি হইয়াছে তাহার মূলান্বেষণে অবশ্য লোকের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে বলিয়া এখানে উহা সবিস্তার বর্ণিত হইল।

দেবীবর ঘটক আপন প্রতিজ্ঞা অনুসারে রাঢ় বঙ্গে পর্য্যটন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টির নিকট সমস্তই দোষ-পরিপূর্ণ বোধ হইল। গুণের ভাগ প্রায় রহিত। তথাপি যাঁহাদিগের কিছু আছে বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল। তাঁহাদিগকে থাক্ হইতে পৃথক্ করিলেন। তাঁহারা কেবল থাক্ রূপে প্রতিষ্ঠাপ্ত হইলেন

তাহাদিগকে ছাটিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা দেবীবর ছাটা চক্রবর্ত্তি রূপে আখ্যা পাইলেন। এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে ইহাঁরা কেন চক্রবর্ত্তি উপাধি পাইলেন এবং তাহাই কেন বিশেষ দোষ-ব্যঞ্জক হইল। চক্র শব্দে চাকলা বুঝায়. ঋত্বিক শব্দে পুরোহিত বুঝায়। যে সকল ব্যক্তি চাকলা যাজন করিত তাহাদিগের নাম তাৎকালিক লোক দিগের নিকট চক্র ঋত্বিক হয়; ক্রমে ঋত্বিকের কলোপ পাইয়া চক্রঋত্তি হয় তৎপরে চক্রর্ত্তি হয় অধুনা চকত্তি হইয়াছে। যাঁহারা চাকলা যাজন ও শূদ্র যাজন করিতেন তাঁহাদিগেরই নাম তৎকালে চক্রর্ত্তি হয়। ব্রাহ্মণের পুরোহিত গণ ভট্টাচার্য্য আখ্যা ধারণ করিতেন। অধুনা ঐ সকল শূদ্রযাজী ও চাকলাযাজীগণ চক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণ করিয়াছেন। তৎকালে তাঁহারা চক্রবর্ত্তী বলাইতে পারিতেন না। চক্রবর্ত্তী শব্দটী সদাচারসম্পন্ন ও বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের এবং সার্ব্বভৌম নৃপতির উপাধি ছিল। সুতরাং উহা সামান্য লোকে গ্রহণের অধিকারী ছিলেন না।

দ্বিতীয়—

মহারাজ বল্লালের যজ্ঞে যেসকল দ্বিজগণ সুবর্ণ-নির্ম্মিত ধেনু গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা পতিত হয়েন। তাঁহাদিগের মধ্যে রাঢ়ীয় শ্রেণীর যে সকল ব্যক্তির নাম দেখা যায় তাঁহাদিগের সংখ্যা ২৫। এক্ষণে দেখা যাউক ঐ ২৫ ব্যক্তির মধ্যে কোন্ গোত্রের কত জন সুবর্ণ ধেনু গ্রহণ পুরঃসর পতিত হয়েন। যথা

পতিত ব্যক্তির নাম	সে ব্যক্তি যে গাঁই	সে ব্যক্তির গোত্র
১ শঙ্কর,	পীতমুণ্ডী।	কাশ্যপ
২ দিবাকর	গড়গড়ী।	শাণ্ডিল্য
৩ ডাউক	গুড়।	কাশ্যপ
৪ দোকড়ি	পিপলাই	বাৎস্য
৫ মার্ত্তণ্ড	বন্দ্য	শাণ্ডিল্য
৬ আনাগ্নি	বন্দ্য	শাণ্ডিল্য
৭ গণাগ্নি	বন্দ্য	শাণ্ডিল্য
৮ হাড়	বন্দ্য	শাণ্ডিল্য
৯ গোপী	বন্দ্য	শাণ্ডিল্য
১০ বিঠুর	বন্দ্য	শাণ্ডিল্য
১১ দেকড়ী	মাশ্চটক।	ঐ
১২ মধুসূদন	রয়ী॰	ভরদ্বাজ
১৩ যব	কুশারি	। শাণ্ডিল্য
১৪ নারায়ণ	কড়	। কাশ্যপ
১৫ দায়াবি	মহিন্তা	বাৎস্য
১৬ কেশব	মহিন্তা	বাৎস্য
১৭ শকুনি	চট্টো।	কাশ্যপ
১৮ নয়ারী	তৈলবাটী।	কাশ্যপ
১৯ বিশ্বেশ্বর	কুন্দ	সাবর্ণি
২০ মদন	ঘোষাল	বাৎস্য
২১ বিশ্বরূপ	ঘোষাল	বাৎস্য
২২ হাস্য	গাঙ্গুলী।	সাবর্ণি
২৩ গৌতম	পূতিতুণ্ড।	বাৎস্য
২৪ পরাশর	শিমলাই	কাশ্যপ
২৫ শঙ্কর	ডিংসাই	ভরদ্বাজ

ধেনুং স্বর্ণময়ীং কৃত্বা দদৌ বিপ্রায় ধার্ম্মিকঃ।
সাচ স্বর্ণময়ী ধেনুশ্ছেদনে প্রজগৌ মুহুঃ॥

ছিন্না বহিষ্কৃতা রাজ্ঞা স্বর্ণনাং বণিকো ভবৎ বিপ্রা: প্রতিগ্রহাজ্জাতাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ।

কুলার্ণব।

শঙ্করঃ পীতমুণ্ডীচ গড়োপিচ দিবাকর ;।
গুড়ো ডাউকনামাচ দোকড়িশ্চৈব পিপ্‌পলী॥
বন্দ্যোমার্ত্তণ্ডনামাচ তপোনিষ্ঠঃ দৃঢ়ব্রত ;
আনায়িশ্চ গণায়িশ্চ হাড়োগোপীচ বন্দ্যজা॥
মাধো দোকড়িনামাচ রায়ীচ মধুসূদন।
কুশিকো গবন্নামাচ হাড়ো নারায়ণোপিচ।
মহিন্তা দ্বিবিধনামা দায়ারিশ্চৈব কেশবঃ॥
চট্টং শকুনিনামাচ তৈলবাটী নয়ারিকঃ।
কুন্দো বিশ্বেশ্বরো জ্ঞেয়োবন্দ্যজঃ বিঠুসংজ্ঞকঃ।
ঘোষজো ভ্রাতরাবেতৌ মদনবিশ্বরূপকৌ।
গাঙ্গোদ্ভবোহাসানামাপূতি-গৌতম-সজ্ঞকঃ॥
অমী কুলোদ্ভবাশ্চৈব গোদানং জগৃহু দ্বিজাঃ
তেষাং সম্বন্ধমাত্রেণ পঙ্কে গৌরিব সীদতি।
সম্বন্ধে ভোজনে চৈব দানে যজ্ঞে তথৈবচ।
বিবর্জিঃ শ্রাদ্ধকালেচ বর্জ্যাএতেপুনঃ পুনঃ॥

কুলশাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে দেখিতে পাই কাশ্যপ গোত্রে শঙ্কর পীতমুণ্ডী, ডাউকগুড়, নারায়ণ হড়, নয়াবী তৈলবাটী ও পরাশর শিমলাই এই ছয়জন; শাণ্ডিল্য গোত্রে দিবাকর গড়গড়ী, বন্দ্য-বংশ সম্ভূত মার্ত্তণ্ড আনায়ি, গণায়ি হাড়, গোপী বিঠুর কুশারি বব এই অষ্টজন; ভরদ্বাজ গোত্রে মধুসূদন রায়ি ও শঙ্কর ডিংসাই এই দুইজন, বাৎস্য গোত্রে দোকড়ী পিপ্‌লাই, ও কেশব ও দায়ারি মহিন্তা, মদন ও বিশ্বরূপ ঘোষাল এবং গৌতম পীতমুণ্ডী এই ছয়জন; সাবর্ণি গোত্রে বিশ্বেশ্বর কুন্দ, ও হাসা গাঙ্গুলী এই দুইজন সর্ব্ব সমেত ২৪ ব্যক্তি। যথা—

কাশ্যপে ৬ ঘর		এই সকল ঘর অগ্রদানী নামে খ্যাত হয় এবং তাহাদিগের সহিত শুদ্ধ সত্ব ব্রাহ্মণ-
শাণ্ডিল্যে ৯ ঘর		
ভরদ্বাজে ২ ঘর		
বাৎস্যে ৬ ঘর		
সাবর্ণিগোত্রে ২ ঘর		

গণের আদান প্রদান রহিত হয়। তৎকালে সর্ব্বথা ইহঁাদিগের সংস্রব নিন্দনীয় বলিয়া ইহঁারা সমাজের নিকট নিতান্ত হেয় বলিয়া পরিচিত হয়েন। তদবধি ভোজনাদ্য নিমন্ত্রণ ও আমন্ত্রণাদি সর্ব্ববিষয়ে ইহঁারা সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। এই সকল পতিত ব্যক্তি দিগের সহিত যাঁহারা সংস্রব করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের কুল-গৌরব নষ্ট হয়। বশিষ্ঠ গণায়ির কন্যা বিবাহ করেন। ঠোঠ শকুনিসুতার পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন। দায়িক হাড়ের পুত্রীকে সহধর্ম্মিণী রূপে স্বীকার করেন। কুবের ও চক্রপাণি হাস্যের কন্যাদ্বয়কে পত্নীরূপে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এইরূপে কুলভূষণ বিঠুর-নন্দিনীকে গ্রহণ করিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধে কুলচ্যুত হয়েন। এবং উত্তরকালে আদিম-বংশজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন।

আদিতে এই ছয় ঘর বংশজ হয়েন। যথা

গণো কন্যা বশিষ্ঠেন ঠোঠেন শকুনিসুতা।
হাড়োকন্যা দায়িকেন কুবেরো হাস্যজাপতিঃ॥

চক্রপাণিনাম্নি কন্যা গৃহীতা ধনলোভতঃ।
বিঠুসুতাপতিভূ্ত্বা চট্টজঃ কুলভূষণঃ॥
প্রতিগ্রহসুতোদ্বাহাৎ ষড়েতে বংশজাস্মৃতা

কুলরমা।

ইঁহাদিগেরই অধস্তনবংশীয়গণ অগ্রদানী বংশজনামে খ্যাত হইলেন। এবং সাধু-বিগর্হিত দান গ্রহণ দ্বারা অদ্যাবধি অন্নাচ্ছাদন সংগ্রহ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

পূর্ব্বখণ্ডে বলাগিয়াছে যে দেবীবরের সময়ে প্রায় অধিকাংশ কুলীনেরই নবগুণের অভাব হয়। শ্রোত্রিয়দিগের মধ্যেও অনেকে সদাচার-পরিভ্রষ্ট হয়েন। এমন কি কতিপয় শ্রোত্রিয় ব্যতীত অনেকেই কন্যাবিক্রয় আরম্ভ করেন। তাহাতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের সমাজের মর্ম্মচ্ছেদ হয়। তদবধিই কুলীনগণের সর্ব্বদ্বারী বিবাহ লোপ হয়, তাহাতেই কুলীনগণের একমেল হইতে মেলান্তরে গমন পূর্ব্বক বিবাহ রহিত হয়। ইহাই কুলীনকন্যাগণের অদৃষ্টে আগুণ লাগাইয়াছে। ইহাই শ্রোত্রিয়গণের পুরুষের বিবাহের নানা বিঘ্ন জন্মাইয়াদিয়াছে। তদবধিই শ্রোত্রিয়গণের বংশ ধ্বংশ হইতেছে। এবং বংশজগণ ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতেছেন।

একটী সমাজে দুইটী দল হইলে সমাজের বল হ্রাস হয়। কিন্তু রাঢ়ীয় কুলীনদিগের কি দুর্ভাগ্য তাঁহাদিগের এক সর্ব্বদ্বারিরূপ কুলসমাজকে দেবীবর ৩৬ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কন্যাগণকে চিরদিনের জন্য দুঃখরূপ জলধিজলে বিসর্জ্জন দিয়াছেন কুলশাস্ত্র-বিশারদ কুলীন-প্রবর চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কুলচন্দ্রিকার যে বাঙ্গালা পদ্য করিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে কিরূপে কুলীনের কুলধ্বংশ হইল। যথা—

দেবীবর যবে কুলে খাটাইল পাল্টি।
প্রকৃতি হইল ভারী লাউপড়ে উলটি॥ ১
অনিষ্ঠার ট্যাকে গিয়া কেটে যায় গুণটি।
স্বজনায় ঠেক খায় ভেঙ্গে যায় ঢুমুটি॥ ২॥
আনায়ে নায় দেয় ফুলিয়ার হালটি।
আছিল বাপের পুণ্য শুধেগেলে চক্রটি॥
ফুলিয়া খড়দা আর বল্লভীর মুড়াটি।
বাঁধাছিল তাই জালে সর্ব্বানন্দে গুঁড়াটি॥
চাঁদাই মাধাই বীজ তিন বন্দ্যা ঘটিটি।
ডুবু ডুবু করে তার তিনে তিনটি॥ ৫॥
সুরানন্দ সতানন্দ শুভরাজ খানিটী।
দৃষ্ট নাহি হয় পারি দেহাটার দেহটি॥ ৬॥
শ্রীয়াসহ রঙ্গ আর বৰ্দ্ধিনীর কায়াটি
ঘোষ বালি চন্দপাতি রায় মেল সুঙোটি॥৭।
মালাধর বিদ্যাধর ধরাধর ধরাটি।
গোপালের চলেপাছে বলে আছে পটীটি॥৮।
ভৈরবের বরনাই রাঘবের চটিটি।
দেখিতে দেখিতে ডুবে আচম্বিতা ছায়াটি॥৯।
হরিমজুমদার ছিন্ন বিভোচট্টোচাটুতি।
দেখিতে দেখিতে ভাসে দুই কুলে গাঁতিটি
বাঙ্গাল আচার্য্য আর প্রমোদের পাখীটি।
তির্য্যক গমন হোলো পণ্ডিতের গতিটি ॥১১.

কাকুসহ কোথায় গেল দশরথ ঘটিটি।
ভাসিতে ভাসিতে কুলে ভেসে গেল দেইটি॥
নড়িয়া বড়িয়া যেতে ভেঙ্গে গেল মালাটী।
মেল বন্ধ পরে কুলে এই হলো কুলটি॥১৩॥
নালা খালা ভেঙ্গে এবে হয়ে এক হাটিটি।
খড়দহে পলো দেহ ফুলিযার পালিটি॥১৪॥
চক্রবর্ত্তী অংশবলে স্থির কর মতিটি।
দেবীর নংহিক দোষ স্রোতের এই গতিটী॥

ছত্রিশ মেলের মধ্যে ফুলিয়া ও খড়দহের ভাগে অধিক লোক। সেই হেতু তাঁহাদিগের প্রতাপ অধিক। এবং কুলশাস্ত্র-বিশারদ গণ ঐ দুই মেলকে অগ্রগণ্য করিয়া অন্যান্য মেলের বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং আমরা পূর্ব্বাচার্য্যদিগের পথ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহি। যথা—

খড়দাফুলিয়ামেলযুগলং।
সংপ্রতি যাতং ফুলিয়া বিমলং॥
আদৌ খড়দা ফুলিয়া শেষঃ।
কথয়তি সকলং ক্রমশঃ পূজ্যা॥
সুরবন্দ্যাজঃ পুত্তিণ্ডদয়ৌ।
অনয়োঃ করণাদ্দ্বাবত্তিসদয়ৌ॥
যৎসমতায়ৈ কুরুতে যত্নং।
কুলচূড়ামণি পণ্ডিতরত্নং।
কিমধিকপরং সহচরিমিশ্রঃ।
পূর্ব্বং দামোদরকৃতকুশ্রঃ ইত্যাদি।

আমরা এক্ষণে মেলমালার কারিকা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের মনস্তুষ্টি জন্মাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। যথা

খড়দা ফুলিয়া কুল মেল অন্যান্য সমতুল
কাছে তার বল্লভ সর্ব্বানন্দ।
পণ্ডিতরত্ন বাঙ্গাল পাছে, আঠাহরিমিশ্র কাছে
হড় সুরাই এক কি নিবন্ধ॥
ছায়া বিজয়বাণ লিখি, আচার্য্য দেখি শেখর
বাঘাই মধ্য মেলে হয় প্রচার।
নদীকুল' কান্দাকুল, চাঁদাই মাধাই মূল,
তবে বিদ্যাধরী মেল সার।
আর যত মেলি বলি ছাত্রবৃন্দে গালাগালি
কৃষ্ণদাস উত্তম মধ্যম।
আর যত মেল কই পারি আদি হৈ
তবে সবার করিব নিয়ম॥
ছত্রিশ মেলের ন্যায়, সকল ঘটকে গায়,
ইহা বৈ মেল নাহি আর।
যে যার খাদক কুল, সে তার সমান মূল,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার॥
লোকে বলে ধন্য ধন্য, খড়দাফুলে বড় পুণ্য
খড়দা সর্ব্বানন্দ একদাপা।
আঠাকাশী দুই ভাই, পণ্ডিত লাদিনেঠাই
বঙ্গ পাইল যে উধো তাপ।
রজনী সুখ নালিয়া, আর বলি খালকুলিয়া
মিশ্রহরি বিজয় পণ্ডিত।
বৈদ্যসথ হরিহর, আচার্য্য শেখর পর
সুরাই তুল্য কাঠাবাণ॥

কোন কোন স্থলে বিভিন্ন মেলেও পরস্পর আদান প্রদান চলে, তদ্দ্বারা সেই দুই মেলের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। সে সকল মেলে পরস্পর আদান প্রদান আছে, তাহাদিগের ঘরে অধিকবয়স্কা অনূঢ়া কন্যা প্রায়ই হয় নাই বা অপাত্রে অধিক অল্পবয়স্কা কন্যা পতিত হয় নাই। সেই সকল মেল অধুনা সমান সমান মর্য্যাদাপন্ন। যথা

চাঁদাই মাধাই কুলে ঠাকুর।
কুলাশ্রমী বিদ্যাধর পাঠক ॥
পারিমালাধর শ্রীরঙ্গ ভট্ট।
প্রমোদন কালী কাকুস্থ-চট্ট ॥
আচম্বিতা চক্রপাণি।
মেল করিতে টানাটানি ॥
চন্দ্রপতি শত্তানন্দ থানি।
ছায়া নরেন্দ্র তবে গণি ॥
দাশরথি ঘটক রায়।
দুই মেল পাছে ধায় ॥
রাঘব ঘোষাল কুলে লাজ।
সৌবী ধরাধর একই কাজ ॥
সুঙোসর্ব্বানন্দ কুলে ভাল।
যায় পোবাণী তশানানামানি ॥
দশরথ ঘটক তবে জানি।
ঠেক ঠোক মিছে মানি ॥
রবি কর সর্ব্বানন্দ মধ্যবর্ত্তী।
বিজয় চাঁদাই চৈবৃত্তি ॥
সুরাই ছায়া সমান বস্তু।
নামদ্বয়ে পরমানন্দী ॥

দেশভেদ।

রাঢে সুরাই বঙ্গে ছায়া সঁথো পনিয়া চণ্ডীবরী। ঠেকা থাল কুলিয়া দেহাটী এই ষট্ ত্রিংশৎ মেলি।

ফুলিয়া মেলের বিষয়ও উৎপত্তি প্রকরণ।

নাধাস্থানবাসী বন্দ্যোপাধ্যায়গণ আদিবংশজ ছিলেন। গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পিতা ঐ নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের কন্যা বিবাহ করেন। তদ্দ্বারা তাঁহার কুলচ্যুতি হয় ঘটকদিগের অনুগ্রহে নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়গণ মাশ্চটক নামে শ্রোত্রিয় সংজ্ঞা পাইলেন। তাহাতেই মনোহরের কুল রক্ষা হইল। কিন্তু কুলক্ষয় হইতে পরিত্রাণ পাইলেন বটে কিন্তু একটু কলঙ্ক থাকিল। সে মালিন্যের নাম নাধাদোষ। ১

শ্রীনাথ চাটুতীর দুইটী অদত্তা কন্যা ছিল। ধাঁধা খালে জল আনিবার সময় ঝড় বৃষ্টি হেতু হাঁসাই খানদার নামক মুসলমানের আশ্রয় গ্রহণ হেতু বিপক্ষেরা ঐ দুই কন্যার হাঁসাই খানদারের দ্বারা জাতি পাতের অপবাদ দেন। তদবধি শ্রীনাথ চাটুতীর কুলে ধাঁধা নামক যবনাস্ত গালি প্রচার হয়। এই দুইটী কন্যার একটী কংশারি তনয় পরমানন্দ পূতিতুণ্ড, আর এক কন্যা গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন। এই গঙ্গাধরের সহিত নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলীর আদান প্রদান হয়। নীলকণ্ঠের সহিত আদান প্রদান দ্বারা গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ও যবন দোষে দূষিত হয়েন। ইহার নাম ধন্দ দোষ। ২ *

বারুইহাটী গ্রামে ভোজন করিলে ব্রাহ্মণের জাতিভংশ ঘটিত। কাঁচনার

* অনূঢ়া শ্রীনাথসুতা ধন্দঘাটস্থলে গতা।
হাঁসাই খানদারেণ যবনেন বলাৎকৃতা ॥
ধন্দস্থানগতা কন্যা শ্রীনাথচট্টজাত্মজা।
যবনেনচ সংস্পৃষ্টা সোঢ়া কংশসুতেন বৈ ॥
নাথাই চট্টের কন্যা হাঁসাই খানদারে।
সেই কন্যা বিভাকরে বন্দ্যগঙ্গাধরে ॥
মেলমালা।

মুখটী অর্জ্জুন মিশ্র ঐ গ্রামে ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহিত আদান প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার সহিত আবার গঙ্গানন্দ ভটাচার্য্য (মুখো) আদান প্রদান করেন। তদ্দ্বারা তিনিও ধন্ধ দোষ প্রাপ্ত হয়েন।

গঙ্গানন্দ ভ্রাতপুত্র শিবাচার্য্য মলুক জুড়ী কন্যা বিবাহ করিয়া কুলভ্রষ্ট হয়েন ও সপ্তশতীভাবাপন্ন হয়েন। পরে শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করেন। ইহার নাম মলুকজুড়ী দোষ। ৩

ফুলিয়া মেল।

মেলমালার কারিকা যথা—

পঞ্চগুণ সিন্ধুপুন, ইন্দু তাহে ধরি।
মেলকুল তারগুন নিবেদন করি॥
যথাযার স্থিতিতার দোষ বলি পিছে।
ফুল্লমেল তাহেশেল ধন্ধ বলি আছে॥
হেতু তার শুনসার ধন্যের সন্তুতি।
ব্যাসবংশ গরিষ্ঠাংশ শ্রীনাথ চাটুতি॥
তার সুতা রূপযুতা উর্ব্বশীর প্রায়।
যত সখী সবে ডাকি স্নান হেতু যায়॥
ভৃগুবার তাহে আর দশদণ্ডকালে।
সখী সঙ্গে নানারঙ্গে যায় ধাঁধাখালে॥
ধাঁধাস্থলে পাইয়া স্নান করে সখীগণে।
তাহে হেন কাল ঘনো উদয় গগণে॥
বিন্দুপাত তারসাত পঞ্চলাসঞ্চারি।
কাদম্বিনী করে ধনি শুনি চমকারি॥
বৈশাখেতে পশ্চিমেতে ঝড়ের আলয়।
ঝড় জোর হইল ঘোর হইল প্রলয়॥
উড়ে পাংশু সহস্রাংশু ঢাকিল সত্বরে।
ঘোরদায় আঁখি তায় প্রকাশিতে নারে॥
অন্ধকার হইল সার সকল ভুবন।
শীলাঘাত বজ্রপাত মরে কতজন॥
কত কত শত শত ভাঙ্গিল ভূধর।
বৃহদ্বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ভাঙ্গে কত ঘর॥
হুড় হুড় ছুড় ছুড় ঘোর শব্দ তায়।
তাহে কত গর্ভপাত শিশু মূর্চ্ছা যায়॥
ত্বরা করি যত নারী যায় নিজালয়।
এই ক্রমে পথভ্রমে চট্টসুতা রয়॥
তদা আশা করি বাসা হাঁসাইথানদার।
ঘাটে কর সাধে ডরনাতিক কাতার॥
হাঁসানাম তার ধাম নিকটে পাইল।
হেনকালে সেইস্থানে চট্টসুতা গেল॥
বাটী পরি বাতাধরি ছিল ক্ষণ কাল।
সেই হতে চট্টসুতে ঘটিল জঞ্জাল॥
পুনর্ব্বার গৃহে তার চট্টসুতা যায়।
ব্যাজদেখি যত সখী কাব্য কথাকয়॥
আইলা আইস বৈস বৈস বুঝিলাম ঐ।
ছল করি থানাদারি ভেটা আইলা সৈ॥
তাহা শুনি কানাকাণি বিপক্ষেতে করে।
এদেশ ওদেশ অন্যদেশেতে সঞ্চরে॥
সেইহতে বিপক্ষেতে ধাধা ধাঁধা কয়।
কিন্তুজানি মিশ্রমানি পরমার্থ নয়॥
মিথ্যাবলি যদি গালি মহন্তের হয়।
মহিমারহানি তায় জানহ নিশ্চয়॥
সেই হেতু চট্টনাথ দোষী ধন্দদোষে।
বসিভাবে কিবা হবে কেহ না জিজ্ঞাসে॥
তবে ধীর করে স্থির করিয়া সন্ধান।
কংসারিকে কন্যাদিকে চতুর্ভুজে জান॥
সহোদর পুত্রবর দিলা পৃথিরাজ।
চট্ট যেহে কন্যাদিকে করে নিজ কাজ॥

রণ্ড পায় রঙ্গতায় পঞ্জগোপী হেতু।
বড় ধন্দ সঙ্গ হইল চট্টনাথু॥
কংসারি করিল পরেতে ধনো।
বিশ গঙ্গার সাগরে গণো॥
পরেতে করিল বৈরবংশ *।
পিণ্ড যে খাইল হইল ধংশ॥
† নারায়ণ তার ভাজন সুত।
করয়ে বসতি সহিত সুখ॥

শ্রীনাথ চাটুতির কন্যার বৈবাহিক কার্য্য সমাধা হইলে মুখকুলের গঙ্গানন্দ ভটাচার্য্য, অবসথী চট্টোকুলের গঙ্গানন্দ চাটুতি, সাগরদিয়া গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলী, কংসারি-তনয় পরমানন্দ পূতিতুণ্ডর ও কাচনার মুখটী অর্জ্জুন মিশ্র এই কয়েকজন যূথবদ্ধ হয়েন। ইহাঁরা দলবদ্ধ হইলে যজুর্ব্বেদী মধুচট্টোপাধ্যায় চৈতল উদয় কুলরব, কাঁটদিয়া বৈদ্যনাথ, শ্রীনাথ, বাসু, মাধব ও বনমালী প্রভৃতির সহিত গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের যোগ হয়। মুখকুল সকল কুলের প্রকৃতি। অন্যগুলি মুখকুলের পাল্টী। সুতরাং সমুদায় দোষ গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের স্কন্ধে বিক্ষিপ্ত হয়। গঙ্গানন্দের দোষ হওয়াতে অন্যান্য পাল্টী প্রকৃতির কেহই এদোষ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। যথা

অবসথী পরে করেন গাঙ্গ।
গাঙ্গ করি সাগর সঙ্গে॥
সাগর করিয়া পাইলে নীলে।
সে হেতু মলিন হৈলা কুলে॥
তবে শ্রীনাথ চট্টরাজ।
জ্যেষ্ঠা সুতা দিয়া করিলা কাজ॥
ধাঁধা কলঙ্কিনী তনয়া ঘরে।
গোপীনাথ কবি গঙ্গাবরে॥
তাহার তনয় গঙ্গাদাস।
লইল নীলকণ্ঠে বাস॥
সে হেতু নীল হৈল ধন্ধ।
তাহাতে মজিল গঙ্গানন্দ॥
যজুর্ব্বেদী মধুতনয়াপতি।
হৈয়া মুখ করে ধন্ধে গতি॥
আছে তাতে উদয় চট্ট।
ফুল্ল চৌধুরী† হইল ভট্ট॥
পরে মুখবরে করিল কার্য্য।
লোহজ নামাই মিত্তর রাজ্য॥
স্বীয় মাতামহ কণ্টক ঘর।
সাত শত শিব তেঁই সে রথ॥
কাছা ধরি ফিরে উদয় চট্টো।
তেঁই ভাল জিয়ে ফুলেতে ভট্ট॥
পূর্ব্বেতে আছিল পৌতৃক নাধা।
গাঙ্গ হেতু পাইল ধাঁধা॥

* বৈর—সর্ব্ব বারি সময়। বংম বল্লভাচার্য্য। পিণ্ডদোষ বল্লভীমেলে দেখ।

† নারায়ণ—পূতিনারায়ণ।

আকাডাঙ্গানিবাসী কবিকুল—চূড়ামণি রামহরি ন্যায়ালঙ্কারকৃত মেলিমালা।

† চৌধুরী-চতুর্ধুরী-এখানে বাৎস্য, সাবর্ণি কাশ্যপ ও শাণ্ডিল্য এই চারি ঘরের ভার গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ এই চারি ঘরের কয়েক ব্যক্তিকে নিজের দলে আনেন। তদনুসারে গঙ্গানন্দ ভটাচার্য্যই শ্রেষ্ঠ হয়েন সুতরাং তাঁহার উপাধি চৌধুরী হওয়া অসঙ্গত হয় না।

বৈদ্যনাথ হেতু বারুইহাটী।
পাইয়া ভট্ট কুলেতে ঘাটী ॥

বারুইহাটী দোষটী প্রথমে কাঁচনার মুখটী অর্জ্জুন মিশ্রকে স্পর্শ করে। তৎসংসর্গ হেতু তদীয় পুত্র বাণে ঐ দোষ স্পর্শাক্রান্ত রোগের ন্যায় সংস্পৃষ্ট হয়। ক্রমে ঐ দোষ বৈবাহিক সম্বন্ধে সাগর দিয়া বন্দ্যকুলে প্রবেশ করে। তথায় লব্ধাধিকার হইয়া খনিয়ার চাটুতি কুলে ভাসমান হয়। তদনন্তর পূতিতুণ্ড পরমানন্দের কুলে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপে বাঙ্গালপাশী মেলেও তাহার গতি হয়। এই দোষ অতি দ্রুতপদে অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টকে আক্রমণ করে। তথা হইতে কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটীদিগকে আশ্রয় করে। তৎপরে গয়ঘড়ী হিরণ্যবন্দ্যো অনন্ত বন্দ্যো প্রভৃতিতে বিশ্রাম সুখলাভ করিয়া কিছুকাল পরে গঙ্গানন্দ ভাতৃপুত্র শিবাচার্য্যের কুলে পদার্পণ করে। যথা

বারুইহাটী মুখ অর্জ্জুনে ছিল।
সুতরাং সুতবাণেতে আইল ॥
তাহার সে দোষ সাগরে আসে।
পরে খনিয়াতে ভাষে ॥
পরেতে পূতি পাইলা তায়।
শেষেতে অন্যথনিয়া পায ॥
পরেতে কাঞ্জিলালেতে আসি।
শেষেতে পাইল বঙ্গপাশী ॥
পরে অবসথী পাইলা গিয়া।
সেহেতু পাইলা কণ্টক দিয়া ॥
ভট্টকরি তাব সুতেব সুত।
কিন্তু জানিয়া কুল্ল যথ ॥
হিরণ্য কারণ কেহবে যে বলে।
তাহার কারণ বলিব কলে ॥
বজ্রাজন্নাথ শ্রীবর আগে।
সুন্দর প্রভৃতি মুখ যে যোগে ॥
আর যত বলি সে পরিপাটী।
নাথাই করিয়া বারুইহাটী ॥
আগেতে শ্রীনা মিতের জান।
বারুই হাটীর বিগ্না সে মান ॥
আনাই গয়ঘড় তাহাতে আসি।
কেহ কেহ তাহে সাগরে ভাসি ॥
জগাই সুসেন-তনয় যত।
সকলে হইলভট্ট গত ॥
ফুলিয়া মেলেতে হইল কত।
কলঙ্ক হইল চাঁদের মত ॥

এখানে কুল-চন্দ্রিকা-কার কহেন বারুইহাটী দোষটী সাগরদিয়ার সংস্রব হেতু মার্জ্জিত হয়। ঐ দোষ মার্জ্জন সময়ে নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিবর্গ সংস্পৃষ্ট হয়েন। যথা কাচনার মুখটী দ্যাকর-সন্তান সারঙ্গ, তৎসুত বিজ (বিজয), বিজয়েব সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে চংমার্কণ্ডেয়, চট্টবিশো, কুন্দউধবং গয়ঘড়ী, শ্রীপতি, অর্জ্জুন মিশ্র, চট্ট নিত্যানন্দ, বন্দ্য শ্রীমান্ প্রভৃতির যোগে সাগর সম্পর্কে বারুইহাটী মার্জ্জিত হয়। * যথা *

* মুংকাচনাদ্যাকরসুতসারঙ্গস্তৎসুতো বিজো অস্যার্ত্তি চংমার্কণ্ডেয় চট্টো বিশো কুন্দউধো বংশশ্রীপতিস্তৎসুত অর্জ্জুনমিশ্রঃ অস্যার্ত্তি শ্চট্ট নিত্যানন্দঃ লভ্যো, বন্দ্যঃ শ্রীমান্ তৎসুতো বাণেশ্বরঃ বটকঃ অস্যার্ত্তিঃ বংসাগরঃ ধ্রুবানন্দমিশ্রঃ (গ্রন্থকাবঃ) সাগরসম্পর্কাৎ মার্জ্জনা। (মিশ্রগ্রন্থঃ।

এক্ষণে আমরা গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের প্রকরণ আরম্ভ করিলাম। ইহাঁর পালটী ও প্রকৃতি দেখিলে গঙ্গানন্দ বংশের কুল পবিত্রাক্ত হওয়া যাইতে পারে। আনু-সঙ্গিক প্রক্রম অনুসারে অনাকুলেও অধিকার হইবার সম্ভব।

মুংফুলিয়া গঙ্গানন্দ প্রমুখ রামাচার্য্য সুত রাঘবেন্দ্র গোষ্ঠী।

(২৪) গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য।

(২৫) রামাচার্য্য। বাসু মথুরেশ। বাসু ও মথুরেশ নিঃসন্তান।

ইহাঁর পাল্টী আর্ত্তিসাং যদু ও কেশব, আনাই বন্দ্যো লভ্য ভুবন চট্টো ও লক্ষ্মী পতি ও লভ্য।

(২৬) রাঘবেন্দ্র কাশীশ্বর গোপাল বিশ্বেশ্বর গোপীনাথ পার্ব্বতী।

(২৭) যাদবেন্দ্র +নীলকণ্ঠ। মহাদেব (হরি ষষ্ঠীদাস নীলকণ্ঠ কর্ত্তৃক * লভ্য।
শ্রীকণ্ঠ রমাকান্ত * বন্দ্যো যাহার তুল্য)

+ যাদবেন্দ্র নবদ্বীপাধিপতি গোবিন্দ দেবের কন্যা বিবাহ করিয়া কেশরকুনী ভাব প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে গোঘাটা পাটিকা বাড়ীতে ভঙ্গ হয়েন। তদ্ধেতু সারাবলী গ্রন্থে ইহাঁর বিষয় সেই খানেই সমাপ্ত হয়। শ্রীকণ্ঠ ও মহাদেব অনপত্যাবস্থায় লোকান্তর প্রাপ্ত হয়েন।

যথা রাঘবেন্দ্রসুত কুশর-ভূষিত যাদবেন্দ্রকুলবরে।
* রূপগুণযুতা ষষ্ঠীদাসসুতা বলাৎকার করি হরে॥
* গোপীনাথসুত কৃষ্ণগুণযুত সেই ষষ্ঠীদাস লয়া।
অপর ঠাকুর নীলকণ্ঠবর কুলকরে যোগদিয়া॥
তাহার তনয় বিষ্ণুনাম হয় বিষ্ণু সমালয়ে কুলে।
মার্জ্জিত কুলায় সাগর জয়ী হলো পুণ্য বলে॥

গোবিন্দ দেবের সন্তন্তিবর্গ দিগম্বরপুর ও গোটপাড়ায় আছেন।

(২৮) গঙ্গাধর রঘুনাথ শ্রীধর বিষ্ণু রতি রামেশ্বর রাধাকান্ত

যোগঙ্গানন্দভট্টঃ ফুলকুলমিহিরঃ ফুলমেলৈকহেতুঃ
সো হয়ং গঙ্গাধরোভূন্নিজকুলগুরুতা মেধিতঃ ফুলচূড়ঃ।
যো হভূৎ কৈলাসবাসী ফুলকুলবিকাশী কাশীখণ্ডপ্রকাশী।
সো হয়ং গঙ্গাধরাখ্যো মুখকুলতিলকঃ সর্ব্বলোকপ্রকাশী॥

রাধাকান্ত নবদ্বীপাধিপতি কর্ত্তৃক কেশরকুনীভাব প্রাপ্ত হয়েন। রঘুদেব কাশ্যপকাঞ্জিকা দোষাশ্রিত হন। শ্রীধর উভয় দোষের সন্ধিস্থলে ছিলেন। কোন পুস্তকে নীলকণ্ঠ ঠাকুরের মুকুন্দ নামে এক পুত্রের নাম দেখা যায়। ইনি এবং বিষ্ণু এই দুইজন ও সন্ধিস্থলে ছিলেন। যথা—

কেশরেচ গতো রাধা রঘুঃ কাশ্যপকাঞ্জিকঃ।
শ্রীধরশ্চ গতঃ সন্ধৌ বিষ্ণো র্নাবায়ণো পিচ ॥

সারাবলী (কৃষ্ণনগরের পুস্তক)

নীলকণ্ঠ প্রমুখ গঙ্গাধর (২৮) বংশ গৌরীচরণ

(২৯) রামদেব রূপনারায়ণ গোপীরমণ জীবন রামভদ্র রামনারায়ণ রমাকান্ত

গোপীরমণের সহিত রামদেবের কুল

(৩০) গোকুল প্রাণ রাম রঘু গৌরী কৃষ্ণ শঙ্কর আত্মারাম

গয়ঘড়ী ধনিরাম বন্দ্যো গৌরীচরণের লভ্য *

(৩১) রুদ্র হরেকৃষ্ণ রামকিশোর কৃষ্ণচন্দ্র রামকৃষ্ণ সীতারাম

মুংফুং গঙ্গাধর ঠাকুর প্রমুখ গোপীরমণসুত রামশঙ্করস্য মেল ফলিয়া।

৩০ রামশঙ্কর তৎপুত্র শ্যামসুন্দর (৩১)।

(৩১) যদুচন্দ্র রামজয় উদয়চন্দ্র রামতনু জগন্নাথ †রামচন্দ্র রাধামোহন আনন্দ।

(২৯) রামভদ্র বংশ (রুদ্ররামের সহিত পাললটী) শিবরাম বন্দ্যো লভ্যো।

(৩০) হরিদেব জয়দেব শুকদেব বাসুদেব চন্দ্রশেখর (বিদ্যালঙ্কারের বংশের শুকদেবের সহিত পালটী।)

(৩১) রামকান্ত হৃদয়রাম শ্যাম

| হৃদয়রাম জৌগ্রাম বাসী গয়ঘড়ী পালটী।

(৩২) রামসুন্দর মাণিক্যরাম কাশীনাথ রামসুন্দর রামমোহন।

† জৌগ্রাম বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত

গৌরীচরণ গঙ্গাধরসুত রামদেব সোন্দার কুলে বিবাহ করেন বঙ্গে সন্ধিজ্ঞ দোষ (পূর্ব্বগ্রামী) গোপীরমণের পুত্র আত্মারাম গাং গৌরীকান্ত রায়ের কন্যা বিবাহ হেতু চঁচুড়াতে ভঙ্গ।

* গৌরীচরণের পুত্র ব্রজকিশোরের বন্দ্য বংশে এক দৌহিত্র থাকে। তাহার নাম অনন্ত কোনা গ্রামে বিবাহ হেতু ব্রজকিশোরের কুল ভঙ্গ হয়।

আলাপ।

দাশরথি রায় গাইয়া গিয়াছেন—"একা ত এসেছি ভবে, একা যেতে হ'বে রে;" কিন্তু যখন গাইলেন, তখন তিনি শ্মশান প্রান্তে,—সংসার তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত, তিনি সংসারকে ভুলিতে প্রস্তুত। তথাপি তখন সেই অবস্থায়, সেই মহাবিরাগের মর্ম্মপীড়ন করিয়া, অনুরাগের প্রাণাকর্ষণ করিয়া, সেই এক নিঃশ্বাসে বলিলেই হয়, দাশরথি ডাকিলেন—"ভাই তিনুরে," আর সংসারের চরমসাধ মিটাইয়া অনুরোধ করিলেন—"ঘরে বিধবা রমণী র'ইল তা'রে অন্ন দিও রে।" বাস্তবিক সংসারের এই নিয়ম; মরিতে মরিতেও বিধবা রমণীর ভাবনা, মরিতে মরিতে তিনকড়িতে প্রয়োজন। ঐ যে বিভূতিভূষিত-দেহ মহাপুরুষ স্বীয় নগ্নতাকে অধিকতর দেদীপ্যমান করিবার উদ্দেশে বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডে অগ্নি সংযোগ পূর্ব্বক হরিতানন্দের ধূম উড়াইতেছেন, মনে করিও না যে উনি বিরাগী, উনি সংসারকে ভাবাইতে জানেন না, কিম্বা উনি সংসারের ভাবনা ভাবেন না। ঐ আহৃত ইন্ধন কাষ্ঠে, ঐ চিমটা খানিতে সমগ্র সংসারের ভাবনা আছে। বস্তুতঃ মনুষ্য নাম ধরিতে গেলে, লোকালয়ে বিচরণ করিতে হইলে, তুমি যে ভাবেই কেন আত্মপরিচয় দেও না, তুমি সংসারী; জানিয়া শুনিয়াই হউক বা তোমার অজ্ঞাতেই হউক, পরকে তুমি ভোগাইবে, আর বুঝ বা না বুঝ তুমি পরের জন্য ভুগিবে। সংসারের এই সম্বন্ধ-সূত্র চিনিয়া চলিলেই তুমি প্রকৃত মনুষ্য, তোমাতে মনুষ্যত্ব আছে; না চিনিয়া চল, সম্বন্ধ ছাড়াইতে পারিবে না, সেই জন্য তুমিও মনুষ্য, কিন্তু মনুষ্যত্ব যাহাকে বলে সে বস্তু তোমাতে নাই।

একবারেই সম্বন্ধ-সূত্র চিনে না, এরূপ লোক পাওয়া যায় না বলিলেই হয়; সংসার সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান-রহিত যদি কেহ থাকে, তবে সে লোকালয়ের বাহিরে, বন্য পশুর সঙ্গে পশু, অথবা উন্মাদাগারে। ফলতঃ সম্বন্ধ জ্ঞান সকলেরই আছে, তবে মাত্রার তারতম্যও আছে। সেই তারতম্য অনুসারে কেহ সভ্য ভব্য, শিষ্ট শান্ত, সুশিক্ষিত ভদ্রলোক, কেহ বা বর্ব্বর গোঁয়ার, মূর্খ ইতর লোক। ইহাতে শেষ দাঁড়াইল এই যে, মনুষ্যত্বই বল, আর শিষ্টাচারই বল, আর ভদ্রতাই বল, সাত সতের যে নামেই কেন তোমার বাহ্য ব্যবহারের পরিচয় হউক না, সকলই পরের জন্য, সকলই পরকে লইয়া। বাধ্যবাধকতা সখের সামগ্রী নয়, পেটের দায়ে করিতে হয় পেটের দায়ে রাখিতে হয়।

মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যাধিকার আর ব্যক্তিগত বশ্যতার কথা লইয়া জাহাজী দার্শনিকেরা গণ্ডগোল করুন,

আমরা, আদ্রক ব্যাপারী, মোটামুটি এই বুঝি যে মহারাজ হউন, রাজা হউন, রায় বাহাদুর হউন, বাবু হউন, আর কোট্ পেণ্টালুন পরুন, ইজের-কাবা-চাপকান পরুন, ধুতি চাদর পরুন বা কৌপীনই ধরুন, কাহাকে কবে কোন্ অবস্থায় পড়িতে হইবে, কাহাকে কখন কোথায় থাকিতে হইবে নিশ্চয় করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। পরিচিত অপরিচিত নাই, চিরদিনই তোমার লোক-প্রয়োজন থাকিবে। আর প্রয়োজন সাধিতে হইলে, যাহার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে তাহার সঙ্গে পরিচয় করিতেই হইবে। সুতরাং পরিচিতের সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়াইতে পারিবে,—সেই পরিমাণে তুমি দূরদর্শী, তেমনই তোমার মঙ্গল হইবে। পরিচয়, আলাপে হয়।

আলাপের এত গুণ, এত আবশ্যকতা, কিন্তু আলাপ করা বড় কঠিন। যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর কল্যাণে নৈশ গগনতলে, নদী-সৈকতোপরি, ঝিল্লীর-সমাকুলিত পবন স্বননে, বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোকে—সে আলোক থাকিয়া থাকিয়া নিবিয়া নিবিয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া সেই নদী-গর্ভ রজত-মণ্ডিত করিতেছে—পরস্পরের অপরিচিত ত্রিংশদ্বর্ষীয়া বঙ্গীয়া বালিকা এবং পঞ্চাশদ্বর্ষীয় বঙ্গীয় যুবককে সহসা সম্মুখীন হইতে দেখিয়াছেন; জানা নাই শুনা নাই, এই প্রথম মিলন, তাহাতে প্রণয়ের প্রথম অঙ্কুর, মুখ ফুটিয়া ফুটিয়া ফুটিতেছে না হৃদয়াবেগ অধর প্রান্ত পর্য্যন্ত উঠিয়া উঠিয়া অলক্ষ্য হাসিতে মিটিয়া যাইতেছে—যাঁহারা এ দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, তাঁহারাই মানিবেন আলাপ করা কত কঠিন।

নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আলাপ করা যায় না তাহা নহে। কিন্তু "মহাশয়ের নিকট আমি আসিয়াছি, আমার একটু প্রয়োজন আছে। মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া" ইত্যাদি আলাপ করিতে আপনা আপনি যেন কেমন আত্মগ্লানি হয়, আপনাকে হীন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এ আলাপ করা না করা তুল্য, এ আলাপে সুখ নাই, এ আলাপ আলাপই নয়। তাহার উপর, মনে কর, আলাপে শিষ্টাচার আলাপে সুশিক্ষার পরিচয় হয়। আলাপ করা কি সহজ? সেই জন্য "মুখ চোরা" অপবাদ সহ্য করে তথাপি অনেকে আলাপ করিতে অগ্রসর হয় না। আমিও এই দলভুক্ত, কাহারও সহিত আলাপ করিতে হইলেই আমি গলদ্‌ঘর্ম্ম।

"নবমীতে অলাবু ভক্ষণ নিষেধ" এ ব্যবস্থা লোকে যত দিন মানিত, হিন্দুর যত দিন হিন্দুয়ানি ছিল, তত দিন আলাপ করিবার ও একটা পাঠ বা পদ্ধতি ছিল, অভ্যাস করিয়া রাখিলেই এক প্রকার চলিয়া যাইত। "মহাশয়ের নাম?" "আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীরামহরি শর্ম্মা, পিতার নাম ঠাকুর সদানন্দ শর্ম্মা, পিতামহের নাম ৺ধনঞ্জয় শর্ম্মা, আমরা ফুলের মুখটি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান।" "মহাশয়ের

কয় সংসার?" "আজ্ঞে তিন, বিক্রমপুর বালিহাটীতে ৺ দামোদর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে এক বিবাহ করি, রানীগঞ্জের ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্রী দ্বিতীয়, আর পেণিটীর অমরশিরোমণির ভগ্নী তৃতীয়।" "বিষয় কর্ম্ম কি করা হয়?"—ইহার উত্তর, হয় "কুলীনের ছেলে, বুঝতেই ত পার্‌ছেন, দু বিঘা দশ বিঘা ব্রহ্মত্র আছে" অথবা আমার সাক্ষাৎ মাতুলের শ্যালক ধরণীধর রায় নেজামতের কারকুনের দপ্তর সেরেস্তায় কর্ম্ম করেন, বেস দশটাকা উপায় ও করেন সেই খানে থাকা হয়"। এ পক্ষ হইতে ইহার পাল্‌টা প্রশ্ন, উত্তর ও তথাবিধ। এই গেল প্রথম আলাপ, নির্ভীক চিত্তে যে সে করিতে পারিত। সে কালের মার্জ্জিত শিষ্টাচার ও তদ্রূপই। দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, ঘোষাল মহাশয় তৈলপ্লাবিত বপু, নাভির বহুনিম্নে পরিধেয় নামাইয়া দিয়া লম্বোদরে বাম করতল বুলাইতে বুলাইতে, দক্ষিণ হস্ত দোলাইতে দোলাইতে, স্কন্ধে গাত্র মার্জ্জনী পুষ্করিণী অভিমুখে চলিয়াছেন, স্নান ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর নাই, তথাপি জিজ্ঞাসা করিলাম "ঘোষাল মহাশয়, স্নানে?" ঘোষাল মহাশয় পরমাপ্যায়িত হইলেন, সর্ব্বদাই আমার শিষ্টাচারের প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন।

কিন্তু "তেহি নো দিবসা গতাঃ।" এখন নাম, ধাম, গাঁইগোত্রের বিষয় ব্যাপারের কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার অপমান করা হয়—এ সকল গুপ্ত বিষয়—"প্রাইবেট্‌ হিষ্টরী"-জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই। উভয়ে উভয়ের সোপাধিক নাম বাসস্থান প্রভৃতি কিছুই জানেন না, অথচ ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষম বিড়ম্বনায় করি কি? আমি ত আলাপ করা ছাড়িয়া দিয়াছি।

ডার উইনের গ্রন্থ প্রচারের পর অবধি পরিচিতে পরিচিতে সূক্ষ্ম শিষ্টাচার প্রদর্শনের একটা উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে; দেখা হইলে ঈষৎ গ্রীবা ভঙ্গী পুরঃসর উভয়ে ঈষৎ দন্তবিকাশ করিলেই আজি কালি চলিয়া যায়। আগা গোড়া আলাপের এমনি একটা প্রকরণ কবে বাহির হইবে। নচেৎ আর ভদ্রতা রাখিতে পারি না।

বিশ্বনিন্দুক।

প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অংশে প্রকৃত প্রণয় মস্তক দিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলে লোকে সহসা মনে করিতে পারে লেখক চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিবেন, কতকগুলি গিলিত পদার্থের উদ্গার করিবেন। বাস্তবিক এরূপ আশঙ্কা অমূলক বা অসঙ্গত নহে।

ইয়রোপে এপর্য্যন্ত কত লোকে যে প্রণয়-শীর্ষক রচনা লিখিয়াছেন বলা যায় না। গ্রীসে বিদ্যাচর্চ্চার প্রাক্তরুণোদয় আরম্ভ করিয়া গত শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় যে কেহ লেখনী ধারণ করিয়া যশোলাভ করিতে গিয়াছেন, যে কেহ মানব সমাজের মনোরঞ্জন করিতে গিয়াছেন, তিনিই প্রণয়ের উপর কিছু না কিছু লিখিয়াছেন। এবং এক্ষণে বাঙ্গালায় ও অনেকে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন আমাদের দেশের প্রধানতম নবেল লেখক মহাশয় স্বভাবসিদ্ধ অমানুষ প্রতিভাবলে মানব হৃদয়ের অভ্যন্তর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রণয়ের একটী আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম ভেদ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। আমরা লেখনী ব্যবসায়ে শিক্ষানবীশ মাত্র, আমরা লিখিতে গেলে যে লোকে চর্ব্বিত চর্ব্বণ মনে করিবেন তাহাতে লোকের কোন দোষই নাই। কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি আমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক, আমরা প্রস্তাবটীকে উনবিংশ শতাব্দীর পাঠ্য করিতে চেষ্টা করিব বলিয়াই একর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রকৃত প্রণয় বিষয়ে লিখিতে গেলে অনেকে আমাদের নিকট চাহিয়া বসিবেন প্রণয়ের লক্ষণ কি? আমরা বলিতেছি এরূপ লক্ষণ দিতে আমরা অসমর্থ। শুদ্ধ আমরাই অসমর্থ এরূপ বলি না ইহার লক্ষণ হয় না। মনের প্রত্যেক বৃত্তির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম লক্ষণ দিবার চেষ্টা বিফল। শাস্ত্রাভিজ্ঞ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ইয়ুরোপীয় ফিলজফর মহাশয় রাগ করিবেন না—আমরা বলি এরূপ সূক্ষ্ম লক্ষণের দিন গিয়াছে। প্রণয়ের লক্ষণ হয় না কিন্তু প্রণয় এমনি জিনিস যে উহার লক্ষণের প্রয়োজন হয় না। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, বিশ্ব বিদ্যালয়ের এম এস ডি হইতে সামান্য কুলি পর্য্যন্ত প্রণয় কি তাহাও জানে, প্রণয়ের কি বেগ তাহাও অনুভব করে। কোন্ পণ্ডিত কবে লক্ষণ দিয়া প্রণয় বুঝাইতে গিয়াছেন? আর লক্ষণ দিয়াই বা তিনি কি বুঝাইয়াছেন? আর যাহা সকলেই বুঝিতে পারে তাহারই বা লক্ষণের প্রয়োজন কি?

প্রণয়ের লক্ষণ হয় না কিন্তু উহার বিবরণ দেওয়া যায়। সূক্ষ্মদর্শী লোকে প্রণয় হইতে অন্য মানস প্রবৃত্তির ভেদ নির্ণয় করিতে পারেন। এই ভেদ নির্ণয় আবশ্যক এবং আমরাও এস্থলে এই ভেদ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। প্রণয় একটী মানসিক কোন বিকার। একটী সুন্দর বস্তু দেখিলে আমরা যে তাহাকে ভাল বাসিতে চাই শৈবলিনীর ন্যায় কোন একটী সুন্দর মুখ দেখিলে মীর কাসিম পর্য্যন্ত গলিয়া যান তাহা প্রণয় নহে। ভবভূতি তাহার নাম তারামৈত্রক বা চক্ষুরাগ দিয়াছেন। সে তারামৈত্রক চক্ষুরাগ—প্রণয় নহে।

অনেক দিন একজনের সঙ্গে একত্র থাকিলে তাহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না, ছাড়িতে কষ্ট বোধ হয়, মনে ২ একটু কষ্ট হয় সে মানসিক বিকার প্রণয় নহে। অনেক স্থানে স্ত্রী ও স্বামী মনের মিল

না থাকিলেও সাংসারিক অসুবিধার জন্য, বা আবার কোথায় যাইব দূর হক ছাই এই লইয়াই নিবৃত্তি প্রবৃত্তি হইয়া থাকি এই ভাবে বাস করেন, সেটী প্রণয় নহে। অনেক অর্ব্বাচীন লোক, আমাদের প্রাচীন কালের অনেক কবিই প্রণয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়পরতার এমনি অভেদ্য মিলন করিয়া দিয়াছেন যে উহাকে প্রণয় বলিতে আমাদের লজ্জা হয়। অনেকে রূপতৃষ্ণার নাম প্রণয় বলিয়াছেন তাহাও প্রণয় নহে। বঙ্কিম বাবু তাহাকে মদন-বাণ বা পঞ্চশর বলিয়াছেন বাস্তবিক ও সে মদন বাণ বা পঞ্চশর। সে প্রণয় নহে। প্রণয় নামে যে প্রবৃত্তি আছে তাহার কার্য্য এই তাহার কারণ এই—একজন লোকের সঙ্গে আর একজন অনেক দিন থাকিলে উহার আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ভাব ভঙ্গি, দোষগুণ, শ্বেত অংশ কৃষ্ণ অংশ দেখিয়া আপনার মনের সহিত অনেক বিষয়ে তাহার সহিত ঐক্য হয় ক্রমে তাহার সহিত একত্র বাস করিবার ইচ্ছা-হয়, তাহাকে না দেখিলে কষ্ট হয়, তাহার অদর্শনে জগৎ শূন্যময় বোধ হয় তাহার কথা কর্কশ হইলে ও প্রণয়ীকর্ণে উহা সুধাধারা বর্ষণ করে। উহার দোষ দেখিতে ইচ্ছা হয় না গুণ ও দেখিতে ইচ্ছা হয় না। কেবল সে যেমন আছে সেই ভাবে তাহার সহিত এক হইয়া—চিরকাল এক হইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। স্বর্গে যদি বিচ্ছেদ সম্ভাবনা থাকে তবে সে স্বর্গ ও অবাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয়। উহার কষ্ট হইলে আপনার দ্বিগুণ কষ্ট হয়, আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া ও উহার কষ্ট নিবারণের ইচ্ছা হয়, শেষ উহার সামান্য সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জনে ইচ্ছা হয়। এই স্থায়ী প্রবৃত্তি, এই স্থায়ী ঘনতর মনের বিকার, এই আত্মবিসর্জ্জন-প্রণয়। তারামৈত্রক, চক্ষুরাগ, রূপতৃষ্ণা, সৌন্দর্য্যস্পৃহা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি নানা কারণে সহবাসের ইচ্ছা হয়, সেই সহবাস শেষ প্রণয় রূপে পরিণত হইতে পারে, নাও হইতে পারে। আজি কোন কারণে সহবাস ইচ্ছা হইল কালি তাহারই বিপরীত কারণে তাহাকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। অতএব সহবাস প্রণয়ের কারণ হইতে ও পারে নাও হইতে পারে। এবং কোথায় কারণ হইবে কোথায় না হইবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না। প্রণয় এই রূপ পদার্থ, কেন হয় কেন না হয় কেহই বলিতে পারে না। হইলে তৃপ্তি হয় মোহ হয় আনন্দ-সমুদ্র সুখসন্তান বোধ হয়, আত্মজ্ঞানরহিত হয়, স্বার্থপরতা একেবারে থাকে না, পরকে আপনার অপেক্ষা বড় দেখিতে হয়, প্রণয়ীর সহিত একাকার হইয়া আপনার স্বতন্ত্রতা লোপ হইয়া যায়, পরের জন্য আপনার জীবন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করাও অসীম সুখকর বোধ হয়।

প্রণয় প্রবৃত্তির বিবরণ দিতে গেলে আরও কত প্রবৃত্তির সহিত যে উহার ভেদ নির্ণয় করিতে হয় তাহার ঠিকানা নাই। শুদ্ধ তাহাই নহে অনেক সময়ে অনেকের মনে বিশুদ্ধ প্রণয়ের সঙ্গে অন্য অন্য সু ও কু প্রবৃত্তি এমনি মিশ্রিত থাকে এমনি ঘনীভূত থাকে যে আপাততঃ উহাকে শুদ্ধ নির্দ্দোষ প্রণয় বলিয়া বোধ হয়; সেই স্থানে উহার অবিমিশ্রণ অতি আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেক কবিরা প্রণয় ও ইন্দ্রিয়পরতা এক নিঃশ্বাসে বর্ণনা করিয়াছেন। যে কবিতায় মনের গভীর ভাব, অনির্ব্বচনীয় আন্তরিক চাঞ্চল্য, তাহাতেই দুর্দ্দাম রুধির প্রবাহ, পঞ্চেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাসনা অনেক স্থানে দেখা যায়। এরূপস্থলে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি অত্যন্ত আবশ্যক। প্রণয় শুদ্ধ আন্তরিক ভাব মাত্র, বাহিক্য তাহাতে কিছুই নাই। প্রণয় আত্মার গুণ,

চিরস্থায়ী, ক্ষণিক নহে; মনের গুণ নহে, ইন্দ্রিয়ের গুণ নহে, শরীরের নহে, বাহ্য জগতের নহে, একবিধ আত্মগুণাবলী-প্রণোদিত মানসের বিকার; আন্তরিক চাঞ্চল্য উহার অনুভাব মাত্র, কার্য্যমাত্র, অন্য কিছুতে অন্য কোন কার্য্যতেই উহার নির্ণয় হয় না, ঠিক নির্ণয় হয় না। বাহিরের যে সকল কার্য্য দেখিয়া আপাতত আমরা প্রণয় আছে বলিয়া মনে করি সে সকল কার্য্য প্রবাহের মূল অনুসন্ধান করিলে অনেকস্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে উহা আত্মার অপর গুণাবলী হইতে নিঃসৃত, সুতরাং তাহা প্রণয়কার্য্য কি না নির্ণয় হওয়া দুঃসাধ্য। এই জন্য কবিরা প্রণয় বর্ণনাস্থলে সর্ব্ব প্রথম লোকের অন্তর মধ্যে যান, সেখানকার গোপন ভাবগুলি খুলিয়া খুলিয়া পিঁজিয়া পিঁজিয়া দেখান; ক্ষুদ্র কবির গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া লন, বড় কবিরা একটী অপূর্ব্ব বিস্তৃত বীচি-বিক্ষুব্ধ মানস-সমুদ্রের চিত্র প্রদর্শন করেন। নাটকে প্রকৃত ভাব জানাইবার স্থান--স্বগতবাণী বা সখী সংবাদ।

এই পর্য্যন্ত প্রণয় লইয়া গেল; শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র, মানসমাত্র-গামী প্রণয়ের স্বভাবের উপর দুই এক কথা বলা হইল। এখন সেই প্রণয়ের স্ফূর্ত্তি হয় কখন? কোন্ সময়ে তাহার তেজের আধিক্য হয়? কোন্ সময়ে তাহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ থাকে? কোন্ সময়ে তাহার পবিত্রতা অক্ষুন্ন থাকে? কোন সময়ে? এ প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে জানা চাহি কি অবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্যের কোন ব্যাঘাত হয়, কোন্ সময়ে মানসিক প্রবৃত্তি সকল বর্ষাপ্রাপ্ত শালি শস্যের ন্যায় সবল, সতেজ ও মনোবিমোহন মাধুর্য্য প্রাপ্ত হয়, কোন্ সময়ে তাহাদের কোনরূপ বৃদ্ধি ব্যাহত না থাকে, কোন্ সময়ে তাহারা স্বাধীন ভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারে। বীজবপন করিয়া চাপা দিয়া রাখ, অঙ্কুর হইলেও হইতে পারে কিন্তু সে অঙ্কুর কেবল শুকাইবার জন্য। নদীর স্রোত যে দিকে যাইতেছে তাহার অন্যদিকে লইয়া গেলে তাহার গতির লাঘব হইবে মাত্র। সেই রূপ কোন স্ফূরণোন্মুখ মানসিক বৃত্তির মুখে যদি বাধা চাপান যায় সে বৃত্তিটী হাপসিয়া যাইবে মাত্র। প্রণয়ের মুখে যদি অধীনতা পাথর চাপাও সে প্রণয়াঙ্কুরকে পিষিয়া ফেলিবে। বাড়িতে দিবেনা, দিবেনা।

প্রণয়ী যুগল যদি উভয়েই স্বাধীন হয়, কেহ কাহার কোন অধীনতা স্বীকার না করে, উভয়ে আপন ইচ্ছায় উভয়কে ভালবাসে, কেবল ভালবাসা ভিন্ন আর ভালবাসার কোন পার্থিব কারণ না থাকে, ক্রমে যখন সেই ভালবাসা ঘনতর হইয়া আসে—সেই বিশুদ্ধ প্রণয়, সেই খানেই প্রণয়ের সর্ব্বতোমুখী শ্রীবৃদ্ধি। এরূপ একটী চিত্র জগতে যদি মিলে তবে জগতে আর স্বর্গে কিছুই প্রভেদ থাকে না। এই রূপ একটী চিত্র যদি কল্পনায় অঙ্কিত করা যায় তাহাতেও বিমলানন্দ। যিনি এরূপ চিত্র আঁকিয়া জগতের লোককে দেখাইতে পারিবেন তিনিই প্রকৃত কবি। কিন্তু জগতে এরূপ চিত্র নাই কেন? জগতের লোকের অত্যাচারে, যে সমাজ বলিয়া জগতে এক বিধাতার অনির্ম্মিত সৃষ্টি আছে, তাহার অত্যাচারে। যে সকল লোক সমাজ বলিয়া দৈত্য সৃজন করেন তাঁহারা জানিতেন উহাতে কুলোক শাসিত হইবে কুপ্রবৃত্তির দমন হইবে, কুকার্য্য জগৎ হইতে উঠিয়া যাইবে। কিন্তু সমাজ আমার পঞ্চানন্দ ঠাকুর বড়ছেলেটীর কিছু করিতে পারেন না, ছোট ছেলেটীর ঘাড় ভাঙ্গেন। যাহারা কু তাহারা সমাজকে কদলী দর্শন করাইয়া

কুকর্ম্ম করে। তাহারা গোপনে করে, গোপন করে বলিয়া আরো অধিক দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে। সমাজ দেখিতে পান না বা দেখিতে পাইয়াও কিছু করিতে পারেন না। মাত্র থান সুলোকের, সুপ্রবৃত্তি গুলিকে যুবড়া করিয়া রাখেন, তাহাদের জন্মাইতে দেন না, জন্মাইলে বাড়িতে দেন না, বাড়িলে প্রকাশ হইতে দেন না, প্রকাশ হইলে অঙ্গহীন করিয়া দেন। এরূপ অত্যাচারে দেবদুর্ল্লভ পবিত্র প্রণয় কোথায় মিলিবে? গোময় রাশি মধ্যে উজ্জ্বল হীরক কখন কি মিলিয়া থাকে? পবিত্র বিশুদ্ধ নির্ম্মল উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় প্রণয়ের উপর সমাজের প্রধান অত্যাচার বিবাহ প্রথা প্রচালন। ইহাতে যে একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখা হয়, চারি দিক্ হইতে প্রণয়-স্রোত বন্ধ করা হয়, উহাকে অপরাপর প্রবৃত্তির সহিত মিশ্রিত করিয়া কলুষিত করা হয় তাহার আর কোন সংশয়ই নাই। বিবাহে প্রণয়ের কত অনিষ্ট করা হয় এক বার কল্পনা বলে দেখা যাউক। কুলোকে নানাবিধ উপায়ে সুনিয়ম কু করিয়া তুলে ভালতে মন্দ করে, মিষ্ট পদার্থ কটু করে, তাহাদের কথা আমাদের প্রয়োজন নাই, তাহাদের কথা আমরা কহিতে চাহিনা কহিতেও ছিনা। আমরা মনে করিয়া লইয়াছি জগতে কুলোক নাই সবই সু, সবই ভদ্রলোক বিশুদ্ধ চরিত্র সাধু সজ্জন। বিবাহ আসিয়া বলিলেন কি?—'অমুক ঘোষের কন্যা তোমার গৃহিণী, তুমি তাহাকে ভাল বাসিবে, সে তোমাকে ভাল বাসিবে, অন্য লোককে তোমার ভাল বাসিতে নাই। যদি বাস, তোমায় আমি শাস্তি দিব, কুরত শ্রীঘরেও দিব। এই নাও ইহার হাত, তুমি ধর তোমাদের শুভ দৃষ্টি হউক-'। নাও কথা তুমি আমায় ভাল বাসিতে বাধ্যকরার কে? তুমি সমাজ আছ আমি দুষ্কর্ম্ম করিলে শাস্তি দিও, আমার অন্তর-স্রোত আমার ইচ্ছাধীন আমি তাহাকে যে দিকে চালাইব সে সেই দিকে চলিবে। তুমি তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার কে? প্রথম ঘোর অত্যাচার। আমাদের দেশের দশা ঠিক এই রূপ। সে ঘোষের মেয়ে আমার মনে ধরিল না, আমার প্রণয় বলিয়া যে প্রবৃত্তিটী ছিল তাহার বিক্রয়া হইল। মনে কর ধরিল তাহাকে আমি খুব ভাল বাসিতে লাগিলাম, একদিন অতি বিশ্রব্ধ কথোপকথন সময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি আমায় বড় ভাল বাস—না? সে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—খুব। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম যদি আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ না হইত তুমি কি করিতে? কাহাকে ভাল বাসিতে?" যাহাকে বিবাহ করিতাম? ও হরি তবে ভাল বাসার কল আছে। যার দিকে কল নাড়িবে সেই চরিতার্থ হইবে। আমাদের দেশের বিবাহে স্ত্রীলোকের একেবারে স্বাধীনতা নাই। তাহারা যে ভালবাসে তাহা এক প্রকার কল মাত্র। তাহাদের পছন্দ করিবার ক্ষমতা নাই ত্যাগ করিবার ক্ষমতা নাই। খাও দাও চিনির বলদের মত স্বামী ও গুরুজনের সেবা শুশ্রূষা কর। শেষ ঐ এক ভাবে থাকিয়া, এক রকম কি গোজামিলযুক্ত একটা মানসিক ভাবের উৎপত্তি হয়। এটী প্রণয় নহে। প্রণয় একটী প্রবৃত্তি উহার কার্য্য-প্রবণতা অত্যন্ত বলবতী, প্রণয় গাঢ় হইলে কার্য্য-প্রবণতা বৃদ্ধি হয়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি উহাতে আত্ম বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত জন্মায়। পূর্ব্বোক্ত যে ভাবটী জন্মায় সেটী নিবৃত্তি-মূলক তাহার তলা অন্বেষণ করিয়া দেখ এই কয়টী অক্ষর পাথরে খোদা দেখিতে পাইবে। "আর ত উপায় নাই এখন এই ভাবেই মানিয়ে

জুনিয়ে থাকিতে হইবে” সেই ভাবে বাস্তবিকই মানিয়ে জুনিয়ে থাকে, এই ভাবে মানিয়ে জুনিয়ে অধিকাংশ বাঙ্গালীর দিন কাটে, প্রণয় মুসড়িয়া যায়, প্রণয়—মনুষ্যও পশু প্রভেদ করিবার এক মাত্র উপায়, জগদীশ্বরের প্রদত্ত অত্যুৎকৃষ্ট মানস প্রবৃত্তি—বৃথা হইয়া যায়। বলিয়াছি এই প্রথম জঘন্য সর্ব্বথা পরিহারযোগ্য অত্যাচার। দ্বিতীয়—ইয়ুরোপীয় বলিবেন নিজে পচ্ছন্দ করিয়া বাছিয়া দুজনে মিল হইলে অন্তরে অন্তরে ঘাত প্রতিঘাত জন্মিলে বিবাহ কর। এও বরং। কিন্তু বলি ইয়রোপীয় মহাশয় আমাদের যদি মনের মিল হইল আমরা যদি উভয়ে উভয়কে বুঝিলাম, পরস্পর যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস এমন কি যদি একাত্মভাব দাঁড়াইল বিবাহে প্রয়োজন? চর্চ্চে যাওয়া, দশজনের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করা এত হাঙ্গাম কেন? উহাতে আমাদের কি কিছু বাড়িবে? কিছু বেশী ঘনিষ্ঠ প্রীতি উৎপন্ন হইবে? কখনই না, বরং এই হইবে যে আমাদের নিজের কথার উপরে হাত দেয় কেন? এই ভাবিয়া একটু বিরক্তি হইবে। আমরা আপন ইচ্ছায় যা করিব পরে বলিলে তা কখনই তেমন করিয়া করিব না। ছেলেরা আপন মনে যেমন খেলা করে কি যেমন পড়ে বাপ মা কি গুরু মহাশয় যদি তাহাদিগকে হুকুম করেন সে তেমন করিয়া পড়া ত করিবেই না, অনেক জায়গায় দেখিয়াছি তেমন প্রফুল্ল মনে খেলাও করে না। হয়ত সমাজের এরূপ অনধিকার চর্চ্চায় আমাদের প্রণয়ে বিঘ্ন হইবে মাত্র। এত দুরন্ত হয়তর উপর দিয়া গেল। তাহার পর তুমি পাদরি সাহেব বলিলে আমাদের চির দিন এই দম্পতী ভাবে থাকিতে হইবে। কেন? চির দিন যখন কিছুই থাকেনা সকল পদার্থেরই যখন প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন আমরা কেমন করিয়া বলি যে আমরণ আমরা এই ভাবে থাকিব। হয়ত থাকিতাম যদি আমাদের নিজ ইচ্ছাধীত হইত আমরা ঘরে ঘরে বন্দোবস্ত করিয়া থাকিতাম। তোমার হুকুমে থাকিব কেন? এইরূপ অন্যায় হুকুম করা কি তোমার ঘোরতর অত্যাচার নহে? তাহার পর বলিবে ডাই ভোর্স প্রথা আছে। তোমরা অত্যাচার করিয়া একটি বন্ধন দিলে আবার আমার সেইটী কাটাইতে হইবে। এ দোকর পরিশ্রম কেন? আর তোমাদের যেরূপ ডাই ভোর্স প্রথা তাহাও ত বিশুদ্ধ প্রণয়ের পোষক নহে। পরস্পর অন্যায় ইন্দ্রিয়পরতা আদালতে প্রমাণ না করিয়া দিলেত ডাই ভোর্স হইবে না। কিন্তু তাহা না হইলেও ত অনেক কারণে পরস্পর একত্র বাস কষ্টকর হইতে পারে. যখন সাত বৎসরে সমস্ত শরীরের পরিবর্ত্তন হইয়া যায় তখন যে মানসিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইবেনা তাহার ঠিক কি? যদি এই রূপ শরীর পরিবর্ত্তনে মনেরও পরিবর্ত্তন হয়? তবেই গোলমাল।

এই রূপে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে প্রকৃত প্রণয় স্থলে বিবাহ প্রথা—সমাজের হস্তক্ষেপ, প্রণয়ীর অত্যন্ত ক্ষতিকর উহা যত শীঘ্র অপনীত হয় ততই জগতে মঙ্গল। শ্রীশরৎ।

আমরা এপ্রস্তাবের শেষ সিদ্ধান্তের অনুমোদন করি না। প্রচলিত বিবাহ প্রথা অপনীত হইবার যোগ্য বলিয়া যে একেবারে বিবাহেই প্রয়োজন নাই ইহা আমরা স্বীকার করি না। আজীবন হউক বা সাময়িক হউক বিবাহ প্রথা আবশ্যক। এবিষয়ে আমাদের মত সকল একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাবাকারে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। সা।

কণ্ঠমালা * ।

কোন ধনবান্ ব্যক্তি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে করিতে যদি সহসা দুরবস্থায় পতিত হন, তবে সেই অট্টালিকার যে দুর্দ্দশা ঘটে, তাহার সেই অসম্পূর্ণ অবস্থায় যেন তেন প্রকারেণ যেরূপ কুৎসিৎ আকারে তাহার পরিশেষ করা হয়, সেই অট্টালিকার প্রতি চাহিলে দর্শকের যে প্রকার দুঃখ বোধ হয়, কণ্ঠমালা পাঠে ও আমাদিগের সেই প্রকার মনোবেদনা উপস্থিত হইয়াছিল। কোন সতেজ বৃক্ষ ফলোন্মুখী হইয়া উঠিতে উঠিতে যদি সহসা তাহা শুখাইয়া যায়, সেই বৃক্ষের প্রতি চাহিলে যে প্রকার কষ্টবোধ হয়, কণ্ঠমালা পরিসমাপ্ত করিয়া আমাদিগের সেই প্রকার কষ্ট বোধ হইয়াছিল। আমরা এই উপন্যাসের প্রথম প্রথম ত্বরিত বৃদ্ধি দেখিয়া যেরূপ সুখের আশায় ফুলিয়া উঠিতেছিলাম, শেষে ইহার সহসা অধঃপতন দেখিয়া সেইরূপ নৈরাশ্যে দুঃখিত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, উপন্যাস-লেখক যদি হাকিম না হইতেন, আদালত এবং মিছিলে যদি তাঁহার কল্পনা পরিপূর্ণ না থাকিত, তবে কণ্ঠমালার ভাগ্য নিশ্চয় অন্যবিধ হইত। তাহা হইলে শৈল বহুকাল অন্ধকূপে আবদ্ধা থাকিয়া কেবল বিলাস বাবুর মুক্তি ভিন্ন কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধন জন্য বিমুক্তা হইতেন, বিনোদের প্রেম প্রসারণ দ্বিগুণিত হইত এবং তিনি মাজিষ্ট্রেটকে চমকিত করিবার জন্য শৈলের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া তাহাকে কেবল জলমজ্জন হইতে উদ্ধার করিতেন না; শম্ভু কয়েদী নিজ হত্যাব্যাপারের রহস্য ভেদ করিবার অপেক্ষা কোন গভীর ও গুরুতর উদ্দেশ্য সাধন জন্য সৃষ্ট হইতেন। গ্রন্থের এই তিন জন প্রধান ব্যক্তির প্রতি আমরা যে রূপ আশাপূর্ণ চক্ষে চাহিয়াছিলাম, তাহারা তিন জনেই আমাদিগের আশা তেমনি সমান ভঙ্গ করিয়াছেন। বিনোদ যখন শৈলকে উদ্ধার করিলেন, আমরা ভাবিলাম, প্রেমরাজ্যের আর এক দেশ অধিকৃত হইল, এখন আমরা শৈল এবং বিনোদের সহিত এরাজ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার কতই না শোভা সন্দর্শন পূর্ব্বক সুখী হইব, শৈল-চরিত্রের সংশোধন জন্য শম্ভুকে কতই না আশীর্ব্বাদ করিব। কিন্তু হায়! বিধাতা আমাদিগের ভাগ্যে সে সুখ লিখেন নাই। বিনোদ মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে একদিন দেখা দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইলেন খুঁজিয়া পাইলাম না. শৈলের হৃদয়-পরিশুদ্ধির কিছুই

* অথবা শৈল। শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বঙ্গদর্শন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮৭৭ অব্দ।

পরিচয় পাইলাম না, শম্ভু কয়েদীর প্রকাণ্ড চিত্রের কতকগুলি বাহ্য রেখা দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইল। বিনোদের জন্য প্রাণ কাঁদিল, শৈলের প্রতি সহানুভূতিতে মাধবীর মত আমাদিগের ও হৃদয় গলিত হইয়াই রহিল, শম্ভু কয়েদীর সম্পূর্ণ অবয়ব দেখিবার জন্য সকল আশাই অতৃপ্ত রহিল। ইহাঁরা সকলেই আমাদিগের হৃদয়কে খালি করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহাই গ্রন্থের প্রধান দোষ। ইহার পরিসমাপ্তিকে নিতান্ত দোষার্হ বলি এই জন্য, যে যখন এই উপন্যাসের চরমভাগ পরম প্রীতিকর হইয়া আসিবে বলিয়া আশা হইতেছিল, তখন গ্রন্থকার একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিলেন। তিনি কূলের নিকটে আসিয়াই তরি ডুবাইয়া দিলেন। আমরা দূর হইতে প্রীতনয়নে কূলের শোভা দেখিয়া যেরূপ আশ্বস্ত হইয়াছিলাম, অচিরাৎ সকলই হারাইয়া ততদূর নৈরাশ্যে পড়িলাম। যখন আমাদিগের হৃদয় মন এক অমৃত আস্বাদনের জন্য উৎফুল্ল হইয়া আসিতেছিল, অমনি গ্রন্থকার আমাদিগের দৃষ্টি হইতে সেই সুধাধার অপসারিত করিলেন।

এ গ্রন্থের মধ্যে শম্ভু কয়েদীর প্রকাণ্ড চিত্রের কতিপয় বাহ্য রেখা পতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই কতিপয় রেখাতেই তাঁহাকে বিলক্ষণ চেনা গিয়াছে। তিনি গ্রন্থ ব্যাপারের সকল সূত্র ধরিয়া মহাকাণ্ড ঘটাইতেছেন। তাঁহার মন্ত্রণা, অদ্ভুত উদ্যোগিতা, ঔদার্য্য প্রভৃতি মহৎ গুণপরম্পরা তাঁহাকে এক আশ্চর্য্য ব্যক্তিরূপে সৃজন করিয়াছে। তিনি গ্রন্থের মধ্যে দেবতার মত কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার গূঢ় মন্ত্রণা এবং উদ্যোগিতায় তাঁহার ক্রিয়া কাণ্ডপরম্পরা যেন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার রূপে প্রতীত হইতে থাকে। পাঠক তাঁহার ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া চমকিত হয়েন, চমকিত হইয়া ভীত হয়েন, ভীত হইয়া তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া মনে মনে স্বীকার করেন। তাঁহার বদান্যতা এবং মহানুভাবকতা যতদূর চমৎকৃত না করে, তাঁহার ক্রিয়া কলাপ তদপেক্ষা অধিকতর চমকিত করিয়া থাকে। তাঁহার রাজপদ এবং অধম ব্যবসায়, দয়া এবং নৃশংসতা, চিত্তৌদার্য্য এবং বীরভাব এরূপ আশ্চর্য্যরূপে মিশ্রিত হইয়াছে যে তাহাতে তাঁহার সমগ্র জীবিতচরিতকে এক বিচিত্র প্রহেলিকা রূপে প্রতীত করিতে থাকে। আমরা বুঝিতে পারি না তাঁহার শরীরে এই সমস্ত গুণ পরম্পরার সমাবেশ কোথা হইতে হইল, কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি, তাঁহার এই গুণপরম্পরা না থাকিলে তাঁহার বীরভাব শোভা পাইত না। তাঁহাকে দেখিলে ভয় হয়, কিন্তু তাঁহার গুণে মোহিত হইতে হয়। তিনি রাজপদ ত্যাগ করিয়া আজিও সকলকে শাসনে রাখিতে পারেন। তাঁহার নির্ভীকতা, বল ও বীরত্ব লোককে চমকিত করিয়া ভীত করে, তাঁহার সম্পদ, মর্য্যাদা এবং দয়া লোককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া

রাখে এবং এক একবার তাঁহার কঠোর ব্যবহার দেখিয়া লোকে একদা চমকিত, সশঙ্কিত এবং রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তিনি কি মন্ত্র বলে রামদাস এবং মোহন্তকে বশীভূত রাখিয়াছিলেন তাহা তাঁহারাই জানিতেন না। মোহান্ত বলিয়া ছিলেন, "মহারাজ কি মোহিনী মন্ত্র জানেন; তিনি যাহাই করেন, তাহাতেই আমাকে সম্মত হইতে হয়। কি জানি যদি মতান্তর করিতে পারেন, আমার এই ভয়। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে যাওয়াই ভাল।" রামদাস তাঁহার শাসনে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া কি না করিয়াছেন।

রামদাস, মোহান্ত এবং শম্ভু গ্রন্থের মধ্যে এই দলটি চমৎকার সৃষ্টি। রামদাস এবং মোহান্ত, শম্ভুর অস্ত্র স্বরূপ হইয়া, শম্ভুর চিত্রকে গম্ভীরতর করিয়াছেন। তাঁহারা শম্ভুর হাতে ছায়া বাজীর পুত্তলির ন্যায় কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা যে ঘটনাজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহা কণ্ঠমালার সঙ্কীর্ণ প্রসর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার নহে; তাহা আরও বিস্তারিত ক্ষেত্র অধিকার করিতে চাহে। শম্ভু নির্জ্জনে মন্ত্র আঁটিতেছেন, রামদাস তাঁহার সিদ্ধিদান করিতেছেন। শম্ভুর নৃশংসতার দোষ, রামদাসের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে, কিন্তু তাঁহার সৎকার্য্যের সাধুতা রামদাস প্রাপ্ত হন না। এই জন্য রাম দাসের চিত্র অতি ভয়ঙ্কর বোধ হয়। আমরা আশ্চর্য্য হই, মোহান্ত এদলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন কেন! রামদাসের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, এই জন্য রামদাস শম্ভুর সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহার প্রিয় পাত্র হইতে যাইতেন। মহান্তের ও যে সেই রূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল তাহা কোথায়ও প্রকাশিত নাই। তিনি এ প্রকার দল মধ্যে থাকিবার লোকও নহেন অথচ তিনি এ দলের বিচিত্র কার্য্য পরম্পরায় কেন মিলিয়াছিলেন এই আশ্চর্য্যের বিষয়।

ফিলডিঙ্গের উপন্যাস সকল পড়িয়া রিচার্ডসনের গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করিলে মনে যে প্রকার ভাবের উদয় হয়*, বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলি পাঠ করিয়া কণ্ঠমালা অধ্যয়ন করিলে অনেক দূর তৎসদৃশ ভাবের সঞ্চার হয়। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়া বেড়াই; বনে যাই, পর্ব্বতে উঠি; সরোবরে, উদ্যানে, এবং নদীতীরে যথেচ্ছা বিচরণ করি; বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করি; সর্ব্ববিধ লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কই; এবং বাহ্য প্রকৃতির শোভা ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া যাই। বঙ্কিমবাবু কাহাকেও কোথা আবদ্ধ রাখিতে ভাল বাসেন না, কদাচিৎ কেহ কোন স্থানে আবদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া স্বাধীন কার্য্য ক্ষেত্রে আনয়ন করেন। এমত কি তাঁহার সুন্দরীগণও পুরবাসিনী নহেন;

* See Talfoard on British Novels amd Ronances.

তাঁহারা ও স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেছেন, চিন্তা করিতেছেন এবং যথেচ্ছা বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। মানব প্রকৃতি দমিত হইলে যে রূপ কার্য্য করে, বঙ্কিম বাবু তাহা দেখান না, তিনি দেখান, মানব প্রকৃতি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রগামিনী হইতে পারে, অগ্রগামিনী হইয়া কিরূপ সুন্দর ভাব ধারণ করে, প্রকৃতি বিমুক্ত ভাবে কার্য্য করিলে তাহা কতদিকে কতরূপ লীলাক্রমে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। কণ্ঠমালা উপন্যাসে ঠিক ইহার বিপরীত চিত্র। এখানে আমরা বাহ্য জগতের বিস্তারিত ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কারাগারে, পৃথ্বীতলে, কূপে এবং অন্ধকারে প্রবেশ করি। বাহ্য জগতের সকলই হারাই; চারিদিকে প্রস্তর লৌহ, অন্ধকার, অবিশুদ্ধ বায়ু প্রভৃতি দেখিয়া বক্ষে বিষম ভার বোধ হইতে থাকে। কোথাও নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই, কোথায় নামিতেছি, কোথায় উঠিতেছি কিছুই ঠিক পাই না, যেন পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া আছি। প্রকৃতির নবীন সৌন্দর্য্য ত্যাগ করিয়া মানবের পুরাতন অট্টালিকার বিমলিন ও ভগ্ন শোভা দর্শন করি; স্বাধীন এবং সতেজ মানব প্রকৃতি তন্মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া কিরূপ চিন্তা ও কার্য্য করিতেছে তাহা দর্শন করি রোগে শোকে, প্রকৃতি বলবীর্য্যহীন হইয়া, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রকৃতি কাতর হইয়া, সেই দমিত ভাবে কিরূপ কার্য্য, চিন্তা ও চেষ্টা করে তাহা দর্শন করি। কণ্ঠমালার গ্রন্থকার শৈলকে শুধু অন্তঃপুর কারাগারে আবদ্ধা রাখিয়া সন্তুষ্ট হয়েন নাই, তদপেক্ষা কঠিনতর পিঞ্জরে তাঁহাকে আবদ্ধা করিলেন। বিনোদকে শুদ্ধ কারাগারে ফেলিয়া সন্তুষ্ট হয়েন নাই, তাহাকে রোগে শোকে, এবং কাতরতায় অশক্ত করিয়া ফেলিলেন। মহান্ত এবং রামদাসকে এক অৰ্দ্ধ-ভগ্ন মন্দির মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট হয়েন নাই, তাঁহাদিগকে এক জন কয়েদীর কয়েদী করিয়া রাখিয়াছেন। বীর মহারাজ কারাগারে আবদ্ধ। সুন্দরী মাধবী স্বাধীন বায়ুর মত এখানে ওখানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং বনলতা লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, তাহা গ্রন্থকারের সহিল না; তিনি অনতিবিলম্বে তাঁহাকেও এক অন্ধকূপ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া সুখী হইলেন। আমরা বাহ্যজগতের প্রসন্নমূর্ত্তি হারাইয়া এক সংকীর্ণ অন্ধজগৎ মধ্যে প্রবেশ করি বটে, কিন্তু তাহাতে নিতান্ত অসুখী হই না; সেখানে আর এক সুখ লাভ করি; তাহা বাহ্য জগতে প্রাপ্ত হই না। সেখানে অন্ধ পাতাল কূপ-মধ্যে পাপীয়সী শৈলের পার্শ্বে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময়ী রূপাসুন্দরী মাধবীকে উজ্জ্বলিত দেখি; তাঁহার অনুকম্পার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যাই, মাধবীর সহিত আমরা ও শৈলের দুঃখে দুঃখী হইয়া সহানুভূতির সুখ সম্ভোগ করি এবং সেই পাতালপুরী মধ্যে এক সুরসুন্দরীকে সন্দর্শন করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করি। কারাগার মধ্যে প্রবেশ করি, সেখানে দেখি,

নির্দ্দোষী প্রেমময় বিনোদ এবং সদাশয় বীরপ্রতিম মহারাজ শম্ভু। শম্ভুর গুণে পাপময় কারাগারও পুণ্যের আশ্রয়স্থান হইয়াছে। সেখানে শম্ভু আতুরের দুঃখমোচন করিতেছেন, রোগীর ব্যথায় ব্যথিত হইয়া সাহায্যদানে তাহার ক্লেশ দূর করিতেছেন এবং বিনোদের মুক্তির জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন। বিধাতা অন্তরঙ্গকে আনিয়া অন্তরঙ্গের সহিত কারাগারেও মিলাইয়া দেন। সেখানেও দেখি মানবের জন্য মানবহৃদয় কাঁদিতেছে। অনুকম্পার স্রোত কারাগারেও প্রবাহিত হইয়া তাহাকে সুখধামে পরিণত করিতেছে। এরূপ কারাগারের চিত্র সন্দর্শন করিয়া কে না সুখী হয়? বিনোদ রোগাক্রান্ত হইয়া পুরাতন রাজপ্রাসাদ মধ্যে আবদ্ধ। বিনোদ নীরোগী এবং সবল থাকিলে কি করিতেন তাহা আমরা দেখিতে পাই না, বটে, কিন্তু আবদ্ধ বিনোদ সেই রাজপুরীকে আপন প্রেমনৈরাশ্যগীতে কেমন পূর্ণ করিতেছেন তাহা আমরা দেখিতে পাই। তথাকার পত্রাবলি পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় ও মনের ঔদাস্য প্রেমের প্রবলতা দেখি, এবং সেই ঔদাস্য ধীরে ধীরে সময়ক্রমে অপনীত হইয়া প্রেম কেমন হৃদয়কে পুনরায় গড়িয়া আনিতেছে তাহা সন্দর্শন করি, সেখানে মাধবীর সারঙ্গগীতে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। মাধবীর পদসঞ্চারে অনুমান হয় কাব্যদেবী সেই পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন প্রবেশ করিয়া একে একে স্মৃতির সহস্রদ্বার খুলিয়া দিলেন, রাজপ্রাসাদ কবিত্বে পূর্ণ হইল। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে বিনোদের সঙ্গে ভ্রমণ করি, আশ্চর্য্য হইয়া মাধবীর মুখে শৈলের পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করি, শ্রবণ করিয়া সুখী হই, যে বিনোদ রাজজামাতারই উপযুক্ত বটেন। বিনোদের দুঃখে হৃদয় দ্বিগুণ দুঃখিত হইয়া উঠে। শৈলের জন্য সন্তাপিত হই; ভাবি বিধাতার কি বিচিত্র লীলা; শৈল রাজকন্যা হইয়া সামান্য রজত অলঙ্কারের জন্য সতীত্ব বিক্রীত করিয়া কারাবাসে অবরুদ্ধা রহিলেন!

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে, "কণ্ঠমালার অধিকাংশ লিখিত হইলে হঠাৎ আমি একদিন বুঝিলাম যে ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত চন্দ্রশেখরের অনুকরণ হইতেছে। উপন্যাস অংশে চন্দ্রশেখর আর কণ্ঠমালা এক দাঁড়াইয়াছে। চন্দ্রশেখর নিজে সজ্জন ছিলেন, কিন্তু তাহার দুশ্চরিত্রা স্ত্রী শৈবলিনী কুলত্যাগিনী হইয়াছিল। পরে ঘটনাক্রমে শৈবলিনীর চরিত্র সংশোধিত হইতে আরম্ভ হয়। কণ্ঠমালায় অবিকল তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। শৈবলিনীর স্থলে শৈল ও চন্দ্রশেখরের স্থলে বিনোদ; প্রতাপরায়ের স্থলে বিলাস বাবু; রমানন্দস্বামীর স্থলে রাজা মহেশচন্দ্র বর্ণিত হইয়াছে।" উপন্যাস অংশে চন্দ্রশেখর এবং কণ্ঠমালার ব্যক্তিগণের অবস্থা বিবেচনা করিলে যে সামান্য সাদৃশ্য প্রতীত হয় তাহা নিতান্ত

দুর-লক্ষ্য বলিয়া ধরিতে হইবে। ঘটনা এবং চরিত্র বিবেচনা করিলে আবার এই দুই গ্রন্থ যেমন বিসদৃশ বোধ হইবে এমত আর কিছুই নহে। চরিত্র পরীক্ষা করিলে বলিতে হইবে যে শৈবলিনীর সঙ্গে শৈলের নাম মাত্র করিলে শৈবলিনীর অপমান করা হয়। ধীর এবং বীর প্রকৃতি প্রতাপ রায়ের সহিত লম্পট বিলাসের তুলনা! স্বর্গের সহিত নরকের তুলনা! কণ্ঠমালার পাঠ সমাপ্ত হইলে গ্রন্থকারের এই কথা স্মরণ হওয়াতে আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল বিজ্ঞাপনের এই অংশটুকু নখ দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলি। একথা উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। কোথায় প্রতাপ রায়ের অমানুষ হৃদয়-সংযমের চরিত্র, কোথায় বিলাসের পঙ্কিল লম্পটতা। অবস্থার সাদৃশ্য থাকিলেও চন্দ্রশেখরের সহিত বিনোদের বিস্তর প্রভেদ। চন্দ্রশেখর অধ্যয়নশীল চিন্তা-পরায়ণ পণ্ডিত, গ্রন্থ এবং শাস্ত্রালাপই তাঁহার বিনোদ ও বিলাস। এই বিলাসের জন্য তিনি শৈবলিনীর হৃদয় তুষিতে পারেন নাই; তিনি স্ত্রৈণ হইতে পারেন নাই। চন্দ্রশেখরের চিন্তা এবং চিত্তের ভাব সমুদায় অত্যন্ত উন্নত ছিল। শৈবলিনীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া তিনি পুনঃগ্রহণ করিলেন। বিনোদের গুণ স্বতন্ত্র। অথবা তাঁহার কি কি গুণ ছিল আমরা তাহার বিশেষ পরিচয় পাই নাই। কেবল তাঁহার স্ত্রৈণতা ও শৈলের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ এবং প্রেমেরই পরিচয় পাইয়াছি। শৈবলিনীর প্রতি চন্দ্রশেখরের অনুরাগ বঙ্কিমবাবু দুইটি ঘটনা দিয়া যেরূপ নিপুণতা ও আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন, সঞ্জীব বাবু শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও তাহা পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। চন্দ্রশেখর যখন নবাবের নিকট হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শুনিলেন, শৈবলিনী গৃহে নাই, তখন তিনি তাঁহার সমুদায় প্রিয়তম, বহুআয়াসলব্ধ মহামূল্য গ্রন্থ-রাশিতে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া একে একে সেই সর্ব্বনাশকারী গ্রন্থগুলি ভস্মসাৎ করিলেন, এবং শৈবলিনীর জন্য বিরাগী হইয়া গিয়া যখন তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন পুনরায় আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক সংসার ধর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ইহাতে চন্দ্রশেখরের অনুরাগ বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ তাঁহার চরিত্র সুরক্ষিত হইয়াছে এবং মহত্ত্বেরও পরিচয় হইয়াছে। বিনোদের চিত্রে আমরা এরূপ কৌশলময় অঙ্কপাত দেখিতে পাই না। বিনোদ যেন তন্তুকীটের মত একাকী নির্জ্জনে হৃদয় হইতে আপনার প্রণয়-সূত্র বাহির করিতেছেন এবং সেই সূত্ররাশিতেই নিবদ্ধ হইয়া আছেন। সে অনুরাগের ফল কি দাঁড়াইল আমরা তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। চন্দ্রশেখর একজন পুরুষের মত কার্য্য করিয়া গেলেন, কিন্তু বিনোদ কি করিলেন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনি শৈলের জন্য যে নিজে জেলে গিয়াছিলেন, সে কল্পনায় আমরা সঞ্জীব বাবুকে প্রশংসা

করিতে পারিনা। কারণ তাঁহার বিজ্ঞাপনেই প্রকাশিত আছে।

কিন্তু বিনোদের অনুরাগ চিত্রের দুইটি স্থল অতিসুন্দর। বিনোদ প্রেম-নৈরাশ্যে পড়িয়া রাজ-প্রাসাদ হইতে শম্ভুকে যে কয়েক খানি পত্র লেখেন তাহাতে তাঁহার মনের ভাব অতি সুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে। সেই পত্রাবলি ভাবে পরিপূর্ণ, তাহাতে বিনোদের তাৎকালিক চিত্তভাব গম্ভীর জলাশয় গর্ভস্থ প্রতিবিম্বের মত আমরা দেখিতে পাই। বাক্যাবলিতে হৃদয়ের শূন্যভাব স্পষ্ট ব্যক্ত কিন্তু সেই শূন্যভাবের মধ্যে গভীর প্রণয়-নৈরাশ্য চমৎকার রূপে প্রতিবিম্বিত দেখায়। ইহাই এই পত্রাবলির সৌন্দর্য্য এবং চাতুরী। এই প্রেম-নৈরাশ্য কিছুকাল পোষিত হইলে তাহা হৃদয়কে কেমন আবার প্রেমের দিকে পুনরায় গড়িয়া আনে, তাহাও গ্রন্থকার অতি কৌশল পূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন। এই চিত্রাংশ এমন সুন্দর যে আমরা তাহার বিশেষ পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই দেখুন বিনোদের প্রেমময় হৃদয় কালক্রমে আপনাপনি পুনরায় কেমন গড়িয়া আসিতেছে। কাল, প্রেমের সঙ্গে যোগদিয়া শৈলের দোষ বিস্মৃতির নীরে ডুবাইয়া দিয়াছে। বিনোদের প্রেমকল্পনা শৈলকে কালের বিস্মৃতিনীরে ডুবাইয়া এখন কিরূপে বিনোদের সমক্ষে উপনীত করিতেছে দেখুন:—

"ঘুম আবার অলসভরে ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল। এবার তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ প্রফুল্লিত হইল: পূর্ব্বে যাহা মনে আসিয়া আইসে নাই এবার তাহা মনে আসিল—তাঁহার পূর্ব্ব সুখ—যে সুখে আপনি শৈলের অন্তরে ডুবিয়াছিলেন, শৈলকে অপনার অন্তরে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সুখপ্রতিমা, আলোকময়ী আহ্লাদময়ী দেবপ্রতিমার ন্যায় মনে আসিল। বিনোদ ভাবিলেন আমি কত সুখেই ছিলাম। শৈল কি সত্য সত্যই এই কার্য্য করিয়াছিল, সেই রাত্রে আমি যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি তাহা কি নিশ্চিত? না; হয় ত আমার ভ্রম। ভ্রম ত লোকের হয়। আমি হয় ত সে রাত্রে অজ্ঞানাবস্থায় অন্য কাহারও বাটীতে গিয়াছিলাম। প্রদীপ হস্তে যে যুবতীকে দেখিয়া শৈল ভাবিয়াছিলাম সে হয় ত আর কেহ হইবে। শৈল সে সকল অলঙ্কার কোথা পাইবে, একথা আমার তখনই বিবেচনা করা উচিত ছিল। কি আশ্চর্য্য! এই সকল কথা আমি এত দিন অনুধাবন করিয়া দেখি নাই; অনর্থক এই মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় জ্বলিতেছি।"

প্রেম সকলই পবিত্র করিতে পারে। সেই প্রেম, সেই অন্ধ প্রেম তাঁহার মনে এই চিন্তা সহসা উদিত করিল। তিনি সেই চিন্তাকে কেমন গোপনে হৃদয় মধ্যে অমূল্য নিধি বলিয়া লুকাইয়া রাখিলেন দেখুন। এভাব কি কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবার যোগ্য!

"বালকে কোন পক্ষিশাবক হঠাৎ

কুড়াইয়া পাইলে যেমন আহ্লাদে উছলিয়া উঠে, চারি দিক্ দেখে, আর শাবকটি বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে থাকে, বিনোদ সেই রূপ মনের এই ভাবটি আহ্লাদে অন্তরের ভিতরে লুকাইতে লাগিলেন। "সে যুবতী শৈল নহে-আর কেহ হইবে' এই কথা গুলিন যেন বিনোদ হঠাৎ কুড়াইয়া পাইলেন, এবং বালকের মত সুখে পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে টিপিয়া ধরিতে লাগিলেন।"

চিত্রের এই অবস্থা বর্ণনাটি কি স্বাভাবিক, কি সুন্দর। কল্পনা এই চিন্তাকে ক্রমে বাড়াইতে লাগিল। বিনোদের মন তখন শৈলের দিকে ধাবিত হইল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বিনোদ উঠিলেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে এক স্থানে চন্দ্রবশ্মিকে কোন ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার ভ্রম জন্মিল। সেই ভ্রম লইয়া প্রেম তখন বিনোদের পূর্ব্বচিন্তাকে কেমন বর্দ্ধিত করিতেছে দেখুন "বিনোদ ভাবিলেন আমাদের এত সহজেই ভ্রম হয়; বৃক্ষচ্ছায়ায় চন্দ্রকিরণ যদি মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, তবে অজ্ঞানাবস্থায় এক ব্যক্তিকে দেখিয়া আর এক ব্যক্তি বোধ হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? অপর সুন্দরীকে শৈল বলিয়া বোধ হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি!"

এই অনুকূল দৃষ্টান্ত বিনোদের পূর্ব্বচিন্তা সমর্থিত করিল। বিনোদ নিশ্চিত ভাবিলেন, শৈল সম্বন্ধে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা সকলই ভ্রম। তখন তিনি শৈলকে দেখিবার জন্য আহ্লাদে নাচিয়া উঠিলেন। যে রূপে তাঁহার এই সুখস্বপ্ন বিনষ্ট হয় তাহা গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, আর বলিবার আবশ্যক করে না। কিন্তু শৈলের প্রতি বিনোদের এই হৃদয়গতির চিত্রখানি কেমন স্বাভাবিক ও সুন্দর, পাঠক তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

গ্রন্থের অনেক স্থল এই রূপ স্বাভাবিক সুন্দর চিন্তায় পরিপূর্ণ। বাস্তবিক এ গ্রন্থের আর একটি বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, ইহার ব্যক্তিগণ অনেকেই একাকী অবস্থিত হইয়া স্বাভাবিক ভাবে হৃদয়-ভাব ব্যক্ত ও চিন্তা করিতেছে। সঞ্জীব বাবু এই সমস্ত হৃদয় ভাব ও চিন্তা এমত অনুরূপ চিত্রিত ও বর্ণিত করিয়াছেন যে তাঁহাকে তদ্বিষয়ে এক জন সুনিপুণ লেখক বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বিলাস বাবুর হৃদয় চিত্রখানি এই রূপ সুন্দর ও স্বাভাবিক তাহাতে সেই পাপীর অনুতাপ, ভয়, উদ্বেগ ও হৃদয়ের চঞ্চলতা এবং যন্ত্রণার ভাব যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। সে চিত্র খানি এত দীর্ঘ যে আমরা তাহা এখানে পাঠকগণের সমক্ষে ধরিতে পারিলাম না। আর এক স্থলে দেখুন বিনোদ বাবুর দাসী ভগীর অবস্থা দেখিয়া কিরূপ সন্তাপিত হইয়াছিল। তাহা নিজ মুখে কেমন সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিতেছেঃ—

"দৈত্যের মা উত্তর করিল—আমি জেলখানার নিকটে একটি গৃহস্থের বাটীতে আছি, আমাদের বাবুকে দেখিতে পাব

বলে সেই খানে গিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, একান্ত দেখিতে না পাই, তথাপি তাঁহার নিকটে আছি, এই মনে করিতে পারিলে ও আমার সুখ হবে। এক এক দিন জেলখানার ভিতর সন্ধ্যার সময় বড় গোল হইত; কেন গোল হইত তখন আমি তাহা জানিতাম না; কিন্তু আমার প্রাণের ভিতর কাঁদিয়া উঠিত; কত দেবতার নিকট মানিতাম যেন আমাদের বাবুর আবার কোন বিপদ না ঘটে। এই বলিতে বলিতে দেঁতোর মা অঞ্চল দিয়া আপনার চক্ষের জল মুছিল। তাহার পর দেঁতোর মা বলিতে লাগিল, এক দিন বাবুকে দেখিতে পাইলাম, তিনি অন্য কয়েদীর সঙ্গে পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। একে স্বভাবতঃ শান্ত, তাহাতে লজ্জায় ঘৃণায় একেবারে মাটী হইয়া গিয়াছেন। বাবু ধীরে ধীরে জলে নামিলেন, কোন দিকে ফিরেও চাহিলেন না, কাহারও সহিত কথা ও কহিলেন না। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে ঠাকুর, বাবু একটা কথা কহেন ত আমার কাণ জুড়ায়। পরে বাবু জলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন। বাবু যখন হাত যোড় করিয়া সূর্য্যের দিকে মাথা তুলিলেন, আমার বুক উথলে উঠিল। আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম বাবু মনোবেদনা সূর্য্যদেবতাকে জানাইতেছেন। আমিও সেই খানে কলসী রাখিয়া তেমনি করিয়া হাত যোড় করিয়া সূর্য্যের কাছে কাঁদিলাম। বলি ঠাকুর, তুমিই এ সংসারের সত্য, তুমি সকল দেখিতেছ, রাত দিন করিতেছ; বাবু যে নির্দ্দোষী তা জেনেও কেন দুঃখ দেও ঠাকুর! যেমন করে তুমি অন্ধকার নষ্ট করিয়া থাক, এক বার তেমনি করে বাবুর শত্রু নষ্ট কর, দশে ধর্ম্ম দেখুক। বাবুর সেই যোড় হাত যখনই মনে পড়িত, তখনই কেঁদে উঠিতাম।"

এই দাসী প্রথমে শৈলের কুমন্ত্রণাতে যোগ দিয়াছিল, কারণ সে দাসী মাত্র, অল্পবুদ্ধি, অভদ্রা, এবং শৈল তাহার কর্ত্রী। তথাপি এই অভদ্রা দাসী কণ্ঠমালা চুরীতে চমকিত হইয়া গিয়াছিল। শৈলের দোষে যখন বিনোদ বাবু সত্য সত্যই কারাবাসে গেলেন, তখন এই দাসীর হৃদয় কেমন কাঁদিয়া উঠিল, তাহা গ্রন্থ মধ্যে সুন্দর বর্ণিত আছে। তাহার কাতর বাক্যাবলি শুনিলে তাহার চরিত্রে মোহিত হইতে হয়। এ দাসীও শৈল অপেক্ষা শত গুণ শ্রেষ্ঠ।

আর একা শৈল কি দুশ্চারিণী! কি ঘোর পাপীয়সী! এক জন সামান্য বেশ্যার হৃদয়েও তদপেক্ষা অধিকতর মমতা আছে। বিনোদের প্রতি তাহার ব্যবহার দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। যে বিনোদ তাহার জন্য কারাবাসে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, সেই বিনোদ যখন অস্থিসার হইয়া ছয়মাসের পর স্বীয় প্রাণেশ্বরী প্রাণপ্রতিমাকে দেখিতে আসিলেন, পিশাচী শৈল তখন তাহাকে দেখিয়া যে মর্ম্মভেদী বাক্য বলিয়াছিল, কোন বারবিলাসিনী বিশ্বাসঘাতিনীও তাহা বলিতে পারে

না। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন "ঘটনাক্রমে শৈবলিনীর চরিত্র সংশোধিত হইতে আরম্ভ হয়; কণ্ঠমালায় অবিকল তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।" আমরা শৈলের চরিত্র সংশোধনের চিত্র সমস্ত গ্রন্থের কোন স্থলে দেখিতে পাই নাই। তাহার সহিত বিনোদের পুনর্মিলন হইয়াছিল বটে, কিন্তু কই, তাহার পর ত শৈল-হৃদয়ের বিনতির পরিচয় ত কিছুই পাই-লাম না। কি জন্য তবে এতদিন গ্রন্থকার শৈলকে অন্ধকূপের নির্গাতনায় রাখিয়া পাঠকের হৃদয় ব্যথিত করিলেন? পাঠক এই ব্যথার পর কি সন্তোষ লাভ করেন? কিছুই না। তবে কেন গ্রন্থকার এত ক্লেশ করিয়া তাঁহার কল্পনায় এক ভীষণ যাতনাগার সৃষ্টি করিলেন? সাহিত্য-সংসারে যদি কোন শাসনপ্রণালী থাকিত তবে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, আমা-দিগের গ্রন্থকার এই দোষের জন্য দণ্ডার্হ হইতেন।

শৈলের পর সরলা মাধবীলতার সুন্দর শোভায় হৃদয় ও মন মোহিত হইয়া যায়। মাধবী কণ্ঠমালায় অতি মধুময় চিত্র। যদি কণ্ঠমালায় কিছু সৌন্দর্য্য থাকে, তাহা মাধবীর জন্য। যদি কণ্ঠমালায় কোন চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে তাহা মাধবীর সুবর্ণ-ময় চিত্র। এই বিমোহন চিত্র আমা-দিগের হৃদয়-দর্পণে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। আমরা প্রথমে ভাবিয়াছিলাম মাধবী কণ্ঠমালার গিরিজায়া; কিন্তু তৎপরে দেখিলাম তাহাকে গিরিজায়া অপেক্ষা অনেক উচ্চস্থানে স্থাপিত করিতে হয়। মাধবীর চিত্রে এমন সুন্দর অঙ্কপাত আছে, যাহা গিরিজায়াতে নাই। সামান্যা ভিখারিণী অপেক্ষা গিরিজায়া যত গুণে শ্রেষ্ঠ, মাধবী গিরিজায়া অপেক্ষা ততগুণে শ্রেষ্ঠ। গিরিজায়া যুবাজনের চিত্তরঞ্জিনী, মাধবী পরিণতবয়স্কগণের সম্মুখে মনোহারিণী প্রতিমা। গিরিজায়ার গানে যুবাজনের চিত্ত উথলিয়া উঠে, মাধবীর "গীতধ্বনি ক্রমে চন্দ্রলোকে মিলাইয়া যায়"* গিরি-জায়া চঞ্চলা প্রগল্‌ভা যুবতী, মাধবী স্থির সরলা অর্দ্ধবয়স্কা সুন্দরী। গিরিজায়া চঞ্চলা অস্পষ্ট তারকা, মাধবী প্রভাময় স্থির নক্ষত্র। মাধবীর জ্যোতিতে রজনীর ঘনতিমির কথঞ্চিৎ অপসারিত হয়।

গিরিজায়া ভিখারিণী বটেন, কিন্তু তিনি সামান্যা ভিখারিণী নহেন। ভিখারিণীর চিত্রে কতিপয় মনোহর বর্ণপ্রয়োগ করিয়া বঙ্কিমবাবু গিরিজায়াকে ভিখারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। গিরিজায়া সামান্য গ্রাম্য অনাথা বালিকা. এই পর্য্যন্ত তিনি ভিখারিণী। কিন্তু যখন সেই গ্রাম্যবা-লিকাকে দেখি সুস্বর লহরীসুধা বিতরণ করিতেছেন, যখন দেখি তিনি কাব্যদেবীর ন্যায় সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় উপ-যোগী গান আপনি বিরচন করিয়া গাহি-তেছেন, যখন দেখি তিনি দুঃখিনীর দূতী

* উদ্ধৃত বাক্যাবলি কি সুন্দর ভাব-পূর্ণ। কবি এমত সুন্দর পদ রচনা করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

হইয়া সাহসভরে সর্ব্বস্থানে গিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহার শরীরে ভিখারিণীর অপেক্ষা অনেক গুণ উচ্চতর ধর্ম্মের সমাবেশ দেখি। গিরিজায়া বয়সের দোষে রসিকা, রঙ্গপ্রিয়া, চঞ্চলা যুবতী। তাঁহার প্রগল্‌ভতা ভিখারিণীর দোষ। কিন্তু গিরিজায়া বয়সদোষে গ্রাম্য ভিখারিণীর ন্যায় অসতী নহেন। এই গুণে তাঁহার রঙ্গপ্রিয়তা, রসিকতা ও চঞ্চলতা সকলই শোভা পাইয়াছে। তাঁহাকে ভিখারিণী অপেক্ষাও উচ্চপদে তুলিয়াছে। আবার যখন দেখি গিরিজায়া সহৃদয়তার সহিত হেমচন্দ্রের দূতী হইয়া মৃণালিনীর সম্বাদ আনিয়া দিয়া তাঁহাকে সুখী করিলেন, যখন তিনি দুঃখের দুঃখিনী হইয়া গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া মৃণালিনীর সহিত দেশে দেশে ফিরিতে লাগিলেন, মৃণালিনীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, মৃণালিনীর সহিত হেমচন্দ্রের মিলন সাধন জন্য কত অপমান ও কষ্ট স্বীকার করিলেন, তখন কি আর তাঁহাকে সামান্য ভিখারিণী বলিয়া প্রতীতি জন্মে? তখন তাঁহাকে কি এক রমণীরত্ন বলিয়া বোধ হইতে থাকে না? গিরিজায়া দুঃখিনীর সহচরী, প্রেমমিলন ও শান্তির দূতী এবং দুঃখভাগিনী। ভিখারিণী বেশে পরমাসুন্দরী রমণীরত্ন।

মাধবী ও তাপিতের হৃদয়ে সুখলহরী বিস্তার করিয়া সান্ত্বনা দান করিতেন। কিন্তু মাধবীর পরদুঃখকাতরতা গিরিজায়া অপেক্ষা অধিকতর। মাধবী বিনোদের আবাসে এবং শৈলের অন্ধকূপে যেন স্বর্গীয় দূতীর ন্যায় সহসা উদিতা হইয়াছিলেন। শৈলের প্রতি তাঁহার মমতা ও সহানুভূতি দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহার গুণে পশুপক্ষীও একদিন তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকে। তিনি শৈলের দুঃখে দুঃখিনী হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন দিতেও সম্মত হইয়াছিলেন। শৈলের সহিত তাঁহার স্নেহময় ও কাতরতার কথাবার্ত্তা শুনিলে অনুমান হয় তিনি যেন পৃথিবীতে কেবল পরদুঃখমোচনের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার জীবনের আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল না। কোন সুরবালা উদাসিনীবেশে যেন এই পৃথিবীর দুঃখমোচনের জন্য ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি সেই অন্ধকারাগারে শৈলের পার্শ্বে গিয়া যেমন দুঃখিনী হইয়াছিলেন, সমুদায় পৃথিবী ঘুরিয়াও সে রূপ দুঃখিনী হয়েন না। পৃথিবীতে যেন তিনি দিশাহারার ন্যায় বেড়াইতেছিলেন। সেই অন্ধকূপে নির্জ্জন দুঃখকারাগারে শৈলের পার্শ্বে বসিয়া ভাবিলেন, পৃথিবীর মধ্যে সেই তাঁহার মনোমত স্থান। সমুদায় পৃথিবী তাঁহাকে দুঃখিনী করিতে পারে নাই। শৈলের সহিত মিলিত হইয়া তাহার মুক্তির জন্য তিনি কিছুমাত্র উদ্যোগিনী হইলেন না। গিরিজায়া এস্থলে অন্যবিধ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু মাধবীর হৃদয় অন্যরূপ। দুঃখ হইতে একেবারে মুক্ত করা মাধবীর কার্য্য নহে। মাধবী নিজে অনাথিনী অভাগিনী ছিলেন। তিনি

চাহিতেন তাঁহার মত অনাথিনী অভাগিনীর কাছে গিয়া চিরজন্ম হৃদয়ের সন্তাপ হরণ করেন। পৃথিবীর সুখে তাঁহার আশা ছিল না। পৃথিবীর দুঃখে তিনি দুঃখিনী হইতেই সুখবোধ করিতেন। রমণীর জন্য রমণীহৃদয় কাঁদিয়া উঠে তাহা গিরিজায়াও প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু গিরিজায়ার হৃদয়ব্যথা নিশ্চয় ব্যথা বলিয়া বোধ হয়, সে ব্যথা অপনীত হইবার জন্য ঔষধ চাহে। মাধবীর হৃদয়ব্যথা স্বতন্ত্র প্রকার। সে ব্যথা অপনীত হইতে চাহে না, কিন্তু চিরকাল পোষিত হইতে চাহে; যেন পরদুঃখ কাতরতা পৃথিবীর কোন অমূল্য ধন। মাধবীহৃদয়ের এই বিশেষ চমৎকার ভাব দেখিয়া কে না তাঁহাকে গিরিজায়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিবে? মাধবী আসিয়া শৈলের নিকট পরিচয় দিলেন "আমি অনাথিনী, তোমার মত অভাগিনী, আমার আর কেহ নাই, আমি একাকিনী" শৈল ভগ্নস্বরে বলিল, "বুঝেছি, তোমার কেহ থাকিলে তোমায় কেন এখানে আসিতে দিবে, তুমিই বা কেন আসিবে; অনাথিনী না হইলে কেন অনাথিনীর দুঃখ ভাবিবে?" আবার দেখুন মাধবী একস্থলে বলিতেছে "তুমি একা ছিলে এখন আমরা দুইজন হইলাম, আর আমাদের ভাবনা কি? এখন দুইজনে একত্রে ঘুমাব, একত্রে জাগিব, একত্রে গল্প করিব, একত্রে হাসিব, একত্রে কাঁদিব, আর আমাদের ভয় কি?" শৈল বলিল, "তবে কি তুমি আমার সঙ্গে এই খানেই থাকিবে? আমার জন্যই কি এখানে থাকিতে আসিয়াছ? এত দয়ার শরীর? তুমি কি আর যাবে না?" মাধবী উত্তর করিলেন "এ জন্মে নহে। আমি কোথায় যাব? আমার কে আছে? যতকাল তুমি এখানে থাকিবে, ততকাল আমিও এখানে থাকিব।"

মাধবী হৃদয়ের একি সুন্দর ভাব! গিরিজায়া ত একদা মৃণালিনীকে তাহার গৃহে একাকিনী বিরাগিণীরূপে পাইয়াছিলেন। গিরিজায়াও ত মৃণালিনীর পার্শ্বে বসিয়া অনেক দিন তাঁহার দুঃখে কাতরা হইয়াছিলেন। কিন্তু গিরিজায়ার চেষ্টা মৃণালিনীকে সুখী করিয়া নিজে সুখিনী হয়েন। মাধবী নিজের সমবেদনা খুঁজিয়া বেড়াইত। মাধবীর মত এরূপ সুন্দর ভাবের বিকাশ এ পৃথিবীতে অতি সুদুর্লভ। চিরদিনের জন্য কাহারও দুঃখে দুঃখিনী হইতে সুখবোধ হওয়া রমণী-হৃদয়ে ও সুদুর্লভ বলিতে হইবে। শৈলকে পার্শ্ব হইতে লইয়া যাইবার জন্য সন্ন্যাসী আসিয়া যখন মাধবীকে পীড়ন করিতে লাগিল, তখন সেই পীড়নে [illegible] আরও দ্বিগুণ [illegible] বিকসিত হইল।

অথচ মাধবীকে কি [illegible] সময়ে ম্লানমুখী দুঃখিনী বলিয়া বোধ হইত? তাহাও নহে। এই দেখুন অন্যস্থলে মাধবীর কেমন চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে— "শৈল অপেক্ষা মাধবী প্রায় সাত আট বৎসর বয়োধিক, অথচ শৈল ক্ষীণাঙ্গী, মাধবী তেমন [illegible]। শৈলকে কখন

হাসিতে দেখা যাইত না, মাধবী কখন হাসিছাড়া থাকিত না। মাধবী কখন উচ্চ হাসি হাসিত না অথচ সতত হাসিত; মিষ্ট কথায় বক্তার মুখপ্রতি চাহিয়া হাসিত; রুষ্ট কথায়ও হাসিত কিন্তু সে সময় নিকটস্থ শ্রোতাদিগের মুখপ্রতি চাহিয়া হাসিত। আবার যখন অপ্রতিভ কি লজ্জিত হইয়া হাসিত তখন মৃত্তিকার প্রতি চাহিত। মাধবীর অপ্রতিভের হাসি, আর তাহার দুঃখের কান্না প্রায় একইরূপ দেখাইত; হাঁসিতেছে কি কাঁদিতেছে সহজে তাহা বুঝা যাইত না। অনেকে বলিত ওষ্ঠের গঠনের নিমিত্ত তাহার ক্রন্দনেও হাসি বোধ হইত। আবার কথায় কথায় তাহার মুখ আরক্ত হইত। তৎসঙ্গে নিম্নদৃষ্টি, নাসাগ্রে ঘর্ম্ম, ওষ্ঠকম্প দেখা যাইত। শৈলের এসকল কিছুই ছিল না; শৈলের দৃষ্টি সর্ব্বদাই তীব্র বোধ হইত। মাধবীর নয়ন স্বভাবত ভীতা, কেহ তাহার চক্ষু প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নয়নপল্লব নামিয়া তৎক্ষণাৎ চক্ষু দিগকে আচ্ছাদিত করিত।" উন্মাদিনী গিরিজায়ার প্রফুল্লতা অন্যবিধ ছিল। গিরিজায়া সকলই রঙ্গপ্রিয়। গিরিজায়া দুঃখে ডুবিয়াও পদ্মিনীর ন্যায় প্রফুল্লিত হইয়া উপরে ভাসিয়া ভাসিয়া দিবালোকে হাসিতে থাকিতেন। গিরিজায়া দুঃখের ঘরে বাস করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে যেন কি সুখ আছে; সেই সুখ সর্ব্বদাই উথলিয়া পড়িত। তিনি দুঃখিনী মৃণালিনীর পার্শ্বে থাকিয়াও অন্যবরীর সহিত স্বচ্ছন্দে রঙ্গরস করিতেন। আপনার মনের আনন্দে সর্ব্বদাই গীত গাহিয়া বেড়াইতেন। যে সুখী হইত, তাহাকে তাহাতে সুখী করিতেন; যে দুঃখী হইত তাহাকেও সেই গীতসুধায় সুখী করিতে চাহিতেন। উপহাস কিরূপ মাধবী তাহা কখনই জানিতেন না, গিরিজায়া সর্ব্বদাই উপহাস লইয়া থাকিতেন। গিরিজায়া সকলের মুখপ্রতি চাহিয়া আমোদিনীর ন্যায় মুচকিয়া মুচকিয়া হাসিতেন। তিনি মাধবীর ন্যায় অপ্রতিভ কি লজ্জিত হইয়া হাসিতেন না। গিরিজায়ার মুখমণ্ডল কৌমুদীময়; মেঘাবরণে কৌমুদী যে ভাব ধারণ করে, মাধবীর সেই ভাব।

সরলা মাধবী বনদেবীর ন্যায় বনে বনে বেড়াইতেন। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে মোহিত হইতেন। মাধবী লজ্জিত হইলে "নতমুখে ঈষৎ হাসি হাসিতে মাধবীলতার নবপত্র কোমল অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন।" কখন "উপবনে কতকগুলি লতাপুষ্প হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন।" যেন সরলতা ও ধীরতা বনদেবীবেশে লোকলোচন মোহিত করিতে আসিয়াছেন। সংসারের চপলতা ও চাতুরী মাধবী জানিতেন না। তাঁহার অসাংসারিক সরলতাব একখা অঙ্গের স্বর্ণ অলঙ্কার পরিতেও লজ্জিত হইত।

গিরিজায়া ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। গিরিজায়া সংসারের রঙ্গরসে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। তিনি সংসারের চাতুরীও

বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি চতুরকেও চাতুরালিতে পরাজয় করিতেন। তাঁহার প্রগল্‌ভতা, প্রফুল্লতা, ও চাতুরী, লজ্জাকে হরণ করিয়াছিল। বন্য সরলতা গিরিজায়াতে নাই। গিরিজায়ার লজ্জা হাসি ও সমুদায় ভাবে সাংসারিক ভাব পরিদৃষ্ট হইত। গিরিজায়া যদি কখন লজ্জিত হইতেন, সে লজ্জা সংসারিণীর সলজ্জতা। তাহাতে অন্য ভাবগুলি জড়িত আছে। তাহা মাধবীর সরল লজ্জা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গিরিজায়ার চঞ্চলতা, রসিকতা ও প্রফুল্লতায় সংসারিণীর ভাব উথলিয়া পড়িত। মাধবীর ধীরতা, পরদুঃখকাতরতা এবং সলজ্জ ভাবে সরলতা প্রচ্ছন্ন ন্যায় দেখা যাইত। গিরিজায়া কুসুম-শোভিত, ঈষৎ-বায়ু-কম্পিত, হাস্যযুতা উদ্যানশোভিনী লতা। মাধবী, নবকিসলয় শোভিত, সরলা মনোহারিণী বনস্থিত লতিকা। একজন চিত্তকে উদ্বেলিত করে, অন্যজন মনকে মোহিত করিয়া রাখে। একজনের সৌন্দর্য্য সকলেই দেখিতে পায়; অন্যজনের প্রতি স্থির-নয়নে চাহিয়া থাকিলে তবে তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া ক্রমে মন মোহিত হইতে থাকে।

আমরা মাধবী ও গিরিজায়ার চিত্র অনেকদূর তুলনায় প্রদর্শন করিয়া দেখাইলাম। এক্ষণে বোধ হয় এই দুই চিত্রের বিশেষ ভাব সকল অনেক পরিস্ফুট হইয়া থাকিবে। মাধবী কণ্ঠমালার একখানি ক্ষুদ্র চিত্র বটে, কিন্তু এই সামান্য চিত্র সমুদায় গ্রন্থকে শোভিত করিয়াছে। আমরা গ্রন্থের শেষভাগে যেমন অপরাপর চিত্রের বর্ণগ্রাস দেখিয়া বিষাদিত হই, মাধবীর চিত্র দেখিয়া তেমনি আনন্দিত হইতে থাকি। অন্যগুলি বিবর্ণ হইয়া চিত্র-ভূমিতে মিশাইয়া যাইতেছে, মাধবী ক্রমশঃ উজ্জ্বলবর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। মাধবীর রূপ-মাধুরী ক্রমে মনোমন্দির অধিকার করিতে লাগিল। বিনোদের হৃদয়-সৌকুমার্য্য, শম্ভুর প্রকাণ্ড গৌরব এবং সন্ন্যাসীর কঠোরতা ক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম। অথবা ইহাদিগের পার্শ্বে মাধবী দেবীমূর্ত্তি বলিয়া প্রভাসিত হইতে লাগিল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

সেনবংশীয় নৃপতিগণের জাতি নিরূপণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৮। বহুদিবস গত হইল বাখরগঞ্জ অঞ্চলে রাজা কেশব সেন-প্রদত্ত একখণ্ড প্রস্তর ফলক * পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে বাৎস্যগোত্রীয় ঈশ্বর দেবশর্ম্মা নামক একজন ব্রাহ্মণকে বাগুলি, বেড়ঘাটা ও উদয়মুন নামক তিনখানা গ্রাম ব্রহ্মত্র করিয়া দেওয়ার কথা লিখা আছে। মহারাজ বল্লাল সেনের সম্বন্ধে এমন

* Vide Prinsep's Indian Antiquities Vol II. P. 272.

বিশেষ কিছু লিখিত নাই কিন্তু একস্থানে কেবল এই মাত্র লিখা আছে যে তিনি বহুকাল মহাদেবের তপস্যা করিয়া লক্ষ্মণ সেনের মত গুণনিধি পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেনবংশীয় নৃপতিগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন তাহা উহাতে স্পষ্টভাবে কিছুই লিখা নাই। কেবল স্থানে ২ তাহাদিগকে "শঙ্কর গৌড়েশ্বর" বলিয়া লিখা হইয়াছে। এই "শঙ্কর গৌড়েশ্বরের" অর্থ প্রিন্সেপ সাহেব দুই প্রকার করিয়াছেন। প্রথম যদি শঙ্কর শব্দের 'শ' তালব্য হয় তাহা হইলে উহা সেন রাজাদিগের গুণের পরিচায়ক। আর যদি "শঙ্কর" শব্দের 'স' দন্ত্য হয় তাহা হইলে উহা সেনবংশীয় রাজারা যে সঙ্কর (মিশ্র) জাতীয় ছিলেন তাহার এক প্রমাণ। প্রিন্সেপ সাহেব বোধ হয় এই সিদ্ধান্ত ও দেশীয় প্রবাদ অবলম্বন করিয়াই সেনবংশীয় রাজাদিগকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

৯। পূর্ব্ব-কথিত প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় অনেক কাল অতীত হইল সুন্দর বনে লক্ষ্মণ সেন প্রদত্ত আর একখণ্ড তাম্রশাসন * পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লক্ষ্মণ সেন কোন্ বংশীয় রাজা এবং তিনি কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৎসমস্তের এবং তাঁহার পিতা ও পিতামহের নাম লিখা আছে। আবার রাজসাহী অঞ্চলেও এই প্রকার প্রাচীন এক প্রস্তর খণ্ড † পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বীর সেন প্রভৃতি সেনবংশীয় রাজাদিগের গুণ কীর্ত্তন করিয়া উমাপতি ধরের রচিত ৩৬টী শ্লোক লিখিত আছে। এই উভয় প্রস্তর খণ্ডেই সেনবংশীয় রাজাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া উল্লিখিত আছে।

১০। ভারতাধিপ সম্রাট্ আকবরের প্রধান মন্ত্রী আবুলফাজল তাঁহার স্বকীয় আইন আকবরী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বল্লাল প্রভৃতি সেনবংশীয় রাজাদিগকে কায়স্থকুলোৎপন্ন * বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে নানাবিধ গ্রন্থ হইতে আমরা সেনবংশীয় রাজাদিগের জাতিবিষয়ক প্রমাণাদি গ্রহণ করিলাম। তাহার কারণ এই যে আজকাল প্রমাণের এত ছড়াছড়ি পড়িয়াছে যে প্রমাণ ব্যতীত একটী কথাও বলিবার যো নাই। ৫ বৎসরের শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই বলিবেন কেন? "প্রমাণ কি?" এই প্রমাণ চাহিতে গিয়া কেহ ২ নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা প্রমাণ না পাইলে কিছুই

* রামগতি ন্যায়রত্নের বঙ্গ ভাষার ইতিবৃত্ত দেখ।

† রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিত সেনবংশ এবং কান্তি মিত্র দেখ।

* আইন আকবরীর বঙ্গদেশ-বিষয়ক অধ্যায় দেখ।

বিশ্বাস করিবেন না। এই হেতু প্রিয়তা আজকাল বাঙ্গদেশে বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ত কথাই নাই; যাঁহারা মোকদ্দমা করা কি জিনিশ পত্র ক্রয় বিক্রয় উপলক্ষে কোন নগর কি উপনগরে গমনাগমন করিয়া থাকেন, অথবা যাঁহার দাদা মামা স্কুলে পড়েন বা পড়ান তিনিও শুনিয়া২ প্রমাণ ব্যতীত কিছু বিশ্বাস না করা অভ্যাস করিয়াছেন। এই অভ্যাস ভাল কি মন্দ আমরা এস্থলে কিছু বলিব না, কেবল এত আদরের প্রমাণ যে জিনিশটী কি আমরা আদৌ তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বহুবিধ প্রমাণ আছে। ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলা আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের লক্ষ্য। প্রমাণ ও প্রমেয় পরস্পর অনুগত। ইহার একটী না থাকিলে আরটী তিষ্টিতে পারে না। তুমি যদি কোন বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু ভাল মন্দ বল, তবেই তাহার যাথার্থ্যের বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মিতে পারে, তখনই আমি প্রমাণ চাহিলাম। প্রমাণের মধ্যে আগে চক্ষুর প্রমাণ বলবৎ অর্থাৎ তুমি বলিলে রাম রাবণকে বধ করিয়াছে যদি শ্যাম বলে "হাঁ আমি দেখিয়াছি" তবে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ। আমরা ঈদৃশ প্রমাণকে মৌলিক প্রমাণ নামে অভিহিত করিলাম। কারণ ইতিহাসে যাহা কিছু লোকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করেন তাহা ঈদৃশ প্রমাণ হইতেই জীবন লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ শ্রবণগত প্রমাণ। এই প্রমাণ উভয় প্রকৃতির। ইহা কখন মৌলিক ও প্রায়শঃ আহৃত। শ্রবণে ক্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা-বিশেষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রবণ মৌলিক ও তদ্ভিন্ন সকলই আহৃত। সুতরাং সকল প্রমাণের মূল মৌলিক প্রমাণ। আহৃত প্রমাণ মৌলিক-প্রমাণ-সাপেক্ষ। আহৃত প্রমাণ লিখিত আকারে থাকিলে লোকে তাহার অধিক আদর করে, কারণ তাহা স্থায়ী ও সহজে রূপান্তর হইতে পারে না। কিন্তু শুদ্ধ স্মৃতি শক্তির নিকট সমর্পিত হইলে লোকে তাহাকে প্রবাদ বলে ও অল্প আদর করিয়া থাকে, কারণ তাহার সহজে রূপান্তর হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু যে প্রবাদ সকলে একরূপে ও পরস্পর অবিরুদ্ধ ভাবে আছে বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহা বোধ হয় প্রাগুক্ত আহৃত কোন প্রমাণ অপেক্ষাই অল্প আদরণীয় নয়।

এক্ষণে বল্লাল-ঘটিত প্রমাণের মধ্যে লিখিত প্রমাণ ও প্রবাদ উভয়ই আছে। লিখিত প্রমাণের মধ্যে একটীও মৌলিক প্রমাণ নাই সকলই আহৃত। তবে কি না ইহাদের মধ্যে বলের তারতম্য আছে। লেখকদিগের বাসস্থান, ব্যবসায় ও সময় ইত্যাদি পর্য্যালোচনা দ্বারাই আমরা ইহার তারতম্য স্থির করিব। যিনি বাঙ্গদেশের সেই প্রাচীন গৌড়, নবদ্বীপ, রামপাল কি তৎসন্নিকট বর্ত্তি গ্রামবাসী অবস্থান সম্বন্ধে তাঁহারই বলবত্তা। ব্যবসায় সম্বন্ধে, যাঁহারা সামাজিক পরিবর্ত্তন লিখিয়াছেন

তাঁহাদেরই প্রাবল্য। কারণ বঙ্গে ইতিহাস-বেত্তা নাই। সময় সম্বন্ধে যিনি অধিক প্রাচীন তাঁহাকেই আমরা আদর করিব। প্রাগুক্ত নিয়মদ্বারা পরিচালিত হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করাই আমাদের অভিপ্রায়। সেনবংশীয় রাজাদিগের জাতি সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত প্রমাণ দেখিতে পাই তাহার মধ্যে কেহ তাঁহাদিগকে বৈদ্য, কেহ চন্দ্রবংশীয় এবং কেহ বা তাঁহাদিগকে কায়স্থ-জাতীয় বলিয়াও লিখিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব-কথিত দশটী প্রমাণের মধ্যে প্রথম পাঁচটী সেন-বংশীয় রাজাদিগকে এক বাক্যে বৈদ্য-জাতীয় বলিয়া স্বীকার করিতেছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রমাণে যদিও বল্লাল প্রভৃতি নৃপতিগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন তাহা স্পষ্ট ভাবে কিছুই লিখিত নাই, তথাপি ঘটনার সত্যতা ও ভাবের বিশুদ্ধতা হেতু তাঁহাদিগকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়াই পরিচয় দিতেছে। অষ্টম প্রমাণের যদি শেষোক্ত সিদ্ধান্ত সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অম্বষ্ঠ-কুলোৎপন্নই বলিতেছে। নবম প্রমাণে তাঁহাদিগকে কেবল চন্দ্রবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। জাতি সম্বন্ধে কিছুই লিখে নাই। কেবল দশম প্রমাণে তাঁহাদিগকে নিরপক্ষ ভাবে কায়স্থ-জাতীয় বলিয়া লিখিতেছে। এক্ষণে এই সমস্ত প্রমাণ পৃথক্ ২ করিয়া আমরা সমালোচনা করিব এবং স্থানে ২ প্রমাণের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের মত জ্ঞাপন করিয়া যাইব। আমরা সর্ব্ব প্রথমেই জনপ্রবাদ অবলম্বন করিয়া গুটিকত কথা লিখিয়াছি। দশবৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের আপামর সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে মহারাজ বল্লাল সেন বৈদ্যজাতীয় ছিলেন। কিন্তু গত ৫।৭বৎসর যাবত এই বিষয় লইয়া বঙ্গীয় সমাজে নানা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কেহ তাঁহাকে বৈদ্য এবং কেহ তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমরা এই বিষয় জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া কথোপকথন-চ্ছলে জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর করিলেন যে বল্লাল বৈদ্য-বংশীয় ছিলেন। আমরা তাহাতে বলিলাম যে এক্ষণে এতদ্দেশস্থ অনেকানেক সুশিক্ষিত লেখক বহুবিধ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে (বল্লালকে) ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহাতে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন যে "তাঁহারা যাহাই লিখুন না কেন আমি বাল্যকাল হইতে বল্লাল-সেনকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া জানি এবং এই বিশ্বাস আমার মন হইতে কখনও উন্মূলিত হইবে না।" এস্থলে আমাদের এগল্প প্রকটন করার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল মহারাজ বল্লাল সেন বৈদ্য-জাতীয় বলিয়া যে প্রবাদটী আছে তাহা কত দূর বদ্ধমূল তাহাই প্রমাণ করার উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বঙ্গে যবনাধি-কারের পর হইতে বৈদ্যদিগের সামাজিক

অবস্থার অত্যন্ত অবনতি হইয়াছে। ইহাতেই এক প্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে যে সেনবংশীয় রাজারা যে বৈদ্যকুল-সম্ভূত বলিয়া একটী প্রবাদ আছে তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। বিশেষতঃ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, যে প্রবাদ সকল একরূপে ও পরম্পর অবিরুদ্ধ ভাবে সত্য বলিয়া বিশ্বাসস্থলীয় হইয়া আসিয়াছে, তাহা লিখিত প্রমাণ হইতে কোন প্রকারেই অনাদরণীয় নয়। আমরা এক্ষণেও তাহাই বলিতেছি। নিরপেক্ষ পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

আমাদিগের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্রমাণ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির কুলগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থ সমুদয় কোন্ সময় লিখিত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। তথাপি এই সমুদয় গ্রন্থ যে অতি প্রাচীন তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। প্রায় অষ্ট শত বর্ষ অতীত হইল মহারাজা বল্লাল সেন বঙ্গদেশে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত করেন। তিনি স্বর্গবাসী হইলে তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনারূঢ় হইয়া কুলীনদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করেন। এই সময়ের অন্তত: দেড়শত কিম্বা দুইশত বর্ষের মধ্যে কুলগ্রন্থ সমুদয় রচিত হওয়ার সম্ভাবনা।

বৈদ্যদিগের কুলগ্রন্থও সর্ব্ব প্রথমে কোন্ সময় রচিত হয় তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। প্রবাদ আছে দুর্জ্জয় দাস নামক কোন একজন লেখক খৃষ্টীয় দ্বাদশ কিম্বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৈদ্যদিগের কুলগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপর কণ্ঠাভরণ-উপাধিধারী জনৈক বৈদ্য এই পুস্তক হইতে সার সঙ্কলন করিয়া অন্য একখানা কুলগ্রন্থ প্রচার করেন। কবিকণ্ঠহার শেষোক্ত পুস্তক হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় সমুদয় সংগ্রহ করিয়া ১৫৭৫ শকে অর্থাৎ ১৬৫৩ খৃ: অব্দে স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রচার করেন।

"কবিনা কণ্ঠহারেণ মাতুলোদিত বর্ত্মনা
পঞ্চসপ্ততিমৌ শাকে ক্রিয়তে কুলপঞ্জিকা।
কণ্ঠহার।

শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত কায়স্থকুলাচার্য্য-কারিকা কোন্ সময় লিখিত হইয়াছে তাহা আমরা অবগত নহি।

এক্ষণে যখন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির কুলগ্রন্থ মহারাজ বল্লালকে একবাক্যে বৈদ্যকুলোৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দিতেছে তখন তাঁহাকে আমরা সহসা ক্ষত্রিয় বলিতে সাহসী হই না। বিশেষতঃ যদি বল্লাল প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইবেন তাহা হইলে এই সমুদায় গ্রন্থে এপ্রকার লিখিত রহিল কেন? যাঁহারা কুলশাস্ত্র নিরূপণ করিয়াছিলেন তাঁহারা কি এতই অনভিজ্ঞ ছিলেন যে যিনি তাঁহাদের কুল নিরূপণ করিয়াছিলেন তিনি কোন্ জাতীয় ছিলেন তাহাই তাঁহারা জানিতেন না। ফলকথা বহুকাল অতীত হইল যে সমস্ত গ্রন্থে মহারাজ বল্লালকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছে সে সমস্তকে মিথ্যা

এবং ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে আমরা কখনও সাহসী হই না।

মহারাজ বল্লাল সেনের সঙ্গে তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনের যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং যাহাতে বঙ্গদেশস্থ সমস্ত বৈদ্যগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন তদ্বিষয় অবলম্বন করিয়াই ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রমাণ লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় অনেকেই জানেন যে এদেশে রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ নামে দুই শ্রেণীর বৈদ্য আছে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি ক্রিয়া কর্ম্ম হইতে পারে না। বিশেষতঃ রাঢ়ীয় বৈদ্যগণ এক্ষণ পর্য্যন্তও উপবীতধারী, কিন্তু বহুকাল অতীত হইল বঙ্গজ-শ্রেণীয় বৈদ্যদিগের উপবীত লোপ হইয়াছে। কি কারণে বঙ্গজ বৈদ্যগণের উপবীত লোপ হইয়াছে তাহা বোধ হয় অনেক বৈদ্য পর্য্যন্তও অবগত নহেন। সুতরাং আমরা অম্বষ্ঠাচার-চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ হইতে সেই বিবরণ অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছি।

এই অম্বষ্ঠাচার-চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ প্রায় ১৩০ বৎসর হইল রচিত হইয়াছে। যৎকালে মহারাজ রাজবল্লভ কাশী কাঞ্চী কর্ণাট মিথিলা নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে পণ্ডিত-মণ্ডলী আনাইয়া বহু আত্মীয় স্বগণ সহ পুনর্ব্বার উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকালে এই গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। এক্ষণে রাজনগরের কালীবাবু-কৃত অম্বষ্ঠাচার-চন্দ্রিকা নামক যে গ্রন্থ আছে তাহা প্রকৃত অম্বষ্ঠাচার-চন্দ্রিকা নহে, উহার সার সঙ্কলন মাত্র।

রামজীবন-কৃত কুলপঞ্জিকাতেও বল্লাল সেন এবং লক্ষণ সেনের বিবাদ বিশেষরূপ লিখিত আছে। সম্বন্ধনির্ণয়-প্রণেতা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লাল মোহন বিদ্যানিধি কুলপঞ্জিকার বিবাদ অবলম্বন করিয়াই মহারাজ বল্লালকে বৈদ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু অম্বষ্ঠাচার-চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থের সহিত ঐ কুলপঞ্জিকার অনেক মত-বিভিন্নতা আছে। অম্বষ্ঠাচার-চন্দ্রিকা গ্রন্থে বল্লালসেনীয় সম্প্রদায়ের উপবীত লোপ হওয়ার উল্লেখ আছে, কিন্তু কুলপঞ্জিকার বচনানুসারে লক্ষ্মণসেনীয় সম্প্রদায়ের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন হইয়াছিল। যাহা হউক সে বিষয় লইয়া তর্ক করা আমাদের ঐ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। কেবল কুলপঞ্জিকা বল্লালসেনকে কোন্ জাতীয় লিখিয়াছে শুদ্ধ তাহাই দেখা আমাদের উদ্দেশ্য। এই কুলপঞ্জিকাও প্রায় একশত বৎসর হইল লিখিত হইয়াছে। অষ্টম প্রমাণ সম্বন্ধে আমাদের আর অধিক কিছু বলিবার নাই। আমাদের যে মত তাহা প্রিন্সেপ সাহেবই এক প্রকার ব্যক্ত করিয়াগিয়াছেন। এক্ষণে উহার বিচারের ভার পাঠকের উপর।

নবম প্রমাণ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। আমরা পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছি যে লক্ষ্মণ সেন-প্রদত্ত যে প্রস্তর-ফলক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সেনবংশীয় রাজাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

কিন্তু অনেকেই এই সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে শুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করেন না। কারণ "চন্দ্রবংশ" এমত কোন্‌ শব্দ এই প্রস্তর-ফলকে পাওয়া যায় না। কেবল এক স্থানে "ঔষধনাথবংশ" বলিয়া লিখিত আছে। যথা—

সেবাবনম্রনৃপকোটীকিরীটরোচি-
রম্বুপ্লসংপদনখদ্যুতি বল্লবীভিঃ।
তেজোবিষজ্বরমুষোদ্বিষতামভূবন্
তৌণীভূজঃ স্ফুটমথৌষধনাথবংশে।

এই ঔষধনাথ বংশের অর্থ কেহ বা চন্দ্রবংশ এবং কেহ বা বৈদ্যবংশ বলিয়াও স্থির করিয়াছেন। ওষধি এবং ঔষধ শব্দের অর্থের অনেক বিভিন্নতা আছে। যে সমস্ত বৃক্ষের ফল পক্ব হইলে মৃত্যু হয় সেই সমুদয় বৃক্ষকে ওষধি বৃক্ষ কহে। কিন্তু ঔষধ শব্দের অর্থ তাহা নহে। রোগনাশক দ্রব্যমাত্রই ঔষধ নামে অভিহিত। চন্দ্রকে লোকে ঔষধনাথ বলে না, তাঁহাকে ওষধিনাথ কিম্বা ওষধিপতি কহে। এক্ষণে যিনি ঔষধ প্রথম আবিষ্কার করেন এবং যাঁহা দ্বারা ইহা রোগনাশক দ্রব্য রূপে পরিণত হয়, তাঁহাকেই লোকে ঔষধনাথ বলার বিশেষ সম্ভাবনা। সুতরাং চিকিৎসা-শাস্ত্র-প্রণেতা ভগবান্ ধন্বন্তরি সম্ভবতঃ এস্থলে ঔষধনাথ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। যাহা হউক্ এবিষয় লইয়া এস্থলে অনর্থক তর্ক করা একপ্রকার নিষ্প্রয়োজন। সাধারণে যখন "ঔষধনাথ বংশের" অর্থ "চন্দ্রবংশ" বলিয়া স্থির করিয়াছেন তখন আমরাও সেই মতের বিরুদ্ধাচারী হইতে ইচ্ছা করি না। বিশেষতঃ যখন অন্য এক খণ্ড প্রস্তর-ফলকে সেন-বংশীয় রাজাদিগকে স্পষ্ট-রূপে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, তখন তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ করা অসঙ্গত। বাস্তবিক সেনবংশীয় নৃপতিগণ যে চন্দ্রবংশীয় ছিলেন তদ্বিষয়ে বোধ হয় আর কাহার ও অবিশ্বাস কিম্বা দ্বিমতি হইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে "চন্দ্রবংশ" শব্দ শুনিয়াই অনেকে হয়তঃ বল্লাল প্রভৃতি নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয় বলিবেন। এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রমমূলক ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বলিতে কি ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র পর্য্যন্তও ইহার কুহকজাল হইতে এড়াইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ আমাদের দেশে চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশ শব্দের অর্থ অনেকেই সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত নহেন। অনেকের এই প্রকার সংস্কার যে কোন ব্যক্তি চন্দ্র কিম্বা সূর্য্য-বংশোৎপন্ন হইলেই তিনি ক্ষত্রিয় হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অম্বষ্ঠ, বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজগণের মধ্যে যে অনেকে চন্দ্র ও সূর্য্য বংশোদ্ভব ছিলেন তাহা অনেকে বোধ হয় স্বপ্নেও মনে ভাবেন না। যাহা হউক এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বাক্য পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়া সেনবংশীয় রাজারা যে অম্বষ্ঠ-কুলোদ্ভব ছিলেন তাহা প্রমাণ করিব।

সৃষ্টির প্রথমে বর্ণের কোন পার্থক্য ছিলনা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি আর্য্যগণ

সকলেই একবংশোদ্ভব ছিলেন। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বাক্য কেবল রূপক মাত্র। অর্থাৎ আপন ২ কার্য্যকলাপ দ্বারা আর্য্যগণ চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে—

একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥

হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে পৃথিবীতে এক বর্ণই বিদ্যমান ছিল। তৎপর কর্ম্মক্রিয়া দ্বারা আর্য্যগণ চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন।

অপিচ—

নবিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টাহি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতাঃ॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃক্রোধনাঃপ্রিয়সাহসাঃ
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়াঃ লুব্ধাঃসর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরাং গতাঃ।

"পূর্ব্বে বর্ণের কোন বিশেষ ছিলনা। সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময় ছিল। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রথমে সকলের সৃষ্টি হয়, সকলেই এক বর্ণ ছিল। পরে স্বীয় ২ কর্ম্মদ্বারা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা কামভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ, ক্রোধন-স্বভাব, সাহসী, সেই স্বধর্ম্মত্যক্ত (ব্রাহ্মণের ধর্ম্মত্যক্ত) রক্তবর্ণ দ্বিজেরা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা গোবৃত্তি (গোপালন) অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং কৃষিজীবী ছিলেন, সেই স্বধর্ম্মত্যক্ত (ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ত্যক্ত) পীতবর্ণ দ্বিজেরা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা হিংসা ও অসত্য আচরণে রত ও লুব্ধ ছিলেন এবং সকল কর্ম্মই অবলম্বন করিতেন, শৌচাচার-পরিভ্রষ্ট সেই কৃষ্ণবর্ণ দ্বিজেরাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই প্রকার, স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা সকলে পরস্পর বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি জাতি সকল যে এক-বংশীয় ছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তিন বর্ণ যজ্ঞোপবীতধারী এবং দ্বিজ-শব্দ-বাচ্য আর্য্যগণের চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হওয়ার পরেও তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি ও দান প্রতিদান প্রভৃতি ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। এবং এই জন্যই এক ব্যক্তির পুত্রগণ মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ কেহ ক্ষত্রিয় ও কেহ বৈশ্য হইয়াছেন। তাহার কয়েকটী উদাহরণ এস্থলে প্রদর্শন করা যাইতেছে। যথা—

বেণুহোত্রসুতশ্চাপি ভর্গো নাম প্রজেশ্বরঃ।
বৎস্যস্য বৎস্যভূমিস্তু ভৃগুভূমিশ্চ ভার্গবাৎ।
এতেহ্যঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেথ ভার্গবে
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যা স্ত্রয়ঃ পুত্রাসহস্রশঃ।

হরিবংশ— ২৯ অ।

ভার্গস্য ভার্গভূমিঃ ততশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রবৃত্তিঃ।

বিষ্ণু পুরাণ ৪ অংশ।

ভার্গ চন্দ্রবংশীয় ছিলেন। ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি, ভার্গভূমি হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছিল।

চন্দ্রবংশীয়েরা ব্রহ্মার সন্তান। ব্রহ্মা হইতে অত্রিমুনির উৎপত্তি, অত্রির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বুধ ও বুধের ঔরসে ইলার গর্ব্ভে পুরোরবা চন্দ্রবংশীয়দিগের আদিপুরুষের উৎপত্তি। পুরোরবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম আয়ু, আয়ুর বংশে গৃৎসমদের জন্ম। গৃৎসমদের পুত্র শৌনক। ইনি চতুর্ব্বর্ণের প্রবর্ত্তয়িতা ছিলেন। অর্থাৎ শৌনিকবংশীয়েরা (চন্দ্রবংশোদ্ভব) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণস্য প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ।"

বিষ্ণু পুরাণ ৪ অংশ

পুত্রোগৃৎ সমদস্যাসীৎ শুনকো
যস্যশৌনকঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব
বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ॥

মহাভারত হরিবংশ—২৯ অ।

আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তয়িতা বিখ্যাত ধন্বন্তরিও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া কীর্ত্তিত।

"কাশীরাজগোত্রে অবতীর্য্য ত্বমৈধা মষ্টাগায়ুর্ব্বেদং করিষ্যসি।"

বিষ্ণুপুরাণ।

পাঠকবর্গ বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে ভগবান ধন্বন্তরি অম্বষ্ঠ-জাতির আদিপুরুষ ও সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতা।

পুরোরবার পুত্র অমাবসুর বংশে জহ্নুর উৎপত্তি। এই বংশে বিশ্বামিত্র ঋষির উৎপত্তি হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র চন্দ্রবংশীয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

ততোব্রাহ্মণতাং যাতোঃ বিশ্বামিত্রোমহাতপাঃ।
ক্ষত্রিয়ঃ সোপিচ তথা ব্রহ্মবংশস্য কারকঃ।

মহাভারত।

বিশ্বামিত্রের শুশ্রুত নামে এক পুত্র ছিল। যথা—বিশ্বামিত্র সুতঃ শ্রীমান্ শুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছন্তি।

শুশ্রুত।

কাহারও মতে শুশ্রুত অম্বষ্ঠ-জাতীয় ছিলেন। তিনি অনেক স্থলে ভিষক্ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সত্য বটে আত্রীয়গোত্রের ব্রাহ্মণগণ অনেক স্থলে বৈদ্য ব্যবসা করেন ও ভিষক্ বলিয়া পরিচয় দেন কিন্তু শুশ্রুত কখনও আত্রীয় গোত্রের ব্রাহ্মণ ছিলেন না। ইনি চন্দ্রবংশীয় মধ্যে পরিগণিত।

বেণুহোত্র-সুতশ্চাপি গার্গ্যোবৈ নাম বিশ্রুতঃ।
গার্গ্যস্য গর্গভূমিস্তু বাৎস্য বৎসস্য ধীমতঃ
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব তয়োঃ পুত্রাঃ সুধার্ম্মিকাঃ॥

বায়ু পুরাণ।

বেণুহোত্রের পুত্র গার্গ্য তৎপুত্র গর্গভূমি ও বৎস্যের পুত্র বাৎস্য, ইহাদের বংশে অনেক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের মধ্যে বাৎস্য-গোত্রীয় যত লোক সকলই ক্ষত্রিয়বংশীয়।

পুরোরবার (চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ) বংশে রম্ভনামক নৃপের রভস নামক পুত্র তাঁহার বংশে গভীর এবং সেই গভীরের বংশে ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিলেন।

"রম্ভস্য রভসঃ পুত্রোগভীরশ্চাক্রিয়স্ততঃ।
তস্য ক্ষেত্রে ব্রহ্মজজ্ঞে——————"

ভাগবত।

চন্দ্রবংশে যযাতির জন্ম। যযাতিবংশীয় ঋতেয়ুর সন্তান রন্তিনার, তাঁহার পুত্র তংসু ও অপ্রতিরথ এবং ধ্রুব। অপ্রতিরথের বংশে কণ্ব জন্ম গ্রহণ করেন। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি,মেধাতিথি হইতে কাণ্বায়নগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। তংসুর বংশে দুষ্মন্ত ও তৎপুত্র ভরত জন্ম গ্রহণ করে।

"ঋতেয়োঃ রন্তিনারঃ পুত্রোঽভূৎ। তংসুং অপ্রতিরথং ধ্রুবঞ্চ রন্তিনারঃ পুত্রান্ অবাপ। অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ তস্যাপি মেধাতিথিঃ। যতঃ কণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ। তংসোরনিলস্ততো দুষ্মন্তাদ্যাশ্চত্বারঃ পুত্রা বভূবুঃ। দুষ্মন্তাচ্চক্রবর্ত্তী ভরতোঽভবৎ।"

বিষ্ণুপুরাণ ৪ অ—১৯অ-

মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ।

বিষ্ণুপুরাণ।

হর্য্যশ্বের (চন্দ্রবংশীয়) মুদ্গল নামে এক পুত্র ছিলেন। সেই মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই বংশে কৃপ ও কৃপীর জন্ম। কৃপীর পুত্র অশ্বত্থমা। এই সকল চন্দ্রবংশীয় মধ্যে কীর্ত্তিত।

উপরোক্ত এই সকল উদ্ধৃত বচন পাঠকবর্গের বিরক্তিজনক হইতে পারে, কিন্তু এইসমস্ত বচনদ্বারা চন্দ্রবংশীয়েরা যে কেবল ক্ষত্রিয় ছিলেননা এবং ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির মধ্যেও যে চন্দ্রবংশীয় পরিবার ছিল অতীতসাক্ষী (পুরাণাদি) ইতিহাস তাহা বিস্তৃতরূপে প্রমাণিত করিল। সূর্য্যবংশীয়দের মধ্যেও যে অনেকে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য ছিলেন তাহারও ভূরি ২ প্রমাণ পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা বিবৃত করা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। সেনবংশীয় রাজারা চন্দ্রবংশীয় হইয়াও যে অম্বষ্ঠ-কুলোৎপন্ন হইতে পারেন তাহাই প্রতিপন্ন করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তথাপি বাক্য রক্ষার জন্য একটী মাত্র প্রমাণ বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্দে উক্ত আছে, নরিষ্যন্তের (ইনি সূর্য্যবংশীয় ছিলেন) বংশে অগ্নিবেশ্যের জন্ম হয়। ইনি কানীন এবং জাতুকর্ণ নামক মহর্ষি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এই অগ্নিবেশ্য হইতে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে ব্রাহ্মণকুল উৎপন্ন হয়। ইহারা সূর্য্যবংশীয় ছিলেন। সুতরাং বল্লাল চন্দ্রবংশীয় ছিলেন এই প্রমাণ তাঁহার অম্বষ্ঠ-কুলোৎপন্ন থাকিবার বিরোধি নহে, বরং তাঁহার জাতি বিষয়ক বিবরণের অনুপূরক মাত্র। দশম প্রমাণ সম্বন্ধেও আমরা বিস্তৃতরূপে কিছু বলিব। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক আবুল ফাজল তাঁহার আইন আকবরী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সেনবংশীয় নৃপতি-

গণকে কায়স্থজাতীয় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রিন্সেপ সাহেব তাঁহার এই কথাতে আস্থা প্রদর্শন না করিয়া সেনবংশীয় নৃপতিগণকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া লিখিয়াছেন। বাস্তবিক আবুল-ফাজলের এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমমূলক। কিন্তু তথাপি আমরা তাঁহার উপর দোষা-রোপ করিতে পারি না। কারণ তিনি সত্য লিখিতে গিয়া মিথ্যায় পতিত হইয়া-ছেন। এক্ষণে তিনি কি কারণে বৈদ্য-বংশীয় নৃপতিগণকে কায়স্থ-জাতীয় বলিয়া লিখিয়াছেন এবং উহা কতদূর ভ্রমপূর্ণ তাহাই আমরা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হইব।

১। সেনবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে বঙ্গদেশের যত পুস্তক বর্ত্তমান আছে তাহার কোনখানেই উক্ত নৃপতিগণ কায়স্থজাতীয় ছিলেন এমত কথা লিখিত নাই। আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য সংসারের আধুনিক পুস্তক সমূহের কথা বলি-তেছি না।

২। আবুল ফাজেল কখনও সংস্কৃত জানিতেন না। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির কুলগ্রন্থ (অর্থাৎ যাহাতে সেনবংশীয় নৃপতিগণের জাতির বিষয় লিখা আছে) পাঠ করেন নাই। পাঠ করিলে এপ্রকার লিখিতেন না।

৩। আবুল ফাজল ১৫৯৬ খৃঃ আইন আকবরী গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার মতে বল্লালসেন ১০৬৬ খৃঃঅব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন। সুতরাং বল্লালসেন আবুলফাজলের পঞ্চ শত বৎসরেরও পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

এরূপস্থলে প্রকৃত ইতিহাস ব্যতীত সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হওয়া কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

৪। সেনবংশীয় নৃপতিগণের প্রথম সূচনাতেই আবুলফাজল এক ভুল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে শুকসেন বল্লাল-সেনের পিতা। কিন্তু সুন্দরবনে লক্ষণ-সেনের প্রদত্ত যে এক খণ্ড তাম্রশাসন * ও বাখরগঞ্জ অঞ্চলে কেশবসেন প্রদত্ত যে অপর আর এক খণ্ড তাম্র শাসন † পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বিজয় সেন বল্লালসেনের পিতা এপ্রকার লিখিত আছে।

* "যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃ সহ-চরৈর্যশোভিঃ শোভন্তে পরিধি-পরিণদ্ধাঃ করদিশঃ।
ততঃ কাঞ্চীলীলাচতুরচতুরম্ভোধি লহরী
পরীতোর্ব্বীভর্ত্তাহজনিবিজয়সেনঃ স বি-জয়ী॥
প্রত্যক্ষঃ কলিসম্পদামনলসো বেদায়নৈ-কাধ্বগঃ
সংগ্রামঃ শ্রিত জঙ্গমাকৃতিরভুবল্লালসেন স্তুতঃ॥"
লক্ষণসেন প্রদত্ত তাম্রশাসন।
রামগতিন্যায়রত্ন প্রণীত বঙ্গভাষার ইতিবৃত্ত দেখ।

† "Regarding the Vaidya dynasty of Bengal (so called from its founder being of the medical

৫। আইন আকবরীতে লিখিত আছে নবসেন বঙ্গের শেষ রাজা। তৎপরে বঙ্গে মুসলমানাধিকার হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসবেত্তা মিনহাজুদ্দিন লক্ষণিয়াসেন নামক রাজাকে বঙ্গের শেষ রাজা স্থির করিয়াছেন। মার্সমান ও ষ্টয়ার্ট সাহেব ইঁহাকেই লক্ষণসেন বলেন। আবার শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় দেখাইয়াছেন লক্ষ্মণিয়াসেন লক্ষণসেন নহেন তিনি লক্ষণসেনের পৌত্র, ও সম্ভবতঃ তাঁহার নাম লাক্ষণেয়।

৬। আবুল ফাজল বলেন লক্ষণসেন ১১১৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১১২৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহা হইলে তাঁহার রাজত্ব কাল ৭ বৎসর হইল মাত্র। "কিন্তু লক্ষণসেনের প্রধান মন্ত্রী হলায়ূধ ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব গ্রন্থে লিখিয়াছেন, লক্ষণসেন কৈশোরাবস্থায় হলায়ুধকে সভাপণ্ডিত করেন, যৌবনকালে মহামাত্য করেন ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এত ৭ বৎসরের বিবরণ নহে স্মুতরাং আবুলফজলের নির্দ্দেশ বাক্যে অবশ্য ভ্রম আছে। *

৭। আবুলফাজল বঙ্গদেশে কখনও আসিয়াছিলেন কি না তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যায় না। তিনি লোকমুখে শুনিয়া বঙ্গের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন এই প্রকার লোকের বিশ্বাস। তথাপি যদি তিনি কোন সময় এদেশে আসিয়া থাকেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি এতদ্দেশীয় বহুকালনিবাসী কোন এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান অথবা জাতিবিষয়ক অনভিজ্ঞ কোন একজন পদস্থ ব্যক্তির নিকট এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া

caste) there is the same uncertainty as in almost all other portions of Indian history. Some make Adisur the progenitor: he who is stated to have applied to the reighing king of Kanaug or Kanyakubja for a supply of Brahmins for the Bengal provinces; but the catalogues recorded on good authority in Ayinia-Akbari place the whole of the Bhupala dynasty extending to 698 years between Adisur and Sukhsen the father of Ballal sen who built the fort of Gour. No mention of either of these parties is made in the present inscription, but on the contrary, the father of Ballal sen is distinctly stated to be Vijay sen; and as this is I believe the first copper-plate record of a grant by the family, we should give it the preference to books or traditions, on a point of history so near its own time; for Kesav sen is but fourth in descent from Vijay on the plate; or the fifth if we take Abul Fuzl's list." Prinseps] Indian Antiquities Vol II. page 272.

* (৫), (৬) বঙ্গদর্শন কার্ত্তিক ১২৮০। জয়দেব চরিত সমালোচনা ৩৩৩পৃষ্ঠা দেখ।

থাকিবেন। পাঠক! আপনার স্মরণ হয় যে সম্রাট্ আকবরের সময় বঙ্গদেশে কায়স্থজাতির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। কৃষ্ণনগরাধিপতি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখনও উদিত হন নাই। মুর্সিদাবাদের ধনবান্ বণিক্ জগৎসেঠ তখনও জন্ম গ্রহণ করেন নাই। নাটোরাধীশ্বরী রাণী ভবানী তখনও ভূলোকে অবতীর্ণা হন নাই। মহারাজ রাজবল্লভ তখন পর্য্যন্তও ভবের খেলা খেলিতে আরম্ভ করেন নাই। বর্দ্ধমানাধিপতি অত্যন্ত হীনপ্রভ ও এক প্রকার সের আফগানের হস্তাধীন ছিলেন। কেবল কায়স্থজাতীয় প্রবলপ্রতাপান্বিত মহারাজা প্রতাপাদিত্য সমস্ত বঙ্গে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বিস্তার করিয়াছিলেন; দিল্লীশ্বর আকবর সাহ পর্য্যন্তও তাঁহার পরাক্রমে অনেক সময় শশঙ্কিত থাকিতেন এবং তাঁহাকে ও পাঠানজাতিকে এবং পর্ত্তুগীজ গনজানিসকে পরাভব করিবার জন্যই মহারাজা মানসিংহ বহুদলবল সমেত বঙ্গ দেশে প্রেরিত হন। এই কারণ আমাদিগের মনে বিশ্বাস হইতেছে যে আবুলফাজল যাহার প্রমুখাৎ বল্লালসেন প্রভৃতি নৃপতিগণকে কায়স্থ কুলোদ্ভব বলিয়া শুনিয়াছিলেন তাহা অবশ্য ভ্রমমূলক।

৮। যদি আবুলফাজল বঙ্গদেশে কখনও না আসিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বলিখিত সিদ্ধান্তমতে বল্লালসেনকে কায়স্থ-কুলোৎপন্ন বলিয়াও শুনিতে পারেন অথবা অম্বষ্ঠ-জাত্যন্তর্গত বলিয়াও শুনিতে পারেন। তবে অম্বষ্ঠ-কুলোৎপন্ন শুনিয়া তিনি বঙ্গীয় নৃপতিগণকে কিজন্য কায়স্থ লিখিলেন এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু ইহার কারণ আছে। প্রথমতঃ পশ্চিম দেশে অম্বষ্ঠ-জাতীয় লোক অতি বিরল (এক প্রকার নাই বলিলেও হয়)। কালক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের লোপ হওয়াতে অনুলোমজ সন্তানগণ মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে এক প্রকার মিশ্রিত হইয়াগিয়াছে। সুতরাং তৎসময়ে দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি স্থানে অম্বষ্ঠজাতীয় লোকেরা অধিকাংশই বৈশ্যগণের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ পশ্চিম দেশে কায়স্থ জাতির দ্বাদশ শ্রেণী * মধ্যে শ্রীবাস্তব ও অম্বষ্ঠকায়স্থগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ কেবল অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) নামক জাতি বিশেষ নহে। ইহার আরও অনেক অর্থ আছে। যথা হস্তিপক, বাসকবৃক্ষ ও অম্বষ্ঠ নামক দেশ বিশেষ। এই অম্বষ্ঠ-দেশীয় কায়স্থগণকে অম্বষ্ঠকায়স্থ বলে। এই কারণ রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দ কল্পদ্রুম নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ এক স্থানে "পশ্চিম দেশীয় কায়স্থ

---

* যথা—১ মাথুর ২ সূর্য্যধ্বজ ৩ অম্বষ্ঠ ৪ ভটনাগর ৫ গৌর ৬ নিগম ৭ সকসেনা ৮ করণ ৯ অহিটানা ১০ শ্রীবাস্তব ১১কুলশ্রেষ্ঠ ১২ বাল্মীক—জাতিমিত্র প্রথমভাগ ৯২ পৃষ্ঠা দেখ।

জাতি বিশেষ” লিখা আছে। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি তাঁহার “বৃহৎ অভিধানে” করণ শব্দের অর্থ প্রকরণে শ্রীবাস্তব ও অম্বষ্ঠ কায়স্থগণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই কারণে আমাদিগের মনে সন্দেহ হইতেছে যে আবুলফাজল বঙ্গীয় নৃপতিগণকে অম্বষ্ঠকায়স্থ বলিয়া ভুল করিয়াছেন। তিনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন, হিন্দুদিগের জাতি তত্ত্বের বিষয় কখনও বিশেষরূপ অবগত ছিলেন না। এরূপস্থলে তিনি যে অম্বষ্ঠজাতিকে অম্বষ্ঠ-কায়স্থ বলিয়া ভুল করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

৯। দেবীবর ঘটক বল্লালসেনকে বৈদ্যবংশীয় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। দেবীবর কোন্ সময়ের লোক তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। তবে তিনি যাঁহাদিগের মধ্যে মেলবন্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাদিগের অধস্তন পুরুষ গণনা করিলে দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ সন্ততির অতিরিক্ত দেখা যাইবে না। এক্ষণে এই ত্রয়োদশ পুরুষের কাল মোঠা মুটী ২৫ বৎসর করিয়া ধরিলে দেবীবর ১৩×২৫ অর্থাৎ ৩২৫ বৎসর পুর্ব্বে জীবিত ছিলেন এই প্রকার দেখা যায়। অর্থাৎ দেবীবর আইন আকবরী প্রচারেরও প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বল্লালকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। *

* বিশেষ অবগতির জন্য সম্বন্ধ-নির্ণয়ে দেবীবর ঘটকাধ্যায় দেখ।

উপরে লিখিত এই সমস্ত নানা কারণে আমাদের মনে দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে যে আবুলফাজল বল্লাল প্রভৃতি নৃপতিগণকে কায়স্থ লিখিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। সেনবংশীয় নৃপতিগণ যে ক্ষত্রিয় ছিলেন না তাহার আর একটী মাত্র প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াই আমরা এ প্রস্তাব সমাপ্ত করিব।

যখন পালবংশীয় নৃপতিগণ সমগ্র বঙ্গদেশে রাজ্যসূত্র বিস্তার করিয়াছিলেন, যখন তাঁহাদের জয়পতাকা সমগ্র ভারতে বিস্তারিত হইয়াছিল, এবং এক্ষণ পর্য্যন্তও যে বংশের মহতী কীর্ত্তি দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান আছে, সেই মহাপুরুষদিগের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশ বৌদ্ধধর্ম্মে প্লাবিত ছিল। সুতরাং তৎসময়ে ও তাহার পরবর্ত্তী অনেক কাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশস্থ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদি সম্পূর্ণরূপে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। যখন মহারাজা আদিশূর পালবংশীয় নৃপতিগণকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গের সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন তখন এদেশে যে সপ্তশতঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহারা বৌদ্ধদিগের প্রভাবে অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিলেন এবং বৈদিকক্রিয়াকলাপানুষ্ঠানে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। এরূপ কিম্বদন্তী যে মহারাজা আদিশূর কোন সময় এক পুত্রেষ্টি যাগের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে নিতান্ত অপটু ও অনভিজ্ঞ থাকাতে মহারাজ

অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া কাণ্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহ রায়ের নিকট পঞ্চ গোত্রের পঞ্চজন বেদজ্ঞ, সাগ্নিক, যজ্ঞনিপুণ ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ শূদ্র ভৃত্য প্রার্থনা করেন। যথা—

নৃপতিসুকৃতিসারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ
প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোঽতিধীরঃ।
ময়ি বর সখিতাস্তে ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং নিতান্তং।

আদিশূরের পত্রের শেষভাগ।
শব্দকল্পদ্রুম হইতে উদ্ধৃত।

তুমি নৃপতিদিগের মধ্যে সুকৃতিসার স্বীয়বংশে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি বীরসিংহ অতিশয় ধীর, এবং তোমার অতি সুবিচার। আমাতে তোমার মিত্রতা আছে। অতএব আমার গৌড়রাজ্যে শূদ্রদিগের সহিত ব্রাহ্মণগণকে নিতান্তই পুনর্ব্বার প্রেরণ করিবে।

মুদাগন্তুকামাঃ পুরাবাসগৌড়ং
সমাহায় কোলাঞ্চদেশং ক্ষিতীশং।
নৃপাজ্ঞাঞ্চ লব্ধা সদারাঃ সভৃত্যাঃ
মহাযোগিনস্তে বভূবুঃ সশূদ্রাঃ।

সেই ব্রাহ্মণগণ কাণ্যকুব্জাধিপতির আজ্ঞা লাভ করিয়া কোলাঞ্চ দেশ ও রাজাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সস্ত্রীক এবং পঞ্চ ভৃত্য শূদ্রের সহিত হর্ষযুক্ত হইয়া আগমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

হয়মানঃসমারুহ্যসোপানত্কাঃদ্বিজোত্তমাঃ
সদারাশ্চ সপুত্রাশ্চ ভৃত্যৈরপি সমন্বিতাঃ।

সেই দ্বিজগণ অশ্বযানে আরূঢ় হইয়া স্ত্রী পুত্র এবং ভৃত্য সহিত এদেশে আসিয়াছিলেন।

আগত পঞ্চব্রাহ্মণ মহারাজ কর্ত্তৃক কি প্রকার সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় বঙ্গদেশের অশীতিবর্ষের বৃদ্ধ হইতে দশমবর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত সকলেই অবগত আছেন। শুভদিবসে মহারাজ পঞ্চব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্রেষ্টি যাগ সম্পন্ন করাইলেন। তাঁহাদের যাগপ্রভাবে মহিষীগর্ভবতী হইলেন ও পুত্রমুখ অবলোকন করিলেন। এই অলৌকিক ঘটনার পর মহারাজের ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁহাদিগের উপর দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তিনি তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে রাখিবার নিমিত্ত বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহারাও রাজার নির্ব্বন্ধাতিশয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর রাজা তাঁহাদিগকে সুবর্ণ প্রভৃতি বহুমূল্য রত্ন দান করিলেন এবং পঞ্চ গ্রামে তাঁহাদিগের পৃথক্ ২ বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন। তদবধি ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের আত্মীয় কুটুম্বগণ হইতে সমাজচ্যুত হইয়া এদেশে বাস করিতে লাগিলেন। এরূপও প্রবাদ আছে যে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণ রাজকার্য্য সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে ফিরিয়া যান। কিন্তু তাঁহারা আদিশূর হইতে দান প্রতিদান গ্রহণ করাতে সেখানে সমাজচ্যুত ও অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া কিছু কাল বাস করেন। তৎপরে স্বদেশে থাকা নিতান্ত কষ্টকর জ্ঞান করিয়া পুনর্ব্বার স্ত্রী, পুত্র সহ গৌড়রাজ্যে ফিরিয়া আসেন। তথায় আদিশূর কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার সাদরে গৃহীত হইয়া এদেশে বাস করিতে আরম্ভ

করেন। যদি মহারাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় হইতেন তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ কখনও সমাজচ্যুত হইতেন না। কারণ ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় রাজা হইতে দান গ্রহণ করিলে সমাজচ্যুত হন না। এক্ষণে বোধ হয় ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল যে মহারাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় ছিলেন না। কারণ ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্লীয়াদরাজন্যপ্রসূতিতঃ।
সূনা চক্রধ্বজবতাং বেশে,নৈব চ জীবিতাং॥

৪ অধ্যায়—৮৫ শ্লোক।

অস্য টীকা।

ন রাজ্ঞ ইতি। রাজনাশব্দঃ ক্ষত্রিয়বচনঃ অক্ষত্রিয় প্রসূতস্য রাজ্ঞোধনং ন প্রতিগৃহ্লীয়াৎ। রজতোধনমর্ষিচ্ছেদিত্যুক্তং তস্যায়ং বিশেষ উক্তঃ।°——"কুল্ল কভট্টঃ॥"

"From a king not born in the military class, let him (Brahmin) accept no gift———————"

Sir W. Jones's translation of Manu

যে রাজা ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই তাহা হইতে ব্রাহ্মণ কখনও বহুমূল্য দান গ্রহণ করিবেন না ইত্যাদি ——

উপসংহারকালে বৈদ্যবংশীয় নৃপতিগণের বংশাবলী সাধারণের জ্ঞাপনার্থ সম্বন্ধনির্ণয় হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

আদিশূর ও সেনবংশের রাজত্বকাল।

খৃঃ খৃঃ
আদিশূর—৯০০——৯৫২
|
খৃঃ খৃঃ
ভূশূর(পুত্র) পুত্রিকা (কন্যা) ৯৫২-৯৭০
|
খৃঃ খৃঃ
অশোকসেন—৯৭০—৯৮১
|
শূরসেন—৯৮১—৯৯৪
|
বীরসেন—৯৯৪—১০১২
|
সামন্তসেন—১০১২—১০৩০
|
হেমন্তসেন—১০৩০—১০৪৮
|
বিজয়সেন—১০৪৮—১০৬৬
|
বল্লালসেন—১০৬৬—১১০১
|
লক্ষ্মণসেন—১১০১—১১২১
|
মাধবসেন—১১২১—১১২২
|
* কেশবসেন—১১২২—১১২৩
|
লাক্ষণেয়সেন—১১২৩—১২০৩

* অনেকের মতে কেশবসেন মাধবসেনের পুত্র নহে। ইহারা দুই ভ্রাতা এবং উভয়েই লক্ষ্মণসেনের পুত্র। আমরাও এই মতের পক্ষীয়।

ভূস্থর নামক পুত্র আদি নৃপতির।
মুনি পঙ্ককের যজ্ঞে জন্ম যার স্থির॥
ভূস্থরে না দেখি পুত্র আদি নৃপমণি।
নিজতনয়া লক্ষ্মীকে পুত্রিকায় গণি॥
তাহার তনয় দেখি যায় স্বর্গপুর।
পুত্র বা কন্যার পুত্র নাহি কিছু দূর॥
অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপতির।
তাহার তনয় হন শূরসেন ধীর॥
যাঁহার ঔরসে জন্মে বীরসেন রায়।
তাঁহার পুত্র ভূপ সামন্ত নাম তায়॥
সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন।
বিষক ভাত বলি যারে করে বন্দন॥
কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্যবংশে এক পাই সমাচার॥
আদিশূরের বংশধ্বজ সেনবংশ তাজা।
বিষকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা॥
বল্লালনৃপের পুত্র নামেতে লক্ষ্মণ।
মাধব তাঁহার পুত্র বুদ্ধি বিচক্ষণ॥
কেশবভূপতি হন মাধব তনয়।
তার সুত লক্ষ্মণ গুণযুত সে হয়॥

কুৎসা।

গ্রীষ্মকালের দীর্ঘ দিনে, গৃহকার্য্য সমুদয় সুসম্পন্ন করিয়া, পাড়ার দশ বাড়ীর দশ জন, কুটুম্ব সম্পর্কে আগত পাঁচজন, আর বাড়ীর কএক জন রমণী অপরাহ্নে অন্দর মহলের রোয়াকে বসিয়া বিস্রম্ভালাপ করিতেছেন। ইহাঁদের অধিকাংশই বিধবা, এবং কাহারই বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের ন্যূন নহে। আলুলায়িতকুন্তলাগণ মাথা দেখাইতেছেন, সংযমিতকেশা কএক জন সেই মাথাগুলি—এক এক জন এক এক জনের—দেখিতেছেন। কেহ দীপবর্ত্তিকা প্রস্তুত করণে ব্যাপৃতা, কেহ শিশুর কন্থা সীবনে ব্যস্তা কথার উপর কথা পড়িতেছে, নানা কথার আন্দোলন হইতেছে।

—"অমুকের স্বামী অমুককে ভাল বাসে না, লোকটার স্বভাব চরিত্র বড়ই মন্দ।—

"ভাল বাসিবেই বা কি? ভালবাসা ত মুখের কথা নয়, যে লোকের দোষ দিলেই হইল। মাগীর ঐ ত রূপ, গুণের আবার অন্ত নাই; স্বামিকে ভক্তি নাই, ভয় নাই, মুখে মিষ্ট কথা নাই; কাটঠোকরা লোককে যেমন সুখ দেয়, আপনিও তেমনি সুখ পায়। আমরাও ত মা স্বামির ঘর করিয়াছি, দশ পরকে লইয়া বাস করিয়াছি, শাশুড়ী, ননদ, জা সতীনের মন যোগাইয়াছি"—(বিবাহের রাত্রিতে বাসরঘরে বক্তৃীর স্বামী সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন, সুতরাং কল্যাণীর কখনও শ্বশুরালয় দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই)—"কিন্তু এমন কোথায়ও দেখি নাই। মরুক মাগী, আমি উহাকে দুটী চক্ষে দেখিতে পারি না।"—

"যে আপনি ভাল, তাহার জগৎ ভাল। স্বামির যদি এতই গুণ, তিনি যদি এমনিই ভাল মানুষ, তাহা হইলে কি একটা মেয়ে মানুষের মন নরম করিতে পারেন না, ভাল বাসাইয়া লইতে পারেন না, তাহাকে ভাল করিতে পারেন না? হরগুণ নাই, বরগুণ আছে, পরের

বাছার চক্ষের জল না দেখিয়া জলগ্রহণ করেন না। লজ্জার কথা বলিব কি, গুণবান্ কথায় ক্ষান্ত দেন না, তাঁহার হাত ও মধ্যে মধ্যে চলে। আবার ইহার উপর, যদি এক দিন শেষ রাত্রিতে বাড়ী আইসেন, তবে দশ দিনের মত অন্তর্দ্ধান ; কথায় উক্তি করিলেই সর্ব্বনাশ! মরুক মিন্‌সে, গলায় দড়ীও যোড়ে না!”—

“যত দোষ, নন্দঘোষ; কেবল পুরুষের কথা বলিলেই ত হয় না। ছি ছি! বলিতে লজ্জা, শুনিতে লজ্জা, লোকের কাছে মুখ দেখাইতে লজ্জা। পাড়ার ভিতর বলিলেই হয়, পর নয়, অমুক মাগীই ত অমন সোণার চাঁদ ছেলেকে ভেড়া করিয়া রাখিয়াছে। তবু যদি এক তিল লজ্জা থাকে! চাবিশিক্‌লি ঝুলাইয়া, আঁচলের খুঁটে রিঙ্ ভরা চাবি দোলাইয়া মাগী যখন হাত নাড়িয়া বাহির হয়, তখন ইচ্ছা করে ঝাঁটার বাড়ীতে জন্মের মত বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিই।”

সূত্র ধরিয়া একে একে (উপস্থিত দল বাদ দিয়া) এ পাড়া, ও পাড়া, গ্রাম, বহির্গ্রাম, সর্ব্বত্রের স্ত্রী পুরুষের স্বভাব চরিত্র, রূপ গুণ, আয় ব্যয়, খাদ্যাখাদ্যের বিচার চলিতেছে। যাঁহারা বলিতেছেন, তাঁহারা শান্তভাবে, বিনাপক্ষপাতে, প্রমাণের উল্লেখ বা মীমাংসার অপেক্ষা না করিয়া স্বার্থসম্পর্কশূন্য হইয়া স্ব স্ব হৃদয় ভাণ্ডার উন্মোচন করিয়া তাহার শোভা দেখাইতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ উঠিয়া গেলে, আবার তিনি, তাঁহার আত্মীয় স্বজন প্রসঙ্গাধীন বিচারাধীন হইতেছেন। চক্ষু আছে, অথচ এ দৃশ্য দেখে নাই এমন লোক কোথায়?

পঞ্চানন স্বর্ণকার আপন দোকানে বসিয়া রামহরি রায়ের তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীর পঁয়তাল্লিশ ভরির সোণার চন্দ্রহারে ডায়মন কাটিতেছে, শিক্ষার্থী একটী বালক মুহুর্মুহু তামাক সাজিতেছে, আর পঞ্চাননের খুড়া ঠাকুর, দাদা ঠাকুর প্রভৃতি অনেকগুলি ভদ্র সন্তান জলপূর্ণ গাড়ু নামাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে সেই দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। চন্দ্রহারের প্রসঙ্গে, রামহরি দারপরিগ্রহের তৃতীয় সংস্করণ করিয়া যে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তদ্ধেতুক যে ভোগ ভুগিতেছেন, তাহার আলোচনা হইতেছে। রামহরির নির্ব্বুদ্ধিতা হইতে তদীয় পত্নীর চতুর-বুদ্ধিমত্তা, তথা হইতে তাহার চরিত্র, সেই চরিত্র সম্পর্কে তদীয়া প্রথমা সপত্নীর জ্যেষ্ঠপুত্রের ব্যবহার, তাহার পর সেই পুত্রের বয়স্যবর্গের উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রভৃতি বিবিধ কথা যথাক্রমে তর্কের বিষয়ীভূত হইতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তি স্বীয় বহুদর্শিতার গরিমা করে, সে বাতুল।

রাগ নাই, দ্বেষ নাই, অথচ অযোধ্যাবাসী না জানিয়া, না শুনিয়া, তথাপি ঘুঁটিয়া ঘুঁটিয়া পরিশেষে রামচন্দ্রকে যে অবস্থায় উপস্থাপিত করিয়াছিল, ও জানকী সতীকে যে বিপাকে ফেলিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আর, বিরলে

বসিয়া কবি "বিদ্যাসুন্দর" লিখিয়াছেন; পঞ্চাননের দোকানে বসিবার অবসর পান নাই বলিয়া নবাখ্যা-লেখক "বিষবৃক্ষে" মনের সাধ মিটাইয়াছেন। সম্পাদক এবং পাঠক ভারতবর্ষে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে, বিলাত হইতে সংবাদ পাঠাইতেছেন—অমুক লর্ডের অমুক সম্পর্কীয়া এবং তাঁহার অশ্বপাল একত্র অদৃশ্য হইয়াছেন! কুৎসা নাই কোথায়? কুৎসা কে না করে?

বাস্তবিক কুৎসা কালের সীমা, স্থানের সীমা, ব্যক্তির সীমা জানে না, বা মানে না। তুমি বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া গণ্ডস্ফীত করিয়া, নাসিকাগ্র কাঁপাইয়া, আমার দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া আরক্তিম চক্ষু দেখাইও না, কারণ তুমিও কুৎসায় লিপ্ত,—হাসিতে হাসিতে কুৎসা করিয়া থাক, কুৎসা শুনিতে তোমার আমোদ হয়। যখন অমানুষী বিজ্ঞতা তোমার স্কন্ধে আরূঢ় হয়, কেবল তখনই তোমার ঐ গভীর ভঙ্গী। কুৎসা করিতেছি বলিয়া আমার নিন্দা, আমাকে তিরস্কার করিও না। করিলে ফল হইবে না, আমিও উপহাস করিতে জানি, হাসিয়া তোমার কথা উড়াইয়া দিব।

আমি মনুষ্য নামে আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকি, প্রকৃতিকে যথাসাধ্য বা যথাপ্রবৃত্তি শাসন করিয়া থাকি, আহার নিদ্রা প্রভৃতি জীব সাধারণ ধর্ম্মের অনুসরণ বিষয়ে স্থান কালাদির নিয়ম সংস্থাপন করি, অথবা অপরের নিয়ন্ত্রিত মত আত্মচালনা করি; কোন বিশেষ কার্য্য কর্ত্তব্য কি না, বিশেষ পন্থা অনুসরণীয় কি না বিষয় বিশেষ হইতে আমার পরাঙ্মুখ থাকা বা প্রতিনিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক কি না সে বিচার করিবার ক্ষমতা আমার আছে; অনেক স্থলে সে ক্ষমতার প্রয়োগ করি না, সত্য; কিন্তু ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারি বলিয়া যে অভিমান, তাহা তিলার্দ্ধও আমার চিত্ত হইতে অবসারিত হয় না। এই প্রকৃতিশাসন, নিয়মসংস্থাপন, কর্ত্তব্যাবধারণের সমষ্টিকে আমরা মনুষ্যত্ব বলিয়া থাকি; আমাদের গঠনবৈচিত্র্যহেতুক যে রূপ, এই মনুষ্যত্ব হেতুকও তথাবিধ অপরাপর জীব হইতে আমরা বিভিন্ন। কিন্তু প্রধানতঃ এ মনুষ্যত্বের নিদান কোথায়, ইহার নিয়ামক কে? আমি বলি—কুৎসা। নেত্র বিস্ফারিত করিও না, তোমার অধর-প্রান্তের হাসি অধরেই ধরিয়া রাখ; আমি শিক্ষক, তুমি শিষ্য, আমি পণ্ডিত, তুমি মূর্খ, আমার কথা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি; কিন্তু বিদেশীর এক মহাবাক্যও এস্থলে তোমাকে শুনাইয়া রাখি—"আমি বুঝাইতে পারি কিন্তু বোধশক্তি দিতে পারি না।"

জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, স্বার্থসাধন করিতে গিয়াই হউক বা পরের হিতচেষ্টিতেই হউক, মনুষ্যমাত্রেই অহরহ সমাজের উপকার সাধন করিতেছে। নরহন্তা, এবং বিচারাসনে বসিয়া যিনি সেই নরহন্তার প্রাণদণ্ড করেন, এই উভয়ের মধ্যে কে সংসারের অধিকতর কল্যাণ সাধন করিতেছে, সহসা এ প্রশ্নের উত্তর

দেওয়া যায় না বটে; তথাপি উভয়েই যে সমাজ-শিক্ষক, ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া উভয়েই সংসারকে উপদেশ দিতেছে, এবং সংসার সেই উপদেশ পাইয়া পরমুহূর্ত্ত হইতে নূতন ভাবে আত্মব্যবহারকে সঞ্চালিত, বিপর্য্যস্ত, বিশোধিত মার্জ্জিত বা পরিবর্ত্তিত করিতেছে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। নরহন্তা ও তাহার দণ্ডবিধাতা উভয়েই হয় ত ভ্রান্ত; ফলতঃ ভ্রম একের হউক বা উভয়েরই হউক ভ্রমও আমাদের শিক্ষার উপকরণ। নরহন্তা স্বীয় কার্য্যের ফলাফল ভাবিয়া তাহার পর নরহত্যা করিয়াছে, বিচারকও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। আমরা বহিস্থঃ লোক, অসম্পৃক্ত ব্যক্তি, এক্ষণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া কেহ নরহন্তার কেহ বা বিচারকের, অপর কেহ বা উভয়েরই দোষ দিতেছি। এখন নরহন্তা, বিচারক ও আমরা, সকলেই ত এ উহার দোষ দিলাম; বল দেখি, পূর্ব্ব-বর্ণিত অন্তঃপুরবিহারিণীর দল এবং পঞ্চাননের কর্ম্মশালাস্থ ব্যক্তিগণ কি ইহা ভিন্ন অন্য কিছু করিতেছিলেন? পূর্ব্বে যে কুৎসা, এখানেও সেই কুৎসা! পূর্ব্বে যে সমাজসমালোচন, এখানেও তাহাই। প্রভেদের মধ্যে কেহ না বুঝিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিতেছে, কেহ বা বুঝিয়া করিতেছে। সমালোচনার শিক্ষা, শিক্ষায় ইষ্টসিদ্ধি, এ কথা যে না বুঝে কেবল সেই ব্যক্তি কুৎসার দোষ দেখে। কুৎসিতের কুৎসা কেন করিব না? আর, কুৎসা করিতে হইলে, পরোক্ষে করি বলিয়াই বা দোষ কি? গৌণেও কি তাহার ফল সমাজে ফলে না?

তবে, এক কথা স্বীকার করিতে আমিও প্রস্তুত,—কুৎসার প্রণালীতে কুৎসাকারির শিক্ষা ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, সুতরাং যে ব্যক্তি সুশিক্ষা এবং সুরুচির অধিকারী বলিয়া অভিমান করে, স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কুৎসার মূর্ত্তিভেদ করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। মার্জ্জিত, বিশোধিত, সুরুচিসম্মোদিত কুৎসার নাম, সমালোচনা! যাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, যাহার কাছে তুমি অন্তর খুলিয়া দিতে পার না, তাহার সমক্ষে মনুষ্যের চরিত্রের বা মনুষ্যের কার্য্যের "সমালোচনা" করিও, কেহ তাহাতে কুৎসা বলিবে না।

আবহমানকালে কুৎসা চলিয়া আসিতেছে, অনন্ত কালের সঙ্গে কুৎসা চলিবে, কুৎসার প্রতাপ অক্ষুন্ন রহুক, কুৎসার জয় হউক।

বিশ্বনিন্দুক।

রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনা।

সম্প্রতি কয়দিন হইল লর্ড লীটন বাহাদুর বঙ্গরঙ্গভূমিতে কালীদাসপ্রণীত অভিজ্ঞান-শকুন্তল নামক নাটকের বঙ্গভাষায় অভিনয় শ্রবণে গমন করেন। সেই ঘটনায় মহামতি মিরার সম্পাদক মিরার পত্রিকায় এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে "যেখানে বারাঙ্গনাগণ অভিনয় কার্য্যে লিপ্ত, সেখানে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরেলের উপস্থিত হওয়ায়, দুর্নীতির উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইয়াছে। বঙ্গরঙ্গভূমিতে বারাঙ্গনা দ্বারা যে অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন হয় বোধ হয় লর্ড লীটন বাহাদুর তাহা অবগত ছিলেন না"।

এবিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার আমাদিগেরও কিঞ্চিৎ অধিকার আছে। আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে অভিনয়-প্রথা ভারতে এই প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যখন শ্বেতপুরুষেরা নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ভূগর্ভালয়ে বাস করিতেন, যখন খ্রীষ্টধর্ম্মের মোহিনী শক্তিতে তাঁহারা মানবত্ব প্রাপ্ত হন নাই, যখন সাহিত্য-গর্ব্ব নাটক পৃথিবীর আর কোন দেশে প্রাদুর্ভূত হয় নাই, তখন অভিনয় প্রবর্ত্তয়িতা ভরত ভারতবর্ষে অভিনয় কার্য্যের প্রথম প্রবর্ত্তনা করেন। তিনি নাটকসকল কাহাদিগ দ্বারা অভিনীত করিতেন, দুই একটী উদাহরণ দ্বারাই আমরা পাঠকদিগকে তাহা বিদিত করিব।

যথা—

প্রথমতঃ উত্তররামচরিতের চতুর্থ অঙ্কে জনকলবসম্বাদে এরূপ লিখিত আছে :—

'লবঃ। নায়ং কথাপ্রবিভাগোঽস্মাভিরন্যেন বা শ্রুতপূর্ব্বঃ।

জনকঃ। কিং ন প্রণীতঃ কবিনা?

লবঃ। প্রণীতো ন প্রকাশিতঃ। তস্যৈব কোপ্যেকদেশঃ সন্দর্ভান্তরেণ রসবানভিনেয়ার্থঃ কৃতঃ; তঞ্চ স্বহস্তলিখিতং মুনির্ভগবান্ ব্যসৃজত্তরতস্য মুনেস্তৌর্য্যত্রিকসূত্রকারস্য।

জনকঃ। কিমর্থম্?

লবঃ। স কিল ভগবান্ ভরতস্তমপ্সরোভিঃ প্রয়োজয়িষ্যতীতি।"

ইহার মর্ম্ম এই—রামায়ণের শেষভাগ বাল্মীকি নাটকাকারে লিখিয়া অভিনয় করিবার জন্য নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনির নিকট প্রেরণ করেন। ভরতমুনি সেই নাটকখানি অপ্সরাগণ দ্বারা অভিনীত করেন। কুমারসম্ভব ও মেঘদূত প্রভৃতি হইতেও এরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

যথা—

কুমারসম্ভবের ৭ম সর্গের ৯১ শ্লোক।

তৌ সন্ধিষু ব্যঞ্জিতবৃত্তিভেদং
রসান্তরেষু প্রতিবদ্ধরাগম্।
অপশ্যতামপ্সরসাং মুহূর্ত্তং
প্রয়োগমাদ্যং ললিতাঙ্গহারম্॥

ইহার মর্ম্ম এই—হরপার্ব্বতী পরিণয়

কার্য্য সমাধানন্তর মনোহর অঙ্গভঙ্গির সহিত অপ্সরাগণপ্রযুক্ত নানারসসমন্বিত অভিনয় কার্য্য অবলোকন করিয়াছিলেন।

এই অপ্সরাগণ যে বেশ্যাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, বোধ হয় পাঠকমাত্রই তাহা অবগত আছেন। সুতরাং বলিতে হইবে যে বেশ্যা দ্বারা অভিনয় কার্য্য সম্পাদন করার প্রথা ভারতে আধুনিক নহে, অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই প্রথা যদি হিন্দুসমাজে অশ্রদ্ধেয় বা অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা হইলে মুনিবর ভরত কখনই তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতেন না এবং মহর্ষি বাল্মীকিও তদীয় অমৃতময় রামায়ণকে তাহাদিগ দ্বারা কলুষিত হইতে দিতেন না।

এক্ষণে বিবেচ্য যে—"কেন এই প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল?" পুরাকালে হিন্দুললনাগণ যে অনেক পরিমাণে স্বাধীন ছিলেন তাহা বোধ হয় এক্ষণে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। স্বাধীনা ভদ্রললনা সত্বেও কেন বেশ্যাগণ অভিনেত্রী বলিয়া পরিগৃহীত হইতেন? এ প্রশ্নের একই উত্তর আমাদিগের মনে উদিত হয়। পরের মনোমোহন করা যাহাদিগের জীবনযাত্রার একমাত্র উপায়, তাহারা রঙ্গালয়ে সমাগত দর্শকমণ্ডলীর চিত্তবিনোদনে অধিকতর সক্ষম; এই জন্যই পুরস্ত্রী অপেক্ষা বেশ্যাগণই অধিকতর আদরের সহিত অভিনেত্রীরূপে পরিগৃহীত হইত। অভিনয়কার্য্যে বিলক্ষণ প্রৌঢ়তা ও কিঞ্চিৎ ধৃষ্টতার প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমি সাবিত্রী নহি, অথচ আমাকে সাবিত্রী সাজিয়া সাবিত্রীর অতুল পতিভক্তি দেখাইতে হইবে; আমি রামের ছায়া স্পর্শ করার যোগ্য নহি, অথচ আমাকে রাম সাজিয়া রামের ঔদার্য্য দেখাইতে হইবে। যাহা নাই তাহা সাজিতে, তাহার ভাণ করিতে যে পরিমাণে প্রৌঢ়তা ও ধৃষ্টতার প্রয়োজন, লজ্জাশীলা কুলকামিনীতে সকল সময় সেরূপ প্রৌঢ়তা ও ধৃষ্টতা পরিদৃষ্ট হয় না। এই জন্যই বোধ হয় পুরাকাল হইতে এরূপ প্রথার আবির্ভাব হয়। শুদ্ধ যে অভিনয় কার্য্যেই বারাঙ্গনারা নিয়োজিত হইত এরূপ নহে, দেবতাদির পূজন বন্দনাদি উপলক্ষেও ইহাদিগের গীতি সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। এই প্রথা এখনও চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং হিন্দুরা যখন পবিত্র দৈবকার্য্যেও বারাঙ্গনাদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তখন ঐহিক সুখের উৎপাদন জন্য অভিনয়কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলে হিন্দুসমাজ বা হিন্দু ধর্ম্ম বিগর্হিত কোন কায করা হয় বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস নাই।

ইউরোপের ন্যায় এখানেও ভদ্র মহিলারা অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন ইহা আমরা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি। কিন্তু যত দিন তাহা না ঘটিতেছে, তত দিন স্ত্রীলোকের অংশ বারাঙ্গনা দ্বারা অভিনীত হওয়া অনুচিত কি সে আমরা বুঝিতে পারি না। যাঁহারা স্ত্রীলোকের অংশ পুরুষের দ্বারা অভিনীত হওয়ার উপদেশ দেন তাঁহারা অভিনয় শব্দের

অর্থ বুঝেন না। আসল চরিত্রের নকল করাই অভিনয়ের উদ্দেশ্য। নকল আসলের যত অনুরূপ হয় ততই ভাল। পুরুষ দ্বারা স্ত্রীচরিত্রের নকল কখনই ভাল হয় না। প্রকৃতি এরূপ কার্য্যের প্রতিকূল। রঙ্গস্থলে পুরুষ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া আসিলে সর্ব্ব প্রথমে স্বর শুনিয়াই আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠে। কোথায় কামিনীর কোকিল-বিনিন্দিত স্বর শুনিব, না শুনিলাম বায়সের কর্কশ স্বর। তাহার পর কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পুরুষের লক্ষণ বিদ্যমান। ইহা দেখিয়া কাহার মনে অভিনেয় স্ত্রীচরিত্রের বিভ্রম (Illusion) জন্মিতে পারে? অভিনেতা বা অভিনেত্রীর উপর অভিনীত চরিত্রের বিভ্রম না জন্মিলে অভিনয়ই হইল না। সুতরাং স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় অভিনেত্রী ভিন্ন অভিনেতা দ্বারা কখনই হইতে পারে না। যখন হইতে পারে না, তখন রঙ্গস্থলে অভিনেত্রী আনিতে অবশ্যই হইবে। ভদ্র মহিলারা অভিনেত্রী হয়েন, পরম সুখের বিষয়। কিন্তু যত দিন ভদ্র মহিলারা এ আসরে না নামিতেছেন, তত দিন বারাঙ্গনারা তাহাদের অভাব পূরণ করে তাহাতে আমাদের আপত্তি কি? আর একটী কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অভিনয়কার্য্যে যেরূপ হাব ভাব ভঙ্গি প্রভৃতির প্রয়োজন, লজ্জাশীলা কুলকামিনী দ্বারা সে গুলির পূরণ হইতে পারে কি না এ দেশে তাহা অদ্যাপি পরীক্ষিত হয় নাই। যত দিন পরীক্ষিত না হইতেছে, তত দিন যাহারা সেই অভিনয়োপযোগী হাব ভাব ভঙ্গিতে বিশেষ দীক্ষিত তাহাদিগকে অভিনয়কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া করিবেন কি?

ইংলণ্ডেও দ্বিতীয় চারল্‌সের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত অভিনয় কার্য্য বারাঙ্গনাদিগ দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইত। তাহার পর ক্রমে ক্রমে গৃহস্থ মহিলারা যখন তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত হইলেন, তখন সে ক্ষেত্র হইতে বারাঙ্গনাদিগকে অপসারিত করা হইল। এ দেশেও যদি কখন ভদ্র মহিলারা এ ব্যবসায়ে অগ্রসর হন, বারাঙ্গনারা সেই দিন হইতে আপনিই এই ক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইবে। কিন্তু যত দিন ভদ্র মহিলারা এ ব্যবসায়ে অগ্রসর না হইতেছেন, তত দিন অভিনয় ক্ষেত্র হইতে তাহাদিগকে বিদূরিত করা সাধ্যাতীত।

আমরা "সাধ্যাতীত" বলিলাম তাহার কারণ এই যে আমরা স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয় দ্বারাই স্ত্রীচরিত্র অভিনীত হইতে দেখিয়াছি। দেখিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছে যে পুরুষ দ্বারা স্ত্রীচরিত্র অভিনয় করার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোক দ্বারা স্ত্রীচরিত্র অভিনীত হইতে এক বার দেখিয়াছেন, তিনি পুরুষ দ্বারা তাহা অভিনীত হওয়া দেখিতে কখনই পারিবেন না। তাঁহার একটীকে প্রকৃত অভিনয় বলিয়া ও অপরটিকে ভাঁড়ামি মাত্র বলিয়া নিশ্চয়ই বোধ হইবে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আজ যদি বঙ্গ-রঙ্গ

ভূমি ও জাতীয় নাট্যশালা হইতে অভি-নেত্রীগণ বিদূরিত হয়, কাল সে সকল নাট্যশালার দর্শক জোটা ভার হইবে। একবার যাঁহারা অভিনেত্রীগণের উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছেন, তাঁহারা কখনই সংস্কারায় পরিতৃপ্ত হই-বেন না। আমরা অনেক বার উভয় নাট্যশালাতেই গমন করিয়াছি, সুতরাং আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে অভি-নেত্রীগণ দ্বারাই উভয় নাট্যশালার গৌরব সবিশেষ পরিরক্ষিত হইয়াছে। অভিনে-তৃগণ অপেক্ষা যে অভিনেত্রীগণ অভিনয় কার্য্যে অধিকতর দক্ষ তাহা বোধ হয় অপক্ষপাতী দর্শক মাত্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

এই উৎকর্ষের বিশেষ কারণ আছে। লোকে বলে "সাধনায় সিদ্ধি"। অভি-নেতৃগণ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় অভিনয় কার্য্যে সাধনা করিতে পারেন না। আরও যশোলাভের অন্যান্য দ্বার উদ্‌ঘাটিত থাকায় অভিনয় দ্বারা লোকের চিত্তবিনোদন ও যশোলাভ তাঁহারা জীব-নের এক মাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু অভিনেত্রীদিগের জীবনের আর কি আশা আছে? মানব-সুলভ যশোলিপ্সা চরিতার্থ করার তাহাদিগের আর কি উপায় আছে? এক পদস্খলনে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত, পিতা মাতা ভাই বন্ধু স্বামী পুত্র সকল হইতে চিরজীবনের মত বিচ্ছিন্ন—হতভাগিনীদিগের ঘোরত-মসাচ্ছন্ন জীবনগুহায় অভিনয় ব্যবসায় একটী মাত্র আশারশ্মি। তাহাদিগের সন্তপ্ত জীবনে সুধীজনমনোরঞ্জনই এক মাত্র সুখ। তাহাদিগের জীবনমরুভূ মিতে সাধুজন-চিত্ত-বিনোদনই এক মাত্র শান্তিস্থল। সুতরাং তাহারা যে প্রাণপণ করিয়া অভিনয় কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করিবে তাহাতে আর বিচি ত্রতা কি?

অভিনয় কার্য্যে প্রতিষ্ঠালাভের এই বলবতী ইচ্ছা যে অভিনেত্রীদিগকে জঘন্য বেশ্যাবৃত্তির অনুসরণ হইতে অনেক পরি-মাণে রক্ষা করিয়াছে, আমরা তাহা বিশেষরূপে অবগত আছি। ইহাদিগের মনের ভাব এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ পাইলে, ইহাদিগের মধ্যে অনেকে বোধ হয় এ ব্যবসায় একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে। ইহাদিগের চরিত্র সংশোধন ও সংগঠনের জন্য আমরা অনেকবার একটী বোর্ডিং বিদ্যালয় সংস্থা-পনের প্রয়াস পাইয়াছিলাম, কয়েকজন অভিনেত্রী বেশ্যাব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক তাহাতে প্রবিষ্ট হইবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু অর্থা-ভাবে আমরা সে কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। যদি উভয় নাট্যশালার অধ্যক্ষ-গণ মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের লাভাংশের কিয়দংশও এইরূপ একটী বোর্ডিং বিদ্যা-লয়ের সংস্থাপন ও সংরক্ষণে বিনিযোজিত করেন, তাহা হইলে তাঁহারা লোকের এই রূপ গালিবর্ষণ হইতে আত্মরক্ষাও করিতে পারেন, এবং যে অভিনেত্রীগণ দ্বারা তাঁ-

তাবা বঙ্গের এত আদরের ধন হইয়াছেন, তাহাদিগকে দুস্তর পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া জগতে অতুল যশ ও অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন।

আর যে মহাত্মাগণ অভাগিনী বিভ্রান্ত (Benighted) বারাঙ্গনাগণের উঠিবাব একটীমাত্র সোপান রুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমবা বিনীতভাবে এই কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি—"অভাগিনীদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াও কি আপনাদিগের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই? অনুতাপেও কি তাহাদিগেব পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই? যথন তাহারা পাপপঙ্ক হইতে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন তাহাদিগকে অনুকূল হস্তাবলম্ব প্রদান কবা উচিত, না আরও নিমগ্ন করিয়া দেওয়া উচিত? যদি অনুকূল হস্তাবলম্ব পাইলে সহস্রের মধ্যে একজনও উঠিতে পারে, তাহাতে জগতের ও সমাজের মঙ্গল না অমঙ্গল? যদি পাপস্রোত কমিলে জগতের মঙ্গল হয়, তাহা হইলে ইহাতে হইবে না কেন? যথন আমরা উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব ভ্রাতৃগণের চরিত্র সংশোধনের জন্য বিশেষ যত্নপর হই ও তাহাদিগকে সমাজের ক্রোড়ে রাখিয়া স্নেহবাক্যে কুপথ হইতে ফিরাইতে চেষ্টা করি, তথন আমরা কোন্ নীতি ও কোন্ যুক্তি অনুসারে বিভ্রান্ত ভগিনীগণকে জঘন্যতর নরকে নিক্ষেপ করি, উঠিবার চেষ্টা করিলেও তাহাদিগকে আর উঠিতে দিই না? চোর, ডাকাত, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক, বেশ্যাশক্ত, অধিক কি নরহন্তা প্রভৃতিকেও যথন আমরা সমাজতরুর ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করি, তথন কোন্ নীতি ও কোন্ ধর্ম্ম অনুসারে আমরা বারাঙ্গনাদিগকে আজীবন সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিই? তাহাদিগের সংখ্যা ও বলের হীনতাই কি এই সকল অত্যাচারের প্রধান কারণ নয়?"

রঙ্গভূমির অস্তিত্বের বিরুদ্ধে আরও যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহার মীমাংসা করিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে রঙ্গভূমিতে আমাদিগের অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় নাই। আমাদিগের বিশ্বাস তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আধুনিক অভিনয় প্রণালী যে কুরুচির সংশোধন করিয়া উৎকৃষ্ট রুচির প্রবর্ত্তনা করিয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই। অভিনয় প্রথা আরম্ভ হওয়ার পর অবধি দাসুরায়ের পাঁচালী বা জঘন্য যাত্রাদি শুনিতে কাহারও স্পৃহা জন্মে না। যাঁহারা শনিবার রাত্রিতে বেশ্যালয় গিয়া দূষিত আমোদ প্রমোদে মত্ত হইতেন, তাঁহাদের চিত্ত অভিনয়ের বিশুদ্ধ আমোদে আকৃষ্ট হওয়ায়, তাহাদের আর তথায় যাইতে প্রবৃত্তি থাকে না। সমস্ত সপ্তাহ পরিশ্রম করিয়া শনিবার দিবস অনেকেরই আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা হয়। পূর্ব্বে বেশ্যালয় যাওয়া ব্যতীত অল্পব্যয়ে সে আমোদস্পৃহা চরিতার্থ করিবার অন্য উপায় ছিল না। আমোদস্পৃহা চরিতার্থ করিতে বেশ্যালয় গিয়া অনেক যুবক বেশ্যা ও মদে নিতান্ত

আসক্ত হইয়া পড়িতেন। রঙ্গভূমি সকল যদি দেশের আর কোনও উপকার না করিয়া থাকে যুবকবৃন্দের প্রবৃত্তিস্রোতের এইরূপে গতি পরিবর্ত্তন করিয়া সমাজের যে মহৎ উপকার সাধন করিয়াছে তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। যাঁহারা বলেন "যেখানে গীত বাজনার আমোদ, নেশা ও বেশ্যাশক্তি যেন সেখানে থাকিবেই থাকিবে" তাঁহারা অতীত সময়ের ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে সে স্রোত ফিরিয়াছে। এক্ষণে গীত বাদ্যে অনেকেই পবিত্র আমোদ অনুভব করিতে শিখিয়াছেন। গীত ও বাদ্য কবিত্ব অপেক্ষাও যে অধিকতর হৃদয়-উত্তেজক তাহা এক্ষণে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। শৃঙ্গার ও শান্তরস ভিন্ন যে অন্যান্য রস গীত ও বাদ্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে তাহাও এক্ষণে ঐ সকল রঙ্গভূমিতেই প্রদর্শিত হইতেছে।

রঙ্গভূমির অস্তিত্বের বিরুদ্ধে আর একটী আপত্তি—ইহার অভিনেতৃগণ সচ্চরিত্র নয়। ইহা দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু প্রথম অবস্থায় ইহা অনিবার্য্য। জনসমাজে ইহার উপকারিতা ও পবিত্রতার দিন দিন যত উপলব্ধি হইবে, ততই সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র লোকেরা ইহাতে প্রবিষ্ট হইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমরা আহ্লাদসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে দুই চারি জন সুশিক্ষিত ও সচ্চবিত্র লোক উভয় বঙ্গভূমিরই সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। আমাদিগের আশা যে ইহাঁদিগের অসাধারণ অধ্যবসায় ও সবিশেষ যত্নে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের চরিত্রের সংশোধন ও অভিনয়ের অন্যান্য দোষের অপনয়ন হইবে। গ্রন্থকার ও সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ সাধারণ্যে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া অভিনয়ের দোষের উল্লেখ ও গুণের প্রশংসা করিয়া তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলে দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধন করা হইবে। কিন্তু যাঁহারা তাহা না করিয়া রঙ্গালয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেশের বিশুদ্ধ আমোদপথে কণ্টক রোপণ করিবেন—তাঁহারা সমাজের শত্রু, ভারতের কলঙ্ক!

নিত্য-হোমীর অগ্নি-রক্ষা।

শ্মশান-সদৃশ মরুভূমি খণ্ড—
পার্শ্বে বিধূমিত হয় অগ্নি-রেখা;
কত দিন হইতে ও অগ্নিস্থাপিত,
অর্দ্ধদগ্ধ-চিত্রে আছে তাহা লেখা।

কাজ নাই দেখে সেই চিত্র আর,
সে কালের সীমা কি হবে দেখিয়া?
কোমল মস্তিষ্ক নূতন হৃদয়
তা দেখে এখনি যাবে বিদরিয়া!

যাছিল প্রাচীন সত্ত্ব বা জীবনী,
তাহা দগ্ধ হয় ঐ তুঁষানলে;
দার্ঢ্য-হীন চিত্ত দার্ঢ্য-হীন নেত্র
দেখে সে যন্ত্রণা সবে কোন্ বলে?

তাই বলি ভাই কাজ নাই দেখে,
সহ আরো জ্বালা দৃঢ়কর হিয়া,
ক্রমে হবে সেই তত্ত্ব-নির্ব্বাচন,
যে রূপে ও অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া।

বুঝিবে যে দিন সে তত্ত্ব কাহিনী,
বুঝিবে যে দিন প্রশ্নের উত্তর,
বুঝিবে যে দিন নিজের অস্তিত্ব
গণিবে সে দিন অদৃষ্ট-অক্ষর;

যে দিন হইতে ঐ অগ্নি-কুণ্ড
জ্বলে মিটিমিটি এ ভূমি ব্যাপিয়া,
তার পূর্ব্বদিন স্মরিবে যে দিন
উঠিবে সে দিন স্বতঃ শিহরিয়া!

কিন্তু তাও বলি না জেনে না শুনে,
নির্ব্বাপিতবৎ অনল কণায়,
অকালে জ্বালিতে করিও না চেষ্টা,
ফুৎকার মাত্রকে করিয়া সহায়।

এত কোটী নর-মধ্যে তুমি একা
কি করিতে পার, তুমি কোন্ ছার!
তুমি মর যবে দেখিবে সকলে
সেই দিন চেষ্টা করো একবার।

তোমাতে আমাতে একতীর্থসাথী
হইয়া একত্রে যবে আরেবার
এক অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিব সুখে
সেই দিন চেষ্টা করো একবার।

কোটী কোটী স্নায়ু স্থূল নাড়ীরূপে
হয়ে অস্ত্র বস্তু করিবে যেদিন
রাশি রাশি বিঘ্ন বাধা পরিপাক,
প্রকৃত রোগের শান্তি সেই দিন!

তবে বলি ভাই মনে রেখ কথা,
থেকোনা নিশ্চিন্ত এক দিন তরে,
সাগ্নিক রূপেতে কর অগ্নি-রক্ষা
যত দিন অগ্নি না জ্বলে হুঙ্কারে!

সকলে মিলিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাসে
কর প্রধূমিত ক্ষুদ্র অগ্নি-শিখা,
আন্তরিক দার্ঢ্য ইন্ধনরূপেতে
ফেল দিবানিশি ঐক্য-ঘৃত-মাখা!

আছে বুঝি কিছু পিতৃপুণ্য-বল,
দৈব-তেজ কিছু আছেরে অদ্যাপি,
নতুবা এ অগ্নি থাকিত কোথায়?
দৈত্য নিষ্ঠীবনে যাইত নির্ব্বাপি!

একবার যদি এই তুঁষানল
কোন দোশ-স্পর্শে যায়রে নিবিয়া,
আর জ্বালা ভার;—চিরকাল তরে
হইবে নিঃশেষ এই বহ্নি-ক্রিয়া!

অতএব ভাই দাও ধুমাইতে,
হোক্ ধূম-ময় এই তুঁষানল;
ধুমায়ে ধুমায়ে ক্রমশঃ এ বহ্নি,
প্রজ্বলদ্ রূপে ফলাইবে ফল।

মনে নাই সখে! সেদিনের কথা?
যবে সহ্য দেব অসহ্য-পীড়ন
সহিতে না পারি, ক্রোধ পরবশে
শিহরি উঠিল করিয়া গর্জ্জন।

অজস্র অজস্র আহুতি-সামগ্রী
ঝলকে ঝলকে বেগে উগারিয়া,
"স্বাহা স্বাহা" বলি দিয়াছিল হোত্রে,
ঐ হুতাশনে আনন্দে ঢালিয়া!

ঐ ক্ষুদ্র-বহ্নি ভক্ষি হুতি-স্তূপ,
ভীষণ প্রকাণ্ড আকারে জলিয়া,
লোলি তীব্র অভ্র-পরশিনী শিখা,
ভীম বাত্যাস্পর্শে উঠিল নাচিয়া!

ক্রমে কাল-চক্রে ফিরিল অদৃষ্ট
সেই কালানল হইল নির্ব্বাণ;
ভরসার স্থলে কণামাত্র তার
ধূমাকারে ঐ আছে বিদ্যমান।

আছে আছে আজো সেই অগ্নি-বীজ,
হইওনা ভাই কভু আশা-হীন;
এক মুষ্টি তুঁষ করিতে নিক্ষেপ
ভুলিয়া থেকোনা যে কোন দিন!

চাণক্যে করিয়া স্মরণ
দাও তৃণ-গুচ্ছ ঐ তুঁষানলে,
হোক ধূম-বৃদ্ধি আরোধূমা হোক
ঘোর ধূমাচ্ছন্ন হউক সকলে।

ভীম-ধূম-রাশি ক্রমশঃ বাড়িয়া
সুদীর্ঘ কালেতে গুমারি গুমারি,
অকস্মাৎ বেগে দেখ এক দিন
জ্বালাময়ী শিখা উঠিবে শিহরি!

উপযুক্তকালে কাহাকেও কোন
যতন করিতে হবেনা হবেনা,
অনন্ত শিখায় গর্জ্জিয়া আপনি
উঠিবে অনল; (বাধায় রবেনা)

সপ্ত স্বর্গ ভেদি উঠিবে সে শিখা
ভুবন-বিকম্পী ধূ-ধূ-ধূ-ধূ রবে!
হবে যুগান্তর এ ভূম্রে সে দিন
জয় জয় জয় দেবগণ গাবে।

দেখিবে সে দিন এই ধূম-ফল
কোন্ শুভ-ফলে হবে পরিণত,
মরতে বসিয়া শত স্বর্গ-সুখ
লভিবে সে দিন জনমের মত।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মিশ্র।

মেলমালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে এই অবসরে কেশরকুনীদিগের বৃত্তান্ত কিছু লেখা আবশ্যক। নতুবা যে যে স্থলে কেশরকুনীর উল্লেখ হইবে তথায় পাঠকের বিরক্তি জন্মিতে পারে। সে দোষ পরিহার জন্য অগ্রেই তাহার উল্লেখ করা গেল। কেশরকুনীরা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণবংশসম্ভূত।

নিম্ন-লিখিত চতুর্দ্দশ ঘর কষ্ট-শ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত যথা—

পঞ্চগোত্রের মধ্যে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়

দীর্ঘাঙ্গী, পারিহাল, কুলভি, গড়গড়ি ও কেশরকুনী এই পাঁচ ঘর, কাশ্যপ গোত্রে পোড়ারি, হড় গুড় ও পীতমুণ্ডী এই চারি ঘর; ভরদ্বাজ গোত্রে রাই গাঁই ও ভিংসাই এই দুঘর; বাৎস্য গোত্রে মাহিন্তা ও পিপ্‌লাই এই দুই গাঁই; সাবর্ণি গোত্রে কেবল ঘণ্টেশ্বরী এই চৌদ্দ গাঁই পূর্ব্বে গৌণ কুলীন বলিয় খ্যাত হয়েন। অর্থাৎ ন্যূনমর্য্যাদাপন্ন হয়েন।

প্রথমভাগ (২২৫ পৃষ্ঠা দেখ।)

এই কয়েক ঘর গৌণ কুলীন মহারাজ লক্ষ্মণসেনের নিকট শ্রোত্রিয় সংজ্ঞা পাইলেন। শ্রোত্রিয়সংজ্ঞা পাইলেন বটে কিন্তু সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধশ্রোত্রিয়দিগের সমকক্ষ হইতে পারিলেন না। কুলশাস্ত্রে পিপ্‌লাই দীর্ঘাঙ্গী, ভীংসাই এই কয়েক ঘরের সিদ্ধ নাম হইল বটে কিন্তু কার্য্য ত কিছুই হইল না।

সেইরূপে মহিন্তা হড় গুড় পারিহাল ইহাঁদিগের নাম সাধ্যশ্রোত্রিয়ের দলে উঠিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাঁরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

কেশর, পীতমুণ্ডী, রাইপাঁই, ঘণ্টেশ্বরী, চোৎখণ্ডী ও কুলভী ইহাঁরা কুলান্তক বা কুলের অরিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেন। তৎকালে ইহাঁদিগের নাম কষ্টশ্রোত্রিয় হয়। সমাজে এই কয়েক ঘর যেরূপে লোকের নিকট অনাদৃত ছিল পূর্ব্বোক্ত পিপ্‌লাই প্রভৃতি ইদানীন্তন সিদ্ধশ্রোত্রিয় ও হড় গুড় প্রভৃতি আধুনিক কষ্টশ্রোত্রিয় মধ্যেই পরিগণিত থাকিলেন।

যথা।—

হড় গুড় কেশরকুণি মহিন্তা রাইগাঁই। ১
ঘণ্টেশ্বরী পীতমুণ্ডী দীর্ঘাঙ্গী পিপ্‌লাই॥ ২
কুলভী চোৎখণ্ডী পারিহাল ভিংসাই। ৩
* * * * * যাঁছুলে কুল নাই॥ ৪

ইহাঁদিগের সম্বন্ধে যে কয়েক ঘর দুষ্ট হইয়াছিলেন তন্মধ্যে কয়েক ঘরকে দেবীবর ঘটক মেল নির্ব্বাচন কালে ঐ সকল ঘরকে সেই সেই মেলের উৎপত্তির কারণ রূপ শ্রোত্রিয় সংজ্ঞা দেন। তদনুসারে তাঁহারা ঐ সকল মেলের নির্দ্দিষ্ট শ্রোত্রিয় হয়েন। স্বীয় মেলে ঐ সকল শ্রোত্রিয়েরা বিশেষ মান্য।

যেমন হড়, গড়্গড়ী, পিপ্‌লাই ও ডিংসাই এই কয়েক ঘর শ্রোত্রিয় খড়দহ মেলের আশ্রয় —

মহিন্তা, সর্ব্বানন্দী মেলের আশ্রয়—

গুড় গাঁই, সুরাইমেলের নিদান;

কেশর গাঁই সেরূপে কোন মেলের নিদান হইতে পারে নাই সেইহেতু কেশরগ্রামীরা পূর্ব্ববৎ পশ্চাতেই থাকিলেন। কিছুকাল পরে যখন কেশরগ্রামী ভবানন্দের বংশের প্রতাপ বৃদ্ধি হইল এবং ঐ রাজগণ নবদ্বীপাদি চারি সমাজের অধিপতি হইলেন তখন কেশরকুনীরা চতুঃসাগরী কুলক্রিয়া আরম্ভ করেন। এক্ষণে কেশরকুনিভাবাপন্ন কুলীনের সংখ্যা যত অধিক এত অন্য ভাবাপন্নের ভাগ দেখা যায় না।

এই কেশরকুনিরা এদেশের কোন্ কোন্ স্থলে অধিক পরিমাণে বিরাজ করিতেছেন

তাহা কার্ত্তিকের চন্দ্র রায় কৃত বাং ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিতে সবিস্তার বর্ণিত আছে। পাঠকগণ ঐ পুস্তক পাঠ করিলে সমুদায় জানিতে পারিবেন। এখানে কেবল ঐ বংশের যে সকল বিষয় উক্ত পুস্তকে নাই অথবা যে সকল বিষয়ের সহিত আমরা ঐকমত্য অবলম্বন করিতে পারি না, এবং যে সকল বিষয়ের উল্লেখ না করিলে প্রক্রান্ত বিষয়ের সামঞ্জস্য রাখা যাইতে পারে না তাহারই কেবল উল্লেখ হইবে।

যথা—

ক্ষিতীশ-বংশাবলীর অষ্টমাধ্যায়ে—

তিনি (ভট্টনারায়ণ) কাণ্যকুব্জান্তর্ভূত কোন প্রদেশের ক্ষিতীশ নামক রাজার পুত্র। একারণ বঙ্গাধিপতি তাঁহাকে কতিপয় গ্রাম প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। ভট্টনারায়ণের সহিত অপর্য্যাপ্ত অর্থ ছিল। তিনি দান গ্রহণে অসম্মত হইয়া, মূল্য প্রদানপূর্ব্বক প্রস্তাবিত কয়েকখানি গ্রাম গ্রহণ করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে অপর লোকের নিকট আরও কতকগুলি নিষ্কর গ্রাম ক্রয় করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার একটী ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপিত হয়—

এই সকল যাহা হইতে সংগৃহীত তাহা এই বাক্যং—

অথ কাণ্যকুব্জে বিদিতপ্রভাব-ক্ষিতীশ-নামনরেন্দ্রপুত্রস্য ভট্টস্য লোকাতীত-কর্ম্মভির্ভৃশং পরিতুষ্টো রাজাহ—প্রভো! ময়া কিয়ন্তো গ্রামা দীয়ন্তে কৃপয়া তান্ গ্রহীতুমর্হসি। ভট্টঃ প্রাহ দুষ্প্রতিগ্রহ-গোহিরণ্যতিললৌহাদি সহিতা গ্রামা ময়া ন গ্রহীতব্যাঃ। রাজাহ অনুগ্রহেণ কিঙ্করেণ ময়া তদা কিং কর্ত্তব্যং। মম পারলৌকিক-সদ্গতির্বা কথং ভবিষ্যতি। ইতি শ্রুত্বা ভট্টঃ পুনরাহ—মম ধনানি বহূনি বিদ্যন্তে তৈ র্ময়া কতিচিদ্‌গ্রামাঃ ক্রীয়ন্তে, ভবতা বিক্রীয়তাং, ভবতো যদি মমোপকারে বাঞ্ছাস্তি তত্রৈব সমুচিতোপকারঃ ক্রিয়তাং। শ্রুত্বা রাজাহ তথৈবাস্তু। ততঃ স্বল্পেন মূল্যেন বহবঃ গ্রামা বিক্রীতাঃ তেষু চ প্রতিবর্ষলব্ধব্যকরা গ্রামান্তরলব্ধব্য করেষু বর্দ্ধিতাঃ। ভট্টেন চ ক্রীতা গ্রামাঃ চতুর্ব্বিংশতি বর্ষান্ নিষ্করং ভুজ্যন্তেস্ম।

সং ক্ষিতীশ-বংশাবলিচরিতম্।

ক্ষিতীশ বংশাবলীর এই কথাগুলি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। প্রথম ধার্ম্মিক ও সৎক্রিয়াশালী ব্যক্তির নিকট ভূমিদান গ্রহণ করা যায় তাহাতে পাপস্পর্শ করে না। ভূমি দান করিলেই তাহার সহিত গো হিরণ্য ও তিল দান করিতে হয় এরূপ বিশেষ নিয়ম নাই। যত প্রকার দান ও প্রতিগ্রহ আছে তন্মধ্যে ভূমিদান ও ভূমির প্রতিগ্রহে উভয় পক্ষের পুণ্য সঞ্চয় হয়।

দ্বিতীয়তঃ অধ্বরে দীক্ষিত ব্যক্তিরা যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ দান গ্রহণে নিষিদ্ধ নহেন। তৃতীয়তঃ শাস্ত্রে প্রমাণ আছে যে পরশুরাম সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডল দান করিয়া নিজে সমুদ্রের কূল আশ্রয় করেন। অধুনাও দেখা যায়—প্রত্যেক সৎক্রিয়াশালী ব্রাহ্মণেই ব্রহ্মোত্তর গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন—তাঁহারা কেহই ঐ ভূমির দান গ্রহণকে

ভূপ্রতিগ্রহ মনে করেন না।

যাজ্ঞিক পঞ্চজনের মধ্যে অন্য চারি জন ভূমিদান গ্রহণ পূর্ব্বক এদেশে বাস করিলেন, কেবল ভট্টনারায়ণ গ্রাম ক্রয় পূর্ব্বক ভূস্বামী হইলেন—ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না। যদি অন্য চারিজন গ্রহণ করিয়া থাকেন স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে ভট্টনারায়ণেরও প্রতিগ্রহ অস্বীকার করা যাইতে পারে না। সকলেরও যে গতি, তাঁহারও সেই গতি। অন্য চারি জন ভট্ট অপেক্ষা কোন বিষয়েই হীনকল্প ছিলেন না। আর এক কারণ এই ভট্টের সন্তানগণ অন্য চারিজনের সন্তানগণের ন্যায় রাজদত্ত গ্রাম গ্রহণ পূর্ব্বক তত্তৎগ্রামীন হইবেন কেন? তাহা যদি না হইত তবে কেন তাঁহারা দান স্বীকার করিবেন। বিশিষ্ট কারণ এই যদি ভট্টনারায়ণ ভূস্বামী হইয়াছিলেন তবে কেন তিনি তাঁহার প্রথম সন্তান আদিবরাহকে রাজ্যের উর্দ্ধরাধিকারিত্বে বঞ্চনা করিলেন। নিয়মানুসারে তাঁহারই রাজ্যপ্রাপ্তির সম্ভব। নীপ তৃতীয় পুত্র, তাহার রাজ্যপ্রাপ্তি সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যিনি ক্ষিতীশবংশাবলী রচনা করাইয়াছিলেন তিনি মনে করিয়াছিলেন এখন তিনি রাজা সুতরাংযদিপূর্ব্বপুরুষগণ রাজা হন তাহা হইলে বড় স্পর্দ্ধার বিষয়। পূর্ব্বপুরুষকে নির্দ্ধন বলিলে মানের কিছু খর্ব্বতা হইবে মনে করিয়া নিজের আদিপুরুষকে প্রথমাবধিই ভূস্বামী করিয়া তুলিয়াছেন। পঞ্চজন যাজ্ঞিককেই যে দান করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই।

ইতি শ্রুত্বা নৃপস্তত্র মনসা হর্ষমাগতঃ।
বিধানেনৈব নির্বর্ত্ত্য ক্রতুঞ্চ ধর্ম্মসংজ্ঞিতং॥ ২৩

গ্রামং সুবর্ণং গাশ্চৈব বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
দক্ষিণার্থে দ্বিজাতিভ্যো প্রদদৌ স নৃপোত্তমঃ॥ ২৪

অত্র দেশে কৃতাবাসাঃ সর্ব্বে চ দ্বিজপঞ্চকাঃ।
বহবশ্চ প্রজা জাতা নানাদেশনিবাসিনঃ॥ ২৫

কুলরমার বচন।

নীপ যে তৃতীয় তাহার প্রমাণ ২১৮ পৃঃ দেখ। এখানে সংস্কৃত প্রমাণ গুলি দেওয়া গেল।

আদ্যোবন্দ্যঘটিঃখ্যাতঃরামো গড়গড়িঃস্মৃতঃ
কেশরোনীপসংজ্ঞোংভূন্নান্যঃ কুসুমকোভবৎ
পারিহালো বাটুকোপি কুলভিগু ক্রিনামকঃ
ঘোষলী চ গুণোনামা দীর্ঘাঙ্গী গুণ্ডকস্তথা॥
ররাজ বৈ মাসচটে গ নামা মহমতিঃ।
রেজে তথা শুদ্ধমতি র্ব্যালবটেবিকর্ত্তনঃ॥
বসুয়ারিস্তথা নালো করালে মধুসূদনঃ।
কুশারিনিহ্লকো নাম বিভুর্বিরাজতে দিবৌ॥
শাণ্ডুকস্য শেয়কেষু বাসো দত্তো নৃপেণ বৈ
এতেষাং সহজঃপশ্চাৎ গুতনামা মহীপতিঃ
দ্বিজধর্ম্মসমাধাতুং বসেদ্গ্রামে কুনিকুলৌ॥

রাঢ়দেশীকুলপদ্ধতিঃ।

ক্রমশঃ

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ভার্গববিজয়-কাব্য। শ্রীগোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। আল্‌বার্ট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১॥ টাকা মাত্র। গ্রন্থখানি অবয়বে প্রায় চারিশত পৃষ্ঠা। এরূপ বিস্তৃত মহাকাব্য বঙ্গভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণই ইহাতে বর্ত্তমান আছে! কেবল একটী দোষেই সমস্ত মাটী হইয়াছে। ইহার যেখানেই খুলি সেই খানেই অর্থ বোধ হয় না। সংস্কৃত কোন মহাকাব্যে এরূপ শব্দাড়ম্বর দেখি নাই। গ্রন্থকার সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণ করিতে গিয়া আপনার গ্রন্থখানিকে সংস্কৃতের জটিলতম কাব্য অপেক্ষাও জটিলতর করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি কাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া এরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। টোলের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এরূপ ভাষা ভাল বাসেন বটে, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও মাইকেলী ক্রিয়াকলাপের উপর তাঁহারা নিতান্ত বিরক্ত। সুতরাং ইহা যে তাঁহাদিগেরও প্রীতিকর হইবে না সে বিষয়ে সংশয় অল্প। যাহা হউক আমরা গ্রন্থকারের অসাধারণ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। নিম্নে আমরা পাঠকগণকে দুই একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া উপহার প্রদান করিলাম :—

সুনিবিড় নীরোদর নীরধর কর
জলদ-আগম-কাল অন্তে অন্তর্হিত
হ'লে যথা, নভস্থল পুনঃ সুবিমলে
শোভে শরতের সমাগমে, সুনীলিম,—
কিম্বা বিধু বিধুন্তুদ-গ্রাস-অবসানে
অমৃত মরীচি মালে অবনী ব্যাপয়ে,—
বিরামিলে বেগ-রাশি ভীম প্রভঞ্জন
আবার প্রকৃতি ধরে পরমা সুষমা,—
অথবা মরুদ্‌-গ্রাম সহিত সংগ্রাম
অচল-উত্তুঙ্গতম তরঙ্গগণের
নিবারিলে, ফিরে ইন্দ্রনীলস্তোম সম
গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি লভে জল-নাথ,—
অথবা যামিনী হাসে তম-অপগমে
সমুদিলে শশধর,পীযূষ-দীধিতি,—
কিম্বা বিভাবসু শিখা প্রোজ্জ্বল জ্বলনে
ভূমাধূম-হীন তনু দীপে নিশাগমে,—
তরঙ্গিণী রোধ ভঙ্গে পঙ্কিল সলিলা
আবার প্রবহে ধীর প্রসন্নতা সনে,—
ভীষ্ম গ্রীষ্মে দব-বহ্নি-দগ্ধ পক্ষ শিখী,
মেঘনাদ-অনুলাসী, বরষা আসিলে,
নবঘন-সন্দর্শনে যেমন প্রফুল্লে
নর্ত্তন-নিরত হয়, পুচ্ছ সুবিস্তারি'
ষড়্‌জের শিক্ষা-গুরু হ'য়ে গায়কের,—
বিষন্নতা দূর হ'লে তেমন সকলে
সন্তোষের সমুদয়ে হ'ল উল্লাসিত।

আনন্দ-মিলন। নাট্যগীতিকা। শ্রী রামতারণ সান্যাল কর্ত্তৃক সুর লয়ে গঠিত। রাজকীয় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য

॥০ আনা। এই গীতিকার অভিনয় দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। ইহার গান গুলি অতি সুন্দররূপে সুরলয়ে গঠিত হইয়াছে। দময়ন্তীর অভিনয় এত সুন্দর হইয়াছিল যে গ্রন্থকর্ত্তা ও অভিনেত্রীকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যাঁহারা অভিনয়ের পরম শত্রু, তাঁহাদিগেরও পাষাণ হৃদয় দময়ন্তীর গীত শ্রবণে বিগলিত হইবে। অভিনেতা দ্বারা স্ত্রী-অংশ অভিনীত হইলে দর্শকমণ্ডলীর কথনই এরূপ চিত্তবিভ্রম ও চিত্তোন্মাদ জন্মিতে পারে না। পাঁচালী ও যাত্রার পরিবর্ত্তে এরূপ নাট্যগীতিকার অভিনয় যে বহুলরূপে প্রচারিত হয় আমরা তাহা অন্তরের সহিত ইচ্ছা করি। সুতরাং এরূপ নাট্যগীতিকার সংখ্যা যতই বাড়িবে, ততই আমরা সুখী হইব। এই গীতিকাখানিতে ভাবের তারল্য ও অনুপ্রাসমূলক বাক্‌চাতুর্য্যের কিঞ্চিৎ আধিক্য দৃষ্ট হয়। বিষয়টী যেরূপ করুণবিপ্রলম্ভরসপ্রধান, তাহাতে তারল্য ও রসিকতার এত আধিক্য সমীচীন নহে। ইহাতে স্থায়ী রস গৌণভাবাপন্ন হইয়া নাটকের ও অভিনয়ের উদ্দেশ্য বিফল করিয়া তুলে। সময়ে সময়ে এমন ঘটে যে গ্রন্থকার কাঁদাতে গিয়া হাঁসাইয়া ফেলেন। এ গ্রন্থেরও কোন কোন স্থলে এরূপ রসভঙ্গ ঘটিয়াছে। আশা করি গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সেই দোষ পরিহরণ করিবেন।

ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত। শ্রী কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত। সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। এই গ্রন্থে লিখিত আছে যে ত্রিপুরার অধিপতিরা যযাতির পুত্র দ্রুহ্যু হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দ্রুহ্যুর পুত্র ত্রিপুর পূর্ব্বদেশে গিয়া রাজ্য সংস্থাপন করেন। তাঁহার নামেই উক্ত রাজ্য ত্রিপুরা নামে আখ্যাত হইয়াছে। ত্রিপুরার অধিপতিগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। অতি অল্প দিন মাত্র হইল সর্ব্বগ্রাসিনী ব্রিটিশ রাজনীতি এই নিরীহ রাজবংশকে স্বাধীনতা-হারা করিয়াছেন। এই স্বাধীন রাজ্যের ইতিহাস পাঠ আমাদিগের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাতে অতীত গৌরব ও ভবিষ্য রাজনীতির শিক্ষা হইতে পারে। গ্রন্থকারও ইহাকে সুপাঠ্য করিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই।

বিশ্বদর্শন। প্রতি ঋতুতে প্রকাশ্য সাময়িক পত্র ও সমালোচন। শ্রী অমরেন্দ্র নাথ সোম কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ভবানীপুর সুবর্‌বন্‌ প্রেসে মুদ্রিত। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।/০ আনা। ইহাতে সূচনা, স্বার্থবৃত্তি ও দেহাবসান, বসন্তকুমারী, বীরতর্পণ, অদ্ভুত পঞ্জিকা, সিদ্ধির ঝুলী, পরকাল প্রভৃতি দ্বাদশটী প্রস্তাব লিখিত আছে। রচনা মন্দ নহে। যদি জীবিত থাকে ত বিশ্বদর্শন দ্বিতীয় শ্রেণীর এক খানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা হইবে। কিন্তু দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ইহা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে তাহার আশা করা যায় না।

ইহার ভুবনমোহিনী-প্রতিভার লেখক কর্তৃক রচিত বীর তর্পণটী অতি সুন্দর হইয়াছে। পাঠকগণের পরিতোষার্থ তাহা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম :—

৯

"যে দিন হইতে হিন্দু ভাগ্যশশী,
ঢাকিয়া ফেলেছে যবন-জলদে,
সে দিন হইতে আছি উপবাসী
আছি তৃষ্ণাতুর; পুত্র রে জল দে!

১০

"যে দিন হইতে হিন্দু শৌর্য্য সূর্য্য
গ্রাসিয়া ফেলেছে যবন-রাহুতে,
সে দিন হইতে আছি উপবাসী,
আছি তৃষ্ণাতুর; বিশুষ্ক কণ্ঠেতে!

১১

"যে দিন হইতে হিন্দুরাজলক্ষ্মী
হরিয়া লয়েছে যবন-তস্করে,
সে দিন হইতে আছি উপবাসী
আছি তৃষ্ণাতুর; আছি প্রাণে মরে!

১২

"যে দিন হইতে ইন্দ্রের অমরা
পিশাচের স্পর্শে অশুচি হয়েছে,
সে দিন হইতে আছি উপবাসী,
সে দিন হইতে সকলি গিয়েছে!

১৩

"যে দিন হইতে এ কনক-পুরী
বানরে পোড়ায়ে করিয়াছে ছাই,
সে দিন হইতে আছি উপবাসী
সে দিন হইতে আর কিছু নাই!!

১৪

"যে দিন হইতে সিংহের আহার
শৃগাল কুক্কুরে করেছে ভক্ষণ,
সে দিন হইতে আছি উপবাসী
পুত্ররে! সকলি নিয়তি-লিখন!

১৫

"যে দিন হইতে সোণার সংসার
পরের পদেতে বিকায়ে গিয়েছে,
সে দিন হইতে শুখায়েছে সিন্ধু,
হিমাদ্রির শৃঙ্গ নত হইয়াছে!

১৬

"যে দিন হইতে যবন সমুদ্র
উত্তাল তরঙ্গে প্রবেশি ভারতে,
গিরি নদ নদী সিন্ধু জনপদ
ভাসায়ে দিয়েছে দুর্দ্দম স্রোতেতে!

১৭

"সে দিন হইতে সব অপবিত্র!
পুত্ররে! কাজেই আছি উপবাসী,
(ভারত সমুদ্রে নাই জলবিন্দু
যাহা দেখ উহা হিন্দুরক্তরাশি!

১৮

"গঙ্গা যমুনাদি সপ্ত নদ নদী
দেখিতেছ বেগে আজও বহিছে,
জল নহে উহা হিন্দুদের রক্ত
হিন্দু মজ্জা মাংসে বালুকা জমেছে?

১৯

" দেখিছ লতায় ফুটেছে কুসুম,
বৃক্ষশাখে শোভে সুরসাল ফল;
ক্ষেত্রে শোভে শস্য নয়ন রঞ্জন,
কি দেখিছ ? হিন্দু মেদ ওসকল !

২০

" দেখিছ সুমেরু, নীল বিন্ধ্যাচল
হিন্দুদের অস্থি কঙ্কাল প্রমাণ,
দেখিছ যে সব দেশ জনপদ,
কি দেখিছ ? উহা হিন্দুর শ্মশান !

২১

" কি দিয়া তর্পণ করিবিরে পুত্র
হিন্দু রক্ত বিনা পানীয় ত নাই,
তবে যদি পার, বলি উপদেশ,
পার বা না পার চিন্ত দেখি তাই

২২

" হেন পুত্র যদি জন্মে কোন দিন,
ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারে এ সংসারে,
ভারত-সমুদ্র সপ্ত নদ নদী
ছেঁচিয়া ফেলিতে পারে স্থানান্তরে !

২৩

" আবার সগর-বংশ যদি জন্মে
ভীম বাহুবলে কাটে পারাবার,
বংশ উদ্ধারিতে জন্মে ভগীরথ,
আনে ব্রহ্মময়ী গঙ্গারে আবার !

২৪

" আবার যদ্যপি জন্মে এক ভীম
নব কুরুক্ষেত্রে করেরে তর্পণ,
আকণ্ঠ পুরিয়া পান করি তবে
করি যুগান্তের তৃষ্ণা নিবারণ !

২৫

" আবার যদ্যপি জন্মে এক রাম
কোদণ্ড-কণায় কাটিয়া সরযু
আব্রহ্ম প্লাবিয়া করে রে তর্পণ
তবে তৃষ্ণা শান্তি হতে পারে কিছু !

২৬

" যে শর-শয্যায় আছিরে শয়িত
যে অনল শিখা জ্বলেরে বক্ষেতে,
আবার যদ্যপি জন্মে ধনঞ্জয়
ভোগবতী গঙ্গা আকর্ষী শরেতে !—

২৭

নিভায় এ বহ্নি, তবেই নিভিবে
অন্যথা এ দাহ দহিবে ভীষণ,
(থাক যদি কেহ রাম ধনঞ্জয়
কর্ণ ভীমসেন করহ তর্পণ !)

২৮

" থাক যদি কেহ বংশে ভগীরথ
বাজায়ে দুন্দুভি আন জাহ্নবীরে,
আব্রহ্ম প্লাবিয়া কর রে তর্পণ
মুক্তি লভি সবে যাই স্বর্গপুরে ! "

শৈবলিনী-চরিত-সমালোচনা।

সাহিত্যকাননের অত্যুৎকৃষ্ট ও অতি রমণীয় কুসুম কবিজনকৃত কাব্য। সাহিত্য-কানন-ভ্রমী জনগণের চিত্তবিনোদন জন্য, কাব্য-রসে তাঁহাদের হৃদয়ের পরিতৃপ্তি জন্মাইবার জন্য, সৌন্দর্য্যে তাঁহাদের মন মাতাইবার জন্য, কাব্যকাননে যে প্রাকৃতিক শোভার সমাবেশ, যে অপূর্ব্ব মনোরম দৃশ্যের অবতারণ, যে অসীম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি, তাহাই কবিগণ কৃত কাব্য। কিন্তু পর্য্যটক মাত্রেরই দৃষ্টি সমান তীক্ষ্ণ নহে। কবিগণ যে সকল চিত্তবিমোহন দৃশ্যের সন্নিবেশ করিয়া রাখেন, সকলেই তাহার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারেন না। কেহ কেহ বাহ্য শোভা দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। অন্তঃসৌন্দর্য্যের অনুসন্ধানে তাঁহাদের প্রবৃত্তিও হয় না, তাঁহারা তাহার অনুসন্ধানওকরেন না। আবার কোন কোন দর্শক দৃষ্টিমাত্রেই সকল সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, পূর্ণ সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন। এক শ্রেণীর পাঠক কাব্যবিশেষের কেবল গল্প-রচনা, কেবল ঘটনা-পরম্পরার আশ্চর্য্য ঔপন্যাসিক আশ্লেষণ দেখিয়াই সন্তুষ্ট। কাব্যকার মনুষ্যপ্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, মনুষ্যমনের অতলতল পর্য্যন্ত ডুবিয়া কি গূঢ় তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা দেখিতে পান না। পক্ষান্তরে উচ্চ শ্রেণীর পাঠকবর্গ কাব্যে মানবহৃদয়ের লীলা খেলা এবং মনুষ্যমনের বিচিত্র অন্তঃপ্রবহনই প্রধান উপভোগের সামগ্রী বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা কাব্যপাঠ মাত্রেই এই প্রকারের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, সুতরাং কবিপ্রদত্ত উপহারের প্রকৃত সুখ তাঁহারাই অনুভব করিয়া থাকেন। হয় ত কবি প্রতীভাবলে যে সকল রত্নের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তিনি নিজেই সকল দেখিতে পান নাই। তীক্ষ্ণদৃষ্টি পাঠকদের মধ্যে অনেকে কবির অজ্ঞাত সেই সকল রত্ন খুঁজিয়া বাহির করেন। সৌন্দর্য্যবোধশক্তির তারতম্য অনুসারে পাঠকগণের শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে শ্রেণীসংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া উঠে। পাঠকসংখ্যা অনন্ত হইলে শ্রেণীসংখ্যাও অনন্ত বলা অন্যায় নহে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ পাঠকই কাব্যের প্রকৃত রসগ্রহণে অসমর্থ। সেই জন্য সাধারণ পাঠককে কাব্যের সৌন্দর্য্য দেখাইবার নিমিত্ত সমালোচকের আবশ্যক। সাধারণ পাঠক নিজ শক্তিবলে যে সুখ-সম্ভোগে অপারগ, সমালোচক তাঁহাকে দেখাইয়া দেন সেই সুখ কেমন করিয়া আস্বাদন করিতে হয়। এজন্য সমালোচকের নিকট সাধারণ পাঠক যত ঋণী তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সম্পন্ন পাঠক তত ঋণী নহেন, কারণ তাঁহার জনাই প্রধানতঃ সমালোচকের প্রয়োজন, তাঁহার জন্যই প্রধানতঃ সমালোচকের যত্ন ও পরিশ্রম। তীক্ষ্ণদৃষ্টি-

সম্পন্ন পাঠকের সমালোচকের নিকট কৃতজ্ঞ হইবার কিছুই নাই আমরা এরূপ বলি না। সৌন্দর্য্য দর্শনে যে সুখ, বর্ণনকুশল কোন ব্যক্তি যথাযথ বর্ণনদ্বারা সৌন্দর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ করিলে সেই সুখ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া তাঁহারও সমালোচককে ধন্যবাদ করা উচিত। সমালোচকের আর এক কার্য্য কাব্যের দোষ গুণ দেখাইয়া পাঠকবর্গের রুচি-পরিমার্জ্জন করা। অস্মদ্দেশে সাধারণ পাঠকবর্গকে সুরুচিসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অধুনা সমালোচকের বিশেষ প্রয়োজন। আজ কাল আমাদের দেশে বঙ্গভাষায় যে সমুদায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে তাহার বিশেষ আদর না করিয়া কুৎসিত নাটকাদিতে আশক্তি, অথবা 'বঙ্গভাষায় পড়িবার যোগ্য কিছু নাই, বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট কিছু হইতে পারে না' বলিয়া বঙ্গভাষার প্রতি ঔদাসীন্য—সুরুচির অভাবের কুফল। কবিবর বঙ্কিম বাবু প্রণীত গ্রন্থনিচয়সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। কেহ বা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলিকে সাধারণ গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন পিতামহীদের উপন্যাসে কিঞ্চিৎ অলঙ্কার সংযোগ করিয়া বঙ্কিম বাবু গ্রন্থকার হইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা বলেন তিনি তাঁহার গ্রন্থমধ্যে কেবল কতকগুলি রসিকতার সমাবেশ করিয়া রাখিয়াছেন; সেরূপ রসিকতা স্ত্রীমহলে প্রায় সর্ব্বদাই শুনা যাইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা প্রভৃতিকে ইংরেজি গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত কয়েক খানি তুচ্ছ পুস্তক বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা গল্প ব্যতীত কিছু বোঝেন না, রসিকতা ভিন্ন কোন গুণ গ্রহণ করিতে পারেন না, বাস্তবিকও দুর্গেশনন্দিনী তাঁহাদের নিকট রাজপুত্র ও রাজকন্যার গল্প মাত্র; কপালকুণ্ডলা—দরিদ্র ব্রাহ্মণের সহিত বনবাসিনীর দৈবাৎ মিলন ব্যতীত আর কিছুই নহে; মনোরমা তাঁহাদের চক্ষে পাগলিনী; সূর্য্যমুখী কেবল এক জন সতী স্ত্রী; কমলমণি রসিকা চপলা বালা মাত্র; প্রতাপকে তাঁহারা কেবল লাঠিয়ালের সর্দ্দার বলিয়া মনে করেন; বিষবৃক্ষে তাঁহারা বঙ্কিম বাবুর বিদ্যা দেখেন কেবল হরিদাসী বৈষ্ণবীতে এবং আলবোলা বর্ণনে। যাঁহারা ইংরেজীর অনুকরণ বলিয়া তুচ্ছ করেন, তাঁহারা যে সকল ইংরেজী গ্রন্থের অনুকরণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করেন সে সব গ্রন্থেরও গুণগ্রহণ যেরূপ করিতে পারেন এই সকল বাঙ্গালা কাব্যেরও গুণ সেই প্রকার গ্রহণ করিয়া থাকেন। হায়! কতদিনে আমরা প্রকৃত গুণের আদর করিতে শিখিব।

পূর্ণ* বাবু এক জন সুরুচি-সম্পন্ন সুদক্ষ সমালোচক। ঔপন্যাসিক কাব্যের প্রকৃত সৌন্দর্য্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। মধ্যে মধ্যে বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থের চরিত্র বিশেষের সমালোচনা করিয়া তিনি বঙ্গীয় পাঠক-মণ্ডলীর ও বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিতেছেন। তাঁহার

"কপাল-কুণ্ডলা" এবং "শৈবলিনী" পাঠ করিয়া আমরা নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। তাঁহার এই দুই উপহারের জন্য আমরা অন্তরে তাঁহাকে কতবার ধন্যবাদ দিয়াছি। তিনি দেখাইয়াছেন কপালকুণ্ডলা বৃদ্ধা পিতামহীদের উপন্যাসের নায়িকা নহে; তিনি দেখাইয়াছেন কপালকুণ্ডলা ধমানিক্যের সখিসোনা বা মদনকুমারের মধুমালা নহে; কপালকুণ্ডলা এক জন উচ্চ শ্রেণীর কবির মস্তিষ্কনিঃসৃত একটী আশ্চর্য্য স্ত্রীচরিত্র সৃষ্টি। কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের গৌরব কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের গূঢ় সৌন্দর্য্য পূর্ণ বাবু অনেক পরিমাণে দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি দুঃখিনী শৈবলিনীর প্রতি বড় অত্যাচার করিয়াছেন। শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার নির্দ্দয় ব্যবহারই আমার লেখনী ধারণের কারণ। শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার ব্যবহারে আমরা বাস্তবিক অন্তরে ব্যথিত হইয়াছি। লোকধর্ম্মানুরাগের প্রাবল্যে প্রতাপ প্রতাপময়-জীবিতা শৈবলিনীকে স্বামীগৃহ পরিত্যাগ জন্য ভৎসনা করিয়াছেন; শৈবলিনীকে গ্রহণ করেন নাই। পূর্ণ বাবু বোধ হয় কঠোরতর লোকধর্ম্মনীতির দাস তাই শৈবলিনীর প্রতি তিনি এত কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বলেন "পূর্ব্বেই শৈবলিনী সমাজের অতি পবিত্র নিয়ম ভঙ্গ করিয়া এরূপ কলুষিত ভাবে আমাদিগের কল্পনাকে অধিকার করিয়াছেন যে সে অপবিত্র সংস্কার কিছুতেই অপনীত হয় না। শৈবলিনীর চিত্রে আমরা একটী কুলটা রমণীর চিত্র এরূপ উজ্জ্বল বর্ণে দর্শন করি যে তাহার সাধুভাবের সংস্কার আমাদিগের মনে স্থত প্রতীত হয় না। শৈবলিনীর ন্যায় কোন রমণীর চিত্র আমাদিগের তরুণীগণের সমক্ষে ধরিতে আমরা সাহসী হই না। * * । শৈবলিনী যদি প্রতাপকে ভুলিতে পারিবেন না। তবে চন্দ্রশেখরকে বিবাহ করিলেন কেন? জুলিয়েট সুন্দরী প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন তবু দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা এরূপ বিবাহে সম্মত হন নাই। * * । যে চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী ব্যতীত সংসারের আর কেহই ছিল না, যে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন; যাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে কোন দোষ ছিল না, সেই চন্দ্রশেখরকে ত্যাগ করিয়া যেরূপ শৈবলিনী ফষ্টরের সহিত চলিয়া গেলেন, সেই ঘটনাটি আমাদিগের কল্পনাকে নিতান্ত চমকিত করিল।"

যে বৃত্তির প্রাবল্যে মুনি-হৃদয়ও বিচলিত হয় সেই বৃত্তির বশীভূত হওয়ায় অশিক্ষিতা যৌবনমদমত্তা সংসারজ্ঞানশূন্যা শৈবলিনীর একটু পদস্খলন হইয়াছিল বটে, কিন্তু * অন্যথা শৈবলিনী

---

* 'অন্যথা শৈবলিনী রমণীরত্ন' আমিও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই বলিয়াছি। শৈবলিনীর মানসিক দুর্ব্বলতা আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু তাহার অনুমোদন করিতে পারি না। শৈবলিনী কুলটা না

রমণীরত্ন, শৈবলিনী প্রেম পুতলী শৈবলিনী উচ্চ-হৃদয়া। তিনি যদি উচ্চ-হৃদয়া না হইবেন তবে ভাল বাসিতে না পারিয়া যে চন্দ্রশেখরকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তাঁহার গৃহ-পরিত্যাগে তাঁহার অভাবে অসুখী হইয়াছেন মনে করিয়া সেই চন্দ্রশেখরের জন্য দুঃখিত হইবেন কেন? চন্দ্রশেখর তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রাণের প্রাণ প্রতাপকে পাইলেন না জানিয়াও চন্দ্রশেখরকে উল্লেখ করিয়া বলিবেন কেন "আমি তাঁহার যোগ্য নহি বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাহাতে কি তাঁহার কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন? * * । তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয় সেই কথাটি আমাকে কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি কখনও ভাল বাসি নাই—কখন ভাল বাসিতে পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া থাকি তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল।" সচরাচর প্রণয়-পাত্রের সহিত সম্মিলনের অন্তরায়কে লোকে ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহার অমঙ্গল, তাহার মৃত্যু কামনা করে; সে সুখী হইল কি দুঃখী হইল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সে যে আত্মসুখের ব্যাঘাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এজন্য অন্তরে অন্তরে তাহাকে শত অভিসম্পাত করে †। কিন্তু শৈবলিনীর হৃদয় তাঁহার সুখান্তরায়কে তিনি নিজব্যবহারে দুঃখ দিয়াছেন ভাবিয়া ব্যথিত। এরূপ হৃদয়কে উচ্চ বলিব না ত কোন্ হৃদয়কে বলিব? শৈবলিনী না বুঝিয়া, প্রণয়-স্রোতে গা ঢালিয়া, একবার লোকধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তজ্জন্য তিনি যে জীবন্তে ভয়ানক নরক ভোগ করিয়াছেন তাহাই সে পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। এত কষ্টের পরেও কি তাঁহাকে আবার কুলটা বলিয়া ভৎর্সনা করিয়া নির্দ্দয়তার পরিচয় দিতে হইবে! শৈবলিনীর রমণী-সুলভ এই সামান্য দোষ যদি আমরা ক্ষমা করিতে না পারিলাম তবে মনুষ্য-হৃদয়ে ক্ষমা গুণ আছে বলিয়া আমরা অহঙ্কার করিতে পারি না। কেহ কেহ বলিবেন শৈবলিনী ত আর প্রকৃত মানবী নহেন যে তাঁহার দোষের যথোচিত দণ্ড হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে ক্ষমা করা হইল না বলিয়া এত আক্ষেপ এত বাক্যব্যয়। তিনি

হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে দুর্ব্বলহৃদয়া তরলমতি বালিকা তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। শৈবলিনী-হৃদয়ের কোমলতা ও ঔদার্য্য অনুভব করিতে আমি অক্ষম নহি। শৈবলিনীর প্রেমের উচ্চতা ও গভীরতাও আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। প্রতাপের ন্যায় চিত্তসংযম থাকিলে শৈবলিনী যে রমণীরত্ন হইতে পারিতেন তাহাও আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

* ' ' শ্রীপূ—

† তাহা হইলে শৈবলিনীকে পাপিষ্ঠা রাক্ষসী বলিতাম।

যদি প্রকৃত মানবী হইতেন, মনুষ্য মন অতি দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করা যাইত। তিনি কাব্যের একটি চিত্র মাত্র, তাঁহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার হইল বলিয়া এত মারমারি কেন? আমরা সেরূপ বলি না। কবি পাঠকের দয়ার উপযোগী করিয়া ক্ষমার উপযুক্ত করিয়া যে চিত্র অঙ্কিত করেন তাহা দেখিয়া যদি আমাদের দয়ার উদ্রেক না হয় তবে প্রকৃত দয়ার পাত্র দেখিলেও আমাদের দয়া হইবে না। যাঁহার হৃদয়ে দয়া আছে উপন্যাস হউক, প্রকৃত ঘটনা হউক, দুঃখের কথা হইলেই তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইবে, তাঁহার দয়া উথলিয়া উঠিবে। *

পূর্ণ বাবু বলেন "পূর্ব্বেই তিনি (শৈবলিনী) সমাজের অতি পবিত্র নিয়ম ভঙ্গ করিয়া এরূপ কলুষিত ভাবে আমাদের কল্পনাকে অধিকার করিয়াছেন যে সে অপবিত্র সংস্কার কিছুতেই অপনীত হয় না।" সুতরাং বুঝিতে হইবে তাঁহার প্রতি দয়া, তাঁহার দুঃখে দুঃখও কম হয়। আমরা পূর্ণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করি একথা কি সত্য? পূর্ণ বাবু স্বভাবতঃ কঠিন-হৃদয়ের লোক নহেন। কিন্তু তিনি আপনার হৃদয় আপনি বুঝিতে পারেন না। তিনি শৈবলিনীর প্রণয়ানুরাগ দেখিয়া প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর প্রণয়ের দোষ ভুলিয়া গিয়াছেন; যে অপবিত্র সংস্কার তাঁহার কল্পনাকে অধিকার করিয়াছিল তাহা অপনীত হইয়াছে। তিনি শৈবলিনীর দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন, তিনি শৈবলিনীর জন্য কাঁদিয়াছেন। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না পরিশেষে তিনি কি ভাবিয়া চক্ষের জল মুছিয়া হৃদয় কঠিন করিয়া বলিতে বসিয়াছেন—কৈ আমি কাঁদিলাম কোথায়? শৈবলিনীর ন্যায় পাপিষ্ঠার দুঃখে আমি দুঃখিত হইব কেন? শৈবলিনী কুলটা, সে পাপচিত্র, সে দয়ার পাত্রী নহে। আমরা বুঝিতে পারি না কেন তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া যাহার দুঃখে একবার দুঃখিত হইয়াছেন, যাহার জন্য একবার কাঁদিয়াছেন, তাহার মস্তকে আবার কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত। বোধ হয় শৈবলিনীর দুঃখে তাঁহার অন্তরে যে দুঃখাবেগ উপস্থিত হয় সে আবেগ প্রশমিত হইলে, ভিন্ন এক সময়ে তিনি তাঁহার সমালোচনার শেষভাগ লিখিয়াছিলেন, নতুবা হৃদয়ের এরূপ অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন আমাদিগের নিকট স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। যাহার দুঃখে অন্তর বিগলিত হয় তাহার যদি কোন দোষ দৃষ্ট হয় তবে সে

* ক্ষমার সহিত সমালোচকের সম্বন্ধ নাই। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থিনী। চন্দ্রশেখরও শৈবলিনীর প্রতি সেই ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আপনার অসাধারণ ঔদার্য্য দেখাইয়াছেন! সমালোচকও ঐরূপ অবস্থায় হয়ত সেই ক্ষমা দেখাইতেন, কিন্তু এরূপে তিনি যে কার্য্যে ব্রতী, তাহাতে শৈবলিনী-চরিত্রের 'শ্বেত' ও 'কৃষ্ণ' উভয়ই তাঁহাকে দেখাইতে হইবে। শ্রীপূ

দোষ যে কোন অনিবার্য্য-কারণ জনিত, সে দোষ যে ক্ষমার নিতান্ত উপযুক্ত তাহাই প্রমাণ করিবার ইচ্ছা মনুষ্যমনের অন্ততঃ দয়ালু-হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি। পূর্ণ বাবু যে শৈবলিনীকে অপরাধিনী মনে করেন না, তিনি যে শৈবলিনীর দুঃখে দুঃখিত তাহা আমরা তাঁহার নিজের কথাতেই দেখাইব। দলনীর সহিত শৈবলিনীর তুলনায় তিনি বলিয়াছেন শৈবলিনী "কলঙ্কিনী হইয়াও নিরপরাধিনী" * কলঙ্ক সত্বেও যাহাকে নিরপরাধিনী বলিয়া মনে করা যায় তাহার দোষ চক্ষে তত উজ্জ্বল দেখায় না; তাহার দোষের জন্য তাহাকে ভৎর্সনা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। শৈবলিনী যদি নিরপরাধিনী তবে তাহার প্রতি এত তিরস্কার কেন? শৈবলিনী-সমালোচনের একস্থলে আমরা দেখিতে পাইলাম "চন্দ্রশেখরের নিকট শৈবলিনী দায়ে কুমড়া কাটিতেন। এ কি তাঁহার দোষ, তাঁহার হৃদয়ের দোষ, মনের প্রকৃতির দোষ; না তাঁহাদিগের সেরূপ বিবাহের দোষ?" সমালোচকের লিখনভঙ্গিতে আমরা এই বুঝি যে তিনি শৈবলিনীর দোষ তাঁহার নিজদোষ বলিয়া গণ্য করেন না। হয় সেটি মানবপ্রকৃতির দোষ, না হয় তিনি যেরূপ কুৎসিত পরিণয়-প্রণালীতে পরিণয়াবদ্ধ হন সেই পরিণয়-প্রণালীর দোষ। সমালোচক বুঝিয়াছেন শৈবলিনীর অপরাধ নাই; থাকিলেও তাহা অত্যল্প এবং অপ্রতিরুধ্য-কারণ-ঘটিত, তাই সে দোষ তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে চেষ্টা করেন নাই। তাই তাঁহার চক্ষে তিনি "কলঙ্কিনী হইয়াও নিরপরাধিনী।" তিনি দেখিয়াছেন "যখন উদ্ধৃতা শৈবলিনী প্রতাপের সমক্ষে হৃদয় কপাট খুলিয়া দিলেন তখন শৈলিনীর হৃদয় অধিকতর সুন্দর বোধ হইল।" যখন তিনি শৈবলিনীকে "কলঙ্কে নিরপরাধিনী অনুতাপিনীরূপে" দেখিলেন তখন তাঁহার অপরিসীম সন্তোষ ও আনন্দ বোধ হইল। এইখানে পূর্ণ বাবু শৈবলিনীর হৃদয়-সৌন্দর্য্য অধিকতর হৃদয়ঙ্গম † করিলেন—ভাবিলেন "এইরূপ হৃদয় লইয়া স্যাফো ফেয়নের জন্য সিসিলী পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এই হৃদয়ে এন্‌জেলিনা এড্‌উইনের জন্য বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন।" "শৈবলিনী অন্য উপায়েও প্রতাপের নিকট আসিতে পারিতেন কিন্তু শৈবলিনীর প্রকৃতি এরূপ ছিল না, যে তিনি কোন গোপনীয় ষড়যন্ত্রে এ কার্য্য সিদ্ধ করেন। তিনি লুকাইয়া

* কলঙ্কিনী এই জন্য, যে তিনি চন্দ্রশেখরকে ত্যাগ করিয়া কুলত্যাগিনী হইয়াছিলেন, কিন্তু কুলত্যাগিনী হইয়াও ফষ্টরের নিকট এবং অপরাপর স্থলে সাহসভরে বরাবর সতীত্ব রক্ষা করাতে তাঁহাকে আমি নিরপরাধিনী বলিয়াছি। অন্য অর্থে নহে। শ্রী পূঃ—

† শৈবলিনী-চরিত্রের যাহা সৌন্দর্য্য তাহা আমি প্রসংশা করি, যাহা দোষ তাহা অবশ্য নিন্দা করি; ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। শ্রীপূঃ—

কার্য্য করিবার, কোন নীচবৃত্তি অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইবার লোক ছিলেন না।" ইহা দেখিয়া পূর্ণ বাবু শৈবলিনী-হৃদয়ের নীচভাব-রাহিত্য উপলব্ধি করিলেন। কৌমুদী-প্রদীপ্ত ভাগীরথী-বক্ষে প্রতাপ শৈবলিনীর কথোপকথন শুনিয়া তিনি ভাবিলেন "এত দিনে প্রতাপের মন বুঝি শৈবলিনীর দিকে বিনত হইয়াছে।" তিনি "এইরূপ প্রত্যাশায় শৈবলিনীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া প্রতাপকে প্রীতনয়নে" দেখিতেছিলেন। "এমত সময়ে সহসা প্রতাপের কঠোর শপথ-বাক্য শৈবলিনীর নিকট ব্যক্ত হইল। অমনি সহসা পূর্ব্বকার সমুদায় ভাব তিরোহিত হইল।" * শৈবলিনীর সহিত তাঁহারও মনে "সহসা কাল মেঘে বজ্র নিনাদ ধ্বনিত হইল।" তিনিও শৈবলিনীর সহিত কিয়ৎক্ষণ "স্তম্ভিত" হইলেন। ভাবিলেন "কি নিদারুণ বাক্য" প্রতাপের মুখ হইতে বহির্গত হইল। শৈবলিনীর জন্য তিনি কাঁদিলেন। শৈবলিনীর স্বামীগৃহ-পরিত্যাগদোষ তিনি এতদূর ভুলিয়া গেলেন যে আবেগ-পূর্ণ হৃদয় লইয়া তিনি প্রতাপ-কর্ত্তৃক পরস্ত্রী-গ্রহণের প্রত্যাশাকে মনে স্থান দেওয়া অন্যায় বোধ করিলেন না। প্রতাপ তাঁহাতে—যে প্রেমের পুতলি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে তাহার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া লোকধর্ম্মানুরাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন, পরলোকের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন, তাহা দেখিয়া দুঃখিত হওয়া কুলটার প্রতি অনুচিত দয়া বলিয়া একবারও তাঁহার মনে উদয় হইল না। অন্যত্র পূর্ণ বাবু বলিয়াছেন, "শৈবলিনীর স্বামী-গৃহ পরিত্যাগ-হেতু যে অপবিত্র কল্পনা অধিকৃত হয় তাহা কিছুতেই অপনীত হয় না।" "শৈবলিনীর চিত্তে একটী কুলটা রমণীর চিত্র এরূপ উজ্জ্বল বর্ণে দৃষ্ট হয় যে তাহার সাধুভাবের সংস্কার মনে তত প্রতীত হয় না।" "এ চিত্র সর্ব্বদা অপবিত্র সংস্কারে পাঠকের মনে উদয় হয়।" আমরা বুঝিতে পারি না, অপবিত্রা পাপিষ্ঠা বলিয়া প্রথম হইতেই যাহার প্রতি ঘৃণা † জন্মে; যাহার

* শৈবলিনী যখন এত দূর আসিয়াছেন, যে প্রতাপমিলন ভিন্ন তাঁহাকে অনন্যগতি বোধ হয়, তখন সকল সহৃদয় ব্যক্তিই ইচ্ছা করিবেন যেন প্রতাপের সহিত তাঁহার মিলন হইয়া যায়। বাস্তবিক যখন তিনি চন্দ্রশেখরকে ত্যাগ করিয়াছেন, তখন পাঠক মাত্রেই তাঁহার ভাগ্য ভাবিয়া চিন্তিত হইবেন। যখন কোন সুন্দরীকে শৈবলিনীর মত প্রতাপের জন্য নানা বিপদে বিপন্ন দেখায়, তখন তাঁহার প্রতি সহানুভূতি সহজেই উদিত হয়। চন্দ্রশেখর যে তাহাকে পুনঃগ্রহণ করিলেন তাহা শৈবলিনীর নিতান্ত সৌভাগ্য, ততদূর পাঠক আজিও প্রত্যাশা করেন না। সেই জন্য, প্রতাপের সহিত পুনর্ম্মিলন ঘটে ইহাই বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠে। শ্রীপূঃ—

† ঘৃণা, শৈবলিনীর প্রতি ঘৃণা আমার কিছুই নাই। কুলটা শব্দ প্রয়োগে যে ঘৃণা বুঝায় এমত আমি অনুমান করি নাই। শ্রীপূঃ—

কথা মনে হইলেই তাহার দুশ্চরিত্রের কথা মনে পড়ে তাহার সহিত সহানুভূতি জন্মে কি প্রকারে—তাহার প্রতি দয়া এবং তাহার জন্য দুঃখ হয় প্রকৃতির কোন্ নিয়ম অনুসারে। ঘৃণা এবং দয়া বা সহানুভূতি এ দুটি পরস্পর-বিরোধিনী বৃত্তি। যেখানে দয়া এবং সহানুভূতি সেখানে ঘৃণা থাকিতে পারে না। ঘৃণার পাত্রের প্রতি দয়া এবং তাহার সহিত সহানুভূতি প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সহানুভূতি দুই ব্যক্তিকে একত্রিত করে, ঘৃণায় একজনকে অন্যজন হইতে দূরে লইয়া যায়। সহানুভূতির পাত্রের প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয়, ঘৃণার পাত্রের বিরুদ্ধে হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়। দয়া যাহার প্রতি হয় তাহার কোন পাপ থাকিলে সেই পাপের প্রতি ঘৃণা হইতে পারে, কিন্তু সেই ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা হওয়া অসম্ভব।

জুলিয়েট সুন্দরী প্রাণান্তেও শরীরের বিবাহে সম্মত হন নাই। শৈবলিনী হইলেন কেন, ইহা পূর্ণ বাবু বুঝিতে পারেন না। আমরা বলি, জুলিয়েট সুন্দরী ইউরোপীয় সমাজের, ইউরোপীয় ব্যবহারের চিত্র; শৈবলিনী বাঙ্গালী সমাজ ও বাঙ্গালীর ব্যবহারের দৃশ্য;—ইহাই ইহার কারণ। শৈশবকাল হইতে ইউরোপীয় বালিকার শিক্ষা স্বাধীনভাবে প্রণয়-স্থাপন এবং প্রণয়-পাত্রের সহিত পরিণয়-সম্মিলন *। বাঙ্গালীর মেয়ে আশৈশব শিক্ষা করে পরিণয়-বিষয়ে পিতা মাতা বা অন্য গুরুজনের প্রতি নির্ভর করা। প্রণয়প্রকৃতির কার্য্য, সুতরাং বাঙ্গালীর মেয়েরও প্রণয় স্বভাবতঃ নিরপেক্ষভাবে জন্মিতে পারে, কিন্তু পরিণয়-বিষয়ে বাঙ্গালীর মেয়ে আত্মনির্ভর কদাচিৎ করিয়া থাকে। আবার রূপ-মোহোৎপন্ন প্রণয় হঠাৎ যত প্রচণ্ড ভাব ধারণ করে দীর্ঘকাল একত্র বাসজনিত এবং গুণানুরাগোৎপন্ন প্রণয় তাহা করে না। রোমিওর প্রতি জুলিয়েটের অনুরাগ রূপ-মোহ হইতে উৎপন্ন। প্রতাপও শৈবলিনীর প্রেমানুরাগের উৎপত্তির কারণ শৈশবে একত্র বাস। বিবাহান্তে প্রতাপকে দেখিয়া যখন শৈবলিনীর রূপোন্মত্ততা জন্মিল বাল্যসখ্য যখন রূপমোহজাত প্রণয়ে পরিণত হইল, তখনই আমরা তাঁহার হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় বেগ দেখিতে পাইলাম।

পূর্ণ বাবু মানব-প্রকৃতি বোঝেন না। আমরা এরূপ মনে করি না। তথাপি "যে চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী ব্যতীত সংসারে আর কেহই ছিল না, যে চন্দ্রশেখর

* জুলিয়েটের সময় ইউরোপীয় সমাজ যে এতদূর উন্নত ছিল তাহা আমি সন্দেহ করি। ইউরোপের এক্ষণকার সামাজিক ভাব যে জুলিয়েটের সময়ও বিদ্যমান ছিল তাহার প্রমাণ কি? কিন্তু সে কথা থাক। শৈবলিনীর মত রমণীরত্ন যখন প্রতাপের প্রণয়ে একেবারে নিমগ্ন ছিলেন তখন তাঁহার চন্দ্রশেখরকে বিবাহ না করাই শোভা পায়; সে বিবাহের হাত হইতে তিনি কোন না কোন উপায়ে মুক্ত হইতে পারিতেন। অন্ধ রজনী কি করিয়াছিলেন? যদিও তিনি অন্ধ ছিলেন, এবং পথ ঘাট কিছুই দেখিতে পাইতেন না।

শ্রীপূঃ—

শৈবলিনীকে প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন, যাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে কোন দোষ ছিল না, সেই চন্দ্রশেখরকে " শৈবলিনী ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় তিনি " চমকিত " * হইলেন কেন আমরা বুঝিতে পারি না। তিনি দুঃখিত হইতে পারেন। ইহাতে চমকিত হইবার কিছুই আমরা দেখি না। আমি একজনকে ভাল বাসলেই সে আমাকে ভাল বাসিবে—এই যদি প্রকৃতির নিয়ম হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর অনেক দুঃখ কমিয়া যাইত। বলিতে পারি না, বোধ হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক সুখও উঠিয়া যাইত †।

শৈবলিনী-চিত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য পূর্ণ বাবু নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কবি কি উদ্দেশ্যে এ চিত্র ওরূপ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন তিনি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। শৈবলিনী-চিত্রে বঙ্কিম বাবু সমাজকে শিক্ষা দিয়াছেন—সমাজের কুৎসিত বিবাহপদ্ধতি হইতে কিরূপ কুফল ফলিয়া থাকে। শৈবলিনী-চিত্রে তিনি দুর্নীতির দাস স্বার্থপরায়ণ পিতা মাতাকে দেখাইয়াছেন, যে প্রাণাধিকা কন্যাদিগকে প্রণয়ের বিরুদ্ধে পরিণয়াবদ্ধ করিলে তাহাদের কিরূপ হৃদয়বিদারক দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে। আমরা স্বীকার করি যে কলুষিত চিত্র পাপ-প্রবৃত্তির উত্তেজক, যাহার ধর্ম্মনৈতিক কোন ফল নাই অথচ যাহা অধর্ম্মের পথে লইয়া যাইতে পারে, কাব্য নাটকাদিতে সেরূপ চিত্রের অবতারণা না করাই ভাল। কিন্তু তাই বলিয়া মানব প্রকৃতির যথাযথ চিত্র না দেখাইয়া কাব্যোপন্যাসাদির পাত্র মাত্রকেই সৎগুণে বিভূষিত করা আমাদের নিকট যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। উপন্যাসাদির পাত্র পাত্রীগণকে স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীতি জন্মাইবার জন্য আমরা মনুষ্য-প্রকৃতিতে যেরূপ দেখিয়া থাকি বা সম্ভব বিবেচনা করি সেই রূপ করিয়া তাহাদিগকে চিত্র করিতে হয়। পৃথিবী দেখিয়া আমাদের যেরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহাতে সৎগুণের, সাধুভাবের নিরবচ্ছিন্নতায় আমাদিগের বিশ্বাস থাকে না। অসংখ্য মানব মধ্যে দুই এক জন সম্পূর্ণ সাধুহৃদয় অপাপবিদ্ধ হইতে পারেন এবং পাপস্পর্শ-শূন্য আজীবন সাধুতার দুই একটি চিত্রে আমাদের বিশ্বাসও হইতে পারে, কিন্তু উপন্যাস-সংসৃষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই অথবা উপন্যাস মাত্রেরই নায়ক নায়িকা সাধু কলঙ্ক-শূন্য পাপভাববিরহিত সমস্ত সৎগুণের আধার বলিয়া বর্ণিত হইলে সেই সকল চিত্র আমাদের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মুরের ইউটোপিয়া বা তদ্রূপ অন্য কোন কাল্পনিক সৃষ্টি পৃথিবীর প্রতিকৃতি রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। যাহা স্বাভাবিক ও সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস না জন্মে তৎপাঠে মনের তত সুখ নাই। তাহার অনুকরণে প্রবৃত্তি জন্মে না, সুতরাং তাহাতে সহস্র ধর্ম্মভাব সন্নিবিষ্ট থাকিলেও মনুষ্য মনে তাহাতে কোন ধর্ম্মনৈতিক ফল ফলে না। এই

† কেন ? আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

জন্য মানব প্রকৃতির যথাযথ চিত্রেরই আমরা অনুমোদন করি *। তবে যে চিত্রে মনকে পাপের দিকে আকৃষ্ট করে তাহা অবশ্য নিন্দনীয়। বিদ্যাসুন্দর এই দোষে দুষ্ট। পৃথিবীতে প্রায় এমন কোন পাপ নাই যাহার কোন না কোন রূপে শাস্তি না হয়, যাহা কোন না কোন ক্লেশের উৎপত্তি না করে, সুতরাং পাপ এবং পাপের শাস্তি উভয়ই যদি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয় অথবা পাপ-চিত্র যদি এরূপ ভাবে প্রদর্শিত হয় যে স্বভাবতই তাহার প্রতি ঘৃণা জন্মে তাহা হইলে কোন কলুষিত চিত্র পাঠে পাপ-কার্য্যে প্রবৃত্তি না হইয়া অপ্রবৃত্তিই হইয়া থাকে। যে চরিত্র অনুকরণীয় তাহাতে কোন কলঙ্ক থাকিলে সেই কলঙ্ককে কবি যদি পাঠকের সম্মুখে এরূপ ভাবে উপস্থাপিত করিতে পারেন যে পাঠক সেই কলঙ্ক সেই চরিত্রের গুণাংশের মধ্যে গণ্য না করেন, বরং সেই সচ্চরিত্রের সেই এক মাত্র অসম্পূর্ণতা মনে করিয়া সেই চরিত্রের অন্যান্যাংশ অনুকরণ করেন এবং দোষাংশ পরিহার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা জন্মে, তবে সেরূপ চিত্রকে অধিকতর প্রশংসা করিতে হয়। সাধুতা দেখাইয়া সাধু হইতে প্রবৃত্তি অনেকেই লওয়াইতে পারেন। যে পাপের প্রলোভন দুর্নিবার্য্য তাহাকে নিরতিশয় মোহন বেশ পরাইয়া পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিয়া পাঠকের মনে তাহার প্রতি প্রগাঢ় ঘৃণার উদ্রেক যিনি করিয়া দিতে পারেন, পাপীকে ভাল বাসাইয়া, পাপীর দুঃখে দুঃখ করিয়া পাপীর চরিত্রের পাপাংশের প্রতি যিনি অপরক্তি জন্মাইয়া দিতে পারেন তাঁহার ক্ষমতারই প্রশংসা সমধিক। বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থে আমরা যে সকল পাপ-চিত্র দেখিতে পাই তাহা এই শ্রেণীর—তাহা কুপ্রবৃত্তি-উত্তেজক নহে বরং সম্পূর্ণরূপে

* এ প্রকার চিত্রে বোধ হয় ততদূর ফল দর্শে না। এরূপ চিত্র প্রতিমূর্ত্তিঅঙ্কন সদৃশ। প্রতিমূর্ত্তিচিত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবময় চিত্রে কি অধিকতর ফল দর্শে না? বোধ হয় উৎকৃষ্ট ভাবময় চিত্র মানবহৃদয়কে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়া থাকে। এরূপ চিত্র একবার হৃদয়ঙ্গম হইলে তাহা শীঘ্র ভুলা যায় না। অন্যবিধ চিত্র তত অধিককাল স্থায়ী নহে। সাধুভাবের প্রতিই লোকের লক্ষ্য ফিরান উচিত; দোষভাগ সকলেরই আছে, তাহার উল্লেখ না করিলে যে মানবচিত্র স্বাভাবিক হয় না এমত নহে। আমি একজনের অনেক গুণ শুনিলাম; এবং সেই সকল গুণ শুনিয়া তাহার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি হইল। তাহার সহিত আলাপ পরিচয়ে আবার যখন তাহার কতগুলি দোষ দৃষ্ট হইল তখন আর তাহার প্রতি কি আমার পূর্ব্বভক্তি সমান থাকে, না কমিয়া যায়? যতদিন আমি গুরুর গুণ দেখি, ততদিন গুরুর প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকাতে আমি তাহারই মত হইতে চেষ্টা করি। অন্যথা সে গুরুর প্রতি কিছু হতশ্রদ্ধা হইবেই হইবে। ইহা মানবপ্রকৃতি—এই জন্য অনিবার্য্য শ্রীপূঃ—

কুপ্রবৃত্তি-নিবারক। অনুপমরূপলাবণ্যবতী পূর্ণযৌবনা কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রের আসক্তির চিত্র পাপপ্রলোভনে পরিপূর্ণ। কিন্তু কবি সে চিত্র এরূপ করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন যে নগেন্দ্রের চিত্তবেগ দমনে শৈথিল্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের রাগ হয়। যাহাকে ভাল বাসি, যে হৃদয়ের বন্ধু তাহার চরিত্রে অপ্রিয় কিছু দেখিলে যেরূপ রাগ হয় এ সেই রূপ রাগ। এ রাগের সহিত ঘৃণার লেশ মাত্রও থাকে না—এ রাগ ভাল বাসার রাগ। নগেন্দ্রকে ভাল বাসি, সূর্য্যমুখীকে ভাল বাসি, তাই যাহাতে তাঁহাদের সুখের ব্যাঘাত হইবে তাহা দেখিতে পারি না, দুইয়ের মধ্যে কাহাকেও তাহা করিতে দেখিলে তাহার প্রতি রাগ করি। যে কুন্দনন্দিনী তাঁহাদের সুখান্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কবির অসাধারণ শক্তি-গুণে তাঁহাকেও ভাল বাসিতে হয়। ইচ্ছা হয় কুন্দনন্দিনী একা দুঃখিনী না হইতেন; ইচ্ছা হয় স্ত্রীজাতির গৌরব স্বরূপ সূর্য্যমুখীর এরূপ দুরবস্থা না হইত; শতবার মনে হয় নগেন্দ্রের চরিত্র কলঙ্কশূন্য হইত। কাহাকেও ছাড়িতে পারি না, কাহাকেও দুঃখের অবস্থায় দেখিতে পারি না। সকলকেই সুখী দেখিতে ইচ্ছা করি। সকলকেই ভাল বাসি। সকলের জন্যই কাঁদি। অথচ ইহার মধ্যে যদি কাহারও কোন দোষ থাকে তবে সে দোষ তাহার না হইত ইহাই ইচ্ছা হয়। সে দোষ অনুকরণ করিতে ইচ্ছা হয় না। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র কলঙ্কিত পুরুষচরিত্রের চিত্র, চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী কলঙ্কিত স্ত্রীচরিত্রের দৃশ্য। উভয়েরই এক উদ্দেশ্য। একে বঙ্কিম বাবু পুরুষদিগকে বলিতেছেন, দেখিও ভাই নগেন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হইয়া যেন একমাত্র দোষে এত অনর্থ ঘটাইও না, যে প্রেমময়ী ভার্য্যা তোমা বই আর জানে না তাহাকে এত কষ্টে ফেলিয়া পরে আত্মগ্লানিতে জলিয়া মরিও না, কুন্দনন্দিনীর ন্যায় কোন দুঃখিনী অনাথিনীর প্রাণহন্তা হইও না। অন্যত্র তিনি রমণীকুলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, দেখিও ভগিনী রমণীরত্ন হইয়া যেন প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসিয়া, তোমার সাধুহৃদয় স্নেহপূর্ণ চন্দ্রশেখরকে ভুলিয়া এত আদরের রমণী নাম কলঙ্কিত না করো, প্রতাপের ন্যায় কোন সাধু ব্যক্তির জীবন নাশের কারণ হইয়া না বসো, জীবন্তে যেন নরক-যন্ত্রনায় পুড়িয়া মরিতে না হয়। দেখিও যেন নিজ কর্ম্মদোষে শেষে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে না হয় যে হায় আমি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি। হায় আমি আপনার সুখের মূলে আপনি কুঠারাঘাত করিলাম কেন? এ পূতিগন্ধময় হৃদয়দাহন নরকে আসিয়া পড়িলাম কেন? আমি যদি আগে বুঝিয়া কাজ করিতাম, চিত্তদমনের যদি চেষ্টা করিতাম তাহা হইলে আর এ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। সাবধান যেন শৈবলিনীর মত ঠেকিয়া শিখিতে না হয়—যে সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন অশেষ

অনর্থের মূল, অনন্ত দুঃখের উৎস। শৈবলিনীর চিত্র তরুণীগণের সমক্ষে ধরিতে পূর্ণ বাবুর সাহস হয় না। "পাছে তাঁহারা শৈবলিনীর দৃষ্টান্তে আপন আপন চন্দ্রশেখর ত্যাগ করিয়া এক এক জন প্রতাপের জন্য কষ্টরের সঙ্গে বাহির হইয়া যান।" আমরা এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ দেখিতে পাই না। আমাদেব বিশ্বাস শৈবলিনী পাঠে এরূপ ফলোৎপত্তি হইতে পারে না। শৈবলিনী অশেষ গুণের আধার হইয়াও লোকধর্ম্মানুরাগবিহীনতা জন্য যে ভীষণ নরক ভোগ করিয়াছেন তাহাতে লোকধর্ম্মানুরাগের প্রয়োজনিতাই শিক্ষা দেয়, সামাজিক পবিত্র নিয়ম ভঙ্গে প্রবৃত্তি জন্মায় না। বরং এরূপ নিয়ম ভঙ্গের ভয়ানক ফল উজ্জ্বলবর্ণে প্রদর্শন করে। শৈবলিনীকে এরূপ ভাবে চিত্রিত করিবার আর একটী প্রধান উদ্দেশ্যের কথা আমরা এখনও বলি নাই। সে উদ্দেশ্য প্রতাপ-চরিত্রের গৌরব বৃদ্ধি। কেবল রূপের আকর্ষণ হইতে তো অনেকেই মনকে ফিরাইয়া লইতে পারে। সামান্য ভাল বাসায় মুগ্ধ না হইয়া চরিত্র-পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে এরূপ লোকেরও সম্পূর্ণ অভাব নাই। প্রলোভন যেখানে অনিবার্য্য সেখান হইতে দূরে পলায়ন করিয়াও কেহ কেহ কলঙ্কস্পর্শ হইতে মুক্ত থাকিতে কৃতকার্য্য হয়। কিন্তু প্রতাপের চিত্তবলের পরিমাণ এ সকল অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক। শৈশবকাল হইতে প্রতাপ শৈবলিনীর সহিত প্রণয়ে আবদ্ধ। বেদগ্রামে শৈবলিনী আবার যৌবনজনিত পূর্ণবিকশিত রূপের আলোতে প্রতাপকে মোহিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপ দেখিলেন ভাল নয়। তিনি বেদগ্রাম হইতে পলায়ন করিলেন। পলায়ন করিলেন শৈবলিনীর জন্য, নিজের জন্য নহে। প্রতাপের ন্যায় হৃদয় শৈবলিনীর সর্ব্বক্ষণসান্নিধ্যেও অবিচলিত থাকিতে পারে ইহাই সে হৃদয়েব গৌরব, ইহাই সে হৃদয়ের মহত্ত্ব। পূর্ণ বাবু প্রতাপ-চিত্রের গৌরবের পরিমাণ করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার মতে নিজ হৃদয়ের জ্বালা নিবারণে প্রতাপের দূরগমনের উদ্দেশ্য। আমরা প্রতাপের হৃদয়কে এরূপ অল্প-বল মনে করিতে পারি না। প্রতাপ পলাইলেন বটে কিন্তু শৈবলিনী তাহাতেও তাঁহাকে ছাড়িলেন না। তিনি সুযোগ খুঁজিয়া প্রতাপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পরিশেষে প্রতাপকে তিনি পুনরায় দেখা দিলেন; প্রতাপের সমক্ষে হৃদয় খুলিয়া দিলেন। প্রতাপ দেখিলেন তাঁহার প্রতি শৈবলিনীর ভালবাসা সামান্য ভালবাসা নহে। শৈবলিনী তাঁহার জন্য উন্মাদিনী, শৈবলিনী তাঁহার জন্য গৃহত্যাগিনী. তাঁহার জন্য শৈবলিনী দিগ্‌বিদিক-জ্ঞান-শূন্যা হইয়াছেন, তাঁহার জন্য শৈবলিনী আপন ইষ্টানিষ্টের মানাপমানের প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই; তাঁহার জন্য শৈবলিনী মরিতে বসিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা অধিকতর মনমুগ্ধকর প্রলোভন আর কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা

অধিকতর দুর্নিবার্য্য আকর্ষণ আর এ পৃথিবীতে কি আছে? কিন্তু ইহাতেও প্রতাপের হৃদয় বিচলিত হইল না। তাই বলি প্রতাপ-হৃদয়ের মহত্ত্বের পরিমাণ করিয়া উঠা যায় না। প্রবলের মধ্যে প্রবলতম প্রলোভনেও তাঁহার চিত্ত টলিল না। আবার বলি ইহাই সে হৃদয়ের গৌরব, ইহাই সে হৃদয়ের মহত্ত্ব। এই মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া সুখস্পৃহাশূন্য পরহিত-ব্রতী সন্যাসী রমানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন "প্রতাপ! ব্রহ্মাণ্ড জয় তোমার এই ইন্দ্রিয় জয়ের তুল্য হইতে পারে না" এই মহত্ত্ব দেখাইবার জন্য শৈবলিনীকে গৃহের বাহির করা প্রয়োজন হইয়াছিল। কবির অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন মন এই আবশ্যক সহজেই বুঝিয়াছিল বলিয়া শৈবলিনীকে সমাজের পবিত্র নিয়ম ভঙ্গ করাইতে সঙ্কোচ করে নাই।

আবার প্রতাপ চিত্রে কবির চিত্রনৈপুণ্য দেখিয়া তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়াও মনের তৃপ্তি জন্মে না। প্রতাপ-চিত্রের রমণীয়তা সমধিক পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য কবি প্রতাপকে কোমলহৃদয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রতাপের হৃদয়ও প্রেমপূর্ণ ছিল।—প্রতাপও ভাল বাসিতে জানিতেন। আমরা যদি প্রতাপকে অন্তরে অন্তরে শৈবলিনীকে ভাল বাসিতে না দেখিতাম, আমরা যদি শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের ঐকান্তিক অনুরাগ না জানিতাম, আমরা তাঁহাকে হৃদয়শূন্য বলিয়া মনে করিতে পারিতাম তাহা হইলে তাঁহার মহত্ত্ব আমাদের চক্ষে তত উজ্জ্বল দেখাইত না। যে প্রেম কাহাকে বলে জানে না, যাহার হৃদয় প্রেমশূন্য, প্রেম প্রলোভনে মুগ্ধ না হওয়া তাহার পক্ষে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? তাহার আবার লোকধর্ম্মানুরাগের মূল্য কি? তাহার আবার চিত্ত-সংযমের প্রশংসা কি? কবি ইহা বুঝিয়াছিলেন তাই দেখাইয়াছেন শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের ভালবাসা কেমন তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছিল, কেমন তাঁহার প্রতি রক্তকণায় মিশিয়াছিল। প্রতাপ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু-শয্যায় শয়ান তখন তিনি রমানন্দ স্বামীর কথার প্রত্যুত্তরে কি বলিয়াছিলেন পাঠক দেখুন। আমরা প্রণয়ের এরূপ জীবন্ত চিত্র আর কোথাও দেখিয়াছি এরূপ স্মরণ হয় না। অপরাপর কথার পর রমানন্দ স্বামী প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি শৈবলিনীকে ভাল বাসিতে?" শবাকারে পরিণত তথাপি যেন নবজীবনে জীবিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন "কি বুঝিবে, তুমি সন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে আজি এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভাল বাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্খা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে।

কখন মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না—এই মৃত্যু কালে আপনি কথা তুলিলেন কেন? এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে—কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই এইজন্য মরিলাম।”

আমরা আর একটী কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করিব। মূল প্রস্তাবের সহিত কথাটির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। তথাপি চন্দ্রশেখর গ্রন্থের নায়িকা শৈবলিনীর চরিত্র-সমালোচনোপলক্ষে চন্দ্রশেখর গ্রন্থ সম্বন্ধে এই কথাটি পাঠকগণ নিতান্ত অসম্বদ্ধ মনে করিবেন না আমাদের এই ভরসা। আমরা বঙ্গদর্শনে চন্দ্রশেখর যে ভাবে প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছিলাম এই উপন্যাসের পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কণ কালে তাহার কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে দেখিলাম। প্রতাপ-শৈবলিনীর শৈশব প্রণয়ের কথা উপক্রমণিকাকারে গ্রন্থের প্রথমেই বলা হইয়াছে। আমরা এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। প্রতিভাশালী লোকের মস্তিষ্ক হইতে প্রথমবারে যাহা নিঃসৃত হয় তাহাই স্বাভাবিক এবং সুন্দর। পরকালিক পরিবর্ত্তনে তাহার সৌন্দর্য্যের লাঘবই সচরাচর ঘটিয়া থাকে। স্বভাবপ্রস্ফুটিত গোলাপ-কুসুমের পত্রসমূহের বিন্যাস যেরূপই হউক না কেন তাহাই দেখিতে সুন্দর। অস্ত্র দ্বারা ছাঁটিয়া পত্রসমূহের সামঞ্জস্য করিতে গেলে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের হানি করা হয় মাত্র। চন্দ্রশেখর গ্রন্থসম্বন্ধেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্য সখ্য উপন্যাস আরম্ভের অগ্রেই প্রকাশিত হওয়ায় কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নষ্ট করা হইয়াছে তাহা পূর্ণ বাবু কৃত শৈবলিনী-সমালোচনের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলিতে প্রদর্শিত হইবে।—“শৈবলিনী যখন চন্দ্রশেখরের বাটীতে ছিলেন, তখন বোধ হয় অনেক দিন সুন্দরীর সহিত একত্রে বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেন আমরা ইহার দৃশ্যমাত্রও চন্দ্রশেখরমধ্যে দেখিতে পাই নাই। সুন্দরীর নিকট শৈবলিনী কেমন অকস্মাৎ অজ্ঞাতভাবে আধ আধ হৃদয় খোলেন এবং তৎক্ষণাৎ চতুরতার সহিত তাহা কেমন আধ আধ ঢাকিয়া লয়েন, এই সুন্দর দৃশ্যটি বঙ্কিম বাবু গোপন রাখিয়াছেন। গোপন রাখিয়াছেন এই জন্য, পাছে পাঠক প্রতাপের প্রতি আজি পর্য্যন্তও শৈবলিনীর প্রগাঢ় অনুরাগের আভাস পান। আভাস পাইলে বুঝিতে পারেন কেন শৈবলিনী ফষ্টরের সহিত গৃহত্যাগিনী হইলেন। বুঝিতে পারিয়া, সুন্দরীর সহিত যখন শৈবলিনী গৃহে ফিরিলেন না, তখন শৈবলিনীর প্রতি যেরূপ রাগান্ধ হইয়াছিলেন, পাছে সেই রাগ সেই অসন্তোষের কিছু প্রশমণ হয়। এই জন্য গ্রন্থকার প্রথমে শৈবলিনীর হৃদয় পাঠকের নিকট প্রকাশিত করেন নাই। প্রকাশিত করেন নাই বলিয়া পাঠক যেরূপ কৌতুহল-পরতন্ত্র এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শৈবলিনীর ভাগ্য

দেখিতেছিলেন সেরূপ ভাব কখন উদ্রিক্ত হইত না। প্রকাশিত করেন নাই বলিয়া শৈবলিনীর প্রতি যেরূপ ক্রোধের উদয় হইয়াছিল সেই ক্রোধহেতুই যখন উদ্ধৃতা শৈবলিনী প্রতাপের সমক্ষে হৃদয়-কবাট খুলিয়া দিলেন তখন শৈবলিনীর হৃদয় অধিকতর সুন্দর বোধ হইল; যখন পাঠক শৈবলিনীকে কলঙ্কে নিরপরাধিনী অনুতাপিনীরূপে দেখিলেন তখন তাঁহার যত দূর আনন্দ ও সন্তোষ বোধ হইল, তত দূর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এইখানে শৈবলিনীর হৃদয়-সৌন্দর্য্য অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করিলাম। ভাবিলাম এইরূপ হৃদয় লইয়া স্যাফো ফেয়নের জন্য সিসিলি পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। ভাবিলাম এই হৃদয়ে এন্জেলিনা এডুউইনের জন্য বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন।" দুর্গেশনন্দিনীতেও বঙ্কিমবাবু একটী অবাঞ্ছনীয় পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি দিগ্‌গজের মাতায় অড়হরের ডাইলের হাঁড়ি বসাইয়া তাহাকে এতদূর বিকৃত করিয়াছেন যে আমরা আর পূর্ব্বের সেই দিগ্‌গজকে চিনিতে পারি না। আশমানীর যে ব্যাহারের স্থান অড়হরের ডাইলের হাঁড়িতে অধিকার করিয়াছে তাহা কিঞ্চিৎ অশ্লীল বটে, কিন্তু সে অশ্লীলতা দূষনীয় নহে; কারণ সেরূপ অশ্লীলতা কোনরূপ কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক নহে, কুপ্রবৃত্তিকে বরং দমনই করিয়া থাকে। আশমানী দিগ্‌গজের দৃশ্যটি কদর্য্যরুচির পরিপোষক নহে অথচ স্বাভাবিক। এই পরিবর্ত্তন বিষয়ে বোধ হয় সম্পূর্ণ দোষ বঙ্কিম বাবুর নহে। কতক নিষ্কর্ম্মা সৌন্দর্য্য-জ্ঞানশূন্য সংবাদপত্র সম্পাদকের যন্ত্রণাতেই বোধ হয় তাহার এরূপ প্রবৃত্তি হইয়াছিল আমরা জানিতাম বঙ্কিম বাবু সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগের কথা গ্রাহ্য করেন না। তাঁহার সেই মতের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হই নাই।—ভরসা করি উক্ত গ্রন্থদ্বয় পুনর্মুদ্রিত হইলে আমরা তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ব্বআকারে দেখিতে পাইব।

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী—

ভারত-উদ্ধার *।

বাগ্মীর সুদীর্ঘ বক্তৃতা অপেক্ষা সরস বিদ্রূপে যে অধিক ফল ফলে তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। কি রাজনীতি কি সমাজনীতি ইংলণ্ডে সকল বিষয়েই পঞ্চের(Punch)প্রভাব অমূলক্ষ্যনীয়। আমাদিগের দেশে সেরূপ বিদ্রূপাত্মক এক খানি পত্রিকা না থাকায় আমরা বিশেষ অসুবিধা অনুভব করি। বসন্তক ও হরবোলা ভাঁড় এই শ্রেণীর পত্রিকা ছিল বটে, কিন্তু তাহারা অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে। এক্ষণে

* অথবা চারি আনা মাত্র। (ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা) শ্রীরামদাস শর্ম্মা-বিরচিত। গুপ্তপ্রেসে মুদ্রিত।

বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গীয় সমাজ, ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে হৃদয়বেধকারিণী বিদ্রূপোক্তি দ্বারা কুপথ হইতে নিবৃত্ত ও স্থপথে প্রবৃত্ত করে এমন এক খানিও পত্রিকা নাই। সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য মান্য গণ্য,ধন্য গুণিগণাগ্রগণ্য অলৌকিক-প্রতিভাসম্পন্ন শ্রীলশ্রীযুক্ত রামদাস শর্ম্মা বাহাদুর বঙ্গরঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শর্ম্মা মহাশয়ের ভারত-উদ্ধার কাব্য পঞ্চের স্থানীয় নয় বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা যে কিয়ৎ পরিমাণে পঞ্চের অনুষ্ঠেয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কি উপায়ে ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া ভারতের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে আজ কাল ভারতের সর্ব্বত্র যুবকমণ্ডলীর ক্ষীণ মস্তিষ্ক এই চিন্তায় আলোড়িত। চতুর্দ্দিকে সভা সংস্থাপিত হইতেছে। বক্তৃতাতরঙ্গে ভারতরঙ্গ তরঙ্গায়িত হইতেছে। যেন ভারত শ্মশানে নবজীবন সঞ্চার হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া রাম শর্ম্মার উর্ব্বর মস্তিষ্ক স্থির থাকিতে পারিল না। তিনি সেই যুবক দলের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। এই প্রকাণ্ড মহাকাব্য সেই উপলক্ষেই প্রসূত হইল।

কিরূপে এবং কিরূপ লোক দ্বারা ভারতের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে রাম শর্ম্মা বিপিনকৃষ্ণ নামক একটী বঙ্গীয় যুবকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহা বিশদীকৃত করিয়াছেন। সেই চিত্রটী এত সুন্দর হইয়াছে যে নিম্নে প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বিপিনকৃষ্ণ কালেজের পড়াশুনা সমাপ্ত করিয়া এক কর্ম্মে নিযুক্ত হন কিন্তু সামান্য অপরাধে সেই কর্ম্ম হইতে তাড়িত হইয়া আফিসে আফিসে ভ্রমণ করিয়া কোন কর্ম্ম কাষ জুটাইতে পারিলেন না। অবশেষে এক দিন

"ধূলি-ধূসরিত জুতা, মলিন বদন
ফেকো উড়িতেছে মুখে সাধি' জনে জনে"

এই অবস্থায় ব্রাহ্মণীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট খাবার চাহিলেন। ব্রাহ্মণী তাহার উত্তরে বলিলেনঃ—

"ভস্ম খাও, দগ্ধানন! তোমার কপালে
পড়িয়া সকল সাধ পুরিয়াছে মোর?
আছে মাত্র ছেলে দুটো-সংসার বন্ধন—
নহিলে, কলস রজ্জু ক্লেশ অবসান
করি দিত কোন্ কালে। হে অক্ষম নাথ!
দুধের অভাবে বুঝি সে দুটোও মরে।"

ব্রাহ্মণীর বাক্য অসহ্য হওয়ায়, বিপিনকৃষ্ণ যেমন তাহার উত্তরে দুদশ কথা বলিলেন অমনি ব্রাহ্মণী—

"ধরিয়া বিরাট ঝাঁটা প্রহার করিল।"

তখন বিপিনকৃষ্ণ তথায় আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া নিজঘরে পলায়ন পূর্ব্বক অর্গল রুদ্ধ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সুরেশ্বরীর উপাসনা করিলেন। অমনি তিনি দিব্য চক্ষু পাইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান রূপে দেখিতে লাগিলেন।

আর এক দিন আষাঢ় মাসের সায়ংকালে বিপিনকৃষ্ণ ভারতবাসীদিগের দুরবস্থার

বিষয়ে ভাবিতে ভাবিতে এইরূপ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেনঃ—

———"———হায়! গত কত দিন
এই ভাবে; আর কত দিন বা সহিব
দারুণ যন্ত্রণা; বঙ্গ, কত কাল র'বে
বঙ্গবাসী-পেটে অন্ন যদি নাহি পড়ে?
আমি ত মরিব আগে, ক্রমে বংশলোপ
এই রূপে ক্রমে ক্রমে সব যদি যায়,
থাকিলেও বঙ্গ, তার নাম কে করিবে?
ভারত কি চিরদিন পরাধীন র'বে?
সুখের চাকুরী ছিল, তুচ্ছ অপরাধে
দশের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল,
পাপিষ্ঠ ইংরেজ। পদে পদে প্রবঞ্চনা
যার, সেই কি না মিথ্যা-বলা দোষ ধরি,
তোনাতা ছলে সর্ব্বনাশ সাধনিল!
ছাড়িয়া জননী-স্তন্য ধরিয়াছি পুঁথি,
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম,
যথাকালে উপজিল মাথার ব্যারাম।
এখন যে খেটে খাব সে গুড়েও বালি।
ভাবি নিরুপায়, আসি সাহিত্যের হাটে
বিবিধ কল্পনা-খেলা করিতে লাগিনু,
সাজাইনু নানা মতে দ্রব্য অপরূপ,
ঘুমন্ত ভারতে ডাকি লক্ষ সম্বোধনে
জাগাইতে গেনু—ওমা! সকলেই জেগে,
সকলেই ডাকিতেছে—ভারত! ভারত!
সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই—
ভারতে ভারত-কথা বিকায় না আর।
গিয়াছে ধর্ম্মের দিন, এবে গলাবাজি,
তা'ও যদি ঘরে খেয়ে করিবারে পার।
—উপায় কিছুই নাই! কুপোষ্য সুপোষ্য,
পতিপ্রাণা প্রণয়িনী, দুগ্ধপোষ্য শিশু,
এসব ফেলিয়া, দূর দেশান্তরে যাই,
তা'ও ত পারি না প্রাণ থাকিতে এদেহে।
ইংরেজে আপত্তি নাই, যদি জনে জনে
"লাট" পদে অভিষেকি আহার যোগায়
ভারতের ভাগ্যদোষে তাহা ঘটিবে না,
আমার দুঃখের নিশি বুঝি পোহা'বে না।
অসহ্য হ'তেছে ক্রমে, রাখিতে পারি না,
নিশ্চিন্ত ইংরেজে দিতে হ'ল রসাতলে।
রুষ ভাল, যদি খেতে পাই দুই বেলা;
যবন মাথার মণি, জঠরের জ্বালা
নিবারণ করে যদি; না হয় স্বাধীন
হউক ভারতবর্ষ লুটে পুটে খাব।
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে বঁটি করি করে
—হায় রে লজ্জার কথা, অন্য অস্ত্র নাই!—
—হায় রে দুঃখের কথা, অস্ত্র চালাইতে
শক্তি নাই, জ্ঞান নাই বঙ্গবাসী-দেহে।—
"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে।"

এই বলিতে বলিতে বিপিনকৃষ্ণ উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। "বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে" ইহাই অবশেষে তাঁহার ধুয়া হইয়া উঠিল। এই রূপে শুধু মুখে পাষণ্ড ইংরাজগণকে বঁটাইতেছেন এমন সময় বিপিনকৃষ্ণের পরমবন্ধু কামিনীকুমার পশ্চাৎ দেশ হইতে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্ত প্রদান করিলেন। বিপিনকৃষ্ণ তাঁহাকে পুলিস কর্ম্মচারী ভাবিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে চেষ্টা করিলেন। কামিনীকুমারও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চৎ ধাবিত হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ভূপাতিত করিলেনঃ—

তখন কামিনীকুমার বলিতে লাগিলেনঃ—

"কেন ভাই এত ভয় ?
তুমি ত সাহসী বড় বিখ্যাত জগতে,
বাঁধিলে লড়াই আজি দুশ্‌মনের সনে
তুমি অগ্রবর্ত্তী হ'বে ? দেশের কল্যাণে
মুণ্ড নিতে মুণ্ড দিতে ভয় নাহি পাও ;
তবে এ নগর মাঝে, জাগ্রত সকলে,
সিপাই সন্তরী হেথা ইঙ্গিত করিলে,
কেন হেন ভাব তব হৈল আচম্বিতে ?
পড়া শুনা করিয়াছি, ভূত নাহি মান,
কেন তবে, হে বিপিন, বাঙ্গালী ভরসা !
সাগর লঙ্ঘিতে পারি, গোষ্পদে ডুবিলে ?
তবে ত ভারত মাটী ইংরেজের (ই) জয়!"

চিরপরিচিত কামিনীকুমারের স্বর জানিতে পারিয়া বিপিনকৃষ্ণ উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন ভাই কামিনী ! আমার মস্তকের পীড়া হইয়াছিল বলিয়া ওরূপ করিয়াছিলাম। তুমি কিছু মনে করিও না। তাহার পর দুই বন্ধুতে ভারতের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিলেন এবং পরিশেষে সিদ্ধান্ত হইলঃ—

"বাক্যে শুধু কালক্ষয়, কার্য্যহানি তায়।"
অতএব
কহিলা বিপিন, "আর বিলম্ব না সহে ;
কল্যই সভায় সব করিব নিশ্চয়।
—ভারত উদ্ধার কিম্বা সভার বিলয়।"

তাহার পর দুই জন বন্ধু দুই দিকে নিজ নিজ গৃহে গিয়া ভাত খাইয়া
"ভারত উদ্ধার প্রান্তে" ভাবিয়া শুইলা।

পর দিন বেলা চারি ঘটিকার সময় বিপিনকৃষ্ণ কামিনীকুমার প্রভৃতি পঞ্চ জন সভ্য এক জীর্ণ সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। রামশর্ম্মার অলৌকিক কবিত্বশক্তি সভাগৃহের যেরূপ বর্ণন করিয়াছে তাহা অতি মনোরম।

যদি নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনার সহিত বর্ত্তমান ভারত সভাগৃহের কিয়ৎ পরিমাণ অবস্থাগত ঐক্য না থাকিত, তাহা হইলে আমরা তাঁহার কবিত্ব শক্তির অসাধারণ প্রভূত্ব স্বীকার করিতামঃ—

"আজীর্ণ দ্বিতল গৃহ ইষ্টক-রচিত,
লোণাধরা বালি-চুন-কাম স্থানে স্থানে
খসিয়া গিয়াছে, তাই ইট দেখা যায়,—
শোভিছে, সুরম্য ; রাজ-পথের উপরে,
আঁকা বাঁকা, উচু নীচু, কাষ্ঠ-দণ্ড-শ্রেণী-
আবৃত অলিন্দ তার ম্লানভাবে ঝুলি,'
নশ্বর জগৎ তাই প্রমাণিছে যেন।
অযুত জুতার ঘর্ষে সোপানের ইট
ক্ষয়িত কোথায়, আর স্খলিত কচিৎ।
উপরে সুন্দর ঘর, দীর্ঘ বিশ হাত,
প্রস্থে, অনুমানি, হ'বে হাত সাত আট ;
মাদুরিত মেজে, তার উপরে চেয়ার
সারি সারি সুসজ্জিত, পূর্ণ চতুষ্পদ,
ত্রিপদ দু চারি খান, মধ্যস্থ টেবিল
কালের করাল চিহ্ন দেখাই'ছে দেহে
জীর্ণ, শীর্ণ, ছিন্ন রজ্জু আশ্রয় করিয়া,
বিলম্বিত টানা-পাখা, চীর-আবরিত ;
পড়িত সে এত দিন, কেবল সন্দেহ
দড়ি আগে ছিঁড়ে কিম্বা কড়ি আগে পড়ে।"

এই রূপ সভাগৃহে সভ্যগণ উপবিষ্ট হইলে রীতিমত সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। গতোপবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে বিপিনকৃষ্ণ সমবেত সভ্যগণের

অনুমতি লইয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা আ-
রম্ভ করিলেন। বক্তৃতাটী এইঃ—

" ভদ্রগণ, বন্ধুগণ, স্বদেশীয়গণ
যুষ্মদীয় অনুমতি সহকারে আমি
বাঞ্ছি প্রস্তাবিতে এক গভীর প্রস্তাব;
জীবন মরণ সম যে প্রস্তাব গুরু;
যে প্রস্তাবে নির্ভরি'ছে সবার কল্যাণ;
দেহ প্রাণ নিজ হ'বে, র'বে বা পরের
চির অন্ন, যে প্রস্তাবে খলু মীমাংসিবে,
ভারত আপন ভার, পারে কি না পারে
লইতে আপন স্কন্ধে, সিদ্ধ যে প্রস্তাবে,
যে প্রস্তাবে, সংক্ষেপতঃ নির্ভরে সকল—
আমাদের, বাঙ্গালার ভারতের ভাবী।
* * * * কিন্তু দুঃখের বিষয়,
নহি বাক্যপটু আমি, নাহিক বাগ্মিতা,
নাহি শব্দে অধিকার প্রকাশিতে ভাব,
উদিত অন্তরে যত; * *
* * * * * *
ইংরেজের অত্যাচার নহে অবিদিত
কাহার এ সভাক্ষেত্রে; বিস্তার বিফল,
তথাপি, মরম দুঃখ চরম যাহাতে,
গন্তব্য উল্লেখ তার না করিয়া আজি
পারি না গ্রহিতে পুনঃ আসন আমার;
বিশাল ভারত-ক্ষেত্র, মাসাবধি যা'র
নিরন্ত হাঁটিলে প্রান্ত দেখা নাহি যায়,
লৌহের শৃঙ্খলে তার অষ্ট অঙ্গ বাঁধি,
চালাই'ছে তদুপরি আগ্নের শকট,
সংবাদের পথ হেন সঙ্কীর্ণ করেছে।
কি আর লাঘব বল, কোন অপমান
এর চেয়ে তীব্রতর মানবের হৃদে
রক্ত থাকে যে যদি, শোণিত তাহাতে
জমিয়া না থাকে যদি দধির মতন
—শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর যাহা দুগ্ধের বিকার!
এ নিগড় খুলিবে না, দুলিতে দেহের
দুই পার্শ্বে দুই ভুজ? * *
নিজ নিজ বাহু কাটি, সাগরের জলে
ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও, ঘৃণা যদি থাকে,
নিয়োজিত বাহু যদি নাহি উন্মোচিতে
যেই শেল হানিয়াছে বাঙ্গালার বুকে,
চড়ায়েছে যেই শূলে প্রাচীন ভারতে।
—অসাধ্য বোঁচায় আর না নিন্দিবে কেহ।
হায় ঘৃণা! হায় লজ্জা! হাধিক্! হাধিক্!
হা কষ্ট! হা দুরদৃষ্ট! ভাগ্য ভারতের!
চী[illegible]রিছে দিবানিশি কবি, নাট্যকার,
ব[illegible] না ভাঙ্গিল ঘুম, অকালকুষ্মাণ্ড
কুম্ভকর্ণ বাঙ্গালীর, ভারতের ওরে!
বিলম্ব না সহে আর * * * *
বঙ্গের সুপুত্র যত পত্র-সম্পাদক,
কবিপুঙ্গব নাট্যকার, যে দিন লেখনী
ধরিয়াছে, সেই দিন হইতে তটস্থ
কম্পমান-কলেবর ইংরেজের কুল।
ভাব ত ধরিলে অস্ত্র এ হেন বাঙ্গালী,
কি হইবে কাপুরুষ ইংরেজের গতি!—"

বিপিনকৃষ্ণের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সুরেশ নামক একজন সভ্য ভারতবর্ষীয়দিগের বলহীনতা ও ঐক্যহীনতানিবন্ধন ইংরাজ-দিগের ভারতে অবস্থিতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এই প্রস্তাব করিলে সভাস্থ সকলেই সুরেশের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। একজন সভ্যসত্যই তাঁহাকে মারিতে যাইতেছিলেন এমন সময় সুরেশ বলিয়া উঠিলেন—"এস না? কেমন—" অমনি সভাস্থ

সকলেই নিস্তব্ধ হইলেন। ইহার পর বিপিনকৃষ্ণ আবার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন ঃ—

" শেষ বক্তা বকিলেন বহু অপ্রলাপ ?
উত্তর তাহার কিন্তু চাহি না দানিতে
উপস্থিত ক্ষেত্রে। তবে যাইতে যাইতে
দুই চারি কথা তা'র সম্বন্ধে বলিব।
শরীরের বলে নাহি দেখি প্রয়োজন,
বুদ্ধিবল থাকে যদি ; কৌশলে কামান
ভোঁতাইতে পারা যায়, গোলার অনল
কৌশলে বরফ তুল্য শীতলি যায়।
সংখ্যায় পদার্থ কিছু নাহি থাকে কভু,
পঞ্চজন আছি, শূন্যে হইব পঞ্চাশ,
পাঁচ শত, সহস্র বা শূন্যেতে সকল।
মূলেতে প্রধান রাশি একমাত্র যদি
থাকে, তবে শূন্য দিয়া লক্ষ করা যায়।
বৃথা শঙ্কা, শেষ বক্তা, না বুঝিনু কেন
করিলেন ; যাহা হোক সত্বর যাহাতে
পরাস্তি' ইংরেজে রণে, বিনা রক্তপাতে
আমাদের পক্ষে, হয় ভারত-উদ্ধার
উপায় তাহার অদ্য হৌক বিবেচিত।"

কামিনীকুমার এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেনঃ—

" * * * পরাজয় যদি
স্বদেশ উদ্ধার হেতু, নাহি লাজ তায়।
ফাঁসি দিতে চাহে যদি বিজয়ী ইংরেজ,
লইব না গলে ফাঁসি ; কি ভয় হে তবে?—
করাইতে পারে বলে মুখের ব্যাদান,
কিন্তু গিলাইতে বস্তু নাহি পারে কেহ।
উচ্চ ডাকি, নিদ্রাগত ভারত সন্তানে
জাগাও হে বঙ্গবাসী, জাগুক সকলে,
উঠ সবে মুখ ধোও, পর নিজ বেশ
ভারত উদ্ধারে মন করহ নিবেশ।"

তাহার পর কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এবং কোন্ কোন্ সভ্যকে কোন্ কোন্ কার্য্যভার দিলে ভারতের উদ্ধার সাধন হইবে, সভাস্থলে তাহা আলোচিত ও স্থিরীকৃত হইলে সভা ভঙ্গ হইল।

চতুর্থ সর্গের শেষভাগে ও পঞ্চমসর্গে কি কি উপায়ে সভ্যেরা ভারতের উদ্ধার আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। তাহা কল্পনায় এত সুন্দর হইয়াছে যে সে সমস্তই আমরা নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশা করি স্বদেশহিতৈষীগণ আমাদিগের এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

" না পড়িতে তোপ,
না ডাকিতে আস্তাবলে কুক্কুট কুক্কুটী,
ভারত-ভরসা যত বাঙ্গালীর চূড়া,
সভার মন্ত্রণা স্মরি', নিদ্রা পরিহরি',
কোঁচান কাপড় কেহ করি' পরিধান,
পরিয়া পিরাণ গায়' কোঁচান উড়ুনী
বুকের উপরে বাঁধি' ফুল উচু করি,
ইজের চাপ্‌কান কেহ কার্পেটের টুপি,
যাহার যেমন ইচ্ছা সাজিয়া উল্লাসে
ভারত-উদ্ধার-ব্রতে উৎসুজিল তনু,
বাহিরিল গৃহ হৈতে। আর রে সে সাজে
কন্দর্প ভুলিয়া যায়, অন্য কোন ছার!
ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দেশে চলিল সকলে।
সুন্দর বনেতে গেল তিন মহাবীর,
রমণী, মোহিনী আর কিশোরী মোহন।
কাটাইল বহুতর সুন্দরীর গাছ

সেই মহাবনস্থলে, উজাড়িল বন,
ক্রমেতে চালান দিল এ মহানগরে।
সেনানী উমেশ আর অপ্রকাশচন্দ্র
পাণ্ডুয়ার বনে গেল বাঁশ কাটাইতে।
দিনাজপুরের অস্ত্র ছাড়াইয়া তা'রা
রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, ইতি আদি
কত দেশে কত বাঁশ করিয়া সংগ্রহ,
মহানগরীতে শেষে আসিল ফিরিয়া
বহুদিন পরে। হেথা উত্তর-পশ্চিমে
ছাতু আর লঙ্কা যত যেখানেতে মেলে
সমস্ত হইল ক্রীত। লঙ্কা কলিকাতা,
ছাতু সব পেশাওর মুখেতে চলিল।
আপনি বিপিনকৃষ্ণ ছাতুর সহিত।
বস্তা বস্তা ছাতু যায় কে করে গণন,
ভারতের প্রান্তে ক্রমে সব উপনীত।
সীমান্তে ইংরেজ যত, করিয়া সন্দেহ
বিপিনে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা, কি আছে বস্তায়,
কোথা হইতে আইল, যাইবে বা কোথা?
বিপিন বলিল, "ছাতু খাইবার বস্তু,
বাণিজ্য উদ্দেশে যা'বে আফগান দেশে"।
ইংরেজ না ভুলি তায় বলিল বিপিনে
পরীক্ষিতে হ'বে ইহা নতুবা ছাড়িয়া
দিবে না একটী বস্তা। তথাস্তু বলিয়া,
নিয়ম করিয়া পরে একমাস কাল,
বিপিন চলিয়া গেল আফগানস্থানে।
সীমান্ত-রক্ষক ছিল মিষ্টর ডনশ,
সকল বস্তার ছাতু দেখিল খুলিয়া
এক এক করি, তা'র তথাপি সংশয়
না মিটিল। রাসায়ন-পরীক্ষার তরে
প্রধান নগরে যত প্রধান বিজ্ঞানী,
তা'দের সমীপে দিল নমুনা প্রেরিয়া।
বহু পরীক্ষার পরে ডনশ সমীপে
সিদ্ধান্ত উত্তর গেল—দহ্যমান নহে।
বিপিন ইত্যবসরে আমীরের সহ
স্থাপিল সাহায্য-সন্ধি, রক্ষণ পীড়ন।
নিয়ম হইল এই—আমীরের রাজ্যে
বিপিন পাইবে পথ বাঙ্গালীর তরে
অবারিত, হৈলে পরে ভারত-উদ্ধার
ভারতের অর্দ্ধ অংশ আমীর পাইবে।
ঠিক এই মর্ম্মে সন্ধি পারস্যের সহ
বিপিন করিয়া শেষে, ভারত-সীমায়,
ছাতু লইবারে ফিরে আইল, লইল।
আরবের মরুভূমি উত্তরিয়া পরে,
সুএজ-খালের ধারে অযুত গুদাম
ভাড়া করি', ছাতুদিয়া বোঝাই করিল।
স্বদেশে বিপিনকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিল।
হেথা কলিকাতা ধামে মহাহুলস্থুল,
ইংরেজ অসন্ধিহান কিন্তু বরাবর।
ব্যাপৃত কামার যত বঁটি নিরমাণে,
সুন্দরীর কাষ্ঠে বাঁট গড়িছে ছুতোর,
বাঁশ সব কাটিয়া গড়িছে পিচকারী।
চিত-পুর-খাল-ধারে কুম্ভকার দল
মাটী তুলিবার ছলে, সুড়ঙ্গ কাটিয়া
চলিল গড়ের মুখে। গড়ের তলায়,
সেই সুড়ঙ্গ অন্তরে লঙ্কা স্তূপাকৃতি
বোঝিত হইল, চুপি চুপি নিশি যোগে।
কেহ না জানিল বার্ত্তা, না সুধায় কেহ।
বাজারে পটকা যত মিলিল কিনিতে,
সব কিনি', সলতে তার ছিঁড়িয়া লইয়া,
পটকা লঙ্কার স্তূপে মিশাইয়া দিয়া,
রক্ষিত সলতের হুচ্ছ সুড়ঙ্গের মুখে।

দিবা নাই, রাত্রি নাই, এ ভাবে উদ্যোগ.
শেষ হইল একদিন কার্ত্তিক মাসেতে।
ইতি ভারতোদ্ধারকাব্যে উদ্যোগো নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ।

বাঙ্গালায় বিভাবরী হইল প্রভাত।
আজি যেন নবোৎসাহে জাগিল বাঙ্গালা,
সমীর বহিল যেন সুনবীন ভাবে,
ভাবি-আনন্দের ভাবে হইয়া বিভোর,
প্রকৃতি পুলক-অশ্রু, শিশিরের ছলে,
সমধিক পরিমাণে ফেলিলেন যেন।
কামিনী, বিপিনকৃষ্ণ, বসন্ত, রমণী,
আর যত বঙ্গবীর, গত রজনীতে—
উৎসাহ আশঙ্কা, আশা নৈরাশ্য পর্য্যায়ে
পীড়িয়াছে তাহাদের হৃদয় যেমন,—
উঠিয়াছে চমকিয়া রহিয়া রহিয়া,
নাহি ভুঞ্জিয়াছে, তা'রা নিদ্রার বিলাস।
"সুস্বপ্ন, সুস্বপ্ন" বলি' প্রণয়িনী কুল
ধরিয়াছে তাহাদের বুক চাপি' চাপি'।
দুরু দুরু করে হিয়া প্রভাত যখন,
বিপিন বিশুষ্কমুখ উঠিলা বসিয়া
প্রণয়িনী-পদপ্রান্তে; ধরিয়া চরণ
"আজি রে সুন্দরি, দেখা জনমের মত
হয় বুঝি; আর বুঝি ও মুখ-কমল
হাসিবে না এ অভাগা মুখ পানে চাহি';
জনমের মত বুঝি হাসি ফুরাইবে;
একমাত্র আমি জানি তুষিতে তোমায়,
কে আর করিবে প্রীতি, সোহাগ, যতন,
আমি যদি যাই, প্রিয়ে, প্রাণের পুতলী?"
কান্দিলা বিপিনকৃষ্ণ ঝর ঝর ঝরে।
"সে কি কথা প্রাণনাথ? একি কুলক্ষণ"
উঠিয়া বসিল সতী, পতি-কর ধরি,'
"কোথায় যাইবে তুমি? কেন হেন ভাব?
নিবাব নয়ন-বারি, রোদন তোমার
কভু নাহি শোভা পায়; কি দুঃখে বা কান্দ?
নাহিক চাকুরী, তাই যা'বে কি বিদেশে
করিতে অন্নের চেষ্টা, করিয়াছ মনে?
কাজ কি তোমার গিয়া, এত ক্লেশ যদি
পাও তুমি মনে, নাথ! কাটনা কাটিয়া
খাওয়াইব ঘরে বসি', ভাবনা কি তার?
অবশ্যই কোনমতে দিন কেটে যাবে।"
"তা' নয় প্রেয়সী" বলে ঈষৎ হাসিয়া
বিপিন, আরুদ্ধ-কণ্ঠ চিত্তের আবেগে.
—সে হাসি কান্নার সনে মিশিয়া সুন্দর,
রৌদ্র বৃষ্টি এক সঙ্গে হায় রে যেমতি
নববর্ষা-সমাগমে—"তা' নয় প্রেয়সি.
স্বদেশ-উদ্ধার-কল্পে বাহিরিব আজি,
করিব বিচিত্র রণ ইংরেজের সনে,
শেষে পরাজিব তারে, সফল জনম
করিব, ভারতে দিয়া স্বাধীনতা ধন,
বহুদিন অপহৃত হইয়াছে যাহা।"
"রক্ষা কর নাথ, যুদ্ধে যাওয়া হইবে না,
কোথায় বাজিবে অঙ্গে"—চমকে বিপিন,
শিহরে সর্ব্বাঙ্গ তা'র কাঁটা দিয়া উঠে—
"দেখ দেখি যার নাম করিতে স্মরণ
অস্থির হ'তেছে হেন, সহিবে কেমনে?
কে দিল কুবুদ্ধি ঘটে? তার মাথা খাই,
দেখা যদি পাই এবে। বলি প্রাণনাথ,
দেশ ত দেশেই আছে, কি আর উদ্ধার?
এতই অমূল্য ধন স্বাধীনতা যদি,
নিতান্তই দিবে যদি সে ধন কাহারে,

আমারেই লও নাথ, ল'ব শিরঃ পাতি ;
আমি তব চির দাসী।" ভয় নাই সতি,
স্বদেশ-বাৎসল্য. স্বাধীনতা মহাধন,
বুঝিবে না মর্ম্ম তুমি,—দর্শন বিজ্ঞান
পড়া শুনা না থাকিলে বুঝা নাহি যায়।
তোমারে দিবার বস্তু নহে তা' কদাপি।
কৌশলের যুদ্ধে দেহে কভু না বাজিবে ;
নিশ্চিন্ত যাইব রণে, উদ্যম ভাঙ্গিয়া
হতাশ্বাস, হতবল করিও না মোরে।"
"ভয় যদি নাই তবে চক্ষে জল কেন ?"
"প্রিয়া-মুখ না হেরিলে যাত্রা নাহি হয়,
যাত্রা-কালে নেত্র-জল বাঙ্গালী-কল্যাণ,
উদ্দেশ করিয়া যদি কোন (ও) কাজে যাই
গৃহ ছাড়ি দুই পদ, কান্দিবারে হয়।"
"নিতান্তই যা'বে যদি হৃদয়বল্লভ,
নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবে যদি,"
(ফুকারি' কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
"আলু-ভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া,
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।"—বিপিন সম্মত।
এই ভাব সে প্রভাতে প্রতি ঘরে ঘরে।
তাড়াতাড়ি স্নান করি' বঙ্গবীরবৃন্দ
নাকে মুখে গুঁজিলেন ভাতে ভাতে ছুটো
কাঁপিতে কাঁপিতে, হায় আশ্বিনে যেমতি
শারদীয় মহোৎসবে, অষ্টমী তিথিতে,
পূজার প্রাঙ্গণে পাঁঠা বদ্ধ যূপকাষ্ঠে
বিল্বপত্র চর্ব্বে, যবে ছেদক আসিতে
বিলম্ব করয়ে কিছু ; অথবা যেমন
মার্গশীর্ষে পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে।
যাত্রা করি' একে একে বীরশ্রেষ্ঠ যত
সভাগৃহে উপনীত হইলা সকলে।
আইল তারিত বার্ত্তা—"কেল্লা হইয়াছে'—
বুঝিলা সে বীর-বৃন্দ নিরূপিত দিনে
পূর্ব্বের সঙ্কেত মত, সুএজে যে ছাতু
বিপিন আসিয়াছিল সঞ্চিত করিয়া,
তথাকার কর্ম্মচারী গাঢ় নিশিযোগে
সে সব নিক্ষেপিয়াছে, সুএজের খালে,
শুষিয়াছে যত জল, খাল বন্ধ এবে।
আনন্দে বিষম রোলে দৈল করতালি,
"জয় ভারতের জয়' শব্দ সভাতলে ;—
ইংরেজের ভবিষ্যৎ পথ রুদ্ধ এবে।
চলিলা সে যোদ্ধৃদল মহাতেজে ভরি'।
উড়িতেছে দূর শূন্যে বংশ দণ্ডোপরি,
রঞ্জিত বাসন্তি রঙ্গে, মদন মূরতি-
সুলাঞ্ছিত, ভারতের নাম আঁকা তাহে,
পতাকার শ্রেণী, আহা পত পত স্বনে,
সঞ্চারি' অরাতি-হৃদে কালান্তের ভয়।
বাজিতেছে রণ বাদ্য তবলার চাটি,
(কটিতে আবদ্ধ যাহা) মৃদঙ্গ,মন্দিরা,
সেতার, ফুলুট, বীণ, ঘুঙ্গুরের সনে
সুমধুর ভীমরবে, রৌরব চৌদিকে।
প্রত্যেক যোদ্ধার করে ভীম পিচকারী,
কাহার বা বঁটি হাতে,—চলে বীরদাপে,
কাঁপাইয়া শত্রুহিয়া, কাঁপাইয়া মহী।
মুখে জয় জয় শব্দ, আকুলিত দেশ,
বিপিন, কামিনী চলে পশ্চাতে পশ্চাতে
সকলে উৎসাহপূর্ণ, হায় রে যেমতি
উর্দ্ধপুচ্ছ গাভিদল গোষ্ঠের সময়ে।
গড়ের সম্মুখে গিয়া বীরবৃন্দ এবে
দাঁড়াইলা ব্যূহ রচি', অপূর্ব্ব সে ব্যূহ,
চক্রাকৃতি চতুষ্কোণ, অর্দ্ধচন্দ্র প্রায়,
অদ্ভুত শ্রবণাকৃতি শ্রবণ অন্তরে,
করাল কাতার দিয়া দাঁড়াইলা সবে

পটকা এক এক হাতে। বিপিন আদেশে,
প্রসারি' দক্ষিণ বাহু যথাসাধ্য যা'র,
সবলে নয়ন মুদি, মুখ ফিরাইয়া
পটকা ছুড়িল ভীম বজ্রনাদ করি'।
কলসে পটকা পূরি, সংযোজি অনল
নিক্ষেপিল মহাবেগে গড় অভিমুখে।
ভাবিয়া তামাসা কিছু হই'ছে বাহিরে,
ইংরেজ-সৈনিকদল, যত ছিল গড়ে
দৌড়াদৌড়ি বাহিরিল রঙ্গ দেখিবারে,
—হায় রে না জানে তা'রা অদৃষ্টের বশে,
কালের করাল রঙ্গ হইতেছে এবে।
সিকতা-মিশ্রিত জলে পূরি' পিচকারি
হানিল বাঙ্গালী-সৈন্য ইংরেজের আঁখি
লক্ষ্য করি', কচকচি কচালি নয়ন
বিষম বিভ্রাট তবে জানিল ইংরেজ।
"জয় ভারতের জয়"—ঘোর জয়ধ্বনি
ছাইল বিমানমার্গ, হুড়াহুড়ি করি'
পলায় গড়ের মধ্যে ইংরেজের দল।
পুনশ্চ ইংরেজ সৈন্য বাহিরিল বেগে,
সসজ্জ সশস্ত্র এবে; বন্দুক, শঙ্গিন্‌
ঝক ঝকি ঝলসিল বাঙ্গালী-নয়ন,
কোষের ভিতর হয় কিরিচ ঝঞ্জনা
বাঙ্গালী-হৃদয়ে ভীতি উপজি' ক্ষণিক।
সেনাপতি আদেশেতে, অরাতির দল
করিল আওয়াজ ফাঁকা ধড় ধড় ধড়,—
বাঙ্গালী অর্দ্ধেক সৈন্য পড়ে মূর্চ্ছাগত।
তথাপি সে রণে ভঙ্গ না দিয়া বাঙ্গালী,
অর্দ্ধবল, আরম্ভিল ঘোর যুদ্ধ এবে।
সুড়ঙ্গের মুখে সলতে ছিল সুরক্ষিত,
অনল সংযোগ তাহে হইল এখন,
চটপট ভীম শব্দে গড়ের ভিতর,
গড়ের বাহিরে তথা, যথায় ইংরেজ-
সৈন্যশ্রেণী দাঁড়াইয়া, ক্ষিতি বিদারিয়া
গর্জ্জিয়া উঠিল ধূম লঙ্কা-দগ্ধ করি';
ধূমে ধূমে সমাচ্ছন্ন হৈল দশদিক,
প্রবল লঙ্কার ধূম প্রবেশি অরাতি-
নাসারন্ধ্রে, গলে, হায় খক খক খকে
কাসাইল শত্রুদলে, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ফ্যাঁচে
হাচাইল ভয়ঙ্কর, কাতরিল সবে।
তদুপরি বালি-জলে পড়ে পিচকারি।
কাতর ইংরেজ-কুল; স্খলিয়া পড়িল
হস্ত হৈতে ভূমিতলে সমস্ত বন্দুক।
কুড়াইয়া সে বন্দুক বাঙ্গালী সৈনিক
মহাবেগে গঙ্গাজলে নিক্ষেপিল এবে।
সুশিক্ষিতা অশিক্ষিতা বিবিধ রমণী—
কাহার চসমা চক্ষে গোন পরা কেহ,
কার্পেট-শিল্পিনী কেহ বুনিছে সুন্দর,
মখমলে উর্ণা-ফুল,—দাঁড়াইয়া ছাদে
এ উহারে দেখাইয়া বীর্য্য বাখানি'ছে,
কেহ বা হেরিয়া মুগ্ধ, দেখি'ছে নীরবে;
মোহন হাসির ছলে কোন সীমন্তিনী
পুষ্প বরিষণ করে বাঙ্গালী উপরে।
ধন্য রে বাঙ্গালী-শিক্ষা! ধন্য রে কৌশল!
ধন্য রণ বাঙ্গালীর! ধন্য বীরপনা!
বিচিত্র সাহস তা'র কেমনে বাখানি।
স্তব্ধ দেব দৈত্য দেখি' বাঙ্গালী-বীরতা।
অস্ত্রহীন অরিকুল, ব্যাকুল ভাবিয়া,
পুনঃ প্রবেশিল সবে গড়ের অন্তরে,
করিল মন্ত্রণা ঘোর অর্দ্ধদণ্ড কাল।
পুনঃ জয় জয় ধ্বনি উঠিল আকাশে,
"জয় ভারতের জয়," ত্রাসিল ইংরেজ।
মাচায় গর্জ্জিয়াছিল অলাবুর লতা,

পতিপ্রাণা মেমকুল ব্যঞ্জনের তরে
সেই সব মাচা খুঁজি তন্ন তন্ন করি
অগণ্য অলাবু এবে করিল বাহির।
অলাবুর প্রহরণে সাজিয়া আবার
গদাযুদ্ধে অগ্রসর হইল ইংরেজ।
ইংরেজ বাঙ্গালী পুনঃ আরম্ভিল রণ।
নির্ভীক বাঙ্গালী বীর বঁটি ধরি করে
কচ কচ লাউ কাটি করে খান খান।
অলাবু প্রহারে কিন্তু বিষম আহবে,
অস্থির বাঙ্গালী সৈন্য তিষ্ঠিবারে নারে,
পড়িল সৈনিক বহু।—দেখি মিত্রক্ষয়,
সারি দিয়া দাঁড়াইয়া বঙ্গ-বিলাসিনী
নয়নে অজস্র অশ্রু বর্ষিতে লাগিল
অরাতি-বদন লক্ষ্যি; অসংখ্য ইংরেজ
পপাত সে ভূমিতলে, মমারচ বহু,
রণে ভঙ্গ দিল যা'রা ছিল অবশেষ,
মাগিল জীবন ভিক্ষা বিনয়ে, কাতরে।
তথাপি উকীল-সৈন্য বঁটি হস্তে করি',
বাম করে শামলার ঢাল শোভিতেছে,
পড়িল অরাতি মাঝে—পলায়নপর
আপনি যাহারা এবে। জয় জয় রবে
আচ্ছন্ন করিল দিক্, হারিল ইংরেজ।
শান্তির প্রস্তাব যবে করিল অরাতি,
উকীল সম্মতি দিল; হইল নিয়ম
দেশে না যাইবে কেহ ইংরেজ যত্তেক
অনুমতি না লইয়া, থাকিবে ভারতে
ভৃত্যভাবে, ভারতের করিবেক সেবা।
—যে যেমন আছে এবে রহিবে তেমতি।
স্বাধীন বাঙ্গালা এবে, স্বাধীন ভারত,
ভারতের জয় শব্দ উঠিল চৌদিকে,
বাঙ্গালী ভারত-প্রাণ হইল বিধাতা
ভারত-উদ্ধার যবে হৈল হেন মতে।
ভারত-উদ্ধার কথা অমৃত সমান।
দ্বিজ রামদাস ভণে, শুনে পুণ্যবান্॥

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার কাব্যে উদ্ধারো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে আমরা ভারতোদ্ধার কাব্যের প্রায় অর্দ্ধেক উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলাম! বাস্তবিকই কাব্যখানি আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে যে আমরা এতখানি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কবী ইহাতে এই কয়েকটী বিশেষ গুণ দেখাইয়াছেন—অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা, কল্পনা, সৃষ্টি, উপমা, তীব্র বিদ্রূপ এবং গম্ভীর হাস্যরসের (Mock heroic) অবতারণা। আর একটি ক্ষমতা এই যে ইনি পূর্ব্বকবিগণের ভাব—অধিক কি ভাষা পর্য্যন্তও—এমন নূতন আকারে গঠিতে পারেন যে তাহা আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ নূতন হইয়া দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম:—

(আদর্শ) উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজবেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥
(নকল) উঠ সবে মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
ভারত উদ্ধারে মন করহ নিবেশ॥

আমরা বিশেষ বিশেষ স্থল উদ্ধৃত করিয়া উপর্য্যুক্ত প্রত্যেক গুণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রমাণ দিতে পারি। কিন্তু প্রস্তাববাহুল্য-ভয়ে তাহা হইতে বিরত হইলাম। পাঠকেরা

ইচ্ছা করেন ত এক এক খণ্ড কিনিয়া এই সকল গুণের অস্তিত্বের প্রমাণ লইতে পারেন।

উপসংহারকালে গ্রন্থপাঠের নৈতিক ফল সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। অনেকের বিশ্বাস যে এই গ্রন্থ পাঠের অনিবার্য্য ফল স্বদেশানুরাগের অঙ্কুরে বিদলন। তাঁহারা বলেন যে স্বদেশানুরাগ ভারতে এখনও শব্দমাত্রে অবস্থিত রহিয়াছে। এখনও ইহা লোকের হৃদয়ের সহিত—প্রতীতির সহিত—সংমিশ্রিত হয় নাই। সুতরাং এরূপ তীব্রতর বিদ্রূপোক্তি ইহার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। এই উক্তিতে যে কিছুমাত্রও সত্য নাই একথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। তরলমতি তরুণবয়স্ক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের অন্তরে ধীরে ধীরে যে অল্প পরিমাণ স্বদেশানুরাগ প্রবেশ করিতেছিল, এরূপ কঠোর বিদ্রূপোক্তিতে তাহাদিগের অন্তর হইতে সেই কণামাত্র স্বদেশানুরাগ হয়ত চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহাদিগের অন্তরে সেই স্বদেশানুরাগের ভাব অমলদক্ষরে লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা এরূপ বিদ্রূপোক্তিতে ভগ্নহৃদয় না হইয়া বরং, দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইবেন। কারণ এ বিদ্রূপোক্তির উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগের মূলে কুঠারাঘাত করা নহে, ইহাকে উত্তেজিত করা। যে সকল স্বদেশানুরাগাভিমানী স্বদেশানুরাগকে শুষ্ক বক্তৃতায় আবদ্ধ রাখিতে চান, যে সকল তরলমতি যুবক ভারতোদ্ধারব্রতের গুরুত্ব ও দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া হাস্যাস্পদ কল্পনাজালে আবদ্ধ হন, এই বিদ্রূপবাণ তাঁহাদিগের প্রতিই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা ব্রতের গুরুত্ব বুঝিয়া ধীরে ধীরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চাহেন, যাঁহারা ভারত-উদ্ধারকে নাম কিনিবার এবং অর্থ ও যশ অর্জ্জন করিবার পন্থা স্বরূপ মনে না করেন, যাঁহারা এই ব্রত উদ্যাপনে ধন প্রাণ মান সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, এ বিদ্রূপোক্তি তাঁহাদিগের প্রতি বিক্ষিপ্ত নয়।

মেলমালা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে নৃপের বংশাবলীর বিবরণ পাইলে পাঠকগণ কেশরকুনিদিগের বিষয় বিশেষ বুঝিতে পারিবেন। বাঙ্গালা ক্ষিতীশ-বংশাবলীর ৭০ পৃঃ লিখিত আছে ভট্টনারায়ণের পরপুরুষেরা যে স্থানে অবস্থিত ও আধিপত্য করিতেন তাহা বিক্রমপুরের সন্নিহিত। একারণ অনুমান হয় যে উল্লিখিত যজ্ঞানুষ্ঠানকালে আদিশূর বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যাহা হউক ভট্টনারায়ণ, নিপু, হলায়ুধ, হরিহর, কন্দর্প, বিশ্বম্ভর, নরহরি, নারায়ণ, প্রিয়ঙ্কর, ধর্ম্মাঙ্গদ, তারাপতি, কামদেব এই দ্বাদশ পুরুষ ক্রমান্বয়ে ১৩৯৯

খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, সর্ব্বশুদ্ধ ৩২২ বৎসর এই রাজ্য ভোগ করেন।

আমরা এই কথাগুলি প্রমাণ ব্যতীত সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। বিপরীত পক্ষে বরং প্রমাণ আছে কেশর গ্রামে রাঢ় দেশে। ভট্টনারায়ণের নিজের বাস পঞ্চকোটি গ্রামে। উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পঞ্চকোটি এক্ষণে প্রদেশবিশেষ, উহা মানভূমি জিলার অন্তর্গত। ঐ প্রদেশে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় তাবৎগ্রামীণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দেখা যায়। কেশরগ্রামীদিগের রাজত্বের উল্লেখ মাত্র আছে, কিন্তু কোন থানে তাঁহাদিগের অধিকৃত রাজ্যের বা গ্রামাদির কিছু উল্লেখ নাই। সুতরাং সংস্কৃত ক্ষিতীশ-বংশাবলীরচয়িতা যে প্রয়োজনের নিয়মানুসারে যথাশ্রুত লিখিয়াছেন ও প্রমাণ অনুসন্ধান করেন নাই তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়। সে যাহা হউক এক্ষণে ঐ পুস্তক হইতে নীপের বংশাবলীর যত দূর পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য যথা।—

(১) ভট্টনারায়ণ-প্রমুখ কেশরগ্রামী
|
(২) নীপবংশ
|
(৩) হলায়ুধ
|
(৪) হরিহর
|
(৫) কন্দর্প
|
(৬) বিশ্বম্ভর
|
(৭) নরহরি
|
(৮) নারায়ণ
|
(৯) প্রিয়ঙ্কর
|
(১০) ধর্ম্মাঙ্গদ
|
(১১) তারাপতি
|
(১২) কামদেব
|
(১৩) বিশ্বনাথ দ্বিতীয়(০) তৃতীয়(০) চতুর্থ(০)
|
(১৪) রামচন্দ্র
|
(১৫) সুবুদ্ধি
|
(১৬) কংশারি
|
(১৮) ত্রিলোচন
|
(১৯) ষষ্ঠীদাস
|
(২০) কাশীনাথ

(১৩) বিশ্বনাথ রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। অন্য তিন সহোদর রাজ্যের অধিকারে বঞ্চিত হয়েন।

এই রাজগোষ্ঠীর এই খানেই জ্যেষ্ঠাধিকার প্রবৃত্ত হয়। এই কয়েক পুরুষ কিশোর গ্রামে বাস করেন বাং ক্ষিতীশ-বংশাবলী এই কথা কহেন।

এই সপ্ত পুরুষ একাদিক্রমে ১৫৯৯ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত, সর্ব্ব সাকুল্যে ১৯৮ বৎসর এই জমীদারী ভোগ করেন। বাং ক্ষিতীশ-বংশাবলী ৭১ পৃঃ।

কাশীনাথ দিল্লীর কারাগারে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। ক্ষিতীশ-বংশাবলী পুস্তক দেখ।

কাশীনাথ কাঁকদি হইতে বাগুয়ান পং আইসেন। কাশীনাথবংশের রাম-সমাদ্দার হইতে এ প্রদেশে বাস। কাশীনাথের পত্নী আন্দুলিয়ানিবাসী বাগুয়াণ পরগণার জমীদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আলয়ে আশ্রয় লয়েন। যৎকালে উক্ত রমণী হরেকৃষ্ণের আশ্রয় পান ও পতি হইতে বিযুক্ত হয়েন তৎপূর্ব্বেই তিনি স্বীয় গর্ভে এক অমূল্যনিধিকে ধারণ করিয়াছিলেন। সমাদ্দার ঐ গর্ভবতী রমণীকে লোকললামভূতা-জ্ঞানে এবং আপনার অনপত্যতা হেতু অপত্যনির্ব্বিশেষে রক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাকালে ঐ রমণী এক পুত্র প্রসব করিলেন। হরেকৃষ্ণ ঐ সন্তানের রমণীয় আকৃতি দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার নাম রাম রাখিলেন। তাহার জাতকরণ হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত সমুদায় সংস্কার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার দ্বারা অতি সমারোহে ও যথারীতি নির্ব্বাহিত হয়। হরেকৃষ্ণ যখন রামচন্দ্রকে নিজের উত্তরাধিকারীরূপে সম্রাট্ সমীপে স্বীকার করেন, তখন নিজের উপাধি, সমাদ্দার পর্য্যন্তও তাঁহার প্রতি সংক্রান্ত করান। তদবধি কাশীনাথের পুত্র রামচন্দ্র রাম সমাদ্দার নামে খ্যাত হইলেন।

(২১) রাম সমাদ্দারের চারি পুত্র

২২ ভবানন্দ জগদীশ হরিবল্লভ সুবুদ্ধি

ভবানন্দের বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার বিষয় ক্ষিতীশ-বংশাবলী ও অন্নদা মঙ্গল পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

ভবানন্দ জাহাঙ্গির বাদসার অধিকার কালে ঢাকার নবাব ইসমাইল খাঁর নিকট হইতে কানুনগুইপদ প্রাপ্ত হয়েন এবং ঐ পদের মর্য্যাদা স্বরূপ মজুন্দার উপাধি ধারণ করেন। এই হইতেই ভবানন্দের নাম বিখ্যাত হয়।

ভবানন্দের ভ্রাতা হরিবল্লভ ফতেপুরের, জগদীশ কুড়ালীগাছীর ও সুবুদ্ধি পাটিকাবাড়ীর অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। এগুলি এক্ষণে নদীয়া জিলার গ্রাম বিশেষ। এই তিনেরই বংশাবলী বিশেষ বিস্তৃত হইয়াছে।

২২ ভবানন্দের বংশাবলী

২৩ গোপাল গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ

ভবানন্দের প্রথম বাস বাগোয়ান, তৎপরে মাটীয়ারী। মাটীয়ারীর রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

হরিবল্লভের সন্তানেরা কেবল ফতেপুরেই বাস করিতেছেন। সেই প্রকার জগদীশের সন্ততিবর্গ কেবল কুড়ালীগাছীতেই অবস্থান করিতেছেন। সুবুদ্ধির সন্তানগণ পাটিকাবাড়ী রাড়িপাড়া, বাদতেহট্ট ও বড়গাছীতে বিস্তৃত হইয়াছেন। ভবানন্দের পুত্রগণের মধ্যে গোপাল মাটীয়ারীতে অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণের সন্তানগণ শ্রীকৃষ্ণপুর, শিবালয়, সন্তোষপুর, কৌড়কদিও গ্রামে এবং গোবিন্দের সন্তানবর্গ গোটপাড়া, আড়পাড়া, বামনপুখুরিয়া, আকাইপুর, জয়রামপুর, ঘাটেশ্বর,

বেজপাড়া, নবদ্বীপ, দিগম্বরপুর ও খাসকুল গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। গোবিন্দদেবের বৃত্তিবিধান জমীদারী বিষয়ে আমরা ক্ষিতীশবংশাবলীর কথারসহিতঐকমত্য অবলম্বন করিতে পারি না। যেহেতু ক্ষিতীশবংশাবলীতেই লেখা আছে সম্রাটের আদেশ ও ফরম্মাণের হুকুম ব্যতীত কেহই আশা সোটা নকীব ডঙ্কা, ঝালরদার পাল্‌কী ও পাঁচ হাতিয়ার প্রভৃতি রাজসম্মানচিহ্ন ব্যবহার করিতে পারিতেন না। কিন্তু নবদ্বীপের রাজাদিগের অন্যান্য জ্ঞাতিগণ মধ্যে কেবল দিগম্বরপুরের জ্ঞাতিগণই এই সকল বিষয়ে অনন্যসাধারণ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহারা জমীদার বলিয়া খ্যাত। নবাব সরকার ও দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে তাঁহারা ভূম্যধিকারী বলিয়া বিশেষ পরিগণিত। তাঁহারা কখনও নবদ্বীপাধিপতির নিকট নিজ অধিকারের কর প্রদান করেন নাই। নবদ্বীপের রাজারা জ্ঞাতিগণের প্রতি যেরূপ দৌরাত্ম্য করিতেন সেরূপ দৌরাত্ম্য কেবল দিগম্বরপুরের জ্ঞাতির প্রতি করিতে কোন কালে সমর্থ হয়েন নাই। নতুবা কোন জ্ঞাতিরই নবদ্বীপের রাজাদিগের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার উপায় ছিল না। তাহার প্রমাণস্বরূপ কতগুলি বিষয় এখানে লিখিত হইল।

নবদ্বীপের রাজারা যে জ্ঞাতিকে বড় ভাল বাসিতেন, তিনি রাজবাটীতে অবস্থান পূর্ব্বক রাজাদিগের কর্ত্তব্য পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ সমাধা করিতেন।

যাঁহারা রাজাদিগের নিকট সম্পর্কে বড় ও মান্য তাহারাই শ্রাদ্ধ কার্য্যে প্রতিনিধিস্বরূপ সম্মান পাইবেন।

কোন কোন জ্ঞাতিকে চিরকালই অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে রন্ধন করিতে হইত। কোন কোন জ্ঞাতিকে পুরুষপরম্পরায় পরিবেশন ও কাহাকেও বা পরিচারক ব্রাহ্মণের কার্য্য করিতে হইত। কেহ বা আচমন কালে খড়িকা যোগাইতেন। নবদ্বীপের রাজপরিবারবর্গ এইরূপে জ্ঞাতিগণের দুর্দ্দশা করেন। কিন্তু কস্মিন্‌কালেও দিগম্বরপুরের জ্ঞাতির প্রতি কোনরূপ অকার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহা কাহারও মুখে শ্রবণ করা যায় না। এই সকল বংশের কে কোথায় আছেন তাহা নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকে দুঃখিত করা বিধেয় নহে। নদীয়া জিলায় আপামর সাধারণেই সে সকল জ্ঞাতিগণকে বিশেষ জানে। তাঁহাদিগেরও ওসকল কথা গোপন করিবার উপায় নাই।

এক্ষণে গোবিন্দদেব হইতেই কুলক্রিয়া আরম্ভ হয়। গোবিন্দ দেব-প্রমুখ দিগম্বরপুর-নিবাসী কেশরকুনীদিগের বংশাবলী লিখিব।

যে হেতু অদ্যাপিও ইহাঁরা অন্যান্য জ্ঞাতিগণ অপেক্ষায় সম্পত্তিতে ও মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ আছেন।

২২ ভবানন্দ মজুমদার প্রমুখ

।

২৩ গোবিন্দ দেব বংশ

।

২৪ হরিদেব রামদেব শ্যামদেব কৃষ্ণদেব

২৫ বলরাম

২৬ ভবানীশঙ্কর রামশঙ্কর শিবশঙ্কর গৌরীশঙ্কর

২৭ আনন্দ বিজয় যাদব

২৮ রুক্মিনীকান্ত প্রাণকৃষ্ণ গোপাল

গোপীকৃষ্ণ

(২৯) রাজকৃষ্ণ মধু

৩০ শরৎ (মৃত)

—oo—

ভবানীশঙ্কর প্রমুখ বিজয়বংশ (২৭)

২৮ মাধব রমেশ কালী

২৯ বিহারী কুঞ্জ

—oo—

ভবানীশঙ্কর প্রমুখ যাদব বংশ ২৭

২৮ বরদা (নিঃসন্তান)

—oo—

বলরাম প্রমুখ রামশঙ্কর বংশ ২৬

২৭ কেশব

২৮ মুকুন্দ

২৯ জ্ঞানপতি যদুপতি গণপতি সুরপতি

—oo—

বলরাম প্রমুখ শিবশঙ্কর বংশ ২৬

২৭ মহেশ

২৮ অম্বিকা নিমাই

—oo—

বলরাম প্রমুখ গৌরীশঙ্কর বংশ ২৬

২৭ বাণীকান্ত শিবাকান্ত চন্দ্রকান্ত দুর্গাদাস

২৮ দুহিতা উমাচরণ দেবনাথ বিদ্যানাথ

২৯ গোপাল গণপতি। গুড় দৌহিত্র

গোবিন্দদেবপ্রমুখ রামদেব বংশ ২৪

২৫ রামগোবিন্দ

২৬ হরপ্রসাদ দুর্গাপ্রসাদ চণ্ডিপ্রসাদ রামপ্রসাদ কমলাকান্ত

২৭ শ্রীকণ্ঠ নীলকণ্ঠ শিতিকণ্ঠ গঙ্গাকান্ত গৌরীকান্ত

২৮ ঈশান ঈশ্বর | যুগাদ্যা হরিচরণ ২৮

২৯ রজনী (দত্তক) ২৮ মথুরেশ (দত্তক)

রামগোবিন্দপ্রমুখ হরপ্রসাদ বংশ ২৬

২৭ শ্রীপতি গণপতি

২৮ প্রসন্ন (দত্তক)

২৮ কৈলাশ যদু আদিত্য

২৯ কুলদা প্রভৃতি অজ্ঞাত

রামগোবিন্দপ্রমুখ দুর্গাপ্রসাদ বংশ ২৬

২৭ তারণ রাজ ভৈরব রাঘব গিরিশ জগৎ গোলোক

২৮ কীর্ত্তিচন্দ্র ভুবনচন্দ্র আশুতোষচন্দ্র সতীশচন্দ্র

২৯ কানাইপ্রভৃতি

রামচন্দ্র ২৭

২৮ দ্বারিক জানকী

ভৈরব ২৭

২৮ ভবশঙ্কর উমাশঙ্কর নবকুমার

২৯ জ্যোতিশ্চন্দ্র

রামদেব সহোদর শ্যামদেব বংশ

দুর্গাচরণ গৌরীচরণ

কৃষ্ণদেববংশ ২৪

জয়নারায়ণ মধ্যম। মধুসূদন ছোট ২৫

২৬ মধু কামদেব দেবীচরণ কাশীকান্ত

২৭ শম্ভুনাথ রঘুনাথ ভৈরবনাথ রুদ্রনাথ

২৮ নীলকান্ত নবচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র হরিনাথ

২৯ কৈলাশ নবচন্দ্র

৩০ দত্তক শিবচন্দ্র

—০০—

কামদেব প্রমুখ রঘুনাথবংশ ২৭

২৮ কালাচাঁদ (দত্তক)

২৯ রতিনাথ আদিত্যনাথ

—০০—

কামদেব প্রমুখ ভৈরবনাথ বংশ ২৭

২৮ কাশীপতি বিশ্বনাথ কাশীপতি

২৯ কিনু

৩০ ক্ষেত্রনাথ শশিভূষণ

কামদেব প্রমুখ রুদ্রনাথ বংশ ২৭

২৮ ব্রজনাথ

২৯ গোপাল কৃষ্ণ দুহিতা

৩০ দৌহিত্র শশিভূষণ

—০০—

কামদেব সহোদর দেবীচরণ বংশ ২৬

২৭ কালীকান্ত তারাকান্ত গিরিজাকান্ত উমাকান্ত

২৮ শ্রীনাথ রাধানাথ ২৮

২৯ দৌহিত্র ৩০ অরুণ গণেশ

—০০—

জয়নারয়াণ সহোদর মধু ২৫

তারাকান্ত (দত্তক) ২৬

২৭ চন্দ্রকান্ত ত্রিপুরাকান্ত পূর্ণচন্দ্র

রাধিকাপ্রসাদ ঠাকুরদাস

২৮ কমলেশ (দত্তক)

—০০—

মধু সহোদর কাশীনাথ ২৬,

২৭ শিবানন্দ অন্নদাপ্রসাদ উমাপ্রসাদ সর্ব্বচন্দ্র

২৮ সদু রমেশ কালীদাস নৃসিংহ শ্রীপ্রসাদ

২৯ ত্রৈলোক্য হৃষিকেশ।

এক্ষণে দিগম্বরপুরের বংশাবলী দ্বারা জানা যায় যে ভট্টনারায়ণ হইতে কেশরগ্রামী নীপবংশে ৩০ পুরুষ পর্য্যন্ত অধস্তন বংশাবলী হইয়াছে। কেশরগ্রামীর অন্যান্য বংশীয়গণ এই তালিকা মিলাইলে আপন আপন বংশাবলী জানিতে পারিবেন।

অধুনা নবদ্বীপাধিপতির বংশাবলীর উল্লেখ করিয়া কেশরগ্রামী নীপবংশের ইতিবৃত্ত সমাপন করা যাইতেছে।

ভবানন্দের পুত্র (২৩) গোপাল যখন রাজ্য প্রাপ্ত হন তখন তিনি শান্তিপুর,

সাহাপুর, ভালুকা ও রাজপুর প্রভৃতি কয়েক পরগণার জমীদার ও সম্রাটের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। ইতিপূর্ব্বে ঐ গুলি ভবানন্দের অধিকারে ছিল না।

২৩ গোপালের তিন পুত্র

২৪ নরেন্দ্র রামেশ্বর রাঘব

২৫ রুদ্র প্রতাপনারায়ণ

রুদ্ররায় সম্রাট আলমগিরির নিকট হইতে মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং ইনিই সর্ব্বাগ্রে হস্তী প্রভৃতি উপহার প্রাপ্ত হয়েন। গৌড়নগরের রাজাদিগের এই প্রথম সম্মান।

২৫ রুদ্র

২৬ রামকৃষ্ণ রামজীবন

রামকৃষ্ণ যথার্থ বিদ্যানুরাগী ও রাজবুদ্ধি ধারণ করিতেন বলিয়া তিনি রাজা হয়েন। তাঁহার প্রদত্ত বৃত্তি দ্বারা নবদ্বীপের চতুস্পাঠীর শ্রীবৃদ্ধি হয়। ঐ বৃত্তি অদ্যাপি নদিয়ার কালেক্টারী হইতে প্রতি মাসে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

রামকৃষ্ণের এত গুণ থাকিলেও তিনি অসদাচরণে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তিনি রাজ্যলোভহেতু স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামজীবনকে জাহাঙ্গীর নগরের নবাবের কারাগারে বন্দীভূত করেন। পরিশেষে আপনিও ঐ কারাবাসের আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে ভ্রাতার মৃত্যুহেতু রাজ্যাধিকার-প্রাপ্ত ও কারাবিমুক্ত হইলেন।

২৬ রামজীবন

রাজারাম কৃষ্ণরাম রঘুরাম রামগোপাল

২৮ কৃষ্ণচন্দ্র

গোপালের পুত্র নরেন্দ্রের পরপুরুষেরা নবলা, সীমলা, আমুলে, দুর্গাপুর, ও শালীগ্রামে এবং রামেশ্বরের বংশীয়েরা বেড়িপলুতায় অবস্থিত আছেন। রাঘবের প্রথম পুত্র রুদ্রনারায়ণ কৃষ্ণনগরেই থাকেন। দ্বিতীয় পুত্র প্রতাপনারায়ণ বাগোয়ানে যাইয়া বাস করেন। রুদ্রের পুত্রদিগের মধ্যে রামজীবন পৈত্রিক বাটীতেই থাকেন। রামকৃষ্ণের সন্তানেরা আশাননগরে আছেন রামজীবনের পুত্রদিগের মধ্যে রঘুরাম কখনও কৃষ্ণনগরে কখনও শ্রীনগরে থাকিতেন।

রামগোপালের পরপুরুষেরা কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত দোগাছিয়াতে বাস করিতেছেন রঘুরামের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে কৃষ্ণনগর পরে স্বীয় নিবাসে অবস্থিতি করেন। ইহাঁর প্রথম পুত্র শিবচন্দ্র কখন স্বীয় নিবাসে কখন কৃষ্ণনগরে থাকিতেন। শিবচন্দ্রের সন্তানেরা কৃষ্ণনগরে বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের অপর পুত্রদিগের মধ্যে শম্ভুচন্দ্রের বংশীয়েরা হরধামে, ঈশানচন্দ্রের বংশীয়েরা আনন্দধামে বাস করিতেছেন। ভৈরবচন্দ্রের দৌহিত্রের সন্তানেরা এবং মহেশ্চন্দ্রের পৌত্রের দৌহিত্রগণ কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কে আছেন। ভৈরবচন্দ্রের কন্যার বংশের মধ্যে এক্ষণে রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর প্রসিদ্ধ।

বাং ক্ষিতীশ বংশাবলী। ২১৯ পৃষ্ঠা দেখ।

যদুনাথ রায় কোন্ গোষ্ঠীর ও কোন্ বংশীয় কুলীন তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে।

মেলবন্ধন সময় হইতে যে সকল কুলীন কেশরকুনী ভাবপ্রাপ্ত হয়েন তাহা এক্ষণে অনায়াসে বুঝা যাইবে।

নিলকণ্ঠপ্রমুখ শ্রীধর বংশ. ২৮ মেলফুলিয়া

২৯ রামকৃষ্ট শ্রীনারায়ন [illegible]শেখর

৩০ প্রাণবল্লভ শুকদেব নন্দরাম গোবিন্দ

সাং কলিকাতা

৩১ সুন্দররাম রামরাম আনন্দরাম

৩২ রামহরি শঙ্কর ভবানী মৃত্যুঞ্জয় তারিণী

৩৩ দেবীচরণ

—oo—

শ্রীধরপ্রমুখ রামকৃষ্ণ বংশে নন্দরামসুত লক্ষ্মীকান্ত ফুলিয়ামেল সাং জেঁটা-পালসিট বর্দ্ধমান।

নন্দরাম ৩০

৩১ মুলুকচাঁদ লক্ষ্মীকান্ত জগন্নাথ ব্রজনাথ

যুগল কেবল

ব্রজনাথবৎ।

৩২ কৃষ্ণচন্দ্র মাণিকচন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র জয়রাম

জগন্নাথ ৩১

৩২ গুরুপ্রসাদ নীলমোহন

কেবলরাম ৩১

৩২ রামমোহন রামতনু রামজীবন সার্থক

—oo—

শ্রীধরপ্রমুখ রামনারায়ণসুত হরিদেব ফুলিয়ামেল রামনারায়ণ ২৯

৩০ হরিদেব সীতারাম গোবিন্দ কৃষ্ণচন্দ্র

৩১ গৌরীচন্দ্র নিমাই উদয়চন্দ্র সদাশিব

আনন্দরাম

শ্রীধরপ্রমুখ রামনারায়ণসুত কৃষ্ণচন্দ্র

ফুলিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ৩০

৩১ সুধারাম হৃদয়রাম তিলকরাম বীর নিমাই

—oo—

শ্রীধরপ্রমুখ বাণেশ্বর ২৯

৩০ শিব পাঁচু হরিদেব নন্দ শ্রীকৃষ্ণদেব কানু

ভুবন

৩১ রামসুন্দর রামলোচন রামকিশোর বলরাম

রামতনু কাশী কানাই রঘুনাথ

—oo—

বিষ্ণুঠাকুর প্রমুখ রামদেববংশ

ফুলিয়া মেল।

নীলকণ্ঠসুত বিষ্ণু ২৮

২৯ রামদেব নারায়ণ

৩০ শ্যাম সীতারাম কৃষ্ণজীবন কন্দর্প পঞ্চানন রাজকিশোর খেলারাম

৩১ রামগোবিন্দ রামকিশোর কালীশঙ্কর

রামগোবিন্দ কেশরকুনী ভাব প্রাপ্ত।

রাজকিশোর কেশরকুনী ভাব প্রাপ্ত।

রামগোবিন্দ ৩১

৩২ হরশঙ্কর জয়শঙ্কর শম্ভুচন্দ্র গৌরীশঙ্কর প্রভৃতি সাত সহোদর

৩৩ পীতাম্বর বটুকনাথ

—oo—

রামকিশোর ৩১

৩২ রামকানাই জগচাঁদ রামচাঁদ

৩৩ বৈকুণ্ঠ রামতনু রামকমল

মধু

৩৪ প্রাণকৃষ্ণ গোপীকৃষ্ণ অনাথবন্ধু

গোপীকৃষ্ণের সাতশতী কাটানী বিবাহ।

রামকানাই ৩২ তৎপুত্র ঈশান ৩৩

তৎপুত্র গিরিশ ৩৪ এই রামকিশোরবংশ।

কালীশঙ্কর ৩১

৩২ উমাশঙ্কর দুর্গাচরণ শিবপ্রসাদ ইহাঁর দুই স্ত্রী

৩৩ বিষ্ণু গুরুদাস

৩৪ শরৎ সতীস মাখন অন্নদাপ্রিভৃতি

প্রথমপক্ষে ৪ চারি সন্তান। অপর পক্ষে ছয় সন্তান।

৩৩ প্রথমপক্ষ রামচন্দ্র আনন্দ ঈশ্বরচন্দ্র গিরিশচন্দ্র

৩৩ দ্বিতীয়পক্ষে বদনচন্দ্র ভুবনচন্দ্র ভৈরবচন্দ্র মহেশচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র

৩৩ আনন্দ

৩৪ সর্ব্বচন্দ্র প্রসন্নচন্দ্র অঘোরচন্দ্র

৩৫ আশুতোষ পূর্ণচন্দ্র শ্যামাচরণ

অঘোরচন্দ্র রাজজামাতা। ইনি রাজাধিরাজ শ্রীশচন্দ্ররায়ের কন্যা শ্রীমতী কালীকুমারীকে বিবাহ করিয়া কেশরকুনী ভাব প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁর পুত্রের উপাধি উক্ত রাজগোষ্ঠীর নিয়মানুসারে রায় হইয়াছে এক্ষণে ইহাঁকে রায় শ্যামাধব বলিতে হয়।

বিষ্ণুঠাকুরের সন্তানগণ ফুলিয়াবেলগড়িয়াতে বাস করেন। ফুলিয়াবেলগড়ি নদীয়া জিলার শান্তিপুরের নিকট।

বিষ্ণুঠাকুর প্রমুখ রামদেবসুত সীতারাম(৩০)

ফুলিয়ামেল

সীতারামের ৮ পুত্র (৩১) পর্য্যায়। ব্রজকিশোর, কৃষ্ণচন্দ্র, বিজয়, রামরাম, শুকদেব, শ্রীরামচন্দ্র, সদাশিব ও রামলোচন।

শুকদেবের পুত্রাদির মধ্যে রামনন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে (পর্য্যায় ৩২)

টেলিফোন (দূর-শ্রবণ) যন্ত্র।

অনেকে শুনিয়া থাকিবেন যে টেলিফোন নামে একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা দ্বারা দুইজন লোক বহুদূরে থাকিয়াও কথোপকথন করিতে পারে। টেলিগ্রাফের সৃষ্টি হইতে বহুদূরবর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে কথোপকথন একরূপ চলিয়া আসিতে ছিল। এই টেলিগ্রাফের সাহায্যেই আমরা [illegible] যুদ্ধে স্থানীয় লোকের মত [illegible] যুদ্ধের সংবাদ অদ্য পাইয়াছি এবং [illegible] নিত্তক অব-

ন্যায় প্রতিদিন ইংলণ্ডের মন্ত্রী সভার আ-ন্দোলন ও মত পরিবর্ত্তন সকল দেখিতেছি। টেলিগ্রাফের সাহায্যে আমরা কলিকাতা থাকিয়া ইংলণ্ড ও রুসিয়াস্থ লোকের নিকট হইতে কথা শুনিতেছিলাম বটে; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে, পরন্তু পরোক্ষ সম্বন্ধে অর্থাৎ কতকগুলি সঙ্কেত দ্বারা। টেলিগ্রাফ কতকগুলি ভৌতিক সঙ্কেত দ্বারা অক্ষরের উৎপাদন করিয়া মনের ভাব একের নিকট হইতে অপরের নিকট সঞ্চালন করে।

টেলিফোন যন্ত্রে আমরা দূরবর্ত্তীলোক-দিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে পারিব। এ কথোপকথনে কোন ও সঙ্কেতের প্রয়োজন হইবেনা। কেবল বাক্-শক্তি ও শ্রবণ শক্তির প্রয়োজন। আমি মুখে কথা কহিব, যাহার সহিত কথা কহিব সে কর্ণে শুনিবে। আবার সে কথা কহিবে, আমি কর্ণে শুনিব। সচরাচর যাহাকে কথোপকথন বলা যায় তাহার সকলই ইহাতে থাকিবে, কেবল উভয়ে উভয়কে দেখিতে পাইবেনা। দুই জন অন্ধ নিকটে থাকিয়া যেরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে পারে টেলিফোন দ্বারা কথোপকথন ও সেইরূপ হইবে।

টেলিফোন যন্ত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর অত্যদ্ভূত আবিষ্ক্রিয়া। বৈজ্ঞানিক চর্চার সুখময় ফল। প্রচলিত টেলিগ্রাফ অপেক্ষা ইহা দুই কারণে উৎকৃষ্ট। প্রথমতঃ ইহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথোপকথন হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইহা অল্পব্যয়-সাধ্য। এই শেষোক্ত গুণেই ইহা বৈজ্ঞানিক সমাজে এত আদরের সহিত গৃহীত ও ব্যবসায়ীজাতি দিগ-কর্ত্তৃক ঈপ্সিত। এই অল্পব্যয়-সাধ্যতার কারণ কি পরে বলা যাইবে। কিন্তু এই ব্যয়লাঘব হইতে যে ইহার প্রসর অধিক হইবে তাহা বলা বাহুল্য। টেলিগ্রাফের ব্যয়বাহুল্য বশতঃ অন্তিম কালে ভিন্ন আমরা প্রায় তাহা ব্যবহার করিনা। কোন টেলিগ্রাফ আসিলেই আমরা ভয় পাই, কিজানি কাহার মৃত্যু সংবাদ বা মুমূর্ষু সংবাদ আ-নিল। টেলিফোন যন্ত্রে এত ব্যয়লাঘব আশা করা যায়, যে সাধারণ লোকে সামান্য সামান্য কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্যও ইহার ব্যবহার করিতে পারিবে। অল্প-দিনের মধ্যেই ডাকের চিটীর মত গৃহে গৃহে ইহার ব্যবহার দেখা যাইবে।

কোন সংবাদ পত্র ইহার ভাবি অশেষ শুভফলনিচয়ের মধ্যে একটী এইরূপ ফল আশা করিয়াছেন যে ভবিষ্য বিলাসী-গণ মেঘ, বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝনার মধ্যে গৃহাবদ্ধ হইয়াও আলবোলা টানিতে২ একটী টেলিফোন কর্ণে দিয়া রমণীকণ্ঠ-বিনিঃ-সৃত মনোহর সঙ্গীত-সুধা উপভোগ করিতে পারিবেন। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম বিলাসীদিগের অদৃষ্ট তত সুপ্রসন্ন নহে। তাঁহাদের বাসনা-স্রোতের সহিত বৈজ্ঞানিক উন্নতি-স্রোত দৌড়াইতে পারিল না। টেলিফোন যন্ত্রে কাহারও কণ্ঠ-স্বর শুনা যাইবে না। যিনিই কথা কহুন তাহা হইতে একই রূপ স্বর

শ্রুত হইবে। সেটী তাহার নিজের স্বর। স্তরাং সঙ্গীতের রমণী-কণ্ঠস্বর তাঁহাদের কর্ণে উপলব্ধি হইবেনা।

টেলিফোন্ যন্ত্র আর এক দল লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। টেলিফোন্ যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়ার পর কোন সম্বাদ পত্রে লিখিত হয় যে, যে টেলিফোন্ লইয়া ইয়ুরোপে এত আন্দোলন হইতেছে উহা আমাদের ভারতবর্ষে বহুকাল পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। উক্ত সম্বাদ পত্রে বলেন যে সিংহল দ্বীপে এক সময় কিন্নরদের মধ্যে কথোপকথন জন্য দুইটী বাঁশের চোঙ, এক ২ দিক পাতলা চামড়া দিয়া মোড়া, দুই ব্যক্তির নিকট থাকিত। উভয় চোঙের চামড়া এক গাছি সূতা দ্বারা সংযুক্ত ও সূতায় টান্ থাকিত। এরূপ অবস্থায় একজন এক চোঙে মুখ দিয়া কথা কহিলে অপর ব্যক্তি দূরে থাকিয়া অপর চোঙটী কর্ণে দিলে পূর্ব্ব ব্যক্তির কথা শুনিতে পাইত। উক্ত সম্বাদ পত্র বলেন টেলিফোন্ও ঐরূপ। কথাটী নিতান্ত অযথা নহে, কতক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এই সাদৃশ্য হইতে আমাদের একটী কথা মনেপড়িল। আমাদের দেশে যখন প্রথম গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি আইসে [illegible] সাহেব কোন কলেজ পরিদর্শনোপলক্ষে [illegible] একটী ব্যাটারি লইয়া তৎসম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে [illegible] সাহেব কলেজের প্রধান পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'পণ্ডিত মহাশয়! আপনাদের সংস্কৃত শাস্ত্রে এ সকল বিষয়ে কিছু লিখিত আছে কি?' পণ্ডিত মহাশয় তদুত্তরে বলিলেন থাক্‌বেনাকেন? উহার চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে (যথা) তড়িৎ সৌদামিনী বিদ্যুৎ চঞ্চলা চপলাপিচ'। ফলতঃ পণ্ডিত মহাশয় ভাবিলেন অমরকোষই তড়িত্তের তন্ন২ মীমাংসা করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সংবাদ পত্রের মীমাংসাও এইরূপ। এই দলের লোক একটী মহৎ উদ্দেশ্যের অপব্যবহার জন্য ভ্রান্ত ও অন্ধ। অতীতের গৌরব তাঁহাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু অতীত গৌরব তাঁহাদের চিত্ত এতদূর অধিকার করিয়া ফেলে যে তাঁহারা বর্ত্তমানে অন্ধও বর্ত্তমানের গৌরব করিতে অক্ষম হন। বর্ত্তমানের প্রতি উপেক্ষা করিয়া কোন জাতি উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারে না। যে টেলিফোন যন্ত্র সভ্য সমাজে, বণিক সমাজে একটী নব যুগের আবির্ভাব করিল, যাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইয়ুরোপ, আমেরিকা একাগ্র হইয়া লাগিয়াছে সে সম্বন্ধে তাঁহারা বলিলেন 'নূতন কি আবিষ্কার হইল, ইহা ত পূর্ব্বে ছিল'।

আমরা পূর্ব্বোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত নহি। তাই বলিয়া আমরা অতীত-গৌরবের বিরোধী নহি। কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে জীবন্ত ও জাগ্রত উৎসাহের অত্যন্ত পক্ষপাতী। আমরা বলি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হয়ত টেলিফোন আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু আমরাত জানিতাম না। এক্ষণে জানিলাম; উহা হইতে বহুদূর উপকার লইতে পারি নাই। ফলতঃ আমরা এই যন্ত্রকে অশেষ [illegible] সূত্র বলিয়া

মনে করিতেছি। এবং যিনি ইহার আবিষ্কর্ত্তা যাঁহার সুন্দর কল্পনা ইহাঁর প্রসূতি এবং যাঁহার অধ্যবসায় ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে তিনি আমাদের ধন্যবাদের এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র।

টেলিফোন যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা একজন আমেরিকা বাসী। ইহাঁর নাম বেল সাহেব। এই যন্ত্রের নির্ম্মাণ ও কার্য্য প্রণালী বিজ্ঞানতত্ত্ববিদ্‌দিগের পক্ষে অতি সুন্দর ও পরিপাটি বলিয়া বোধ হইবে। সাধারণ লোকে ও উহার মূল-তত্ত্বগুলি অনুধাবন করিতে পারেন।

যন্ত্রটি এইরূপ। একটী চোঙের মত কাষ্ঠের ফ্রেমের মুখের একটু নিম্নে একখানি বৃত্তাকার লৌহপাত পরিধির দ্বারা ফ্রেমে সংলগ্ন ও তন্নিম্নে একখানি চুম্বক ও তাহাতে জড়ান তারের সন্নিবেশ। ইহা ভিন্ন যন্ত্রে আর কিছু নাই। টেলিগ্রাফের ব্যাটারী বা নিদর্শকের (indicator) সহিত ইহার সম্পর্ক ও নাই। যেখানে কথা কহিবে সেখানে এইরূপ একটী যন্ত্র ও যেখানে শুনিবে সেখানে অপর একটী থাকিবে। টেলিগ্রাফের মত উভয় যন্ত্র তার-সংযুক্ত থাকিবে। এক্ষণে দেখা যাউক উহার ক্রিয়া প্রণালী কিরূপ।

পূর্ব্বে যে বাঁশের চোঙের মুখ চর্ম্মাবৃত করিয়া কথোপকথনের কথা বলিয়াছি কলিকাতায় অনেকে তাহা লইয়া অনেকে আমোদ করিয়া থাকে। একজন একটী উক্তরূপ বাঁশের চোঙ্গে মুখ দিয়া কথা কয়, অপর জন দ্বিতীয় চোঙ্গে কর্ণ দিয়া উক্ত কথা শুনে। উভয় চোঙ্গের মুখস্থ চর্ম্ম পরস্পর সূত্র দ্বারা সংযুক্ত ও সেই সূত্রে টান্ থাকা চাই। এস্থলে কথা সঞ্চালন নিম্ন-লিখিতরূপে হয়। শব্দ সকল কম্পন মাত্র। সেতারের একটী তার কাঁপাইয়া দাও অমনি শব্দ হইবে। বাক্য শব্দ বিশেষ অর্থাৎ বায়ুর এক রূপ বিশেষ কম্পন। মানব-কণ্ঠস্থ এক সূক্ষ্ম সচির পাতলা চর্ম্মের ভিতর দিয়া শ্বাসনালীস্থ বায়ু সবেগে নির্গত হইলে উক্ত চর্ম্মাবরণ কম্পিত হইতে থাকে। সেই কম্পন বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া কর্ণপটহে যাইবা মাত্র কর্ণপটহ ও কম্পিত হয়। কর্ণপটহের কম্পন শ্রুতি শিরার দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইলে বাক্য শ্রুত হয়। এক্ষণে বিবেচনা কর একজন একটী চোঙ্গ মুখে দিয়া কথা কহিবা মাত্র চোঙ্গের মধ্যস্থ বায়ু কম্পিত হইল, ঐ বায়ু হইতে চোঙ্গের অপর মুখস্থ চর্ম্মাবরণ ও কম্পিত হইল। এই চর্ম্মাবরণের কম্পন হইতে তৎসংযুক্ত সূতায় একবার টান পড়িতে লাগিল এক বার ঢিল পড়িতে লাগিল। এবং সূতার টান ও ঢিল হইতে অপর চোঙ্গের মুখস্থ চর্ম্ম কম্পিত হইতে লাগিল। সুতরাং মূল কণ্ঠস্বরের কম্পন প্রথম চর্ম্মাবরণ ও সুতা দ্বারা চালিত হইয়া দ্বিতীয় চর্ম্মাবরণের কম্পনে পরিণত হইল। এবং শেষোক্ত কম্পন বায়ুর দ্বারা অপরের কর্ণপটহে চালিত হইয়া তৎকর্তৃক শ্রুত হইল।

উক্ত বাঁশের চোঙ্গের কলের সহিত টেলিফোনের সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত যে উভ-

সেই কণ্ঠস্বরের কম্পন, প্রেরক আস্থানস্থ (sending station) এক পাতলাপাত হইতে প্রাপক আস্থানস্থ (receiving station) অপর এক পাতলা পাতে চালিত হইতেছে। কেবল একে চর্ম্মপাত, অপরে লৌহ পাত ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু যাহার ভিতর দিয়া চালিত হইতেছে সেটী উভয়ে বিভিন্ন। একটীতে সূতার টানে চালিত হইতেছে, কিন্তু অপরটিতে তড়িৎ দ্বারা। যে কম্পনে শব্দ হয়, তাহাতে অধিক সূতা টানিতে পারেনা সুতরাং সূতার টানে অধিক দূরের কথা শুনা যায়না।

টেলিফোন যন্ত্রে যে বল প্রযুক্ত হয় সে তড়িতের ক্ষমতার বিষয় আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যে তড়িৎ-বলে এক লৌহপাতের কম্পন অপর লৌহ পাতে চালিত হয় সে তড়িতের উৎপত্তি কোথা হইতে হয়। এই খানেই আবিষ্কর্ত্তার বুদ্ধি ও কম্পনার কার্য্য। ইহা বুঝিবার পূর্ব্বে চুম্বক সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক।

চুম্বক। চুম্বক কি? সাধারণ কথায় ইহার উত্তর এই যে, ইহা এক খণ্ড লৌহ দণ্ড যাহার অপর লৌহ আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে। পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখা গিয়াছে যে একটী তার স্ক্রুপের মত জড়াইয়া তাহার ভিতর দিয়া তড়িৎ-স্রোত চালাইলে ঐ তারের স্ক্রুপটী এক খণ্ড চুম্বকের সকল গুণ প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার মত লৌহ আকর্ষণ প্রভৃতি সকল কার্য্য করিবে।

আঁপের সাহেবের মত। উক্ত তারের স্ক্রুপের উপর নানা রূপ পরীক্ষা করিয়া আঁপের সাহেব এই স্থির করিয়াছেন যে চুম্বকের চতুর্দ্দিকেও বৃত্তাকারে তড়িৎ-স্রোত ঘুরে। প্রত্যেক পদার্থে উহার অণুর সকলে চতুর্দ্দিকে তড়িৎ-স্রোত থাকে। চুম্বক-দণ্ডে সেই প্রত্যেক আণবিক তড়িৎ-স্রোতের এরূপ সংস্থান হয় যে তাহাদের সমবেত কার্য্যের ফলে চুম্বক দণ্ডের চতুঃপার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত তারের স্ক্রুপের মত বৃত্তাকারে তড়িৎ-স্রোত ঘুরিতে থাকে।

চুম্বকের পূর্ব্বোক্ত রূপ প্রকৃতি নির্ণীত হইলে তড়িৎ-সক্রামণের সকল কার্য্য চুম্বক দ্বারা পরীক্ষিত হয়। এবং তাহা হইতে ইহা জানা গিয়াছে যে একটী চুম্বকের চতুর্দ্দিকে তার জড়াইয়া আর একটী চুম্বক সহসা তাহার নিকট আনিলে বা তাহার নিকট হইতে দূরে লইয়া গেলে উক্ত তারে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়। গ্যাল ভ্যানিক ব্যাটারিতে যে তড়িৎ-স্রোত চালিত হয় তাহা এই কারণে।

এক্ষণে দেখা যাউক টেলিফোন যন্ত্র কি? এক খানি লৌহ পাত ও তাহার অনতি নিম্নে এক খানি চুম্বক ও তাহাতে তার জড়ান। লৌহ পাত খানি চুম্বকের নিকট বলিয়া চৌম্বক ধর্ম্ম-প্রাপ্ত। এরূপ স্থলে একজন লৌহ পাতের উপর কথা কহিলে কি ফল হইবে? কণ্ঠস্বরে বায়ু কম্পিত ও তৎসহে লৌহ পাত কম্পিত হইবে অর্থাৎ লৌহ পাত এক বার চুম্বকের নিকটে যাইবে আবার তাহা হইতে সরিয়া যাইবে। কিন্তু লৌহপাত চৌম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত

সুতরাং এক খানি চুম্বকেও যে কার্য্য হয় ইহাতে ও তাহা হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি এক খানি চুম্বক সহসা অপর এক খানি তার জড়িত চুম্বকের নিকট আসিলে বা নিকট হইতে দূরে গেলে তারে তড়িৎস্রোত সংক্রামিত ও চালিত হয়। কিন্তু নিকটে আসিলে তড়িৎ-স্রোত যে দিকে যায় দূরে গেলে তাহার বিপরীত দিকে যায়। সুতরাং কথা কহায় যেমন লৌহ পাত কম্পিত হইবে অর্থাৎ লৌহ পাত একবার চুম্বকের নিকট যাইবে আবার তাহা হইতে দূরে আসিবে, অমনি চুম্বক জড়িত তারে তড়িৎ-স্রোত ক্রমান্বয়ে এক বার একদিকে আর বারে তাহার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইবে।

এই সংক্রামণোৎপন্ন উভয় বিধ তড়িৎ-স্রোত তারের দ্বারা অপর একটী টেলিফোন যন্ত্রে (সেটী যতদূরবর্ত্তী দেশেই থাকুক না কেন) চালিত হইলে তড়িতাকর্ষণের নিয়মানুসারে শেষোক্ত যন্ত্রের লৌহপাত একবার আকৃষ্ট হইবে আরবার বিক্ষিপ্ত হইবে। অর্থাৎ সে লৌহ পাত ও কম্পিত হইবে।

সংক্ষেপ। সুতরাং সংক্ষেপতঃ টেলিফোনের ক্রিয়া প্রণালী এই। একজন কথা কহিল—একটী লৌহপাত কাঁপিল, ঐ কম্পনে চুম্বকোপরিস্থ তারে তড়িৎস্রোত সংক্রামিত হইল, এই তড়িৎ-স্রোত চালিত হইয়া দূরবর্ত্তী স্থানের অপর একটী লৌহপাত কাঁপাইল। ইহা বলা বাহুল্য যে দ্বিতীয় টেলিফোন যন্ত্রের লৌহপাত প্রথমটীর লৌহ পাতের ঠিক অনুরূপ কম্পিত হইল। একই রূপ কম্পনে একই রূপ শব্দের উৎপত্তি হয়। সুতরাং প্রথম লৌহপাতের নিকট যে শব্দ উচ্চারিত হইল দ্বিতীয়টীর নিকট অবিকল সেই শব্দ শ্রুত হইল।

প্রচলিত টেলিগ্রাফিতে একটী ক্লকের (clock) মত বাক্সর ডাইলে (dial) একটী দিগ্‌দর্শনের কাঁটা থাকে। দিগ্‌দর্শন-শলাকা চুম্বক ভিন্ন আর কিছুই নয় কেবল বিশেষ আকারে গঠিত।

ঐ বাক্সর ভিতরে কতকগুলি তার জড়ান থাকে। উহাতে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হইলে ডাইলের উপরিস্থ কাঁটা স্রোতের দিক্ অনুসারে দক্ষিণে বা বামে বিক্ষিপ্ত হয়। টেলিগ্রাফ বাক্সের নিম্নে একটী হেণ্ডেল থাকে তাহা নাড়িয়া ঐ তড়িৎ-স্রোত চালিত হয়। হেণ্ডেলটী ডাইন দিকে নাড়িলে কাঁটা ডাইনে ও উহা বামে নাড়িলে কাঁটা বামে যায়। কতকগুলি সঙ্কেত থাকে যাহাতে ঐ কাঁটার এদিক্ ওদিক যাওয়া হইতে কথা বুঝা যায়। মনে কর কাঁটা এক বার ডাইনে ও এক বার বামে গেলে 'ক' হয়। একবার ডাইনেও এক বার বামে গেলে 'খ' হয়। এইরূপ সঙ্কেত গুলি জানিয়া কাঁটা দেখিয়া অক্ষর গুলি পর২ লিখিয়া গেলেই খবর জানা যায়।

টেলিগ্রাফিতে যে তড়িৎ স্রোতে কল চলে অর্থাৎ কাঁটা ফিরে তাহা রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন। এই রাসায়নিক ক্রিয়ায় দস্তা, সলফিউরিক এসিড প্রভৃতি দ্রব্যের

প্রয়োজন। কলে যত কাজ হয় এই গুলিরও তত ধ্বংস হয়। সুতরাং এই সকল খরচ যোগাইতে হয় বলিয়া টেলিগ্রাফিতে সংবাদ পাঠান সুলভ হইতে পারে না।

টেলিফোন যন্ত্রে যে তড়িৎ-স্রোত কল চালায় তাহা প্রাকৃতিক তড়িৎ স্রোত-বিশিষ্ট চুম্বক হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ সংক্রামিত। ইহাতে কোন ব্যয় নাই। ব্যয় কেবল যন্ত্র প্রস্তুত করিতে, লোক জন রাখিতে।

চুম্বকের প্রকৃতি জানার পর হইতে উহার প্রকৃতি-জাত তড়িৎ-স্রোত কাজে লাগাইতে যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টা অনেক বিষয়ে সফল হইয়াছে। গ্যালভ্যানিক ব্যাটারী প্রভৃতি এই চেষ্টার ফল। এই ব্যাটারী চালাইতে কোন ব্যয় নাই। এক বার ক্রয় করিতে পারিলেই হইল ইহাতে যেমন একটী চাকা ঘুরাইতে হয় টেলিফোনে তাহাও করিতে হয় না। শুদ্ধ কথা কহার যে পরিশ্রম কল চালাইতে তাহাই প্রয়োজন।

টেলিগ্রাফ আপিসে এখন হইতে একটী নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি হইবে। কতক গুলি লোক প্রয়োজন হইবে যাহারা ...চা তার ...যে সকল খবর পাঠাইবে সেই তার দিয়া তড়িৎ...ফোনের সম্মুখে গিয়া চেঁচাইয়া ...পটী এক খণ্ড ...সকল লোক প্রকৃত কথা হইবে এবং তাহা... এবং ইহারা কথা প্রভৃতি সকল কার্য্য... গুণিয়া পয়সা লইবে।

...গের সাহেবের ...নিক ব্যাটারি প্রভৃতি অনেক চৌম্বক তাড়িত (Magneto electric) যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে বটে। কিন্তু উহা হইতে টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে এই দুইটী কেহ এতদিন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। একটীর অভাব পূর্ণ হইল। অপরটী ও শীঘ্র হইবে আমাদের এইরূপ আশা ও ইচ্ছা।

বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া কলাপ মানবের উপকারে লাগাইতে হইলে ব্যয়ের বিষয়টী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হয়। ব্যয়ের যতই লাঘব হইবে ততই এ সকল মানবের অধিক উপকারে লাগিবে। কোন ২ স্থলে ব্যয়ের বাহুল্য বশতঃ অতি সুন্দর ২ আবিষ্ক্রিয়া সকল ও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া থাকে। তাড়িত রেলওয়ে এইরূপ একটী অব্যবহার্য্য আবিষ্ক্রিয়া।

বৈজ্ঞানিকেরা তড়িতের সাহায্যে রেলওয়ের গাড়ি চালাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের পরীক্ষণাগারের (laboratory) টেবিলের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মাত্র ইহার বেশী নয়। কারণ তাহাতে এত ব্যয় হয় যে তাহা বহ্বায়তনে করা অসম্ভব। তাড়িত রেলওয়ে যে সকলেরই প্রার্থনীয় ইহা বলা বাহুল্য। আমরা যত পাই ততই চাই। পূর্ব্বে কাশী যাইতে এক মাস লাগিত রেলওয়ে হইয়া যখন সেই পথ এক দিনের হইল তখন লোকের আর আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু এখন সমস্ত দিন রাত্রি গাড়িতে থাকিয়া কাশী যাইতে কষ্ট বোধ হয়। ইচ্ছা হয় গাড়ি আরও বেগে চলুক। তা-

ড়িত রেলওয়ে হইলে আমাদের সেই ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হইবে। এক ঘণ্টায় হয়ত কাশী যাইতে পারিব।

যদি টেলিফোনের মত চৌম্বক তড়িৎ হইতে রেলওয়ের গাড়ি চালান সম্ভব হয় তাহা হইলেই আমাদের পূর্ব্বোক্ত আশা সফল হইবার সম্ভাবনা। অধুনা অনেক বিজ্ঞান-বিদের মস্তিষ্ক এই চিন্তায় বিঘূর্ণিত হইতেছে, অনেকের কল্পনা এই চিন্তা-সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস অচিরাৎ এই সকল মস্তিষ্ক হইতে আমাদের প্রার্থিতফল প্রসূত হইবে।

শ্রীমঃ

সামাজিক নির্য্যাতন।

আজ কাল ব্রাহ্ম-সমাজ যে আন্দোলনে আমূল আলোড়িত হইতেছে সেই আন্দোলনে সমস্ত শিক্ষিত হিন্দুসমাজও কিয়ৎ পরিমাণে আন্দোলিত হইয়াছে। এইরূপ আমূল আন্দোলন আমাদিগের মতে অশুভ লক্ষণ নহে, বরং ভারতের ভাবী উন্নতির অগ্র দূত। হিন্দুরাও যে ব্রাহ্মদিগের সুখে দুঃখে ও সামান্য গৃহকার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিখিতেছেন, ইহাও একটী বিশেষ শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ আকস্মিক ভীষণ বিপ্লবের কারণ আমাদিগের চক্ষে অতি লঘু। ব্যক্তিবিশেষ ব্যক্তিবিশেষের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন। বিবাহ সর্ব্ব-বাদি-সম্মত হইল না। কতক ব্রাহ্ম অনুমোদন করিলেন, অনেকে করিলেন না। স্বপক্ষে হউক বিপক্ষে হউক প্রকাশ্যে হউক বা অপ্রকাশ্য লিপিতে হউক—ব্রাহ্মগণ আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। আমাদিগের মতে এই স্থানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম হওয়া উচিত ছিল। ব্যক্তিগত কার্য্য লইয়া যদি সমাজ সতত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে সমাজের উন্নতি ব্যাহত ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব তিরোহিত হইবে।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যে সামাজিক উন্নতির মূল সুবিখ্যাত দার্শনিক জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল তদীয় 'স্বাধীনতা' নামক পুস্তকে তাহা বিশেষ প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। সে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা এ প্রস্তাবের কার্য্য নহে। সুতরাং এক্ষণে আমরা কেবল এস্থলে সেই সিদ্ধান্তটী মূলভিত্তি স্বরূপ ধরিয়া লইব। একত্র-সম্বদ্ধ ব্যক্তিগণের সমষ্টির নাম সমাজ যদি সেই ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের চিন্তা ও কার্য্যে সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতা না থাকে তাহা হইলে ব্যক্তিগত কার্য্যকারী ও চিন্তাবিধায়িনী স্বাধীনতার সহিত সামাজিক কার্য্যকরী ও চিন্তাবিধায়িনী স্বাধীনভাবও লোপ হইবে। চিন্তা ও কার্য্যে সামাজিক স্বাধীনতা না থাকিলে

যে সমাজ এক পাও অগ্রসর হইতে পারেনা, তাহা বোধ হয় যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবেনা; ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মধ্যে সর্ব্বত: পরিগৃহীত হইয়াছে। এই সামাজিক স্বাধীনতা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সমূহের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ইহা বলা বাহুল্য যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ব্যতীত সামাজিক স্বাধীনতার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অসম্ভব। অতএব ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে সামাজিক স্বাধীনতা প্রার্থনীয় হইলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অগ্রে প্রার্থনীয়।

এক্ষণে দেখা যাউক এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিরূপে সুরক্ষিত হইতে পারে। যতক্ষণ না অপরের সুখ ও অপরের স্বাধীনতার সহিত এক জনের চিন্তা ও কার্য্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, ততক্ষণ তাহাকে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে কার্য্য করিতে ও চিন্তা করিতে দিলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে পরিরক্ষিত হইতে পারে। আমি যাহা ভাল বুঝিলাম তাহা লিখিলাম বা কার্য্যে পরিণত করিলাম, তাহাতে অপরের সুখ বা স্বাধীনতার কোনও ব্যাঘাত জন্মিলনা। তথাপি তাহাতে অপরের আপত্তি কেন হইবে? সমাজের কি অধিকার আছে যে এই সকল বিষয়ে আমার স্বাধীনতা হরণ করেন? তবে সমাজ বলবান্ আমি দুর্ব্বল। সমাজ শক্তিসমষ্টি আমি এক শক্তির আধার। আমি সেই এক সূক্ষ্ম শক্তি লইয়া, সেই শক্তিরাশির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে অক্ষম। এই আমার অপরাধ! আমি দুর্ব্বল তাই আমি অপরাধী! দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার চিরপ্রসিদ্ধ। সেই চিররূঢ় নিয়মের অধীনে বলবান্ সমাজ আজ বলহীন অধীনকে এরূপ নির্য্যাতন করিতেছেন। আমি কি করিয়াছি? আমি বলিয়াছিলাম কন্যার অন্যূন চতুর্দ্দশ বৎসরে এবং পাত্রের অন্যূন অষ্টাদশ বর্ষে বিবাহ হওয়া উচিত। আমি এখনও তাহাই বলি। কিন্তু তাই বলিয়া কি যে শৃঙ্খল শক করিয়া এক বার পায় পরিয়াছি, তাহা কি ইচ্ছা হইলেও এ জন্মের মত আর খুলিতে পারিব না? ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া শৃঙ্খল পায় পরিয়াছিলাম, ইচ্ছা হইল একবার খুলিলাম: ইচ্ছা হইলে হয় ত আবার ইহা পরিতে পারি। যতক্ষণ অপরের সুখ ও স্বাধীনতার প্রতিঘাত না করিতেছি, ততক্ষণ অপরের নির্য্যাতন করিবার অধিকার কি? তবে আমি সুন্দর বলিয়া সেই শৃঙ্খল বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে পরিতে বলি। ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা তাহা পরিয়াছেন, আমি ত স্বহস্তে তাঁহাদিগকে তাহা পরাইতে যাই নাই। আমার ভাল লাগিয়াছিল, তাঁহাদিগকে পরিতে বলিয়াছিলাম; তাঁহাদিগের ভাল লাগিয়াছিল তাঁহারাও পরিয়াছেন। আমার ইচ্ছা হইল আমি একবার খুলিলাম, তাঁহাদিগের ইচ্ছা হয় তাঁহারাও খুলিতে পারেন। যদি তাঁহারা এমন করিয়া পরিয়া থাকেন যে সে শৃঙ্খল খুলিবার আর আশা নাই, সে দোষ

তাঁহাদিগের ; সে দায়িত্ব তাঁহারা নিজ নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে আমার উপর কোপ কেন? আমি বলিলাম তোমাদিগের এইটী করা উচিত, আমার ভাল বলিয়া বোধ হইল আমি বলিলাম, ভাল কি না সে বিচার তোমরা করিবে, সে পছন্দ তোমাদিগের হাতে। তোমরা কেন আমি যাহাই বলিব তাহাই করিবে। আমি যাহা ভাল বলিলাম তাহা যদি তোমাদিগেরও ভাল লাগিল, তোমরা তাহা করিতে পার। কিন্তু দুই দিন পরে যদি তাহা মন্দ বলিয়া তোমাদের বোধ হয়, আমাকে গালাগালি দিও না, নিজ বুদ্ধিকে তিরস্কার করিও। আমি যাহা ভাল বলিয়া স্থাপন করিয়াছিলাম কার্য্যতঃ তাহা করিতে অক্ষম হইলাম। তজ্জন্য আমার উপর খড়্গহস্ত হইও না কারণ আমি ঘটনার দাস — হয় ত ইচ্ছা থাকিতেও, যাহা ভাল বলিয়া জানি, অবস্থা-বৈষম্যে তাহা করিতে পারিলাম না। ইহাতে তোমার কিছু অনিষ্ট হইতেছে না, তুমি রাগ কর কেন? অসৎ দৃষ্টান্ত? ইহার মীমাংসা হওয়া দুর্ঘট। তুমি বলিবে 'তুমি যাহা ভাল বলিয়া জান, তাহার প্রতিকূলাচরণ করিলে, সকলে তোমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিবে'। আমি বলিব 'আমি যে অবস্থায় পড়িয়া—যাহা ভাল বলিয়া জানি—তাহার প্রতিকূলাচরণ করিলাম, ঠিক সেই অবস্থায় পড়িয়া যদি আর এক জনও ঠিক্ সেই কাজ করে, আমি তাহাকে দূষিব না'। তুমি বলিবে 'কোন স্থানেই নিয়মের ব্যভিচার হওয়া উচিত নয়'। আমি বলিব 'যেখানেই নিয়ম—সেইখানেই ব্যভিচারের সম্ভাবনা - কারণ মানুষ ঘটনার দাস, মানুষ অভ্রান্ত নহে, মানুষ সম্পূর্ণ সূক্ষ্মদর্শী নয়, সুতরাং ভবিষ্যতে ব্যভিচারের সম্ভাবনা নাই এমন করিয়া কোন নিয়ম নির্দ্ধারণে অক্ষম'। আমার একমতাবলম্বী কোন অবোধ ব্যক্তি আমার মতন বিশেষ অবস্থায় না পড়িয়াও পাছে আমার মত কার্য্য করে—পাছে আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে—এই ভাবনায় যদি আমাকে অহরহ কাটাইতে হয় তাহা হইলে আমার মত দুঃখী জগতে আর নাই। আমার কি উদ্দেশে কি অবস্থায় পড়িয়া একটী কাজ করিলাম, তাহা সকলের জানিবার সুবিধা নাই, সকলের নিকট আমি হয়ত তাহা বলিতেও ইচ্ছা করি না। আর একজন অবোধ হয়ত উদ্দেশ্য ও অবস্থা না বুঝিয়া শুদ্ধ আমি করিয়াছি বলিয়া—বিভিন্ন অবস্থায়, বিনা উদ্দেশ্যে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে-ঠিক্ সেইরূপ একটী কায করে, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য কি আমি জবাবদিহি করিব? তাহার অজ্ঞতা-অপরাধের দণ্ড কি সমাজ আমার মস্তকে অর্পণ করিবেন? সমাজ এরূপ উৎপীড়ন করেন ত আমি সামাজিক জীব নহি। আমি সামাজিক সুখের জন্য এরূপ অধীনতা স্বীকার করিতে বা এরূপ অকারণ অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি।

আমি আজ সমাজকে বলিলাম এই কাযটী ভাল এই কাযটী মন্দ। আজ আমার মতে

এই কাযটী ভাল বটে, কিন্তু সেই মত যে আমার চির দিন থাকিবে তাহার প্রমাণ কি? জগতে সকলই পরিবর্ত্তনশীল। দিন যাইতেছে, আমার শরীর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যখন শরীর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, প্রকৃতির সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন মন অপরিবর্ত্তিত রহিবে, হৃদয়-ভাব একই ভাবে থাকিবে, তাহার প্রমাণ কি? দশবৎসর পূর্ব্বে আমি যাহা সত্যের আদর্শ বলিয়া জানিতাম, আজ, হয়ত আমার নিকট তাহা সত্যের আদর্শ বলিয়া বোধ না হইতে পারে। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যাহা লিখিয়াছি কি বলিয়াছি, মত পরিবর্ত্তন হইলেও শুদ্ধ অবিসম্বাদের (consistency) অনুরোধে, আমাকে যদি চিরজীবন তাহার দাস হইয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে আমার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি নিজের জন্য যে গণ্ডী কাটিয়াছিলাম, যাহা উল্লঙ্ঘন করা তখন পাপ মনে করিতাম, সে গণ্ডী ছেদন করা আমার মতে এখন পুণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

আর সত্য কি, পুণ্য কি? আমরা হিতবাদীদিগের সহিত বলি—জগৎই সত্যস্বরূপ, এবং সেই জগতের মঙ্গল সাধন করাই পুণ্য। জগৎ সত্যস্বরূপ, এবং যে নিয়মে সেই জগৎ পরিচালিত হইতেছে—সে নিয়মাবলীও সত্যরূপিণী। 'জগৎ' শব্দ আমরা এখানে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ—উভয় জগৎই গ্রহণ করিলাম। আমরা বলিয়াছি সেই জগতের নিয়মাবলীও সত্যরূপিণী। পৃথিবী ঘুরিতেছে—যে নিয়মে পৃথিবী ঘুরিতেছে, তাহা একটী অনুল্লঙ্ঘনীয় সত্য; তাহার অপলাপ অসম্ভব। কিন্তু সেই নিয়মটী কি, কিসের ফল, তদ্বিষয়ে মত ভেদ হইতে পারে; সেই মত সত্য হইতেও পারে নাও পারে। আজ যাহা মাধ্যাকর্ষণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, কাল আর একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি হয় ত প্রমাণ করিতে পারেন ইহা অন্য কিছু। যাহা জগতের মঙ্গল-সাধক তাহাই পুণ্য—এবিষয়ে মত ভেদ নাই। কিন্তু কি উপায়ে সেই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে। যাহাতে শরীর সবল হয় তাহা করা উচিত, করিলে পুণ্য, না করিলে পাপ। কিন্তু কিসে শরীর সবল হয়, তদ্বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে। কেহ বলিবেন মাংস খাইলে শরীর সবল হয়, কেহ বলিবেন উদ্ভিদ্ খাইলে শরীর সবল হয়, কেহ বা শরীরের পুষ্টিসাধনে উভয়েরই উপযোগিতা স্বীকার করিবেন। কেহ বলিবেন বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিলেই শরীর আপনি পুষ্ট হইবে, মাংস না খাইলেও চলিবে। কেহ বা বলিবেন বাল্যবিবাহও রহিত করা চাই, মাংস খাওয়াও চাই। আবার কতক লোক হয় ত বলিবেন অধিক বয়সের মেয়ের সন্তান দুর্ব্বল হয়। সুতরাং এ সকল বিষয়ে নানা মুনির নানা মত; একমাত্র বিশ্বব্যাপিনী মীমাংসা হওয়া দুর্ঘট। চিকিৎসকদিগেরও এবিষয়ে মতের সম্পূর্ণ একতা নাই। এ সকল বিষয়ে

সত্যাসত্য ও পাপ পুণ্য নির্ণয় হওয়া দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং এ সকল বিষয়ে বিশ্বব্যাপী নিয়ম সংস্থাপন না করিয়া ব্যক্তিমাত্রেরই যুক্তি ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের উপর সমাজের নির্ভর করা উচিত। যেখানে সমাজ তাহা না করিয়া, ১৯ জনের মধ্যে ১০ জনের মত লইয়া আর ৯ জনকে অপর ১০ জন কর্তৃক গৃহীত নিয়মের অধীনে আনিতে চেষ্টা করেন, সেই খানেই আমরা ব্যক্তির উপর সমাজের যথেচ্ছাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। ১০ জনের সুবিধার জন্য, দশ জনের সুখোৎপাদনের জন্য, সমাজ ৯ জনের অসুবিধা—৯ জনের অসুখ—উৎপাদন করিলেন। এ পক্ষপাতিতা সমাজের পক্ষে সাজে না। সমাজ জননী, সমাজের ক্রোড়ে সকলই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং সমাজকে সকলেরই মুখের দিকে তাকাইতে হইবে, সকলেরই সুবিধা ও সুখ দেখিতে হইবে। যদি সেই উনিশ জন মাত্রে সমাজ গঠিত হয়, তাহা হইলে সমাজকে সেই উনিশ জনের প্রত্যেকেরই মুখের দিকে তাকাইতে হইবে; প্রত্যেকের সুবিধা সুখ উৎপাদন করিতে হইবে। যদি একজনের প্রতিও অবিচার করা হয়, তাহা হইলেও সে সমাজ দূষিত হইল। সেই একজনের পক্ষেও সমাজ বিমাতা, বিমাতার ক্রোড়ে বাস করা অপেক্ষা সেই ব্যক্তির মরুশয্যা বা বনবাস সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ! আমার অস্তিত্ব আমার জন্য, কিন্তু সমাজের অস্তিত্ব আমার (ব্যক্তিমাত্রের) জন্য। আমার সুবিধার জন্য সমাজ গঠিত হইয়াছে, সমাজের সুবিধার জন্য আমি গঠিত হই নাই। সুতরাং সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ভাবিবে, প্রত্যেক ব্যক্তির সুখোৎপাদন করিতে চেষ্টা করিবে। না হইলে সমাজের অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই। অল্পের নিমিত্ত বহুকে পরিত্যাগ করাও সমাজের পক্ষে যেমন অত্যাচার, আবার বহুর নিমিত্ত অল্পকে পরিত্যাগ করাও সেইরূপ অত্যাচার। প্রভেদ এই যে বহুর নিমিত্ত অল্পকে পরিত্যাগ করিলে সমাজকে ধন্য বাদ দিবার জন্য অধিক লোক থাকিবে। কিন্তু অল্পের নিমিত্ত বহুকে পরিত্যাগ করিলে, সমাজের নির্যাতন হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। আবার সেই অল্প যদি প্রবল হয় তাহা হইলে সমাজের কোন আশঙ্কা নাই। যাহা হউক এই উভয়বিধ অত্যাচারকেই আমরা সামাজিক পীড়া মনে করি। এই পীড়া আরোগ্য না হইলে সমাজের মৃত্যুর—পতনের—সবিশেষ সম্ভাবনা। এই সামাজিক পীড়াই সামাজিক বিপ্লবের মূল। পুরাকালে ব্রাহ্মণগণের শূদ্রদিগের উপর—এবং অধুনা ইংরেজদিগের ভারতবাসিদিগের উপর অত্যাচার, বহুর উপর অল্পের আধিপত্যের ফল। ব্রাহ্মণ শূদ্র স্থলে এই অত্যাচার রাজনৈতিক হইতে সামাজিক আকারে পরিণত হইয়া হিন্দু সমাজের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে; শ্বেত কৃষ্ণ স্থলে ইহা অদ্যাপি সামাজিক আকার ধারণ করে নাই—এই জন্যই আমরা ব্রিটিশ গবর্ণ

গবর্ণমেণ্টের অধীনে সামাজিক সম্বন্ধে পরম সুখে আছে; এরূপ সামাজিক স্বাধীনতা আমরা আর কখন কোন রাজার অধীনে ভোগ করি নাই; কোন দেশের প্রজা কোন রাজার অধীনে কখন এরূপ ভোগ করিয়াছে কি না জানি না। যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব ভারতে কোন কারণে প্রার্থনীয় হয়, তাহা ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্য। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি। রাজহস্তক্ষেপ না থাকায় হিন্দুসমাজও দিন দিন উদার ভাব ধারণ করিতেছে। ব্যক্তিগত কার্য্য ও চিন্তার উপর আজ কাল ইহা অল্পই হস্তক্ষেপ করিতেছে।

এক দিকে যেমন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও হিন্দুসমাজ ব্যক্তিগত চিন্তা ও কার্য্য-বিষয়িণী স্বাধীনতার অনুকূল, ভারতে অতর্কিত ভাবে আর একটী সমাজ উত্থিত হইতেছে যাহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার তেমনই প্রতিকূল। একটী শৃঙ্খল ভাঙ্গিতেছে, আর একটী শৃঙ্খল নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে। হিন্দুরা যেমন অন্নপ্রাশন নামকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহ মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের সমস্ত ঘটনাকে কঠোর ধর্ম্মশাসনের অধীনে আনিয়া আপনাদিগের মৃত্যুর পথ আপনারাই প্রস্তুত করিয়াছিলেন—লূতাতন্তুর ন্যায় আপনাদের জালের অভ্যন্তরে আপনারাই নিহিত হইয়াছিলেন, এই সম্প্রদায়ও সেইরূপ জীবনের সমস্ত ঘটনাকে কঠোর ধর্ম্মশাসনের অধীনে আনিয়া আপনাদিগের মৃত্যুর পথ আপনারাই পরিষ্কৃত করিয়া রাখিতেছেন। সমাজ ও ধর্ম্ম যে দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। ধর্ম্মের ভিত্তি বিশ্বাস, সমাজের ভিত্তি যুক্তি। ধর্ম্ম পরকালের, সমাজ ইহ কালের। ধর্ম্মের ভিত্তি বিশ্বাস স্থিতিশীল, সমাজের ভিত্তি যুক্তি উন্নতিশীল সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল। ভূয়োদর্শনের বৃদ্ধির সহিত যুক্তি শক্তি দিন দিন অধিকতর পরিমার্জ্জিত হইবে, কিন্তু বিশ্বাস যেখানে থাকিবে সেখানে একই ভাবে থাকিবে। বিশ্বাসের বিষয় পরলোক ও ঈশ্বর, দুইই অতীন্দ্রিয়, সুতরাং ভূয়োদর্শনের অধীন নহে। কিন্তু ভূয়োদর্শনই যুক্তির প্রধান আহার্য্য। ভূয়োদর্শন দিন দিন পুষ্টাবয়ব হইবে, সুতরাং যুক্তি-শক্তিও দিন দিন খরতর হইয়া উঠিবে। যুক্তি শক্তির প্রখরতার সহিত সামাজিক নিয়ম সকলও দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইবে। এই পরিবর্ত্তন স্রোত ব্যাহত হইলেই সমাজ সংরুদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় দূষিত হইয়া যাইবে। সুতরাং সামাজিক বিপ্লব অনিবার্য্য, এবং পঙ্কোদ্ধার দুষ্পরিহার্য্য হইবে। ব্রাহ্মসমাজ সামাজিক ঘটনা সকলকে কঠোর ধর্ম্মশাসনের অধীন করিতে গিয়া এই স্রোতের গতি রোধ করিতেছেন। ইহার বিপদ্ তাঁহারা হাতে হাতেই পাইতেছেন ও পাইবেন। ইহার অবশ্যম্ভাবি ফল যে বহুর উপর অল্পের

অত্যাচার বা অন্যের উপর বহুর অত্যাচার—ইহা আমরা দুই একটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিব। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ধর্ম্মের সহিত সামাজিক সংস্কার মিশাইতে অস্বীকৃত হন, তখন বাবু কেশবচন্দ্র সেন নব্য ব্রাহ্মগণের সহিত তাঁহার মতের ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। কেশববাবু বলিলেন যাহার কণ্ঠে পবিত্র ঝুলিবে সে আবার ব্রাহ্ম কিসে? যে অসবর্ণ বিবাহ না করিবে সে বেদিতে বসিবার অযোগ্য। যে যবনান্ন গ্রহণ না করিবে সে অস্পৃশ্য ও অব্রাহ্ম। দেবেন্দ্র বাবু ধর্ম্মবিষয়ে ব্রাহ্ম বটেন, কিন্তু সামাজিক বিষয়ে সম্পূর্ণ হিন্দু। সুতরাং তাঁহার সহিত কেশব বাবুর বনিল না। কেশব বাবু নব্য ব্রাহ্মগণ সঙ্গে করিয়া একটী নূতন উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন, নাম দিলেন কি না ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। ইহার অর্থ এই যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আদিব্রাহ্মগণ অব্রাহ্ম, নূতন ব্রাহ্মেরাই প্রকৃত ব্রাহ্ম। তাঁহাদিগের অপরাধ যে তাঁহারা সামাজিক বিষয় ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত করিতে চাহেন নাই। কেশব বাবু এই নব্য ব্রাহ্মগণের সাহায্যে ও নিজের অসাধারণ সৃষ্টিকরী বুদ্ধি-বলে নব নব সামাজিক নিয়ম গঠিতে বসিলেন। গঠিয়া তাহাদিগকে কঠোর ধর্ম্মশাসনের অধীনে আনিলেন। শাসনপত্র বাহির হইল যে তাঁহার গঠিত সামাজিক নিয়ম সকল যে লঙ্ঘন করিবে সে অব্রাহ্ম হইবে ও ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবে। দুই এক স্থলে শুনিতে পাওয়া যায় যে এই শাসন অক্ষরে অক্ষরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি একটী নিয়ম করিয়াছিলেন যে কন্যা চতুর্দ্দশ বৎসর ও পাত্র অষ্টাদশ বৎসরের নিম্নে বিবাহ করিতে পারিবে না। এই নিয়মের উপর তিনি কঠোর ধর্ম্মশাসন সংস্থাপিত করেন। যে ইহা লঙ্ঘন করিবে তাহাকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে। কিন্তু মানুষ ঘটনার দাস—তিনি স্বয়ং আজ সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নিকট হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, সেই শিক্ষাবলে তাঁহাকেও সিংহাসনচ্যুত করিলেন। এইরূপে অন্যের উপর বহুর ঘোরতর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল। তিনি লূতাতন্তুর ন্যায় নিজকৃত জালের অন্তর্নিহিত হইলেন। তিনি যদি এই কঠোর নিয়ম ... রন্তর ধর্ম্মশাসনের অধীনে না ...নতেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় থাকিত। তাঁহার নিজের কন্যার বিবাহ তিনি দিবেন, তাঁহাতে অপরের একটী কথাও বলিবার অধিকার থাকিত না। তাঁহার এমন সুখের দিনে আজ এমন বিষাদ ঘটিত না। আজ তাঁহার শিষ্যেরা—উন্মত্ত হস্তী যেমন মাহুতকে পদদলিত করে—সেইরূপ তাঁহার অসংখ্য গুণ বিস্মৃত হইয়া কীটের ন্যায় তাঁহাকে পদদলিত করিতে পারিতেন না। তিনি ধর্ম্মসিংহাসনে অটল থাকিতে পারিতেন। তাঁহার এই পতনে কাহার নয়নে না অশ্রু

পাত হইবে? তিনি দেশের একটী মস্তক, তাঁহাকে আজ সামান্য কীটেও ভক্ষণ করিতেছে; সামান্য অজাতশ্মশ্রু বিদ্যালয়ের ছাত্রেও তাঁহার মস্তকে পদার্পণ করিতেছে। আমরা ব্রাহ্ম নহি—আমরা হিন্দু, তথাপি আমরা তাঁহার দুঃখে—তাঁহার অপমানে—সহানুভূতি না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। অল্পের উপর বহুর অত্যাচারে আমাদিগেরও হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, কিন্তু এ দোষ কার? এ দোষ তাঁহার নিজেরই, সুতরাং আমরা কি করিব? উৎপীড়িত মানবের জন্য অশ্রুপাত করা ব্যতীত আমাদিগের আর কি ক্ষমতা আছে?

আর যে বহু এই অল্পের উপর অত্যাচার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি তাঁহারা কেশব বাবুর ন্যায় গুরুর বধের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আপনাদিগের জন্য ভবিষ্য শৃঙ্খল প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন। ভারতে উন্মত্ত তরলমতি যুবকদিগকে উচ্ছৃঙ্খল ধর্ম্মোন্মাদে উন্মাদিত করিতেছেন, তাহারা যে এক সময়ে তাঁহাদিগকেও মত্ত হস্তীর ন্যায় মস্তক হইতে নামাইয়া পদতলে উন্মথিত করিবে না তাহার প্রমাণ কি? যে সকল কঠোর সামাজিক নিয়ম তাঁহারা ঘোরতর ধর্ম্মশাসনের অধীনে আনিতেছেন, তাহা যে তাঁহারাই সাকল্যে প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারিবেন তাহার প্রমাণ কি? কেশব বাবুর ন্যায় ওরূপ গঠিত চরিত্রেরও যখন স্খলন হইল, তখন তাঁহাদিগেরও যে হইবে না তাহার প্রমাণ কি? তাঁহারা কি এক বার ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে তাঁহাদিগেরও এক বার স্খলন হইলে, যে হস্তিরূপী বহুত্বকে (Majority) তাঁহারা উন্মাদিত করিয়া রাখিলেন, সেই উন্মত্ত হস্তী তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকেও পদদলিত করিবে। সুতরাং অভ্রান্ত নেতা ভিন্ন কেহই অধিক দিন এই সমাজের অধিনেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু জগতে কোন মানুষই অভ্রান্ত নহে, সুতরাং কাহারই অধিক দিন এই সমাজের নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে নেতার পর নেতা বহুত্বরূপী হস্তীর পদতলে দলিত হইবে। সুতরাং এখনও বলি বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দ যেন ধর্ম্ম হইতে সামাজিক নিয়ম সকল বিশ্লিষ্ট করিয়া সামাজিক নির্যাতনের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত করেন এবং ভারতবাসী ব্রাহ্মদিগের ভাবী উন্নতি ও সুখের পথ পরিষ্কৃত করিয়া রাখেন। যেন নব নির্ম্মিত শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে ভবিষ্যতে আর একটী বিপ্লবের প্রয়োজন না হয়।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের শ্রীপাঠের কথা।

আর্য্যদর্শনের অনেক পাঠকের সংস্কার আছে যে বৈষ্ণবদিগের পক্ষে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন ব্যতীত আর তীর্থ নাই এবং তাঁহারা কৃষ্ণ বলরাম ও রাধিকা ব্যতীত

অন্য উপাস্য দেবতা স্বীকার করেন না বস্তুত তা নহে। ইঁহারা চৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার মনে করেন। অদ্বৈত ইঁহাদিগের শিব। নিত্যানন্দ ইঁহাদিগের ব্রহ্মা অথবা রাম।

পৌরাণিকগণ পরমেশ্বরকে জীবগণের উদ্ধারের জন্য নানাকালে নানাবিধ পাপ নিরাকরণের জন্য নানা প্রকার অবতারে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। আধুনিক বৈষ্ণবগণ ও কলির কলুষ বিনাশ জন্য (বৈষ্ণবতীর্থ) দ্বিতীয় স্বর্গ স্বরূপ ব্রজধাম হইতে বঙ্গদেশের দ্বাদশস্থানে ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকরূপে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। এক্ষণে ঐ দ্বাদশটী স্থানে বৈষ্ণবদিগের দ্বাদশ শ্রীপাঠ নামে বিখ্যাত। এই সকল পাঠ যে বৈষ্ণব দর্শন না করেন তাঁহার বৈষ্ণব জন্ম বৃথা।

সংখ্যা।	দ্বাদশ শ্রীপাঠেরনাম।	কোন দেব ব্রজধামের কি কি দেবতা।	গৌড়ে অবতীর্ণ হইয়া কি নাম ধারণ করেন।
১ ম।	নবদ্বীপ (নদিয়া)	শ্রীকৃষ্ণ	চৈতন্য। (নিমাই)
২ য়।	একচাকা (বর্দ্ধমান জিলা)	বলরাম	নিত্যানন্দ।
৩ য়।	খানাকুল কৃষ্ণনগর (হুগ্লীজিলা)	শ্রীদাম	অভিরাম
৪ র্থ।	তলদা মহেশপুর (নদিয়া জিলা)	সুদাম	সুন্দরানন্দ
৫ ম।	শীতলগ্রাম (বর্দ্ধমান জিলা)	বসুদাম	ধনঞ্জয় পণ্ডিত।
৬ ষ্ঠ।	ব্যাড়ালা বৌইচি (হুগ্লীজিলা)	মহাবল	কমলাকর পিপলাই।
৭ ম।	উদ্ধরণপুর (বীরভূমজিলা)	সুবাহু	উদ্ধরণ দত্ত।
৮ ম।	বাঘনাপাড়া (বর্দ্ধমান জিলা)	স্তোক কৃষ্ণ বালকৃষ্ণ	রমাই পণ্ডিত।
৯ ম।	অম্বিকা ঐ	সুবল	গৌরদাস পণ্ডিত।
১০ ম।	বোধখানন্দ (নদিয়া জিলা)	অর্জ্জুন	পরমেশ্বর দাস।
১১ শ।	আকাইহাট (বর্দ্ধমান)	কালিয়াকৃষ্ণ	নরঙ্গ
১২ শ।	বড়গাছী (নদিয়া জিলা)	মহাবাহু	মহেশ পণ্ডিত

নদিয়া জিলার মধ্যে শ্রীপাঠের ১ম। ৪র্থ। ১০। ও ১২ শ এই চারিটী
বর্দ্ধমান জিলায় শ্রীপাঠের ২ য়। ৫ ম। ৮ ম। ৯ ম। ১১শ এই পাঁচটী
হুগ্লীজিলায় শ্রীপাঠের ৩ য় ও ৬ ষ্ঠ এই দুইটি
বীরভূমজিলায় শ্রীপাঠের ৭ ম এই একটী

এই সকল পাঠের মধ্যে শান্তিপুর খড়দা, কাঁটোয়া ও দেবানন্দাদির পাঠের নাম গন্ধও নাই, তথাপি এইগুলির নাম সিদ্ধ পাঠ। শাক্তদিগের বায়ান্নটী পীঠস্থান আছে।

বৈষ্ণবেরাই বা কেন কম হয়েন, তাঁহাদিগের ৫১টী শ্রীপাঠ স্থান অছে, ঐ একান্নটীর একান্ন জন অধিষ্ঠাতা দেব আছেন। শাক্তদিগের পীঠস্থানের কর্ত্তা তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বৈষ্ণবদিগের পীঠ স্থানের কর্ত্তা দেবগণ।

বৈষ্ণবদিগের মৃত্যু নাই কেবল কলেবরপরিত্যাগ মাত্র, তাঁহাদিগের জন্মের নাম আবির্ভাব এবং মৃত্যুর নাম তিরোভাব। পৌরাণিক অসংখ্য অবতারগণ মৎস্য কূর্ম্ম ও বরাহাদি রূপ ধারণ করিয়া অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যুগে যুগে হইতেছেন ও হইবেন। বৈষ্ণবদিগের অবতারগণ চিরস্থায়ী ও চিরজীবী বরাহাদি রূপ ধারণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য্য দ্বারা ঐ সকল অবতারের কার্য্যের অনুকরণ হয়।

চৈতন্যকে সকলেই জানেন তাঁহার পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই।

নিত্যানন্দের পরিচয় আবশ্যক। ইনি সুন্দরামল্ল বাড়ুর্য্যের পৌত্র, হাড়াই পণ্ডিতের পুত্র, ইহাঁর জননীর নাম পদ্মাবতী। ইহার জন্মভূমির নাম একচাকা গ্রাম। এই এক চাকাগ্রাম অম্বিকাকালনা হইতে দুই কোষ মাত্র ব্যবধান। এখানে যে সকল বন্দ্যোপাধ্যায়গণ অছেন, তাঁহারা সুন্দরা মল্লের অবতার, সুতরাং ইহাঁরা বংশজ। খড়দহ প্রভৃতি স্থানে যাঁহারা অবতীর্ণ তাঁহারা নিত্যানন্দ পরিবার সুতরাং তাঁহারা বটব্যাল অর্থাৎ শুদ্ধ-শ্রোত্রীয় রূপে খ্যাত। যথা—

"এক বাপের দুই ব্যাটা শুন পরিপাটী।
বড় হলেন বটব্যাল ছোট বন্দ্য ঘটী॥"

মেলমালা।

নিত্যানন্দের বংশ পরিচয় চৈতন্যভাগবতে যথা—

ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্তধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হইল নিত্যানন্দ রাম॥
মাঘমাস শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী দিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নাম গ্রামে॥
হাবাই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তারে করি পিতা ব্যাজ।
রাঢ়দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যথা অবতীর্ণ হইল নিত্যানন্দ ধাম।
নিত্যানন্দের অপত্য গঙ্গা আর বিরু।
মাধব গঙ্গার পতি সর্ব্বশাস্ত্রে গুরু।

(কুলচন্দ্রিকা দেখ)

৮ ম। বাঘনাপাড়ায় বালকৃষ্ণের আবির্ভাব এখানেই তাঁহার তিরোভাব হয়। ইহার বংশধরগণ পাটুলীর চাটুতি ও কৃষ্ণের সন্তান ও সর্ব্বানন্দী মেল বলিয়া খ্যাত। বাল কৃষ্ণের ব্রজধামে শ্লোক কৃষ্ণ হয়। বাঘনা পাড়ায় রমাই পণ্ডিত নামে খ্যাত। ইহার সন্তানগণ বংশজ।

৬ ষ্ঠ। কমলাকর পিপলাই চৈতন্যের উড়িষ্যাগমনকালে সহচর হয়েন। কমলাকরের অবতারগণ ব্যাড়ালাবোইচী ও শান্তিপুরে এবং পুরীতে আছেন তথায় টোটা গোপীনাথ বলিয়া খ্যাত।

পিপলাই যথা।

কোথাথেকে উড়ে এলো কোমলাপিপলাই।
সে আগুণে পুড়ে মলো মাধবতনয়॥

মেলমালা।

পিপলাই পুর্ব্বে কষ্টশ্রোত্রিয় ছিল চৈতন্যের প্রধান কৃষ্ণদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র মাধব বংশের সন্তানগণ দ্বারা পিপ্লাই মার্জ্জিত হয়। এই সকল গোস্বামী দিগের সন্তানগণ অবতার বিশেষ।

৭ ম উদ্ধরণদাস বীরভূমের উদ্ধরণ পুরে সুবর্ণ বণিক কুলে জন্মগ্রহণ করেন। যৎকালে নিত্যানন্দকে চৈতন্য দেব সংসারে পুন প্রবেশ করিতে কহেন সেই সময়ে উদ্ধরণ দত্ত নিত্যানন্দের উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গলায় আসিবার সময় সহচর হয়েন। নিত্যানন্দ উদ্ধরণ দত্তের হস্তের অন্ন গ্রহণ করিতেন। নিত্যানন্দ যৎকালে বীরভদ্রের জননীর পাণিগ্রহণ করেন তৎকালে নিত্যানন্দের জাতি· মর্য্যাদার প্রতি লোকের সংশয় হয়, সেই কালে নিত্যানন্দ কহেন

নিত্যানন্দের জাতির কি কহ পরিপাটি।
উদ্ধরণ দত্ত যার ডালে দেয় কাটি॥

চৈতন্য ভাগবত

উদ্ধরণ দত্ত সপ্তগ্রামী থাকেন সুবর্ণ বনিক কহিলেন, ইহাদিগের দ্বারা বৈষ্ণবদিগের সম্প্রদায়সম্বন্ধ হইয়াই ইহারা যে খানে আবির্ভূত অথবা তিরোভূত হইয়াছেন সেই সকল স্থল অথবা ইহাদিগের লীলা ভূমি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট শ্রীপাঠ বলিয়া খ্যাত। আমাদীদিগের তামসিক ও কৌতুকী পাঠকগণের ও শ্রীপাঠ আছে সে সকল গ্রামের নামের পুর্ব্বে শ্রীব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সে সকল শ্রীপাঠ অতি পূজ্য ইহারাই ধর্ম্ম সংস্কারক বলিয়া লোক সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের শিষ্যগণ ধর্ম্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কারে হস্তার্পণ করেন। নিমাই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিলেন পিতা মাতা ওদার পরিত্যাগ করিয়া বিষয় বাসনা পরিত্যাগের পরাকষ্ঠা দেখাইলেন। প্রথম সহচর নিত্যানন্দের সংসার হইতে মন সম্পূর্ণ রূপে মুক্তি মার্গে প্রধাবিত হয় না। এইখানে নিত্যানন্দের দেবত্ব লোপ পায় তিনি পরদিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া ছিলেন ভিক্ষা লব্ধ তণ্ডুলয়াদির অবশিষ্ট ভাগ সযত্নে রক্ষা করেন। এই থানে তাঁহার মানুষোচিত ক্ষুদ্রাশয়তা প্রকাশ পায়।

অদ্বৈতকে কৌপিন ও লাঠীর জন্য ব্যস্ত দেখিয়া চৈতন্য কহিলেন তোমার ও এখনো সংসারের প্রতি মায়া আছে। তিনি কহিলেন আমার মায়া নাই কিন্তু আমি সংসারে এক ব্যক্তির অধমর্ণ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ঋণ গ্রস্ত আছি যদি আমার পুত্রগণ পরিশোধ করে তাহা হইলে আমি মুক্ত পুরুষ।

চৈতন্য শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং কহিলেন তুমি অগ্রে ঋণ পরিশোধ কর। এই রূপে দুই এক দিন যায় এমত সময় তাহার পুত্রগণ টাকার জন্য লেখেন, তিনি পথ হইতে ভিক্ষা করিয়া টাকা পাঠাইয়া দেন। তৎকালে ৩০০ তিন শত টাকা গুরুতর ঋণ ছিল। বিশেষ ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণের পক্ষে। এই স্থানে অদ্বৈতের সংসারের

প্রতি বিশেষ মায়া হয়, কিন্তু লজ্জাক্রমে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই সকল বিবরণ চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ অনুসন্ধান কর আরও জানিতে পারিবে।

ইহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্য ও উপশিষ্য এবং তৎশিষ্য দ্বারা ভেক আরম্ভ হইল। সর্ব্ব জাতীয় লোকেই কহিল "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে। বিপ্র হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে॥"

* * * *

* * * *

শ্রীলাল—

হিতবাদ বা সুখবাদ দর্শন *।

কোন কার্য্যটী ভাল কোন্‌টী মন্দ, অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহার বিচার হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যে সময় এই বিচার আরম্ভ হয় সে সময়ও এ বিষয়ে যেরূপ মতভেদ ও অনিশ্চয়তা ছিল এক্ষণেও প্রায় সেই রূপই রহিয়াছে। এই দীর্ঘকালের ভূয়োদর্শনেও মানব এবিচারের কোন মীমাংসায় উপনীত হয়েন নাই। একজন যে কার্য্যটী ভাল বলে অন্য জন তাহাকে মন্দ বলিলে সে বিবাদের সামঞ্জস্য হয় এমন কোন সাধারণ নিয়ম আজিও প্রবর্ত্তিত হয় নাই, পরন্তু মতভেদের বাহুল্যবশতঃ বিবাদের প্রসর অধিক হইয়াছে। হিতবাদ দর্শন সেই সাধারণ নিয়মের অভাব পূরণ করিবে, সকল প্রকার বিবাদের মীমাংসা করিবে।

এক্ষণে ভাল মন্দ বিচার করিবার কোন সাধারণ নিয়ম প্রবর্ত্তিত নাই বটে কিন্তু কেহ এ বিচার হইতে বিরতও নহে। মানব-মাত্রেরই নৈতিক নিয়ম আছে, ভাল মন্দ জ্ঞান আছে, পাপ পুণ্যের বিচার আছে। সুতরাং ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে এই সকল বিচারের সময় মানব-সাধারণ কোন্ নিয়মের অনুসরণ করে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে মানব সাধারণের কার্য্য-প্রণালী দুইটী নিয়মের কোন না কোনটীর অনুসারী। সেই দুইটী নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল। এই দুইটী নিয়মের প্রকৃতি দেখিলেই বুঝা যায় যে উহাদের অনুসরণ মানব-সাধারণ-ব্যাপী হইতে পারে না।

১ম নিয়ম—যথেচ্ছাবাদ। অধিকাংশ লোক ইচ্ছাবৃত্তির অনুসরণ করিয়া পাপ-পুণ্যের বিচার করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোক কোন উদ্দেশ্য লক্ষ্য না করিয়া নিজের বা অপরের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্যের বিচারও অনুসরণ করেন। শাস্ত্রে যে কার্য্যগুলি ভাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে বা গুরু যে গুলিকে ভাল বলিয়াছেন অথবা যেগুলি তাঁহাদের নিজের ভাল বলিয়া লাগে সেই গুলিই তাঁহাদের নিকট ভাল। শাস্ত্র কেন ভাল বলিয়াছে, গুরুই বা কেন বলেন আর নিজেরই বা কেন ভাল লাগে তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না অথবা জানেনও না। তাঁহারা শাস্ত্র মানেন

* Utilitarianism

সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা বলিয়া, গুরূপদেশ মানেন পরোক্ষ সম্বন্ধে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা বলিয়া, এবং নিজের যাহা ভাল বলিয়া বোধ হয় তাহার অনুসরণ করেন ঈশ্বরানুমোদিত বিবেকশক্তির আজ্ঞা বলিয়া। সুতরাং মূলতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাঁহাদের লক্ষ্য। কিন্তু সে ইচ্ছার অনুসরণ উদ্দেশ্যবিহীন। ক্রীত দাসের মত তাঁহারা তাঁহাদের প্রভু ও স্রষ্টার আজ্ঞা অন্ধেধভাবে পালনে বাধ্য। সে যাহা হউক এই নিরুদ্দেশ্য ইচ্ছানুসরণ হইতে মতভেদ ও স্বেচ্ছাবৃত্তির উৎপত্তি হয়। প্রথমত শাস্ত্র যে ঈশ্বরের আজ্ঞা ইহাতে মানব-সাধারণের বিশ্বাস হইতে পারে না এবং বিবেকশক্তি যে আমাদের সংস্কারের ফল নয় পরন্তু ঐশ্বরিক ইহাতে সকলের প্রতীতি হয় না। দ্বিতীয়তঃ স্বীকার করা গেল যে শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তা ঈশ্বরের ইচ্ছা ; কিন্তু সেই শাস্ত্রের অর্থ বুঝাইবে? খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সকল সম্প্রদায়েরই মূল শাস্ত্র বাইবেল।' তবে তাঁহাদের মধ্যে এত মতভেদ এত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেন?—নানা ব্যক্তি নানা প্রকারে সেই মূল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন বলিয়া। এরূপ স্থলে কাহার ব্যাখ্যা মানিতে হইবে? আমাদের শাস্ত্র হইতে একজন বলিতেছেন বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত, অন্যজন বলিতেছেন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। কাহার কথা প্রত্যয় করিব? আবার বিবেক শক্তিকে যদি ঈশ্বরের দূত বলিয়া মানিতে হয়, সকলেই বলিতে পারেন আমার বিবেক শক্তি যাহা বলে তাহাই ঈশ্বরের অনুমোদিত। এবং বাস্তবিকও এই শ্রেণীর লোক তাহা ভাবিয়া থাকেন। যাহাদের সাহস ও সরলতা অধিক, তাঁহারা যীশুখৃষ্ট বা মহম্মদের মত আপনাদিগকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া তাঁহাদের বিবেকশক্তিতে যে কার্য্যগুলি ভাল বোধ হয়, সেইগুলিই সকলের শিরোধার্য্য হওয়া উচিত বলিয়া প্রচার করেন। যাঁহাদের সাহস অল্প, তাঁহারা সহজবুদ্ধি, প্রাকৃতিক নিয়ম, সত্য বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আপনারা যেটী ভাল বলিয়া বুঝেন সেইটী ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পান। শেষোক্ত শ্রেণীর একজন বলিবেন এই কার্য্যটী যে মন্দ তাহা সহজবুদ্ধিতে বুঝা যায়, ইহা করিলে সত্যের বা ধর্ম্মের অবমাননা করা হয়। কিন্তু এই সহজবুদ্ধি এই সত্য ও ধর্ম্মের জ্ঞান কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন, যে এ সকল স্বভাবজ এবং সকলেরই আছে। কিন্তু যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তিনি যেটীকে সহজবুদ্ধিতে মন্দ বলিতেছেন আর সকলের সহজবুদ্ধি সেটীকে মন্দ না বলিলে কিরূপে মীমাংসা হইতে পারে। ফলতঃ এ শ্রেণীর লোকের মধ্যে মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। কারণ ইহাঁদের সমস্ত কার্য্য-প্রণালীর মূল প্রবৃত্তি। যাঁহার যেরূপ প্রবৃত্তি তিনি সেই মত কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করেন এবং সেইমত বিবেকশক্তির বা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া নিজ মতের পোষকতা করেন।

২য় নিয়ম—সন্ন্যাসবাদ। আর এক

শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহাদের কার্য্য-প্রণালীর মূল সন্ন্যাসবৃত্তি। তাঁহারা বলেন জগতে যতকিছু সুখ আছে সমস্ত পরিত্যাগ করাই ধর্ম্ম। কতক গুলি লোক আবার এত দূর যান যে তাঁহারা বলেন শুদ্ধ সুখ ত্যাগ করিলেই হইবে না, ইচ্ছা পূর্ব্বক এবং চেষ্টা করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। কতক গুলি সুখ আছে যাহাদিগের উপভোগ করিতে গেলে অনিষ্টের উৎপত্তি হয় বলিয়া এই শ্রেণীর লোক একেবারে সুখের মূলে কুঠারাঘাত করাই শ্রেয়ঃ সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহা আমরা পরে দেখাইব।

যিনিই যে নিয়মে কার্য্য ব্রর ন ই। বা কার্য্যের বিচার করুন সকলেই কা জনক স্বীকার করেন যে সুখই স সাম- উদ্দেশ্য। যিনিই যে কার্য্য নিয়ম তাহা হইতে তাঁহার সুখ পাইবার থাকে। তবে সকলেই কিছু এক প্রকার সুখ অভিলাষ করেন না। যিনি সন্ন্যাস বাদী তিনি সর্ব্ব সুখ ত্যাগ করিয়াও সুখের অভিলাষী। সন্ন্যাসী বলিয়া সকলের পূজনীয় হওয়ায় যে গৌরব ও সুখ আছে ইহ জীবনে তিনি তাহারই প্রার্থী। এবং পরকালে তিনি অনন্ত সুখের প্রার্থী। যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণ করিয়া কার্য্য করেন তিনিও ইহকাল পরকাল উভয় কালেই সুখের প্রার্থী। কিন্তু নিজের বুদ্ধিশক্তির উপর তাঁহার প্রত্যয় অল্প। কিরূপ আচরণ করিলে ঈপ্সিত সুখ পাইবেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের জ্ঞানরাশির আশ্রয় লইয়া থাকেন, শাস্ত্র বা বিবেক শক্তির অভ্যন্তর দিয়া সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের মন্ত্রণা গ্রহণ করেন। যখন বিবেক শক্তির প্রতারণায় তিনি নিজের প্রবৃত্তি মত কার্য্য করেন তখনও তিনি সুখের অনুসরণ করেন। কারণ ইহাবলা বাহুল্য যে যাহাতে আমাদের সুখ তাহাতেই আমাদের প্রবৃত্তি। ফলতঃ মানবসাধারণ যে কোন প্রকারে সুখই জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া এতদিন অজ্ঞাতভাবে হিতবাদ দর্শনের অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন।

এই মানব সাধারণ ব্যাপক উদ্দেশ্য—সুখের উপর হিতবাদ দর্শন নির্ম্মিত ব হইয়াছে। যাহাতে জগতে সুখের ভাগ ববর্দ্ধিত হয় এবং দুঃখের ভাগ কমিয়া যায় তাহাই হিতবাদ দর্শনের উদ্দেশ্য। কোন ব্যক্তি-বিশেষের সুখের জন্য হিতবাদ দর্শন ব্যস্ত নহে, সমগ্র মানব জাতির সুখই ইহার লক্ষ্য। যে সকল কার্য্য জগতে সুখের পরিমাণ বাড়ায় এবং দুঃখের পরিমাণ কমায় এই মতানুসারে সেই সকল কার্য্য উৎকৃষ্ট। তোমার শত পরিমাণ সুখ নষ্ট করিয়া যদি তুমি দশ জন লোকের প্রত্যেকের পঞ্চ করিয়া পঞ্চাশত পরিমাণ সুখ বাড়াও হিতবাদ দর্শন উদারতা দেখিয়া তোমার প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু তোমার

কার্য্যের প্রশংসা করিবে না। কারণ সে কার্য্য হইতে জগতে পঞ্চাশত পরিমাণ সুখ কমিল। আবার তোমার শত পরিমাণ সুখের জন্য যদি আর দশ জনের দেড় শত পরিমাণ সুখ বিনষ্ট কর তাহা হইলে তোমার স্বার্থপরায়ণতার এবং তোমার কার্য্যের উভয়েরই নিন্দা করিবে। কারণ এস্থলেও তোমার কার্য্যে যে পরিমাণ সুখ উৎপাদিত হইতেছে তাহা অপেক্ষা অধিক নষ্ট হইতেছে। ফলতঃ হিতবাদ দর্শন একটী নৈতিক গণিতশাস্ত্র। সুখ দুঃখের একটী জমা খরচ করিয়া যে কার্য্যে যত অধিক সুখ জমা থাকে সে কার্য্য তত ভাল। বীজগণিতের সঙ্কলনে যেমন নানা যৌগিক ও বিয়োগিক রাশির সমষ্টি হইতে হয় একটী যৌগিক না হয় একটী বিয়োগিক রাশির উৎপত্তি হয়, নানা প্রকার সুখ দুঃখের সঙ্কলনেও সেইরূপ, হয় সুখ নয় দুঃখ শেষ সঙ্কলনফল উৎপন্ন হইবে। এইকারণে সকল প্রকার সুখ ও দুঃখের বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে গণিতের এক দুই প্রভৃতি সংখ্যার মত তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। কিরূপে তাহা করিতে হইবে বেন্থাম প্রণীত ব্যবহার শাস্ত্রে * তাহার সুন্দর পথ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বিবেচ্য নহে। গণিতেও যেরূপ অঙ্ক কসিবার দোষে সকল সময় ঠিক উত্তর পাওয়া যায় না হিতবাদ দর্শন রূপ গণিতেও সেইরূপ অনেকে হয়ত সুখ দুঃখের সঙ্কলন করিতে ভুল করিতে পারেন। কিন্তু গণিতের অঙ্ক কসিতে যদি ভুল হয় সে ভুল দেখাইয়া দিলে সকলেই অসন্দিগ্ধচিত্তে বরং অপ্রতিভ হইয়া স্বীকার করেন। হিতবাদদর্শন-গণিতেও সেইরূপ যখন কসিবার নিয়ম স্থির রহিবে যিনি ভাল কসিতে পারেন তিনি আসিয়া ভুল দেখাইয়া দিলে যিনি ভুল করিবেন তাঁহাকে ভুল স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং হিতবাদ দর্শনে মত বৈষম্য হইলে তাহার মীমাংসা আছে।

যথেচ্ছাবাদ বা সন্ন্যাসবাদের সহিত সমগ্র মানবের সহানুভূতি হইতে পারে না। কিন্তু হিতবাদের সহিত সকলেরই সহানুভূতি হইতে পারে। যিনি ঈশ্বরের অনুমোদন ভিন্ন কার্য্যের কর্ত্তব্যতা স্বীকার করেন না, তাঁহাকে হিতবাদীর বক্তব্য এই যে, তাঁহার কল্পনায় ঈশ্বরের প্রকৃতি যেরূপ তাহাতে ঈশ্বর যে তাঁহার সৃষ্ট জীব সমূহের সুখে সুখী হন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং মানব জাতির সুখ বর্দ্ধন যে হিতবাদ দর্শনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা যে ঈশ্বরের অনুমোদিত ইহা বলা বাহুল্য। যিনি সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাইয়া শাস্ত্র সকলকে ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনি যুক্তিবলে হিতবাদ দর্শনকে ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া লইতে পারেন। ফলতঃ ঈশ্বর যদি দয়া ধর্ম্ম ও ন্যায়ের অনন্ত আধার হন্ তবে হিতবাদ দর্শন অবশ্যই তাঁহার অনুমোদিত।

* Bentham's Theory of Legislation.

যে সন্ন্যাসবাদী ইহকালের সুখের বিদ্বেষী, হিতবাদীর তাঁহার প্রতি বক্তব্য এই যে, তাঁহার মনে যদি এরূপ জ্ঞান থাকে যে ইহ কালের সুখ ভোগ করিতে ঈশ্বরের নিষেধ আছে তাহা হইলে তিনি যে পরকালের সুখের আশায় এ জীবনের সুখ ত্যাগ করিতেছেন, সে পরকালের সুখই যে ঈশ্বর তাঁহাকে ভোগ করিতে দিবেন তাহার প্রমাণ কি? ফলতঃ ঈশ্বরকে তাঁহারা মুখে যে সকল গুণের আধার বলেন মনে তাহা ভাবেন না তাঁহারা মনে মনে ঈশ্বরের প্রকৃতি অতি নীচ করিয়া ফেলিয়াছেন এবং তাহারই ফলে তাঁহাদের বোধ হয় যেন ঈশ্বর মানবের সুখ দেখিতে পারেন না এবং তাহারা কষ্টে থাকিলেই তিনি সুখী।

যাঁহারা যথেচ্ছা বাদ বা সন্ন্যাসবাদের পোষকতা করেন না, যাঁহারা যুক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য্য প্রণালী নিয়মিত করিতে স্বীকৃত হন, হিত-বাদ দর্শনকে কার্য্য প্রণালীর নিয়ামক বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহারা কতক গুলি আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। নিম্নে সেই সকল আপত্তি লিখিত হইয়া খণ্ডিত হইল। এই সকল আপত্তিও খণ্ডন হইতে হিতবাদ দর্শনের অর্থ বিষদ ও পরিস্ফুট হইয়া যাইবে।

প্রথম আপত্তি—সুখ অপেক্ষা জীবনের উচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুখ কথাটীর অপব্যবহার হইতে এই আপত্তির উৎপত্তি। অনেক বৎসর পূর্ব্বে এপিকিউরস সুখই প্রার্থনীয় বলিয়াছিলেন বলিয়া সেই এপিকিউরসের শিষ্যদিগকে লোকে শূকরের সহিত তুলনা করিত। এপিকিউরসের শিষ্যেরা তাহার এই উত্তর দিত যে যে বলে মানব, শূকরের মত ইন্দ্রিয় সুখ ভিন্ন আর কোন সুখ ভোগ করিতে পারে না তাহাকেই ঐ নাম সাজে। ফলতঃ মানবের ইন্দ্রিয় সুখ ভিন্ন আর কোন সুখ নাই মনে করিলেও মানব নামের অপমান করা হয়। বুদ্ধি বৃত্তি, হৃদ্বৃত্তি বা কল্পনা শক্তি প্রভৃতি দ্বারা যে সকল সুখ অনুভূত হয় সে সকলের সহিত কি ইন্দ্রিয় সুখের তুলনা হয়! আর্কিমিডিস্ একদিন একটী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া সেই মানসিক সুখে উন্মত্ত হইয়া অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় 'আমি পাইয়াছি'; 'আমি পাইয়াছি' বলিতে বলিতে রাস্তায় ছুটিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কালিদাসের শকুন্তলা পাঠ করিয়া সুবিখ্যাত জর্ম্মন কবি গেটি বলিয়াছিলেন 'তুমি কি বসন্তের ফুল, বর্ষশেষের ফল অথবা জগতে যাহা কিছু চিত্তকে বিমোহিত, উন্মাদিত বা পরিপুষ্ট করে, সংক্ষেপতঃ তুমি কি স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়কে এক নামে বুঝাইতে চাও? এক মাত্র শকুন্তলার নাম কর সকলই বুঝাইবে'। কোম্‌তের হৃদ্বৃত্তি ম্যাডাম ক্লতিল্‌দিতে চরিতার্থ হইয়া যে সুখ অনুভব করিয়াছিল সেই সুখ হইতে কোম্‌তের বিশ্ব-প্রেমিকতাও মানবধর্ম্মের (Religion of Humanity) আবির্ভাব হয়।

মিল্ প্রমাণাভাব বশতঃ ধর্ম্ম বিশ্বাস জনিত সুখের আকাঙ্ক্ষা, স্বর্গ সুখের আশা এবং বিশ্বাস মূলক সকল আশাই ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বুদ্ধিবৃত্তিও হৃদ্বৃত্তি দ্বারা সহধর্ম্মিণীতে একীভূত হইয়া যে অতুল সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন সেই সুখ আর একবার ভোগ করিবার আশায় প্রমাণাভাবেও আত্মার অমরত্ব বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

ফলতঃ মানসিক বৃত্তি সকল-জনিত সুখ ইন্দ্রিয় সুখ অপেক্ষা অতি উচ্চ প্রকৃতির। নিম্ন প্রকৃতির অপরিমিত সুখের সহিত উচ্চ প্রকৃতির অল্পমাত্র সুখও বিনিময় করা যায় না। সমাজের দোষে, অবস্থার প্রতিকূলতায় বা অদৃষ্টের বিপাকে কোন ব্যক্তির এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহার উচ্চ মানসিক বৃত্তি সকল সুখের কারণ না হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ দুঃখের কারণ হইয়াছে; ইন্দ্রিয় সকলের পরিতৃপ্তি-জনিত সুখ তাহাতেও তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে যদি কেহ তাঁহাকে বলে 'তোমার মনুষ্য হইয়া সুখ কিছুনাই, যদি ইচ্ছাকর আমি তোমাকে মন্ত্রবলে পশু করিয়া দিতেছি ইন্দ্রিয় সকলের পূর্ণ উপভোগ-জনিত সুখ পাইবে তাহাতে কেহ তোমাকে বাধা দিবে না' তাহাহইলে তিনি কি পশু হইতে চহিবেন? অসম্ভব। তাঁহার মানসিক বৃত্তি সকল হইতে জীবনে কণামাত্র উচ্চতর প্রকৃতির সুখের আশা থাকিলে তিনি সমস্ত পশুতুল্য ইন্দ্রিয় সুখের পূর্ণ পরিতৃপ্তি তুচ্ছ করিবেন। তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন 'বরং অসন্তুষ্ট মানব হইব তথাপি সন্তুষ্ট পশু হইব না, সক্রেতিস্ হইয়া চিরকাল অসুখী হই সেও ভাল তথাপি অসভ্য ও মূর্খ হইয়া সুখী হইব না'। ফলতঃ মানসিক বৃত্তি সকল হইতে মানব যে উচ্চ প্রকৃতির সুখ ভোগ করিতে পারে তাহা অপেক্ষা মানব জীবনে উচ্চতর লক্ষ্য আর কিছু হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন সুখ অপেক্ষা ধর্ম্ম উচ্চলক্ষ্য। কিন্তু ধর্ম্ম কি? পরোপকার একটী ধর্ম্ম। আমি এক জনের উপকার করিলে উপকৃত ব্যক্তি সুখ পায় এবং সেই সুখ হইতে আমার মনেও এক অনির্ব্বচনীয় সুখের আবির্ভাব হয়। আমি যদি উপকৃত ব্যক্তি সুখী হইবে বলিয়া বা আমি সুখী হইব বলিয়া অথবা উভয় কারণে পরোপকার করি সে পরোপকার কি ধর্ম্ম নহে? কেবল ধর্ম্ম ভাবিয়া পরোপকার অপেক্ষা সেই সুখ লক্ষ্য করিয়া পরোপকার করার মূল্য কি অধিক নয়? কেবল অর্থ উদ্দেশ্য করিয়া যে কৃপণ ধন সঞ্চয় করে তাঁহা অপেক্ষা যিনি অর্থে জগতের সুখ বাড়াইব মনে করিয়া ধন সঞ্চয় করেন তিনি কি উচ্চ প্রকৃতির লোক নহেন? আর কেহ ২ বলিয়া থাকেন যে সুখ লক্ষ্য করা দূরে থাকুক সুখের আশা ত্যাগ করিতে না পারিলে ধর্ম্ম হয় না। পরোপকার করিতে যাও তোমার ক্ষতি হইবে তুমি সেই ক্ষতি-গণিত অসুখের জন্য প্রস্তুত না হইলে

পরোপকার করিতে পারিবে না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ব্যক্তি বিশেষের সুখ হিতবাদ দর্শনের উদ্দেশ্য নহে, সমগ্র মানব জাতির সুখ ইহার লক্ষ্য। স্বীকার করিলাম আমি পরোপকার করিতে গিয়া আপনার সুখ নষ্ট করিলাম কিন্তু সে সুখ অনর্থক নষ্ট করিলাম না। তাহাতে আর এক বা বহু জনকে সুখী করিলাম। সুতরাং এ স্থলেও সুখ (আমারই হউক বা পরেরই হউক) উদ্দেশ্য করিয়া পরোপকার করিলাম। যে ত্যাগ স্বীকারে কিছু লক্ষ্য না থাকে বা যাহাতে আর কাহাকেও সুখী করিবার উদ্দেশ্য না থাকে হিতবাদ দর্শনে তাহার কোনও মূল্য নাই। সন্ন্যাসিদিগের নিলক্ষ্য সুখ-স্পৃহা-বিসর্জ্জন—মানব কি করিতে পারে তাহারই উদাহরণ, কিন্তু মানবের কি করা উচিত তাহার উদাহরণ নহে।

দ্বিতীয় আপত্তি—সুখ অপ্রাপ্য, সুতরাং উহার বৃদ্ধি চেষ্টা বৃথা। যে পৃথিবীতে চক্ষুর অদৃশ্য কীটের ভিতরও মানব শরীরের মত রক্ত প্রবাহিত হয়, যাহার বায়ুর কম্পন কর্ণে অমৃতধারা সিঞ্চন করে, যাহার এক একটী সূর্য্যরশ্মির ভিতর ইন্দ্রধনুর শোভা বিদ্যমান, যাহার এক একটী মানব-হৃদয় স্বর্গীয় ভাবের আধার, ফলতঃ যাহাতে সকল প্রকার প্রাকৃতিক ও মানসিক স্বর্গীয় শোভা বিরাজিত—যে বলে সে পৃথিবীতে সুখ অপ্রাপ্য, সে সুখ ভোগ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই। চরম আনন্দের ভাব সর্ব্বক্ষণস্থায়ী না হইলে যদি তাহাকে সুখ না বল তাহা হইলে তাহা এপৃথিবীতে অসম্ভব স্বীকারকরিতে হইবে। কিন্তু অবিরাম সেই চরম আনন্দ ভোগ করায় সুখ হয় কি না সন্দেহ, আর তাহার জন্যও সকলে প্রার্থী নহে। চরম আনন্দের ভাব ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের মত মধ্যে মধ্যে আমাদের অন্ধকার ময় জীবনকে আলোকিত করে। যাহার জীবনে এই বিদ্যুতের ভাগ অধিক তাহাকেই সুখী বলা যাইতে পারে। সেই জীবন সুখী যে জীবনে শান্তি ও উত্তেজনা ক্রমানুসারে আপনার আধিপত্য বিস্তার করে। অত্যন্ত উত্তেজনার পর শান্তি না পাইলে সুখ হয় না। আবার কিছুকাল শান্তি উপভোগ করিলে উত্তেজনার প্রয়োজন হয়। স্বভাবের ব্যতিক্রম না হইলে কেহ অবিরত উত্তেজনা বা অবিরত শান্তি চাহে না। সুতরাং যে জীবনে নানা প্রকারের সুখ, অল্প অল্প ক্ষণ স্থায়ী দুঃখের সহিত মিশ্রিত, যে জীবনে কার্য্যকরী বৃত্তি সকলের অনুশীলন অধিক এবং যে জীবনে অসম্ভব সুখের আশা নাই সে জীবনকে সুখী বলা যাইতে পারে। এরূপ জীবন যে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই সম্ভব তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিক্ষার অভাবে এবং সমাজের অত্যাচারে বর্ত্তমান অবস্থায় অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ইহা ঘটিয়া উঠে। কিন্তু এই শিক্ষার অভাব বা সামাজিক

অত্যাচার স্থায়ী নহে, ইহা দূর করাই হিতবাদ-দর্শনের প্রথম সঙ্কল্প।

স্বার্থ একটী সুখের অন্তরায়। যে যত আপন চিন্তায় রত এবং যত পরের চিন্তা অল্প করে সে জীবনে তত অল্পসুখী। মৃত্যুর সময় তাহার অসুখী আরও গুরুতর কেন না পৃথিবীতে যাহার আত্মই সার সে আত্মের অবসানে তাহার সমস্ত আশা ভরসা, আকাঙ্ক্ষা লালসা সকলই ফুরাইবে, তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে; তিনি কাহারও জন্য ভাবেন নাই অন্যে কেন তাঁহার জন্য ভাবিবে। কিন্তু যিনি পরের চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করেন তাঁহার জীবন সুখময় ও ইহ জীবনেই তাঁহার অমরত্ব লাভ হয়। মৃত্যুর সময়ও তাঁর আশা ভরসা প্রত্যেক মানবের আশা ভরসার সহিত গ্রথিত থাকে এবং মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতে হৃদয়ে হৃদয়ে তাহার আত্মা জীবিত থাকে।

স্বার্থের পর সুখের প্রধান অন্তরায় মানসিক উন্নতির অভাব। অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র অনন্ত সুখের আধার। এই জ্ঞান-সুখে উন্মত্ত হইয়া কতলোক সুখে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। যিনি এই জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে গুটি কত মাত্র উপল-খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন অনন্ত সুখের উৎস তাঁহার সম্মুখে উঠিয়াছে। প্রকৃতির শোভায়, কল্পনার কবিত্বে, মানব মণ্ডলীর অতীত ও বর্ত্তমান কার্য্য কলাপে, তাহাদের ভবিষ্যতের উন্নতিতে সকল বিষয়েই তাঁহার মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সকল বিষয় হইতেই তিনি আপনার সুখের সামগ্রী আহরণ করিতে সক্ষম।

ফলতঃ এই পৃথিবীতে—যেখানে আমাদের মন আকর্ষণ করিবার এত বস্তু রহিয়াছে, এত ভাল বসিবারও উপভোগ করিবার সামগ্রী আছে এবং যে খানে আমাদিগেকে উন্নত ও সংশোধিত করিবার এত বস্তু রহিয়াছে সেই পৃথিবীতে যাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল কিছু মাত্র চর্চ্চিত হইয়াছে যাঁহার হৃদয় পরের জন্য ভাবিতে শিখিয়াছে তাঁহার জীবন সুখময় ও আকাঙ্ক্ষনীয় হইতে পারে।

দারিদ্র্য, পীড়া, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি সুখের আর কতক গুলি অন্তরায় আছে। এগুলি শুদ্ধ সুখের প্রতিকূল নয় পরন্তু প্রকৃত দুঃখ। আমরা সে গুলিকে দৈব বলিয়া জানি। কিন্তু বস্তুতঃ সে গুলি দৈবনয়। সমাজ বিজ্ঞ হইলে ও ব্যক্তি সকল সতর্ক ও দূরদর্শী হইলে সমাজ হইতে দারিদ্র্য একেবারে লোপ পাইবে। শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষার চরম উৎকর্ষ হইলে পীড়া একেবারে কমিয়া যাইবে। এবং ভৈষজ্য শাস্ত্রের উৎকর্ষে অকাল-মৃত্যু অতি অল্প হইয়া আসিবে। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইল যে সুখ প্রাপ্য ও দুঃখ নিবার্য্য।

তৃতীয় আপত্তি—মানব-সাধারণের সুখ ভাবিয়া কয়জন লোক কার্য্য করিতে পারে। সংসারে সকলে কিছু উদার ভাবে পরের সুখ ভাবিয়া কার্য্য করিতে

পারে না। অধিকাংশ লোকই স্বার্থ ভাবিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু স্বার্থ দূষণীয় নহে। ঈষা বলিয়াছিলেন 'তোমার প্রতি যে রূপ ব্যবহার অন্যে করে তুমি ইচ্ছাকর তুমিও তাহাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর এবং তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত ভাল বাস'। ঈষার এই উপদেশের অর্থ এই যে, যে আত্মকে না ভাল বাসিয়াছে সে কখন পরকে ভাল বাসিতে পারে না, যে স্বার্থে উদাসীন পরার্থে তাহার সজীবতা অসম্ভব। আত্মে যাহার আদর ও আত্মের জন্য যাহার আগ্রহ আছে সেই পরের সহিত আত্মকে একীভূত করিয়া আত্ম হইতে আদর ও আগ্রহ পরের উপর ব্যাপ্ত করিতে পারে।

ঈষার এই সারগর্ভ উপদেশ অনুসারে যে কার্য্য করিতে পারে সেই হিতবাদী। এই উপদেশই হিতবাদ দর্শনের সার। ইহা ভাবিয়া কার্য্য করিলেই মানব-সাধারণের সুখ লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করা হইল। এবং বোধ হয় এ উপদেশ পালন করিতে অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আবশ্যক করে না। যে সে এই উপদেশ পালন করিতে পারে।

সমাজের কুনিয়মে, শিক্ষার অভাবে বা দূষণীয় শিক্ষায় স্বার্থ ও পরার্থ এরূপ পরস্পর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে স্বার্থের পরিতৃপ্তি করিতে গেলেই পরার্থ বিদলিত হয়. এই জন্যই স্বার্থ বর্ত্তমান অবস্থায় এত ঘৃণিত। কিন্তু যখন সমাজের নিয়ম ও শিক্ষার গুণে সমাজের ও ব্যক্তিগত সুখের একীভাব হইবে তখন স্বার্থ অনুসারে কার্য্য করিলেই পরার্থ সাধিত হইবে এবং মানব সাধারণের মঙ্গল হইবে।

বর্ত্তমান অবস্থায় স্বার্থ এরূপ ঘৃণিত হইয়া পড়িয়াছে যে কেহ কোন ভাল কার্য্য করিলেও—তাহাতে বিন্দুমাত্র স্বার্থের ভাব থাকিলে সে কার্য্যের আর প্রশংসা থাকে না। হিত-বাদ দর্শন কার্য্যের এরূপ অভিপ্রায় দেখিয়া গুণাগুণ বিচার করে না। একজন জলে ডুবিতেছে দুইজন তাহাকে তুলিতেছে, একজন পুরস্কার পাইবার আশায় তুলিতেছে অন্য ব্যক্তি দয়া বশতঃ তুলিতেছে। হিত-বাদী উভয়ের কার্য্যের সমান প্রশংসা করিবেন। কিন্তু উভয়ের কার্য্য তাঁহার নিকট সমান প্রশংসনীয় হইলেও যে ব্যক্তি দয়াবশতঃ কার্য্য করিয়াছে তাহাকে তিনি অধিক সম্মান করিবেন। কারণ তাঁহার স্বভাবানুসারে তাঁহার নিকট হইতে মানবের ইষ্টকর কার্য্যের অধিক আশা করা যায়। আবার একজন অতি ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি সদভিপ্রায়েও কোন অন্যায় কর্ম্ম করেন হিত-বাদী তাঁহার ধার্ম্মিকতার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া তাঁহার অন্যায় কার্য্যের নিন্দা করিবেন। একজন কোন বন্ধুর নিকট বিশেষ ঋণী আছেন বলিয়া যদি তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য অপর এক বন্ধুর বিশ্বাস ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সদভিপ্রায় তাঁহাকে বিশ্বাস ঘাতকতা পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারেনা।

ফলতঃ হিত-বাদ দর্শনে কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার—সেই কার্য্যের ইষ্টকরতা বা অনিষ্ট-করতা হইতে। কার্য্যের অভিপ্রায়ের সহিত সে বিচারের কোনও সম্বন্ধ নাই।

ইহাতে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে হিত-বাদ দর্শন অতি কঠোর ধর্ম্ম। এধর্ম্ম ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, সৎ অসৎ বিভেদ করে না সকলকেই এক ভাবে গ্রহণ করে। ইহাতে একজন নারকীর দোষও যে তুলায় তোলিত হয় একটী স্বর্গীয় পুরুষের দোষও সেই তুলায় তোলিত হয়। এ কথার উত্তর এই যে কার্য্যের দোষ গুণ বিচার ও ব্যক্তির দোষ গুণ বিচার দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু। কার্য্যের সৎ অসতের প্রমাণ ইষ্টকরতা বা অনিষ্টকরতা। কিন্তু কোন ব্যক্তির চরিত্র বিচার করিতে হইলে কেবল তদনুষ্ঠিত পাপ কার্য্য বা পুণ্য কার্য্য দেখিলে হইবে না। কারণ অবস্থার দোষে অতি সদাশয় মহৎ প্রকৃতির লোক কর্ত্তৃকও পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কখন বা ইহাঁদের দ্বারা সৎ বা অসৎ কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয়না। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার কারণে আমরা ব্যক্তি সকলের আদর ও সম্মান করিয়া থাকি। ব্যক্তির চরিত্রগত সৌন্দর্য্যই ব্যক্তির প্রতি আমাদের মন আকৃষ্ট করে। কিকি বস্তুর অভাব, সম্ভাব বা সংযোগ বিয়োগে যে সেই সৌন্দ- র্যের উৎপত্তি হয় তাহা কে গণিয়া উঠিতে পারে? সত্য ও সৌন্দর্য্য দুইটী পৃথক পদার্থ। কার্য্যের সদসৎ বিচার করা সত্যের ভার। ব্যক্তির মহত্ত্ব নির্ণয় করা সৌন্দর্য্যের ভার। প্রয়োজন হইলে একই পদার্থ হইতে সত্য ও সৌন্দর্য্য পৃথক করিয়া পৃথক ভাবে উভয়ের আলোচনা করিতে হয়। কবি ক্যাম্বেল যখন ইন্দ্রধনুকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন 'আমি গর্ব্বিত বিজ্ঞানের নিকট তোমার স্বরূপ জানিতে চাহিনা' তিনি সত্য ও সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষ করিয়াছিলেন, ইন্দ্র ধনুকে জলকণা সমূহের সমষ্টি-জনিত জানিয়াও তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ফলতঃ কোন ব্যক্তির কার্য সকল অসৎ হইলেও সেই ব্যক্তির চিন্তা হইতে তাহার কার্য্য সকলের চিন্তা পৃথক্ করিয়া তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য অনুভূত হইতে পারে। কার্য্য সকল সৎ হইলে ত কথাই নাই, সৌন্দর্য্য-কল্পনার সহায়তা করে মহতের মহত্ত্ব আরও বর্দ্ধিত করে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে মহৎ ও সুন্দর চরিত্র হইতে কখন নিরবচ্ছিন্ন অসৎ কার্য্য প্রসূত হয় না, দুই এক বার হইতে পারে।

চতুর্থ আপত্তি—প্রচলিত নৈতিক নিয়ম সকল ভঙ্গ করায় লোক সুবিধা দেখিবে। একজন দরিদ্র ভাবিতে পারে কোন অপরিমিত ধন শালীর অল্প অর্থ অপহরণ করিলে তাহাকে অসুখী না করিয়াও নিজে সুখী হইতে পারে, সুতরাং তাহাই শ্রেয়ঃ। অপর একজন ভাবিতে পারে 'শপথ করিয়া একটী মিথ্যা কথা কহিলে যদি কাহারও অনিষ্ট না করিয়া নিজে কোন বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে

পারি তবে কেন না মিথ্যা কহিব'। ইহার উত্তর এই যে ঐ সকল আপাত-সুবিধা ক্ষণস্থায়ী ও অনেক গুলি স্থায়ী সুখের মূল উৎপাটন করে। ইন্দ্রিয় সুখ সকল অপেক্ষা তীব্র ও দুর্দ্দম সুখ নাই। কিন্তু ইহা অপরিমিত ভোগ করিলে স্বাস্থ্যের বিনষ্ট হয় বলিয়া আমরা উহার অপব্যবহার করি না। একটী আপাত-সুখের জন্য একটী স্থায়ী সুখের বিসর্জ্জন দিই না। মানব একটী স্থায়ী সুখের জন্য যখন এত দুর্দ্দম অথচ সর্ব্বদা করায়ত্ত ইন্দ্রিয় সুখকেও দমন করিয়া রাখিতে পারে তখন মানব যদি বুঝিতে পারে যে মিথ্যা কথনে ও পর দ্রব্যাপহরণে বিশ্বাস ও নিরাপদতা-জনিত কি অমূল্য সুখের ধ্বংস হয় তাহা হইলে আহ্লাদের সহিত মিথ্যা কথন-জনিত বা অপহরণ-জনিত সামান্য সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে। আমরা যদি মিথ্যা কহিবার সময় ভাবিয়া দেখি যে একবার মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইলে আমাদিগকে চিরকালের জন্য কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং মানব সাধারণ মিথ্যা কহিলে কিরূপ অনিষ্ট হয় তাহা হইলে আর মিথ্যা কহিতে পারি না। হিত-বাদ দর্শন কেবল এই চায় যে চক্ষু-বদ্ধ বলদের মত নৈতিক নিয়ম সকল অনুসরণ না করিয়া সে গুলিকে একটী মহৎ উদ্দেশ্যের উপায় স্বরূপ বলিয়া অনুসরণ করিবে। সত্যের পথে অবিচলিত থাকিবে কিন্তু কাহারও আজ্ঞায় বা ভয়ে থাকিবে না। মানব-সাধারণের সুখ স্বরূপ মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া সত্যকে সেই উদ্দেশ্যে নীত হইবার একমাত্র পথ বলিয়া তাহার অনুসরণ করিবে।

কোন নৈতিক নিয়মই একেবারে অব্যভিচারী থাকিতে পারে না। মানব-সাধারণের সুখ স্বরূপ উদ্দেশ্য সর্ব্বদা চক্ষুর উপর থাকিলে সেই সকল সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার কোথায় ২ সঙ্গত, যুক্তি দ্বারা তাহা নির্ণয় করা যায়। আর কোন প্রকার নীতি শাস্ত্রে তাহা হইতে পারে না। সত্য কথন মানব-সুখের প্রথম ও মূল ভিত্তি, কিন্তু সকল নীতি-শাস্ত্রই স্থলবিশেষে অজ্ঞাতভাবে হিতবাদ-দর্শনের অনুসরণ করিয়া সত্যের ব্যভিচার অনুমোদন করিয়া থাকে। একজন সাংঘাতিক পীড়িত ব্যক্তির নিকট একটী অশুভ সম্বাদ গোপন না করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয় এরূপ স্থলে সকলেই সত্য গোপন করা উচিত বলেন। হিত-বাদ-দর্শনও তাহার অনুমোদন করে কিন্তু কারণ দেখাইয়া। কারণ এই যে ওরূপ স্থলে কেহ মিথ্যা বলিলে তাহার উপর লোকের বিশ্বাস নষ্ট হয় না; কারণ কেহই সে ব্যক্তি সত্য বলে ইহা ইচ্ছা ও আশা করে না এমন কি যে রোগী সেই মিথ্যায় প্রতারিত হইল সেও সুস্থ হইয়া মিথ্যাবাদীকে আপনার হিতৈষী বলিয়া স্বীকার করে। সুতরাং সেস্থলে মিথ্যা কথনে কোন অপকার হয় না অথচ এক জনের জীবন রক্ষিত হয়। কিন্তু সাধারণ নিয়মের ব্যভি-

চার অনির্দ্দিষ্ট থাকিলে সাধারণ নিয়মের বলবত্তার হ্রাস হয় এই জন্য হিতবাদ-দর্শনে স্বপক্ষ বিপক্ষ যুক্তি সকল গণনা করিয়া অঙ্কের উত্তরের মত ব্যভিচারের স্থল স্থিরীকৃত ও তাহার সীমা একটী পরিস্ফুট রেখা দ্বারা নির্ণয় করা উচিত।

পঞ্চম আপত্তি—কোন্ কার্য্য হইতে মানব সাধারণের সুখের উপর কিরূপ ফল ফলিবে কার্য্য করিবার পূর্ব্বে এ সকল ভাবিবার সময় থাকে না। ইহার উত্তর এই যে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাহা ভাবিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ভূয়োদর্শনে যাহা যাহা জ্ঞাত হইয়াছে তাহার সাহায্য লইলেই পথ পরিষ্কার বোধ হইবে আর অধিক ভাবিতে হইবে না। ক্ষেত্রতত্ত্বে যে ৪৭শ প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত কসিয়াছে তাহার বুদ্ধি থাকে ত সে ৪৮শ প্রতিজ্ঞা আপনা হইতেই কসিতে পারে। কিন্তু শেষের ৪৮শ প্রতিজ্ঞা মূলের স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য হইতে প্রমাণ করিতে যাওয়া অতি অবিবেচকের কার্য্য। স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য সকল ক্ষেত্রতত্ত্বের সমস্ত প্রতিজ্ঞার মূল বটে, কিন্তু কোন বিশেষ প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে হইলে সেই আদি মূল হইতে ক্রমে ক্রমে প্রমাণিত অন্যান্য প্রতিজ্ঞার সাহায্য চাই। ফলতঃ মূল সূত্র স্থলবিশেষে প্রযোজিত করিতে হইলে অনুসূত্রের প্রয়োজন। মানব-সাধারণের সুখ—মূল সূত্র; সত্যবাদিতা, দয়াবত্তা, পরোপকারিতা প্রভৃতি তাহার অনুসূত্র। সেই মূল সূত্রানুসারে কোন কার্য্য করিতে হইলে উপযুক্ত প্রকারের অনুসূত্র সকল অবলম্বন করিতে হইবে; একেবারে মূল ধরিয়া কার্য্য করা দুরূহ। সত্যবাদিতা প্রভৃতি অনুসূত্র পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহাদের ভূয়োদর্শনে পাইয়াছেন। সুতরাং সেগুলি আমাদিগ কর্তৃক উত্তরাধিকৃত। প্রয়োজন হইলে আমরা ও আমাদের ভূয়োদর্শনে নূতন অনুসূত্রের উৎপাদন বা পুরাতনের সংস্কার করিতে পারি। ভূয়োদর্শন-লব্ধ অনুসূত্র বা নৈতিক সাধারণ নিয়ম সকল শিক্ষার সাহায্যে আমাদের প্রবৃত্তি সকলের সহিত গ্রথিত হইলে এবং অভ্যাস বলে সেই গ্রন্থন দৃঢ়ীভূত হইলে প্রকৃতির নিয়মে কোন ভাবনা ও চিন্তা ব্যতিরেকে আমরা স্বতঃই ইহাদের অনুসরণ করি। কেবল যখন সেই অনুসূত্র সকলের অনুসরণে বাধা পাই তখনই চিন্তার প্রয়োজন হয়। যে ব্যক্তি বাল্য হইতে সত্য-কথনে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হইয়াছে স্বভাবের নিয়মে সে না ভাবিয়া চিন্তিয়া সত্য কহিবে; কিন্তু মিথ্যা কহিতে হইলেই চিন্তা করিবে। ফলতঃ কার্য্যের সময় আমরা শিক্ষা ও অভ্যাসের প্রভাবে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া নীতির সাধারণ নিয়ম সকল অজ্ঞাত ভাবে অনুসরণ করিয়া থাকি। কেবল যে থানে নিয়মের ব্যভিচার সেই থানেই আমাদের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং ইহা বলা বাহুল্য যে সেই ব্যভিচার স্থলেই বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন।

ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী।

(দশম প্রবন্ধ।)

অদ্ভুত নির্য্যাতন।

যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির মহতী দুর্ব্বলতা এই যে, ইহা প্রতিবাদ সহিতে পারে না। প্রতিবাদ ন্যায়সঙ্গত হউক বা না হউক, প্রতিবাদ মাত্রে ইহার ক্রোধ উদ্দীপিত হইবে। সুতরাং যে রূপ আশা করা যাইতে পারে, ম্যাট্‌সিনি-রও প্রতিবাদ প্রচারিত হইল অমনি তাঁহার প্রতি ও তৎপ্রতিষ্ঠাপিত সমাজের প্রতি ফরাশি গবর্ণমেণ্টের নির্য্যাতন-স্পৃহাও বলবতী হইয়া উঠিল। তাঁহা-দিগের অধ্যবসায়ে উদ্দীপিত ও ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের দূতগণ-কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া, ফরাশি মন্ত্রী নব্য ইতালী সমাজের পত্রিকার প্রচার রহিত করিবার জন্য যথাশক্তি বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি ইহার প্রকাশক ও প্রিণ্টর প্রভৃতিকে ইহার লেখক বলিয়া সন্দেহ করিয়া তাহাদিগের প্রতি সম্পত্তি-হরণ ও নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রয়োগ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন। এবং দ্বিগুণতর উৎসাহ ও দ্বিগুণতর কার্য্য-পরতার সহিত ম্যাট্‌সিনির অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। তাঁহারাও অসাধারণ পৌরুষের সহিত সেই ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধের সমতা রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাড়িত ইতালীয় কম্পজিটর প্রেসমান প্রভৃতির স্থলে তাঁহারা ফরাশি কম্পজিটর প্রেস-মান প্রভৃতি নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ভিকটর ভিয়ান্ নামক একজন মার্সে-লিসের অধিবাসী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের কম্পজি-টরগণ কার্য্যকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকস্থিত গ্রাম সকলে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল, এবং তাঁহারা পত্রিকা সকল মুদ্রিত হওয়ার পরক্ষণেই সর্ব্বত্র প্রেরণ করিতে লাগি-লেন। এই রূপে ফরাশি গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই বিফল হইতে লাগিল।

ম্যাট্‌সিনি ইহার পর আর ত্রিশ বৎসরকাল মাত্র জীবিত ছিলেন। এই ত্রিশ বৎসরের বিশ বৎসরকাল তিনি একটী ক্ষুদ্র গৃহের দেউল-চতুষ্টয়ের অভ্যন্তরে ইচ্ছা-কারাবাসে সংরুদ্ধ হন।

ফরাশি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তিনি অদ্ভুত কৌশলে ফরাশি গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার অনুসন্ধানের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে লাগিলেন। মার্সেলিসের প্রিফে-ক্টের কতিপয় গুপ্তচর ম্যাট্‌সিনির নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের যতকিছু হুকুম জারি হইত, তাহার নকল তাঁহাকে প্রদান করিতে লাগিল। তদ্দ্বারা তিনি প্রতিপদেই গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধিৎসা হইতে রক্ষা পাইতে লাগিলেন। অব-শেষে একবার ধরা পড়িলেন। কিন্তু

কোনপ্রকারে প্রিফেক্‌টের মত করিলেন যে, প্রিফেকটের নিজের অনুচর দ্বারা যেন তাঁহাকে দেশান্তরিত করা হয়। উৎকোচের মহিমায় এ যাত্রায়ও তিনি রক্ষা পাইলেন। ম্যাট্‌সিনির একজন বন্ধু ছিলেন, ম্যাট্‌সিনির সহিত তাঁহার সম্পূর্ণরূপ আকৃতি-সৌসাদৃশ্য ছিল। উৎকোচের মোহিনী শক্তিবলে প্রিফেক্‌টের অনুচরেরা তাঁহাকেই ম্যাট্‌সিনি বলিয়া জেনোয়ায় রাখিয়া আসিল। এ'দিকে আসল ম্যাট্‌সিনি জাতীয় সৈন্যের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অবাধে ও নিঃশঙ্ক চিত্তে আপন গুপ্ত মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যাট্‌সিনি এতদবস্থায় একবৎসর কাল মার্সেলিসে অবস্থিত হইয়া প্রবন্ধসংরচন, প্রুফসংশোধন ও পত্রাপত্রি লেখনে এবং গভীর মধ্য রজনীতে ইতালী হইতে সমাগত জাতীয় দলের সভ্যদিগের সহিত ও ফরাশি সাধারণতান্ত্রিক দলের অধিনায়কদিগের সহিত গুপ্ত মন্ত্রণায় নিরত রহিলেন।

এমন সময় ফরাশি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে একটী ভীষণ দুর্ণাম রটনা করিলেন। ফরাশি গবর্ণমেণ্ট ম্যাট্‌সিনির বিরুদ্ধে—অপ্রামাণ্য ও অমূলক অপবাদ প্রচার; দোষোদ্ঘোষণ, যাহার প্রতিবাদ সম্ভবপর নহে; এক সংবাদপত্রে এই উদ্দেশ্যে সন্দেহ স্থাপন যে অপর সম্বাদপত্র লেখকেরা এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার নিন্দা সর্ব্বত্র প্রচারিত করে; জেস্যুইট্‌দিগের ন্যায় অন্তর্নিগূহিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুমান করা; এবং সমগ্র পত্র হইতে এরূপ পরিবর্ত্তিত ও বক্রীকৃত ভাবে খণ্ডাংশ সকল প্রকাশ করা, যাহাতে লেখকের অনভিপ্রেত অন্য অর্থ বুঝাইতে পারে—ইত্যাদিরূপ যে নির্যাতন-পরম্পরা অবলম্বন করেন পূর্ব্বোক্ত দুর্ণাম রটন তাহার সূত্রপাত মাত্র। ইতালীর যথেচ্ছাচারী রাজমাত্রই লুই-ফিলিপের পুলিশের নিকট এইরূপ নির্যাতন প্রণালী শিখিতে লাগিলেন। এই প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া ইতালীয় ঐতিহাসিক রাজকর্ম্মচারীরা, নির্ণাম-সম্বাদপত্র-লেখক, সামান্য-পত্রিকা রচয়িতা, কর্ম্মপ্রার্থী বা পেন্‌সন্‌-ভিখারী, গুপ্তচর বা বাণিজ্য ব্যবসায়ী—যুদ্ধ সেনার পশ্চাৎবর্ত্তী শকুনির ন্যায় ত্রিশবৎসর কাল তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল।

এই রণবীরদিগের যুদ্ধপ্রণালী পশ্চাতে বা পার্শে আঘাত করা—সম্মুখ সমরে ইহাঁরা কখনই অগ্রসর হন না, যদি কখন হন তাহা হইলে নাম অপ্রকাশ রাখিয়া। তাঁহারা স্বকপোলকল্পিত বা প্রকৃত ম্যাট্‌সিনির প্রত্যেক কার্য্যের বিরুদ্ধে কুক্কুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কমিউনিষ্ট, গোঁড়া সোসালিষ্ট, বিভীষক, রক্তপিপাসু, প্রতিবাদসহনাসমর্থ, প্রবেশ-নিষেধক (Exclusive) দুরাকাঙ্ক্ষ ভীরু ও ষড়যন্ত্রী প্রভৃতি বিশেষণে অভিরঞ্জিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল তাহাদি-

গেরই মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন—যাহাদিগের সকলবিষয়েই সহজে বিশ্বাস জন্মে, অথবা যাহারা আপনদিগের অজ্ঞতাজ্ঞানে—পেচক যেমন দিবালোক সহিত পারে না তেমনই—কার্য্যের নামে কম্পিত-কলেবর হয়।

গুপ্তহত্যা বা তত্তোধিক জঘন্য গুপ্তহত্যার আদেশ রূপ অপবাদ ম্যাট্সিনির বিরুদ্ধে প্রচারিত হইল। ফরাশি গবর্ণমেণ্ট ম্যাট্সিনিকে ধরিতে না পারিয়া সংক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন যে ম্যাট্সিনির বিরুদ্ধে এইরূপ অপবাদ উদ্ভাবিত করা যাউক যাহাতে, যে লোকের প্রীতি ও ভক্তি ম্যাট্সিনির এক মাত্র অবলম্বন, তিনি তাহা হইতে নিশ্চয়ই বিচ্যুত হইবেন। এই জন্য তাঁহারা ম্যাট্সিনির নাম জাল করিয়া মণিটর নামক পত্রিকায় তাঁহার নাম স্বাক্ষরিত একখানি আদেশলিপি প্রচারিত করিলেন।

আদেশ লিপির মর্ম্ম এই—"১৫ই অক্টোবর রজনী দশ ঘটিকার সময় মার্সিলিসে নব্য ইতালী সমাজের একটী অধিবেশন হয়। রোডেস্ সমাজের সভাপতি ইমিলিয়ানি, স্কুবিএটী, লাজারেচি, এবং আন্দ্রিয়ানি নামক ব্যক্তি-চতুষ্টয়ের নামে এক অভিযোগপত্র প্রেরণ করেন। সেই অভিযোগ পত্রের বিচারই এই সভার সেই অধিবেশনের কার্য্য ছিল। সভায় উক্ত ব্যক্তি-চতুষ্টয়ের অপরাধ সাব্যস্ত হইল। অপরাধ গুলি এই—'প্রথমতঃ ইহারা আমাদিগের পবিত্র সমাজের বিরুদ্ধে কতকগুলি কলঙ্কপূর্ণ রচনা প্রচার করে, এবং দ্বিতীয়তঃ ইহারা জঘন্য পোপ-গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া আমাদিগের পবিত্র স্বাধীনতা-সমরের উদ্যোগ সকল বিফল করিতে চেষ্টা করে, এই জন্য নব্য ইতালী সমাজ অনেক বিবেচনা ও বিচারের পর একবাক্যে ইমিলিয়ানি ও স্কুবিএটীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। পূর্ণ প্রমাণ না পাওয়ায় লাজারেচি ও আন্দ্রিয়ানির প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ করা গেল না, কেবল বেত্রাঘাত ব্যবস্থা করা গেল, এবং রোডেস্ সভার প্রতি ভার হইল তাঁহারা যেন তাহাদিগকে চির-দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। রোডেস্ সভার সভাপতির প্রতি এই আদেশ প্রদত্ত হইল—তিনি যেন এমন চারিজন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করেন যাহারা বিশদিনের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ অস্বীকৃত হইলে যেন অচিরাৎ তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

"মার্সেলিসের প্রধান সভার সম্মুখে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর, রজনী দ্বিপ্রহরের সময় এই আদেশ প্রদত্ত হইল।

"ম্যাটসিনি, সভাপতি।

"সেসিলিয়া, কর্ম্মচারী।"

এই পত্রে যে গুপ্ত হত্যার উল্লেখ আছে তাহা বাস্তবিক ঘটিয়াছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২০এ অক্টোবর আভেরণ প্রদেশের রোডেজ্ নগরের রাজপথে ইমিলি-

য়ানি নামক এক ব্যক্তি সত্য সত্যই কতিপয় ইতালীয় নির্ব্বাসিত দ্বারা আক্রান্ত ও আহত হয়। কিন্তু সে আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই; এবং আততায়ীরাও প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই দণ্ডের অনতিকাল পরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩১এ মে উক্ত ইমিলিয়ানি এবং তাহার সহচর লাজারেচি নামক আর এক ব্যক্তি গার্ভিয়োলি নামক কোন ইতালীর নির্ব্বাসিত যুবকের হস্তে হত হয়।

হত দুই জনই মডেনার ডিউকের গুপ্ত চর। যৎকালে এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, ম্যাট্‌সিনি হত ও হত্যাকারীদিগের কাহারও অস্তিত্ব মাত্রও অবগত ছিলেন না।

ইহার অব্যবহিত পরেই আভেরণ প্রদেশের 'জর্ণাল ডি আভেরনস' নামক পত্রিকায় এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বলিয়া ম্যাট্‌সিনির নামে এক অভিযোগ প্রকাশিত হয়। ম্যাট্‌সিনি এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে ট্রিবিউন্ নামক পত্রিকায় যে পত্র খানি লিখেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"সুবিখ্যাত ট্রিবিউন্ পত্রের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

"মহাশয়! জর্ণাল ডি আভেরনসের, ২৭এ অক্টোবর তারিখের সংখ্যায় ইহা মডেনার ডিউকের পূর্ব্ব অশ্বপাল ইমিলিয়ানি নামক কোন ব্যক্তির গুপ্ত হত্যা উপলক্ষে এই রূপ মত প্রকাশ করিয়াছে :—

"আভেরণের প্রিফেক্ট এই হত্যা সম্বন্ধে যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে এরূপ বিশ্বাস হয় যে হতভাগ্য ইমিলিয়ানির আততায়িগণ নব্য ইতালী নামক সমাজের অধিনায়কদণের হস্তে কল-যন্ত্র স্বরূপ (Instruments); যে সহচরগণ তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীতে বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত, ইহারা এই সকল কল-যন্ত্র দ্বারা তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন।

"উক্ত পত্রিকার সম্পাদক যদি এই বাক্যগুলি দ্বারা সেই 'নব্য ইতালী' সমাজের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন—যাহার সভ্যেরা একটি নির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক ধর্ম্মে দীক্ষিত, একমাত্র যে ধর্ম্ম ইতালীর পুনরুদ্ধার সম্ভবপর বলিয়া যাহার সভ্যদিগের অবিচলিত বিশ্বাস, 'নব্য ইতালী' নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় যে সমাজের ভিত্তিভূত মত সকল বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে—তাহা হইলে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে আমি সেই সমাজের একজন অধিনায়ক, এবং সেই পত্রিকার একমাত্র সম্পাদক। সুতরাং সেই সভার অন্যতম সভ্য বলিয়া সেই সভার নামে এই অভিযোগের প্রত্যুত্তর দানে আমার অধিকার আছে। অধিকার আছে বলিয়াই আমি অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতেছি যে পূর্ব্বোক্ত পত্রিকার সম্পাদক ও অন্যান্য যে কেহ এরূপ অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছেন তাঁহাদিগের সকলেরই কথা

সম্পূর্ণ মিথ্যা।

"আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে কেহই এরূপ লজ্জাকর অভিযোগের স্বাপক্ষ্যে প্রমাণের ছায়াও অবতারিত করিতে পারিবেন না,—যাঁহাদিগের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে তাঁহারা যে আভেরন্ পত্রিকার সম্পাদকের তুল্য সম্ভ্রান্ত তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

"আমি আরও বলিতেছি যে—যে দল আপনাদিগের সংস্থাপিত নিয়ম প্রতিপালনে অক্ষম বা অনিচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রেরই উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প, এরূপ কোন দলের অস্তিত্ব সম্ভবপর বলিয়া আভেরন্ পত্রিকার সম্পাদক ভিন্ন আর কেহই বিশ্বাস করিবেন না। নব্য ইতালী সমাজের করযন্ত্র কেহ নাই। যে সকল স্বাধীন পুরুষ স্বাধীন ভাবে ইহার মত সকল গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকেই এই সমাজ সভ্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহার সভ্যেরা যথাকালে কেবল অষ্ট্রীয়দিগের বিনাশ সাধন করিবেন বলিয়াই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

"এ-ই আমার উত্তর।

"ফরাসি সম্পাদক যে সকল মার্গহত্যা ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে ফ্রান্সে এরূপ ব্যাপার কখনই জাতীয় আকার ধারণ করিতে পারে না, ইহা উত্তর দানের অযোগ্য। প্রত্যেক ফরাশিলেখক—যিনি লিখিবার পূর্ব্বে একবার ভাবেন—জানেন যে এরূপ মার্গহত্যা জাতিবিশেষের বিশেষ ধর্ম্ম নহে; এবং কোন জাতির জাতীয় আচার ব্যবহারের বিসদৃশ অপরাধ সকলও তাঁহাদিগের দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

"রেমন ও ডেল্‌পেকের হত্যাকারীরা ইমিলিয়ানির হত্যাকারিদিগের সমশ্রেণীক।

৩০এ অক্টোবর ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ। } আপনার একান্ত অনুগত ম্যাটসিনি"

ম্যাট্‌সিনি মনিটর পত্রের উত্তরে ন্যাসন্যাল্ পত্রিকায় এই মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখেন:—

"মহাশয়!—বিগত ৭ই জুনের মনিটরে রোডেসের হত্যাসম্বন্ধে সত্যের আকারে কতকগুলি অলীক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার সারাংশ এই—'মার্সেলিস্-স্থিত নব্য ইতালী নামক কোন গুপ্ত সমাজের আদেশেই লাজারেচি ও ইমিলিয়ানির গুপ্তহত্যা সংসাধিত হইয়াছে।' মনিটায় সেই স্বকপোলকল্পিত আদেশলিপি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহাতে সেই সমাজের সভাপতি বলিয়া আমার নাম সংযোজিত করিয়াছেন।

"যে গবর্ণমেন্ট—পিরিনিসে মিথ্যা শপথকারী, আঙ্কোনায় পুলিসের গুপ্তচর, ফ্রাঙ্কফোর্টে অপজ্ঞাপক (Informer), এবং পবিত্র সম্মিলনের (Holy alliance) নামে তাহার উপকারার্থ নির্যাতনকারী—আমার ও মৎসদৃশ স্বদেশানুরাগী অন্যান্য নির্ব্বাসিতের বিরুদ্ধে এইরূপ যখন যেরূপ প্রয়োজন, নূতন নূতন আকার ধারণ করিয়াছেন;

কোন স্বাধীন-হৃদয় তেজস্বী ব্যক্তি অসামান্য পৌরুষ ও অধ্যবসায় সহকারে দুর্ব্বহ দুঃখভার অবিচলিত চিত্তে বহন করিতেছেন দেখিলে যে গবর্ণমেণ্টের অহঙ্কার আহত হয়;—সেই গবর্ণমেণ্ট যে আমি যাহাতে দুঃখ পাই এমন কোন ষড়যন্ত্রে নিমগ্ন হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? যে ফ্রান্সে আমি স্বাধীনভাবে বাস করিতেছিলাম, সে ফ্রান্স হইতে আমি যে বিদূরিত হই তাহা যে এরূপ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এবম্ভূত গবর্ণমেণ্টের সহিত আমার মত স্বদেশানুরাগিদিগের সমর কেবল মরণে অবসিত হইবে।

"কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহার শত্রুকে আহত করিয়া ক্ষতস্থানে বিষপ্রয়োগ করিবেন; নির্যাতন-তূণ হইতে এক একটী করিয়া সমস্ত বাণ শত্রুগাত্রে নিক্ষেপ করিয়া যে আবার অপযশশর তাহার বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করিবেন; এবং তাহাকে সুখ, শান্তি ও স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিয়া অবশেষে গৌরবেও বঞ্চিত করিবেন—এরূপ নীচতা ঈদৃশ গবর্ণমেণ্টেও আমি সম্ভবপর বলিয়া মনে করি নাই। সেই কৌশলময় ও জঘন্য রচনার যে যে স্থল পরস্পর বিসম্বাদী, সে সে স্থল উদ্ধৃত করিয়া আমি বৃথা সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। * * *

"এরূপ অভিযোগ যেরূপ নীচ স্থান হইতে উত্থিত হইয়াছে, তাহাতে আমার পক্ষে দোষক্ষালণ চেষ্টায় লাঘব স্বীকার বটে, কিন্তু তথাপি মনিটর যেরূপ অসমসাহসিকতার সহিত এক জন নিরীহ ভদ্রলোকের নাম পূর্ব্বোক্ত আদেশলিপির নিম্নে প্রদান করিয়াছেন, সে অসমসাহসিকতা দণ্ড না পাইলে জগতে দুষ্টের অতি প্রাদুর্ভাব হইবে। এই জন্য আমি বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিব।

"আমি বিচারালয় কেন্দ্র দিয়া জানিব কি সাহসে মনিটর একমাত্র অপ্রমাণীকৃত দলিলের উপর নির্ভর করিয়া আমার মত একজন নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

"যাহা হউক, ইত্যবসরে অনেকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার পক্ষ সমর্থন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার পক্ষসমর্থনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন এ অভিযোগ আমি অস্বীকার করি ইহা বোধ হয় তাঁহারা আশা করিতে পারেন।

"সেই জন্যই আমি স্পষ্টাক্ষরে ইহা অস্বীকার করিতেছি।

"আমি অসন্দিগ্ধভাবে আরোপিত বিবরণ, [দণ্ডাজ্ঞা] এবং সমস্ত বিষয় আমূল অস্বীকার করিতেছি।

"আমি মুক্তকণ্ঠে গবর্ণমেণ্টকে ও গবর্ণমেণ্টের মুখযন্ত্রস্বরূপ মনিটরকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে।

"আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে গবর্ণমেণ্ট, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, এবং মদ্বিষয়ক অপযশের সৃষ্টিকর্ত্তা বৈদেশিক পুলিশ—কেহই আমার স্কন্ধে আরোপিত অভিযুক্ত বিষয়ের একবর্ণও প্রমাণ ক-

িতে পারিবেন না, অথবা যে আদেশ-লিপি প্রচারিত হইয়াছে মন্নামাঙ্কিত তাহার আসল লিপি কেহই দেখাইতে পারিবেন না। এবং আরোপিত লিপির একটী ছত্রও দেখিয়া বোধ হইবে না যে এরূপ কার্য্য আমা দ্বারা সম্ভবপর।

জোসেফ্ ম্যাট্‌সিনি।"

এই প্রতিবাদে মনিটর প্রত্যুত্তর রহিত। আসল দলিল কখনই বাহির করা হয় নাই। ম্যাটসিনি তৎকালে মার্সিলিসে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন; সুতরাং তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইতে বা কাহার ও উপর ওকালতনামা দিতে অক্ষম হওয়ায় মনিটরের নামে মিথ্যা অপযশ-ঘোষণার অভিযোগ করিতে অক্ষম হয়েন।

যাহা হউক আদালত এই বিষয়ের অন্যরূপ মীমাংসা করিলেন। অভেরণের উচ্চতর আদালত বিচারে স্থির করিলেন যে এই হত্যাকাণ্ড পরস্পর বিবাদের ফল, এবং পূর্ব্বাভিসন্ধি ব্যতীত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই জন্য উক্ত বিচারালয় হত্যাকারিদিগের প্রাণদণ্ড না করিয়া গ্যাভিয়ালির প্রতি চির দাসত্ব দণ্ড ও লা সেসিলিয়াকে পূর্ণ মুক্তি প্রদান করিলেন।

আবার অনুমান ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে গিস-কেট্ নামক এক ব্যক্তি—যিনি ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পুলিশের প্রিফেক্টের পদে অভিষিক্ত হন—তদীয় জীবনীমালা লিখিবার সময় তদ্বিরুদ্ধে পূর্ব্বারোপিত অভিযোগ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করেন। ম্যাট্‌সিনিকে অগত্যা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং গিস্‌কেট্ তথায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে তিনি যে ম্যাট্‌সিনির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন সে অন্য ব্যক্তি—ইনি অতি সচ্চরিত্র এবং এরূপ কোন অপরাধ করিতে অক্ষম।

ইহার কিছু পরে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সার জেম্‌স গ্রেহাম নামক একজন ইংলণ্ডীয় মন্ত্রী ম্যাট্‌সিনির বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত অভিযোগ পুনরুত্থাপিত করেন। কিন্তু আভেরণের জজের নিকট হইতে এবিষয়ে যে সম্বাদ পান, তাহাতে তাঁহাকে হাউস্ অব কমন্‌সে প্রকাশ্যরূপে ম্যাট্‌সিনির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়। তথাপি ম্যাট্‌সিনির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সম্বাদপত্রে বা নির্ণাম পত্রে বার বার অনেক দিন ধরিয়া ক্রমাগত এরূপ কুৎসা বাহির হওয়ায়, ধীরে ধীরে অনেকের মনে প্রতীতি জন্মিল—যে ম্যাট্‌সিনি একজন শোণিত-পিপাসু প্রতিহিংসা-পরবশ ভীষণ প্রকৃতির লোক, এবং নব্য ইতালী সমাজের দণ্ডবিধিতে শপথ-ভঙ্গকারী বা গৃহীত মতের বিরুদ্ধাচারী সভ্যগণের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর দণ্ড ব্যবস্থাপিত আছে। এই ভীষণ অপবাদের বিরুদ্ধে ম্যাট্‌সিনি স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম:—

"রক্তমোক্ষণ—যাঁহারা আমাকে ভালরূপ জানেন তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে—রক্তমোক্ষণ আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি এবং আমার বিশ্বাস যে সর্ব্বপ্রকার ভয় প্রদর্শন ভাবি অমঙ্গল নিবা-

রণের অতি নৃশংস, ন্যায়বিগর্হিত, এবং নিন্দ উপায়, এই জন্য ইহাও আমার গভীর ঘৃণার বিষয়; অমঙ্গল নিবারণের সবিশেষ ফলপ্রদ উপায়—উদার ভাব সকলের সর্ব্বতোবিকীরণ। এবং আমার বিশ্বাস যে প্রতিহিংসা বা প্রায়শ্চিত্তকে দণ্ডবিধির ভিত্তিভূমি করা নীতি-বিরুদ্ধ ও নিষ্ফল—এরূপ দণ্ড ব্যক্তি বিশেষ দ্বারাই প্রযুক্ত হউক বা সমজ দ্বারাই প্রযুক্ত হউক। যে দুর্ল্লঙ্ঘ্য বল মানব স্বত্ব ও মানব কর্ত্তব্যের উল্লঙ্ঘন করে, তাহার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হওয়ার শোচনীয় আবশ্যকতামাত্র আমি স্বীকার করি।

"নব্য ইতালী সমাজ কার্ব্বোনারিজম্ সম্প্রদায়ের প্রতিহিংসা-প্রবণ নিয়মাবলী ও ব্যবস্থাবলী অস্বীকার করিয়া বিশ্বাসঘাতকদিগের বিরুদ্ধে পূর্ব্বে যে মৃত্যুভয় প্রদর্শিত হইত তাহা তুলিয়া দিয়াছেন। নব্য ইতালী সমাজের কেন্দ্রভূত সভা হইতে কেবল একমাত্র দণ্ডবিধি ও একমাত্র বিধিব্যবস্থা বাহির হইয়া থাকে। সে দণ্ডবিধি বা বিধি—ব্যবস্থা সকলেরই নিকট ধারণ করা হইয়াছে, সুতরাং সকলেই তাহার ভাল মন্দ বিচার করিতে পারেন।

"যাঁহারা গুপ্তচর বা বিশ্বাস ঘাতকদিগের ধ্বংসবিধানের জন্য অনুরোধ করিতেন, তাঁহাদিগকে আমি বলিতাম যে শুদ্ধ সেই সকলের নাম প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের গুণব্যাখ্যা কর—সেই অপযশই তাহাদিগের যথেষ্ট দণ্ড হইবে।

"এরূপ সম্ভব যে কখন কখন আমাদিগের এই সকল নির্দ্দিষ্ট নীতির বিরুদ্ধে প্রদেশবিশেষে আমাদিগের অজ্ঞাতসারে কোন কোন কার্য্য হইয়া থাকে; কখন কখন দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতকদিগের বিরুদ্ধে কোনও প্রাদেশিক সভা হইতে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু সে দোষ নব্য ইতালী সমাজের উপর আরোপিত করা যুক্তিবিগর্হিত।

"নব্য ইতালী সমাজের লক্ষ্য দ্বিবিধ। প্রথম লক্ষ্য ইতালীর প্রধান বল—একমাত্র আশা—নব্য সম্প্রদায়কে অকৃত্রিম বৈপ্লবিক মতের অধীনেতৃ-বৃন্দের অধীনে আনা। দ্বিতীয় লক্ষ্য ইহার অধিনেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিগণ দ্বারা ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একতা, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রূপ একলক্ষ্যে একত্রীকৃত করা।

"প্রথম লক্ষ্য সংসাধনের ভার অবস্থা ও মর্য্যাদা অনুসারে নব্য ইতালী সমাজের সমস্ত সভ্যের উপরই বিন্যস্ত হইয়াছে।

"দ্বিতীয় লক্ষ্য সংসাধনের ভার মাধ্যমিক ও প্রাদেশিক সভা-নিচয়ের উপর প্রদত্ত হইয়াছে।

"এই জগৎ অনন্ত উন্নতিরূপ একমাত্র নৈতিক বিধিদ্বারা পরিচালিত।

"মহতী অবদান-পরম্পরার সংসাধনের জন্য মানবের সৃষ্টি। তাঁহার বৃত্তিনিচয়ের পূর্ণ, অনিযন্ত্রিত, এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ

পরিপুষ্টি সাধনের জন্য তাঁহার সৃষ্টি।

"এইলক্ষ্য সংসাধনের জন্য তাঁহাকে যে উপায় প্রদান করা হইয়াছে তাহা—মানবে মানবে মিলন।

"যখন এক লক্ষ্যে—এক নিয়মের শাসনাধীনে মানবগণের একীভাব সংসাধিত হয়, তখনই মানবজাতি সম্ভবপর পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হন।

"এই জন্য নব্য ইতালী সমাজ, মানব জাতির বিশ্বজনীন সম্মিলন—স্বাধীন মানবের সমস্ত চেষ্টার চরম ফল বলিয়া স্বীকার করেন। ইহা মানব জাতির বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বভাব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহা প্রচার করিয়া থাকেন।

"যাহাতে মানব জাতি সাধারণ উন্নতিপথে একত্র সমবেত হইয়া অবিসম্বাদে গমন করিতে পারেন, সেইজন্য তাঁহাদিগের সকলকেই একটী. সাধারণ সাম্যস্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। সেই বিশ্বজনীন সমাজের সভ্য হওয়ার পূর্ব্বে, তাঁহাদিগের একটী স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, স্বতন্ত্র নাম এবং স্বতন্ত্র শক্তি চাই।

"মানবজাতি-সাধারণ প্রশ্ন লইয়া বিব্রত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদিগকে অগ্রে এক একটী স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত হইতে হইবে।

"কিন্তু একতা ব্যতীত কোন জাতির জাতীয় অস্তিত্ব অসম্ভব।

"এবং স্বাতন্ত্র্য (Independence) ব্যতীতও চিরস্থায়ী একতা সম্ভবপর নহে। যথেচ্ছাচারিগণ—লোকসাধারণের শক্তির হ্রাস করা যাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য—লোকসাধারণের বিচ্ছেদসাধনে সতত বদ্ধপরিকর।

স্বাধীনতা ব্যতীত ও প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য সম্ভবপর নহে।

"স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইলেই স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীন ব্যক্তি ও স্বাধীন জাতিই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সক্ষম। তাহাদিগেরই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জনে স্বার্থ আছে, তাহারাই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে বাধ্য।

"এইজন্যই ইতালীর একতা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করা নব্য ইতালী-সমাজের অদ্বিতীয় লক্ষ্য।

"যেখানে প্রভুশক্তি পরিবারবিশেষে পুরুষানুক্রমে সংক্রান্ত, সেখানে চিরস্থায়িনী স্বাধীনতা অসম্ভব।

"প্রভুশক্তির প্রবণতা আত্মপরিবর্দ্ধন ও আত্মঘনীকরণের দিকে।

"যেখানে প্রভুশক্তি পুরুষানুক্রমিক, সেখানে প্রথম পুরুষলব্ধ সুবিধা গুলি দ্বিতীয় পুরুষের ভিত্তিভূমি হয়। পুরুষানুক্রমিক প্রভুশক্তিধারয়িতা হইতে লৌকিক মূলের স্মৃতি বিলুপ্ত করে। পুরুষানুক্রমিক স্বার্থ—শাস্তা ও জাতীয় স্বার্থের অন্তর্ব্বর্ত্তী হয়। ইহাতে একটী সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষ অবশেষে বৈপ্লবে পরিণত হয়। প্রত্যেক বৈপ্লবিক জাতির কর্ত্তব্য যতশীঘ্র সম্ভব অনিবার্য্য বিপ্লবের অবসান করা; এবং পূর্ণ অবসান করার

একমাত্র উপায় বিপ্লবের পথ সকল বন্ধ করিয়া ভবিষ্য বিপ্লবের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত করা।

"লোকসাধারণের উপকারার্থ লোক-সাধারণ কর্ত্তৃকই বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিপ্লব লোকসাধারণের অভীপ্সিত করিতে হইলে লোকসাধারণের মনে এই প্রতীতি উৎপাদন করিতে হইবে যে ইহা তাহাদিগেরই জন্য অনুষ্ঠিত হই-য়াছে।

"এই প্রতীতি উৎপাদন করিতে হইলে অগ্রে লোকসাধারণরকে তাহা-দিগের প্রকৃতিসিদ্ধ স্বত্ব শিখাইতে হইবে; এবং পরে তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে সেই সকল প্রকৃতিসিদ্ধ স্বত্বের অনিয়ন্ত্রিত পরিভোগের একমাত্র উপায় স্বরূপ তাহা-দিগকে বিপ্লব স্বীকার করিতে হইবে।

"সুতরাং লোকসাধারণকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে হইবে—যে সেই বিপ্লবের লক্ষ্য একটী নূতন লৌকিক প্রণালীর প্রবর্ত্তনা, এই লৌকিক প্রণালীর কার্য্য—অসংখ্য দীন দরিদ্র প্রজাবৃন্দের অবস্থার উন্নতি সাধন করা; এই প্রণালী স্বাধীন নাগরিক মাত্রকেই তাহাদিগের বৃত্তিনিচয়ের পরি পুষ্টি সাধনে ও আপন আপন কার্য্যের ব্যবস্থাপনে অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা প্রদান করিবে; এই প্রণালীর ভিত্তিভূমি পূর্ণ সাম্য; এবং স্বাধীন, সুশৃঙ্খল, সহজ ও অল্প-ব্যয়সাধ্য নির্ব্বাচন।

"এই প্রণালী সাধারণতান্ত্রিক।

"নব্য ইতালী সমাজ ঐক্যবাদী ও সাধারণতান্ত্রিক।

"ধর্ম্ম বিষয়ে ইহা সর্ব্ব-প্রকার সাম্প্র-দায়িকতা ও শ্রেষ্ঠতন্ত্রতার প্রতিকূল।

"সাধারণ মঙ্গলে ব্যক্তিগত ক্ষমতার প্রয়োগকল্পী অনন্ত বিধি হইতে যে সকল ব্যক্তিগত স্বত্ব উপলব্ধ নহে, তৎসমস্তের উচ্ছেদ সাধন করা; শ্রমবিক্রেতা ও শ্রম-ক্রেতার সংখ্যা ক্রমে হ্রাস করা; জাতি-সৃষ্টিকারি সার্ব্বশ্রেণীক সংমিশ্রণের দিন নিকটবর্ত্তি করা; ব্যক্তিগত বৃত্তিনিচয়ের সম্ভবতঃ পূর্ণতম পরিপুষ্টি সাধন করা; এবং যাহাতে জাতীয় শিক্ষার অনন্ত উন্নতি হয় ও লোকসাধারণের অভাব বিদূরিত হয় এরূপ বিধির সংস্থাপনা করা—ইত্যাদি কার্য্যই এই সমাজের প্রধান লক্ষ্য।

"যাহা হউক, যতক্ষণ না বিপ্লবের প্রথম সোপান—বৈদেশিক অধীনতা হই-তে স্বাতন্ত্র্য লাভ—আলব্ধ হইতেছে, ততক্ষণ 'নব্য ইতালী সমাজ' সমস্ত চেষ্টা সেই লক্ষ্যে আবদ্ধ রাখার ঔচিত্য স্বীকার করিতেছেন। যতক্ষণ না ইতালীয় ক্ষেত্র বৈদেশিক পাদচারণ হইতে নির্ম্মুক্ত হই-তেছে, ততক্ষণ এই সমাজের একমাত্র কার্য্য হইবে অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং সর্ব্বথা—যুদ্ধ ঘোষণা করা।

"এই রূপে নব্য ইতালী সমাজ অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য ও স্বতঃসিদ্ধ স্বত্বের খ্যাপনা করিয়া, যতদিন না ইতালী বৈদে-শিক অধীনতা হইতে শৃঙ্খল-মুক্ত হইতেছে, ততদিন তল্লাভের চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবেন।

"ইত্যবসরে, আভ্যুত্থানিক কালে, নব্য ইতালী সমাজ প্রত্যেক প্রদেশ হইতে এক এক জন প্রতিনিধি লইয়া, একটী কেন্দ্রীভূত অলজ্য্য-শাসন প্রভুশক্তি সংস্থাপনের পোষকতা করিবেন। যতদিন বিপ্লব পরিসমাপ্ত না হয়, ততদিন এই মহতী সভা স্থায়ী থাকিবে; ইহার কার্য্য-সকল সাধারণ মত ও নব্য ইতালী সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে; অবশেষে বিপ্লব পরিসমাপ্ত হইলে ইহা চিরস্থায়ী জাতীয় সভায় পরিণত হইবে। মুদ্রা-যন্ত্র, ফৌজদারী বিচার, সংযোজন ও সংশাসন প্রভৃতি বিষয়ের নিয়মন করা এই প্রভুশক্তির সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য হইবে। এদিকে বহির্বাহ্য (Political), অন্তর্বাহ্য (Civil) বিধিমালা সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত একটী সমিতি বসিবে। ইতালী—বৈদেশিক শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত সমিতি দ্বারা স্থিরীকৃত বিধিমালা বিচারের নিমিত্ত জাতীয় সভায় সমর্পিত হইবে।

"ইতালীয় ক্ষেত্রে একটী শত্রু থাকিতে শত্রুদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাবমাত্রও অশ্রাব্য। নগরসকলের রক্ষার ভার নাগরিকদিগের হস্তেই সমর্পিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে নাগরিকসকলকে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিতও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইবে, এবং তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া জাতীয় মহতী সেনার সাহায্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। এই বিভক্ত সেনাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে চতুর্দ্দিকে বিভক্ত হইয়া শত্রুসেনাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে।

"প্রথমে অস্ত্র ও জয়; তাহার পর বিধিমালা ও শাসন-প্রণালীর সংগঠন। নব্য ইতালী—সমাজ এই নব ধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করিলেন। অস্ত্র ও নৈতিক শিক্ষা দ্বারাই নব্য ইতালী সমাজ এই ধর্ম্মবিপ্লব সংসাধনের প্রস্তাব করিতেছেন।

"অস্ত্র প্রাপ্তির জন্য নব্য ইতালী সমাজ ষড়যন্ত্র করিবেন। নৈতিক শিক্ষার জন্য পত্রিকা, সম্বাদ পত্র প্রভৃতি প্রচার করিবেন।

"নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা লিখেন ও ষড়যন্ত্র করেন, এবং তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে ইতালীর উদ্ধার কেবল ইতালীয় বিপ্লব দ্বারাই সংসাধিত হইতে পারে। এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার আংশিক অভ্যুত্থানের প্রতিবাদী। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে আংশিক অভ্যুত্থানে ইতালীর অবস্থা বরং অধিকতর শোচনীয় হইবে।

জাতীয় অভ্যুত্থান কেবল জাতীয় বল দ্বারাই সংসাধিত হইবে। বৈদেশিকের হস্তে কখনও প্রকৃত ও চিরস্থায়ী স্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে না। বৈদেশিক সেনার ইতস্ততঃ সঞ্চালন হইতে নব্য ইতালী সমাজ সুবিধা লইতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু ইহার উপর তাঁহারা আপনাদিগের সমস্ত আশা সন্ন্যস্ত করিবেন না।

"নব্য ইতালী সমাজের প্রত্যেক সভ্যের উপর এই সকল সাধারণ নিয়ম

প্রচারের ভার অর্পিত হইল।

—০০—

নব্য ইতালী সমাজের গঠনপ্রণালী।

"একটী" কেন্দ্রীভূত বা মাধ্যমিক সভা।

"ইতালীর প্রত্যেক নগরে এক একটী করিয়া প্রাদেশিক সভা।

"প্রত্যেক নগরে এক একজন করিয়া সংগঠক (Organizer)।

"কতকগুলি প্রচারক ও কতকগুলি সভ্য।

"মাধ্যমিক সভা প্রাদেশিক সভার সভ্য নির্ব্বাচন, সেই সভ্যগণকে সাধারণ উপদেশ প্রদান, সেই প্রাদেশিক সভা গুলির পরস্পর শৃঙ্খলা স্থাপন, এবং সভ্যগণকে পরস্পর-পরিচায়ক সঙ্কেতাবলী নির্দ্দেশ প্রভৃতি কার্য্য করিবেন। সমাজের পত্র পত্রিকাদির মুদ্রাঙ্কন ও বিতরণ, সভ্য সংখ্যানির্ণয়, কার্য্যের সাধারণ শৃঙ্খলা স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যের ভারও এই মাধ্যমিক সভার উপর বিন্যস্ত থাকিবে। এই মাধ্যমিক সভা প্রাদেশিক সভাগুলির উপর অন্যায় ও অকারণ আধিপত্য করিতে পারিবেন না।

"প্রত্যেক প্রাদেশিক সভা আপন আপন প্রদেশের সমাজ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। প্রাদেশিক সভ্যগণের পরস্পর-পরিচারক সঙ্কেতচিহ্নের স্থিরকরণ, মাধ্যমিক সভার উপদেশবলীর সংবহন, মাধ্যমিক সভার মাসিক আত্মোন্নতিসূচক কার্য্যবিবরণ প্রেরণ, কত অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে, অবান্তর বিভাগসকলের বা মত কি, এবং কি কি উপায়ই বা অবলম্বন করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে মাধ্যমিক সমাজের নিকট আত্ম-মন্তব্য খ্যাপন—প্রভৃতি কার্য্যের ভার প্রাদেশিক সভাগুলির উপরই সমর্পিত হইবে।

"নাগরিক সংগঠক প্রাদেশীয় সভা দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। তিনি প্রাদেশিক সভার নিকট এক খানি করিয়া মাসিক কার্য্য-বিবরণ পাঠাইবেন; এবং প্রাদেশিক সভা মাধ্যমিক সভার সহিত যে সকল বিষয়ে লেখালিখি করেন, তিনিও মাধ্যমিক সভার সহিত সেই সকল বিষয়ে লেখালিখি করিতে পারিবেন।

"নাগরিক সংগঠক ও প্রাদেশিক সভা দ্বারাই প্রচারকগণ নির্ব্বাচিত হইবেন। বুদ্ধিমান্ ও সুহৃদয় ব্যক্তি দেখিয়াই প্রচারক মনোনীত করিতে হইবে। নব ধর্ম্মে সভ্যগণকে দীক্ষিত করা ও সভার মূলমন্ত্র গুলি তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশিত করাই প্রচারকগণের প্রধান কার্য্য। প্রত্যেক প্রচারক আত্ম-নগর-সংগঠকের সহিতই চিটি পত্র লেখালিখি করিবেন। নাগরিক সংগঠক যে যে বিষয়ে প্রাদেশিক সভার সহিত চিটিপত্র লেখালিখি করিয়া থাকেন, প্রচারকগণ সেই সকল বিষয়েই নাগরিক সংগঠকের সহিত চিটিপত্র লেখালিখি করিবেন। প্রচারকগণ নাগরিক সংগঠকের নিকট তাঁহা-

দিগের মাসিক কার্য্য-বিবরণ প্রদান করিবেন এবং তাঁহার নিকট যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইবে তাহা দীক্ষিত সভ্যগণকে প্রদান করিবেন।

"প্রচারকগণ সচ্চরিত্র লোক দেখিয়াই সভ্য নির্ব্বাচিত করিবেন, তাঁহাদিগের অপরকে দীক্ষিত করার উপযোগিনী বুদ্ধি থাকার প্রয়োজন নাই। দীক্ষিত সভ্যগণ নিজ নিজ দীক্ষা-গুরু প্রচারকের অধীনে থাকিবেন, এবং তাঁহাদের যদি কোন সম্বাদ থাকে বা মন্তব্য প্রকাশ করার ইচ্ছা থাকে তাঁহারা দীক্ষাগুরুর নিকটই তাহা প্রকাশ করিবেন। এই দীক্ষিত সভ্যগণ নব্য ইতালী সমাজের মূল মন্ত্রগুলি সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইবেন এবং সর্ব্বদা কার্য্যের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

"প্রত্যেক সভ্যের একটী করিয়া গুপ্ত নাম থাকিবে, যদ্দ্বারা তিনি এই সমাজে পরিচিত থাকিবেন।

"সভার লক্ষ্য আত্ম-বিস্তৃতি। এই লক্ষ্য সাধনের প্রধান উপায় যুবক সাধারণের—বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর সংখ্যাতীত যুবকবৃন্দের—নিকট আত্ম-নিবেদন। এই যুবকবৃন্দের মনেই ভাবী আশা ও বর্ত্তমান প্রবণতার মূল দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে।

"প্রত্যেক সভ্য—যদি সামর্থ্য থাকে—এক একটী করিয়া রাইফেল বা মস্‌কেট বন্দুক ও পঞ্চাশটী করিয়া কার্ট্‌চ্‌ সংগ্রহ করিবেন। যদি অসমর্থ হন তাহা হইলে প্রাদেশিক সভার নিকট আবেদন করিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

"প্রত্যেক সভ্য, যদি তাঁহার অবস্থায় অনুমোদন করে, দীক্ষা কালে ও দীক্ষার পর প্রতি মাসে সভার ধনাগারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিবেন।

"এই প্রদত্ত অর্থ প্রাদেশিক ধনাগারে জমা হইবে। প্রাদেশিক সমাজ ইহা দ্বারা প্রাদেশিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কেবল পরিব্রাজক পাঠান, মুদ্রাঙ্কনব্যয়, অস্ত্রাদি ক্রয় প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সেই সঞ্চিত ধনের ক্ষুদ্রাংশ মাত্র মাধ্যমিক সমাজে প্রেরণ করিতে হইবে।

"দীক্ষাকালে কি পরিমাণে অর্থ দিতে হইবে, কিরূপে সেই অর্থের ব্যয় করিতে হইবে, এবং কাহাকেই বা সেই দীক্ষাশুল্ক হইতে মুক্তি দিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় প্রাদেশিক সভারই বিচার্য্য।

"মাধ্যমিক সমাজ অত্যন্ত আত্মআধিপত্য অস্বীকার করেন; একতা ও কার্য্য-প্রণালীর পূর্ব্বাপর-সঙ্গতি রক্ষার জন্য যেটুকু আধিপত্য একান্ত প্রয়োজনীয় তাঁহারা কেবল সেইটুকু আধিপত্যই সংস্থাপন করিবেন।

"নব্য ইতালী সমাজ কেবল, দুই প্রকার সঙ্কেতচিহ্ন ব্যবহার করিবেন। প্রথম-প্রকার চিহ্ন প্রাদেশিক সভা ও মাধ্যমিক সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত পরিব্রাজকগণ ব্যবহার করিবেন। দ্বিতীয়-প্রকার চিহ্ন কেবলমাত্র প্রাদেশিক সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্যগণ ব্যবহার করিবেন এবং ইহা মাধ্যমিক সভার অগ্রে জানাইতে হইবে।

"এই সঙ্কেত-চিহ্নগুলি প্রতি তিন

মাস অন্তর—এবং প্রয়োজন হইলে তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যেও—পরিবর্ত্তিত হইবে। এইরূপে এক প্রদেশের চিহ্ন পুলিশ কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইলেও, অপর প্রদেশের চিহ্নগুলি পুলিশের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকিবে।

পোপ চতুর্দ্দশ গ্রেগরীয় পত্রের উত্তরে যাজকমণ্ডলীর প্রতি ম্যাট্সিনির উক্তি।

"যে নৈতিক শক্তি দ্বাদশ শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপীয় একতার কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিয়াছিল, ইউরোপ এক্ষণে সে নৈতিক শক্তির প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। ইউরোপ সেই শক্তির প্রতি এক্ষণে যেরূপ উদাসীন তুষ্ণীভাব দেখাইতেছেন তাহা অপেক্ষা অধিকতর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ইহার উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না। পোপীয় প্রভুশক্তি অন্তর্হিত এবং তাহার সহিত ক্যাথলিক ধর্ম্মও বিলুপ্ত হইয়াছে।

"এবং পোপও স্বয়ং ইহা অবগত আছেন; পোপীয় প্রভুশক্তির বিলোপ তিনি স্বভাবজ জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যাজকমণ্ডলীকে (Bishops) যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই ধ্বংসের—দুরপনেয় ধ্বংসের—ধ্বনি স্বয়ং উত্থাপিত করেন; যাঁহারা এই মর্ম্মার্থ বুঝিতে সক্ষম, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন ভাবী ধ্বংসের ইহা অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়োত্তেজক ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হয় নাই।

"পোপের পত্রের জ্বলন্ত অক্ষরগুলি পাঠ কর—বর্ত্তমান যুগের ন্যায় এরূপ দলাদলি, ষড়যন্ত্র, পোপীয় রাজ্যের প্রতি আক্রমণ প্রভৃতি অন্য কোন যুগে পরিদৃষ্ট হয় নাই। একতাশৃঙ্খলের এক এক খানি গ্রন্থি যেন দিন দিন খসিয়া পড়িতেছে। ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রকাশ্যরূপে আক্রান্ত হইতেছে। এই অশুভ সর্ব্বতঃ প্রসারিত হইতেছে। মুদ্রাযন্ত্র প্রাচীন ধর্ম্মমতের বিরোধি মত সকল প্রচার করিতেছে। বোধ হইতেছে যেন পৃথিবীর উপর ঈশ্বরের কোপানল পতিত হইয়াছে। কুমারী (Virgin) ও প্রচারকগণের মধ্য দিয়া কেহ আর এক্ষণে মুক্তিপ্রার্থী হয় না।

"পোপের পত্রত এই বলে।

"এই অবস্থায় ক্যাথলিক ধর্ম্মের কিন্তু একমাত্র আশাস্থল যাহা ছিল তাহাও গিয়াছে। ল্যামেনেজের মত সকল যদি পোপ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে পোপীয় ধর্ম্মের ধ্বংস আরও কিছুকাল বিদূরিত হইতে পারিত। কিন্তু পোপ ল্যামেনেসের মত সকল প্রত্যাখ্যাত করিয়া আত্মধ্বংস ত্বরিত করিয়াছেন।

"ল্যামেনেস প্রত্যক্ষ, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, হৃদ্বৃত্তি ও যুক্তির প্রামাণ্য অস্বীকার করেন! এ সমস্ত তাঁহার মতের বিরোধী বলিয়া তিনি তাহাদিগের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

"তিনি কর্ত্তব্যের একমাত্র ভিত্তিভূমি ও প্রভুশক্তির একমাত্র নিয়ামক একটী

অলঙ্ঘ্য ও বিশ্বনিয়ামক বিধির অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

"এই বিধি ঈশ্বরের বিধি—অথবা সেই বিধিই ঈশ্বর।

"চর্চ্চ সেই বিধির একমাত্র আধার ও একমাত্র ব্যাখ্যাতা।

"চর্চ্চের অস্তিত্ব ইহার আচার্য্যের উপরই নির্ভর করিতেছে। চর্চ্চের আধ্যাত্মিক প্রভুশক্তি পোপেরই হস্তে। তিনিই বিধির বিধির নিয়ন্তা এবং তিনিই ঈশ্বর।

"সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক সম্প্রদায়—যাঁহারা কাথলিক চর্চ্চ ও পোপ হইতে অপসৃত হন—বিদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

"এই গুলিই ল্যামেনেসের প্রধান প্রস্তাব।

"কিন্তু সর্পাক্রান্ত বৃক্ষের ন্যায় ইউরোপ ইহা ত্যাগ করিয়াছেন, ইউরোপ এই সকল মতের বিরুদ্ধে বিপ্লবপতাকা উড্ডীন করিয়াছেন।

"এক্ষণে সর্ব্বত্র এই একমাত্র প্রশ্ন আন্দোলিত হইতেছে যে—কি রাজনীতি কি ধর্ম্মনীতি, কি দর্শন, কি সাহিত্য—সকল বিষয়েই সেই সর্ব্বোপরি বিধি কি অলঙ্ঘ্য শাসন প্রভুশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের উপর সন্ন্যস্ত থাকিবে—না জনসাধারণ তাহার ব্যাখ্যাতা ও সন্ন্যাসস্থল হইবে?

"লেমেনেস ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে ধর্ম্মনৈতিক মত সকলই চর্চ্চের ভিত্তিভূমি, সুতরাং ধর্ম্মনৈতিক প্রভুশক্তি ইহার আচার্য্যেরই হস্তে সন্ন্যস্ত হওয়া উচিত।

"তিনি প্রভুশক্তিকে বিশ্বজনীন-প্রমাণ-সাধ্য বা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"তাঁহার মতে প্রভুশক্তি অদ্বিতীয়, চিরস্থায়ী, এবং বিশ্বব্যাপী।

"চর্চ্চ-পরিখ্যাপিত খৃষ্টধর্ম্ম ধর্ম্মনীতি-বিষয়ে সেই প্রভুশক্তির আধার।

"কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে এবং কোথায় সেই চর্চ্চ এক?

"বিশ্বাস-পরায়ণ জনসাধারণে কি চর্চ্চের একতা? কই জনসাধারণ ত একত্র মিলিত হইয়া তর্কবিতর্কের পর কোন মতামত প্রকাশ করে না।

"যাজকমণ্ডলীতে কি চর্চ্চের একতা? কই যাজকমণ্ডলীত ঐকমত্যে কোন কার্য করেন না; অথবা একত্র মিলিত হইয়া বন্ধুভাবে তর্ক বিতর্ক করিয়া জনসাধারণের ধর্ম্মনৈতিক শাসন প্রণালী বিষয়ে কোন বিধি ব্যবস্থাপিত করেন না।

"তবে কি পোপীয় মন্ত্রিসভাতে চর্চ্চের একতা, কই মন্ত্রিসভাত চিরস্থায়ী নহে। তবে কি পোপ ও মন্ত্রিসভা উভয়েতেই এই একতা? তাহাই বা কিরূপে বলিব? পোপ ও মন্ত্রিসভা—ইহাঁদিগের মধ্যে অনৈক্য ঘটিলে মীমাংসা করে কে?

"সুতরাং প্রভুতা পোপেই কেন্দ্রীভূত।

"ল্যামেনেসের এই যুক্তি ও এই মত; এবং যতই কেন যথেচ্ছাচারিণী হউক না এমন প্রভুশক্তি জগতে বিদ্যমান নাই,

এই যুক্তিবলে যাহার অস্তিত্ব বিধি-সঙ্গত বলা যাইতে না পারে। ঐ যুক্তির সম্প্রসারণ দ্বারা বলা যাইতে পারে—যথেচ্ছাচারি রাজাতন্ত্রের একতা প্রজাসাধারণ বিদ্যমান রাখিতে পারে না, কারণ রাজা শাসন বিষয়ে প্রজাসাধারণের মতামত কখনই গৃহীত হয় না: কোন জাতীয় সভায় বিদ্যমান আছে তাহা বলিতে পার না, কারণ কোন জাতীয় সভার অস্তিত্বই নাই; যে-কোন-প্রকার জাতীয় সভা ও রাজা উভয়েই বিদ্যমান একথাও বলিতে পার না, কারণ ইহাদিগের মধ্যে অনৈক্য ঘটিলে মীমাংসা করিবে কে? সুতরাং রাজ্যের একতা রাজাতেই কেন্দ্রীভূত।

"এ যুক্তি ডন্ মাইগেল, মডেনার ডিউক, এবং টিউনিসের বে°(Bey) প্রভৃতির নিকটই খাটিতে পারে; কিন্তু সে দিন বড়-দূর-বর্ত্তী নয়, যখন প্রজা সাধারণ পূর্ব্বোক্ত যুক্তির উত্তরে বলিবে:—

"যে হেতু রাজ্যের একতা তোমার ন্যায় ব্যক্তি-বিশেষে আবদ্ধ হওয়ায় ঘৃণাস্পদ ও যথেচ্ছচারী হইয়া উঠিয়াছে, আমরা তোমাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজ্যের একতা আমাদিগেতেই কেন্দ্রীভূত করিব; এবং যদি আমরা কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে আমাদিগের প্রভুতা বিধি-বিগর্হিত বলিয়া কে প্রমাণ করিতে পারিবে?

"লামেনেসের যুক্তি-প্রণালীতে ঔচিত্যবাদকে অস্তিত্ববাদের অধীন করা হইয়াছে—অর্থাৎ যাহা আছে তাহার উপরই তাঁহার যুক্তি নির্ভর, যাহা হওয়া উচিত তাহার উপর নির্ভর নহে। কিন্তু এ ভিত্তিভূমি দৃঢ় ও চিরস্থায়ী কি না—ইহার উপর পোপের প্রভুতা বিন্যস্ত রাখা উচিত কি না, পাঠকমণ্ডলী তাহা বিচার করুন।

"প্রত্যেক ঘটনার বিদ্যমানতা প্রকৃতিতঃ পরিবর্ত্তনশীল; যে ঘটনা (fact) আজ পোপের আধিপত্যের সমর্থন করিতেছে, সেই ঘটনা হয়ত কাল পোপের আধিপত্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবে—তখন পোপের আত্মনিন্দা করা ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকিবে না।

"যে পূর্ব্বপক্ষ হইতে লামেনেস্ পোপের আধিপত্য রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই পূর্ব্বপক্ষ হইতেই আমরা পোপের ধ্বংসরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি।

"এবং লামেনেস্ ও পোপ উভয়েই জানিতে পারিয়াছেন—যে অস্তিত্ববাদের উপর তাঁহাদিগের একমাত্র আশা সন্নাস্ত রহিয়াছে, সেই অস্তিত্ববাদই একদিন তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশের নিদান হইবে। পোপের প্রভুতা আজ একটী বিদ্যমান ঘটনা বটে—কিন্তু সেই প্রভুতা যখন কাল জনসাধারণ স্বহস্তে গ্রহণ করিবে, তখন কল্যকার বিদ্যমান ঘটনার দ্বারা অদ্যকার বিদ্যমান ঘটনা নিরস্ত হইবে। প্রভুতা যে পোপ হইতে জন সাধারণে সংক্রামিত হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই,

এবং একবার সংক্রামিত হইলে, কোন্ যুক্তি ও কোন্ আশা আর পোপের পক্ষে থাকিবে?

"পোপও লামেনেস্ উভয়েই এই অবশ্যম্ভাবী বিপৎপাতের প্রতীকারৌষধি নির্ণয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু দুই জনে দুই স্বতন্ত্র প্রতীকারৌষধি স্থির করিলেন।

"পোপ যথেচ্ছাচারিণী প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া একমাত্র আশ্রয়-তরুর মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি তদীয় পত্রে লামেনেসের যুক্তি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলেন; একবার ভাবিয়া দেখিলেন না যে লামেনেসের যুক্তি অস্বীকৃত হইলে, তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে তাঁহার স্বাপক্ষ্যে এমন আর কোন যুক্তি নাই।

"লামেনেস্, ব্যক্তিসমষ্টিরূপ জনসাধারণের একটীমাত্র ব্যক্তি; তিনি জানিতেন যে পোপের লেখনীর একটী আঘাতেই জনসাধারণের প্রভুতারূপ প্রকাণ্ড-বৃক্ষের উন্মূলন অসম্ভব। তিনি জনসাধারণের পতাকা উড্ডীন দেখিলেন, দেখিয়া তাহাতে 'ঈশ্বর এবং স্বাধীনতা' এই জ্বলন্ত অক্ষর গুলি অঙ্কিত করিয়া দিলেন। জনসাধারণকে বলিলেন যে ঐ অক্ষর গুলি চর্চ্চের অধিনায়ক পোপের স্বহস্তাঙ্কিত; এবং সেই পতাকা বৃদ্ধ পোপের হস্তে দিয়া বলিলেন—'আপনি এই পতাকা স্বহস্তে উড্ডীন করিয়া জনসাধারণকে উপশমিত ও বশীকৃত করুন'।

"কিন্তু বৃদ্ধ পোপ লামেনেসের কথা না শুনিয়া সেই শান্তিপ্রদ অক্ষর গুলির উপরে রুধির-কলুষিত অঙ্গুলি দ্বারা 'ঈশ্বর এবং যথেচ্ছাচার' এই অক্ষর গুলি লিখিলেন।

"কিন্তু যে লোক-হৃদয়ে ঈশ্বরের অঙ্গুলি 'স্বাধীনতা' শব্দটী অঙ্কিত করিয়াছে, সেই হৃদয় হইতে সেই শব্দটী মুছিয়া ফেলা কোন পোপের অঙ্গুলির সাধ্য নহে।"

"পোপের পত্রগুলি হইতে ও লামেনেসের অতীত মতাবলী ও বর্ত্তমান তুষ্ণীম্ভাব হইতে এই দুইটী নৈতিক সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে:—

"প্রথমতঃ—লামেনেস্ পোপীয় ধর্ম্মের সহিত স্বাধীনতার সামঞ্জস্য করিতে গিয়া এবং পোপ লামেনেসের মতের প্রতিবাদী হইয়া উভয়েই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে স্বাধীনতা দ্বারা সমর্থিত না হইলে, কোনও চিরস্থায়িনী প্রভুতা সম্ভবপর নহে।

"দ্বিতীয়তঃ—স্বাধীনতা ও পোপীয় ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী, একের সহিত অপরের সামঞ্জস্য হইতে পারে না।

"এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, পোপীয় ধর্ম্মের সহিত স্বাধীনতার সমরে কাহার জয়লাভের সম্ভাবনা?

"পৃথিবী এক্ষণে একতা-পিপাসু; যাহার পতাকা সেই একতায় লইয়া যাইবে, সেই জয় লাভ করিবে।

"বিশ্বজনীন অনুমোদনই একতার—সুতরাং প্রভুতারও—ভিত্তিভূমি। যেখানে

সেই বিশ্বজনীন অনুমোদন নাই. সেখানে একতাও নাই, প্রভুতাও নাই; সুতরাং অরাজকতা দেদীপ্যমান।

"ক্যাথলিক ধর্ম্মে এক্ষণে সেই বিশ্বজনীন অনুমোদন নাই, সুতরাং এক্ষণে ইহা মৃত। ইহা মৃত, কারণ মানবজাতি এক্ষণে আত্ম-স্বাধীনতা স্থাপন করিয়াছে, এবং ইহা সেই স্বাধীনতার বিরোধী। মানব জাতি যখন একবার আত্ম স্বাধীনতা স্থাপন করিয়াছে, তখন ইহাকে আবার দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে কাহার সাধ্য?

"মানবজাতির উন্নতি, একতা এবং সম্মিলন—সকল বিপ্লবের মূলেই এই ভাবের প্রাবল্য; এবং সেই শুভনিচয় সংসাধনের জন্যই বিপ্লব সকলের আবশ্যকতা।

"মানবজাতির এই গম্ভীর [illegible]—যখন সকল জাতি সেই অপরিজ্ঞাত অনির্দিষ্ট সামাজিক জগতের অভিমুখে গান করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে—সেই গম্ভীর সময়ে একটী স্বর শুনা যাইতেছে না, একটী লৌকিক উপাদান অন্তর্হিত রহিয়াছে।

"যে স্বরের কথা বলিতেছি তাহা যাজকমণ্ডলীর; এবং যে লৌকিক উপাদানের কথা বলিয়াছি—তাহা যাজকমণ্ডলী।

"সকল দেশেই বিশেষতঃ ইতালীতে যাজকমণ্ডলী অজ্ঞেয় প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র অস্বীকার করেন; এবং যে হস্তে জনসাধারণকে আশীর্ব্বাদ করা উচিত, সেই হস্ত উত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন।

"যাজকমণ্ডলী যে দিন ফিউডাল প্রভুদিগের ও সম্রাটগণের যথেচ্ছাচার হইতে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করা একমাত্র ব্রত বলিয়া মনে করিতেন, সে দিন ভুলিয়া এক্ষণে তাঁহারা যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহারা সেই বৈদেশিকের চরণে লুণ্ঠিত শির, যে বৈদেশিক একদিন দ্বিতীয় জুলিয়সের স্বরে কম্পিতকলেবর হইতেন। এক্ষণে তাঁহারা ছায়ামাত্রাবশিষ্ট পলায়মান রাজলক্ষ্মীর—যে রাজলক্ষ্মী ঈশ্বর ও মানব উভয় কর্ত্তৃকই অধঃকৃত হইয়াছেন—পক্ষসমর্থনের জন্য নির্যাতক ও গুপ্তচরের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

"নির্জ্জনবাসী ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন সুতরাং ঐক্যরহিত হইয়া এক্ষণে তাঁহারা সেই সকল উপদেশ, এবং মানবমাত্রেরই, সুতরাং তাঁহাদিগেরও, হৃদয়ের সেই সকল অনন্ত পরিণতি ও পরিপুষ্টি সাধনের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর—যে উপদেশমালার শিক্ষা প্রদান ও যে স্বত্বনিচয়ের প্রচার একদিন তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল।

"যাজকমণ্ডলী সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের নামে অজ্ঞান ও অসত্য প্রচার করিতেছেন; এবং সামরিক ঈশ্বরের নামে জঘন্য অধীনতা শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের অধর্ম্ম, অবিশ্বাস ও পাপাচার লইয়া ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত যে অন্যান্য বৈপ্লবিক যুগের ন্যায়

বর্ত্তমান বৈপ্লবিক যুগও প্রধানতঃ ধর্ম্মা। ধর্ম্ম ও আত্মত্যাগের মহীয়ান ভাবে উদ্বেজিত হইয়া যাঁহারা ঈশ্বর নামে মানবজাতিকে ধূলি হইতে তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং মানবমনে নিজ উৎপত্তিকারণ ও জীবনব্রতের ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিতেছেন, যাজকমণ্ডলী তাঁহাদিগের বিরুদ্ধেও বজ্রনিনাদ উত্থাপিত করিয়াছেন। অবশেষে যথেচ্ছাচারজনিত বিশৃঙ্খলা নিবারণ ও বিশ্বপ্রেমের নামে মানবজাতির একতাসাধন যে সকল অসমসাহসিক মনীষীর জীবনব্রতের একমাত্র লক্ষ্য; ইহাঁদিগের কোপানল তাঁহাদিগেরও উপর পতিত হইয়াছে।

"কিন্তু এ সমস্ত আমাদিগের নিকট তৃণবৎ। অঙ্গুলীমাত্রে গণনীয় কতিপয় যাজক উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হইতেছেন বলিয়া মানবজাতির অগ্রগামিনী গতি প্রতিহত হইবে না; তাঁহারা ইচ্ছা করেন ত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আত্মগোপন করিতে পারেন। প্রাচীন ধর্ম্মের ঋত্বিকগণ অগ্রসর হইবেন না বলিয়া, মানবজাতি তাঁহাদিগের সহিত থাকিবেন না। ধর্ম্মের ভাব মানবজাতির জন্যই মানবজাতিতে বিদ্যমান; সুতরাং মানবজাতিই জানেন কোন দিকে ইহার গতি, এবং কি ইহার লক্ষ্য। ধর্ম্মের লক্ষ্যের অনুসরণোদ্দেশে ধর্ম্মের স্বর কেবল মানবজাতিই শুনিতে পান; এবং যে গূঢ় সূত্রে মানবজাতির অধাস্তর জাতিনিচয় পরস্পরসম্বদ্ধ, সেই গূঢ় সূত্রের একমাত্র ধারয়িত্রী মানবজাতি।

"ধর্ম্ম মূলতঃ ঈশ্বরের ন্যায় অদ্বিতীয়, অনন্ত ও অপরিবর্ত্তনীয়; কিন্তু ইহা বাহ্য আকৃতি ও পরিণতিতে সাময়িক বিধি—অর্থাৎ মানববিধি—দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই মানববিধি-নিয়ন্ত্রিত ধর্ম্ম মানবের ন্যায়, মানবজাতির ন্যায়—জন্ম বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন, পরিণতি, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু এবং পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতির অধীন। এবং এই অশ্রান্ত পরিবর্ত্তনে, এই জন্ম মৃত্যুর নিরন্তর বিনিময়ে, ইহা ক্রমেই অধিকতর পূত, উন্নত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতেছে; ইহার লক্ষ্য ও উৎপত্তি কারণ সেই অসীমতার দিকে ইহা ক্রমাগত ধাবিত হইতেছে। ইহা একতা হইতে আসিয়াছে এবং একতায় পুনরায় গমন করিতেছে: ইহা মানবকেন্দ্র দিয়া গতিপথে পৃথিবীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং মানব-ইতিহাসের সহিত ইহার আত্ম ইতিহাস সম্পূর্ণ অভিন্ন।

"যখন পরিবর্ত্তনের সময় পরিপক্ক হইবে তখন পরিবর্ত্তনের গতি রোধ করা মানবী শক্তির অসাধ্য; যদি যাজকমণ্ডলী সেই পরিবর্ত্তন যুগের অবতারণা করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে মানবজাতি মানব হইতে ফিরিয়া ঈশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন করিবেন, এবং আপনি আপনাকে যাজক, পোপ ও ঋত্বিকের কার্য্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। শ্রেণীবিশেষের যাজকতা অপেক্ষা মানবজাতির যাজকতা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমাদিগের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, যাজকমণ্ডলীও

মানবজাতির অন্তর্নিবিষ্ট, তাঁহারাও স্বাধীন নাগরিক, তাঁহারাও আমাদিগের দেশীয় ভ্রাতা; সুতরাং যিনি বৈপ্লবিক পতাকায় 'দেশ ও মানবজাতি' অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহার কর্ত্তব্য সকল শ্রেণীকে ও সকল ব্যক্তিকেই ভ্রম ও আলস্য হইতে তুলিতে প্রাণপণে চেষ্টা করা।

"যদি আমরা দুই চারিজন সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব যাজককে বাদ দিয়া যাজক-মণ্ডলীকে ধরি, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে এমন অসংখ্য লোক দেখিতে পাইব, যাঁহাদিগের গাউনের নিম্নে স্বাধীন নাগরিকের হৃদয় তর তর বেগে রক্ত সঞ্চালন করিতেছে; যাহাদিগের আত্মা জন্মভূমির অতীত ও বর্ত্তমান দুঃখে শোক-মগ্ন রহিয়াছে; এবং রোমাগ্নার সেই ভীষণ রক্তস্রাব ও পোপ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নির্ব্বাসন ও নরহত্যা যাঁহাদিগের গভীর শোক ও বিশেষ লজ্জার কারণ।

"কেন ইহাঁরা তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন? যে সকল অশুভ তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিবারণ করিতে পারেন সে সকল অশুভের জন্য কেবল শোক করিয়া তাঁহারা কেন সন্তুষ্ট রহিয়াছেন? হস্ত তুলিয়া সমবেত মানবের স্বরকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া কেন তাঁহারা পোপের মমতাশূন্য, শুষ্ক ও নিষ্ঠুর বাক্যের নিকট নতশির হইতেছেন?

"বোধ হয় অপ্রকৃত বিবরণে এ বিষয়ে তাঁহারা প্রতারিত হইয়াছেন, যাঁহারা সামাজিক পুনরুজ্জীবনের পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মঙ্গলময় পবিত্র উদ্দেশ্য বিষয়ে বোধ হয় কেহ তাঁহাদিগের মনে সন্দেহ উত্থাপিত করিয়াছেন।

"বোধ হয় এতদিন কেহই তাঁহাদিগের সহকারিতা প্রার্থী হয় নাই। অথবা বহু দিনের নিষ্ঠুর নির্যাতনে রাগান্ধ হইয়া বিপ্লবকারিগণ বুঝি ভুলিয়া গিয়াছেন যে সাম্য সকলেরই সম্পত্তি, এবং যে সেনা এতদিন রাজকীয় যথেচ্ছাচারের প্রধান সমর্থক ছিল, সেই সেনাই এক্ষণে আমাদিগের প্রধান আশাস্থল দাঁড়াইয়াছে।

"এরূপ ভ্রম, প্রতিঘাতের প্রথম মুহূর্ত্তে দুষ্পরিহার্য্য; কিন্তু সত্যের আলোকে সে ভ্রম শীঘ্রই অপনীত হইবে; এবং যে মুহূর্ত্তে জয় নিঃসন্দিগ্ধ হইবে সেই মুহূর্ত্তে ঔদার্য্য ও সহিষ্ণুতার ভাব সর্ব্বত্র বিরাজমান হইবে।

"হয় ত এমনও ঘটিতে পারে যে যাজকমণ্ডলী অযৌক্তিক রাগান্ধতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপুনরাগমনের নিমিত্ত অতীত আধিপত্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া এবং পোপের অন্ধ অধীনতা হইতে আত্ম-বিমোচন করিয়া দেখিতে পাইবেন যে এমন একটী প্রকাণ্ড সামাজিক বিপ্লবের যুগ পরিণত হইয়াছে, যে বিপ্লব-নিবারণ মানবী শক্তির অসাধ্য। যখন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে একটী ভাব জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার স্তরে স্তরে গ্রথিত হইয়াছে, ও তথায় সেই অবস্থায় থাকিয়া কালে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে; ক্রমে

নানা আকার ধারণ করিয়া সমাজের প্রতিবন্ধে প্রবেশ করিয়াছে; নির্যাতন বিদলিত না হইয়া বরং দিন দিন পরিবর্দ্ধমান হইতেছে এবং মানব রক্তে কলুষিত না হইয়া বরং পূত হইতেছে; তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে সে ভাব মানবচিন্তার ফল নহে—ঈশ্বর-চিন্তাপ্রণোদিত। ইহা মানব হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত ঐশ্বরিক চিন্তা; ইহা ভাবী ঐক্যযুগের অগ্রদূত। যাঁহারা এই সমবেত বিশ্বজনীন গতিকে সম্প্রদায় বা দলবিশেষের কার্য্য বলিয়া গালিবর্ষণ করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহারা অনন্ত ঐশ্বরিক বিধির স্থলে আত্মইচ্ছা প্রতিষ্ঠাপিত করিবার উদ্দেশেই প্রতিবাদ করিয়া থাকেন।

"তাঁহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবেন যে এই প্রকাণ্ড বিপ্লব তাঁহাদিগের সহিত অথবা তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হইবে। কাল-বিবর্ত্তনে ও ঘটনাস্রোতে যে অট্টালিকা দূষিতভিত্তি হইয়া গিয়াছে, সেই অট্টালিকাকে বলপূর্ব্বক আমূল পরিরক্ষা করিতে চেষ্টা করার পরিণাম—সমস্ত অট্টালিকার পতন। তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত পোপীয় ধর্ম্মের একীভাব করিয়া পোপীয় ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের পতনের পথ সুপ্রশস্ত করিতেছেন।

"তাঁহারা ক্রমেই জানিতে পারিবেন যে স্বাধীনতাপিপাসু ব্যক্তিবর্গের উপর যে অপযশরাশি আরোপিত করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত ঘটনা সমর্থিত নহে; তাঁহাদিগের দলের সম্ভ্রান্তশ্রেণী যে তাঁহাদিগের সহজপ্রত্যয়িতার (credulity) সুবিধা লইয়া এবিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন। উক্ত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ভয় যে স্বাধীনতার ভাব একবার রাজনীতিতে প্রবিষ্ট হইতে দিলে, সেই স্বাধীনতার ভাব যথেচ্ছাচারিণী পোপীয় শাসনপ্রণালীতেও সংক্রামিত হইবে।

"তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে রোমও পোপীয় ধর্ম্মকে যথেচ্ছাচারী রাজবৃন্দের সহিত সংমিশ্রিত করায়, ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসায় করায়, এবং আত্মকামনা পরিপূরণে চর্চের কর্ত্তব্য জ্ঞানকে বলিপ্রদান করায়, পোপের ধর্ম্ম্য আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছে।

"তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে এক্ষণে ধর্ম্মের বেদি মন্ত্রিসভার পাদপীঠরূপে পরিণত হইয়াছে; পোপগণের হৃদয়তন্ত্রী ভায়েনা ও সেণ্ট পিটর্সবর্গের অঙ্গুলিস্পর্শেই বাজিয়া থাকে, খ্রীষ্টধর্ম্মের আদেশানুসারে কায করিতেছি এই ভ্রমে পোপগণ প্রকৃত প্রস্তাবে রাজবৃন্দের গুপ্ত মনোরথ পূর্ণ ও যথেচ্ছাচারিণী ইউরোপীয় প্রভুশক্তির সঙ্কল্প সকল সিদ্ধ করেন।

"তাঁহারা ক্রমেই দেখিতে পাইবেন যে তাঁহারা কতিপয় মাত্র ব্যক্তির হস্তে ক্রীড়নকস্বরূপ; সেই কতিপয় মাত্র ব্যক্তি—পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন খ্রীষ্টের ভাব চর্চ্চ হইতে তিরোধান করিয়াছিল, এবং প্রতিষ্ঠাপকগণ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত চর্চ্চ গবর্ণমেণ্টের উৎকৃষ্টও উদার প্রণালী

যখন বিধ্বস্ত হইয়াছিল—গ্রাম্য প্রতিনিধি-প্রেরণ প্রথা উঠাইয়া দিয়া সকল ক্ষমতা আত্মসাৎ করেন ও যাজকমণ্ডলীকে সামান্য অনুচরবর্গে পরিণত করেন। তাঁহারা দেখিবেন যে পোপ ধর্ম্মের ভাবকে জঘন্য শূন্য ও বিশুষ্ক পার্থিবতায়, ধর্ম্ম উপাসনাকে ক্রয়বিক্রয়ের সামগ্রীতে, এবং যাজকমণ্ডলীকে যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির করযন্ত্ররূপে পরিণত করিয়াছেন।

"বৈপ্লবিক ব্যক্তিবৃন্দ যদি এই সকল অত্যাচারের প্রতিহিংসা প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে প্রতিহিংসার কারণ আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্কীর্ণ ও সাংঘাতিক ফল দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহা হইতে বিরত হইবেন। তাঁহাদিগের লক্ষ্য ও সাধন পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে বৈপ্লবিক ধর্ম্ম সমাজের প্রত্যেক উপাদান ও প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য 'স্বাধীন' এই শব্দটী; হয় সকলের জন্য উচ্চারিত হইবে, না হয় কাহারও জন্য নয়। এবং যাজকমণ্ডলীর উপর গালিবর্ষণ করিয়াও তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া, তাঁহারা যে সব কার্য্য ও মতের অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতেছেন, আপনারাই সেই দোষে দূষিত হইতেছেন।

"বিপ্লবকারিদিগের যেন স্মরণ থাকে যে স্বাধীনতাসমর মতের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হইবে, ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে নহে। ভ্রান্তমতের সমর্থকগণ পোপের চাতুরিতে প্রতারিত হইয়াছেন; সেই চাতুরি তাঁহাদিগের সমক্ষে ধরিয়া দিয়া তাঁহাদিগের ভ্রমসংশোধনের যতক্ষণ না প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, ততক্ষণ আমাদিগের হতাশ হইবার কারণ নাই।

"তাঁহাদিগের যেন মনে থাকে যে গঠনকার্য্যের সামর্থ্য ও আবশ্যকতা হইতেই, ধ্বংসকার্য্য বহিত করিতে হইবে; এবং বর্ত্তমান সময়ে যে ব্যক্তি একহস্তে ভাঙ্গিতেও অপর হস্তে গঠিতে অক্ষম সে এই বিপ্লব কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

"তাঁহাদিগের জানা উচিত যে জনসাধারণের হৃদয়ে যে ধর্ম্মের ভাব কর্ত্তব্য-জ্ঞানে প্রণোদিত হইয়া ভ্রাতৃভাব দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে—সে ধর্ম্মের ভাব জনসাধারণের হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা অন্যায়; কারণ মানবজাতি বা জাতিবিশেষের সকল শ্রেণীর নৈতিক ও ভৌতিক সর্ব্বপ্রকার অবস্থা ও অভাবের উপযোগী একটী মহান্‌ ও বিশ্বজনীন হৃদয় ভাব ব্যতীত মানবজাতির সঞ্জীবন অসম্ভব।

* * * *

"তাঁহারা জানিবেন যে দীর্ঘকালব্যাপিনী যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির চাতুরী দ্বারা মানব জাতির যে হৃদ্বৃত্তি ও মনোবৃত্তি সকল ম্লান ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে, সেই গুলির স্বাধীন ব্যবহার পুনঃ প্রাপ্ত হওয়ার সর্ব্ব প্রথম সোপান আত্মাদর ও

আত্মশঙ্কা। ললাটে যে দাসত্বরেখা অঙ্কিত হইয়াছে তাহা মুছিয়া ফেলিবা—সে ঈশ্বত্ব আমার অন্তরে ভস্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে, সে মহত্ত্ব ভবিষ্যতের গর্ভে আমার জন্য নিহিত রহিয়াছে, যে দশ জ্বা পত্র আমার প- কলিলক, আমার আপনাকে আপনি সেই গুলি বুঝাইতে হইবে।

* * * * *

"আমাদের যাজকমণ্ডলী জানেন যে নরহত্যা ও রক্তপাত করিবার পোপের স্বহস্ত লিখিত আদেশ অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে; পোপ যে রাজতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন তাঁহারা আমাদিগের দেশীয় রাজা নহেন; এবং আমরা যখন রাজ্যের অধীশ্বর ছিলাম তখন আমাদিগের পরমত-সহিষ্ণুতা ও পরকার্য্য-সহিষ্ণুতা বিমৃষ্যকারিতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল। তাঁহারা জানেন যে আমরা স্বাধীন নাগরিকের শরীর হইতে একবিন্দুও রক্তপাত করি নাই।

"আমাদের যাজকমণ্ডলী জানেন যে অল্পক্ষণ জয়লক্ষ্মী আমাদের অঙ্কশায়িনী ছিলেন, কুশল ও শান্তি ইটালীর সর্ব্বত্র বিরাজমান ছিল; অরাজকতার পরিবর্ত্তে বিধি ও শৃঙ্খলা সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠাপিত হয়; এবং পরে যে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় তাহা আমাদের দোষে নহে, স্বাধীনতার প্রতিপক্ষগণের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ নিবন্ধন।

"তাঁহারা জানেন যে, যে পবিত্র বিষয়ের জন্য আমরা অভ্যুত্থিত হই, তাহা আমাদের দোষে কলুষিত বা আমাদের পাপে কখনই কলঙ্কিত হয় নাই। * * তাঁহারা জানেন যে দাসত্বের বিশ্বব্যাপি উন্মোচনের জন্য যাঁহারা কৃত সঙ্কল্প তাঁহাদিগের প্রচারের বিষয়ীভূত মতাবলী প্রধানতঃ ধর্ম্ম্য। * *

"বস্তুতঃ ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঈশ্বরের পবিত্র নামে প্রতিদিন যে সকল জঘন্য পাপাচরণ অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার সামক্ষ্যে, এবং রোমীয় সভার অবনতি, দূষিততা, কপটতা ও কুসংস্কারের সম্মুখে, কোন যাজকের ললাট লজ্জারেখা-অঙ্কিত হয় না * *।

* * * * *

"আমরা ধর্ম্মের ধ্বংসবিধানে সমুদ্যত হই নাই, ধর্ম্মকে আদি পবিত্রতা ও আদি লক্ষ্যে লইয়া যাইবার জন্যই আমাদিগের এই উদ্যম; যে ধর্ম্ম এক্ষণে জনসাধারণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ঘৃণিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মকে আবার জনসাধারণের প্রেম ও ভক্তিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্যই আমাদের এই উদ্যম।

"একতার ধ্বংস সাধন করা আমাদিগের লক্ষ্য নহে। যেখানে একতা নাই সেখানে একতা প্রতিষ্ঠাপিত করা, এবং ইউরোপে পোপ-কর্ত্তৃক অবতারিত অরাজকতার পরিবর্ত্তে প্রকৃত ও শক্তিমতী একতা স্থাপন করিয়া, সেই একতার ভাব ইউরোপীয় বিচ্ছিন্ন জাতি সমূহে সংক্রামিত করাই—আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য।

* * * * *

"মাতৃভূমির যাজকমণ্ডলী! আপনারা কি খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে অনিবার্য্য ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবেন? আত্ম-সৌন্দর্য্যে বিচ্ছুরিত ধর্ম্মকে আপনারা কি মানবজাতির শ্রদ্ধাস্পদ পুনঃপ্রতিষ্ঠাপিত করিতে ইচ্ছুক? যদি রক্ষা করিতে চাহেন, যদি ইচ্ছুক হয়েন, আপনাদিগকে জন সাধারণের শীর্ষস্থানীয় করুন, এবং তাহাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া চলুন। যে অষ্ট্রীয় বৈদেশিক আপনাদিগকে ও তাহাদিগকে একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই বৈদেশিক শৃঙ্খল হইতে আপনাদিগের ও তাহাদিগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের পুনরুদ্ধার সাধন করুন্।

"আপনাদিগের কি স্বাধীন নাগরিকের হৃদয় নাই? আপনাদিগের কি মাতৃভূমি নাই? আপনাদিগের হৃদয়ে কি স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের প্রতি প্রেম নাই?

"যদি থাকেত তাহাদিগকে ও আপনাদিগকে উদ্ধার করুন। যেন স্মরণ করিবেন যে জর্ম্মান্ সেনা কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত মিলান্ নগরের পুনর্নির্ম্মাণের জন্য লম্বার্ডদিগের যে সেনা গমন করে, তাহার অধিনায়ক একজন যাজক ছিলেন। ইতালীয় লীগের যে সেনা আল্‌প্‌স শিখরে জাতীয় স্বাধীনতা-পতাকা উড্ডীন করিতেছে আপনারা এবার সেই সেনার নেতা হউন্।

"যে ইতালীয় ক্ষেত্র আজ দৈত্যপদতলে বিদলিত হইতেছে, ঈশ্বরের আদেশে এই ক্ষেত্র এক দিন স্বাধীন ছিল। আজ আবার সেই ঈশ্বরের আদেশেই আপনারা দ্বিতীয় জুলিয়সের ন্যায় সমর-দুন্দুভি উদ্‌ঘোষিত করুন্। জনসাধারণের উপর আপনাদিগের স্বরের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। বৈদেশিক উৎপীড়কগণের হস্তে বিমানিত ও শ্রীভ্রষ্ট জন্মভূমিকে পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে, স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের প্রকৃতি-লব্ধ স্বত্বের পূর্ণ ও স্বাধীন ব্যবহারের পুনঃ প্রাপ্তি সাধনের জন্য, জনসাধারণের সহিত আপনাদিগের এবং স্বাধীনতার সহিত চর্চ্চের নূতন সন্ধি সংস্থাপন করিতে আপনাদিগের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করুন্।

"জন্মভূমির যাজকমণ্ডলী! আপনাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্ব প্রথমে পোপ হইতে ঈশ্বরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন—যিনি সর্ব্বপ্রথমে মানব জাতির পুরোহিত হইয়া মানব জাতির স্বরে কর্ণপাত করিবেন—যিনি নিষ্কলঙ্ক কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পবিত্রতায় বলীয়ান্ হইয়া বাইবেল হস্তে জনসাধারণের সঙ্গে 'সংস্কার' প্রচার করিয়া বেড়াইবেন—তিনিই খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবেন, ইউরোপীয় একতার সূত্রপাত করিবেন, অরাজকতা বিদূরিত করিবেন এবং যাজকমণ্ডীর সহিত সমাজের চির-সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত করিবেন।

"কিন্তু পুনর্জন্মের দিন উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে যদি যাজকমণ্ডলীর কাহারও স্বর শ্রুত না হয়—তাহা হইলে—ঈশ্বর যেন না করেন—যাজকমণ্ডলী জনসাধা-

রণের কোপানলে ভস্মীভূত হইবেন। কারণ জনসাধারণের প্রচণ্ড কোপানল একবার উদ্দীপিত হইলে কাহারও রক্ষা নাই। এই জন্য যে মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করিলাম সময় থাকিতে তাহার অনুসরণ করুন।''

যাজকমণ্ডলীর প্রতি লিখিত পত্রের পর ম্যাট্‌সিনি সম্বার্ডীর যুবক সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক নব্যইতালী সমাজের প্রতি-প্রেরিত পত্রের একখানী উৎকৃষ্ট প্রত্যুত্তর লিখেন। তাহার পর ইতালীর অবস্থার অনুরূপ বৈপ্লবিক সমর কি প্রণালীতে অনুষ্ঠান করিতে হইবে তদ্বিষয়ে একটা প্রস্তাব লিখেন। কিছুকাল পরে ম্যাট্‌সিনি উক্ত প্রস্তাবের সহিত 'বৈপ্লবিক সেনার প্রতি উপদেশ' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া ইউরোপীয় সমর-শাস্ত্রবিদ্ সেনাপতিগণ ম্যাট্‌সিনির সামরিক শাস্ত্র-নৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ম্যাট্‌সিনি যে লক্ষ্যে আত্মজীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, সে লক্ষ্য সংসাধনোপযোগী যাবতীয় উপাদান যে তাঁহার করায়ত্ত ছিল; তিনি যে আশ্রান্ত যত্নে বৈপ্লবিক, দার্শনিক ও প্রচারকের কার্য্য হইতে বৈপ্লবিক সেনানায়ক ও সামান্য সৈনিকের কার্য্য পর্য্যন্তও ভাল রূপে বুঝিতেন—ইহা তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

'নব্য ইতালী, পত্রিকায় ম্যাট্‌সিনি তাহার পর 'হঙ্গেরি' ও 'ইতালীর একতা-' শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধ লিখেন। যখন তিনি 'ইতালীর একতা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেন তখন লোকে ইতালীর একতা কল্পনা মাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ ইতালীর একতা—একটী ঐতিহাসিক ঘটনা।

বিধবার সুখ। *

যেদিন স্বামীর মৃত্যু হইল সে আমার এক দিন গিয়াছে। সেদিনের কথা মনে হইলেও চেতনা অকস্মাৎ বিলুপ্ত হয়!—যে অন্ধকার বিশ্বকে আচ্ছাদন করিয়াছিল ভাবি নাই যে আর কখন তাহা তিরোহিত হইবে। যে মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল ভাবি নাই যে সে মোহের পর আবার সংজ্ঞা আসিবে। কিন্তু সেই অন্ধকারের অভ্যন্তরে সেই মোহের মধ্যে যে দুই একটী বাক্য আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল আজিও যেন তাহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। শুনিলাম শ্বশ্রুঠাকুরাণী বলিতেছেন 'মা! আমার হৃদয়ের ধন যে একা চলিল, তুমি শীঘ্র তাহার অনুগমন কর, দেখিয়া মনকে প্রবোধ দিই; পুত্র নাই কন্যা নাই তোমার সহগমনের পথ ত পরিষ্কার রহিয়াছে, আর পুত্র কন্যা থাকিলেই বা বাধা কি? সংসারের এক

* বঙ্গদর্শনে সতীদাহ সম্বন্ধে দুইটী প্রস্তাব দর্শনে লিখিত হয়।

মাত্র অবলম্বন অন্ধের যষ্টি আমার নয়নের মণি হারাইল, তবু যদি সংসার চলে ত তোমার অভাবে সংসারের তাদৃশ ক্ষতি হইবে না।' জ্যেষ্ঠা জায়া আমায় অত্যন্ত ভাল বাসিতেন শুনিলাম তিনি বলিতেছেন 'ভগিনি! তোমার কুসুম-সুকুমার দেহ যে চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হইবে তাহা ত দেখিতে পারিবনা একবারে দগ্ধ হইয়া যায় তাহা কোনমতে সহিব। চিরকাল পুড়িবে কিন্তু মরিবে না তাহা অপেক্ষা একবারে পুড়িয়া মরাই ভাল'। পুরোহিত ও পণ্ডিতবর্গ বলিতেছেন 'শাস্ত্র যদি সত্য হয় আর তুমি যদি কায়মনে পতিকে ভক্তি ও সেবা করিয়া থাক ত সহমৃতা হও স্বর্গ তোমার' ইহাও শুনিলাম। এইরূপ আরও অনেক কথা শুনিলাম। সেই অর্দ্ধচেতন অবস্থায় কথাগুলি যে শুদ্ধ কর্ণে লাগিল এমত নয় অন্তরে আঘাত করিল। বুঝিলাম যে জগতের কীটাণুকীট আমি থাকি আর নাই থাকি সংসার যেমন চলিতেছে তেমনই চলিবে, ভালবাসায় হউক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া হউক সকলেই আমার অস্তিত্ব স্বামীর সহিত বিলুপ্ত হয় ইহা ইচ্ছা করে। আমাকে অল্পে অল্পে দহন করিবার জন্যে যে অনন্ত চিতা প্রস্তুত রহিয়াছে তাহাও দেখিলাম। পণ্ডিতবর্গ যে স্বর্গ আমার বলিলেন সেই রমণীয় স্বর্গীয় শোভাও একবার কল্পনায় বিরাজিত হইল। কিন্তু যে কারণেই হউক আমার উপর সে সকল কথার কোন কার্য্য হইল না। সতীর গৌরব আমি লাভ করিতে পারিলাম না।

আমার এই রীতি-বহির্ভূত আচরণে পরে কত কথা উঠিল। কেহ আমার আচরণের অনুমোদন করিলেন, বলিলেন 'যাহাই বল সহমরণ একরূপ আত্ম হত্যা। আত্ম হত্যা মহাপাপ, শুধু পাপ কেন আত্ম হত্যায় আমাদের অধিকারই নাই। ব্যক্তি মাত্রেই সমাজের দাস, প্রভুর অনুমতি না লইয়া দাসের মরিবার অধিকার কি?' আবার কোন প্রতিবেশিনী বলিলেন 'ভগিনি! তোমার পতি-ভক্তির একমুখে প্রশংসা করা যায় না কিন্তু ভক্তি ও ভালবাসা স্বতন্ত্র, তুমি যদি আমার মত পতিকে ভাল বাসিতে তাহা হইলে তুমি পতির অনুগমন না করিয়া থাকিতে পারিতে না'—ইহাও শুনিতে হইল। প্রতিবেশিনীর উত্তরে কেহ বলিলেন "তুমি অন্যায় বলিতেছ ও পতিকে যথেষ্ট ভাল বাসে এখন অনুগমন করিতে পারিল না বটে কিন্তু 'ধ্বংসপুরের শত সহস্র দ্বার রহিয়াছে' তুমি দেখিবে ও কোন এক দ্বার দিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইবেই হইবে" ইত্যাদি কত কথা কত লোক বলিল। কিন্তু আমি যে কেন মরিলাম না তাহা তাহারা বলিবে কি আমিও তখন বুঝিতে পারি নাই। পরে এবিষয়ে অনেক ভাবিয়াছি। ভাবিয়া একটি এই মাত্র বুঝিয়াছি যে একটি কথা যদি আমাকে কেহ বলিত তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই মরিতাম, সে কথাটী যদি

এখনও কেহ বলে এখনও মরি। আমি বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি এবং সহ্য করিতে অপ্রস্তুত নহি, আমি পতিকে ভাল বাসিতাম না এ অপবাদ বজ্রের মত হইলেও পাষাণের মত হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, আমি ইহলোকে সতীর গৌরব ও পরলোকে স্বর্গের আশাও ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু যদি কেহ আমায় নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে আমি স্বামীর সহিত ইহ জীবনে যে স্বর্গ ভোগ করিয়াছি স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া আবার সেই স্বর্গ পাইব যদি ইহাতে কেহ আমার বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারে ত সে সুখের আশা ত্যাগ করি আমার এমন সামর্থ্য নাই। যে স্বর্গ দেব লোকের অধিবাসিত যাহাতে নন্দন কানন বিরাজিত তাহার প্রলোভন আমার নিকট কিছু নাই। কিন্তু যে স্বর্গে আমার দেবতা আমার নন্দন কানন বিরাজিত ছিল সে স্বর্গের প্রলোভন আমার পক্ষে অনিবার্য্য। একবার যদি দৃঢ় বিশ্বাস হইত যে সে স্বর্গ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে ত জগতে এমন কোন বন্ধন দেখিনা যে আমার গতি রোধ করিতে পারিত। ধ্বংসপুরের সহস্র দ্বারের যে কোন দ্বার দিয়া আমি প্রবেশ করিতে পারিতাম। তুমি বলিবে আত্মহত্যা মহা পাপ—পাপ হয় হউক আমি সে স্বর্গে গিয়া যে কোন পাপের শাস্তি লইতে পারি। যদি বল আত্মহত্যায় আমার অধিকার নাই আমি বলিব আছে। সমাজের সহিত আমার দাস-প্রভুত্ব সম্বন্ধ নয়, সমাজ আমার যে সকল উপকার করে তাহারই বিনিময়ে আমি সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে বাধ্য। যতদিন সমাজের নিকট হইতে উপকার লইব ততদিনই সমাজের প্রতি আমার কর্ত্তব্য রহিবে। উপকার লই বা না লই কোন নির্দ্দিষ্ট কাল কর্ত্তব্য সাধন করিব এরূপ কোন কথা নাই। সুতরাং ইচ্ছামত আদান প্রদান বন্ধ করিবার আমার অধিকার আছে।

ফলতঃ আত্মহত্যায় আমার অধিকার আছে তাহা বুঝিতাম, ইহাতে যদি পাপ হয়, জীবন কিছু নিষ্পাপ নয় পাপের উপর না হয় আর একটি পাপ বাড়িবে তাহারও জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু তথাপি এদুঃখ ভার বহন করিতেছি কেন? লোকের সুখের আশা থাকে ব'লয়া দুঃখ সহিতে পারে আমার তাহাও নাই তবে এক অনুষ্ঠানে সকল দুঃখ ক্লেশের অবসান করি নাই কেন? ইহার একই উত্তর—ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা। এ জগতে আমা অপেক্ষা সহস্র গুণ দুঃখী আছে। আমার দুঃখ কি? আমার একটী স্বর্গ ছিল সেইটী আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে এই মাত্র, কিন্তু কত লোক যে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি তাহারা ও ভবিষ্যতে নিশ্চয় কিছু দেখিতে পায় না বলিয়াই মরে না। তবে যে দুই একজনের নরক যন্ত্রণা এত অসহ্য বোধ হয় যে বর্ত্তমান অপেক্ষা অশুভ কিছু হইতে পারে তাহাদের এরূপ বিশ্বাস হয় না, ভবিষ্যতে যাহাই হউক

বর্ত্তমান অপেক্ষা ভাল হইবে এই সংস্কারে তাহারা আত্মহত্যা করে।

এক এক বার যেন দেখিতে পাইতাম যে আমি যে স্বর্গের আকাঙ্ক্ষী, সে স্বর্গ এবং তাহার অধিষ্ঠাতা আমার দেবতাও যেন আমার সম্মুখে বিরাজিত। অমনি অধীর হইয়া পড়িতাম তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণে আকাঙ্ক্ষা হইত। কিন্তু মূলে যে পথ দিয়া তাহার অনুসরণ করিতে হয় সে পথ দেখিয়া আর বিশ্বাস হইত না যে উদ্দিষ্ট স্থানে যাইতে পারিব। যে দেহ একটু অসুস্থ হইলে [illegible] বিকৃত হয় সে দেহ ছাড়িয়া যে মন চিন্তা করিতে পারিবে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। সকল সুখে বঞ্চিত হইয়া একমাত্র যে চিন্তাসুখ ছিল যে দেহের সহিত সে চিন্তা গূঢ় সম্পৃক্ত সে দেহ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। যে চক্ষু সে দেবতার সৌন্দর্য্য দেখিত যে কর্ণ সে দেবতা-মুখ-নিঃসৃত অমৃত ধারা উপভোগ করিত যে দেহ তাঁহার একটী নখাগ্র স্পর্শে কণ্টকিত হইত সে দেহ সে চক্ষু কর্ণ ফেলিয়া আর কিসের সাহায্যে সে সকল সৌন্দর্য্য সে সকল সুখ ভোগ করিতে সক্ষম হইব। এ শরীরী জীবন ত্যাগ করিয়া কোন সুখের অধিকারী হইব এরূপ বিশ্বাস হয় নাই বলিয়াই আজিও পতির অনুগমন করিতে পারি নাই। শুনিয়াছি যাহাদের বহু পুণ্য তাহারাই সশরীরে স্বর্গে যায়, এখন তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি। যদি কোন দুস্তর সাগর পার হইলে স্বামীকে পাইব এরূপ বুঝিতাম ত সন্তরণে পার হইবার আশায়ও সে দুস্তর সাগরে ঝাঁপ দিতাম। যদি আমার গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত হইত ত গ্রহে গ্রহে স্বামীর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতাম। সে দুস্তর সাগরে সন্তরণ দিতে দিতে, এ অসীম বিশ্বের দুই একটি গ্রহ বেড়াইতে বেড়াইতে হয়ত আমার সংক্ষিপ্ত জীবন শেষ হইত, তাহাতে ক্ষতি ছিল না। শরীর লইয়া সুখের অন্বেষণে ও সুখ। আবার যখন ভাবিতাম স্বামীর যে দেহে জগতের সমস্ত বাহ্য শোভা একত্রে দেখিতাম যে প্রফুল্ল আনন ও ইন্দীবর নয়নের তুলনা দেখিতাম না যে নয়ন ও মুখের অভ্যন্তর দিয়া অন্তরের জ্যোতি ও সৌন্দর্য্য দেখিতাম সে দেহ সে আনন সে নয়ন আর নাই। আমার দেবতার বাহ্য ও অন্তঃ সৌন্দর্য্য আর কোথায় দেখিব তখন অমনি ভবিষ্যৎ হইতে নয়ন ফিরাইতাম আর সেদিকে যাইতে চাহিতাম না।

এই রূপ নানা চিন্তায় যখন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া ভবিষ্যতে ঝাঁপ দিতে পারিলাম না, তখন ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া বর্ত্তমানের দিকে দৃষ্টি পড়িল। ভাবিলাম আমার সুখের সম্ভাবনা থাকিতেও পারে। জীবন সুখী হইতে হইলে জীবনের মূল্য থাকা চাই। জীবনের মূল্য দুই প্রকার--আত্ম সম্বন্ধে ও পর সম্বন্ধে। যখন স্বামী ছিলেন, যখন উভয়ে পরস্পরের ভাবে নিমজ্জিত ছিলাম, তখন যদি কেহ আমার জীবনের প্রয়োজনীয়তা নাই বলিত আমি হাসিতাম। ভাবিতাম লোক কি পাগল! আমার নিকট আমার জীবন কি সুখময় কি অমূল্য তাহা তাহারা বুঝেনা। তাহারা মনে করে যেন তাহাদের জন্যই আমি বাঁচিয়া আছি। কিন্তু এখন যদি কেহ আমার জীবন অনাবশ্যক বলে ত আর তাহা হাসিয়া উড়াইতে পারিনা। ফলতঃ স্বামীর বিয়োগে যখন আত্ম-সম্বন্ধে জীবনের মূল্য গেল তখন পরের নিকট তাহার মূল্য থাকে এই ইচ্ছা বলবতী হইল। একবার স্বার্থশূন্য হইয়া পরের উদ্দেশে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা হইল। কতলোক পরার্থে জীবনধারণ-রূপ ব্রতে ব্রতী হইয়া অহরহ স্বার্থের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া কোন মতে ব্রত সফল করিতে

সক্ষম হইয়েছে। আমার সে স্বার্থের সহিত দ্বন্দ্ব ছিলনা সুতরাং সে সুবিধা কেন ত্যাগ করিব এবং সে সুবিধা-সত্ত্বে ব্রত তত কঠিন বোধ হইল না। আহ্লাদের সহিত সেই ব্রত অবলম্বন করিলাম। এই ব্রত প্রতিপালনে অনেক বস্তুর প্রয়োজন, আমার কিছুই ছিলনা। কেবল এক মাত্র হৃদয় ছিল সেই হৃদয় লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম যে ইহাতে আমার একটি অভাবনীয় ফল ফলিল। দুঃখীর দুঃখে দুঃখী হইয়া, সুখীর সুখে সুখী হইয়া আমার হৃদ্বৃত্তি সকল আত্ম-বহির্ভূত বস্তু সকলের সহিত গ্রথিত হইতে লাগিল। পরের সহিত আত্মের এই সংমিশ্রণ হইতে আত্ম সম্বন্ধেও জীবনের মূল্য বাড়িল। আর জীবন তত অসুখের বোধ হইল না। আবার পৃথিবীর সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিলাম। তবে প্রভেদ এই পূর্ব্বে সকলই সুন্দর বলিয়া বোধ হইত, এখন সুন্দর অল্প বলিয়া বোধ হইল। পূর্ব্বে সকল সৌন্দর্য্য যেন একত্রে চক্ষুর উপর দেখিতাম, এখন যেন বোধ হইল সে গুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ আমার সমাবস্থ সকলের নিকট জানিয়া এবং তাহাদের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া আমার এই প্রতীতি হইয়াছে যে আমাদের মত অকৃত্রিম পরার্থ-জীবন আর কেহ অতিবাহিত করে না এবং জীবনের পবিত্রতাজনিত সুখ আমাদের মত আর কেহ প্রাপ্ত হয় না।

আর একটী পরিবর্ত্তন আমার সুখের কারণ হইল। আমার স্বভাব এইরূপ ছিল, যে কোন বস্তুর দুইদিক থাকিলে আমি তাহার ভাল দিক্‌টীর উপর অধিক দৃষ্টি রাখিতাম। জীবনে অশেষ অসুখ আছে বটে কিন্তু যে কিছু সুখ আছে সচরাচর তাহারই উপরই আমার দৃষ্টি থাকিত। তাহাতে আমার চিত্ত স্বভাবতঃ প্রফুল্ল থাকিত। এই স্বভাবের গুণে ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধেও আমার সুখের আকাশ বিস্তৃত হইল। কল্পনার সাহায্যে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা হেতু যে দুই দিক সম্ভব বলিয়া বোধ হয় তাহার যেটি ভাল বলিয়া লাগিল সেইটী গ্রহণ করিলাম। দেহের অবসানে আত্মা নির্ব্বাণ হইলেও হইতে পারে কিন্তু আমি আত্মার অনশ্বরত্ব বিশ্বাস করিলাম। আমি যে স্বর্গের আকাঙ্ক্ষী তাহা আর পূর্ব্বের মত অপ্রাপ্য বলিয়া বোধ হইল না। পরন্তু সে আকাঙ্ক্ষা বলবতী আশায় পরিণত হইল।

সুতরাং যে তিনটী হইলে জীবন সুখী বলা যায়, আমার জীবনে সেতিনটীর অভাব নাই। অতীতের উজ্জ্বল স্মৃতি, বর্ত্তমানের পরার্থ জীবনরূপ পবিত্র উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যতের বলবতী আশা এজীবনের অন্ধকার তিরোহিত করিয়াছে। আমার অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল জীবন অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু আশা করি আর কেহ আমার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দয়া বা সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন না।

একজন দস্যু আমায় বলিয়াছিল হয় সর্ব্বস্ব নয় জীবন দাও। সর্ব্বস্ব লইয়া যখন সে আমার জীবন রক্ষা করিল, আমি তাহার দয়ায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু যে সমাজ নিজে আমার অনন্ত যন্ত্রণার আয়োজন করিয়া সেই দস্যুর মত অথচ মিত্রভাবে আমার প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং বলে 'অত যন্ত্রণা কিরূপে সহিবে তাহা অপেক্ষা একেবারে পুড়িয়া মর' সে সমাজের সে দয়ার বা সহানুভূতির উপর যে আমার সুখ নির্ভর করে নাই ইহাই আমার সৌভাগ্য এবং ইহাতেই আমি পরম সুখী।—

য়াছেন। কিন্তু যে কালের যে ঝোঁক তাহা কাটাইয়া উঠাও বড় সহজ নহে। আমাদের গ্রন্থকারও সেই ঝোঁকে পড়িয়া প্রণয় নাটকের দ্বিতীয় বীজ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিহিংসা ও প্রণয় দুইটী পরস্পর-বিরোধিনী মনোবৃত্তি। প্রতিহিংসা-বীজক নাটকের যদি প্রতিহিংসা করিয়াই নিবৃত্তি হইত ভাল হইত। তাহা না হইয়া মিলনে নাটকের পর্য্যবসান হইয়াছে। এই প্রণয় অংশ ছাড়িয়া দিলে গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট নাটক মধ্যে পরিগণিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির বেশ কার্য্যকারিতা রক্ষা করা হইয়াছে। যবনকৃত অবমানে ব্যথিত হইয়া ডাহির রাজা পণ করিলেন যে ইহার প্রতিশোধ লইতে পারিবে তাহাকেই স্বীয় কন্যা প্রদান করিবেন। এই প্রতিহিংসার সূত্রপাত। ডাহির সেনাপতি সঞ্জীব শৈলসুতার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন রাজ-অবমানের প্রতিশোধ না লইয়া প্রণয়িনীর পাণি গ্রহণ করিবেন না। শৈলসুতাও যে প্রতিশোধ লইবে তাহারই গৃহিণী হইব সংকল্প করিলেন। ভরসা এই রহিল সঞ্জীবই মুসলমান হস্ত হইতে জয়লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার করিবেন। অন্যায় যুদ্ধে ডাহিরের মৃত্যু, হররমার পতন সেই অবমান-প্রতিশোধ-বাসনাকে ঘনতর করিয়া দুর্জ্জয় প্রতিহিংসা রূপে পরিণত করিল। কিন্তু পিতৃমাতৃ-বিয়োগে শৈলসুতা একেবারে নিরুৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞারক্ষা ও মনের দৃঢ়তা সম্পাদন জন্য ডাকিনীর সৃষ্টি। যখনই শৈলসুতা মনে করিতে লাগিলেন সব নষ্ট হইল তখনই ডাকিনী আসিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিল। শেষ সঞ্জীব কাসিমের প্রাণ সংহার করিয়া শৈলসুতাকে বিবাহ করিলেন। বাঁধুনি বড় মন্দ হয় নাই।

দেশহিতৈষা আজিকালি গ্রন্থের প্রধান অঙ্গ। ডাহির সেনাপতি সেই দেশহিতৈষার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মুসলমানের সহিত বিরোধে হিন্দুরা একবার মাত্র সম্পূর্ণ জয়ী হইয়াছিলেন সে কেবল আরবীয়দিগকে সিন্ধু হইতে দূর করিবার সময় বাস্তবিকও সেই আমাদের এক গৌরবের দিন। গ্রন্থকার সিন্ধু দেশের সেই ঘটনাটী নাটকাকারে জনসমাজে উপস্থিত করিয়া হিন্দুদিগের সেই গৌরবের দিন আবার মনে করিয়া দিয়াছেন। অধুনাতন রঙ্গশালা সকল গান তামাসা প্যাণ্টোমাইম লইয়া ব্যস্ত না থাকিয়া যদি এরূপ নাটকের অভিনয় করে দেশের অনেক উপকার হয়।

শ্রীহঃ—

ম্যাট্‌সিনি ও নব্যইতালী।

(একাদশ প্রবন্ধ।)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'ইতালীর একতা-শীর্ষক প্রবন্ধটী পুনর্মুদ্রিত হয়। গ্রন্থকার প্রবন্ধের পরিশিষ্টে যে অংশটুকু সংযোজিত করেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"ইতালীয় একতার পরিশিষ্ট।

"'ইতালীর একতা' প্রবন্ধটী আমি কথনই সম্পূর্ণ করি নাই। এবং যদি ইতালীর ভবিষ্যৎ আমার সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান না থাকিত, আমি ইহা এক্ষণে সম্পূর্ণ করা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতাম। ঘটনায় প্রমাণ করিয়াছে যে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই ঠিক; এবং যাঁহারা ইতালীয় একতা অসম্ভব মনে করিয়া ইতালীয় সম্মিলনের (Federalism.) প্রতিপোষক ছিলেন, প্রকৃত ঘটনা তাঁহাদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছে। ইতালীয় জাতিসাধারণের সর্ব্বশক্তিমান ও অবিসম্বাদি স্বর সমস্ত সাহিত্য-সাধাবান্‌দিগকে (Literary theorists) স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছে যে ত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া আমাদিগের হৃদয়ে যত্নে লালিতা ইতালীর একতা, কল্পনা বা বিঘূর্ণিত মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা নহে—ইতালীয় জাতিসাধারণের অভাব ও আকাঙ্ক্ষার, গূঢ় জীবনের ও ভবিষ্যসৌভাগ্যের অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র। ইতালীয় জাতিসাধারণের স্বাধীন ও অবিসম্বাদী মত এই দুর্ভেদ্য সমস্যার উচ্ছেদ করিয়াছে, এবং অসংখ্য প্রতিকূল ঘটনা সত্ত্বেও ইতালীয় একতা সংসাধনে প্রাণান্ত পণ করিয়াছে। তাহারা এই মহৎ লক্ষ্যের নিকট অন্যান্য সমস্ত স্বত্ব বলিদান দিয়াছে, অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত রাজার ভয় ও সন্দেহ অতিক্রম করিয়াছে, এবং বৈদেশিক মিত্ররাজ্যের চিরদৌর্ব্বল্যসাধক সম্মিলনের প্রস্তাবে কর্ণপাতও করে নাই।

"ইতালীয় জাতিসাধারণের এই সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা সত্বে আমার ইতালীর একতাবিষয়ে আর কিছু না লিখিলেও চলিত।

"কিন্তু কাল যাঁহারা ইতালীর জাতীয় একতার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহারা ইতালীর নূতন রাজা কর্ত্তৃক ইতালীয় একতার নেতৃত্বে ও শৃঙ্খলাকার্য্যে আদিষ্ট হইয়া ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইতালীর সামান্য অংশ পীড্‌মন্তে প্রতিষ্ঠাপিত একতার উপযোগিনী নিয়মাবলী ইতালীয় জাতিসাধারণের অভাব পূরণে নিয়োজিত করিতেছেন। ইহাতে ইতালীর গতি হয় পশ্চাদ্গামিনী হইবে, অথবা দোলায়মান

হইবে, সুতরাং ইতালীর অগ্রগামিনী গতি রুদ্ধ হইবে। এই জন্যই এ বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক মনে করিলাম।

"'ইতালীয় জাতি' এক্ষণে একটী নূতন ঘটনা। এই নূতন ঘটনার এই গুলি প্রার্থনীয় পরিণাম:—প্রথমতঃ জাতীয়-সঙ্ঘাত-সূচক একটী জাতীয় সভা রোমে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল প্রদেশের স্বাধীন নাগরিক লইয়া একটী জাতীয় সেনা প্রস্তুত করিতে হইবে; তৃতীয়ত: ইতালীয় রাজনীতিকে বৈদেশিক আশ্রয় ও আধিপত্য হইতে বিমুক্ত করিতে হইবে; এবং চতুর্থতঃ রাজ্যের শাসনকার্য্যে কেবল ইতালীয় একতার প্রতিপক্ষদিগকে বাদ দিয়া সমস্ত জাতিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

"ইতালীর শাসনকার্য্যের ভার এক্ষণে যাঁহাদিগের হস্তে তাঁহারা যদি আমাদিগকে সে সকল অধিকার প্রদান না করেন, তাহা হইলে প্রবঞ্চিত জাতির অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই প্রতিঘাত বাত্যা উত্থিত হইবে। আমার ভয়, পাছে সেই প্রতিঘাতবিপ্লবে আমাদিগের প্রধান জয়—একতা—বিনষ্ট হয়। এই জন্য আমি ইচ্ছা করি যে এই একতা যেন জাতীয় জীবনের সহিত সংগ্রথিত হইয়া যায়, যেন ঘটনাবলীর প্রতি নব বিমিশ্রণে ইহা অধিকতর ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে।

"একতা একদিন ইতালীর সৌভাগ্য ছিল, আবার আজ হইল। আটার্ণো ও মৈল্লা পর্ব্বতের বরফরাশির অভ্যন্তরে সাবেলীয় জাতিকর্ত্তৃক যে দিন ইতালীর জাতীয় ভাবের বীজ রোপিত হয়, সেই দিন হইতেই ইতালীয় সভ্যতা অবাধে ধীরে ধীরে অশ্রান্তগমনে ঐ দূর ও প্রকাণ্ড লক্ষ্যের অভিমুখে আসিতেছে।

"এই গতি অতি বিলম্বিত হইয়াছে—কারণ ইতালীয় সভ্যতাকে ইতালীয় জাতির মূল নির্ণয় করিতে গিয়া দুইবার পৃথিবী জয় করিতে হইয়াছিল; কিন্তু বহিশ্চর ও অন্তশ্চর সম্ভ্রান্তশ্রেণীর সহিত জনসাধারণের সংঘর্ষে ইহার গতি রুদ্ধ হয় নাই; এ গতি অনিবার্য্য ও অজেয়—কি ধর্ম্মবিপ্লব, কি বৈদেশিক আক্রমণ, কি বহুকালব্যাপী ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা, কিছুতেই ইহা নিবৃত্ত হয় নাই। ইতালীয় জাতিসাধারণের ইতিহাসই—ইতালীয় ইতিহাসের ও ইতালীয় ভবিষ্যতের বীজ। বৈদেশিক ও স্বদেশীয় ইতালীর ইতিহাস ও রাজনীতি লেখকদিগের এই বীজ দেখিয়াই স্থির করা উচিত ছিল যে ঘটনাবলীর গতি ইতালীয় জাতিসাধারণকে কোন্ লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতেছে?

"কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন্ ইতালীয় ঐতিহাসিক ইতালীয় জাতির জীবন চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন?

"মাকিয়াভেলি এ কার্য্যের অনুপযোগী ছিলেন; এবং তাঁহার কোন পুস্তকেও বর্ত্তমান-কালীন ও পুরাকালীন ইতালীয় জাতি সমূহের পারম্পরিক অবস্থার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

"সিস্মণ্ডি—কেবল একমাত্র বৈদেশিক, যাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে ইতালীর ঐতিহাসিক বলা যাইতে পারে—তাঁহার লোকতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি ও গভীর ঐতিহাসিক গবেষণা স্বত্বেও আমাদিগকে ইতালীর ইতিহাসস্থলে ইতালীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরিবারবর্গের দলাদলি, গুণদোষ ও উচ্চাভিলাষের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন; অবাধে ধীরে ধীরে ইতালীর জাতিসমূহের হৃদয় সরোবরে অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হইয়া ইতালীয় একতারূপ যে প্রকাণ্ড হ্রদের সৃষ্টি হইতেছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার মনে কোন সন্দেহও উপস্থিত হয় নাই।

—"মেকিয়াভেলির গভীর ইতালীয় হৃদয় হইতে একবার একতা-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তিনি একজন রাজকীয় ডিক্‌টেটরের অধীনে ভিন্ন সে একতা কখনই সম্ভবপর নয় বলিয়া মনে করিতেন। সিস্মণ্ডি ইতালীবাসী নহেন, সুতরাং তিনি আপাত-অপ্রতিবিধেয় অন্তরায় সকলকে অলঙ্ঘ্য মনে করিয়া 'ইতালীয় একতা' একটী কল্পনামাত্র (Utopia) বলিয়া খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন।

"কিন্তু কি ইতালীয় ঐতিহাসিকেরা কি ইতালীয় বড়যন্ত্রীরা—আমরা বাদে—কি আভ্যুত্থানিক অধিনেতৃবৃন্দ, অথবা সুক্ষ্মশিল্পপ্রিয় ব্যক্তিগণ ইতালীর স্বরলহরীতে হৃদয় স্নিগ্ধ করিতে ও ইতালীর অপূর্ব্ব পুরাতন চিত্রাবলী দেখিতে দলে দলে ইতালীতে আসিতেন, কি তাঁহারা; অথবা যে কবিবৃন্দকে ইতালীতে জীবনস্ফুলিঙ্গমাত্রও 'চিরকালের মত সমাধি-নিহিত একটী জাতির' সুন্দরদৃশ্যে বঞ্চিত করিত, কি তাঁহারা; কেহই ত্রিংশ বা চত্বারিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনাটী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—যে ইতালীয় জাতি সর্ব্বপ্রকার আংশিক উপাদান স্থলে আপনাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিতেছেন, এবং সকল জাতি বা শ্রেণীকে বিধ্বস্ত বা অন্তর্নিবেশিত করিয়া লইতেছেন—তাঁহারা কেহই জানিতে পারেন নাই যে বলবতী একতা-প্রবণতাই এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ইতালীর যাবতীয় উন্নতির উৎপত্তিকারণ হইয়া আসিয়াছে। * * এক্ষণে ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে যে জাতিতেই লৌকিক উপাদান প্রবল সেখানেই একতা নিশ্চিত ও অনিবার্য্য।

* * * *

"যাঁহারা বলেন যে ইতালীর জাতিনিচয়ের মধ্যে পরস্পর অনেক বৈসাদৃশ্য আছে, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে—ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম সমোপাদান (homogeneous) জাতি ফ্রান্স,—তাহার পিরিনিজ, ব্রিটানী, লম্বার্ডী এবং প্রোভেন্‌সের অধিবাসিগণের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য, ইতালীর লম্বার্ড, রোমান্‌ এবং নিয়োপলিতান্‌ অধিবাসিদিগের মধ্যে কি তাহা অপেক্ষায় অধিকতর বৈসাদৃশ্য? পরস্পরের মধ্যে যে বিদ্বেষ ছিল তাহা সময়ে নিহত হইয়াছে। তিন

শত বৎসরের উৎপীড়নে ইতালীর সর্ব্বত্র জীবন-মৃত্যুর অবস্থা একীভূত হইয়া গিয়াছে।

"অন্তর্বিদ্রোহ কি—ইতালীর জনসাধারণে জানে না। গুপ্তচর ও বিভীষিকা দ্বারা রক্তপ্লাবিত, দূষিত গবর্ণমেণ্ট বহুকালব্যাপী কষ্ট দ্বারা [illegible] শিক্ষা ও সমবেত রাজনৈতিক অভ্যাসের অভাব, এবং ব্যক্তিগত ভাবের প্রণোদন—যে ভাব অন্যান্য সকল দেশ অপেক্ষা ইতালীতে অতিশয় প্রবল—জনসাধারণের মনে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিপৎসঙ্কুল প্রতিঘাতের প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই সকল ব্যক্তিগত দোষকে প্রাদেশিক সম্মিলনের বীজ বলিয়া মনে করা আর ব্যক্তিকে প্রদেশরূপে পরিণত করা সমান। এই ব্যক্তিগত দোষ প্রত্যেক নগরের প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক শ্রেণীতেই বিরাজমান। সেই ব্যক্তিগত দোষাবলী নগর হইতে নগরান্তরে প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে প্রায় সংক্রামিত হয় না।

"ইতালীর প্রতিব্যক্তিতে ও প্রতি নগরে যে জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্য ও স্বাধীনরূপে কার্য্যকরণের ইচ্ছার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, তাহা—জাতীয় একতা সংসাধিত হইলে—গবর্ণমেণ্টের কেন্দ্রীকরণ (Centralization) প্রবণতা হইতে স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান উপায়স্বরূপ হইবে। কিন্তু সেগুলি কখনই রাজনৈতিক প্রকাণ্ড বিভাগ সৃষ্টির আবশ্যকতা উৎপাদন করে নাই এবং করিবেও না।

"দেখিয়া বোধ হয় যেন প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রতিপোষকগণ ইতালীর ইতিহাসের এই দুইটী মূল তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম—যথা—বিগত তিন শতাব্দীতে ইতালী যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে তাহা ইতালীর অধিবাসিগণের স্বেচ্ছাপ্রসূত অভিমতে বা স্বাভাবিকী প্রবণতা বশতঃ নহে: কিন্তু সেগুলি বৈদেশিক কূট রাজনীতি, অত্যাচার এবং শস্ত্রবলে রাজ্যশাসনের ফল; দ্বিতীয়তঃ ইতালীয় ইতিহাসে প্রাদেশিক বৈরভাবের কোনও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল বলিয়া কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। দান্তে যে সকল সমরের উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলি নগরে নগরে হইয়াছিল। প্রদেশে প্রদেশে নহে বরং অনেক সময়েই এক প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন নগরে, যেমন কমো ও মিলান্, পাইসা ও সীনা, আরেজো ও ফ্লরেন্স, জেনোয়া ও টিউরিন্, কিন্তু লম্বার্ডী ও পীডমণ্ট, বা তস্কানী ও রোমাগ্না ইহাদিগের মধ্যে নহে।

যে সকল স্থূলদর্শী পরিদর্শক ভীষণ দাসত্বশৃঙ্খলে মর্ম্মাহত দাসগণের পরস্পর বিবাদ হইতে ইতালীর ভবিষ্যতের ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করেন, তাঁহারা জানেন না যে জাতীয় দুন্দুভি ভবিষ্য সংজাত জাতীয় জীবনের শুভ সমাচার ঘোষণা করিলে সকলেই পরস্পর বৈর ভুলিয়া যাইবে। তাঁহারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইতালীর সর্ব্বত্র কি-

রূপ একবাক্যে এইরূপ সংস্কারকার্য্য সকল প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল?" তাঁহারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিনিসিয়া, লম্বার্ডী ও রামীয় প্রদেশের অশীতিলক্ষ লোক একই শাসনপ্রণালী, একই রাজবিধি এবং একই বাণিজ্য কেমন একীকৃত হইয়াছিল? কই তখন ত পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ বা অনৈক্যের বিন্দুমাত্রও লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় নাই।

"তাঁহারা কি ভুলিয়াছেন কিছুদিন পূর্ব্বে যে জেনোয়ার অধিবাসিরা পীড্‌মন্তের অধিবাসিদিগের অসাধ্য-মিলন শত্রু ছিল, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন পীডমন্তার সেনা অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে গমন করিতেছিল, তখন সেই জেনোয়ার অধিবাসীরাই পীডমন্তীর সেনার পায় পাছে ধূলিকণা বিঁধে এইজন্য তাহাদিগের গমনপথে ফুল ছড়াইয়া দিয়াছিল? তাঁহারা কি ভুলিয়াছেন যে ইহারই দশ বৎসর পরে আবার ইতালীর নামে গুপ্ত সভাসকলের অধিনায়কের আদেশে ইতালীর প্রতি প্রদেশে বিপ্লবপতাকা ও জয়ধ্বনি উত্থাপিত হয় এবং ইতালীর প্রতি প্রদেশে জাতীয় নামে অসংখ্য স্বজাতিপ্রেমিক—জীবন উৎসর্গীকৃত করেন?

"তাঁহারা এই চির-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য ভুলিয়া গিয়াছেন যে চরম ঐতিহাসিক লক্ষ্য সংসাধিত এবং জাতীয় ব্রতের উদ্যাপনা সম্পূর্ণ না হইলে কোনও জাতি কখন মরিবে না বা উন্নতি-পথে স্তব্ধ থাকিবে না।

"ইতালীর জাতীয় ব্রত কি, তাহা তাহার ভৌগোলিক অবস্থায়, তাহার উদারচেতা মহাশয় সন্ততিবর্গের অব্যর্থ ভবিষ্যৎ বাণীতে, তাহার ঐতিহাসিক প্রবাদে এবং তাহার জাতীয় জীবনে পরিব্যক্ত আছে।

"প্রতিপক্ষীয়েরা বলেন যে ইতালী কখন একটী সমগ্র জাতি ছিল না, সুতরাং কখন হইবেও না। কিন্তু আমরা দূরদর্শনে বলিতেছি—যে ইতালী আজ পর্য্যন্ত একটী সমগ্র জাতিতে পরিণত হয় নাই বলিয়াই ভবিষ্যতে ইহা একটী প্রকাণ্ড জাতি হইবে। মানবজাতির শুভসাধন ইহার ললাটে লিখিত আছে বলিয়াই ইহা একটী প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে।

"এবং ধীরে ধীরে যুগে যুগে আমাদিগের জাতি সেই লক্ষ্যের দিকেই গমন করিতেছে। ইতালীর অধিবাসিগণের ও ইতালীয় জাতির ইতিহাস একই। সেই ইতিহাস অদ্যাপি লিখিত হয় নাই, এখন লিখিতে হইবে। সে ইতিহাস লেখার আমার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইল যে আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না; সেই ইচ্ছার সহিত আমাকে অচিরাৎ সমাধিনিহিত হইতে হইবে। ইতালীর ইতিহাস যেরূপ হওয়া উচিত, রাশীকৃত ক্ষুদ্রঘটনাজালে ইতালীর প্রকৃত উন্নতিবিবরণ নিহিত না করিয়া যুগে যুগে ইতালীর জনসাধারণের যে সমবেত

পরিণতি হইয়াছে সেইটী কেন্দ্র প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া—যিনি ইতালীর ইতিহাস লিখিবেন, তিনিই ইতালীয় একতাকে ইতিহাসও প্রবাদের দৃঢ় ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত করিয়া আপনার পরিশ্রমকে সার্থক মনে করিবেন।

* * * *

"হাঁ একতা ইতালীতে ছিল, এবং একতা ইতালীতে আবার প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। প্রথমে সীজরগণের শস্ত্রে; দ্বিতীয়বার পোপগণের স্বরে ইতালীতে একতা প্রতিষ্ঠাপিত হয়—আজ তৃতীয়বার ইতালীয় জাতি দ্বারা ইতালীয় ক্ষেত্রে একতা সংস্থাপিত হইবে।

যাঁহারা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইতালীয় জীবনের উন্নতির প্রতি পর পর স্তরে প্রতি পর পর যুগে একতার লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট প্রতিভাত দেখিতে পান নাই—তাঁহারা ঐতিহাসিক আলোকে বঞ্চিত. প্রকৃত ইতিহাসসম্বন্ধে অন্ধ। কিন্তু যাঁহারা একতার এই সকল সুস্পষ্ট লক্ষণ সত্বেও ইতালীতে প্রাদেশিক সম্মিলন ও প্রাদেশিক স্বাধীনতা সংস্থাপিত করিতে সমুদ্যত, তাঁহারা ইতালীর শত্রু ও বিশ্বাসঘাতক।

সম্মিলনপ্রথা ইতালীতে একতাজনিত বল, বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার সমবায়কে ব্যক্তিবিশেষের উপকার সাধনে পরিণত করিবে; সম্মিলন প্রথার প্রধান রোগ শক্তি ও ইচ্ছার সমতৌল্যাভাবকে পরিপুষ্ট করিয়া অরাজকতা ও অনৈক্যের বীজ রোপিত করিবে; প্রাদেশিক অন্তদৌর্ব্বল্যকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রদেশসকলকে পরস্পর হিংসা ও বিশ্বাসঘাতকতার পাত্র করিবে; এবং অপ্রকৃত ও কাল্পনিক স্বাধীনতার নামে পৃথিবীতে ইতালীর যে মহৎ ব্রত আছে তাহার উদ্যাপন করিতে দিবে না।

"আমি জানি যে প্রাদেশিক সম্মিলনের ভাব যাঁহার (তৃতীয় নেপোলিয়ান) ষড়যন্ত্রে ও উপদেশে ইতালীতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, তাঁহাকে অনেকে আজও ইতালীর প্রকৃত বন্ধু ও রক্ষক বলিয়া মনে করেন; কিন্তু আমি জানি যে সেই বৈদেশিক যথেচ্ছাচারী রাজা বিশ্বাসঘাতক এবং ইতালীয়গণ যদি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন তাঁহাদিগকে শুদ্ধ নির্ব্বোধ বলিয়া ক্ষান্ত হইব না, তাঁহাদিগকে ইতালীর ঘোরতর অনিষ্টকারী বলিব। আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া আমাদিগের উপর আধিপত্য করিবেন ইহাই যে তাঁহার লক্ষ্য তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে যখন সম্মিলনের প্রস্তাব আসিতেছে তখন সে প্রস্তাব যে সন্দেহের সহিত গ্রহণ করা উচিত তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

"ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থায় গভীর গবেষণা করিয়া অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ফরাশিজাতির অধিনেতা প্রথম নেপোলিয়ান প্রায়শ্চিত্তক্ষেত্র সেণ্ট হেলেনায় বসিয়া আত্মজীবনবৃত্তে ইতালী

সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

"ইতালী আলপস পর্ব্বত ও সাগর দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত।

"ইহার প্রাকৃতিক সীমা এরূপ স্পষ্ট রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ইহাকে একটী দ্বীপ বলিলেও বলা যায়। * * ইতালী কেবল সার্দ্ধ চারিশত মাত্র মাইল ব্যাপিয়া ইউরোপীয় মহাদেশের সহিত সংযোজিত; কিন্তু সেই সার্দ্ধ চারিশত মাইল ইহা দুর্লঙ্ঘ্য আল্‌পস রূপী প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা এইরূপে ইউরোপ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ইতালী কালে একটী প্রকাণ্ড ও মহতী জাতি রূপে পরিণত হইবে। * * আচার ব্যবহার রীতিনীতি, ও ভাষা ও সাহিত্যে ইহা এখনও আংশিক একটী জাতিই রহিয়াছে; কালে যখন ইহার অধিবাসিগণ এক শাসনের অধীন হইবে তখন একটী পূর্ণ জাতি হইবে। * * এবং রোম যে ইতালীয়গণ কর্ত্তৃক ইতালীর রাজধানী মনোনীত হইবে তদ্বিষয়ে আর বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।'

"ইতালীর মন্ত্রিগণ যেন এই কয়টী ছত্র সুবর্ণ অক্ষরে তাঁহাদিগের হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখেন এবং আর যেন ইতালী ও ইতালীর মহৎ ব্রতের অন্তরায় না হন।

* * * *

"সুতরাং ইতালী এক হইবে। তাহার ভৌগোলিক অবস্থা; ভাষা এবং সাহিত্য; বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও রাজনৈতিক প্রভুশক্তি সংস্থানের আবশ্যকতা; ইতালীর অধিবাসিগণের ইচ্ছা; ইতালীয় জাতির অন্তর্নিহিত লোকতান্ত্রিকতা-প্রবণতা; এমন জাতীয় উন্নতির পূর্ব্বদর্শন, যাহাতে সমস্ত ইতালীয়ের মানসিক ও শারীরিক বলের একীকরণ সংঘটিত হইবে; ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভের বলবতী আকাঙ্ক্ষা; এবং পৃথিবীর মঙ্গলোদ্দেশে ইতালীর বড় বড় কায করিবার উচ্চাশা —এ সমস্ত উক্ত লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই গতির সম্মুখে কোন বাধাই দুরতিক্রমণীয় নহে; এবং ইহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল আপত্তিই ইতিহাস ও দর্শনের অলঙ্ঘ্য সত্য দ্বারা খণ্ডন করা যাইতে পারে। ইহাতে একটি মাত্র কঠিন বিষয় কেবল কার্য্য-প্রণালী।

"কোন বিস্তৃত রাজ্যে স্বাধীনতার অনিষ্ট বিনা একতা সম্ভবপর নহে—এই যে প্রাকৃত কুসংস্কার, ইহার উত্তর দানে বৃথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই। পুরাকালীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র সকলে জনসাধারণ নিজ নিজ হস্তে রাজ্যের শাসনকার্য্য গ্রহণ করিতেন—এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিকেরা সম্মিলন-প্রথার স্বাপক্ষ্যে যে সকল কথা বলিয়াছেন; এই কুসংস্কার তাহা হইতেই প্রসূত। কিন্তু ঐতিহাসিকদিগের সেই সকল বাক্য যুক্তি ও প্রকৃত ঘটনা দ্বারা বার বার খণ্ডিত হইয়াছে।

"রাজ্যের অল্পেতর বা অধিকতর বিস্তৃতি আমাদিগের উল্লেখনীয় সমস্যা নহে। যদি তাহাই আমাদিগের বিচার্য্য বিষয় হইত, তাহা হইলে আমাদিগের ভার লঘুতর। বিস্তৃত সাম্রাজ্য অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কীর্ণ রাজ্যেই গবর্ণমেণ্টের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ অধিকতর সহজ ও দীর্ঘকালধার্য্য।

"মাধ্যমিক প্রভুশক্তির কেন্দ্র দরত্বের পরিমাণানুসারে ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া আইসে যে প্রভুশক্তি বহুদূর হইতে পরিচালিত ব্যক্তি ও পদার্থের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে প্রভুশক্তির পরিচয় নাই স্থানীয় বিষয় সকলে সে প্রভুশক্তির অনুসন্ধিৎসা এড়াইবার সহস্র উপায় আছে।

'মধ্য যুগের ইতালীয় নগর সকলে প্রতিষ্ঠাপিত প্রভুশক্তির ন্যায় যথেচ্ছাচারিণী ও প্রজাপীড়ক প্রভুশক্তি আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। এবং বর্ত্তমান যুগে মডেনার ডচী গবর্ণমেণ্টের ন্যায় যথেচ্ছাচারী ও প্রজাপীড়ক গবর্ণমেণ্টও আর কুত্রাপি দেখা যায় না।

"ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় রাজ্যেই স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠাপিত করা যাইতে পারে; কিন্তু স্বদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ ক্ষুদ্র রাজ্যে যত সহজ, বৃহৎ রাজ্যে তত সহজ নহে। বৈদেশিক বিজেত্রী জাতির শাসন প্রায় সৈনিক যথেচ্ছাচারে পরিণত হয়, এবং সর্ব্বত্র সমান রূপে বিদ্বেষ উত্তেজিত করিয়া থাকে।

"এই প্রশ্ন স্বতঃসিদ্ধ সত্য দ্বারা পরীক্ষিত হইলে অতি সহজ হয়, কিন্তু কোন্‌টী স্বাধীনতার ব্যবহারের প্রকৃত ক্ষেত্র এবং রাজ্যের উদ্যাপনীয় ব্রতই বা কি ইহা অগ্রে নির্ণয় না করিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাওয়াতেই প্রশ্নটী এত জটিল ও দুর্ভেদ্য বলিয়া বোধ হয়।

"কেহ কেহ ব্যক্তিগত স্বত্বের পরিরক্ষণ এবং ব্যক্তিগত স্বত্ব সমূহের পরস্পর-সংঘর্ষণ নিবারণে সমর্থ প্রভুশক্তিই গবর্ণমেণ্ট -এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্টকে শুদ্ধ পুলিশ কর্ম্মচারীতে পরিণত করিয়াছেন এবং স্বাধীনতাকে লক্ষ্য ও সাধন উভয় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

"অপরে, স্বাধীনতাকে অরাজকতা-উৎপাদক ব্যক্তিনিষ্ঠ নিষ্ফল বৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করিয়া ইহাকে সজ্ঞাত মানবের চরণে বলি প্রদান করিয়াছেন এবং সাধারণ হিতোদ্দেশে গবর্ণমেণ্টকে কেন্দ্রীকরণরূপ যথেচ্ছাচারে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ হিতোদ্দেশেই হউক বা অন্য কারণেই হউক—যথেচ্ছাচার, যথেচ্ছাচার ভিন্ন আর কিছুই নয়।

"কেহ কেহ রাজ্য-শাসন-সম্বন্ধীয় কেন্দ্রীকরণকে ঐক্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন।

"কেহবা রাজ্যের অনিয়ন্ত্রিত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতার সমর্থন করিয়াছেন।

"এবং অন্য এক দল শাসন-কারিণী প্রভুশক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর ভাগে

বিভক্ত করাকেই স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে প্রভুতা কেন্দ্র সংখ্যায় যত বাড়িবে, ততই সেই প্রভুতা আত্মরক্ষায় ও আত্ম-আধিপত্য বিস্তারে অক্ষম হইবে।

"এই সকল বিভিন্ন-মতাবলম্বীরা সকলেই পরস্পরমতাসহিষ্ণু, এবং ইহাঁরা কেহই স্বকীয় কোন মহান্‌ ভাবে উদ্বোধিত, বা কোন মহতী উদ্দীপনায় উত্তেজিত নহেন। ইহাঁরা প্রত্যেকেই অতীত কোন না কোন শাসন-প্রণালীর অবিমৃষ্য-অনুকারী। ইহাঁরা এ অংশ বা ও অংশ দ্বারা এই জটিল সমস্যার পূরণ করিতে চেষ্টা করেন।

"সম্মিলন (Association) ও স্বাধীনতা—এই দুইটী অংশ উক্ত সমস্যার অনুপূরক। এই দুইটীই মানব প্রকৃতির অতি পবিত্র ও অবিনশ্বর ধর্ম্ম। কোনটীই পরিহার্য্য নহে; সুতরাং দুইটীকেই সমঞ্জসীকৃত করিয়া লইতে হইবে।

"সুপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সমস্ত জাতি সম্মিলনের প্রতিভূ, এবং প্রাদেশিক সমাজ (commune) স্বাধীনতার প্রতিভূ।

"জাতি এবং প্রাদেশিক সমাজ—এই দুইটী প্রাকৃতিক উপাদানেই যে-কোন-এক-দেশবাসিগণ গঠিত। অন্যান্য সমস্ত উপাদান নৈমিত্তিক ও কাল্পনিক। সেই সকল নৈমিত্তিক উপাদানের কার্য্য—জাতি ও প্রাদেশিক সমাজের পরস্পর সম্বন্ধ অধিকতর মসৃণিত ও পরস্পরকে পরস্পরের অধিকতর উপকারিত্বে পরিণত করা, এবং দ্বিতীয়টীকে প্রথমটীর সম্ভবপর গ্রাস হইতে রক্ষা করা।

"এই বিষয় গুলি মততঃ সর্ব্বত্র সত্য, বিশেষতঃ কার্য্যতঃ সকল দেশ অপেক্ষা ইতালীতে অধিকতর সত্য। ইতালীতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-বিশেষ বা সম্ভ্রান্ত পরিবার-বিশেষ আছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায়, বহুকাল হইতে এক রাজনীতিতে পরিচালিত এক ভাবে উদ্বোধিত ও এক উদ্দীপনায় উদ্দীপিত কোন স্বতন্ত্র সম্ভ্রান্ত শ্রেণী নাই।

"ইতালীর ইতিহাসের দুইটী নিত্য উপাদান—একটী ইহার প্রাদেশিক সমাজনিচয়ের ইতিবৃত্ত; অপরটী ইতালীর অধিবাসিগণ যে একটী জাতিরূপে পরিণত হইতে অজস্র চেষ্টা করিয়াছেন তাহার বিবরণ। সেই ইতিবৃত্ত এবং সেই বিবরণ ইহার প্রচলিত প্রবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই প্রবাদকে পরিপুষ্ট ও অঙ্কলালিত করিয়া সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করণে কেবল ইতালীয় জাতিরই অধিকার ও সামর্থ্য আছে।

"আল্‌পস্‌ হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিখণ্ডের অধিবাসিগণ যে শুদ্ধ একটী রাজ্যের অধীশ্বর এরূপ নহে, তাঁহারা ব্যক্তিগত কার্য্যের নোদক ও কতকগুলি সমভাবে উদ্বোধিত একটী প্রকাণ্ড সমাজের অধিনেতা। এই রাজ্য-বিভাগের সর্ব্বোপরি লক্ষ্য হওয়া উচিত—প্রজাসাধারণের—যে শ্রেণীরই হউক, বা

যে দলেরই হউক—বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সুশিক্ষা বা সভ্যতা সম্পাদন।

"কিন্তু এই জাতীয় কর্ত্তব্যের সংসাধন এবং এই জাতীয় ব্রতের উদ্যাপন দাস গণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। একার্য্য স্বাধীন নাগরিকের কার্য্য। সমগ্র জাতির এক একটী অংশস্বরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তির—কি কি কর্ত্তব্য অবশ্য ও অনুষ্ঠেয়, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে তদ্বিষয়ক জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় থাকা প্রয়োজন। এবং প্রত্যেক যুগে যে পরিমাণ উন্নতি সাধিত হয়, তাহাকেই উন্নতির চরম সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ভাবী উন্নতির পথে যাহাতে কণ্টক রোপিত করা না হয়, এই জন্য সভ্যতার অবস্থানুসারে প্রতি যুগে উন্নতির আরম্ভ হইতে সীমা নির্দ্দেশ করার ভার প্রত্যেক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত রাখা উচিত।

"এই জন্যই আমরা শাসনপ্রণালীর কেন্দ্রীকরণ প্রথার প্রতিকূল; কারণ কেন্দ্রীকরণ প্রথা দুর্জ্জয় শাসনবলে নাগরিকগণের কার্য্যকলাপকে ব্যক্তিনিষ্ঠ গুণাগুণে বঞ্চিত করিয়া থাকে।

"এইজন্যই আমরা ধর্ম্ম, মুদ্রাযন্ত্র, সম্মিলন, শিক্ষা ও প্রাদেশিকসমাজের আভ্যন্তরীণ প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপিনী স্বাধীনতার অনুকূল। প্রাদেশিক সমাজ—যেখানে জাতি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সামাজিক কর্ত্তব্যের ভঙ্গ না হয় সেখানে—ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা ও অনিযন্ত্রিত জীবনের রাজত্বের প্রতিভূ। স্বাধীনতা এ সীমা অতিক্রম করিলে অরাজকতায় পরিণত হইবে।

"ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনেকে এই ভ্রমপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়া থাকেন—যাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরের অনিষ্ট না হয় এরূপ কোন কার্য্য করা বা না করার পূর্ণ অধিকারের নামই স্বাধীনতা। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা শব্দ অন্যপ্রকার অর্থে বুঝিয়া থাকি। কর্ত্তব্যের করণের যে বিবিধ প্রকার উপায় আছে তাহার মধ্যে যে উপায়টী অবলম্বন করিলে কর্ত্তব্যের ক্রমিক পরিণতি সাধনের সহিত আত্মপ্রবণতার সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, যে বৃত্তি দ্বারা ঠিক্ সেই উপায়টী মনোনীত করা যাইতে পারে তাহারই নাম স্বাধীনতা।

"প্রকারান্তরে, যে সভ্যতা এতাবৎ কালপর্য্যন্ত অধিগত হইয়াছে, জাতি সেই সভ্যতার উপাদান সামগ্রী সকল সংগৃহীত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবেন, এবং তাহা হইতে জাতীয় লক্ষ্যের মূলভিত্তিস্বরূপ কতকগুলি অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্যের নিয়ম অবনয়ন করিবেন—যে কর্ত্তব্যবিষয়ক নিয়মাবলী জাতীয় জীবনকে সেই সাধারণ লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইবে এবং জনসাধারণের মনে সেই লক্ষ্যের ভাব সুপ্রতিষ্ঠাপিত ও উদ্দীপিত করিয়া দিবে। সেই কর্ত্তব্যবিষয়ক নিয়মাবলী যাহাতে যথাবিধি প্রযুক্ত হয় প্রাদেশিক সমাজ তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবেন; এবং এই জাতীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালনের সহিত

প্রাদেশিক হিত সাধনের সামঞ্জস্য করিবেন; এবং প্রত্যেক অধিবাসীর অন্তরে স্বাধীনতার ভাব উদ্দীপিত করিয়া তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ উন্নতির বীজ বপন করিতে শিখাইবেন।

"নৈতিক প্রভুতা জাতিতেই বিদ্যমান আছে।

"কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে নৈতিক নিয়মাবলীর প্রয়োগ প্রাদেশিক সমাজেরই কার্য্য। আপন আপন কার্য্যক্ষেত্রে আবশ্যকমতে নূতন কার্য্যের অবতারণা করার অধিকার জাতি ও প্রাদেশিক সমাজ উভয়েতেই বিদ্যমান।

"প্রাদেশিক সমাজ নগরের ও গ্রামের অধিবাসিগণকে স্বদেশের জন্য সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করিবেন।

"জাতি স্বদেশীয় অধিবাসিগণকে মানবসাধারণের উপকারার্থ সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করিবেন।

"যেমন মানবদেহে রক্তপ্রবাহ শিরাসকল হইতে হৃদয়যন্ত্রে চালিত হইয়া পরিশোধিত আকারে তথা হইতে আবার শিরাসকলে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রাদেশিক সমাজ হইতে উন্নতিস্রোত রাজধানীতে প্রবাহিত হয়, এবং তথায় জাতীয় জীবনের উপযোগিনী হইয়া জাতীয় প্রভুতা লইয়া আবার প্রাদেশিক সমাজে প্রত্যাবৃত্ত হয়। রাজধানীর অস্তিত্ব রাজধানীর নিজের জন্য নহে, সমস্ত দেশের জন্য।

"যাঁহারা কার্য্যতঃ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যদি আমাদিগের প্রদত্ত উপদেশাবলীকে মূলভিত্তি করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকট ইহা দুর্ভেদ্য সমস্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

"জাতিসাধারণ ও প্রাদেশিক সমাজের কর্ত্তব্যের এইরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইলে, সেই সমকেন্দ্র বৃত্তদ্বয়ের আভ্যন্তরীণ কর্ত্তব্য ও অধিকার নির্ণয় করা সহজ হইবে। ইতালীর যাবতীয় কর্ত্তব্যজ্ঞান যাহার অন্তর্নিহিত, অধিবাসিমাত্রের উপর জাতির যে নৈতিক প্রভুতা, যে জাতীয় প্রবাদ পবিত্র সম্ন্যাসস্বরূপ যত্নে পরিরক্ষিত করা উচিত, যে জাতীয় উন্নতি অধিবাসিমাত্রেরই অনুসরণীয়, এবং যে অন্তর্জাতীয় (International) জীবন জাতিমাত্রেরই পরিপোষণীয়, সে সমস্ত গুলিরই নিয়মনে কেন্দ্রস্থ প্রভুতার অধিকার।

"সাধারণ নিয়মাবলীর কার্য্যে প্রয়োগ, প্রাদেশিক হিত, সামাজিক কর্ত্তব্যসাধনের উপায় স্থির করণের স্বাধীনতা, এবং কার্য্যকরণের অলঙ্ঘ্য ব্যক্তিগত অধিকার, এ গুলির নিয়মনে—জাতীয় তত্ত্বাবধানে—প্রাদেশিক সমাজেরই অধিকার। রাজশক্তি বিশ্বজনীন নির্ব্বাচন দ্বারা নির্ব্বাচিত জাতীয় সভার সাহায্যে কেবল জাতীয় কার্য্যের পরিচালক সাধারণ নিয়মাবলী প্রস্তুত ও প্রচার করিবেন।

* * * * *

"রাজশক্তি—জাতীয় শিক্ষার মূল

সূত্র সকল নির্দ্দিষ্ট করিয়া যাহাতে সাধারণতঃ সকলেই একীভাবে সেই মূল সূত্র ধরিয়া শিক্ষা কার্য্য বিধান করে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। কারণ শিক্ষা বিষয়ে ঐক্য না থাকিলে কখনই একটী জাতি সংগঠিত হইতে পারে না।

"সেই সাধারণ মূল সূত্রের কার্য্যে পরিণমন, নিম্নশিক্ষার অভিভাবক স্থিরীকরণ, জাতীয় বিদ্যালয় সমূহের আয় ব্যয়ের নিয়মন, স্বাধীন শিক্ষাশালা উদ্ঘাটনে ব্যক্তিবিশেষের অধিকারের পরিরক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে প্রাদেশিক সমাজেরই অধিকার।

"দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা, ও জাতীয় লক্ষ্যের সংরক্ষণ প্রত্যেক অধিবাসীর কর্ত্তব্য। সুতরাং জাতীয় সেনার একতা বিধান, সশস্ত্র অধিবাসিগণের শৃঙ্খলাবন্ধন—রাজশক্তির প্রধান কর্ত্তব্য।

"জাতীয় সভায় পূর্ব্বেই যে সকল সামরিক মূল সূত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই সকল মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া, প্রাদেশিক সেনা সকল যে সকল সেনানায়ক নির্ব্বাচিত করিবে, সেই তালিকা হইতেই জাতীয় সেনানায়ক সকল মনোনীত করিতে হইবে।

"যেহেতু ন্যায়ের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে সকল অধিবাসিরই বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে—এই জন্য বিচারপ্রণালী ও দণ্ডবিধির ঐক্যবিধান, প্রধান বিচারালয় সকলে উপযুক্ত বিচারপতি সংস্থাপন, দণ্ডবিধি ও বিচারপ্রণালীর সুশৃঙ্খলা বিধান প্রভৃতি কার্যের নিমিত্ত প্রতি প্রাদেশিক সমাজে এক এক জন মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা রাজশক্তিরই কার্য্য।

"প্রাদেশিক সমাজ প্রাদেশিক জুরি মনোনীত এবং শালিসী ও বাণিজ্যবিষয়ক আদালতের সভ্য নির্ব্বাচিত করিবেন।

"রাজশক্তি জাতীয় করের নির্দ্ধারণ ও দেশের সর্ব্বত্র তাহার যথোপযুক্ত বিতরণ করিবেন।

"প্রাদেশিক সমাজ, রাজশক্তির সাহচর্য্যে, প্রাদেশিক করের নির্দ্ধারণ ও জাতীয় কর সংগ্রহের উপায় স্থিরীকরণ করিবেন।

"ব্যাঙ্কসমগুলী, রেলওয়ে কোম্পানী ও অন্যান্য শ্রমশিল্পবিষয়ক কোম্পানীর সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া—রাজশক্তি একটী জাতীয় মূল ধন সংস্থাপিত করিবেন। রাজ্যের অনিয়মিত ব্যয়ভার নির্ব্বাহন, করভার কমান, এবং শিল্প ও কৃষিবিষয়ে শ্রমজীবিদিগের সাহায্য দানে সেই মূল ধনের কিয়দংশ ব্যয়িত হইবে।

"রাজশক্তির অভিভাবকতাধীনে এবং কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সেই মূল ধনের যথাযথ বিতরণের ভার প্রাদেশিক সমাজেরই হস্তে থাকিবে।

"সাধারণের শান্তি-ঘটিত বিষয় সকল, কারাগার-সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাবলী, অনুশোচনাশালা (penitential establishments) স্থাপনা প্রভৃতি কার্য্যের ভার রাজশক্তিরই হস্তে রহিবে।

"প্রাদেশিক বিভাগে শৃঙ্খলা স্থাপন,

স্থানীয় ব্যবহারোপযোগিনী স্থানীয় সেনা সৃষ্টি, এবং প্রাদেশিক কারাগার সকলের আভ্যন্তরীণ কার্য্যপ্রণালীর ব্যবস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য প্রাদেশিক সমাজই করিবেন।

"জাতীয় গৌরব রক্ষা, ও জাতীয় সুবিধা সম্পাদনের জন্য যে সকল সাধারণ কার্য্য (Public works) অনুষ্ঠিত হয় তাহার নিয়মন, এবং জাতীয় শিল্পের পরিরক্ষণ ও পরিপুষ্টি সাধন—এ সমস্ত ভার রাজশক্তিরই উপর ন্যস্ত থাকিবে।

"পথে আলোকপ্রদান, পথবন্ধন, পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ দ্বারা জল সংযোজন, সাধারণ পথসকলের সংরক্ষণ ও সংস্করণ প্রভৃতি কার্য্যসকল প্রাদেশিক সমাজসকলকেই করিতে হইবে।

"বৈদেশিক রাজনীতির নিয়মন, শান্তি স্থাপন ও রণখ্যাপন, সন্ধি বন্ধন ও মৈত্রী সংস্থাপন প্রভৃতি জাতীয় কার্য্যসকল রাজশক্তিরই হস্তে থাকিবে।

"রাজ্যের বৈদেশিক রাজনীতির উপর এরূপ লক্ষ্য রাখা, যাহাতে ইহা জাতীয় লক্ষ্য ও ব্রত হইতে বিচলিত না হয়—প্রাদেশিক সমাজের একটী প্রধান কর্ত্তব্য হইবে।

"এবং এইরূপে অন্যান্য কার্য্যও অনুষ্ঠেয়।

"স্বত্ব ও কর্ত্তব্যের এইরূপ বিতরণ ও বিনিয়োগ করিতে পারিলে অরাজকতা বা যথেচ্ছাচারের সম্ভাবনা কোথায়?

"এইরূপ করিলে জাতীয় গৌরব ও জাতীয় উন্নতির প্রতিকূল প্রাদেশিক বিদ্বেষ এবং প্রাদেশিক বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কোথায়? ফ্রান্সের ন্যায় প্রাদেশিক সমাজ সকলের জঘন্য অধীনতায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? ফ্রান্সে যেরূপ রাজশক্তি প্রাদেশিকসমাজ সকলের অধিনায়ক ও কর্ম্মচারী স্থির করিয়া ও অন্যান্য সামান্য সামান্য আভ্যন্তরীণ বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিয়া প্রাদেশিক সমাজসকলকে ক্রীড়নক স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন—এখানে তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

"যাহা হউক—আমি এখানে যে নূতন প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি তাহার সবিস্তার বর্ণন এখানে আমার উদ্দেশ্য নহে। যদি প্রাদেশিক সমাজ সকলকে প্রতিনিধিসমাজরূপ মাধ্যমিক প্রভুতার অযথা সম্প্রসারণ হইতে আত্মসভ্যগণের স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ করা অভিলষিত হয়, যদি তাহাদিগকে নির্ব্বাচনপ্রণালীর প্রাদেশিক প্রয়োগ এবং সাধারণ কার্য্য ও পদের যথাবিধি অনুশীলন দ্বারা জাতীয় শিক্ষার পূর্ণতা বিধানে সমর্থ করিতে হয়; এবং তাহাদিগকে সকলকে যে সকল স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে তাহা যদি প্রবঞ্চনা না হয়;—তাহা হইলে জাতীয় প্রতিনিধি সভাকে এমন বিধি ব্যবস্থাপিত করিতে হইবে যাহাতে প্রাদেশিক সমাজগুলি জাতীয় প্রভুশক্তির কিয়দংশ প্রাপ্ত হয়।

"প্রাদেশিক সমাজ সকল রাজ্যের

ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিমাত্র; সুতরাং তাহাদিগকে সেই লক্ষ্য-সংসাধনোপযোগিনী প্রভুশক্তি প্রদান করা আবশ্যক। কিন্তু এই লক্ষ্য সংসাধনোদ্দেশে, এবং আপন আপন প্রাদেশিক নৈতিক ও ভৌতিক অভাব পূরণের জন্য প্রাদেশিক সমাজসকলকে অনেক সময় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হয়। কিন্তু তাহা প্রায় আপনাদিগের রীতি নীতি, অভ্যাস ও প্রাদেশিক স্বাধীনতার বিনিপাতে পরিণত হয়।

"প্রাদেশিক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ হস্তক্ষেপই ফ্রান্সে শাসনপ্রণালী-বিষয়ক কেন্দ্রীকরণের আতিশয্যের প্রধান কারণ। ফ্রান্সে ৩৭,০০০ সহস্র প্রাদেশিক সমাজের মধ্যে, অন্যূন ৩০,০০০ সহস্র আপন আপন প্রদেশে ভিক্ষাব্যবসায়ের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে অক্ষম।

"প্রাদেশিক সমাজনিচয়ের দৌর্ব্বল্যই মাধ্যমিক প্রভুশক্তির বলোপচয়ের নিদান, যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টসকল যে ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন, অষ্টমবাৎসরিক ফরাশি রাজবিধি তাহার প্রমাণ। এই বিধি দ্বারা প্রাদেশিক সমাজসকলকে মাধ্যমিক প্রভুশক্তির জঘন্য অধীনতায় আনয়ন করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এরূপ বিধি টীয়ার্স প্রভৃতি মহোদয়গণের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়াছে।

"ইতালীতে যদি শাসনপ্রণালীর পূর্ণ পরিণতি করিতে হয়, তাহা হইলে প্রাদেশিক সমাজসকলের প্রসর বাড়াইতে হইবে।

"এক রাজনৈতিক বিশ্বাসে দীক্ষিত সহযোগিবৃন্দের সহিত আমার এসকল বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। যাঁহারা এক সামাজিক জীবনে গ্রথিত, তাঁহাদিগকে—কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে এক তত্ত্বাবধানে আনার যে কত সুবিধা তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যদি ইতালীয় জাতির সেই সজ্ঘাত জীবনের পরিণতির কোন অন্তরায় থাকে—তাহা নগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সকলের সভ্যতার বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য।

"নগর সকল উন্নতিশীল জীবন ও জাতীয় সম্মিলনের কেন্দ্রনিচয়—কিন্তু নগরপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সকল অধিবাসিসমূহের ঘোর মূর্খতা নিবন্ধন সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রতিরোধ-কেন্দ্র স্বরূপ। এই ভীষণ রোগের একমাত্র বীর্য্যবান্ প্রতিকারৌষধ—ক্রমে সেই সাংঘাতিক বৈষম্যের দূরীকরণ; এবং নাগরিক ও জনপদবাসিগণকে এতদূর মিলিত করণ—যাহাতে নগরের উপচীয়মান সভ্যতাসূর্য্যের কিরণজাল চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সকলে বিকীর্ণ হইতে পারে।

"নাগরিকবৃন্দ ও জনপদবাসিগণকে পৃথক্ রাখ, তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে স্বার্থবিরোধ চলিয়া আসিতেছে তাহাই চিরস্থায়ী করিবে, কিন্তু তাহাদিগকে

মিলিত কর, দেখিবে পরস্পর মিলনের প্রভাবে সে স্বার্থবিরোধ চলিয়া যাইবে। নগরের উন্নতিশীল উপাদান জনপদবৃন্দের অবনতিশীল বা স্থিতিশীল উপাদান দ্বারা বিনষ্ট হইবে তাহার আশঙ্কা নাই,—কারণ এ যুগের দৈব অগ্রগমন, এবং নিম্ন শ্রেণীর শুভসংসাধনী ও জীবনী-শক্তির উদ্দীপনা দেখিয়া নির্ব্বিঘ্নে বলা যাইতে পারে যে যদি এ মিলন প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহা হইলে উন্নতির আধিপত্য নিরঙ্কুশ থাকিবে।

"রাজশক্তির জীবন—সহস্রভাগে দেশের খণ্ডীকরণ যাহার নয়ন-প্রীতিকর—এক্ষণে ভগ্ন ও অন্তর্বিচ্ছিন্ন। যদিও অনেকে মনে করিতেছেন যে রাজশক্তির এই বিচ্ছিন্নীকরণ স্বাধীনতার প্রতিভূ, তথাপি এই ঘটনা হইতে কেবল সেই মাধ্যমিক প্রভুশক্তি বলশালিনী হইতেছে যাহা সাধারণের ভীতিস্থল; এবং যাহা সকল প্রতিরোধকেই মূলে বিদলিত করিতে সক্ষম।

"কতকগুলি লোককে একত্র মিলিত করিলেই যে কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব-কেন্দ্র স্থষ্টি করা হয় এরূপ নহে।

"এমন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরই অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়, যাহার কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, এবং যাহার সেই লক্ষ্য সাধনোপযোগী যুক্তি ও যন্ত্রের প্রাচুর্য্য নাই।

"আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে ইতালীর অন্যান্য বর্ত্তমান বিভাগ সকল বিলুপ্ত হইয়া ইতালী দ্বাদশ প্রকাণ্ড বিভাগে বিভক্ত হয়; প্রত্যেক বিভাগে একশত করিয়া প্রাদেশিক সমাজ ও বিংশ সহস্র করিয়া অধিবাসী থাকে।

"প্রাদেশিক সমাজ গুলি আবার আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত কতকগুলি পল্লীসমাজে বিভক্ত হইবে; কিন্তু পল্লীসমাজ গুলির সাধারণ কার্য্য নিয়মনের কেন্দ্র তত্তৎ প্রাদেশিক সমাজের প্রধান নগরই থাকিবে।

"বিভাগীয় ও প্রাদেশিক সমাজ সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিগণ সাধারণ নির্ব্বাচন দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

"প্রত্যেক বিভাগের প্রধান প্রধান নগরে এক একজন করিয়া গবর্ণমেণ্টের কমিশনর নিযুক্ত থাকিবেন। প্রাদেশিক সমাজ সকলে এরূপ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করার প্রয়োজন নাই। তত্তৎপ্রদেশের প্রধান মাজিষ্ট্রেটগণই প্রাদেশিক ও জাতীয় কার্য্যের প্রতিভূস্বরূপ থাকিবেন। জাতীয় জীবনের বিভাগীয় ও প্রদেশীয় উপাদানদ্বয়ের সামঞ্জস্যের বর্ত্তমানতা পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কেবল মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাবধায়কগণ প্রেরণ করিবেন।

"এরূপ শৃঙ্খলা সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা (localism) বিনষ্ট করিয়া, বিভাগীয় ও প্রাদেশিক একতা কেন্দ্রগুলিকে স্ব স্ব অধিকারে সম্ভবতঃ অধিকতম উন্নতি সাধনে সমর্থ করিবে। এবং এতদিন ইতালীর যে সাধারণ কার্য্য-প্র-

ণালী অতি মৃদু ও জটিল ছিল তাহাকে সরল ও ক্ষিপ্র করিয়া তুলিবে।

"বড় বড় বিভাগ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগেই স্বাধীনতা কার্য্যতঃ ব্যবহার্য্য ও অনুভবনীয়। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ যে বর্ত্তমান বড় বড় বিভাগের স্থান অধিকার করিবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

"যে সকল নগর অতীত ঐতিহাসিক অবদান-পরম্পরা নিবন্ধন দ্বিতীয় রাজধানীর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে, এই শৃঙ্খলা অবলম্বন করিলে তাহাদিগের ধ্বংসের সম্ভাবনা নাই। এই শৃঙ্খলায় প্রত্যেক বিভাগ রাজধানীয় বিভাগের সম-গৌরবশালী হইবে। আমি জানি না—এক্ষণে জাতীয় জীবনের যে বিভিন্ন বিভিন্ন অঙ্গ গুলি একটী মহানগরীতে কেন্দ্রীভূত আছে, সেই অঙ্গগুলি রাজ্যের নানা নগরে বিক্ষিপ্ত কেন না হইবে। আমি জানি না—রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় এক নগরীতে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় নগরীতে, জাতীয় স্থল-সৈন্য তৃতীয় নগরীতে, জলসৈন্য চতুর্থ নগরীতে, শিল্প ও বিজ্ঞান বিদ্যালয় পঞ্চম নগরীতে —ইত্যাদিরূপে রাজশক্তির ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি সকল ভিন্ন ভিন্ন নগরীতে বিভাজিত কেন না হইবে।

"তাড়িত বার্ত্তাবহ শান্তিকালে একতাসূত্রস্বরূপ হইবে, এবং এতন্নিবন্ধন যুদ্ধ ও বিপৎকালে কেন্দ্রীকরণ অতি সহজ হইবে।

"জাতীয় প্রতিনিধিতা, পবিত্র নাম, এবং ইউরোপীয় ধর্ম্ম্য একতার দৈবনির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রীয়তা—রোমের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে।

"কিন্তু মদনুস্তাবিত প্রণালী বা অন্য যে কোন প্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হউক না কেন, একটী বিষয় স্থির—যে যদি ইতালীর স্বাধীনতা ও জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে—একদিকে রাজশক্তিকে শিক্ষাবিষয়িণী প্রভুতা রূপে পরিণত করিতে হইবে, এবং অন্য দিকে প্রাদেশিক সমাজ সকলকে পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তারিত করিতে হইবে।

"যদি ইতালীতে অনিযন্ত্রিত উন্নতি ও অবিচ্ছিন্ন সভ্যতা দেখিতে চাও, তাহা হইলে নগর ও জনপদ সকলকে একত্রীকৃত ও সমঞ্জসীভূত করিতে হইবে। যদি ইতালীর প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকের অন্তরে স্বাধীন নাগরিকোপযোগী আত্মগৌরব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান অনুস্যূত করিতে চাও, তাহা হইলে ইতালীর প্রত্যেক অধিবাসিকেই পর্য্যায়ক্রমে রাজ্যের সমস্ত কার্য্যভার প্রদান করিতে হইবে। তাহা হইলে ইতালীর জনসাধারণকে রাজকীয় কার্য্য ও রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের কার্য্যের উপর মতামত প্রকাশ করিতে আহ্বান করিতে হইবে। যত পরিমাণ সম্ভব ইতালীর সর্ব্বত্র শ্রমশিল্প ও কৃষি-বিষয়ক সমাজ সকল প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে, এবং ইতালীর প্রত্যেক অধিবাসীকে সৈনিক ও নাগরিক উভয় কার্য্যে দীক্ষিত করিতে হইবে।

"যে জঘন্য সম্প্রদায় এক্ষণে ইতালীয়

হৃদয়ে দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ রহিয়াছে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি সেই সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন ও বিপর্য্যস্ত করুন্, এবং ইতালীয়গণ—যাঁহারা জগতে তাঁহাদিগের গুরুতর ব্রতের ভাবে উদ্দীপিত হইয়াছেন—স্বাধীনতা সমরে উৎসর্গীকৃতজীবন ভ্রাতৃবৃন্দের স্মরণার্থে রোমে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তাহাতে ভবিষ্যতের সঙ্কেতচিহ্ন স্বরূপ এই দুইটী কথা সুবর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখুন—ঈশ্বর ও জনসাধারণ—একতা ও স্বাধীনতা।"

আমি বিশ্বনিন্দুক কেন?

চক্ষুলজ্জা বড় চমৎকার সামগ্রী। যেখানে চক্ষুরূপ ব্যাঘাত নাই, সেখানে সবই সোজাসুজি, ঠিক ঠিক, যথোচিত। খাতির নাই, সংকোচ নাই, শঙ্কা নাই, সবই ন্যায্যগণ্ডা। ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু মনে হইতেছে যেন ইংরেজী রূপকে বিচারকে অন্ধ বলিয়া বর্ণন করে; নহিলে কড়া ক্রান্তির এ দিক্ ও দিক্ না করিয়া, অমন প্রসন্নমুখে, স্থিরচিত্তে, সুস্থ শরীরে রামের ধন শ্যামকে দিতে পারিবে কেন? নহিলে, হরি মরিয়াছে, মধু তুমি খর্পরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছ বলিয়া, অকুণ্ঠিতভাবে মধুকে—প্রাণের শোধ প্রাণ—বলিদান দিতে পারিবে কেন? বাস্তবিক চক্ষুলজ্জা বড় মজার জিনিশ; স্বর্গ ও নরকে, দেবতা ও পিশাচে রফা করিয়া ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। শরীরবদ্ধ কাব্য—বঙ্গের কামিনী বুঝিয়া শুঝিয়াই, আত্মপরের ভেদ অস্বীকার করিয়া যাহাকে তাহাকে চক্ষুর মস্তক ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করেন। লোকে যে অনুরোধ রাখে না, সে লোকের দোষ, রাখিলে সংসারের বিড়ম্বনা প্রায় থাকে না।

সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসিয়া, বুকে পিঠে, আশে পাশে তাকিয়া দিয়া, মাথার উপর টানা পাখা টানাইয়া, আঠার হাত আলবোলার নলের মুখে সোণার মুখনলে আমি তামাক খাই। ব্রহ্মাণ্ড মূর্খ আমি পণ্ডিত, ব্রহ্মাণ্ড বোকা আমি বুদ্ধিমান্—বসিয়া ইহাই ভাবি, ভাবিয়া ইহাই বলি। আবার, যাহা বলি, তাহা লিখিয়া বিদ্যা ছড়াই, (সাধুভাষায়) সাহিত্যের বিস্তার করি। দেখিয়া শুনিয়া সংসার অবাক্। এত যে পৃথিবীর নিন্দা করি, পৃথিবীর নিন্দাকে তৃণজ্ঞানও করি না, তথাপি কেহ আমাকে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারে না আমার এ ভাবের কারণ কি? আমি বিশ্বনিন্দুক কেন? সকল ব্যক্তি ও সকল বস্তুর দিকে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আমি দৃষ্টিপাত করি কেন? অধর-প্রান্তে তাচ্ছীল্যের সঙ্গে

ঈষৎ হাসি মাথাইয়া লোকের পিত্ত-জ্বালা উৎপাদন করি কেন? নরহন্তা, জালকারী, পরস্বাপহারী,—অধিক কি বলিব—গ্রন্থকার হেন অসমসাহসিক ব্যক্তি পর্য্যন্ত, আমার নিকট গতিবিধি করে, অথচ মুখ ফুটিয়া এই সামান্য কথা, কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। ইহারা আমার সমীপে কিছু প্রত্যাশা রাখে তাহাও নহে; কারণ এক দিন আসিয়া ইহাদের কেহ কেহ আর দেখা দেয় না,—তথাপি ইহারা জিজ্ঞাসা করে না। জিজ্ঞাসা যে করে না, সে কেবল চক্ষুলজ্জার দায়ে! তাই বলিতেছি চক্ষুলজ্জা বিষম বস্তু।

সৌন্দর্য্য দেখিতেই কবির ইহ জন্ম ফুরাইয়া যায়;—উষার সীমন্তে বালসূর্য্য, অমাবস্যায় কাদম্বিনীর কোলে সৌদামিনী, পল্লবাগ্রে শিশির-মুক্তা, কামিনী-নয়নে প্রেমাশ্রু, শিশুর ভুবন-মোহন পবিত্র হাসি, রমণীর জগন্মোহন যৌবন,—বাহ্য প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য; আর প্রণয়ীর ভালবাসা, বিরহিণীর আশা, মোহের বিকার, ভক্তির উচ্ছ্বাস,—অন্তরাত্মার এই লীলা দেখিতেই কবি বিভোর। তদুপরি, তাঁহার হৃদয় আছে, হাসিতে না পাইলে তিনি কাঁদিয়া আকুল। আমার ছবি তিনি আঁকিবেন কেন? এ চিত্র বিকাশ করিবার অবসর তিনি পাইবেন কেন? পাইলেও—তাঁহার চক্ষুলজ্জা আছে, কারণ তাঁহার চক্ষু আছে।

অতএব আমি আত্মগুণগান করিয়া আত্মচরিতার্থতা সম্পাদন করিব। আমার চরিত্র জগতে অপরিচিত থাকে, ইহা বাঞ্ছনীয় নয়; আমার কথা আমিই বলিব, যিনি আমায় চিনিতে চাহেন, আসিতে আজ্ঞা হউক। "আমি কাহাকেও অনুরোধ করিতেছি না; কেন করিব? যে অনুরোধ করে, সে স্ত্রীলোক, তাহার পৌরুষ নাই, সে বিশ্বনিন্দুক নামের অযোগ্য।

যখন শৈশবে আমার জ্ঞানের প্রথম সঞ্চার, যখন আত্মপরের সামাজিক ভেদ শিখি নাই, তখন এক দিন দুই দিন-দশ দিন আমার পিতামাতা আমার সুখের ক্রীড়ায় ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিলেন, আমার তখনকার সেই নির্ম্মল হৃদয়ের সঙ্গী নীচকুলসম্ভূত বলিয়া আমাকে তাহার সঙ্গসুখে বঞ্চিত করিয়াছিলেন; সেই উপলক্ষে আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, শাসন করিয়াছিলেন, শেষে দাস দাসীকে আমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আমার দুগ্ধকলসে সেই প্রথম অম্ল সংযোগ হইল, কাচে হীরকাঙ্ক পড়িল। সে উপদেশ বিফল হইবার নহে, আমার শিক্ষা সফল হইয়াছে।

ক্রমে আমি বিদ্যালয়ে গেলাম। অপ্রাপ্তবয়স্ক একজন রাজপুত্র আমাদের সহাধ্যায়ী ছিলেন, কিন্তু স্বতন্ত্র বসিতেন, পাঠাভ্যাস করিতেন না, শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে কিছু বলিতেন না; আমার হিংসা হইত, উত্তমরূপে পড়া বলিতাম, তবু মধ্যে মধ্যে প্রহার লাভ করিতাম। আমাদের সহপাঠিদের মধ্যে এক জনের

বয়স কিছু অধিক হইয়াছিল, সে শিক্ষককে উপেক্ষা করিত, তাঁহার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিত, আমাকে বিরক্ত করিত। আমাদের সঙ্গে একজন দরিদ্র সন্তান পড়িত, কিন্তু পুস্তকের অভাবে তাহার পড়া ভাল হইত না; বড় মানুষের বোকা ছেলে স্বর্ণপদক, রৌপ্যপদক, আর লাল কাপড়ের মোড়করা, সোণার জলে হলকরা পুস্তক পুরস্কার পাইত, এদিকে সেই দরিদ্র বালক বুদ্ধিমান্ হইয়াও কাঁদিত, তাহাকে কাঁদিতে হইত। এই মনুষ্যজন্মের প্রথম বার তের বৎসর এই দুঃখ দেখিলাম; প্রাতঃকালে এই মেঘ ঝড়, রাজধানীর বাঁধা রাস্তায় এই কাদা, বাঁধান ঘাটে এই পিছল,—ইহা আর ভুলিতে পারিনাই। আরও কত কি চক্ষের উপর ঘটিয়াছে বটে; কিন্তু দর্পণেও ত সুন্দরীর মুখ নিত্য প্রতিবিম্বিত হয়।

এইবার ভাবিয়া দেখ, আর আমি সে শিশু নাই; এখন আমি দ্রবীভূত ধাতু, যে ছাঁচে আমাকে ঢালিবে, ধীরে ধীরে শীতল হইয়া আমি সেই মূর্ত্তিই পরিগ্রহ করিতে প্রস্তুত। আমার পাঠ সমাধা হয় নাই, চিত্তের উন্মেষ হইতেছে; আদর করিয়া, আহ্লাদে অধীর হইয়া পিতা মাতা আমাকে রূপের কোমল সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন—বালকের বিবাহ দিলেন। অধীতবেদ ব্রাহ্মণই জাহ্নবীর মাহাত্ম্য জানে, গঙ্গাকে ভালবাসিতে ও ভক্তি করিতে সেই জানে; যে অনার্য্য, সে পবিত্রতা অনুভব করিতে পারে না, স্রোতে ভাসিয়া, জলে ক্রীড়া করিয়াই সে সুখী। জল, না, জল। আমিও রূপ চিনিলাম, গৌরব জানিলাম না।

এই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, এই ভাবে গা ঢালিয়া যৌবনের সাগরে আসিয়া পড়িলাম, তরঙ্গে নাচিতে লাগিলাম, লবণাম্বুর স্বাদ পাইলাম। আমার পাঠ সমাপ্ত হয় নাই, বিদেশে পাঠের নিমিত্ত আসিলাম; কিন্তু সে নিমিত্ত মাত্র, পাঠ তখন ছল। কেহ আমাকে ধর্ম্মনীতি শিখায় নাই, উপরে গুরুজন নাই, আমি বিদেশে একাকী! উত্তাপে মধুথ গলে, আর শীতল পদার্থে সংলগ্ন হইয়া সেই বিকারের অবস্থায় প্রকৃতিস্থ হয়। কিসে আমার চিত্ত মধুথ অপেক্ষা কঠিন হইবে? তাহাতে বসন্তের কোকিলের মত, মেলায় যাত্রিদলের মত, নাট্যশালার দর্শকবৃন্দের মত আমার সেই প্রথম যৌবনের বন্ধু যুটিতে লাগিল, কুহকী সঙ্গীত আমার মন ভুলাইয়া দিল, আমি কি করিব? পূর্ব্বে বলিয়াছি, রূপ চিনিয়াছিলাম, গৌরব বুঝি নাই; এখন চতুর্দ্দিকেই রূপ, সকল বস্তুতেই প্ররোচনা, আর অন্তরাত্মার উত্তাপ। সে অবস্থায় কেহ আমাকে ফিরাইল না, কেহ আমাকে বাঁচাইল না, আমি মজিলাম। বিধাতঃ! তিক্ত খাওয়াইবে যদি তোমার মনে ছিল, তবে রসনা দিলে কেন?

এখনও কি বলিতে হইবে যে আমার

পদস্খলন হইল? এখনও—না, কেহত আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই; আমি আপনি বলিতে বসিয়াছি, আপনি বলিব। তবে আর রাখিয়া বলিব কেন?—এক অভাগিনীর প্রতি আমি আসক্ত হইলাম। হাঁ, অভাগিনী! আমাকে যেমন তোমরা বাঁচাও নাই, তাহাকেও তেমনি তোমরাই অতল জলে ডুবাইয়াছ। শিশুর ভবিষ্যৎ না চাহিয়া, সরলার পরিণাম না ভাবিয়া, দুঃখের, কলঙ্কের, পাপের জীবন অপেক্ষা পবিত্র মরণ শ্রেয়স্কর, ইহা না বুঝিয়া অভাগিনীর ভিখারিণী জননী স্নেহ-প্রতিমার কুশলের জন্য, স্বীয় উদরান্নের জন্য অভাগিনীকে গণিকার করে সমর্পণ করিয়াছিল; তোমরা তাহাকে লওনা বলিয়া গণিকার হস্তে অভাগিনীকে অর্পণ করিয়াছিল। বল দেখি কি বলিব—অভাগিনী, না দুশ্চারিণী?

একবার আমার চৈতন্য হইয়াছিল, অভাগিনীকেও আমার আলোকের ভাগ দিলাম, দুই জনেই কাঁদিলাম; তোমরা কেহ আমাদের চক্ষের জল মুচাইতে আইস নাই। সেই অবধি আমাদের প্রণয় হইল; কিন্তু বসন্ত আসিল না, শরতের ক্ষণে রৌদ্র ক্ষণে মেঘে আমরা হাঁসিতাম ও কাঁদিতাম।

এই অবসরে, সেই অভাগিনীর গৃহে আমার যৌবন-বন্ধুর দল আসিতেন। হাসির সময়ে সকলেই হাসিতেন। অধঃপাতের আর এক সোপান-পীঠে অবতীর্ণ হইলাম,—বন্ধুজনের অনুরোধ রাখিলাম, আমি সুরাপান করিলাম। আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী নির্ধন, সকলই ছিল; শৈশবে বাল্যে যাঁহাদের সাহায্য পাই নাই এবং যাহাদের সংস্পর্শ পাপ বলিয়া শিখিয়াছিলাম, তাহারা সকলেই ছিল; এই মহাশ্মশানে জনতা দেখিয়া বিরাগ হইল, বিস্ময় হইল, সেই জন্য সুরাপান করিলাম। সকলই বুঝিয়াছিলাম, সকলকেই চিনিয়াছিলাম, আর শুনিয়াছিলাম যে সুরা, বিষ; মরিতে বাঞ্ছা হইয়াছিল, জীবনে ধিক্কার হইয়াছিল, সেই জন্য কৃতাভ্যাস ব্যক্তির চতুর্গুণ সুরা প্রথম উদ্যমে, একবারে, উদরস্থ করিলাম। কিন্তু—মৃত্যু ত হইল না! বন্ধুবর্গ করতালি দিয়া হাসিল, আমি যে পূর্ব্বে কখনও সুরাপান করিনাই তাহা বিশ্বাস করিল না, বন্ধুর সুরে আমাকে মিথ্যাবাদী, আমাকে বঞ্চক বলিল। তোমরা তখন কোথায় ছিলে?

তোমরা কোথায় ছিলে, শুন। স্পর্শের অগোচর ছায়ার ন্যায় প্রতিনিয়ত তোমরা আমার সঙ্গে; অথচ কখনই তোমরা আমাকে আলিঙ্গন করিতে না, আমার আলিঙ্গন সহিতে না। যখন পড়িতাম, তখন আমায় কেহ ধরিতে না, যখন কাঁদিতাম কেহ তখন কাঁদিতে না, কিন্তু আমি হাসিলে—উন্মাদের হাসি হাসিলে—তোমরা প্রতিধ্বনির পৈশাচিক হাসিতে শূন্য বিদীর্ণ করিতে। নিরন্তর

আমি নীতিকথা শুনিতাম, কিন্তু আমার উপদেষ্টাকে দেখিতে পাইতাম না। সকল চক্ষু আমার উপর, কিন্তু কোনও চক্ষুতে করুণা ছিল না; ঘৃণা ছিল, অবজ্ঞা ছিল, দ্বেষ ছিল। অবিচ্ছেদে, দিনে দিনে, সর্ব্বত্র এইরূপ শত্রুর মিত্রতা, মিত্রের শত্রুতা আমাকে অভিভূত করিতে লাগিল। এইরূপে সমাজ যখন আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল, পদদলিত করিতে লাগিল, তখন সমাজকে আমি চিনিলাম। দেখিলাম, সমাজে হৃদয় নাই, সমস্তই গরলাধার। দেখিলাম, বন্ধুতা নাই, কপট মিত্রের উপহাস আছে। দেখিলাম ফেলিবার লোক আছে। তুলিবার কেহ নাই।

তখন ফিরিয়া চাহিলাম; সেই প্রথম প্রণয়ের মঙ্গল ঘট পদাঘাতে চূর্ণ করিলাম, অভাগিনী মর্ম্মে কাতর হইয়া রোদন করিল; কিন্তু আমার নেত্রে আর জল দেখা দিল না। চতুর্দ্দিকে আমার বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, আমার মনস্বিতার, আমার অন্তরাত্মার বলের যশঃ কীর্ত্তন হইতে লাগিল। আমি শুনিলাম, একবার ভুলিলাম, মুহূর্ত্ত মাত্রে সে ভ্রম দূর করিলাম।

আমি ঘোর মূর্খ, আমি দুর্ব্বলচিত্ত, আমি নিষ্ঠুর,—ইহাত আমার অবিদিত নহে; কিন্তু দেখিলাম যে আত্মদোষ স্বীকার করা অধিকতর মূর্খতা, স্বীকার করিলে আপনার প্রতি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়। তখন মুখমণ্ডল গম্ভীর করিয়া, সামাজিকের সঙ্গে সামাজিক হইয়া, দয়ার পাত্র ক্ষীণ প্রাণিকে পেষণ করিতে লাগিলাম, ঘৃণার্হকে মস্তকে তুলিতে শিখিলাম। বঞ্চনা ক্রমে অভ্যস্ত হইল, আমি সংসারী হইলাম। আপনাকে বাঁচাইতে হইলে পণ্ডিত সাজিয়া তুণ্ড-শোভিনী নীতিকথায় সকলকে "দূরমপসর" বলিয়া চলিতে হয়, এ তত্ত্ব এখন আমার অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে। এই-ভণ্ড-জগতের ভণ্ডামিই প্রাণ; ভণ্ডামিই মান, ভণ্ডামিই অধিনায়ক। আত্মগোপন এসংসারে ধর্ম্ম। আস্ফালন, এখানে প্রকৃত বীরত্ব। জয়, পৃথিবীর দেবতা; জয়েরই উপাসনা হইয়া থাকে। সে জয়, নিজ মুখে।

এখন বল দেখি আমি বিশ্ব-নিন্দুক না হইব কেন?

বিশ্বনিন্দুক।

যোগ।

জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করার নাম যোগ। এইপ্রকার যোগ-সাধনাকে মনুষ্য ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থা বলা যায় না। এরূপ ক্রিয়া ভিন্ন মনুষ্য ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেনা। মানবধর্ম্মের অসীম অবস্থা আছে। দান তপস্যাদি কিছুতেই মনুষ্য ধর্ম্মের চরম সীমায় অধিরোহণ

করিতে পারেনা। দানাদিতে এই হয় যে ধর্ম্ম-মন্দিরে আরোহণের ক্ষমতা জন্মে। ব্রত উপবাস পূজা জপ হোম ও তর্পণাদি দ্বারা বাহ্য জগতের ফল ভোগ হয়। আধ্যাত্মিক জগতের ফল লাভ করিতে হইলে যোগ সাধনা অপেক্ষা করে। মনুষ্য যোগ দ্বারা উভয় জগতের স্বামী হইতে পারেন। এই যোগ হিন্দুশাস্ত্রে দ্বিবিধ উল্লেখিত হইয়াছে। কর্ম্ম যোগ আর জ্ঞান যোগ। ভোগী ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম যোগ প্রশস্ত। যোগীদিগের পক্ষে জ্ঞান যোগ প্রশস্ত। যিনি জ্ঞান যোগ সাধনা করেন তিনি অগ্রে কর্ম্ম যোগ সাধনা করিবেন। কর্ম্ম যোগ সিদ্ধ না হইলে জ্ঞান যোগে অধিকারী হইতে পারেন না। কর্ম্মযোগ তাহাকে বলা যায়, যদ্দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা জন্মে অর্থাৎ শমদমাদি। ইহাকে ক্রিয়া যোগও বলে। অনেক লোক আছেন তাঁহারা কেবল চিরকাল কর্ম্ম যোগ করত দেহ ক্ষয় করিয়া বাহ্য জগতে ফলভোগ করিতেছেন। অন্তর্জগতের ফল-ভোগী যোগী এ সংসারে দুর্ল্লভ।

সংসারের মধ্যে অগণ্য প্রাণী আছে। তন্মধ্যে মনুষ্য ভিন্ন অন্য কেহই অন্তর্জগতের ফলভোগী হইতে পারে না। এজন্য মনুষ্য সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই উচিত যে যাহাতে অন্তর্ব্বাহ্য উভয় জগতের ফল ভোগ করিতে পারেন তদনুষ্ঠান করা। মনুষ্য প্রতিক্ষণে অনুভব করেন যে আমি সর্ব্বদা এক অলৌকিক পুরুষের অধীন। মনুষ্য ভাবে এক, কর্ম্মগতিকে হয় আর; সে চেষ্টা করে এক, হয়ে যায় আর। তাবত লোক যদি স্থির চিত্তে আপন আপন জীবন-বৃত্তান্ত চিন্তা করেন তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিবেন যে অনেক কার্য্য তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত ঘটিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আর অনেক দেখা গিয়াছে যে অনেক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি অক্ষমের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন। অতি বুদ্ধিমান্ লোক আপন বুদ্ধি চালনা করিয়াও স্বকার্য্য সাধন করিতে পারেন নাই। অনেকে শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিয়াও অসম্পূর্ণ মনোরথ হইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছেন। মনুষ্য কেবল ঐন্দ্রজালিক সদৃশ মায়ার আধার। কখন কি ঘটনা যে ঘটে তাহা কেহই বলিতে পারেন না। এক সময় আমি রাজা হইয়া সকলের উপর আধিপত্য করিতেছি, আর এক সময় আবার পথের ভিখারী হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি। এরূপ ঘটনা সংসার-চক্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া। ইহাতে আমরা বুঝিতেছি যে এক অলৌকিক পুরুষ আমাদিগের ভাগ্যের উপর নিয়ন্তৃত্ব করিতেছেন। তাঁহার শক্তি অসীম ও হস্তও অতি প্রশস্ত। তাঁহার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার কাহারও সাধ্য নাই। এজন্য তাঁহার বাধ্য হইয়া তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করা মনুষ্যের অতীব কর্ত্তব্য। এইরূপ আত্ম-সমর্পণ করাকে তন্ত্রশাস্ত্রে যোগ বলে। এই আত্ম-সমর্পণ যোগকে স-

মাধি যোগ বলা যায়। সমাধির অর্থ পুনঃ পুনঃ পরমাত্মা চিন্তন। যোগীরা সমাধি যোগ সাধনার পূর্ব্বে পবনাভ্যাস যোগ সাধনা করিতেন। পবনাভ্যাস ব্যতীত সমাধি যোগ হয় না। "যদীচ্ছসি ভবাত্তর্তুং কৈশ্চিদেকেন কর্ম্মণা তন্ত্রশাস্ত্র-বিধানেন পবনাভ্যাসমারভেৎ" *। যদি একটী কর্ম্ম দ্বারা ভবসাগর পার হইতে চাও, তবে তন্ত্রশাস্ত্রের বিধানানুসারে পবনাভ্যাস আরম্ভ কর। পবনাভ্যাস যোগকে প্রাণায়াম কহে। তন্ত্রশাস্ত্রে প্রাণায়াম বহুবিধ তন্মধ্যে যাহার দ্বারা প্রাণনক্রিয়াকে বশীভূত করা যায় তাহাকেই প্রাণায়াম ক্রিয়া বলা যাইতেছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে প্রাণনক্রিয়া কহে। এই নিঃশ্বাস আর প্রশ্বাসকে বশীভূত করাকে পবনাভ্যাস বলে। বাহিরের বায়ুকে শরীরের মধ্যে পূরিত করাকে নিঃশ্বাস আর ঐ পূরিত বায়ুকে বাহিরে পরিত্যাগ করাকে প্রশ্বাস বলে। পূরক কুম্ভক আর রেচক—বায়ুতে এই তিন প্রকার ক্রিয়া করাকে প্রাণায়াম বলে। বায়ুর ঐ ত্রিবিধ কার্য্যকে যিনি বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তিনি পবনাভ্যাসে সিদ্ধ হইয়াছেন। প্রকৃতরূপে যিনি পবনাভ্যাস-যোগ-সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ ও সর্ব্বস্থান বিচরণ অক্লেশে করিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার শরীরে রোগ শোক পরিতাপাদি কিছুই থাকে না। বিশেষ এই যোগ প্রভাবে দেবত্ব পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। এযোগ সাধনা সিদ্ধ না হইতে হইতে যদি দেহত্যাগ হয় তাহা হইলেও যোগী জন্মান্তরে হয় প্রচুর ধনী নাহয় রাজা হইবে। যথা ধনীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টো'হি জায়তে †।

পবনাভ্যাস যোগসাধন করিতে প্রথমে যোগবিদ্ গুরুর আশ্রয় লইতে হইবে। একার্য্য যে সে গুরুর দ্বারা করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি নিজে উৎকৃষ্ট গুরুর নিকট যোগ ক্রিয়া বিধিমৎ শিক্ষা করিয়া যোগাভ্যাস করিয়াছেন তাঁহারি নিকট শিক্ষিত হইয়া যোগ সাধনা করিবে। কেবল পুস্তক দেখিয়া যোগাভ্যাস করিলে অঙ্গহানি হইতে পারে। এ নিমিত্ত যোগগুরু দেবদেব মহাদেব শিক্ষা-গুরুর আদেশ লইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। যদিচ বিশ্বগুরু মহাদেব তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যোগ সাধনার কোন বিষয় বলিতে ত্রুটি করেন নাই, তথাপি সেই শিব-উক্ত আপনাপনি বুঝিতে যদি ভ্রম জন্মে, এবং ভ্রম জন্মিয়া সাধকের ইষ্টাভাব ঘটে এ নিমিত্ত গুরুর উপদেশ লইতে হয়।

অতঃপর সাধকের ও আসনের বিষয় বলা যাইতেছে। ইহার প্রমাণ গুলি পশ্চাৎ বিবৃত হইবে। যিনি যোগাভ্যাস করিবেন তিনি সবল ও অবিকলাঙ্গ ও যুবা হইলে বড়ই ভাল হয়। রোগী কিম্বা বিকলাঙ্গ ও বালক কি বৃদ্ধ হইলে যোগসাধন অত্যন্ত কষ্ট-দায়ক হয়। যিনি যোগ সাধনা করিবেন তিনি যেন ক-

* শিবসংহিতা।

† ভগবদ্গীতা।

দাচ কুসঙ্গে না বেড়ান ও মিথ্যা আলাপ ও মিথ্যা বাক্য কদাচ প্রয়োগ না করেন। যে যে দ্রব্য ভোজন করিতে নিষেধ করা হইবে তাহা যেন ভোজন করা না হয়। পরনিন্দা পরপীড়ন ও চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ ঐ সকল কুক্রিয়া যেন মনেও স্থান না পায়। যেমন কুলোকের সঙ্গে বাস করা যোগ-শাস্ত্রের বিরুদ্ধ, তেমনই অবিশ্বাসী লোকের সঙ্গে কখন থাকিবে না। গুরুর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি শ্রদ্ধা সর্ব্বদা করিবে। দেবতা ও গুরুর নিন্দাকারী লোকের সঙ্গে বাসকরা দূরে থাকুক্ তাহাদিগের সহিত আলাপও করিবে না। এতদ্ভিন্ন অপর যে সকল আচার ব্যবহার করিতে হইবে তৎসমুদায় প্রমাণস্থলে বলা যাইবে।

অতঃপর স্থানের বিষয় বলা যাইতেছে। যে স্থানের বায়ু নির্দ্দোষ ও যে স্থান পবিত্র সেই স্থান নির্জ্জন হইলে যোগীরা তথায় যোগ সাধনা করিবেন। কুস্থানে যোগ সাধনা করিলে যোগের বিঘ্ন হয়। ইষ্টক-নির্ম্মিত কিম্বা প্রস্তর-নির্ম্মিত কিম্বা দারু-নির্ম্মিত অথবা তৃণ-পর্ণ-নির্ম্মিত গৃহ হইলেও তাহাতে যোগ সাধনা করিবে। এই সকল গৃহ জীর্ণ ও অপরিষ্কৃত যেন না হয়। যোগ-গৃহের দ্বার ও বাতায়ন গুলি যেন অপ্রশস্ত না হয়। যোগ-গৃহ সুগন্ধময় হওয়া আবশ্যক, কদাচ যেন দুর্গন্ধযুক্ত না হয়। যে স্থানে যোগাভ্যাস করিবে তাহার নিকটস্থ স্থানটী গান-বাদ্য-শূন্য হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। যেমন গান-বাদ্য-রহিত স্থান যোগ সাধনার পক্ষে প্রশস্ত বলা হইল, সেই প্রকার অসচ্চরিত্র লোকের বাসস্থান যদি যোগ-গৃহের নিকটে থাকে তবে তথা হইতে অন্যত্র যাইয়া যোগাভ্যাস করিবে। যে স্থানে যোগ সাধনা করিবে সে স্থানে শীত বর্ষা রৌদ্রাদির উপদ্রব না থাকে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

এইক্ষণ যোগাসনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বলা যাইতেছে। আসন অনেক-প্রকার আছে তন্মধ্যে পদ্মাসন প্রশস্ত হেতু তাহাই করিবে। প্রথমে কুশাসন কিম্বা কম্বলাসনে যোগী বসিয়া পদ্মাসন করিবে। বাম পাদের জঙ্ঘার উপর দক্ষিণ পাদ রাখিবে, তৎপর দক্ষিণ পাদের জঙ্ঘার উপরে বাম পাদ রাখিয়া—নাসাগ্র দর্শন করিবে। এইরূপ করাকে পদ্মাসন কহে। এই পদ্মাসনের বিশেষ বিবরণ সংস্কৃত প্রমাণ স্থলে বলা যাইবে।

মনুষ্য যখন আত্মতত্ত্বজ্ঞান-বিহীন হইয়া থাকেন তখন পরমাত্মাতে আত্ম সমর্পণ করিতে না পারায় বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অশেষ প্রকার যাতনা ভোগ করিতে থাকেন। এমন কি মহা প্রলয় হইলেও, তাঁহার প্রারব্ধ-কর্ম্ম-গতিকে দেহধারণ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। প্রাক্তন কর্ম্ম যত দিনে ক্ষয় না হইবে ততদিন তাঁহার এ দুর্গতি ঘুচিবে না। যখন পবনাভ্যাস যোগ সিদ্ধ করিবে, সমাধিসাধনায় পরিপক্ক হইবে,

তখন প্রারব্ধ কর্ম্ম সকল ক্ষয় হইয়া পরমাত্মাতে আত্ম সমর্পণ করত ধর্ম্মের চরম সীমায় আরোহণ করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে মোক্ষ পদ লাভ করা যায়না। এই আত্মতত্ত্বজ্ঞানে কে অধিকারী হইতে পারে?—যে ব্যক্তি সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন সেই ব্যক্তিই আত্মতত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী। সাধন-চতুষ্টয় কাহাকে বলে? নিত্যানিত্য বস্তু বিচার এবং যাবতীয় কামনা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করা, শম দম উপরতি তিতিক্ষা ধ্যান ধারণা এই ছয় প্রকার যোগাঙ্গ সাধনা করা, আর সাতিশয় ভক্তি পূর্ব্বক পরমাত্মাতে আত্ম সমর্পণের ইচ্ছাকে বলবতী করা এই সকল গুলিকে সাধন চতুষ্টয় বলাযায়। যাহার জন্ম-জন্মান্তরীণ পুণ্যপুঞ্জ বিদ্যমান্ আছে সে ব্যক্তি গুরূপদেশ ব্যতীত আপনা আপনি নিত্যানিত্য-বস্তু বিবেকী ও সর্ব্বকামশূন্য হইয়া মহাসন্ন্যাসী হওত শম দম উপরতি ধ্যান ধারণায় ক্ষমবান্ হইয়া পরমাত্মাতে আত্ম সমর্পণ করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত হইবে। এই প্রকার লোকের পক্ষে সকল যোগ সাধনই সহজ। তদ্ভিন্ন অন্যের পক্ষে অতি কঠিন। এইক্ষণে বায়ুর বিষয় বলা যাইতেছে। বায়ু ঊনপঞ্চাশৎ প্রকার। তাহার কার্য্য গতিকে নামও তদ্রূপ। মনুষ্য-শরীরস্থ বায়ুর প্রধানতঃ দশটি নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার মধ্যে পাঁচটী—যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। যে বায়ু হৃদয়স্থিত হইয়া কার্য্য করে তাহাকে প্রাণ বলে। যে বায়ু গুহ্যদেশে থাকিয়া কার্য্য করে, তাহাকে অপান বায়ু বলে। নাভিদেশে থাকিয়া যে বায়ু কার্য্য করে তাহাকে সমান বায়ু, আর কণ্ঠদেশে থাকিয়া যে বায়ু কার্য্য করে তাহাকে উদান বায়ু বলে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শরীরস্থিত কার্য্যকরী বায়ুকে ব্যান বায়ু বলে। এতদ্ভিন্ন আর পঞ্চ বায়ু যাহা আছে তাহাদিগের নাম নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই পঞ্চপ্রকার। নাগবায়ুর কার্য্য উদ্গার। কূর্ম্ম বায়ুর কর্ম্ম উন্মীলন। কৃকর বায়ুর কর্ম্ম ক্ষুধা। দেবদত্ত বায়ুর কর্ম্ম তৃষ্ণা। ধনঞ্জয় বায়ুর কর্ম্ম জৃম্ভন। এই দশপ্রকার-ক্রিয়াবিশিষ্ট বায়ুকে যিনি অভ্যাস দ্বারা সিদ্ধ করিতে পারেন তাঁহাকে পবনাভ্যাসী কহে। পবনাভ্যাস সিদ্ধ হইলে নাড়ী শুদ্ধি হয়। নাড়ীর শুদ্ধি হইলে শারীরিক ও মানসিক কোন দোষ থাকে না।

এইক্ষণে পবনাভ্যাস যেরূপে করিতে হইবে তাহার ক্রম। প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের অগ্র পর্ব্বদ্বারা দক্ষিণ নাসাবিবরকে অবরোধ করত বামনাসিকা-বিবর দ্বারা যথাশক্তি অল্পে অল্পে করিয়া বায়ু পূরণ করিবে। পরে ঐ পূরিত বায়ুকে দক্ষিণনাসা দ্বারা অবেগে পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ পুনর্ব্বার বিলোম ক্রমে দক্ষিণ নাসাতে যথাশক্ত্যনুসারে বায়ু পূরণ করত সেই বায়ুকে স্তম্ভিত অর্থাৎ বদ্ধ করত ঐ স্তম্ভিত বায়ুকে অল্পে অল্পে বাম নাসা দ্বারা পরিত্যাগ করিবে।

এইরূপ প্রতিদিন প্রাত মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন বিংশতি বার করিয়া করিবে। এবং অর্দ্ধ রাত্রিতেও একবার এইরূপ করিবে। এই প্রাণায়াম যোগ একাসনে ক্রমাগত তিনমাস করিলে সমস্ত দ্বন্দ্ব পরিমুক্ত হইয়া অনলসতা প্রাপ্ত হইবে।

প্রমাণ। ততশ্চ দক্ষিণাংগুষ্ঠে নিরুধ্য পিঙ্গলাং সুধীঃ। ঈড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং যথা শক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ। ততস্ত্যক্ত্বা পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ। ১। পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য্য যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ। ঈড়য়া রেচয়েদ্বায়ুং ন বেগেন শনৈঃ শনৈঃ। ২। ইদং যোগবিধানেন কুর্য্যাদ্বিংশতি কুম্ভকান্। সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তঃ প্রত্যহং বিগতালসঃ। প্রাতঃকালেচ মধ্যাহ্নে সূর্য্যাস্তে চার্দ্ধরাত্রকে। কুর্য্যাদেবং চতুর্ব্বারং কালেষ্বেতেষু কুম্ভকান্। ইদং মাসত্রয়ং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে। ততো নাড়ী বিশুদ্ধিঃ স্যাদবিলম্বেন নিশ্চিতম্।

প্রাচীন আর্য্যেরা তন্ত্র, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা শাস্ত্র দ্বারা ঐহিক পারত্রিকের যেরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপি সুখসম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন তদ্রূপ সুখ সম্ভোগ করা অন্য কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছিল দৃষ্ট হয় না ও শোনা যায় না। যে সময় ঐ শাস্ত্রত্রয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসুসম্পন্ন ছিল তৎকালে পৃথিবী মধ্যে ভারতীয় আর্য্য জাতিকে ভয় ও মান্য ও প্রণয় না করিয়াছেন এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। এতৎ সম্বন্ধে তিনটি উদাহরণ না লিখিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের আমলে জেলা বাখরগঞ্জ অঞ্চলের সুন্দর বন হইতে যে এক মহাপুরুষকে ভূকৈলাসে আনয়ন করা হয়, সেই মহাপুরুষ পবনাভ্যাস যোগ প্রভাবে সমাধিযোগ সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই যোগ ভঙ্গ করিবার জন্য কলিকাতাস্থ বড় বড় ডাক্তার সাহেবেরা এবং হাকিমেরা কত প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাহাতেও তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে তাঁহার যোগ ভঙ্গ হইয়া অল্পকাল মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি এইমাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমি অমুক দিবস কলেবর পরিত্যাগ করিব। আমার দেহ কেহ মৃত্তিকাসাৎ বা দগ্ধ না করে। তাহা যেন গঙ্গা জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। ঐ যোগীবরের বাহ্য আড়ম্বর বা বাহ্য ক্ষমতা কিছুই প্রকাশ পায় নাই। কেবল মৃন্নির্ম্মিত জীবিত পুত্তলিকার ন্যায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন এইমাত্র দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি যে কতকালের লোক, বাহ্য লক্ষণে কিছুই প্রকাশ পাইত না। বোধ হইত যেন ৪০। ৪৫ বৎসর তাঁহার বয়ঃক্রম ছিল। তখন তাঁহাকে যে যে ব্যক্তি দেখিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই আশ্চর্য্যজ্ঞানে হিন্দু যোগশাস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। এরূপ ঘটনা কেহ কখন দেখেন নাই বা শুনেন নাই। ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত রাজা রামমোহন

রায় একখানি প্যামফ্লেটে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ঐ সময়ে লাহোরের মহারাজা রণজিৎ সিংহের জীবিতকালে হরিদাস বাবাজী নামে অপর একজন যোগীবর ছিলেন। তিনি কেবল পবনাভ্যাসেই পরিপক্ক ছিলেন, সমাধিযোগ সাধনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার ক্রিয়া দ্বারা এরূপ বোধ হইয়াছিল। মহারাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর লর্ড বেণ্টিঙ্ককে হরিদাস বাবাজীর আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখাইবার জন্য তাঁহাকে এক সিন্দুকে বদ্ধ করিয়া ৬ মাস কাল মৃত্তিকার মধ্যে পুতিয়া রাখেন। যে জমীতে ঐ বাবাজীকে সিন্দুকে করিয়া পুতিয়া রাখেন, সেই জমীতে রীতিমত শস্য বপন করাইয়া সেই শস্য যথাকালে ঐ ভূমি হইতে উঠাইয়া লইবার সময় মহারাজা কলিকাতার বড় সাহেবকে মহাসমারোহের সহিত ঐ স্থানে লইয়া গিয়া হরিদাস বাবাজীকে ঐ ক্ষেত্রের মধ্য হইতে উঠাইয়া বাক্স খুলিয়া সকলকে দেখান, হরিদাস বাবাজী যেমন তেমনি রহিয়াছেন। লাট সাহেব ইহার আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন এরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার দেখা দূরে থাকুক আমরা কখনও কর্ণেও শুনি নাই। ধন্য হিন্দুদিগের যোগশাস্ত্র!

পূরক কুম্ভক রেচকে বায়ুধারণাদি-ক্রম। যোগী যখন প্রাণায়ামে বসিবেন তখন দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুল্যগ্র দ্বারা জলধারা দ্বারা আপনাকে বেষ্টন করিবে। ঐ জলধারাকে অগ্নিপ্রাকার চিন্তা করতঃ দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠের শেষ পর্ব্ব দ্বারা দক্ষিণ নাসারন্ধ্র অবরুদ্ধ করত বাহ্য বায়ুকে ১৬ ষোড়শবার ওঁকার জপ কাল তক শরীরে পূরণ করিয়া দক্ষিণহস্তের কণিষ্ট ও অনামিকা অঙ্গুলীর অগ্রপর্ব্ব দ্বারা বাম নাসাবিবর অবরোধ পূর্ব্বক ৬৪ চৌষট্টী বার ওঁকার জপ কাল তক ঐ শরীরস্থ বায়ুকে অবরোধ করিয়া ৩২ বার ওঁকার জপকালের মধ্যে দক্ষিণনাসাবিবর দ্বারা উক্ত শরীরস্থ বায়ুকে অল্পে অল্পে পরিত্যাগ করিবে। ইহার প্রমাণ সকল পরে বিবৃত হইবে।

পূর্ব্বাচার্য্যেরা সর্প ও ভেকজাতির কার্য্য দর্শন করিয়া প্রাণায়ামের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সর্প আর ভেকজাতির প্রাণনক্রিয়া অত্যল্প, এই নিমিত্ত তাহারা দীর্ঘজীবী। সর্প ও ভেককুল পবনাভ্যাস যোগ প্রভাবে মৃত্তিকা কি জলমধ্যে কেবল বায়ু আহার করিয়া চিরকাল থাকিতে পারে, তাহাতে তাহাদের কোন ক্লেশ হয় না। ভুজঙ্গ ভেক সকল পবনাভ্যাস যোগ সাধনা প্রকৃতিদেবীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা উহাদিগের জিহ্বা এপ্রকার সুকৌশলে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন যে, ঐ জিহ্বা উহারা অক্লেশে উল্টাইয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র-ক্ষরিত সুধাপান করত চিরদিন সুখে প্রাণধারণ করিতে পারে। সর্পপ্রিয় পার্ব্বতীপতি ভগবান্ মহাদেব সর্পজাতির পবনাভ্যাস প্রক্রিয়া দেখিয়া মানবজাতির সম্বন্ধেও

ঐপ্রকার পবনাভ্যাস যোগবিধান করিয়া দিয়াছেন। মানবজাতির জিহ্বার ও সর্প ভেকজাতির জিহ্বার আকার প্রকারে অনেক বৈষম্য। সর্প আর ভেকের দ্বিজিহ্বা। তাহারা উভয়ে নাসিকারন্ধ্রের মধ্যে দুই জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সুধা পান করত প্রাণ ধারণ করে। মনুষ্যের একজিহ্বা অথচ স্থূল ও প্রশস্ত। এই জিহ্বা প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা যোগিগণ দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম করিয়া আস্যমধ্যে উল্টাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশের যে ছিদ্র আছে (অর্থাৎ টাক্‌রা) তাহাতে প্রবেশ করাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সুধা পান করত জীবন ধারণ করেন। ইহাকে যোগীরা প্রাণায়ামের অন্তর্গত খেচরীযোগ বলেন। এরূপ অবস্থা যোগীদিগের হইলে, সমাধি তাঁহাদিগের করতলস্থ হইয়া থাকে। ইহা প্রাণায়ামের চরম সীমা। তন্ত্রশাস্ত্রে যত যোগের বিষয় বলা হইয়াছে, পবনাভ্যাস যোগ সমুদায় যোগের মূল। এ যোগ অভ্যাস না করিলে কোন যোগেই অধিকার জন্মিতে পারে না।

শ্রীরামকমল সার্ব্বভৌম।

আর্য্যজাতির আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক চিকিৎসা-প্রণালী।

ইংরেজদিগের ভারত অধিকার করণাবধি এ কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের চিকিৎসা-প্রণালী এইস্থানে ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। রাজ-প্রসাদ-পুষ্ট কলেবর এলোপাথি এখন সর্ব্বত্র আদরণীয়। বৎসর বৎসর কৃত-বিদ্য ছাত্রগণ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে এলোপাথি চিকিৎসা প্রচার করিতেছেন, কিন্তু ইহাদ্বারা চিকিৎসার উদ্দেশ্য যে পরিমাণে সাধিত হইতেছে তাহা এক বার বিশেষ রূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে এলোপাথির বাহ্য গৌরব অনেকাংশে লঘু বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বস্তুতঃ ডাক্তার মহাশয় দিগের অপরিণামদর্শিতাদোষে রোগ নিরাকরণ হওয়া দূরে থাকুক অধিক কাল তাঁহাদিগের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবন করিলে রোগীর শরীর একেবারে অপটু হইয়া পড়ে। যাঁহারা দেশ, কাল, রোগীর বল ও ধাতু বিবেচনা না করিয়া একমাত্র বিদেশীয় শিক্ষকের উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদিগের দ্বারা, নীরোগ হইবার প্রত্যাশা দূরে থাকুক প্রত্যুত অন্যান্য রোগের নিদান উদ্ভূত হয়। ইংলণ্ড, শীতপ্রধান দেশ; ইংরেজেরা বলবান্ পুরুষ, সুতরাং ইহাঁদের শরীরে বীর্য্যবান্ ঔষধ সকল যে পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে উপকার করে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আমাদিগের দুর্ব্বল শরীরে সেই পরিমাণে সেই সেই ঔষধ প্রয়োগ করিলে

যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে তাহার সন্দেহ কি? আমি যে এলোপাথি চিকিৎসাকে দূষিত বলিতেছি এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। এই প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে প্রস্তাবিত বিষয় সহজে সকলেরই উপলব্ধি হইবে।

চিকিৎসা-প্রণালীর এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া এতদ্দেশীয় কতিপয় সুশিক্ষিত ব্যক্তি, আর্য্যদিগের আয়ুর্ব্বেদ পুনর্জ্জীবিত করিতে যত্ন পাইতেছেন। মনুষ্য-শরীরের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল ও ঔষধের বলাবল যে প্রাচীন হিন্দুরা সবিশেষ অবগত ছিলেন ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের প্রযত্নে সুশ্রুত, চক্রদত্ত ইত্যাদি বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইতেছে। আবার আর একদল ইংরাজি বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন বঙ্গীয় যুবক হানিমানের আবিষ্কৃত নূতন মতের পন্থাবলম্বন পূর্ব্বক ঐ প্রণালীর চিকিৎসা প্রচার ও প্রবল করিতে অত্যন্ত প্রয়াস পাইতেছেন।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা-প্রণালীর সহিত হোমিয়পাথির বিভেদ কি, উভয়েতে কিরূপ সাদৃশ্য আছে এবং এলোপাথির সহিতইবা এই উভয়ের কিরূপ সম্বন্ধ, এই সমুদায় বিচার করা, এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এলোপাথি ও আর্য্য-জাতির চিকিৎসা-প্রণালীতে রোগ নিরাময় করিবার জন্য যে যে বর্ত্ম নিয়ত অবলম্বিত হইয়া থাকে তন্মধ্যে কোন্টী শ্রেষ্ঠ সর্ব্বাগ্রে তদনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সকলেই অবগত আছেন যে কোন ঔষধ সেবন না করিয়া অনেক রোগী আপনা আপনি রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন; এইরূপে পীড়া আরোগ্যার্থে প্রকৃতি যে পথ অনুসরণ করে, চিকিৎসকদিগেরও সেই প্রশস্ত পথ অবলম্বন করা নিতান্ত শ্রেয়স্কর। সকল মতাবলম্বীরাই আপনাদিগকে স্বভাবের কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন; অতএব বিরুদ্ধভাবাপন্ন মত সকল পর্য্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি কি প্রণালী ক্রমে রোগীকে রোগ হইতে মুক্ত করে ইহা নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।

যেমন একটী বৃক্ষশাখা প্রবল বায়ু প্রভৃতির দ্বারা স্থানভ্রষ্ট না হইলে স্বস্থানেই থাকে সেই রূপ মানব-দেহের কোন কারণে বিকৃতি না ঘটিলে পরিপাক ও নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি যান্ত্রিক কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়। কিন্তু যদি সেই বৃক্ষশাখা বলে নত করিতে চেষ্টা পাওয়া যায় ও ঐ বল যদি উহার সাম্যভাবশক্তি অপেক্ষা অধিকতর হয়, তাহা হইলে উহা অবনত হইয়া পড়িবে; অধিক ক্ষণ নত থাকিলে সমতারক্ষণী ক্ষমতা, ক্রমে নষ্ট হইয়া পড়ে। তখন আকর্ষণবল দূরীভূত হইলেও শাখা নত অবস্থায় থাকিয়া যায়, কিন্তু যদি অল্পক্ষণ পরে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবশরীরের কার্য্যও ঠিক ঐরূপ। অত্যাচার করিলে ইহাতে রোগ জন্মে; কিন্তু যদি সময়ে সেই সমস্ত

রোগের মূল কারণ পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার শরীর স্বাস্থ্য লাভ করে। অধিকদিন পীড়ার কারণ উপস্থিত থাকিলে রোগ নিরাময় হওয়া সুকঠিন। বৃক্ষ-শাখাকে শীঘ্র ছাড়িয়া দিলে যেরূপে সমতারক্ষণী শক্তি দ্বারা বিপরীত দিকে চালিত হইয়া উহা স্বস্থান অধিকার করে, রোগ-নিদান দূরীভূত হইলে সেইরূপ প্রকৃতির বিরুদ্ধভাবাপন্ন শক্তি দ্বারায় পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে। সচরাচর অনেকেই দেখিয়াছেন যে একটী বৃক্ষ-শাখা, সবলে নত করিয়া ছাড়িয়া দিলে সে স্বস্থান অতিক্রম করিয়া প্রতিক্রিয়া-বলে বিপরীতদিকে কিঞ্চিৎ গমন করে; পরে কিয়ৎক্ষণ হেলিয়া দুলিয়া অবশেষে স্বস্থান প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা এরণ্ড তৈল, তেউড়িব মূল হরিতকী প্রভৃতি বিরেচক ঔষধনিচয় সর্ব্বদা ব্যবস্থা করেন তাঁহারা মানব দেহে উহার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া সতত নিরীক্ষণ করিয়াছেন। বাস্তবিক বিরেচক ঔষধ মাত্রই পরিণামে ধারক হইয়া উঠে। এই জন্য এলোপাথি ও প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ, এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে রোগের বিরুদ্ধভাবাপন্ন ঔষধ সকল যুক্তিপূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে উহা স্বভাবের প্রতিক্রিয়ার সহিত সম্মিলিত হইয়া রোগ দূরীভূত করে। কিন্তু এই উভয় চিকিৎসাপ্রণালীর মধ্যে কোন্ পথ অবলম্বন করিলে মানব-শরীর নিয়ত সুস্থ থাকে, তাহা দেখিতে গেলে এলোপাথীর সহিত ঔষধের মাত্রা লইয়া আমাদের ঘোর বিবাদ হয়; সুতরাং ক্রমান্বয়ে এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য অনুধাবন করা যাউক।

ঔষধের পরিমাণ।

ঔষধের পরিমাণ বিষয়ে চিকিৎসকদিগের বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য; কারণ পরিমাণ নিতান্ত অল্প হইলে ঔষধের দ্বারা প্রয়োজনানুরূপ ক্রিয়া শরীরে উত্তেজিত হইতে পারেনা। আবার পরিমাণ অধিক হইলে হিতে বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা। এই জন্য কোন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ঋষি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে "মাত্রয়া হীনয়া দ্রব্যং বিকারং ন নিবর্ত্তয়েৎ। দ্রব্যানাং তথা বাহুল্যাৎ ব্যাপৎ সঞ্জায়তে ধ্রুবং॥" ডাক্তার মহাশয়দিগের মাত্রাধিক্যদোষে একরোগ আরাম করিতে গিয়া অনেক সময় এইরূপে অন্য রোগের সঞ্চার হইতে দেখাগিয়া থাকে। রোগমাত্রেই, বিশেষতঃ পুরাতন রোগে, ঔষধ সকল অল্প মাত্রায় সেবন করাইয়া ক্রমে পীড়া নষ্ট করিবার চেষ্টাকরা কর্ত্তব্য। বানস্পত্য ও স্বল্প বীর্য্যের ঔষধ প্রয়োগ করাই প্রশস্ত, কেননা ইহাদের মাত্রা অল্প বৃদ্ধি হইলে বিপরীত পীড়া সহজে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু বিষ ও ধাতু ঘটিত ঔষধ সকল কিঞ্চিন্মাত্রাধিক্যে শরীরে বিশিষ্ট উৎপাত ঘটাইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে অধুনাতন ডাক্তার মহাশয়েরা আশু রোগ মুক্ত করিবার জন্য বিষ ও তেজস্বী ঔষধ ব্যতীত অন্য কিছু ব্যব-

হার করেন না; যাহাই হউক বিষ-চিকিৎসায় একেবারে অবহেলা করা যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে ইহা দ্বারা বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদে স্থানে স্থানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে ঔষধের মধ্যে যে সকল অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে আকাঙ্ক্ষানুরূপ ক্রিয়া উত্তেজিত করে সেই সমস্ত ঔষধই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; যথা "অল্পমাত্রোপ-যোগিত্বাদরুচেরপ্রসঙ্গতঃ। ক্ষিপ্রগা-রোগ্যদায়িত্বাৎ ভেষজেভ্যো রসোধিকঃ"। এই কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে-গেলে বিষকেই মহৌষধ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। বাস্তবিক সুবিজ্ঞ ভিষক্-কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইলে ইহা অমৃতের ন্যায় শরীরকে পোষণ করে। রোগীর বলা-বল, ধাতু ও পীড়ার যথার্থ ঔষধ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। মাত্রা স্থির করাও বড় সহজ নহে। এই জন্য বানস্পত্য ও স্বল্প বীর্য্যের ঔষধ ব্যবহার করিয়াই সামান্য চিকিৎসক দিগের সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য; সুশ্রুত ও চরকে রস-চিকি-ৎসা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। আয়ুর্ব্বেদে লৌহকে পুনঃ পুনঃ কষায় রসে (Tannic acid) ও গোমূত্রে অভিষিক্ত করতঃ সহস্র পুট দ্বারা বিশোধিত করিয়া ব্যবহার করিতে উপদেশ আছে।

ধাতু ঘটিত ঔষধ ও বিষসম্বন্ধে, প্রাচীন আর্য্যেরা লিখিয়াছেন যে বিশো-ধিত অবস্থায় উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ইহা দ্বারা রক্ত পরিষ্কৃত, শরীর সবল, বীর্য্য বৃদ্ধি ও সমস্ত ব্যাধির উপ-শম হয় এবং সেই ব্যধির আরোগ্য হইলে কোন পীড়া দায়ক কার্য্যে (অভিসা চার) শীঘ্র স্বাস্থ্যরক্ষিণী ক্ষমতা নষ্টহয় না। যেমন একটী লৌহ কিম্বা মৃণ্ময় পাত্রকে একক্রমে অত্যন্ত উত্তাপিত করিয়া যদি শীতল বারিতে নিক্ষেপ করা যায় তাহাহইলে উহা যেমন ভঙ্গ-প্রবণ ও অকর্ম্মণ্য হয় সেইরূপ মানব-শরীর একেবারে উত্তেজিত করিয়া সহসা প্রতি কূলাচরণ করিলে সেই শরীর একেবারে চিরকালের জন্য ব্যাধির আকর হইয়া থাকে। রস, রক্ত, মাংস, মেধ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতুর ক্ষমতা একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। একটী নূতন মৃণ্ময় পাত্রে, ক্রমে ক্রমে মন্দ ভাবে জ্বালদিলে যেমন সেই পাত্র না চটিয়া দৃঢ়রূপে বহুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, সেই রূপ মানব দেহে ব্যাধি আক্রমণ করিলে তাহার পীড়ার বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন অত্যল্প ঔষধেই ক্রমে ক্রমে সেই পীড়াকে দূরীভূত করিতে পারিলে শরীর বিলক্ষণ সচ্ছন্দ ও সবল হইতে পারে ও জীবনী শক্তিও রক্ষিত হয়। অধুনা আমাদের দেশে নবজ্বরে কুইনাইন প্রয়োগের আধিক্য হেতু বোধ হয় এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। নব জ্বরে কুইনাইনের ন্যায় দ্বিতীয় ঔ-ষধ যে আর নাই তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ডাক্তার মহাশয়েরা

সম্ভব রোগ দূরীকরণাভিলাষে যেরূপ ভয়ঙ্কর মাত্রায় ইহা প্রয়োগ করেন তাহা দেখিলে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; একাদশ বৎসরের বালককে প্রতি ঘণ্টায় বিরাম অবস্থায় ৯।১০ গ্রেণ কুইনাইন দিতে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। ঐ কুইনাইন যদি ক্রমে ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হয় তাহা হইলেও আর এতাদৃশ অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা থাকে না। আর্য্যেরা শুদ্ধ তিক্ত রসই নব জ্বরের এক মাত্র ঔষধ বলিয়া নির্দ্দিশ করিয়া গিয়াছেন। যথা "লঙ্ঘনং স্বেদনং কালো-যবাগুস্তিক্তকো রসঃ। পাচনান্যবিপক্কানং দোষাণাং তরুণজ্বরে"। *

* এক্ষণে সিঙ্কোনা বার্কের গুণাবলোকন করিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে আর্য্যদিগের দ্রব্য-গুণ-তত্ত্বে যে মহানিম্ব (মহানিম্বঃ পরগ্রাহী, কষায়ো রুক্ষ এবচ; কপ-পিত্ত জ্বর-সর্দ্দি-ব্রণ-হিল্লাস-নাশকঃ) উল্লিখিত আছে তাহাই সিন্‌কোনা বার্ক। বাস্তবিক পক্ষে বিবেচনা করিতে গেলে মহানিম্ব যদিও সিন্‌কোনা বার্ক না হয় কিন্তু উহা যে সিন্‌কোনা বার্ক-সদৃশ-গুণশালী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আধুনিক পদার্থতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কর্ণিস সাহেব নিম্বের-প্রতি পক্ষপাতী হইয়া বার্কের সহিত উহার জ্বরঘ্ন গুণের পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন যে "আমি ৬০ জন রোগীকে সিন্‌কোনা প্রয়োগ করায় ছয় দিবসের মধ্যে ৫৬ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও ১৩৪ জনকে নিম্বের বল্‌কল প্রয়োগ করায় ৬ দিবসের মধ্যে ১০৮ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে"। যদি সামান্য নিম্বের এতাদৃশ গুণ থাকে তাহা হইলে মহানিম্বের যে সিন্‌কোনা সদৃশ জ্বরঘ্ন ক্ষমতা ছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে যখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এলোপাথিক ও হোমিওপেথিক ডাক্তার এবং প্রাচীন চিকিৎসক সকলেই জ্বরে কুইনাইন বা বার্ক সদৃশ ঔষধের প্রতি অনুরক্ত, তখন উহার মাত্রা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে কখনই অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা নাই।

ইহ সংসারের যাবতীয় বস্তুই এক সাধারণ নিয়মের অধীন। যেমন স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সহযোগ দ্বারা পশু পক্ষ্যাদি প্রাণিগণের সন্তান উৎপন্ন হয়, বৃক্ষাদির ফলোৎপত্তির নিয়মও তদনুরূপ। একটী পুষ্পের মধ্যে স্ত্রীস্বরূপ গর্ভ-কেশরে পুরুষের শুক্রবৎ পরাগ কেশরস্থ রেণুসমূহ পতিত হইয়া ফলোৎপাদন করে। এবং বহির্জ্জগতে সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে দ্রব্য শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা অচিরে বিনষ্ট হইয়া থাকে। কদলীবৃক্ষ এক বৎসরান্তেই আশ্চার্য্য রূপে বৃদ্ধি পাইয়া সত্বরই ধ্বংস প্রায় হয়। গাভীরা তিন চারি বৎসরের মধ্যেই পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া নিয়মানুযায়ী সন্তান প্রসব করত শীঘ্র মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। কিন্তু মনুষ্য ক্রমে ক্রমে, বর্দ্ধিত হইয়া এক শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

সেইরূপ আভ্যন্তরিক ক্রিয়াকে যত শীঘ্র উত্তেজিত ও বলবতী করিতে চেষ্টা করা যাইবে উহা শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। এই জন্যই প্রাচীন ঋষিরা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন যে ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল শারীরিক ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। মদ্য পান করিলে তাহারা ক্ষণকালের জন্য অনৈসর্গিক রূপে উত্তেজিত হয়; কিন্তু তাহাদিগের উত্তেজনা শক্তি অবিলম্বেই তিরোহিত হইয়া আবার স্বভাবের ক্রিয়ানুসারে মদ্যপান দ্বারা শরীর যত দূর পর্য্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিল পুনর্ব্বার সেই পরিমাণে অবসন্নতা প্রাপ্ত হয়; আবার স্বভাবতঃ ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করে। কিন্তু সুরাপান করিবার অগ্রে শরীরে যে রূপ যান্ত্রিক কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক ন্যূনতা প্রাপ্তি হয়।

সেইরূপ মাত্রাধিক ঔষধ প্রয়োগ করিলে শরীরের পোষণ ক্রিয়া দূরে থাকুক বরং তদ্দ্বারা অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। আবার সবল শরীর অপেক্ষা দুর্ব্বল শরীরে ঔষধের ক্রিয়া, অত্যল্পতেই প্রকাশ পায়; বিশেষতঃ যাহাদের স্নায়ু দুর্ব্বল তাহাদের শরীরে স্নায়ু-উত্তেজক ঔষধ এত অল্প মাত্রায় কার্য্য-কারক হয় যে তাহাদিগকে চিকিৎসা করা অতীব দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। একালে অধিক মাত্রায় ঔষধ সেবিত হইলে যে ফল দৃষ্ট হয় সেই ঔষধ অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলে সেই রূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। আর্শনিক, ষ্ট্রিকনিয়া ইত্যাদি বীর্য্যবান ঔষধ যদি অল্প মাত্রায় একাদিক্রমে এক সপ্তাহের অধিক কাল ব্যবহার করা যায় তাহার বিষের চিহ্ন ক্রমেই আবির্ভূত হইতে থাকে। এই সময়ে ঔষধ বন্ধ না রাখিলে প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। তবেই দেখা যাইতেছে যে বীর্য্যবান্ ঔষধ অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে যেরূপ কার্য্য করে উহা অল্প মাত্রায় ক্রমে ক্রমে প্রদান করিলেও সেইরূপ ফলই প্রসব করিয়া থাকে। কিন্তু সহসা একটী বলবতী ক্রিয়া শরীরমধ্যে উৎপাদন করিলে তাহাতে শরীর বিনষ্ট হয়।

অল্পমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহার ক্রিয়া ধীরে ধীরে আবির্ভূত হইয়া অধিক সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। যে পর্য্যন্ত সেই মাত্রার ক্রিয়ার হ্রাস না হইতে থাকিবে তাবৎ আর ঔষধ দেওয়া সুবিহিত নহে। এই জন্য প্রাচীন বৈদ্যেরা অধিক সময়েই (বিশেষতঃ পুরাতন রোগে) দিবসে দুইবার ঔষধ ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন; তবে যেখানে শীঘ্র প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা, সে স্থানে অধিক মাত্রায় পুনঃ পুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পুরাতন ভারতের চিকিৎসা-প্রণালীর সাধারণ তত্ত্বই একটী—এইস্থানে সন্নিবেশিত হইল।* অধিক লেখা আমাদের অভিপ্রেত নহে। যাঁহারা এ বিষয় সম্যক্ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা শুশ্রুত পাঠ করুন। এই পুস্তক সাধারণের জন্য

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইতেছে। যদি অস্মদ্দেশীয় ভদ্রসন্তানগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া এক প্রকারে ঐ গ্রন্থখানি সমগ্র পাঠ করেন তাহা হইলে নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন যে শ্বেতপুরুষদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের বুদ্ধিশক্তি ও চিন্তা-শক্তি কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। তাঁহা-দিগের প্রকটিত পুস্তক পাঠ করিলে, তাঁহা-দিগের প্রখর তর্ক শ্রবণ করিলে, ও গভীর অনুসন্ধান নিরীক্ষণ করিলে অসা-মান্য বিজ্ঞান সম্পন্ন আর্য্যদিগকে দে-বতা-নির্ব্বিশেষে পূজা করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? তাঁহাদিগের গভীর উপদেশ-নিচয় অশ্বিনীকুমার কিম্বা ধন্বন্তরির উপদেশের ন্যায় অলঙ্ঘনীয় বোধ হয়। যখন সমস্ত পৃথিবী অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সে সময়েও অন্যদেশীয় পণ্ডিতগণ জ্ঞান-জ্যোতিতে ভারতকে আলো-কিত করিয়াছিলেন। যখন চরক ও শুশ্রুত প্রভৃতি শাস্ত্রে ঔষধ সকল আবি-ষ্কার করিয়া পরমপূজ্য আর্য্য-চিকিৎসক-গণ, আর্য্যাবর্ত্ত হইতে রোগনিচয় দূরীকৃত করিয়াছিলেন, তখন পাশ্চাত্য বৈদ্য-শিরোমণি হিপক্রিটিসের জন্ম পর্য্যন্তও হয় নাই। যদি শরীরকে নীরোগ করাই চিকিৎসা-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হয়, তবে ইহা গর্ব্ব করিয়া বলা যাইতে পারে যে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ যতদূর উৎ-কর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অদ্যাপি কেহই কি যন্মাত্রও উন্নতি করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে প্রা-চীন আর্য্যেরা ঔষধপ্রয়োগে উৎকৃষ্ট বটেন কিন্তু তাঁহাদিগের অস্ত্র-চিকিৎসার বিশেষ নিপুণতা ছিলনা। দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে ও ব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় পুরাতন হিন্দুদিগের অপেক্ষা নব্য পাশ্চাত্য ডাক্তারদিগের দক্ষতা আমি অস্বীকার করিনা, কিন্তু যাঁহারা আর্য্য ভীষক্‌দিগকে ছেদন-কার্য্যে অনিপুণ বলেন তাঁহারা বোধ হয় শুশ্রুত গ্রন্থ সম্যক্ পর্য্যালোচনা করেন নাই। যাঁহারা একস্থানের মাংস অন্য স্থানে সংযোজনা করিতে পারিতেন, যাঁহারা ভগ্নঅস্থি বিবিধ কৌশলে প্রকৃতিস্থ করি-তেন, ও যাঁহারা ছেদন ব্যাপার সম্পাদন জন্য বিবিধ প্রকারের অসংখ্য ছুরিকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শস্ত্র-চিকিৎসায় অপারদর্শী মনে করা কতদূর সঙ্গত তাহা বলিতে পারা যায় না। বহু-কালাবধি অস্মদ্দেশে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের আলোচনার অভাব হইয়া আসিতেছে; রাজপ্রসাদ অভাবে কবিরাজ মহাশয়েরা মৃতশরীর ছেদন পূর্ব্বক ব্যবচ্ছেদ কার্য্য শিক্ষা করেননা, তথাপি আজিও এক এক জন ডোম ডাক্তার চক্ষুর ছানি তুলিতে ও অন্যবিধ দেশীয় চাক্ষুষ অস্ত্রক্রিয়ায় এরূপ নিপুণতা প্রকাশ করিয়া থাকেন যে শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

মুনিগণ আমাদিগের দেশীয় ঔষধ সকল যত দূর সম্ভব পরীক্ষা করিয়াছি-লেন। আমাদিগের শরীর ও ধাতুর

বিষয়, তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া কেবল ভিন্ন জাতীয় দূরদেশবাসীদিগের দ্বারাই চিকিৎসিত হওয়া সদ্বিবেচনার কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণকার বাঙ্গালি আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনেরা যদি পুরাতন বৈদ্যদিগের গ্রন্থ অবলোকন পূর্ব্বক উভয় মত পরীক্ষা করতঃ দেশ কাল ও রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন তাহা হইলে ভারতবাসীদিগের যন্ত্রণার লাঘব হইবার সম্ভাবনা। এবং অনর্থক তাঁহাদিগকে ব্যয়ভারেও কাতর হইতে হয় না।

—oo—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অয়ুর্ব্বেদে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিবার উপদেশ আছে তাহা এক প্রকার ব্যাখ্যা করা হইল। এইক্ষণ হোমিয়পাথি নামক নবোদ্ভাবিত চিকিৎসা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে এলোপাথি চিকিৎসা বিশেষ ফল-প্রদ নহে। হানিমন নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার এইমতে চিকিৎসা করিতেন, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ইহাতে বিশেষ উপকার না দেখিতে পাইয়া এলোপাথির উপর তাঁহার ঘোর বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইল।

তিনি এইরূপে সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে একদা সুস্থ শরীরে কুইনাইন সেবন করিয়া জ্বরাক্রান্ত হইলেন। তদবধি তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মিল যে কুইনাইন অত্যন্ত সেবনে জ্বর হয় বলিয়াই ইহা দ্বারা জ্বর আরোগ্যও হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহ রূপ স্থির করিবার জন্য অন্যান্য কএক ব্যক্তিকে সিঙ্কোনাসার সেবন করিতে দিলে, তদ্ভক্ষণে তাঁহাদিগের শরীরেও জ্বর উপস্থিত হইল। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি মনে করিলেন সুস্থ শরীরে যে ঔষধ অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করিলে শরীরে যেরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, যদি স্বাভাবিক পীড়ার সেই সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে ঐ ঔষধ সেবনে পীড়া উপশান্ত হইবে। বহুকালাবধি বিপরীত দ্বারা তদ্বিপরীতের উপশমন, (কণ্ট্রেরিয়া কণ্ট্রিরিবস্ কিউরেণ্টর) এই বিধি চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু হানিমনউদ্ভাবিত নূতন মতে অনুরূপ দ্বারা অনুরূপের উপশমন (সিমিলিয়া সিমিলিবিস্ ফিউরেণ্টর) প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। সুস্থশরীরে বিষমাক্ষ বিষ (Nux Vomica) অধিকমাত্রায় সেবন করিলে পক্ষাঘাত রোগ উৎপন্ন হয়, অতএব পক্ষাঘাত রোগে উহা মহৌষধি। এইমতে লঙ্কামরিচে পিত্তনাশ; কুবর্বে অতিসার দমন, ও অহিফেনে উৎকট ঊর্দ্ধ রোগ নষ্ট হয়। হানিমন সিঙ্কোনা ব্যতীত আরও কতক গুলি ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত আরও বদ্ধমূল হইল।

এই নূতন মতে ঔষধি শরীরাভ্যন্তরে কিরূপ কার্য্য করিয়া রোগ দূরীকরণে সমর্থ, তাহা আমরা হানিমন-প্রকাশিত কোন গ্রন্থে দৃষ্টি করি নাই, কিন্তু সচরাচর এইমতাবলম্বীরা নিম্ন-লিখিত রূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ; "ঔষধের পরীক্ষা দ্বারা প্রকাশ হয় যে প্রত্যেক ঔষধেই এক একটী স্বভাবসিদ্ধ পীড়া আনীত হয়। যদ্যপি এই ঔষধ জনিত পীড়া স্বাভাবিক পীড়ার সদৃশ হয়, তাহা হইলে ইহাও শরীরের অন্তর্গত সমভাব কার্য্যের জন্য উৎপন্ন হইবে। যদি স্বাভাবিক পীড়ার উপরে আমরা সমান-লক্ষণ-বিশিষ্ট একটী ঔষধ জনিত পীড়া উত্তেজিত করিতে পারি, তাহা হইলে স্বাভাবিক পীড়ার সমস্ত অংশই বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই, যে হেতু উভয় বিকৃতি কার্য্যই সমভাবাপন্ন। সুতরাং এই ঔষধ জনিত পীড়ার সংযোগ হওয়াতে ঔষধের স্বভাবসিদ্ধ নূতন প্রতিক্রিয়া উদ্যম, শরীরের প্রতিক্রিয়া উদ্যমের সহিত সংমিলিত হইবে,— যে হেতু উভয়ই সমভাবাপন্ন। বহুদর্শিতা দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে ঔষধ-জনিত পীড়া অল্পমাত্রা ঔষধ সেবনে উত্তেজিত হইলে সহজেই শরীর দ্বারা পরাভূত হয় ; এবং শরীরের যে অবস্থাতে এই আরোগ্য সমাধা হয় সেই অবস্থা আরোগ্যের পরেও কিছুক্ষণ অবস্থিতি করে। এই অবস্থা শরীরের প্রতিক্রিয়া অবস্থা, এবং ঔষধ-জনিত পীড়ার আরোগ্যের জন্য স্বাভাবিক আরোগ্য উদ্যমের অবশিষ্টাংশমাত্র। স্বাভাবিক ও ঔষধ-জনিত পীড়ার পরস্পর যোগ হইলে ঔষধ-জনিত পীড়ার প্রতিক্রিয়া-উদ্যমের এই অবশিষ্টাংশ, স্বাভাবিক-পীড়া-জনিত অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াতে সংযোজিত হয়, যে হেতু উভয়-পীড়া-জনিত প্রতিক্রিয়া শরীরের একস্থানে উত্তেজিত হয়। স্বাভাবিক এবং ঔষধ-জনিত পীড়া ভিন্ন-স্বভাব সম্পন্ন হইলে ইহা সম্ভব নহে। এক্ষণে সকলেরই প্রতীতি হইবে যে ঔষধের পরবর্ত্তী কার্য্য দ্বারাই আরোগ্য সাধন হয়, যে হেতু আমরা যে দৈহিক প্রতিক্রিয়া-উদ্যম উত্তেজিত করিব তাহা এই পরবর্ত্তী কার্য্য দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। যতক্ষণ প্রতি-ক্রিয়াশক্তি ক্ষীণতা জন্য পীড়া দূর করিতে অক্ষম, ততক্ষণ ইহা শরীরে অবস্থিতি করিতে পারে, প্রতিক্রিয়া শক্তি বলবতী হইলেই তৎক্ষণাৎ পীড়া বিলুপ্ত হইবে। এই বল আমরা সমকার্য্য-বিশিষ্ট ঔষধ দ্বারা সাধন করিতে পারি বলিয়া "বিষস্য বিষমৌষধং" ব্যবস্থানুসারে সমকার্য্য-বিশিষ্ট ঔষধ আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারিলেই কৃচ্ছ্র-সাধ্য পীড়ার প্রাদুর্ভাব-ভয় ও পীড়ার সম্ভাবনা দূর হইতেছে।" (১)

(১) ইহা বিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু বিহারী লাল ভাদুড়ী কর্ত্তৃক কৃত "চিকিৎসা বিজ্ঞান" হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে প্রতিক্রিয়া দ্বারা যদি হোমিওপাথি ঔষধে রোগের বিনাশ হয় তাহা হইলে এলোপাথি ও আয়ুর্ব্বেদের মূলে কুঠার পতিত হইল। ধন্বন্তরির কাল হইতে প্রাচীন চিকিৎসকদিগের পরিশ্রম মাত্র শেষ। সুশ্রুত ও চরক আপন আপন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া কেবল রোগের বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের দ্বারা মানব জাতির কিছুমাত্র উপকার হয় নাই। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ মত ও হোমিওপাথি চিকিৎসার এই ব্যাখ্যা সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, যদি নবাগত চিকিৎসাপ্রণালীতে প্রতিক্রিয়া দ্বারা রোগ নিরাময় হয় তাহা হইলে এলোপাথিতে অবশ্যই উহার বৃদ্ধি হইবে; কিন্তু যখন আমরা ঐ ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি না তখন এই ব্যাখ্যাতে আমরা সহসা অনুমোদন করিতে পারিনা। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতদিগের ন্যায় ইহাঁরাও আমাদিগকে স্বভাবের কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সকলেই দেখিয়াছেন যে এরণ্ড-তৈল সেবন করিলে বিরেচন-ক্রিয়ার পর ধারকতারূপ প্রতিক্রিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। সমস্ত ঔষধ দ্বারাই মানবশরীরে পর্য্যায়ক্রমে এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার উদয় হইয়া থাকে। ইঁহাদিগের মতে প্রকৃতি, অবিকল এইরূপ প্রতিক্রিয়ার বলেই রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। নবাগত প্রণালীতে নিতান্ত অল্পমাত্রায় ঔষধ প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনাতেই রোগ আরোগ্য হয়। উল্লিখিত হোমিওপাথি ব্যাখ্যাতে প্রতিক্রিয়া যেরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে, বোধ হয় ভাদুড়ি মহাশয় রোগের বিপরীত রোগ বুঝাইবার জন্য এই শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছেন; যথা বিরেচক ঔষধির প্রতিক্রিয়া ধারক হওয়া, কিন্তু প্রকৃতি এইরূপ প্রতিক্রিয়া দ্বারা রোগ হইতে অব্যাহতি পান কি না তৎপক্ষে বিশেষ সন্দেহ আছে। বাস্তবিক সবল শরীরে এরণ্ড তৈল দ্বারা বিরেচনের পর যে পরিমাণে ধারকতারূপ প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় তদপেক্ষা দুর্ব্বল শরীরে সেইরূপ প্রতিক্রিয়া অধিক পরিমাণে অধিকক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষণী ক্ষমতা ও এই প্রতিক্রিয়া সম্যক্ বিভিন্ন। একটী বৃক্ষশাখাকে নত করিয়া ছাড়িয়া দিলে যে ক্ষমতা দ্বারা সে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাকেই স্বাস্থ্যরক্ষণী শক্তি বলা যাইতে পারে। স্বস্থানে দৃঢ়রূপে অবস্থিত হইবার পূর্ব্বে উহা কথঞ্চিৎ স্বকীয় স্থান অতিক্রম করিয়াও যে দিকে নত হইয়াছিল তাহার বিপরীত দিকে গমন করে। স্বস্থান অতিক্রম করত বিপরীত মুখে গমন করাইবার শক্তিকে ভাদুড়ি মহাশয় বোধ হয় প্রতিক্রিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যদিও স্বাস্থ্যরক্ষণী শক্তি ক্রিয়ার বিপরীত বলিয়া উহাকেও ন্যায়-সঙ্গত

প্রতিক্রিয়া আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে; তথাপি রোগের বিপরীত রোগের সহিত স্বাস্থ্যরক্ষণী ক্ষমতার বিভেদ করিবার জন্য একটীকে স্বাস্থ্য-রক্ষণী শক্তি ও অপরটীকে প্রতিক্রিয়া বলা বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীরে যখন রুগ্ন ও দুর্ব্বল শরীর অপেক্ষা প্রতিক্রিয়া অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয় তখন এই প্রতি-ক্রিয়াকে স্বাস্থ্য প্রত্যাবর্ত্তনের মূল উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা কত দূর যুক্তিসিদ্ধ তাহা আমরা স্বল্প বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। আবার ক্রিয়া শরীরে অধিক পরিমাণে উত্তেজিত না হইলে প্রতি-ক্রিয়ার কার্য্য দৃষ্ট হয় না; তবে অনুমাত্র ঔষধ প্রয়োগে যে ক্রিয়া অদৃশ্য থাকিয়া প্রতিক্রিয়া শরীরে সঙ্ঘটিত হয় তাহা-ইবা কিরূপে প্রমাণীকৃত হইল? বোধ হয় হোমিওপাথি চিকিৎসকেরা বলি-বেন যে ইহার উত্তর সহজ। অধিক পরিমাণে ঔষধ সেবন করিলে অধিক প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয়, ঔষধের অনুমাত্র সেবনে অনুমাত্র প্রতিক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। ক্রিয়া অত্যল্প হওয়ায় উহা সম্যক্ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার ভাগ উপর্য্যু-পরি বর্দ্ধিত হওয়ায় উহা দৃষ্ট হয়।

কতকগুলি বস্তু সমবেত হইয়া যখন কোন ক্রিয়া সাধন করে, তখন প্রত্যেক বস্তুই ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু উহারা সমবেত হইয়া কোন কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়াই উহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই একাকী সেই কর্ম্মের কিয়দংশ করিতে সমর্থ; এই রূপ বাক্য নিতান্ত অসঙ্গত, শত জন লোক একত্রে ৮০ মন পরিমিত এক প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড শত হাত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহাদিগের মধ্যে এ-কাকী কেহ অন্যের সাহায্য উপেক্ষা করিয়া ঐ প্রস্তরখণ্ড এক হস্তে উত্তোলন করিতে সমর্থ কি না? কখনই সম্ভাবিত নহে। দূর হইতে একটী বন অবলোকন করিলে শ্যামবর্ণ পত্রসমূহ দৃষ্ট হয়; কিন্তু উহাদের মধ্যে প্রত্যেকটী অদ্র ষ্টব্য। সমস্ত পত্র একত্রে আমাদের দর্শন ব্যাপার ঘটাইতেছে; কিন্তু ইহার কোনটীই স্বয়ং ঐ ব্যাপারের কিয়দংশও সম্পন্ন করিতে অসমর্থ। বস্তুতঃ অধিক পরিমাণে ঔষধ সেবনে শরীরে প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয় বলিয়া ঐ ঔষধ অনুমাত্রায় সেবন করিলে কথ-ঞ্চিৎ প্রতিক্রিয়া উদ্দীপ্ত হইবে—এই-রূপ অনুমান করা যায় না। একটী কারণ কোন কার্য্য উৎপন্ন করিয়াছে বলিয়া, উহার অর্দ্ধ পরিমিত কারণে ঐ কার্য্যের অর্দ্ধেক সংসাধিত হইবে ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে; ইংরাজ জাতি ইহাকে Fallacy of Division বলেন।

ক্রিয়ার অপেক্ষা প্রতিক্রিয়া সাধারণত পরিমাণে অল্প ও স্বল্পক্ষণস্থায়ী। পটলের মূলে যেরূপ ভয়ানক বিরেচন ক্রিয়া উপ-স্থিত হয়, তাহার সহিত উহার প্রতিক্রিয়ার তুলনা করিলে ঐ প্রতিক্রিয়াকে নিতান্ত

অল্পক্ষণস্থায়ী ও মৃদু বলিয়া বোধ হইবে। যাহা বলা হইল—তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ভাদুড়ি মহাশয়ের তর্কের মূল চ্ছেদিত হইল। স্বাস্থ্যরক্ষণী শক্তি অপেক্ষা ব্যাধির কারণ বলবান্ না হইলে শরীর পীড়িত হয় না। মনে কর স্বাস্থ্য সংবর্দ্ধনী ক্ষমতা ৫, ও রোগের বল ১০, হোমিওপাথিক নিয়মানুসারে রোগীকে ঔষধ সেবন করান হইলে তাহার শরীরে ঔষধ-জনিত পীড়া উত্তেজিত হইল। উহার বল ২, ও ঐ ঔষধ-পীড়ার প্রতিক্রিয়ার বল ১, সর্ব্বসমেত পীড়ার বল ১২ এবং স্বাস্থ্যরক্ষণী শক্তি ও ঔষধজনিত প্রতিক্রিয়ার বল একত্রে ৬। এই প্রতিক্রিয়া দ্বারা হ্রাস হইয়া পীড়ার বল ৬ রহিল; আর ঔষধক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া যদি উত্তেজিত না হইত তাহা হইলে কেবল স্বাস্থ্য-প্রবর্ত্তনী শক্তি দ্বারা হ্রাস হইয়া পীড়ার বল ৫ হইল অর্থাৎ পূর্ব্বে পীড়া যাহা ছিল অল্পমাত্রায় পীড়ার সমধর্ম্মী ঔষধ ব্যবহারে পীড়া তাহা অপেক্ষা অল্প বৃদ্ধি পাইল; এইরূপে ক্রমান্বয়ে ঔষধ সেবিত হইলে ব্যাধি আরোগ্য না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইবে। সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা অনুমিত হয়, যুক্তিতেও তাহাই হইল; অর্থাৎ রোগীর সমধর্ম্মী ঔষধে রোগ বৃদ্ধি পাইল। ভাদুড়ী মহাশয় হয়ত বলিবেন যে তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন ঔষধ-পীড়া নিতান্ত অল্প হওয়া প্রযুক্ত স্বভাবের বলে উহা স্বতঃই হ্রাস হয়। তাহা হইলে প্রতিক্রিয়া একের দ্বারা মূলরোগ নাশের সাহায্য হইতে পারে। স্বভাবের বল দ্বারা যদি ঔষধ-জনিত পীড়ার হ্রাস হয় তাহা হইলে, স্বাস্থ্য-প্রবর্ত্তনী শক্তি কমিয়া যাইবে। স্বভাবের বল ৫—ঔষধ-পীড়া ২=স্বভাবের বল ৩। ঐ ৩ প্রতিক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইলে ৪ হইল। মূল পীড়ার বল ১০, অতএব পীড়ার বলের আধিক্য ৬ রহিল, অর্থাৎ অগ্রে যেরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল এক্ষণেও তাহার অন্যথা হইল না।

ঔষধ-প্রতিক্রিয়া শরীরে উত্তেজিত করিয়া যে পীড়ার আরোগ্য হয় না তাহা আর একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই সম্যক্ প্রতীতি হইবেক। অধিক পরিমাণ কুইনাইন সেবনে যে জ্বর শরীরে প্রকাশিত হয়, প্রতিক্রিয়ামত সত্য হইলে ঐ কুইনাইন্ অনুমাত্রায় সেবনে জ্বরের আরোগ্য হইবে। কেননা উহাদ্বারা ঔষধ জনিত পীড়া ও তাহার প্রতিক্রিয়া উত্তেজিত হইলে ঐ ঔষধ-জনিত রোগ নিতান্ত অল্প হওয়ায় স্বভাবের বলে স্বতঃই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, এবং প্রতিক্রিয়ার বলে মূল রোগ কথঞ্চিৎ নিরাময় হইবে। এইরূপে বারম্বার অনুমাত্রায় কুইনাইন্ সেবন করায় রোগীর অবশেষে স্বাস্থ্য লাভ করিবার সম্ভাবনা; কিন্তু এইরূপ প্রতিক্রিয়ায় রোগ বৃদ্ধি পায় বলিয়া হোমিওপাথিক্ চিকিৎসকেরা কুইনাইন্ প্রয়োগ করা উচিত মনে করেন না। উহার বিপরীত-গুণ-

সম্পন্ন (Antidote) ঔষধ সেবন করাইয়া রোগ আরোগ্য করণের উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রতিক্রিয়ার দ্বারা রোগ যদি আরোগ্য হইত তাহা হইলে শীতল ক্রিয়ায় পিত্তবৃদ্ধি ও উষ্ণ ক্রিয়াদ্বারা শ্লেষ্মার সঞ্চার হওয়াই সম্ভাবনা। পিপ্পলী ও শুণ্ঠী প্রভৃতি কটু-রসাত্মক দ্রব্য কর্ত্তৃক কফের হানি না হইয়া বরঞ্চ বৃদ্ধি হইবে। আয়ুর্ব্বেদানুযায়িনী চিকিৎসায় রোগের বিপরীত-গুণ-সম্পন্ন ঔষধ প্রয়োগে পীড়ার উপশমের কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিত না; বস্তুতঃ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উভয়ই বিপরীত-ভাবাপন্ন বলিয়া ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দ্বারায় চিকিৎসার কিছু মাত্র একতা নাই। ইহার মধ্যে একটি প্রণালী সত্য হইলে, অন্যতম প্রণালী অবশ্যই মিথ্যা হইবে; সুতরাং যদি আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসায় কোন রোগ দূরীভূত হয় তাহা হইলে হোমিওপাথি মতে চিকিৎসিত হইলে উহা কখনই নিরাময় হইবে না।

তবে কি হোমিওপাথি মত কাল্পনিক? ইহা দ্বারা কি তবে কিছুমাত্র উপকার হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, যে—প্রতিক্রিয়া মত অসত্য হইলেও হোমিওপাথি চিকিৎসার প্রতি আমরা অবজ্ঞা করিতে পারি না। কারণ এই নবাগত মতে বিচক্ষণ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া অনেকে ভয়ঙ্কর রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতেছেন। বস্তুতঃ আমি স্বয়ং হোমিওপাথিক ঔষধ বহুবিধ রোগে পরীক্ষা করিয়াও আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। চিকিৎসক-দর্প-খর্ব্ব-কারী যমস্বরূপ বিসূচিকা রোগে যে ইহা দ্বারা অশেষ উপকার হইয়া থাকে তাহা এইক্ষণ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এইরূপ চিকিৎসায় যে সমুদায় ঔষধের কল্পনা দেখা যায়, হোমিওপাথিতে সেই সমস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা উহার প্রথম অবস্থায় কর্পূরারিষ্ট প্রভৃতি পাচক ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকি; নবাগত-মতাবলম্বীরাও সেই অবস্থায় স্পিরিট্ ক্যাম্ফার সেবন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহার পরক্রমে যখন প্রকৃত ওলাউঠার জীবন-সংঘাতক ভেদ-বমি হইতে সঙ্কোচ-অবস্থায় পরিণত হয়, তখন বৈদ্য-শাস্ত্রানুসারে সূচিকাভরণ, কস্তুরিভূষণ প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ নিচয় সেবন করাইতে বিধান আছে। হোমিওপাথিকেরাও ঐ অবস্থায় আর্সেনিক, কোব্রা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে হোমিওপাথিক ঔষধ সেবনে রোগ আরোগ্য হইতে আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় প্রথমে ইহা দ্বারা পীড়া বৃদ্ধি হইয়া পড়ে, আরোগ্য হইতে আমরা দেখিনাই। বস্তুতঃ ইহা দ্বারা রোগের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ক্রিয়ায় পীড়িত ব্যক্তির শরীরে উত্তেজিত হইয়া রোগ

নিরাময় হইয়া থাকে। যাঁহারা এবিষয়ে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন, হোমিও-পাথিক ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই মীমাংসিত হইতে পারিবে। ফলকথা এই সত্য বিষয়টী অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিক্রিয়া মত পাছে মিথ্যা প্রমাণ হয়, এই জন্যই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, হোমিওপাথিক ডাক্তারদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলেন যে ঔষধ অনুমাত্রা সেবনে রোগীর শরীরে কেবল প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাদ্বারা ক্রিয়া উত্তেজিত হয় না। ক্রিয়ার অভাবে কি-রূপে প্রতিক্রিয়া সম্ভব হয় তাহা সম্যক্ অনুধাবন করা আমাদের সংকীর্ণ বুদ্ধির গোচর নহে। অনুমাত্রা ঔষধ সেবনে ক্রিয়ার উৎপত্তি না হইয়াই প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয়, ইহা না বলিয়া—ক্রিয়া নিতান্ত অল্প হওয়ায় উহা দৃষ্ট হয় না; কিন্তু প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তিতে ক্রিয়ার পূর্ব্ব-স্থিতি অনুমান করিতে হইবে—প্রতি-ক্রিয়ার মতাবলম্বীরা যদি এইরূপ বলি-তেন, তাহাহইলে তাঁহাদিগের কথা বিশ্বাস-যোগ্য না হউক কথঞ্চিৎ বোধ-গম্য হইত। সত্যকে অসত্য করিয়া অসত্য সমর্থনের জন্য এত প্রয়াস পাই-বার প্রয়োজন কি? বস্তুতঃ হোমিয়পাথিক ঔষধ রোগের বিপরীত ক্রিয়া সংস্থাপন করিয়া পীড়া তিরোহিত করে। সচরা-চর লোকে এলোপাথী ও বৈদ্যক মতের যেরূপ বিরোধ ভাবেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম।

জটা-বল্কল-ধারী ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ চিন্তাশীল আর্য্যেরা কোন একটী নূতন বিষয় উদ্ভাবন করিবার জন্য এই সংসারের কোলাহল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবিড় অরণ্য মধ্যে পর্ব্বত-গুহায় আসীন হইয়া সুবিস্তীর্ণ সংসার সাগরের দুর্ভেদ্য ক্রিয়া-কলাপ নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যান কবিতে করিতে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হইতেন। ইহাঁরা চিন্তার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া নভোমণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্যমণ্ডল হইতে সেই জ্যোতি-র্ম্ময় পদার্থের সাহায্যে সমস্ত গ্রহনক্ষত্র ও কীটানু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত জীব সমূহের অস্তিত্ব স্পষ্টচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। পুরাকালের পরম পূজ্য আর্য্য মুনি-ঋষিগণ, চিন্তার প্রভাবে দুর্ভেদ্য অর্গলবদ্ধ নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন নির্জ্জন কুটীর মধ্য হইতে অভিপ্রেত পদার্থ নিচয় অন্বেষণ করিয়া আনিতেন। কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য, কি দর্শন, কি ধর্ম্মতত্ব, কি চিকিৎসা-বিজ্ঞান, এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে যে যে স্থান অত্যন্ত জটিল, যে যে দুর্ভেদ্য বিষয় লইয়া পাশ্চাত্য সভ্যেরা অদ্যাবধি বিবাদ করিতেছেন, পুরাকালের আর্য্যেরা তত্তদ্বিষয়েও চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। মুনিঋষিরা "হেতুব্যাধিবিপর্য্যস্তো বিপর্য্যস্তার্থকারীণাং। ঔষধান্ন বিহারাণাং উপযোগং সুখাবহং॥" চিকিৎসা তন্ত্রের এই মহাবাক্য স্থির করিয়া আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

তখন contraria contraris curanter ও similia similibus curanter এই মত সকলের সূত্রপাতও হয় নাই। সময়ে সময়ে যে ঔষধ সকল রোগের সমধর্ম্মী হইয়া রোগ নাশ করিতে সমর্থ হয়, তাহাও তাঁহাদিগের নিকট অজ্ঞাত ছিলনা। ফলতঃ জ্বরে পীড়িত ব্যক্তির উদর ভক্ষ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ। স্বাভাবিক বমনোদ্বেগ থাকিলে শাস্ত্রে মদন ফলের দ্বারা বান্ত কার্য্য সমাধা করিতে বিধান আছে, কিন্তু এস্থলে রোগী ঔষধের ক্রিয়া দ্বারাই আরাম প্রাপ্ত হয় প্রতিক্রিয়া দ্বারা নহে। জ্বর রোগে জঠরাগ্নি নির্ব্বাণপ্রায় হয়, তখন ভুক্তান্ন সম্যক্ পরিপাক না পাওয়ায় উদরের বৈরক্তি জন্মিয়া বমনোদ্বেগ হইতে থাকে সুতরাং ঐস্থলে বান্তকার্য্য সমাহিত হইলে অজীর্ণ-জনিত রোগের বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকেনা, এইস্থলে বমনোদ্বেগ প্রভৃতি লক্ষণ যে প্রকৃত পীড়া তাহাও নহে। অনেকেই জানেন যে স্ফোটক হইলে বসান অপেক্ষা পাকাইতে চেষ্টা করা উচিত, ফলত স্ফোটক ও অন্যান্যজাতীয় অনেক চর্ম্মরোগকে বাস্তবিক পীড়া রূপে গণ্য না করিয়া শরীরের অন্যবিধ পীড়া হইতে মুক্ত হইবার স্বাভাবিক উদ্যম বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। কারণ শরীরের রস ও রক্ত দূষিত হওয়ায় ঐ দুই পদার্থনিচয় স্ফোটকাদি রোগ-দ্বারা পূঁজরূপে নিস্থৃত হইতে থাকে, যদি চর্ম্মরোগ সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তাহা হইলে প্রলেপ অপেক্ষা রক্তশোধক ঔষধ ঐ ব্যাধিতে অনেক স্থলে প্রশস্ত। এইরূপে চিকিৎসিত হইলে আয়ুর্ব্বেদানুযায়ী রোগের বিপরীত ক্রিয়া উদ্দীপন দ্বারা রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। এবম্ভূত কারণ দৃষ্টে বোধ হয় চরক সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিরা রোগের লক্ষণকে রোগ বলিয়া গণ্য করেন না। যদিচ প্রকৃতপক্ষে বিবেচনা করিতে হইলে স্বাস্থ্যের বিপরীত ঘটনা ঘটিলেই সেই ঘটনাকে রোগ আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে, তথাচ যখন শারীরিক কোন এক বিশেষ যন্ত্রের কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিলেই অনেক অনিষ্ট লক্ষণ যুগপৎ প্রকাশ পায়, তখন প্রতি লক্ষণকেই রোগ না বলিয়া ঐ যান্ত্রিক বিকৃতিকেই রোগ বলিলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পক্ষে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

—oo—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বোধ হয় কেহ কেহ আপত্তি করিবেন যে, হোমিওপাথি চিকিৎসা অন্যান্য চিকিৎসার ন্যায় রোগের বিপরীত ক্রিয়া শরীরে উত্তেজিত করিয়া প্রধানত রোগ নাশ করিয়া থাকে—ইহা সত্য হইলেও হানিমান-উদ্ভাবিত চিকিৎসা-প্রণালী অসত্য বলিয়া প্রমাণ হইতেছে না। কারণ যে ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শরীরে অনিষ্ট লক্ষণ সকল প্রকাশ

পায় সেই ঔষধই অনুমাত্রা ব্যবহারে শরীরের বিশেষ উপকার হইতে পারে। যে বিষ অধিকমাত্রায় জীবননাশক, তাহাই আবার অনুমাত্রায় সেবন করিলে প্রাণবায়ুকে সবল করিয়া সর্ব্বব্যাধি নির্ম্মূল করে। মানব শরীরে এক পরিমাণ ঔষধ একরূপ ক্রিয়া উত্তেজিত করে, আবার পরিমাণভেদে ব্যবহৃত হইলে সেই ঔষধই ঠিক তাহার বিপরীত ক্রিয়া ঘটাইতে পারে। আমি এই যুক্তির প্রতিবাদ করিতে চাহি না। নূতন মতের চিকিৎসানুযায়ী ঔষধ রোগের বিপরীত-গুণসম্পন্ন হইয়াই রোগনাশে সমর্থ হয়—ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য। অধিক পরিমাণে ঔষধ মানবশরীরে রোগের সমধর্ম্মী হয় কি না তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের পরীক্ষাসাপেক্ষ রহিল। কিন্তু এই মত সত্য হইলেও যখন উহার অনুমাত্রা (যে মাত্রায় রোগের নাশ হইতেছে) শরীরে রোগের বিপরীত ক্রিয়া উৎপন্ন করিতেছে তখন প্রদত্ত ঔষধ যে রোগের বিপরীত-গুণ-সম্পন্ন হয় তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যে ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবনে যে যে অনিষ্ট লক্ষণ উৎপন্ন করে, তাহাই আবার অণু মাত্রায় ঐ ঐ অনিষ্ট-লক্ষণযুক্ত পীড়া দূর করণে সমর্থ। ইহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অকাট্য রূপে প্রমাণ করিলে ঔষধ বিজ্ঞানের আর একটী উপায় হইতে পারে; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ ও এলোপাথির মূল মতের কিছুই অনিষ্ট ঘটিবেনা। কারণ যে পরিমাণে ঔষধ রোগনাশক হইল তাহাই যখন রোগের বিপরীত ক্রিয়া উৎপন্ন করিল তখন সে ঔষধ রোগের সমধর্ম্মী হইয়া রোগ নাশ করিয়াছে এরূপ বাক্য কখনই সঙ্গত হইবেনা। বরং সে ঔষধ রোগের বিপরীত-গুণ-সম্পন্ন বলিয়াই রোগ নাশে সমর্থ হইয়াছে, এইরূপ বাক্য ন্যায়সিদ্ধ। বাস্তবিক পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ, এলোপথি ও হোমিওপাথি—ইহাদিগের মধ্যে মূলগত কোন প্রভেদ নাই। শাখা প্রশাখার কিছু কিছু বিভিন্নতা থাকিতে পারে। এই ত্রিবিধ চিকিৎসা প্রণালীর মধ্যে রোগ-বিশেষে ঔষধের সামঞ্জস্য দেখিলে এতদ্বিষয়ে আর কিছু সন্দেহ থাকিবে না। যে সেঁকো বিষ হোমিওপাথি মতে উদরাময় দোষ বিকার ও জ্বরের অমোঘ ঔষধ বলিয়া স্থাক হইয়াছে, তাহাই এলোপাথীক আয়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিতেরাও উক্ত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে পারদ ও গন্ধক হোমিওপাথি মতাবলম্বীরা চর্ম্ম রোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাই আবার অন্যতর দ্বিবিধ চিকিৎসাতেও অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া প্রদত্ত হয়। যে বিষ তিক্তক নবমতাবলম্বীরা পিত্তজ বিকারের অদ্বিতীয় ঔষধ বলিয়া প্রয়োগ করেন, তাহাই আবার বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীরা পিত্তের এক মাত্র ঔষধ বলিয়া থাকেন। হোমিওপাথিতে অমৃত-বিষ জ্বরের অমোঘ ঔষধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

আছে; বিরুদ্ধমতাবলম্বী আয়ুর্ব্বেদ-বিৎ পণ্ডিতদিগের মতে উক্ত ঔষধ ব্যতীত জ্বরের প্রদাহ-নিবারক ঔষধ আর নাই। যে সর্পবিষ হোমিওপাথিরা জীবনের চরমাবস্থার ব্যবস্থা দেন, উক্ত সময়ে হলাহল ব্যতীত বৈদ্যদিগের মতেও সদ্য-ফল প্রদ ঔষধ বলিয়া অন্য দৃষ্ট হয় না। আর যে সিঙ্কোনা বার্ক হইতে হোমীয়প্যাথির মূল সূত্র সঞ্চার হয়, যাহা এলোপাথিক ডাক্তারদিগের জ্বরের একমাত্র ঔষধ, তাহাই প্রাচীন হিন্দুদিগের (মহা-নিম্ব) আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে জ্বরের অমোঘ ঔষধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এইরূপ দেখান যাইতে পারে যে প্রায় সমস্ত বীর্য্য-শালী ঔষধই (যাহাদের কার্য্য প্রত্যক্ষ দেখা যায়) ত্রিবিধ চিকিৎসা প্রণালীতে প্রায় একরূপ মতেই ব্যবহার হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এইরূপ একতা থাকাতেই অনেক সময়ে উভয় দলের মতের অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও ঔষধ রীতিমত ব্যবস্থিত থাকাতে উভয় কর্ত্তৃকই রোগ-সমূহের আ-রোগ্য হইতে দেখা যায়। তবে এই ত্রিবিধ মতের মধ্যে কেবল ঔষধের মাত্রা ব্যতীত মূল বিষয়ের আর কিছুই অনৈক্য দেখা যাইতেছেনা। কিরূপ মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে পীড়া আরোগ্য হয় তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; এইক্ষণ এই ত্রি-বিধ চিকিৎসা প্রণালীর মধ্যে কিরূপ মাত্রায় ঔষধ প্রদত্ত হইলে মানব-শরীর নিয়ত সুস্থ থাকিতে পারে তাহার বিচার করা আবশ্যক। এলোপাথির মাত্রা মানব জাতির পক্ষে বিশেষতঃ বঙ্গবাসীদিগের পক্ষে বিষতুল্য পূর্ব্বে একরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এইক্ষণ আয়ুর্ব্বেদ ও হোমিও-পাথি এই উভয়ের পরিমাণের হিত-কারিতার বিষয়ে বিচার করিতে গেলে হোমিওপাথিরা যেরূপ পথ অবলম্বন ক-রিয়া আসিতেছেন তদপেক্ষা আরও কিছু নিম্নগামী হইলে আর উভয়ের সহিত আর কিছুই বিবাদ থাকিবে না। হানি-মান-কল্পিত ঔষধ প্রস্তুত-করণ-প্রণালীর সহিত এইক্ষণকার হোমিওপাথিকদিগের যেরূপ মতভেদ ঘটিয়া উঠিয়াছে, তাহা ক্রমে আলোচিত হইলে এবং আয়ুর্ব্বেদ-মতানুযায়ী ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালীর সহিত পরস্পর তুলনা করিলে—ঔষধের বীর্য্য হীন করিয়া অতি অল্প পরিমাণেই ব্যবহার করা উভয়েরই উদ্দেশ্য এবং ক্রমে নব-মতাবলম্বীরা আয়ুর্ব্বেদের পথানুযায়ী হইতেছেন—ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবেক।

হোমিওপাথি ঔষধ প্রস্তুত করণ প্রণালী।

যতদূর সম্ভব টাট্কা বস্তু লইয়া অতি উৎকৃষ্ট পরিষ্কৃত আসব দ্বারা তাহার সত্ত্ব বাহির করিয়া লইতে হইবে। ইহারই নাম মাদার টিন্চার। এই টিন্চারের এক বিন্দু, নিরেনব্বুই বিন্দু পরিষ্কৃত আসবে মিসাইয়া নাড়িলে প্রথম ডাইলিউসন প্রস্তুত হয়। এই প্রথম ডাইলিউসনের এক বিন্দু পুনর্ব্বার নিরেনব্বুই আসবে মিসাইলে দ্বিতীয়

ডাইলিউসানের ঔষধ প্রস্তুত হয়। এই-রূপ নিয়মে যদৃচ্ছাক্রমে হানিমানের সময় হইতে ডাইলিউসান বৃদ্ধি করা হইত। হানিমানের ঈদৃশ ঔষধ প্রস্তুত করণ প্রণালীতে ঔষধের সত্ব কিছুই না থাকায় এবং তাঁহার পরবর্ত্তী চিকিৎসকগণ উক্ত-রূপ ঔষধে প্রত্যক্ষ ফল কিছু না দেখিতে পাওয়া তাঁহারা নয় ফোঁটা স্পিরিটে এক ফোঁটা মাদার টিন্‌চার দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন; এবং এইরূপ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া কিছু ফল দেখিতে পাইয়া বর্ত্তমান সময়ের হোমিওপাথিক মাত্রেই এই দশমিক রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। হানিমানের সময় হইতে এই সময় পর্য্যন্ত হোমিওপাথি ঔষধের পরিমাণ কত বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা এক প্রকার সকলেই দেখিলেন। এইক্ষণ আবার উক্ত মহাত্মার সময়ের পর বর্ত্তমান ডাক্তার মহাশয়দিগের ডাইলিউসানের মাত্রা প্রয়োগ দেখিলে আরও বিস্ময়াপন্ন হইবেন। হানিমান বর্ত্তমান পীড়ার সমকার্য্য-বিশিষ্ট ঔষধ প্রদত্ত হইলে পীড়া পাছে বৃদ্ধি হয় এই আশঙ্কায় তাঁহার সময়ের ঔষধ প্রস্তুত মতে ত্রিংশত ডাইলিউসানের নিম্নে কখনই ঔষধ ব্যবহার করিতেন না; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ডাক্তার মহাশয়েরা দার্শমিক রীতির তৃতীয় ডাইলিউসান কখন কখন বা ষষ্ঠ ডাইলিউসান ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর আমি কোন বিশিষ্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসকের নিকট শ্রুত হইয়াছি যখন তাঁহাদের পীড়া সত্বর আরোগ্য করিতে নিতান্ত আবশ্যক হয় তখন কখন কখন মাদার টিন্‌চারও ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইক্ষণ স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইতেছে যে হোমিওপাথি মতে ঔষধের পরিমাণ এত বেশী ব্যবহৃত হওয়াতেও পীড়ার উপশম ব্যতীত, রোগের সমকার্য্য-বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগে, বৃদ্ধি দেখা যায় না। বিশেষতঃ ইহাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, যেখানে পীড়ার আরোগ্য সত্বর আবশ্যক, সেস্থানে তাঁহারা নিম্ন ডাইলিউসানের ঔষধ ব্যবস্থা দেন। এইক্ষণ সকলেই বুঝিতেছেন যে, হানিমানের সময়ের যে ঔষধ ত্রিংশৎ ডাইলিউসানের নিম্নে ব্যবস্থা করিতে সমকার্য্যবিশিষ্ট পীড়ার বৃদ্ধি সতত আশঙ্কা করা হইত, এইক্ষণ দাশমিক রীতির বশবর্ত্তী হইয়া তাহার তৃতীয় ডাইলিউসনেও পীড়া বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় না বরং পীড়া শীঘ্রই নিরাময় হইয়া থাকে।

আর্য্যজাতির ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণ।

হোমিওপাথি ঔষধ প্রস্তুতকরণের ন্যায় আর্য্যজাতির ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণ কোন একটী সাধারণ নিয়মাবদ্ধ নহে। আর্য্যেরা বিষাক্ত দ্রব্যের তেজোহীন করিয়া ঔষধ সম্বন্ধে পীড়িত যন্ত্রের উপযোগীতা বিবেচনা করত এক একটী প্রধান প্রধান ঔষধের অমৃততুল্য যৌগিক গুণ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদিগের প্র-

ত্যেক ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণ ভিন্ন ভিন্ন নিয়মাবদ্ধ; সুতরাং সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণ প্রকাশ করা এই সামান্য প্রবন্ধে স্থানাভাব বিবেচনায় প্রধান প্রধান ঔষধেরই নাম উল্লেখ করা গেল।

"স্বর্ণদলং পলঞ্চৈব রসেন্দ্রঞ্চ পলাষ্টকম্।
রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং তেনৈব কর্জ্জলী কৃতম্॥
কুমারিকা রসৈর্ভাব্যং কাচপাত্রে নিধাপয়েৎ।
বালুযন্ত্রে চসাস্থাপ্য ক্রমাদ্দিনত্রয়ং পচেৎ॥
সাঙ্গ শীতং সমাদায় পুষ্পরক্তরজঃসমম্।
যবমাত্রং প্রদাতব্যমহিবল্লী দলেনচ॥
এতদভ্যাসতশ্চৈব জরামরণনাশনম্।
অনুপানবিশেষেণ করোতি বিবিধান্ গুণান্॥
জ্বরং ত্রিদোষজং ঘোরং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্‌রোগান্‌নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥"

আর্য্যেরা মানবদেহে পারদের অপরিসীম ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, অবশ্যই ইহা বিশোধিত করত হীনবীর্য্য করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে ইহা দ্বারা মানব-শরীরের সমস্ত পীড়াই দূর করিতে পারে; এই অভিপ্রায়ে সাধ্যাতীত কৌশলের সহিত ইহার মলদোষ বিষদোষ পরিহার করিয়া অপরিসীম বীর্য্য ধ্বংস করিবার জন্য গন্ধক দ্বারা রাসায়নিক সংযোগে কর্জ্জলী করিলেন। কিন্তু দেখিলেন যে, এবম্বিধ অবস্থাতেও ইহার অপকারিতাশক্তি লক্ষিত হয়। তখন পুনর্ব্বার ঐ কর্জ্জলী কাচভাণ্ডে নিহিত করিয়া বালুকা যন্ত্র দ্বারা এক-ক্রমে তিন দিবস উত্তাপ দিতে দিতে যখন উহা দগ্ধ হইয়া বালসূর্য্যাভ-বিশিষ্ট হয়, তখনই তাহা ব্যবহারোপযোগী হইবে ক্রমেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। এই পারদ * কি রূপে অমৃত তুল্য গুণ ধারণ করে তাহা ভারতবাসীদিগের মধ্যে সকলেই অবগত আছেন।

সেঁকো-বিষ।

দত্ত্বাস্থ বাণিত্রিরসং দত্ত্বা তালং সুচূর্ণিম।
পুনঃপুনশ্চ সংমর্দ্দ্য শুষ্কং কৃত্বা পুটে দহেৎ॥
দৃঢ়স্থাল্যাং ধৃতং ক্ষারং পলাশঙ্কাপুপর্য্যধঃ।
ততোজ্বালা প্রদাতব্যা দিনরাত্রে মৃতংভবেৎ॥
শুক্লবর্ণং যদা চস্যা দগ্ধৌ দত্তে নধূমকম্।
তদা জাতং মৃতং তালং সর্ব্বরোগবিনাশনম্॥

আর্য্যেরা সেই সময়ে স্থির করিয়া ছিলেন যে, হরিতালের মধ্যে এমন একটী সত্ব আছে যাহা চুণ প্রভৃতি ক্ষারের সাহায্যে সেই বি াক্ত অংশের ধ্বংস হয়। পরে বিশেষ রূপে ঐ সত্বার বীর্য্যহীন করিবার জন্য অনির্ব্বচনীয় কৌশলের সহিত পুনর্ব্বার অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া তাহা একেবারে ভস্ম করিলেন। এই ভস্ম দ্বারা নানাবিধ উৎকট পীড়া হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে যে আর্সেনিক আছে তাহা হোমিওপাথি ত্রিংশৎ ডাইলিউসানের আর্সেনিক অপেক্ষাও অল্প, এরূপ প্রতীতি হয় না।

* সাধারণে ইহাকে মকরধ্বজ বলিয়া জানে।

অভিনয় সমালোচনা।

কাব্যের সারভাগ দৃশ্যকাব্য। সংসার-নাট্যশালায় নটনটী প্রভৃতির আভ্যন্তরীণ চিত্রের প্রতিকৃতি নাটক। সুখে দুঃখে, ও ইন্দ্রিয়বিশেষের উত্তেজনায় মানবপ্রকৃতি যে বিবিধ আকৃতি ধারণ করে, নাটক তাহারই প্রতিবিম্বন। যে শিল্প প্রকৃত জীবনের সেই ফটোগ্রাফকে প্রকৃত জীবন বলিয়া দর্শকমণ্ডলীর নিকট বিভ্রম উৎপাদন করে, তাহাই অভিনয়। যে পরিমাণে সেই অভিলষিত বিভ্রম উৎপাদিত হয়, সেই পরিমাণেই অভিনয়ের কৃতকার্য্যতা। যে শিল্প নকলকে আসল বলিয়া বিভ্রম উৎপাদন করিতে সমর্থ, নকল তোলা অপেক্ষা তাহার গৌরব নিতান্ত ন্যূন নহে। তবে মানবজীবন-চিত্রকরের সহিত অভিনেতার প্রভেদ এই যে—চিত্রকর আপন নায়ক নায়িকা ও পাত্র পাত্রীগণকে ইচ্ছানুরূপ চিত্রিত করেন; মানবজাতি-সাধারণ গুণ বা দোষ লইয়া আপন ইচ্ছামত তাহাদিগকে অলঙ্কৃত বা কলঙ্কিত করেন; তাঁহার নায়ক নায়িকা বা পাত্র পাত্রী কোন নির্দ্দিষ্ট পুরুষ ও রমণীর ছবি না হইতেও পারে;—কিন্তু অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে সেই কবি-চিত্রিত চিত্রের সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে হয়। আর একটী প্রভেদ এই যে চিত্রকর কবি একা অসংখ্য চরিত্রের চিত্রন করিয়া থাকেন; তাঁহাকে এক সময়েই রাজা প্রজা, যুবা বৃদ্ধ, যুবতী বৃদ্ধা, চোর সাধু, উদাত্ত অনুদাত্ত, শত্রু মিত্র প্রভৃতি অসংখ্য অসমভাবাপন্ন চরিত্রনিচয়ের হৃদয়সাগরের অধস্তম প্রদেশে নামিয়া তথাকার এক একটী ক্ষুদ্র কাঁকরও দেখাইতে হয়; কিন্তু অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কার্য্য প্রত্যেকে এক একটী চিত্রিত চরিত্রবিশেষে আসলের বিভ্রম উৎপাদন করা। যাহা হউক কবি-সৃষ্টি নাটক অপেক্ষা অভিনয় কিঞ্চিত ন্যূন হইলেও,—নাটকের উপকারিতা সম্পাদন ও নাটকের সৌন্দর্য্য উপলব্ধিবিষয়ে, অভিনয়ের উপযোগিতা অসীম। যন্ত্রবিশেষের (Eye-glass) সাহায্য ব্যতিরেকে যেমন প্রস্‌পেকিটব্‌ চিত্রের সৌন্দর্য্য অনুভূত হয় না, অভিনয় ব্যতীতও সেইরূপ নাটকের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয় না। অভিনয়ের বিভ্রমে চিত্ত উন্মাদিত না হইলেও, নাটকের কার্য্যকরিতা পরিস্ফুট হয় না।

অভিনয় যেমন নাটকের জীবন, বিভ্রমোৎপাদন সেইরূপ অভিনয়ের জীবন। কিন্তু সেই বিভ্রমোৎপাদন করা অতীব কঠিন কার্য্য। অভিনেয় চরিত্রের সহিত পূর্ণ একীভাব ভিন্ন, পূর্ণ বিভ্রমোৎপাদন অসম্ভব। এই পূর্ণ একীভাব

প্রায় অসম্ভব, সুতরাং পূর্ণ বিভ্রমোৎপত্তিও প্রায় অসম্ভব। পূর্ণ একীভাব অসম্ভব—কারণ বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যের দুইটী সমান ছবি জগতে কথনই মিলে না। যাহা হউক একীভাব অসম্ভব হইলেও, অভিনয় ইহার বিভ্রম উৎপাদন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে না। যে পরিমাণে অভিনয় ইহাতে কৃতকার্য্য হয়, সেই পরিমাণেই অভিনয়ের আদর ও কার্য্যকারিতা।

অভিনয়ের কার্য্যকারিতা যখন পূর্ণ একীভাবের বিভ্রমোৎপাদনের উপর নির্ভর করিতেছে, তখন একীভাবের বিভ্রমোৎপাদন কিসে হইতে পাবে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের তাহা বিশেষ আলোচ্য। যে যে চরিত্র যে যে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অভিনেয়, সেই সেই অভিনেতা বা অভিনেত্রী, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ গঠনে যে পরিমাণে সেই সেই চরিত্রের অনুরূপ হইবেন, সেই পরিমাণেই তাঁহাদিগের বিভ্রমোৎপাদন করা সহজ হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অভিনেয় চরিত্রের অনুরূপ অভিনেতা বা অভিনেত্রী জগতে দুর্লভ। এই জন্যই আমাদিগকে অপার্য্যমানে অভিনেয় চরিত্রের সাদৃশ্যের জন্য নয়াত্রেন সমর্থ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর এত আদর করিতে হয়। বারাঙ্গনার সহিত প্রাতঃস্মরণীয়া সীতা সাবিত্রীর আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য নাই, সুতরাং সেই বারাঙ্গনাকে সীতা সাবিত্রী বলিয়া দর্শকমণ্ডলীর মনে পূর্ণ ও দীর্ঘকালস্থায়ী বিভ্রম জন্মিতে পারে না। কিন্তু সেই বারাঙ্গনা অভিনয়পটু হইলে বাক্যে ও ভাবভঙ্গীতে সাবিত্রী সীতার ভান করিয়া দর্শকমণ্ডলীর মনে আংশিক ও ক্ষণিক বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারে। অভিনেতার স্থলেও এইরূপ। যতদিন সমাজ সংস্কৃত না হইতেছে, যতদিন অভিনয় হৃদ্বৃত্তির পরিপুষ্টি সাধন ও শিক্ষাবিধানের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত না হইতেছে, ততদিন সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত নর নারী অভিনয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন আশা করা যায় না। সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত নর নারী ব্যতীতও অন্য দ্বারা উচ্চ চরিত্রের পূর্ণ ও দীর্ঘকালব্যাপী বিভ্রমের উৎপাদন অসম্ভব। সুতরাং আমাদিগকে আপাততঃ আংশিক ও ক্ষণিক বিভ্রমের উৎপাদনেই পরিতৃপ্ত থাকিতে হইবে। ইহাতেও আমাদিগের হৃদ্বৃত্তির কিয়ৎ পরিমাণে পরিপুষ্টি সাধন ও শিক্ষা বিধান হইতে পারিবে। যে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ দ্বারা এই গুরুতর কার্য্যের আংশিক সংসাধন সম্ভবপর, অভিনয়ের গুণবর্ণন দ্বারা তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন, ও দোষপ্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদিগের সুশিক্ষা বিধান করা সম্পাদকদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য। এইজন্য এখন হইতে উভয় নাট্যশালার প্রধান প্রধান অভিনয়ের মধ্যে মধ্যে সমালোচনা করা আমাদিগের একটী সঙ্কল্প রহিল।

রজনী।

যাহা চন্দ্রশেখরে নাই, রজনীতে তাহা আছে। যে সাহস শৈবলিনীরও ছিল না, অন্ধ রজনীর তাহা ছিল। প্রতাপকে প্রাণসম ভাল বাসিয়া শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে বিবাহ করিলেন কেন? রজনী অন্ধ হইয়াও সেরূপ পরিণয় হস্ত হইতে অনায়াসে মুক্ত হইলেন। অন্ধতা প্রযুক্ত রজনী শৈবলিনী অপেক্ষা দুর্ব্বলা, কিন্তু রজনীর হৃদয়বল তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতাকে পরাজয় করিয়াছিল। তিনি সেই বলে বলবতী হইয়া এক সামান্য সাধন অবলম্বন করিয়া অন্ধতা সত্বেও শচীন্দ্রের জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। দেখাইলেন, শারীরিক বল হৃদয়বলের নিকট অতি সামান্য বিষয়। যে তেজ হৃদয়ে জাগে, শরীরে তাহা ধারণ করিতে পারে না। শৈবলিনীর সে তেজ ছিল না, আমি তাহা বলি না। কিন্তু শৈবলিনীর সে তেজ সময়ে জাগরিত হয় নাই। যখন শৈবলিনীর সে তেজ উঠিল, তখন দিবার মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়াছে। সে তেজ অসময়ে উঠিয়া অতি দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়িল। অপরাহ্নে মধ্যাহ্ন রবির রৌদ্র ফুটিল, যেন মধ্যাহ্ন রবির কিরণ রাহুতে গ্রাস করিয়াছিল। রজনীর তেজ সময়ে উদিত হইয়া তাহার জীবনজগৎ আলোকিত করিয়াছিল। এই জন্য বলি চন্দ্রশেখরে যাহা নাই রজনীতে তাহা আছে।

আবার শৈবলিনী, তুমি লবঙ্গলতার কাছেও হারি মানিলে? তোমার চন্দ্রশেখর কিছু লবঙ্গলতার মিত্রজার মত বৃদ্ধ ছিলেন না। তবু লবঙ্গলতার অনুরক্তি তোমাতে কই? তোমার প্রতাপ তোমাকে ছাড়িয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, লবঙ্গলতার অমরনাথ চিরদিন লবঙ্গের জন্যই ছিল। তথাপি লবঙ্গ একদিনও তাঁহার প্রতি চাহিয়াও দেখেন নাই। লবঙ্গের হৃদয়ে তাহার স্বামী ভিন্ন অন্য কাহারও জন্য অণুমাত্র স্থান ছিল না। লবঙ্গ যদি অমরনাথকে ভাল বাসিতেন, সে ভালবাসা ইহলোকের জন্য নহে। শৈবলিনী এই দেখ, লবঙ্গলতার সুন্দর হৃদয়ভাব দেখ:—

"অং।———কিন্তু তুমি কখন যদি ইহার পর শোন যে অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু—অণুমাত্র স্নেহ করিবে?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

অ। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্র-তুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য একটুকু স্থান নাই?

* শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস। কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২৮৪।

ল। না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলে ও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।"

এই হৃদয়ভাব কেবল প্রতাপের চিত্তসংযমের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। প্রতাপও বলিয়াছিলেন এজন্মে শৈবলিনীর প্রতি অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া আমি দেহ পরিত্যাগ করিলাম। চন্দ্রশেখরের প্রতাপ, রজনীর লবঙ্গলতা। রমণীহৃদয়েও যে প্রতাপের পৌরুষবল অবস্থান করিতে পারে, লবঙ্গলতা তাহাই প্রদর্শন করেন। শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের যে সম্বন্ধ, অমরনাথের সহিত লবঙ্গেরও সেই সম্বন্ধ। শৈবলিনী রমণীর ন্যায় অধীরা হইয়াছেন, অমরনাথ পুরুষের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। সেই শৈবলিনী অধীরা না হইয়া, প্রতাপের মত সুধীর হইলে তাহাকে কিরূপ সুন্দর দেখাইত, লবঙ্গলতায় সেই চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সুধীরতা শৈবলিনীতে নাই, লবঙ্গলতায় তাহা আছে। এই জন্য বলি, চন্দ্রশেখরে যাহা নাই, রজনীতে তাহা আছে।

আবার প্রতাপ, তোমার ইন্দ্রিয়সংযম স্মরণীয়, প্রশংসনীয় বটে; কিন্তু তুমি কি অমরনাথের সাদৃশ্য নিকট দাঁড়াইতে পার? শৈবলিনী তোমার সঙ্গিতা, তোমার অনুরাগ শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। সেই অনুরাগ অহোরাত্র পোষিত করিয়া তুমি কি রূপে রূপসীকে আবার ভালবাসিতে পারিতে? শৈবলিনীর প্রতি তোমার অনুরাগ দেখিয়া অনুমান হয়, তুমি রূপসীকে কখনই ভালবাস নাই। কেন তবে রূপসীকে গলগ্রহ করিয়াছিলে? অমরনাথের ন্যায় বিবাহে উদাসীন থাকিলে তোমার প্রণয় কি অধিকতর পবিত্র হইত না? অমরনাথ বহুকাল লবঙ্গের প্রণয় গোপনে পোষিত করিয়াছিলেন। শেষে অমরনাথ নিরাশ হইয়া সংসারে বিরাগী হইয়া গেলেন। সংসারে বিরাগী হইয়া গেলে ক্রমে তাঁহার সেই অনুরাগ অণুমাত্রায় কমিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার হৃদয় শূন্য হইল। তিনি বাহ্যজগৎ হইতে হৃদয়কে প্রত্যাখ্যান করিয়া অন্তর্জগতে তাহা নিবৃত্ত করিলেন। অমরনাথ অন্তর্জগৎময় হইলেন। বাহ্যজগৎ তাঁহার সম্মুখ হইতে তিরোহিত হইল। এখন আর সে প্রেমনৈরাশ্য নাই, এখন অন্যভাব উপস্থিত। প্রেমনৈরাশ্য বৈরাগ্য আনিয়া দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। মানব একভাবে চিরকাল তিষ্ঠিতে পারে না। বৈরাগ্য ত্বরায় হৃদয়শূন্যতা দেখাইয়া দিল। একদিন অমরনাথ যখন প্রেমনৈরাশ্যের সেতু পার হইয়া বৈরাগ্যে আসিতেছিলেন, তখন বাহ্যজগৎ হইতে অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে করিতে বাহ্যজগতের উপর জয়লাভ করিয়া কিয়ৎ-

পরিমাণে সুখজ্ঞান করিয়া ছিলেন। ক্রমে সে সুখবোধ তিরোহিত হইল। তখন আবার অন্তর্জ্জগৎ শূন্য জ্ঞান হইল। সেভাব আর তাঁহার সুখজনক বোধ হইল না। তিনি বৈরাগ্যপরতন্ত্র হইয়া এতকাল সর্ব্বপ্রকার কাম্য পদার্থ হইতে হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া ছিলেন। লবঙ্গকে একেবারে ভুলিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আবার অমরনাথের হৃদয় বাহ্য জগতে ফিরিল। যখন তাঁহার হৃদয় পৃথিবীর দিকে ফিরিল, আবার প্রেম-নৈরাশ্যের পথে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দেখিলেন বাহ্যজগতে তাঁহার কিছুই বাঞ্ছনীয় নাই। যাহা বাঞ্ছনীয় পদার্থছিল আজিও তাহা আছে;—কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। পূর্ণ হইবার নহে বলিয়া বহুকাল তাহা হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিয়াছেন। আর পুনর্জ্জীবিত করা বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্য তিনি অন্য কোন বাঞ্ছনীয় পদার্থ সংসারে খুঁজিতে লাগিলেন। যে প্রেম-পুত্তলীকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাহাকে আর হৃদয়ে স্থান দিলেন না। প্রতাপের ন্যায়, লবঙ্গের অনুরাগ তাঁহার শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আর প্রবিদ্ধ নাই। এখন তিনি সে অনুরাগ হইতে শুদ্ধসত্ব হইয়াছেন। যতদিন সে অনুরাগ ছিল, ততদিন অন্য-কাহাকে হৃদয়ে স্থান দেন নাই। সে অনুরাগ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইলে তবে তাঁহার হৃদয়-সিংহাসন অন্য প্রেম-পুত্তলীর জন্য প্রসারিত করিলেন। ঘটনাক্রমে রজনী সেই সিংহাসন অধিকার করিলেন। তৎপরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এস্থলে বর্ণনীয় নহে। যাহা প্রদর্শিত হইল তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রণয়-পবিত্র অমরনাথের নিকট প্রতাপ কথনই দাঁড়াইতে পারেন না। প্রতাপের হৃদয়ের উপর বঙ্কিম বাবু আর একরেখা বর্ণ প্রয়োগ করিয়া অমরনাথকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অমরনাথকে সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিম বাবু বলিলেন পাঠক, তুমি প্রতাপের চরিত্রে মোহিত হইয়াছ, কিন্তু আমি এই যে অমরনাথকে সৃষ্টি করিলাম তাহা একাংশে প্রতাপ হইতেও উচ্চতর; তুমি কি অমরনাথের উচ্চতা অনুভব করিতে পারিবে? এক প্রতাপই সামান্যচরিত্রজনগণ অপেক্ষা কতদূর উচ্চ; অমরনাথ তদপেক্ষাও উচ্চতর। এই উচ্চতা অনুভব করিতে পারিলে তবে পাঠক বুঝিতে পারিবে, চন্দ্রশেখরে যাহা নাই, ক্ষুদ্র রজনীতে তাহা আছে।

কিন্তু অমরনাথ ও প্রতাপ ইঁহারা দুইজনে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি। অমরনাথ আশৈশব লবঙ্গকে ভালবাসিতেন, প্রতাপও শৈবলিনীকে আশৈশব ভালবাসিতেন। যে কারণেই হউক, ইহঁাদিগের প্রণয়-মিলন সম্পন্ন হইল না। কিন্তু এই প্রেম-নৈরাশ্য দুইজনকে দুই স্বতন্ত্র পথে লইয়া গেল। ইহা অমরনাথকে সন্ন্যাসী করিল; কিন্তু প্রতাপ তাহা হৃদয়ে অনায়াসে

ধারণ করিয়া দ্বিতীয় নারীর পাণি গ্রহণানন্তর বিলক্ষণ সংসারী হইলেন। যাহা প্রতাপ অনায়াসে বহন করিলেন, অমরনাথ তাহাতে বিরাগী হইয়া গেলেন। ইহাঁদিগের প্রকৃতিগত এপ্রকার বৈষম্য ছিল যাহাতে ইহাঁরা এরূপ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রতাপ লোকধর্ম্মে সিদ্ধ হইতে চাহিতেন, অমরনাথের উচ্চপ্রকৃতি লোক ধর্ম্মের উপরে থাকিতে চাহিত। প্রতাপ ধর্ম্মের শাসনে প্রকৃতিকে শাসিত করিতে চাহিতেন, অমরনাথের ধর্ম্ম প্রকৃতিকে পবিত্র করিত। প্রতাপ, হৃদয়-মন্দিরে দেবভাব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কতই চেষ্টাকরিতেন, অমরনাথের হৃদয়-মন্দিরে দেবভাব স্বতঃই উদিত হইত। প্রতাপ, ধর্ম্মমন্দিরে প্রণিপাত করিতেন; অমরনাথ প্রকৃতির দেবমন্দিরে মস্তক অবনত করিতেন। প্রতাপ ধর্ম্মের পূজা করিবার জন্য সংসারে প্রবেশ করিলেন; অমরনাথ প্রকৃতিকে পূজার্হ, দেবতুল্য করিবার জন্য সংসার পরিত্যাগ করিলেন। প্রতাপ সংসারী, অমরনাথ ঋষি। প্রতাপ কার্য্যময়, অমরনাথ ভাবময়। প্রতাপ সাধুভাবের প্রশংসা করিতেন, অমরনাথ সাধুভাবে বিমুগ্ধ ও বিগলিত হইয়া যাইতেন। প্রতাপ পিটর, অমরনাথ পাল। প্রতাপের নিকট স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ ছিল, তিনি চাবি খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিতেন; অমরনাথের নিকট স্বর্গের দ্বার বিমুক্ত ছিল, তিনি সোপানারোহণে তন্মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেন। প্রতাপ যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অভ্যাস করিয়া প্রকৃতির উপর জয়লাভ করিতে গিয়াছিলেন, অমরনাথ তাহা শিখেন নাই। অমরনাথ প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া তাহার উপর জয়ী হইতে চাহিতেন না। তাঁহার প্রকৃতি দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া দেবভাবে প্রতিষ্ঠিত হইত। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকৃতির দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিতে চাহিত। অমরনাথ রামারূপে সীতাকে উদ্ধার করিতেন, প্রতাপ সীতাকে বনবাসে পাঠাইতেন। অমরনাথ যদি চন্দ্রশেখরে প্রতাপের স্থানীয় হইতেন তাহা হইলে, সে উপন্যাসের ভাগ্য অন্যবিধ হইত। প্রতাপকে যতদূর যাইতে হইয়াছিল, অমরনাথ নিশ্চয় ততদূর যাইতেন না। অমরনাথ প্রথমেই শৈবলিনীকে বিবাহ করিতেন। শৈবলিনীকে আর চন্দ্রশেখরের হস্তে পতিত হইতে হইত না। যে পরীক্ষায় প্রতাপ দাঁড়াইয়া লোকধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, অমরনাথ সেরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন না বটে, কিন্তু তিনি শৈবলিনীকে গ্রহণ করিয়া যাবজ্জীবন তাঁহার প্রণয়ে সুখী হইতেন তাঁহার পার্শ্বে রূপসীকে দেখা যাইত না। এঞ্জিলিনা যে এডউইনের জন্য বনে বনে ভ্রমণ করিতেন, সেই এঞ্জিলিনা এডউইনকে বনবাসেই সন্ন্যাসী রূপে প্রাপ্ত হইতেন। এঞ্জিলিনা যেমন এডউইনের জন্য থাকিতেন এডউইনও তদ্রূপ এঞ্জিলিনার জন্য

থাকিতেন। উভয়ের প্রণয় মিলন নিশ্চয় সুখমিলন হইত কিন্তু, রজনী যদি অমরনাথকে বিবাহ করিত, আর লবঙ্গলতা সেই বিবাহের পর শৈবলিনীর ন্যায় অমরনাথের প্রবাসিনী হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন, তাহাহইলে রজনী ও অমরনাথের প্রণয় এত উচ্চতায় উঠিত, যে লবঙ্গলতা তাহার অবনতিসাধনে অসমর্থা হইতেন। লবঙ্গলতা অমরনাথকে এক প্রতাপের মত রজনীর বিরাগী ও লবঙ্গের অনুরাগী দেখিতেন না। তিনি অমর-রজনীর প্র ়-.গৌরব দেখিয়া আপনি লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া ফিরিয়া আসিতেন।

তরুণ বয়সে প্রণয় কেমন স্বাভাবিক ভাবে, স্বতঃই অনিবার্য্য রূপে হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয় রজনীর জীবন তাহাই প্রকাশিত করে। শকুন্তলার প্রণয় এইরূপ দুষ্মন্তকে দর্শনমাত্রে প্রোৎসাহিত হইয়াছিল, প্রোৎসাহিত হইয়া দিন দিন তাহা স্বতঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বাস্তবিক হৃদয় যখন প্রণয়োন্মুখ হয়, উপযুক্ত প্রণয়পাত্র পাইবামাত্র তাহা সমুদ্গত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ দৃঢ় অনুরাগে পরিণত হইতে থাকে। ঋতুক্রমে যেমন বাসন্তী কুসুম একে একে প্রস্ফুটিত হইয়া বনরাজি সুশোভিত করে, ঋতুক্রমে মানব হৃদয়ও তদ্রূপ প্রণয়ে কুসুমিত হইয়া জীবনকে মধুরতায় পরিপূর্ণ করে। সংসারের বাহিরে বনবাসিনী হইয়া থাকাতে শকুন্তলার নিকট বাহ্যসংসার অন্ধকারময় ছিল, তথাপি প্রণয় কেমন ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়ে সমুৎপন্ন হইয়া কুসুমে, লতাকুঞ্জে, তরুরাজিতে, হরিণীতে, এবং সখীগণে ক্রমে ক্রমে বিস্তারিত হইয়াছিল, কালিদাস তাহা অপূর্ব্ব কৌশলে এক অতুলনীয় দৃশ্যে কুসুম-সুকুমার তুলিকাস্পর্শনে চিত্রিত করিয়াছেন। শকুন্তলা, মাধবীর সহিত সহকারের বিবাহ দিতেন। মাধবী মুঞ্জরিত ও ফলপ্রসবিনী হইবে বলিয়া তাহার আলবালে জলসেচন করিতেন। হরিণীকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেন। কি ভাবে শকুন্তলা এই সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতেন, তাহা শকুন্তলাই বুঝিতেন। হৃদয় সেই ভাবে বিচলিত হইলে একদা শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের শুভদর্শন ঘটিল। দুষ্মন্তের উপর শকুন্তলার প্রণয় স্থাপিত হইল। যৌবনে এই প্রণয় বনবাসিনী শকুন্তলার হৃদয়ে স্বাভাবিকই সমুত্থিত হইয়াছিল; যৌবনে সেই প্রণয় অন্ধরজনীর হৃদয়েও স্বতঃই সমুত্থিত হইয়াছে। সেই প্রণয় একবার উত্থিত হইলে তাহা কেমন স্বাধীনভাবে বর্দ্ধিত হয়, প্রণয়ভাজনের নিরপেক্ষ হইয়াও কেমন সুন্দর ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, শকুন্তলা ও রজনী তাহা দেখাইয়াছেন। দুষ্মন্তের প্রণয় কেবল ইন্দ্রিয়লালসা মাত্র ছিল বলিয়া তাহা দুইদিনে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পরে ভুলিয়াছিলেন। কিন্তু শকুন্তলার প্রণয় কেবল লালসা মাত্র ছিলনা, তাহা প্রকৃত

প্রণয় ও হৃদয়ের অমূল্য ধন; দুষ্মন্তের অন্তরালে এবং অবর্ত্তমানেও তাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাহা দুষ্মন্তের প্রণয়ের অপেক্ষা করে নাই। শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্তের ভালবাসা কতদূর স্থায়ী শকুন্তলা তাহা জানিতেন না, কিন্তু শকুন্তলার প্রণয় দুষ্মন্তকে ভালবাসিয়াই চরিতার্থ হইত। প্রণয়ের এই চমৎকার ও সুন্দরভাব শকুন্তলা প্রকাশিত করিয়াছে; অন্ধ রজনীও তাহা প্রকাশিত করিয়াছে। রজনীর আদর্শ নিডিয়াতে (Nydia) তাহা অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। নিডিয়া গ্লকস্‌কে (Glaucus) যে রূপ ভালবাসিত তাহা একজন অন্ধের ভালবাসা বলিয়াই শোভা পাইয়াছে; যেন পৃথিবীর মধ্যে গ্লকস্‌ ভিন্ন নিডিয়ার আর কিছুই ছিল না। গ্লকস্‌ সে ভালবাসার কিছুমাত্র জানিত না, গ্লকসের চিন্তা আয়ন (Ione) "তথাপি নিডিয়া তাহাকে চিরদিন ভালবাসিয়াছে। আয়নের প্রতি গ্লকসের আসক্তি থাকাতে এই প্রণয়ের সৌন্দর্য্য অধিকতর প্রকাশিত হইয়াছে। নিডিয়ার এতদূর প্রণয় সৌন্দর্য্য রজনীর প্রণয়ে প্রভাসিত হয় নাই। শকুন্তলার প্রণয়ের উপর এক রেখা বর্ণ প্রয়োগ করিলে, রজনীর প্রণয়সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়; কিন্তু রজনীর প্রণয়ের উপর আর এক রেখা বর্ণপ্রয়োগ না করিলে নিডিয়ার প্রণয়-সৌন্দর্য্য অনুভূত হয় না। নিডিয়া কেবল গ্লকস্‌কে ভালবাসিয়াই এই মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিলেন। তিনি একদিনের তরে গ্লকসের হইলেন না। তিনি গ্লকসের হইলেন না বটে, কিন্তু চিরদিনের তরে তিনি মানব হৃদয় অধিকার করিয়া রহিলেন। তিনি গ্লকসের সম্পত্তি নহেন, তিনি মানবজাতির সম্পত্তি।

নিডিয়ার নৈপ্রেমনৈরাশ্যে মানবের সহানুভূতি হওয়াতে, মানব তাহার প্রণয়কে নিজ হৃদয়-মন্দিরে পবিত্র করিয়া রাখে। রজনীতে তাহা ঘটে না; কারণ রজনীর প্রেম নিষ্ফল নহে। রজনী যখন পরপ্রার্থনীয়া হইলেন, সেই দণ্ড হইতে পূর্ব্বে রজনী মানবহৃদয়ের যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেস্থান হইতে বিসর্জ্জিতা হইলেন। তিনি মানব হৃদয় হইতে বিচ্যুতা হইয়া, একবার অমরনাথের এবং পরে চিরদিনের জন্য শচীন্দ্রের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শচীন্দ্রেরই হইয়া রহিলেন। তাহার কারণ এই, মানব পরদুঃখে যত দূর কাতর হয়, পরসুখে ততদূর সুখী হইতে পারে না। সুখ, মানব একাকী ভোগ করে; কিন্তু যে দুঃখ পায়, সে জগৎকে কাঁদাইয়া যায়।

আর এক কারণে নিডিয়া মানবের অধিকতর চিত্তহরণ করিয়াছে। বঙ্কিমবাবু রজনীকে অন্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই অন্ধতার সহিত রজনীকে রূপ, ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, গুণ সকলই দিয়াছেন। নৈসর্গিক গুণ ব্যতীত পার্থিব ধনসম্পত্তি নিডিয়ার কিছুই ছিল

না। নিডিয়া কোন উচ্চবংশ হইতে সম্ভূতা নহেন, কিন্তু তাঁহার গুণগ্রাম উচ্চকুলেরই সমুচিত। এই গুণরাশি তাঁহাকে উচ্চ-পদে উত্তোলন করিয়াছিল। তিনি ইহার গৌরবে উচ্চকুলকামিনী অপেক্ষাও গরীয়সী। উচ্চকুলে যে উচ্চগুণের সমাবেশ হইবে ইহা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু নীচকুলে নিডিয়ার গুণরাশি অতি আশ্চর্য্য মানিতে হয়। বঙ্কিমবাবু রজনীকে উচ্চকুলে তুলিয়া তাঁহার এই গৌরব কথঞ্চিৎ হরণ করিয়াছেন। নিডিয়াকে এই জন্য যেরূপে রমণীরত্ন বলা যায়, রজনীকে সেরূপে বলা যায় না। উচ্চকুলোদ্ভবা হইয়া রজনী যে উচ্চ-গুণে ভূষিতা হইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। যত দিন রজনী উচ্চকুলসম্ভূতা বলিয়া জ্ঞানগোচর হন নাই, ততদিন তাঁহাকে পুষ্পনারীরূপে রমণীরত্ন বলিয়া জ্ঞান হইতেছিল। অবশেষে তাঁহার বংশ মর্য্যাদার গৌরব আসিয়া তাঁহার গুণগরিমাকে লঘু করিয়া ফেলিল। নিডিয়া এই সমস্ত বাহ্যগৌরব-বিহীন হওয়াতে তদীয় অন্তর্গৌরব দ্বিগুণ তেজে শোভা পায়। গভীর অরণ্যানীর অন্ধতমদেশের সুন্দর কুসুমের মত নিডি-য়াকে উপলব্ধি হইতে থাকে। যাহার হৃদয় ও অন্তঃসৌন্দর্য্যই সর্ব্বস্ব। এ সৌন্দর্য্য নিরলঙ্কৃত বেশে সমুদ্রতীরে সন্ধ্যাকালে পূর্ণিমার শশীর ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। এই নিরলঙ্কৃত সরল আন্তরিক সৌন্দর্য্য, নিডিয়ার অন্ধতা, রূপহীনতা এবং দুর্ভাগ্যের বিমলিন দেশ হইতে দ্বিগুণ গৌরবে প্রজ্বলিত দেখায়। তিনি কেবল স্বাভাবিক আন্তরিক সৌন্দর্য্যে অতি উজ্জ্বল বর্ণে শোভা পাইতে থাকেন। তাঁহাকে কেবল আন্তরিক সৌন্দর্য্যের অবয়বী কল্পনা বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে।

এই পাপ পৃথিবীতে কামিনী শুদ্ধ গুণে বিকায় না, নিডিয়া তাহা দেখান। নিডিয়া সেই পাপ পৃথিবীকে যেন ভর্ৎসনা করিয়া গেলেন। তিনি যেন আজিও কহিতেছেন, পৃথিবী, তুমি আমার অন্তঃসৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলে না। আমি কি একাকী অন্ধ? জগৎ তুমিও অন্ধ। আমি, জগৎ! তোমাকে দেখিতে পাই নাই; এবং দেখিতে পাই নাই বলিয়া কত সন্তাপিত হইয়াছি; তোমার নয়ন থাকিতেও তুমি আমার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত কর নাই, আমার জন্য বিন্দুমাত্রও অশ্রুপাত কর নাই। প্রকৃতি! আমাকে এত গুণাধার করিয়া কেন সৃষ্টি করিয়াছিলে?

প্রথমে আমরা রজনীর গুণমাত্রে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। পরে দেখিলাম তাঁহার রূপও আছে, ক্রমে তাঁহার ধন সম্পত্তি ও কুলমর্য্যাদা সকলই প্রকাশিত হইতে লাগিল। বাহ্য চাকচিক্যে আমাদিগের দৃষ্টি পড়িল। আমরা রজনীর গুণরাশি ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম। এমত সময় অমরনাথ উদিত হইয়া আমা-দিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

অমরনাথ রজনীর কেবল গুণাংশে মোহিত হইয়া, রজনীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি তাহা আমাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু তৎপরেই ইহা ভুলিয়া গেলাম। তাঁহার রূপ, ধন, মান দেখিয়া আমরা শচীন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলাম। গুণ অপেক্ষা রজনীর রূপ, এবং ধন মানের গরিমা বাড়িল? উপন্যাসের কি কল্পনা এই? উপন্যাসের যদি ইহাই কল্পনা হয়, তবে যে উপদেশ নিডিয়া দেয়, রজনীও তাহাই প্রদান করে বটে, কিন্তু রজনীর অপেক্ষা নিডিয়ার উপদেশ অধিকতর গম্ভীর, অধিকতর আকর্ষণীয়, এবং দৃঢ় বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। রজনী নিজে অন্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু অমরনাথ থাকিতে তিনি জগৎকে অন্ধ বলিতে পারেন নাই। অমরনাথ মানবের ঔদার্য্য এবং গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়া মানব প্রকৃতিকে উচ্চপদে তুলিয়াছেন।

নিডিয়া যে গুণগ্রামের সৃষ্টি, গিরিজায়া তাহার এক গুণ পাইয়া ভিখারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। নিডিয়ার সহিত যখন আমাদিগের প্রথম পরিচয় হয়, তখন আমরা নিডিয়ার সুকণ্ঠরবে এবং সুধার সঙ্গীতে বিমোহিত হইয়া যাই। ক্রমে আমরা নিডিয়ার উচ্চতর গুণের পরিচয় পাইলাম। তখন আমরা নিডিয়ার সঙ্গীত শক্তি ভুলিতে লাগিলাম। কিন্তু প্রথমে নিডিয়া আমাদিগকে যে গুণে মোহিত করিয়াছিলেন, অন্য শ্রেষ্ঠতর গুণ না থাকিলেও আমরা সেই গুণেই তাঁহার নিকট বিক্রীত থাকিতাম। এই জন্য বঙ্কিমবাবু তাঁহার সেই গুণমাত্র বাছিয়া লইলেন, এবং তদ্দ্বারা গিরিজায়ার সৃষ্টি করিলেন। সে গুণ বঙ্গসমাজে কেবল ভিখারিণীতে শোভা পায় বলিয়া তাহা রজনীকে দিতে পারিলেন না। রজনীর জন্য নিডিয়ার অন্যান্য গুণ রাখিলেন। যে সরলতায় নিডিয়া সাহসিনী ও স্বাধীন; সে সরলতা, সাহস ও অবশ্যতা রজনীর ছিল। যে স্বাভাবিক প্রতিভা প্রভাবে নিডিয়া সকল অবস্থার উপর জয়লাভ করিয়াছেন, রজনীও সেই প্রতিভাবলে প্রত্যুৎপন্নমতি হইয়া সকল অবস্থাই অতিক্রম করিয়াছেন। নিডিয়া যেমন নিজ বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিপরায়ণ ছিলেন, রজনীরও তেজ ও প্রকৃতি ঠিক তদ্রূপ। নিডিয়া যেমন একাধারে অনভিজ্ঞতার সহিত প্রতিভার মিলন, কোমলতার সহিত দৃঢ়তা ও কর্কশতার মিলন, বাল্য চঞ্চলতার সহিত বয়সের সুধীরতার মিলন—অতি আশ্চর্য্য ভাবে প্রদর্শন করেন, রজনীও তদীয় অনতিপ্রসর জীবন ক্ষেত্র মধ্যে অধিকতর চমৎকৃত ভাবে তৎ সমুদয় প্রকাশিত করেন। নিডিয়ার হৃদয় যেমন এক একবার ভাববেগে উদ্দামিত হইত, এক একবার সৌকুমার্য্যের সুন্দরতায় বিকশিত হইত; ঝঞ্ঝাবাত এবং বৃষ্টির পর সুন্দর প্রকৃতিশোভা, এবং বাসন্তী-প্রকৃতির শোভা মধ্যে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও বৃষ্টিধারা পর্য্যায়ক্রমে দেখা যাইত, রজনীরও অন্ত-

প্রসর হৃদয়াকাশে একবার প্রণয়ের প্রবল ভাবের বাত্যা বহিল, আবার সৌকুমার্য্যে বিকশিত হইয়া অমরনাথের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিল। জীবনের ঘটনাসকল বিভিন্ন হওয়াতে এই হৃদয়-দ্বয়ের পরিচয় বিভিন্ন অবস্থাতে প্রকাশিত হয় মাত্র, নহিলে ইহারা যে এক ধাতুতে গঠিত তাহার আর সংশয় নাই। রজনীর ক্ষুদ্রপ্রসর জীবন মধ্যে যেরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে বঙ্কিমবাবু নিডিয়ার গুণগ্রামের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে বঙ্কিমবাবুর চিত্রনৈপুণ্যে চমৎকৃত হইতে হয়।

অন্ধের অনুরাগ, অন্ধের প্রেম—কেমন গভীর ও প্রগাঢ় নিডিয়া এবং রজনী উভয়েই তাহা প্রদর্শন করেন। অন্ধ বলিয়া উভয়েই জানিতেন, তাঁহারা পরকেই চিরকাল ভালবাসিবেন, পর যে তাঁহাদিগকে আবার ভালবাসিবে তাঁহারা এরূপ প্রত্যাশা করেন নাই। সেই জন্য ইহাঁদিগের প্রেম চিরদিন গোপনেই হৃদয়ের গূঢ়তম দেশে পোষিত হইয়াছিল। সে প্রেম প্রকাশ হইবার নহে বলিয়া তাহার তেজ ও প্রাবল্য কখন পরিদৃশ্যমান হয় নাই। বাহাবল ছিলনা বলিয়াই অনুদিন তাহার গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি হইতেছিল। প্রেমের গভীরতা কি যদি একদিন কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমরা এই দুই নারীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিব। প্রেমের প্রাবল্য কি বুঝাইতে হইলে আমরা শৈবলিনীর প্রতি নির্দ্দেশ করিব। শৈবলিনী যেমন প্রেমের অদৃষ্টপূর্ব্ব অদমনীয় প্রবলতা প্রকাশ করেন, তেমনি রজনী প্রেমের প্রগাঢ়তা ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করেন। রজনী অপেক্ষা নিডিয়ার সেই গভীরতা সমধিকতর ছিল। নিডিয়ার সেই প্রেমসমুদ্রে কতই তরঙ্গ উঠিত! নিডিয়া এক একবার ভাবিতেন পাছে গ্লকস্ তাঁহার প্রণয় বুঝিতে পারেন, এবং এই ভাবিয়া লজ্জার মরমে মরিয়া যাইতেন। আবার নিডিয়া একএকবার ভাবিতেন আমার এমন প্রণয় গ্লকস্ একদিনের তরেও জানিতে পারিলেন না-এই দুঃখের বিষয়। জানিলেন না কেন বলিয়া তিনি গ্লকসের প্রতি ঈষৎ কুপিত হইতেন। সেই গ্লকস্, আয়নকে ভালবাসেন বলিয় তিনি একএকবার আয়নকে সুনয়নে দেখিতেন; কিন্তু এক একবার সেই জন্যই তিনি তাহাকে যথোচিত ঘৃণা করিতেন। মনে মনে এক একবার তাহার নিধন সাধন করিবেন ইচ্ছা হইত, আবার এক একবার তাহার জন্য প্রাণপাত করিতে ও ইচ্ছা হইত। এই প্রণয়ের গাম্ভীর্য্য ও প্রগাঢ়তা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। গ্লকস্ তাহার অণুমাত্রও জানিতে পারেন নাই। তিনি আয়ন লইয়াই উন্মত্ত, তথাপি নিডিয়া তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন। তাঁহার শরীর পাত হইল, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না; তাঁহার মুখকান্তি বিবর্ণ হইতে লাগিল, তাঁহার পদদ্বয় স্খলিত হইতে লাগিল, দিন দিন অশ্রুধারা অধিকতর বহিতে লাগিল,

আর সে অশ্রুধারা তাঁহাকে শান্ত করিতে পারেনা। *

রজনীর ও প্রেম গোপনে পোষিত। তিনি শচীন্দ্রকে ভালবাসিয়া এই বিপদে পড়িলেন, কেন তিনি শচীন্দ্রকে ভাল বাসিয়াছিলেন। শচীন্দ্র কখনই তাঁহার জন্য নহে। তথাপি তিনি শচীন্দ্রের ভালবাসা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। দিন দিন সেই ভালবাসা বাড়িতে লাগিল। তাহা মরমে প্রবিদ্ধ হইল। সে সোহাগ কাহাকে বলিবার নহে! তজ্জন্য তিনি বিবাসিনী হইয়া গেলেন। এই প্রেম কত দূর প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল বঙ্কিম বাবু একস্থলে তাহার সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। লবঙ্গলতা বলিতেছেন আমি রজনীকে বলিলাম, আমি তোমাকে শচীন্দ্র দান করিব। ইহা শুনিয়া- "রজনী দাঁড়াইয়া ছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল, অন্ধ নয়ন মুদিল। তার পর, তাহার মুদিত নয়ন হইতে অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল—চক্ষের জল আর ফুরায়না। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। রজনী কথা কহে না কেবল কাঁদে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রজনি? অত কাঁদ কেন?

"রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, সেদিন গঙ্গার জলে আমি ডুবে মরিতে গিয়াছিলাম, ডুবিয়াছিলাম লোকে ধরিয়া তুলিল। সে শচীন্দ্রের জন্য। তুমি যদি বলিতে, তুমি অন্ধ তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব—আমি তাহা চাহিতাম না—আমি শচীন্দ্র চাহিতাম * * * * * *। অন্ধের দুঃখের কথা শুনিবে কি?

"আমি রজনীর কাতরতা দেখিয়া কাতর হইয়া বলিলাম' শুনিব।

"তখন রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে, হৃদয় খুলিয়া, আমার কাছে সকল কথা বলিল। শচীন্দ্রের কণ্ঠ, শচীন্দ্রের স্পর্শ, অন্ধের রূপোন্মাদ! তাহার পলায়ন, নিমজ্জন, উদ্ধার সকল বলিল। বলিয়া বলিল, 'ঠাকুরাণি, তোমাদের চক্ষু আছে চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি?"

রজনীর এই প্রেমগভীরতার পরিচয় পাইয়া লবঙ্গলতা মনে মনে নিশ্বাস ফেলিলেন। লবঙ্গ যে গভীরতর প্রণয় হৃদয়ের গভীরতম দেশে প্রচ্ছন্ন করিয়া পুষিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার সেই প্রণয় একবার উথলিয়া পড়িল। কিন্তু লবঙ্গ অমনি তাহা হৃদয়ের গভীর প্রদেশে পুনরায় ঢালিয়া দিলেন। মনে মনে বলিলেন "কাণি! তুই ভালবাসার কি জানিস্! তুমি লবঙ্গলতার অপেক্ষা সহস্র গুণে সুখী।" লবঙ্গলতার এপ্রণয় যে রজনীর প্রণয়াপেক্ষাও গভীরতর ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। এপ্রণয় কেবল প্রতাপের গভীর শৈবলিনী-প্রেমের সহিত তুলনীয়। আর যদি কাহারও সহিত তুলনীয় হয়, তবে এক দিন চন্দ্রশেখরের প্রণয়ের সহিত তুলনীয় হইতে পারে।

* The Last Days of Pompeii, Book III. Chapter IV.

রজনীর এই প্রণয়-অহঙ্কার নিডিয়ায়ও ছিল। নিডিয়া কেবল মনে মনে তাহার স্পর্দ্ধা করিতেন। গ্লকস্ সে প্রণয় জানিতে পারিল না বলিয়া ক্রুদ্ধ হইতেন। রজনীর ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত এই প্রণয়ের অহঙ্কার কেমন শোভনীয় দেখায়! এই অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়াই তিনি ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেন। এই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া একদিন ডেস্‌ডিমোনা জনকেরও মুখ ম্লান করিয়া প্রিয়জনের মান বাড়াইয়াছিলেন।

যে সাহসে ডেস্‌ডিমোনা একদা সর্ব্বসমক্ষে কৃষ্ণকায় মুরকে প্রিয়জন স্বীকার করিয়া পিতৃ-সন্নিধান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, রজনীও একদিন সেই সাহসে অমরনাথের সমক্ষে স্পষ্টই বলিলেন 'অমরনাথ, আপনি যদি সহস্র গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়া থাকেন, তথাপি আপনি আমার কাছে দেবতা। আপনি আমাকে চরণে স্থান দিলেই আমি আপনার দাসী হইব। কিন্তু আমি আপনার, যোগ্য নহি। সেই কথাটি আপনার শুনিতে বাকি আছে।" ইহার পর আর তিনি বলিতে পারিলেন না। লবঙ্গ ঠাকুরাণীর উপর ভার দিলেন। রজনী অমরনাথকে জীবনদাতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন, তাঁহার নিকট সহস্র ঋণে আবদ্ধ ছিলেন। তজ্জন্য তিনি অমরনাথের নিকট আপনাকে বিক্রীত জ্ঞান করিতেন। তাঁহার জন্য প্রাণপাত করিতেও অগ্রসর ছিলেন। কিন্তু যে প্রণয় তিনি শচীন্দ্রকে দিবেন, তাহা তিনি অমরনাথকে দিতে পারেন নাই। অমরনাথ তাঁহার কৃতজ্ঞতার পাত্র, প্রণয়ের পাত্র নহেন। যে ভক্তি জনকের প্রাপ্য, সে ভক্তি ডেস্‌ডিমোনা জনককে দিয়াছিলেন, কিন্তু যে প্রণয় পতির প্রাপ্য, তাহা আর কাহাকেও দিতে পারেন নাই। রজনীও অমরনাথের ঋণ অমরনাথকে পরিশোধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু যে হৃদয় তিনি শচীন্দ্রের জন্য রাখিয়াছিলেন, তাহা শচীন্দ্রকেই দিয়া সুখী হইলেন। অমরনাথ একদিন ডেস্‌ডিমোনার চিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এ চিত্রে ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, নম্রতা সকলই আছে, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত সে সাহস কই? নম্রতার সঙ্গে সে সতীত্বের অহঙ্কার কই?" অমরনাথ স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যে এই সাহস ও এই অহঙ্কার কোন জীবিত ডেস্‌ডিমোনাতে দেখিয়া তাঁহাকে একদিন শিহরিতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীপূ—

আর্য্যজাতির আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক চিকিৎসা প্রণালী।

(পরিশিষ্ট।)

বিষ-তিন্তুক ও অমৃত প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ বিষাক্ত ঔষধ। আধুনিক আয়ুর্বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতেরা এইক্ষণ জানিতে পারিয়াছেন যে এমনিয়া দ্বারা অনেকানেক বিষের ক্ষমতা নষ্ট হয়।

আর্য্যেরা সেই সময়েই গোমূত্রে উক্ত পদার্থের অবস্থিতি দৃষ্টি করিয়া গোমূত্রে অমৃতাদি ও উদ্ভিজ্জ বিষ সমূহ উত্তাপিত করিয়া বিষাক্ত পদার্থ এমোনিয়া দ্বারা ধ্বংশপ্রাপ্ত হইলে ঐ অমৃতাদি মহা মহা বিষ সকল ব্যবহার করিতেন। এইক্ষণ সকলে স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, আধুনিক হোমিওপাথিকেরা যে উদ্দেশ্যে আসব দ্বারা ঔষধের সত্ব বাহির করত ডাইলিউসানের সৃষ্টি করিয়াছেন; আর্য্যেরা সেই কারণেই ঔষধের বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পদার্থ-দ্বারা বিষ সমূহ ধ্বংশ করত পুনর্ব্বার তাহাই আবার অগ্নিদ্বারা বীর্য্য-হীন করিয়া লইতেন। এই কারণে লৌহকে কষায় রস (Tanic Acid) সহযোগে সহস্র পোড় দ্বারা ভস্ম করিয়াছেন, স্বর্ণকে পারদ দ্বারা জলবৎ করিয়া দগ্ধ করত ভস্মসাৎ করিয়াছেন, এবং সীসা ও তাম্রাদি তীক্ষ্ম বিষ অতি আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত ভস্ম করিয়া প্রপীড়িত মুমূর্ষু ব্যক্তির শরীর স্বচ্ছন্দ করিবার জন্য অশেষবিধ কৌশল প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী ও ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য কৌশলের সহিত ভস্ম করিয়া প্রপীড়িত মুমূর্ষু ব্যক্তির শরীর স্বচ্ছন্দ করিবার জন্য অশেষবিধ কৌশল প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের ঔষধ-প্রস্তুত করণ প্রণালী ও ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য যৌগিক গুণ সন্দর্শন করিয়া ভারতবাসীদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি বিমুগ্ধ না হইয়াছেন? যেমন আর্য্যদিগের, বিষম ও জীর্ণ জ্বরে লৌহ, প্লীহায় তাম্র, ধাতুক্ষারে বঙ্গ, বায়ুতে মকরধ্বজ, কাশে অভ্র ও বাসক, এবং সর্ব্বপ্রকার পুরাতন রোগের পরিণামে হরিতাল-ভস্ম, এমত প্রত্যক্ষ-ফল-প্রদায়ী ঔষধ কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ মতাবলম্বীদিগের ঔষধের মধ্যে—আছে?

যদ্যপি কতক গুলি অব্যর্থ-নাম-ধারী ঔষধ কবিরাজ সমাজে না থাকিত তাহাহইলে এত দিবস ভারতবাসীরা আর্য্য চিকিতৎসার নাম মাত্র শুনিতে পাইতেন না। একে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসক দল সাধারণ বিদ্যায় বঞ্চিত এবং আয়ুর্ব্বেদে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, শুদ্ধ দুই পাঁচটী বচন মাত্রেই তাঁহাদিগের

বিদ্যা; তাহাতে আবার ঘোর কুসংস্কারাবৃত ও সাধারণ বিদ্যার দ্বেষক, আয়ুর্ব্বেদের কোন একটী ঔষধের প্রত্যক্ষ ফল জানিতে পারিলে প্রাণান্তেও কাহাকে বিদিত হইতে দিবেন না। সুবিধা হইলে হয়ত অন্তিম সময়ে অস্ফুট স্বরে সন্তানকে শিখাইলেন, নয়ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই উহা বিলীন হইল। এইরূপ বিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের অগণনীয় ঔষধের মধ্যে ঘটনা ক্রমে যদ্যপি কেহ কিছু জানিতে পারেন তাহা তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে; আবার এই চিকিৎসার উপর সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অনিবার্য্য দৌরাত্ম্য চলিয়া আসিতেছে। মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে মূল আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার চুম্বক মাত্র সুশ্রুতাদি যাহা দুই এক খানি দেখা যায়, তাহারও শিক্ষার নিতান্ত অভাব। আবার মহাতেজস্বী এলপাথি ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে। তত্রাপি আর্য্যচিকিৎসা আপন গৌরবের সহিত ভারতবাসীদিগের মধ্যে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

হোমিওপাথি চিকিৎসায় মিশ্র ঔষধ।

হোমিওপাথি চিকিৎসার একটী প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে মিশ্র-ঔষধ-কল্পনা প্রায় দৃষ্ট হয় না। শরীরে যখন কোন পীড়া উপস্থিত হয় তখন একটী যান্ত্রিক কার্য্যের ব্যাঘাত নাহইয়া যুগপৎ অনেক গুলি যন্ত্র একত্রে বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে প্রায় দেখা যায়। এই জন্য রোগের লক্ষণ সকল ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্নপ্রকার বিমিশ্র ও জটিল হইয়া থাকে। কোন ঔষধেই একত্র ঐ সমস্ত অনিষ্ট লক্ষণসকলকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হয়না। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদে রোগবিশেষে ও ধাতুবিশেষে নানাবিধ ঔষধ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে প্রত্যেক ঔষধের যে গুণ, ঔষধ সকল বিমিশ্র হইলে সেই বিমিশ্র ঔষধের গুণ প্রত্যেক মিশ্রিত দ্রব্যের গুণের সমষ্টি হয়না। বস্তু সকলে রাসায়নিক সংযোগ হইলে উহাদিগের গুণের ব্যতিক্রম ঘটে বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই মিশ্রিত দ্রব্যনিচয়ে রাসায়নিক সংযোগ ঘটেনা, সুতরাং ঐরূপ মিশ্র দ্রব্য মিশ্র গুণই উৎপন্ন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ যাহা ঘটনা হয় তাহার উপর নির্ভর করিয়া চলিলে প্রায়ই ঠকিতে হয়না। জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও কল্য মরিলেও মরিতে পারি এইরূপ আশঙ্কা করিয়া যদি আমি ভাবী কালের কোন উপায় না করি তাহা হইলে লোকে কি আমাকে বিজ্ঞ বলিবে? যখন সাধারণতঃ দ্রব্য সকল মিশ্রিত করিলে মিশ্র গুণই উৎপন্ন করে এবং ঐ রূপ গুণ-সম্পন্ন মিশ্র ঔষধ দ্বারা রোগ দূরীকরণের অধিক সম্ভব দেখা যায় তখন সময়ে সময়ে মিশ্র বস্তু নিচয়ের গুণ সম্যক্ পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া মিশ্র ঔষধ ব্যবহার ক-

কার্য্য তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। যুক্তিপূর্ব্বক ঔষধ সকল বিমিশ্র করিয়া ব্যবহার করা অসঙ্গত হইলেও ঔরূপ মিশ্র ঔষধ মানব শরীরে পরীক্ষা করিয়া তাহার পর ব্যবহার করাতেই বা ক্ষতি কি তাহা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকেরাই জানেন। যেমন প্রত্যেক ঔষধ সকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরীক্ষা করতঃ তাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ মিশ্র ঔষধ-নিচয় পরীক্ষা করিয়া পীড়া দমনার্থ প্রয়োগ করিলে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

ফলতঃ যদি হানিমান মতানুযায়ী চিকিৎসকেরা যুক্তিপূর্ব্বক বিমিশ্র ঔষধ সকল যথানুযায়ী মাত্রা নির্ণয় করত তাহাদিগের গুণ পরীক্ষা করিয়া রোগ দূরা করণার্থ প্রয়োগ করেন ও সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ-মতানুযায়ী তৈল, পাঁচন, ও ঘৃতাদি তাঁহাদিগের চিকিৎসা-তন্ত্রে প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা হইলে এই নূতন মতের চিকিৎসা রোগ দূরীকরণের একটি প্রধান উপায় হইয়া অল্প কাল মধ্যেই সর্ব্বস্থানে আদরণীয় হইবে। ভরসা করি এলোপাথি ডাক্তার মহাশয়েরাও হোমিওপাথি ও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য হইতেছে দেখিয়া আপনাদিগের ব্যবহৃত ঔষধের পরিমাণ লাঘব করিবেন। নূতন মতাবলম্বীদিগের প্রতিক্রিয়ায় রোগ আরোগ্য কল্পনা যদি মিথ্যা হয়, রোগের বিপরীত ক্রিয়ার উত্তেজনা দ্বারা যদি রোগ আরোগ্য হয়, তাহা হইলে স্বরূপার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, আয়ুর্ব্বেদ, এলোপাথি ও হোমিওপাথি চিকিৎসার মূলগত কোন প্রভেদ নাই। যখন হোমিওপাথির ঔষধ অন্যতর দ্বিবিধ চিকিৎসা প্রণালীর ন্যায় রোগের বিপরীত ক্রিয়া সংস্থাপন করিয়া রোগ দূর করিতেছে তখন যে ইহা আয়ুর্ব্বেদ ও এলোপাথি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এরূপ বলা ন্যায়-সঙ্গত নহে। মূলে যখন কোন প্রভেদ রহিল না তখন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখার বিভিন্নতার জন্য বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক মনুষ্যের যাতনা নিবারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হওয়া সকলপ্রকার চিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য। নরদেহ-তত্ত্ব করা এবং নিদানে জ্ঞান থাকা ও দ্রব্যগুণজ্ঞ হওয়া চিকিৎসার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সমস্ত তত্ত্ব এত জটিল যে, কোন সময়ে কেহ যে সম্যক্ উহাদিগকে আয়ত্ত করিবেন তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য বুদ্ধি স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ। সত্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া অনেক সময়ে আমরা তাহার এক পিট মাত্র দেখিতে পাই। অন্য অংশ আমাদিগের জ্ঞানচক্ষুর অগোচর থাকে। প্রচীনদিগের অপেক্ষা নব্য দিগের একটী প্রধান সুবিধা এই যে, নব্যেরা নানা দেশের নানাজাতীয় পণ্ডিত দিগের পরিশ্রমের সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। এইরূপ সুবিধার বলে প্রাচীন

মহামহোপাধ্যায় জ্ঞানিগণের মত বিশেষে যেরূপ ভ্রম দৃষ্ট হয়, নব্য দিগের মত সে রূপ ভ্রমাত্মক নহে। আরিষ্টটল্, বেকন, নিউটন, প্রভৃতি জ্ঞানি-গণাগ্রগণ্য মহাত্মাদিগের ন্যায় চিন্তাশীল পুরুষ এখন আর নাই। কিন্তু ইঁহারা যে পরিমাণে সত্য আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকেরা অধিকার করিয়া থাকেন একথা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয়না। বাস্তবিক পক্ষে বিবেচনা করিতে গেলে অবশ্যই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে একক সত্য অনুসন্ধান করা অপেক্ষা প্রখর-বুদ্ধিশালী ভিন্ন-স্বভাবাপন্ন লোকদিগের পরিশ্রমোপার্জ্জিত ফলের সহায়তা গ্রহণ করিতে কৃতকার্য্য হইবার অধিক সম্ভাবনা। এলোপাথিই হউক আয়ুর্ব্বেদই হউক কিম্বা হানিমান-উদ্ভবিত নূতন মতই হউক, কোন মতের চিকিৎসা একেবারে সম্পূর্ণ ও অভ্রান্ত এরূপ আশা করা বৃথা। ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী যে একেবারে সত্য-বিহীন তাহাও নহে। রোগীর যাতনা দূর করিব আয়ুর পরিমাণ বৃদ্ধি করিব ক্ষণভঙ্গুর মানব-জীবনে যথাসাধ্য সুখের সঞ্চার করিব এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া যে চিকিৎসক নিজ অভীষ্ট লাভের উপায় অনুসন্ধান করিবেন তিনি এই ত্রিবিধ চিকিৎসা-প্রণালীতেই উপকৃত হইবেন। অতএব অনর্থক বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া ভিষকৃগণ যদি পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ-পূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে অধিক পরিমাণে রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীহৃদয় নাথ রায়।

অধ্যাপক হক্‌স্‌লির দার্শনিক মত।

জীব-জগৎ * সম্বন্ধে তাঁহার মত।

জীব-জগতে যত আকার ও প্রকার-ভেদ এত জড়-জগতে দৃষ্ট হয় না। ঐ তৃণগুলি দেখ, ঐ পুষ্পটী দেখ, যে পশুটী তৃণ ভক্ষণ করিতেছে তাহাকে দেখ, আর যে তুমি জীবের রাজা হইয়া উচ্চাসন হইতে নিম্ন নয়নে ঐ সকল দেখিতেছ তোমাকে দেখ; দেখিয়া কি তোমার এমন মনে হয়, যে ঐ তৃণ গাছটীতে ও তোমাতে বা তোমাতে ও ঐ পশুতে বা সকল গুলির মধ্যে কোন প্রকৃতি-গত একতা আছে? ঐ যে বালিকাটী কেশে পুষ্প বিন্যস্ত করিতেছে, তোমার কি ইহা বিশ্বাস হয় যে উহার আরক্তিম গণ্ডদেশ ও ঐ পুষ্প একই উপাদানে একই গঠনে গঠিত? কিন্তু তোমার বিশ্বাস হউক বা না হউক, ইহা বৈজ্ঞানিক

* জীব শব্দ, চেতন ও উদ্ভিদ দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইল। কারণ উদ্ভিদ

অধ্যাপক হক্সলি বলেন জীব-জগৎময় তিন প্রকারের সাদৃশ্য লক্ষিত হয় —শক্তির সাদৃশ্য, গঠনের সাদৃশ্য ও উপাদানের সাদৃশ্য।

শক্তির সাদৃশ্য। সর্ব্বোচ্চ জীব মনুষ্যের সমস্ত কার্য্যপ্রণালী তিন প্রকার বিভিন্ন শক্তির অনুযায়ী। এই তিন শক্তির উদ্দেশ্য তিন প্রকার— শরীর পরিপোষণ, শরীরের স্থান বিশেষের অবস্থান পরিবর্ত্তন ও বংশ বৃদ্ধি। মানব যাহা কিছু করুক ঐ তিনটী শক্তির কোন না কোনটীর অনুযায়ী হইয়া ঐ তিনটী উদ্দেশ্যের কোন না কোনটী উদ্দেশ্যের সহায়ে তাহা করিয়া থাকে। বুদ্ধি বৃত্তি, হৃদ্বৃত্তি প্রভৃতি উচ্চবৃত্তি সকলের ক্রিয়া ও পূর্ব্বোক্ত তিনটী শক্তির বহির্ভূত ক্রিয়া নহে। হক্সলি বলেন ঐ গুলি ও শরীরের স্থান বিশেষে (অর্থাৎ মস্তিষ্কে) অংশ সকলের অবস্থান পরিবর্ত্তন হইতে সাধিত হয়। মানবের ক্রিয়াকলাপ যে তিনটী শক্তির অনুযায়ী সেই তিনটী শক্তি চক্ষুর অদৃশ্য কীটে বা সামান্য উদ্ভিদে ও আছে। তাহারা ও বৃদ্ধি পায়, বংশবৃদ্ধি করে। তাহারা ও অবস্থা বিশেষে শরীরের অংশ সকলের আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে সমর্থ।

গঠন ও উপাদান-সাদৃশ্য। যেমন এক একখানি করিয়া কেবল মাত্র ইষ্টকের সমাবেশে কখন একটী কুটীর কখন একটী রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হয়, হক্সলিবলেন সেইরূপ এমন একটী জৈবনিক পদার্থ আছে যাহা সকল জীব-জগতের মূল উপাদান এবং যাহার রূপান্তরতাও বিভিন্ন সমাবেশ হইতে কখন উদ্ভিদ কখন মনুষ্যের উৎপত্তি হইতেছে। উহা কুম্ভকারের মৃত্তিকাস্বরূপ। সেই জৈবনিক পদার্থকে ইংরাজিতে Protoplasm বলে। আমরা তাহাকে জীবাণু বলিলাম। এই জীবাণু গুলির ও জীবন আছে। তাহারাও বৃদ্ধি পায় ও বংশ বৃদ্ধি করে। উদ্ভিদের একটী বীজে অতি অল্পসংখ্যক জীবন্ত জীবাণু থাকে। তাহারা ক্রমে বংশ বৃদ্ধি করিয়া সেই নূতন বংশকে তাহাদের স্থানে রাখিয়া মরিয়া যায়। সেই নূতন বংশ হইতে আবার বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটী বীজ হইতে প্রকাণ্ড একটী বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। ফলতঃ সেই বৃক্ষটী যে জীবাণু-রূপ ইষ্টক সকলের সমাবেশে গঠিত, সেই সমুদয় ইষ্টক মূল গুটিকত জীবাণু হইতে অনুকুল অবস্থায় আপনিই উৎপন্ন হয়। বৃক্ষের বীজ যেরূপ প্রাণীদিগের অণ্ড সেইরূপ। কিন্তু প্রাণীশরীরের পূর্ণতা-প্রাপ্তি অপেক্ষাকৃত জটিল।

এই জীবাণু রূপ উপাদান অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়। অঙ্গুলি হইতে সূচ দিয়া একবিন্দু রক্ত বাহির করিয়া অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখ, দেখিবে অসংখ্য চক্রাকার বস্তু রক্তের মধ্যে ভাসিতেছে। ইহার ভিতর কতক গুলি রক্তবর্ণ, কতক গুলি শুভ্র। এই শুভ্র

চক্রাকার জীবাণু দিগের ক্রিয়া দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। কখন তাহাদের এক ভাগ প্রসারিত, অপরভাগ সঙ্কুচিত; কখন সে ভাগ সঙ্কুচিত ও অপর ভাগ প্রসারিত হইতেছে। এবং এইরূপ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া একবার এদিকে যাইতেছে একবার ও দিকে যাইতেছে। ফলতঃ দেখিলে বোধ হয় যে তাহারা প্রত্যেকে এক একটী প্রাণী।

সকল প্রকার জীবাণুই এক পদার্থ।

অণুবীক্ষণের সাহায্যে ইহা দেখাযায় যে সকল জীবপদার্থই জীবাণু সকলের সমবায়ে গঠিত। এবং অণুবীক্ষণে ইহাও দেখা যায় যে সেই জীবাণুগুলির ও জীবন আছে। সুতরাং ইহা বুঝাযায় যে প্রত্যেক জীব যেমন জীবাণু সকলের সমবায়ে গঠিত, প্রত্যেক জীবের জীবন ও সেই রূপ জীবাণু সকলের জীবনের সংযোগফল। ইহাতে কাহার ও আপত্তি না হইতে পারে। কারণ জীব সকলের জীবন জীবাণু মূল হইতে আকৃষ্ট হইল মাত্র, জীবাণু মূলের উৎপত্তি বিষয়ে কিছু বলা হইল না। পরন্তু বিভিন্ন জীবের জীবাণুতে যে একতা আছে ইহাতে আপত্তি উঠিতে পারে। বৃক্ষের বীজে বা শরীরে যে জীবাণু থাকে বা পশুর ও মানবের শরীরে যে জীবাণু থাকে সে সকল জীবাণু যে একরূপ ইহা সকলে স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন না। অস্বীকারকারিরা বলিবেন মানব ও উদ্ভিদের বা মানব ও একটী কীটের প্রকৃতি-গত এত প্রভেদ যে তাহাদের পরস্পরের জীবাণু সকল এক প্রকারের হওয়া অসম্ভব। সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের জীবাণু ভিন্ন এরূপ বিভিন্ন জীবের উৎপত্তি হইতে পারেনা। কিন্তু অধ্যাপক হক্সলি বলেন যে সকল জীবাণুর মধ্যে যে একত্ব আছে তাহার দুইটী অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে।

১ ম প্রমাণ। সকল প্রকার জীবাণুই একরূপ রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। সকল জীবাণুই অঙ্গার, উদজান, অম্লজান ও যবক্ষার জান এই চারিটী রাসায়নিক রূঢ় পদার্থের এক প্রকার জটিল সম্মিলনে উৎপন্ন। এবং সকল প্রকার জীবাণুই এক রূপ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় একরূপ ফল উৎপাদন করে।

একখণ্ড অঙ্গার ও একখণ্ড হীরককে বৈজ্ঞানিকেরা এক পদার্থ বলেন কেন, না অঙ্গারে ও যে একমাত্র রূঢ় পদার্থ আছে হীরকে ও তাহাই আছে। চাখড়ি, মার্বেল ও চূর্ণোপল প্রভৃতি এক পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হয় কেন, না তাহাদের রাসায়নিক উপাদান সকল এক। সকল গুলিই কার্বনেট্ অব্ লাইম। সেইরূপ যদি সকল প্রকার জীবাণুর রাসায়নিক উপাদান এক হয় তবে সে জীবাণু সকলই বা এক পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হইবেনা কেন?

২ য় প্রমাণ। সকল প্রকার জীবাণু

যে একপদার্থ তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে প্রাণী সকল পরস্পারের বা উদ্ভিদ দিগের জীবাণু লইয়া বর্দ্ধিত হয়। ঐ পশুটি বেড়াইতেছে, উহার জীবাণু সকল এখন উহার জীবন-ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। আমি উহাকে ছেদন করিয়া ভক্ষণ করি, কিছুক্ষণ পরে তাহার জীবাণু সকল রূপান্তরিত হইয়া আমার দেহের অংশ বিশেষে পরিণত হইবে এবং আমার জীবন ক্রিয়া সকল সম্পাদন করিবে। উদ্ভিদ সম্বন্ধে ও ঐরূপ। আমাদের আহার্য্য উদ্ভিদ সকলের জীবাণু সকল পাকক্রিয়া ও রক্ত সঞ্চালন দ্বারা আমাদের দেহের জীবাণুতে পরিণত হয় এবং আমাদের জীবন ক্রিয়া সম্পাদন করে। সুতরাং দেখ একই জীবাণু কখন উদ্ভিদের অবয়বে, কখন পশুদেহে কখন মানব শরীরে অবস্থা বিশেষে নানা স্থানে থাকিয়া নানারূপ কার্য্যকরে।

তবে প্রাণী সকলের জীবাণুতে ও উদ্ভিদের জীবাণুতে প্রভেদ এই যে পূর্ব্বোক্ত গুলি অজৈবনিক পদার্থ হইতে জীবাণুর উৎপাদন করিতে পারে না, শেষোক্ত গুলি তাহা পারে। জল, কার্ব্বনিক এসিড ও এমোনিয়া এই কয়টী পদার্থ থাকিলেই প্রায় সকল উদ্ভিদ জীবন ধারণ করিতে পারে, কেননা তাহাদের জীবাণু নির্ম্মিত হইতে যে কার্ব্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের প্রয়োজন তাহা ঐ সকলে আছে। তাহারা ঐ সকল হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আপনাদের জীবাণু আপনারাই নির্ম্মাণ করে। কিন্তু কোন প্রাণীর সে ক্ষমতা নাই। মনুষ্য বা কোন পশু আপনাদের জীবন ধারণ করিতে অজৈবনিক পদার্থ হইতে উদ্ভিদ দিগের দ্বারা নির্ম্মিত জীবাণুর সাহায্য লইয়া থাকে। উদ্ভিদ বা পশুর জীবাণু মানব আপনার জীবাণুতে পরিণত করিতে পারে। কিন্তু জল, কার্ব্বনিক এসিড বা এমোনিয়া ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করা, অর্থাৎ সে গুলি হইতে আপনার জীবাণু নির্ম্মাণ করা মানবের বা কোন পশুর সাধ্য নাই।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদিগের জীবাণু সম্বন্ধে যে সামান্য প্রভেদ উক্ত হইল উহা কার্য্য সম্বন্ধে, প্রকৃতি সম্বন্ধে নহে। প্রকৃতিতঃ বিভিন্ন পদার্থ হইলে উহাদের রাসায়নিক উপাদান কখন এক হইত না এবং উদ্ভিদের জীবাণু কখন পশু বা মানবের জীবাণু হইতে পারিত না।

জীবাণু সকল জড় পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন।

অধ্যাপক হক্সলি সকল প্রকার জীবাণু যে এক পদার্থ প্রথমে তাহা প্রতিপন্ন করিয়া পরে সেই সকল জীবাণুতে যে জীবন বলিয়া কোন পদার্থ নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে জীবাণু সকল যেন এক পদার্থ হইল, কিন্তু ইহাদের উৎপত্তি কিরূপে হয়?

প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেহ

কেহ বলিয়াছেন যে যেমন পরমাণু সকল অনশ্বর, অপরিবর্ত্তনশীল ও সমস্ত অজৈবনিক জগতের মূল, জীবাণু সকলও সেইরূপ এবং জৈবনিক জগতের মূল। বিবিধ পরমাণু সকলের অসীম প্রকার সংযোগ হইতে যেমন অসীম অজৈবনিক পদার্থের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অসীম প্রকার জীবাণু হইতে এই অনন্ত জীব-জগতের আবির্ভাব হয়।

হক্সলি বলেন যে অধুনাতন বিজ্ঞান এরূপ কথা বলে না। জীবাণু সকল অনশ্বর ও অপরিবর্ত্তনশীল নহে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। আর জীবাণু সকল যে পরমাণু সকলের মত মূল পদার্থ নয় পরন্তু অন্যান্য সাধারণ পদার্থের মত অজৈবনিক পরমাণু পকলের সংযোগ হইতে উৎপন্ন— তবে কেবল সাধারণ পদার্থ সকল হইতে- ইহার পরমাণু সকলের সংযোগ বিভিন্ন রূপের—ইহাও প্রমাণকরা যাইতে পারে।

জীবাণু সকলের নশ্বরতা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। যখন জীবদেহ লয় প্রাপ্ত হয়, তখন মাটীর দেহ মাটীতে মিশাইয়া যায়, পঞ্চভূত পঞ্চভূতে লয় প্রাপ্ত হয় ইহা আমরা বহুকাল হইতে দেখিয়াও শুনিয়া আসিতেছি।

আমাদের প্রত্যেক নিঃশ্বাসে কতক গুলি জীবাণু ক্ষয় হইয়া বাহির হইতেছে। আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে কতক গুলি জীবাণু দগ্ধ হইতেছে। এই সকল দহনের ফল আমাদের নিশ্বাস বায়ুর জলীয় বাষ্প ও কার্ব্বনিক এসিড। এই জল ও কার্ব্বনিক এসিড় আবার উদ্ভিদ দিগের কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া তাহার জীবাণুতে পরিণত হইতেছে। হক্সলি বলেন, আমরা মরি কেন?—আর কতক গুলি জীবের জন্ম হইবে বলিয়া। আমাদের জীবাণু সকল অনবরত দগ্ধ হইতেছে কেন? আমরা অহরহঃ জ্বলিতেছি কেন?—আর কতক গুলি জীব আলোক (জীবন) পাইবে বলিয়া। ফলতঃ জীব-রাজ্য অবিরাম ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া জল, এমোনিয়া এবং কার্ব্বনিক এসিডে পরিণত হইতেছে; উদ্ভিদ রাজ্য সেই গুলি হইতে আবার জীব রাজ্য নির্ম্মাণ করিতেছে। উদ্ভিদ রাজ্য যাহা অবিরাম সঞ্চয় করিতেছে, জীব রাজ্য তাহার অপচয় করিতেছে সুতরাং জীব-রাজ্যের অস্তিত্ব মূলতঃ তিনটী পদার্থের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। সেইতিনটী পদার্থ—[illegible]নিক এসিড, জলও এমোনিয়া। এই তিনটীর- একটী পৃথিবী হইতে দূর কর, সমস্ত জীব রাজ্য বিলুপ্ত হইবে।

জীবাণু সকলে জীবন বলিয়া কিছু নাই।

জীবাণু সকল অজৈবনিক পরমাণু সকলের, সংযোগে উৎপন্ন হয় স্থির হইল, কিন্তু জীবাণু সকলের জীবনী শক্তি কোথা হইতে আসে? উপাদান পরমাণু সকলের সংযোগের সময় কি কোন

জীবনী শক্তি প্রবেশ করে?

কার্বণ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন কয়টাই জড় পদার্থ। পরিমাণ বিশেষেও অবস্থা বিশেষে কার্ব্বণ ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া কার্ব্বনিক এসিড উৎপাদন করে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, জল; এবং নাই ট্রেজেন ও হাইড্রোজেন, এমোনিয়া উৎপাদন করে। এই যৌগিক পদার্থ ত্রয় ও তাহাদের উপাদান রূঢ় পদার্থ গুলির মত জড় পদার্থ। কিন্তু এই যৌগিক পদার্থ ত্রয় হইতে অবস্থা বিশেষে এমন একটী পদার্থ উৎপন্ন হয় যাহাতে জীবনী শক্তি লক্ষিত হয়।

যখন হাইড্রেজেন ও অক্সিজেন পরিমাণ বিশেষে মিশ্রিত হয় এবং সেই মিশ্রণের অভ্যন্তর দিয়া একটী তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ নির্গত করা যায়, উক্ত দুইটী বাষ্প বিলুপ্ত হয় এবং তাহাদের উভয়ের যত টুকু ওজন সেই ওজনে জল তাহাদের স্থানে আবির্ভূত হয়। এই জল ১০০ ডিগ্রি তাপক্রমে রাখ, বাষ্পাকার ধারণ করিবে; সাধারণ তাপক্রমে রাখ, জলের আকার ধারণ করিবে; ০ডিগ্রি তাপক্রমে আনয়ন কর জল বরফ হইয়া যাইবে। এই ক্রিয়া গুলিকে আমরা জলের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলি। এই জলীয় ধর্ম্ম কোথা হইতে আইসে?

জলের উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে উহা ছিল না। তাই বলিয়া কেহ কি এমন বলিয়া থাকেন যে, যে মুহূর্ত্তে তড়িৎস্ফুলিঙ্গ ঐ উপাদান দুইটীর সংযোগ সাধন করিল সেই মুহূর্ত্তে জলীয় ধর্ম্ম নামক কিছু ঐ সংযোগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সেই যৌগিক পদার্থের উপর আপন অধিকার বিস্তার করিল? এ অসম্বদ্ধ কথা কাহার ও মুখ হইতে বাহির হয় না।

তবে যখন কার্ব্বনিক এসিড, জল এবং এমোনিয়ার সংযোগে ঐ তিনটী পদার্থ বিলুপ্ত হইয়া সমানওজনের জীবাণুর আবির্ভাব হয়, তখন কেন বলিবে যে তাহাদের আণবিক সংযোগের সময় জীবনী শক্তি বলিয়া কিছু সঞ্চারিত হইয়াছে? জলের শক্তি ও কার্য্য সকল যদি জলের ধর্ম্ম বলিয়া 'জলীয় ধর্ম্ম কোথা হইতে আইসে?' সে প্রশ্ন মীমাংসিত হয়, জীবনী শক্তি জীবাণুর ধর্ম্ম বলিয়া 'জীবনী শক্তি কোথা হইতে আইসে?" এপ্রশ্নও কেন না মীমাংসিত হইবে?

তুমি বলিতে পার যে জীবাণুর শক্তির সহিত উহার উপাদান সকলের শক্তির কোন সাদৃশ্য নাই। কিন্তু জলের শক্তির সহিত অর্থাৎ জলীয় ধর্ম্মের সহিত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের কি সাদৃশ্য আছে? সুতরাং জলীয় ধর্ম্মের যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত না হয় জীবনী শক্তির কেন হইবে? যদি জলের তরল, বাষ্পীয় ও কঠিন অবস্থা উহার ধর্ম্মানুসারে সংঘটিত হয়, জীবাণুর ক্রিয়া কলাপ সকল তাহার ধর্ম্মানুসারে কেন না হইবে? আমরা যদি জলের অবস্থা পরিবর্ত্তন ও অন্যান্য

শক্তি তাহার উপাদান অণু সকলের অবস্থান বিশেষের ফল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, জীবাণুর জীবনীশক্তি সকল ও তাহার আণবিক অবস্থানের ফল বলিয়া কেন না স্বীকার করিব?

ফলতঃ হক্সলির মতে জীব-জগৎ জড়-জগৎহইতে নির্ম্মিত এবং জীব জগতের জীবনীশক্তি জড় পরমাণুর সংযোগ বিশেষের ফল ভিন্ন আর কিছু নহে।

দার্শনিক মত।

জীব-জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্তকরিয়া অধ্যাপক হক্সলি বলিয়াছিলেন আমি যে মত ব্যক্ত করিয়াছি ইহা 'অনেকের নিকট ঘৃণিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে, ইহার বিরুদ্ধে অনেক কথা উঠিবে এবং আমিও বোধ হয় জড়বাদী বলিয়া পরিগণিত হইব। বস্তুতঃ আমি যাহা ব্যক্ত করিয়াছি উহা স্পষ্ট জড়বাদের ভাষা। কিন্তু আমি এ দুইটী কথাই নিশ্চিত বলিয়া জানি—এক, আমি যে মত ব্যক্ত করিয়াছি উহা সত্য; অপর, আমি জড়বাদী নহি ইহাও সত্য।'

তিনি বলেন বর্ত্তমান শারীর বিদ্যার গতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে আত্মা ও ইচ্ছা, পদার্থ ও নিয়মের কবলে গ্রাসিত হইতেছে। যেখানে পূর্ব্বে জড় পদার্থের অভ্যন্তরে আত্মা প্রবিষ্ট হইয়া সেই জড় পদার্থকে চালাইত ও জীবনী শক্তির উৎপাদন করিত, সেখানে এখন কেবল জড় পদার্থের আণবিক সংস্থান ও তাহার ফল হইতেই সেই জীবন উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পদার্থ ও নিয়মের অধিকার ক্রমে এত বিস্তৃত হইতেছে যে কালে জ্ঞান, অনুভূতি ও ক্রিয়া সকল ও উহাদের অধীনে আসিবে, অর্থাৎ বাহ্য জগতে উহাদের কার্য্য সম্যক অনুভূত হইলে অন্তর্জগতে ও সেই কার্য্যের উপলব্ধি হইবে।

হক্সলি বলেন "এই চিন্তা অনেক সদাশয় ব্যক্তির হৃদয়াকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছে। তাঁহারা অহর্নিশি ইহা ভাবিতেছেন, তাঁহারা নিদ্রাবস্থায় ও ইহা পাষাণবৎ তাঁহাদের বক্ষস্থলে স্থাপিত দেখেন। পদার্থের স্রোত প্রবল বেগে তাঁহাদের আত্মা গ্রাস করিতে আসিতেছে, নিয়ম তাঁহাদের স্বাধীনতার চরণে কঠিন নিগড় বাঁধিতে আসিতেছে, তাঁহারা এই সকল দেখিতেছেন অথচ সম্মুখ বিপদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে অক্ষম বোধ করিয়া যেন ক্রোধে জ্বলিয়া দুর্নিবার্য্য ললাট লিখনের অপেক্ষা করিতেছেন।

"তাঁহাদের এই দশা দেখিয়া দুঃখ হয়। তাঁহাদিগকে বলিতে ইচ্ছা করে যে দেখ তোমরা পৌত্তলিক্ দিগের অপেক্ষা ও নির্ব্বোধ। পৌত্তলিকেরা একটী পুত্তলি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই সম্মুখে জানু পাতিয়া ভয়ে কাঁপিয়া থাকে। তোমরা ও একটী বস্তুর পদার্থ নাম দিয়া, পদার্থ নামে পুত্তলিটী স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া, পাছে সে তোমাদিগকে গ্রাস

করে এই ভয়ে কম্পমান হইতেছ? এ কি উপহাসের কথা, লজ্জার কথা নয়?"

তিনি বলেন বস্তুতঃ যে পদার্থ হইতে এত ভয় সে পদার্থ কি? পদার্থ সম্বন্ধে আমরা কিছুই নিশ্চয় জানিনা। এই পুস্তক খানি একটী পদার্থ, ইহা আমার চক্ষুর সম্মুখে অবস্থিত হইয়া আমার যে একপ্রকার চেতনার অবস্থা (state of consciousness) উৎপাদন করে সেই চেতনার অবস্থা জানাইবার জন্য উহার পুস্তক নাম আমরাই দিয়াছি। তদ্ভিন্ন সে নামে ঐ বস্তুর আর কোন বিশেষ উপলব্ধি হয় না, নামের সহিত বস্তুর কোন গুঢ় সম্বন্ধ নাই। সেইরূপ অন্যান্য পদার্থের নামেও কেবল আমাদের চেতনার অন্যান্য অবস্থা বুঝায় এই মাত্র। আবার দেখ বাহ্য জগতে ও যেমন অন্তর্জগতে ও সেইরূপ। ভাল বাসা, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি অন্তর্জ্জগতের ব্যাপার। কিন্তু সে নাম গুলিও কেবল কতক গুলি চেতনার অবস্থা সূচিত করে মাত্র। সে সকল চেতনার অবস্থার সহিত ঐ নাম গুলির কোন গুঢ় সম্বন্ধ নাই।

সুতরাং পদার্থ ও আত্মা উভয়ই চেতনার অবস্থা সকল সূচনা করিবার সঙ্কেত মাত্র। সঙ্কেত দ্বারা যাহা সূচিত হয় তাহার বাস্তব অস্তিত্ব থাকিতে পারে কিন্তু সঙ্কেতের কোন অস্তিত্ব নাই। গণিতে ১,২ সংখ্যা বা x ও y দুই প্রকার সঙ্কেত দ্বারাই বস্তু সকল সূচিত হয়। কিন্তু ১,২ বা x ও y এর যে কোন অস্তিত্ব আছে ইহা মনে করে এমন নির্ব্বোধ কেহই নাই। গণিতে কখন কখন ১,২ সংখ্যা অপেক্ষা x,y সঙ্কেতে অঙ্ক কসিতে অপেক্ষাকৃত সুবিধা বোধ হয়। পদার্থ ও আত্মা এই দুই প্রকারের সঙ্কেতের মধ্যে পদার্থ প্রকারের সঙ্কেত মানবজ্ঞানের পক্ষে মঙ্গল কর বলিয়া ঐ সঙ্কেতই ব্যবহার করা সকলের উচিত। ইহাতে প্রাকৃতিক নিয়ম সকল সহজে আমাদের করাশত্ত হয়। চিন্তারাজ্যকে বিশ্বরাজ্যের সহিত সংযুক্ত করে, বহির্জগতের কোন্ কোন্ অবস্থায় অন্তর্জগতের কোন্ কোন্ অবস্থা সংঘটিত হয় তাহার অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিকরে; এবং বহির্জগতের মত অন্তর্জগৎ ও যে সকল নিয়মে চালিত হয় সেই সকল নিয়ম আমাদের করায়ত্ত করিয়া বহির্জগতের উপরও সেইরূপ প্রভুত্ব স্থাপনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

যতক্ষণ সে সঙ্কেত কেবল সঙ্কেত বলিয়াই বিবেচিত হয়, তাহাকেই যথার্থ বস্তু বলিয়া বোধ না হয় ততক্ষণ ইহার ব্যবহারে কোন অনিষ্ট নাই; পরন্তু তাহাতে মানবের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইবে। এই উপকারিতা হেতুই জড়বাদীর পরিভাষা ব্যবহার করা শ্রেয়স্কর। নতুবা আত্মা সম্বন্ধীয় ব্যাপার সকল পদার্থ প্রকারের সঙ্কেতে ব্যক্তকর আর পদার্থ সম্বন্ধীয় ব্যাপার সকল আত্মা সম্বন্ধীয় সঙ্কেতে ব্যক্ত কর উভয়েই কোন আপত্তি নাই। পদার্থকে চিন্তার আকৃতি

স্বরূপ বলিয়া মনে কর আর চিন্তাকে পদার্থের ধর্ম্ম বা প্রকৃতি স্বরূপ মনে কর কিছুতেই ক্ষতি নাই, কারণ উভয়ই সত্য।

হক্স্‌লি এই অর্থেই বলেন "আমি জড়বাদীর পরিভাষা ব্যবহার করি বটে কিন্তু আমি জড়বাদী নহি। আমার পরিচিত কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তির সহিত আমিও জড়বাদীর পরিভাষা গ্রহণ করিয়া জড়বাদীর দর্শন প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইয়াছি। এবং যদি কেহ এই জড়বাদ দর্শন হইতে উদ্ধার হইবার ইচ্ছা করেন আমি তাঁহাকে সাহস পূর্ব্বক উহার অভ্যন্তরে ঝাঁপ দিতে অনুরোধ করি, উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে উহা হইতে উদ্ধার পাইবার বল আপনিই প্রাপ্ত হইবেন। আর ইহাও বুলি যে জড় বাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া তাহা হইতে উদ্ধার হইবার অপর পথ নাই।"

বস্তুতঃ দেখিতে গেলে যিনি বহির্জগৎ ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না যিনি অন্তর্জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তিনিই জড়বাদী। হক্স্‌লি অন্তর্জগৎ অস্বীকার করা দূরে থাকুক তিনি উহার অস্তিত্ব মূল ধরিয়াই বহির্জ্জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, ইহা বলেন। তাই বলিয়া যে তিনি বিশপ বার্কলি প্রভৃতির ন্যায় কল্পনা বাদী তাহা (Idealist) নহেন। তিনি অন্তর্জগৎই সর্ব্বস্ব বলেন না। তিনি বহির্জ্জগতের অস্তিত্ব যে শুদ্ধ আমাদের কল্পনায় বিদ্যমান তদ্ভিন্ন তাহার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই তাহা বলেন না। তবে তিনি ইহা বলেন যে বহির্জ্জগতের বাস্তব জ্ঞান আমাদের নাই। এবং আমাদের কোন জ্ঞানই বাস্তব অর্থাৎ নিরপেক্ষ (absolute) নহে, সকলই সাপেক্ষ (relative)। অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়াদির শক্তির উপর আমাদের জ্ঞান নির্ভর করে। সেই সকল শক্তি পরিবর্ত্তিত হউক আমাদের জ্ঞান ও পরিবর্ত্তিত হইবে। চক্ষুর উপর এক খানি কাচ দিলে বস্তু সকল বড় দেখায়, যদি আমাদিগের কোন শারীরিক গঠন সেই কাচের স্থানীয় হইত, তাহা হইলে আমরা বস্তু সকলের এখন যেরূপ আয়তন দেখি তাহা অপেক্ষা বৃহৎ আয়তন দেখিতাম। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তনেও যে বস্তু সকলের জ্ঞান পরিবর্ত্তিত হয় তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। আবার আমাদের যে কয়টী ইন্দ্রিয় আছে তাহা অপেক্ষা আরও ইন্দ্রিয় থাকিতে পারিত। তাহা হইলে এখন আমাদের বস্তুসম্বন্ধে যে সকল জ্ঞান আছে তাহা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান হইত।

বস্তু সকলের ধ্রুব বা নিরপেক্ষ জ্ঞান যে আমাদের কেবল নাই তাহা নহে। সে জ্ঞান পাইবারও আমাদের শক্তি নাই। বস্তুসকল সম্বন্ধে যেরূপ, কার্য্য কারণ সম্বন্ধেও সেইরূপ আমাদের কোন নিত্য জ্ঞান নাই এবং পাইবারও সম্ভাবনা নাই।

হক্সলি বলেন এই গুলি হৃদয়ঙ্গম হইলেই সকলে একথা বুঝিতে পারিবেন যে দার্শনিক অনুসন্ধিৎসার সীমা (Litmit to philosophical enquiry) আছে। এই সীমার অতীত বিষয় লইয়া যিনি আলোচনা করেন তিনি তাঁহার শক্তিও সময়ের অপচয় করেন।

হিউম উক্ত মতের পোষকতা করেন। তিনি বলেন "যদি একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রের পুস্তক তোমার হস্তে পড়ে, মনে মনে প্রশ্ন করিবে, ইহা আমাকে কি শিখাইতে পারে? ইহাতে কি সংখ্যা ও রাশি সম্বন্ধে গণিতবিষয়ক কোন যুক্তি আছে?—না। অথবা ইহাতে কি জগতের ঘটনাবলি ও বস্তু বা জীবন সম্বন্ধে কোন পরীক্ষণ-লব্ধ সত্য আছে?—না। তবে উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ কর, উহাতে মিথ্যা তর্কজাল (sophistry) ও বিভ্রম ভিন্ন আর কিছুই থাকিতে পারে না।"

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সকল হইতে হক্সলি এই শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন— "সে সকল বিষয়ের জন্য কেন ব্যস্ত হও, যে সকল বিষয়—যতই কেন প্রয়োজনীয় হউকনা—আমরা কিছুই জানি না এবং জানিতে পারি না? আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি ইহাতে অজ্ঞতাও দুঃখ বিস্তর, ইহা সকলেই জানি। এবং ইহা সহজেই বুঝা যায় যে এই পৃথিবীতে জন্মিয়া যদি ইহার কণামাত্র অংশ হইতে কিয়ৎ মাত্র অজ্ঞতা ও দুঃখ দূর করিতে পারি তাহা হইলেই জীবন সার্থক—এবং প্রত্যেক মানবের তাহাই কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সাধনে দুইটী বিশ্বাসের প্রয়োজন। প্রথম, যে প্রকৃতির নিয়ম সকল আমাদিগের শক্তিতে আয়ত্ত হইতে পারে; দ্বিতীয়, যে আমাদিগের ইচ্ছা প্রকৃতির ঘটনা-স্রোত পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। ভূয়োদর্শনে আমরা জানি যে উক্ত দুইটী বিশ্বাসই সত্য ও প্রমাণ-মূলক।"

শ্রীমঃ

চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী।

বালক যেমন উদ্যানে প্রবেশ করিলে কি পক্ক কি সুপক্ক সকল ফলই সমান আগ্রহের সহিত উৎপাটন ও ভক্ষণ করে, সেই প্রকার সাধারণ পাঠক গ্রন্থ-গত সৌন্দর্য্য, হিতোপদেশ ও কদুপদেশ সকলই সমানভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। অধিকাংশ পাঠকই সুরুচি- সম্পন্ন নহেন, অধিকাংশ পাঠকই কাব্যের দোষ গুণ বিচারে অক্ষম, অতএব অধিকাংশ লোকে যে সকল পুস্তক যত্ন ও উৎসাহ সহকারে পাঠ করে, সেই সকল পুস্তকেরই সমালোচনার প্রকৃত প্রয়োজন। এই জন্য আর্য্যদর্শনে সময়ে সময়ে সুপ্রসিদ্ধ কাব্যের বিস্তৃত সমালোচনা হইয়া থাকে।

এই জন্যই পূর্ণ বাবু "কপালকুণ্ডলা ও শৈবলিনী চরিত্র সমালোচনে" যত্নশীল হইয়াছিলেন। তাঁহার শৈবলিনী সমালোচনায় অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ চক্রবর্ত্তী আশ্বিন মাসের আর্য্যদর্শনে এক সুদীর্ঘ প্রতিবাদ প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের গৌরব, কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের গূঢ় সৌন্দর্য্য, পূর্ণবাবু অনেক পরিমাণে দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি দুঃখিনী শৈবলিনীর প্রতি বড় অত্যাচার করিয়াছেন। শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার নির্দ্দয় ব্যবহারই আমার লেখনী ধারণের কারণ। শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার ব্যবহারে আমরা বাস্তবিক অন্তরে ব্যথিত হইয়াছি। লোকধর্ম্মানুরাগের প্রাবল্যে প্রতাপময়-জীবিতা শৈবলিনীকে স্বামিগৃহ পরিত্যাগ জন্য ভর্ৎসনা করিয়াছেন; শৈবলিনীকে গ্রহণ করেন নাই। পূর্ণ বাবু বোধ হয় কঠোরতর লোকধর্ম্ম নীতির দাস, তাই শৈবলিনীর প্রতি এত কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়াছেন"। যাহা কিছু কটুকাটব্য তাহা বিবৃত শৈবলিনী সমালোচনার নিম্নোদ্ধৃত এই দশ ছত্র মধ্যেই দ্রষ্টব্য।

"পূর্ব্বেই শৈবলিনী সমাজের অতি পবিত্র নিয়ম ভঙ্গ করিয়া এরূপ কলুষিত ভাবে আমাদিগের কল্পনাকে অধিকার করিয়াছেন যে সে অপবিত্র সংস্কার কিছুতেই অপনীত হয় না। শৈবলিনীতে আমরা একটী কুলটা রমণীর চিত্র এরূপ উজ্জ্বল বর্ণে দর্শন করি যে, তাঁহার সাধুভাবের সংস্কার আমাদিগের মনে তত প্রতীত হয় না। শৈবলিনীর ন্যায় কোন রমণীর চিত্র আমাদের তরুণী-গণের সমক্ষে ধরিতে আমরা সাহসী হইনা।"

এই কয়েক পংক্তির মধ্যে কুলটা শব্দটা অবশ্যই কটু, কিন্তু পূর্ণ বাবু কি করিবেন তিনি সত্যের অনুরোধে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে ভ্রষ্টাকে কুলটা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে রমণী গৃহ ত্যাগ, স্বামী-ত্যাগ করিয়া প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া অন্য পুরুষের অনুসরণ করে, তাহাকে কে না কুলটা বলিবে? শৈবলিনী নিজেই আপনাকে ভ্রষ্টা বলিয়া জানিত। এই শুনুন—সে প্রণয়পাত্র প্রতাপ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া পুনর্ব্বার আপনার দেবোপম পতির চরণে পড়িয়া কি বলিতেছে শুনুন "মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল। এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে? কেন বিশ্বাস করিবে? যে ভ্রষ্টা হইয়া স্বামী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার আবার স্বামী দেখিবার সাধ কি?" যদি শৈবলিনীর হৃদয় বিশুদ্ধ হইত যদি তাহার প্রণয় সম্ভোগ-বাসনাশূন্য পবিত্র হইত, তাহা হইলে সে কখনই আপনাকে ভ্রষ্টা বলিয়া মনে করিত না এবং পূর্ণ বাবুও তাহাকে কুলটা বলিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু তাহার প্রণয় উচ্চ নহে, পবিত্র নহে। ইতর-বাসনাজাত সামান্য। শৈবলিনী যখন জানিতে পারিল যে প্রতা

পের সহিত তাহার জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ—তাঁহার সহিত বিবাহ হওয়া অসম্ভব, তখন সে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল; কিন্তু যৌবনের প্রবলা তৃষ্ণা অতৃপ্ত ছিল বলিয়া মরিতে পারিল না "ভাবিল কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে?" ঘরে ফিরিয়া আসিল, আসিয়া চন্দ্রশেখর শর্ম্মাকে দেখিল। চন্দ্রশেখর তখন সম্পূর্ণ যুবা পুরুষ দ্বাত্রিংশৎ বৎসর মাত্র বয়েস। "তাঁহার আকার দীর্ঘ, তদুপযোগী বলিষ্ঠ গঠন"। চন্দ্রশেখর তাহাকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করিলেন, তাহার জননী তাহাতে সম্মত হইল, শৈবলিনীও দ্বিরুক্তি করিল না—তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। শৈবলিনী অবশ্যই ভাবিয়াছিল যে চন্দ্রশেখরের সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব, নতুবা সে যে প্রকার প্রকৃতির মেয়ে, কদাচ বিবাহে সম্মত হইত না। যে প্রথম প্রণয়ে বাধা পাইয়া ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, "সৌন্দর্য্যের যোলকলা" প্রকটন করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে সন্তরণে গঙ্গাপার হইয়াছিল, যাহার ন্যায় নির্ভীকা, নির্লজ্জা, তেজস্বিনী রমণী প্রকৃত জীবনে দুর্ল্লভ, কাব্যেও বিরল-প্রাপ্য—সে কি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহে সম্মত হইয়াছিল? কখনই নহে। তাহার নিজের ইচ্ছা না থাকিলে কখনই সে বিবাহে সম্মত হইত না। শৈবলিনী চন্দ্রশেখর সহ মিলনে সুখের আশা করিয়াছিল তাই বিবাহে সম্মত হইয়াছিল। সুখিনীও হইতে পারিত, পারে নাই কেবল তার প্রবৃত্তির দোষে—তার স্বভাব ও চরিত্রের দোষে। চন্দ্রশেখর তাহাকে প্রাণ হইতেও প্রিয়তরা জ্ঞান করিতেন, স্নেহ করিবার, ভালবাসিবার শৈবলিনী ভিন্ন সংসারে তাঁহার আর কেহই ছিল না। তাঁহার মত সদাশয়, সুধার্ম্মিক জগতে দুর্ল্লভ—তাঁহার মত পতি পাইলে কোন্ শান্তশীলা ভদ্রমহিলা আপনাকে সুখিনী ও সৌভাগ্যশালিনী জ্ঞান না করে; কিন্তু শৈবলিনী তাহা করে নাই। চন্দ্রশেখরের চিন্তাশীল গম্ভীর স্বভাব তাহার ভাল লাগিত না, তাঁহার বিদ্যানুরাগ পাপিষ্ঠার বিষতুল্য বোধ হইত—সে যে আশায় চন্দ্রশেখরকে বিবাহ করিয়াছিল সে আশা তাহার চরিতার্থ হয় নাই। চন্দ্রশেখর যদি মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া পশুত্ব অবলম্বন করিতে পারিতেন—যদি তিনি উচ্চ চিন্তা ও শাস্ত্রালোচনায় জলাঞ্জলি দিয়া অহর্নিশি তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুকে কালাতিপাত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে শৈবলিনী নিশ্চয়ই আপনাকে সুখিনী বলিয়া বোধ করিত এবং তাহা হইলে বোধ হয় তাহার বালবন্ধু প্রাণতুল্য প্রতাপকে নিকটে দেখিলেও আর চিনিতে পারিত না। আমাদের এই কথার পরিপোষণার্থ "চন্দ্রশেখর" হইতে একটি দৃশ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিলাম। ফষ্টরের নৌকায় নাপিতানী-বেশধারিণী সুন্দরী ঠাকুরঝির সহিত শৈবলিনীর কি কথোপকথন হইতেছে পাঠক শ্রবণ করুন।

"শৈ।—আমি ঘরে ফিরিয়া গিয়া কি প্রকারে মুখ দেখাইব?

সুন্দরী। যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—সেত আর কিছুতেই ফিরিবে না। কিছুক্লেশ চিরকালই ভোগ করিতে হইবে। তথাপি আপনার ঘরে থাকিবে।

শৈ। কি সুখে? কোন্ সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য, ঘরে ফিরিয়া যাইব? ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু।

সু। কেন স্বামী? এ নারী-জন্ম আর কাহার জন্য?

শৈ। সবত জান—

সু। জানি। জানি যে পৃথিবীতে যত পাপী আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠ কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মনউঠে না, কি না, বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে জানেন না, কি না, বিধাতা তাঁকে সং গড়িয়া রাঙ্গতা দিয়া সাজান নাই—মানুষ গড়িয়াছেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত; তুমি পাপিষ্ঠা; তাঁহাকে তোমার মনে ধরিবে কেন? তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝিতে পার না, যে তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভাল বাসেন, নারী-জন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ—অনেক পুণ্যফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়েছিলে——"

অপিচ প্রতাপ কর্তৃক তিরস্কৃত ও পরিত্যক্ত হইয়া অনুতাপিনী শৈবলিনী স্বগত কি বলিতেছে তাহাও শুনুন্——

"—আর তিনি যিনি আমার স্বামী—তাঁহাকে কি বলিয়া মরিব? কথা ত মনে করিতে পারি না। মনে করিলে বোধ হয়, আমাকে শত সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করে—শিরায় শিরায় আগুণ জ্বলে। আমি তাঁহার যোগ্যা নহি, বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাতে কি তাঁর কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন? না,—আমি তাঁহার কেহ নহি। পুঁতিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না——"

স্বপত্নী পুঁতিই শৈবলিনীর সুখের পথে কণ্টক হইয়াছিল, পাপ পুঁতির জন্যই তাহার যৌবনের প্রবলা তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয় নাই, এবং কেবল পুঁতির জ্বালায় তাহাকে গৃহত্যাগ, কুলত্যাগ ও স্বামীত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যদি প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর প্রণয় বিশুদ্ধ হইত, যদি সে প্রতাপের সুখে সুখিনী, প্রতাপের দুঃখে দুঃখিনী হইয়া, কায়মনে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া, তাঁহাকে দেখিয়া মাত্র সন্তুষ্ট থাকিতে পারিত, তাহা হইলে কাহার সাধ্য কে তাহাকে কুলটা বলে? কিন্তু তাহা সে পারে নাই। সে প্রতাপকে পাইবার জন্য—পাপমূল্যে প্রতাপের নিকট দেহ বিক্রয় করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল। পাঠক নিম্নোদ্ধৃত কএক পংক্তি পাঠ করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ পাইবেন।

"প্রতাপ বলিলেন, তুমি পাপিষ্ঠ,

তাই তোমায় গালি দিই। আমার দোষ? ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্পিণী মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ, তোমার প্রবৃত্তির দোষ। তুমি পাপিষ্ঠা আমায় দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?"

শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—বলিল, "তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবতা মূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কালে, ও রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম, ত তোমাকে পাইলাম না কেন? তুমি কি জান না তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না, যে তোমার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি?"

শৈবলিনীর দুশ্চরিত জন্য আমরা শৈবলিনী চিত্রের দোষ দিই না, কারণ কাব্যে সুচরিত্র ও কুচরিত্র উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে—ঔজ্জ্বল্য ও মালিন্য না থাকিলে চিত্রপট প্রকৃতবৎ বোধ হয় না। অন্ধকার না থাকিলে আলোকের উপযোগিতা তত বুঝিতে পারিতাম না এবং অধর্ম্ম না থাকিলে ধর্ম্মের গৌরবও আমরা তত অনুভব করিতাম না। ইয়াগো কল্পিত না হইলে ওথেলোর সৃষ্টি হইত না। রাবণ, রাবণ রূপে কল্পিত না হইলে, রাম রাবণে বিগ্রহ ঘটিত না। পৃথিবীর অদ্বিতীয় কাব্য রামায়ণ জন্মিত না, এবং যে রাম নামের আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালে আজি সহস্র বৎসর সমস্ত ভারত মোহিত হইয়া আছে সেই অশেষগুণালঙ্কৃত রামচন্দ্রকেও কেহ চিনিত না। লেডি ম্যাকবেথ্ না থাকিলে ম্যাক্‌বেথ কি? দুর্য্যোধন না থাকিলে মহাভারত কি? এবং সয়তানের সৃষ্টিতেই মিলটন্ মহা কবি। কিন্তু রাবণের সহিত কাহার সহানুভূতি হয়, দুর্য্যোধনের সহিত কাহার সহানুভূতি হয়, সয়তানের সহিত কাহার সহানুভূতি হয়? ইয়াগোকে কে না ঘৃণা করে, ম্যাক্‌বেথ্-মহিলাকে কে না ঘৃণা করে? প্রত্যুত শৈবলিনীর কুচরিত্র এরূপ প্রলোভনবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে যে তাহার পাপকার্য্যের সহিত পাঠকের সহানুভূতি জন্মে এবং সেই সহানুভূতি জন্মে বলিয়াই সে চরিত আলোচনায় কুফল আছে বলিয়াই পূর্ণ বাবু বলিয়াছেন যে "শৈবলিনীর ন্যায় কোন চিত্র আমাদিগের তরুণীগণের সমক্ষে ধরিতে আমরা সাহস করি না"। লোকনাথ বাবু বলেন "শৈবলিনী রমণীরত্ন, শৈবলিনী প্রেমপুত্তলী,

শৈবলিনী উচ্চহৃদয়া। তিনি যদি উচ্চহৃদয়া না হইবেন, তবে ভালবাসিতে না পরিয়া যে চন্দ্রশেখরকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তাঁহার গৃহ ত্যাগে তাঁহার অভাবে অসুখী হইয়াছেন মনে করিয়া সেই চন্দ্রশেখরের জন্য দুঃখ করিবেন কেন?" শৈবলিনী দুঃখ করিয়াছিল। কখন? যখন প্রতাপ তাঁহার প্রবৃত্তির দোষ দেখাইয়া, তিরস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রতাপ তাহাকে উপপত্নীত্বে গ্রহণ করিলে কখনই সে অনুতাপ করিত না। ইহাতে শৈবলিনীর উচ্চহৃদয়তার কি পরিচয় পাইলাম? উচ্চহৃদয় তাঁহার, যিনি প্রবল চিন্তাবেগ দমন করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন। উচ্চ-হৃদয় তাঁহার, যিনি আপনার সুখ উপেক্ষা করিয়া অপরের দুঃখ বিমোচনে যত্নবান্ হন। উচ্চ-হৃদয় তাঁহার, যাঁহার দয়া আছে, ধর্ম্ম আছে, উদারতা আছে এবং যিনি ঘোর অনিষ্টকারী পরম শত্রুকেও ক্ষমা করিতে পারেন। উচ্চ-হৃদয় প্রতাপের, উচ্চ-হৃদয় চন্দ্রশেখরের, উচ্চ হৃদয় দলনীর, উচ্চ-হৃদয় শৈবলিনীর নহে——সে তার নীচ প্রবৃত্তির দাসী। প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, দলনী কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এপ্রকার সৌন্দর্য্য-পূর্ণ, ধর্ম্মভাব-উদ্দীপক আশ্চর্য্য চরিত্র-কল্পনা আমরা অতি অল্পই দেখিতে পাই। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে এই তিনটি মহচ্চিত্রের জন্য আমরা হৃদয়ের সহিত বঙ্কিম বাবুকে অগণ্য ধন্যবাদ দিই এবং সহস্র মুখে তাঁহার অসামান্য কবিত্বের প্রশংসা করি। চিত্তসংযমে, ইন্দ্রিয়-শাসনে যে গাম্ভীর্য্য, সৌন্দর্য্য ও অপরিসীম বীরত্ব আছে তাহা তিনি প্রতাপ-চরিত্রে উজ্জ্বল বর্ণে বিচিত্রিত করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরে, ঔদার্য্য, মহত্ত্ব, ক্ষমা, ধৃতি ও জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং দলনীর রমণীয় চরিত্রে তিনি রমণী-মণ্ডলীকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যিনি যথার্থ সতী, যাঁহার প্রকৃত পতিভক্তি আছে, তিনি স্বামীর মঙ্গলের জন্য আত্মবিসর্জ্জনেও পরাঙ্মুখ হন না। কিন্তু তাঁহার শৈবলিনীর নিকট সমাজ কি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়? শৈবলিনী কুহকিনীর ন্যায় যুবতী দিগকে বলিতেছেন যে, এ অসার সংসারে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগই সার। ইন্দ্রিয়-সুখে ব্যাঘাত ঘটিলেই সংসার অন্ধকার এবং তারস্বরে সমস্ত যুবকবৃন্দকে উপদেশ দিতেছে "যে তোমাদের বিদ্যানুরাগ থাকিলে যুবতীর মন ভুলাইতে পারিবে না, যদি রমণীরমণ হইতে চাও কদাচ বিদ্যাচর্চ্চা করিও না। পুস্তক, পুঁতি, গ্রন্থ সব ভস্মসাৎ করিয়া নিরন্তর আমোদ প্রমোদে মত্ত থাক, নতুবা আমার অসুখী স্বামী চন্দ্রশেখরের দশা তোমাদের ঘটিবার সম্ভাবনা। যদি অগ্রেই তিনি পুঁতির সৎকার করিতেন, তাহা হইলে তিনি সুখী হইতে পরিতেন এবং আমাকেও সুখের তরে কাঙ্গালিনীর মত পথে ২ বেড়াইতে হইত না।" পাপচিত্রের অধিক আলোচনা অনিষ্টকর। বোধ হয় পূর্ণ বাবু এই

জন্যই শৈবলিনী চিত্রের সকল অঙ্গ যথাযথ বিবৃত করিয়া দেখান নাই। এই চিত্রে পাপের ঔজ্জ্বল্য অধিক কি না তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়। শৈবলিনীর চরিত্র দ্বিধা বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম তাহার প্রেমপ্রবৃত্তির পাপময় আখ্যায়িকা, তৎপরে তাহার অনুতপ্ত হৃদয়ের বিবরণ। এই উপন্যাসের কোন ভাগটি অধিকতর চিত্তাকর্ষক তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। সকলেই বোধ হয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, তাঁহার প্রবৃত্তিঘটিত উপাখ্যানই অধিকতর উজ্জ্বল এবং তজ্জন্য কল্পনাকে অধিকতর অধিকার করে। এই ভাগের অনেক সংস্থানই পাপ প্রলোভনে পরিপূর্ণ, এই জন্য ইহার অধ্যয়নে যে কুফল উৎপন্ন হয় তাহা সহজে অপনীত হয় না। পূর্ণ বাবু এই কথাই বলিয়াছেন। শৈবলিনী উপন্যাসের শেষভাগ তত উজ্জ্বল নহে, ইহাতে কল্পনা-রঞ্জন ঘটনা-পরম্পরার সমাবেশ নাই। বঙ্কিম বাবু যদি এই শেষ ভাগ প্রথম ভাগের ন্যায় কৌতুক-উত্তেজক ও ঘটনাপূর্ণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে কেহই শৈবলিনীর নিন্দা করিত না। তাহার উপন্যাসে পাপ পুণ্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণ নাই, এই নিমিত্ত "চন্দ্রশেখর" পাঠের ফল মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। সত্য বটে শৈবলিনী অনুতাপ করিয়াছিল, কিন্তু প্রতাপকে পাইলে, সে কখনই অনুতাপ করিত না, এই নিমিত্ত তাহার অনুতাপে কোনই ফল দর্শে নাই॥

শ্রী—

—••—

আনুষঙ্গিক পত্র।

কঠোর ধর্ম্মনীতির আদর্শে কবির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলে, মানব প্রকৃতি যথাযথ চিত্র করিবার অধিকার হইতে কবিকে বিচ্যুত করিলে, কবির বিচরণ-ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া পড়ে কি না; যাহা কিছু পাপ-সংস্পৃষ্ট তাহা কবির কাব্য-মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না, এবং যাহা কিছু উজ্জ্বল, যাহা কিছু কৃষ্ণাভা-বর্জ্জিত তাহা ভিন্ন অন্য কিছু কবির চিত্র-সমূহের অংশীভূত হইবে না—এই নিয়মে কবিকে আবদ্ধ করিয়া প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাঁহার বিচরণ-শক্তি সীমাবদ্ধ করিলে, তাঁহার প্রকৃতি-বৈচিত্র্যপ্রদর্শন-শক্তির লাঘব করিলে, কবির কবিত্ব শক্তির লাঘব করিলে, কবির কবিত্ব-শক্তির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হইতে পারে কি না; তাঁহার অঙ্কিত চিত্র গুলি সকল স্থলে সুন্দর, মনোহর এবং পূর্ণাবয়বসম্পন্ন হয় কি না; পূর্ণ বাবুর সহিত তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা আমার নাই। দেখিলাম এ বিষয়ে আমার সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ মত-ভেদ। ধর্ম্ম নীতি শিক্ষা দিবার জন্য কবিত্ব-শক্তির সৃষ্টি হইয়াছে আমি এরূপ মনে করি না। কবি প্রকৃতির চিত্রকর; প্রকৃতিই তাঁহার উপাস্য দেবতা। প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া যখন তিনি নীতি বা অন্য দেবতার

পূজায় প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি, আমার মতে, স্বধর্ম্মভ্রষ্টত্ব অপরাধের উপযুক্ত। প্রকৃতির বিকৃতি আছে, এই বিকৃতির আবার ভয়ানক ফলও আছে। বিকৃতির এবং বিকৃতির ফল এতদুভয়ই কবির বর্ণনীয়। কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক কদর্য্য রুচির পরিপোষক বিকৃত প্রকৃতির চিত্র ভিন্ন অন্য চিত্র যিনি অঙ্কিত করিতে জানেন না, তিনি কবি নামের যোগ্য নহেন। স্বভাবের বিকার হেতু যে সকল আপাত-মনোরম শোচনীয়-পরিণাম দৃশ্যের উৎপত্তি, সেই সকল দৃশ্য দেখাইয়া যিনি তৎপ্রতি দুর্ব্বল চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারেন, অথচ এরূপ পাপ-দৃশ্যে আসক্তির বিষময় ফল প্রদর্শনে অসমর্থ—প্রকৃতপক্ষে তিনি পাপের দূত, কবি নাম তাঁহার ছদ্ম বেশ, দুর্ব্বল-হৃদয় মানবকে প্রতারিত করা তাঁহার ব্যবসায়, তিনি সমাজের অনিষ্টকারী, তিনি সর্ব্বথা-পরিত্যাজ্য। "কামিনী কুমার" "চন্দ্রনাথ" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতাগণ এই শ্রেণীর লোক। কাব্য-গ্রন্থে নৈতিক উপদেশ থাকিবে না আমি এরূপ বলিতেছি না। নৈতিক উপদেশ প্রদান করা যে কবির কার্য্যে নহে তাহাই বলা আমার উদ্দেশ্য। কবি প্রকৃতিকে চিত্রিত করিবেন, তাঁহার চিত্রগুলি স্বতই উপদেশ-পূর্ণ হইয়া উঠিবে। নীতিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি কাব্য লিখিতে বসিবেন না। একমাত্র সৌন্দর্য্য তাঁহার লক্ষ্য, সৌন্দর্য্যই তিনি বর্ণন করিবেন, সৌন্দর্য্যই তিনি সৃষ্টি করিবেন। তবে যাহা সুন্দর তাহাতে কুৎসিত কিছু থাকিতে পারে না, তাহা নৈতিক-উপদেশ-বিহীন কখনও হয় না; সুতরাং নীতি কবির উদ্দেশ্য না হইলেও, তাঁহার কাব্যে নৈতিক উপদেশের অভাব লক্ষিত হইবে না। বরং কাব্য হইতে যে উপদেশ গৃহীত হইতে পারে, মনুষ্য-মনে তাহা যত কার্য্যকারী হয়, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উপদেশ একত্রিত করিলেও, তাহা তত কাকার্য্যারী হয় না।

পূর্ণবাবু সম্পূর্ণ সাধুচিত্রের পক্ষপাতী। মানব প্রকৃতির যথাযথ চিত্র তাঁহার মতে "প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন" সদৃশ। মনুষ্য-জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনাবলীর অবিকল চিত্র প্রতিমূর্ত্তি-অঙ্কন সদৃশ বটে, কিন্তু মানব-প্রকৃতির যথাযথ চিত্র বলিলে যে প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণন বুঝায় আমার এরূপ বোধ হয় না। প্রাত্যহিক জীবনে কয়টি আয়েসা দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে? পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রতাপের ন্যায় কয়টি মহাপুরুষ ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? মনুষ্য-সমাজের প্রথম গঠন-কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখরের মত উন্নতমনা উদারচিত্ত কয়টি সাধু মনুষ্য-সমাজকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন? এই সকল চিত্রকে কি তবে মানব-প্রকৃতির যথাযথ চিত্র বলিব না? মানব-জীবনের যথাযথ চিত্র আর মানব-প্রকৃতির যথাযথ চিত্র এ দুইটী এক কথা নহে। যে শৈবলিনীর চিত্র লইয়া এত

বিতণ্ডা সেই শৈবলিনী কি মানব-জীবনের যথাযথ চিত্র, না শৈবলিনী মানব প্রকৃতিতে কি সম্ভবে তাহারই একটি দৃষ্টান্ত ?—না হয় মানব প্রকৃতির যথাযথ চিত্র প্রতিমূর্ত্তি-অঙ্কন সদৃশই হইল। এরূপ চিত্র যদি প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন বলিয়া দূষণীয়, কাব্যের পাত্রমাত্রকেই নিরবচ্ছিন্ন সাধুতায় অলঙ্কৃত করিলে কি অনেক পরিমাণে বৈচিত্র্যবিহীনতা এবং নবীনত্ব-শূন্যতা দোষ ঘটে না? আর চিত্রবিশেষকে সাধুভাবপূর্ণ করিতে গেলে যখন তাহাকে কলুষিত চিত্রের সংঘর্ষে না আনিলে হয় না; পাত্রবিশেষের জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিতে হইলে, যখন প্রলোভন-মধ্যে ফেলিয়া তাঁহার মনের অটলত্ব প্রদর্শন করা প্রয়োজন, তখন কাব্যে কলুষিত চিত্রের সম্পূর্ণ পরিহারই বা কিরূপে সম্ভবে? হয় ত পূর্ণ বাবু বলিবেন তিনি কবিকে পাপ-চিত্র সম্পূর্ণ পরিহার করিতে বলেন না; নায়ক, নায়িকা এবং অন্যান্য প্রধান পাত্র গুলিকে পাপ-ভাব-বিরহিত করিয়া প্রদর্শন করিলেই হইল। এরূপ করিবারও যে সকল স্থলে আবশ্যক হয় না তাহা আমি শৈবলিনী-চরিত-সমালোচনায় দেখাইয়াছি। নায়ক বা নায়িকার চরিত্র কোন অংশে কলঙ্কিত করিলে, যদি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়; যদি তাহাতে কোন কুফল না ফলিয়া, পক্ষান্তরে সুফলেরই উৎপত্তি হয়, তাহা দ্বারা যদি কাব্যের রমণীয়তা সম্বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়; তবে তাহাতে আপত্তি করিবার আমি কোন কারণ দেখিতে পাই না। উৎকৃষ্ট ভাবময় চিত্রে সমধিক ফল দর্শে এ কথায় কাহারও দ্বিমত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পাপস্পর্শ হইলেই, কলঙ্ক-রেখা পড়িলেই, যদি কোন চিত্র উৎকৃষ্ট ভাবময় হইতে না পারে; এ হেন শৈবলিনী-চিত্রও যদি উৎকৃষ্টভাবময় না হয়, তবে উৎকৃষ্টভাবময় চিত্র কাহাকে বলে তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। সাধুকে জগতে পূজিত হইতে দেখিয়া, সাধুকে স্বর্গ-সুখ ভোগ করিতে দেখিয়া, জগতে আদৃত হইবার এবং স্বর্গ-সুখ ভোগ করিবার আশয়ে, যদি সাধুর চরিত্র অনুকরণ করিতে ঐকান্তিক ইচ্ছা জন্মে; তবে পাপীকে মনুষ্য-সমাজে ঘৃণিত হইতে দেখিলে, তাহাকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখিলে, সেই ঘৃণার ভয়ে, সেই যন্ত্রণার ভয়ে পাপ-কার্য্যের প্রতি অপরক্তি হইবে না কেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। সাধুচরিত্রে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্য যেরূপ ফল দর্শে, পাপের প্রতি দুর্দ্দমনীয় ঘৃণা হেতু সেইরূপ ফল দর্শিবে না একথারই বা অর্থ কি? তবে দোষ-গুণ-বিমিশ্রিত চিত্র সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে; কিন্তু এরূপ চিত্রও কবি যদি পাঠকের সমক্ষে এরূপ ভাবে উপস্থাপিত করিতে পারেন যে তাহাতে লোক-সমাজের অনিষ্ট না হইয়া ইষ্ট হওয়াই সম্ভাবিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে এরূপ চিত্রেই বা দোষ

কি? কোন ব্যক্তির গুণের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা জন্মে, সেই ব্যক্তির চরিত্রে আবার দোষ দৃষ্ট হইলে যে সেই শ্রদ্ধার হ্রাস হয় ইহা সাধারণতঃ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। দোষের প্রকৃতি-ভেদে স্থল-বিশেষে তত অশ্রদ্ধা নাও হইতে পারে, এবং এক বার হইলে, পরকালিক অবস্থা দৃষ্টে সেই অশ্রদ্ধা সম্পূর্ণ বিদূরিত হওয়াও সর্ব্ব প্রকারে সম্ভবপর; তথাপি যে ব্যক্তির গুণ দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মে এবং তাঁহার মত হইতে চেষ্টা হয়, চরিত্রে কলঙ্ক দৃষ্ট হইলে তাঁহার প্রতি কিছু বীতশ্রদ্ধ হইতেই হইবে, অধিকাংশ স্থলেই ইহা সত্য। আর ইহা যে মানব প্রকৃতি এবং সেই জন্য অনিবার্য্য তাহাও আমি স্বীকার করি। কিন্তু এরূপ হইলেই যে নৈতিক ফল সম্বন্ধে কোনরূপ অনিষ্টের উৎপত্তি হয় এমন আমার বোধ হয় না; বরং এরূপ স্থলে অনুকরণকারীর অনুকৃতের দোষাংশ পরিহার পূর্ব্বক আপনার চরিত্র সম্পূর্ণ পবিত্র এবং সর্ব্বথা কলঙ্ক-শূন্য করিবার ইচ্ছা সমধিক প্রবল হইয়া উঠে এই আমার বিশ্বাস। নিজ হৃদয়ের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মানব সাধারণের মানসিক গতি যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অনুমিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, মনুষ্য-মনে এই রূপ একটি স্বাভাবিক শক্তি নিহিত আছে। সৎপথে যাঁহার চিত্ত একবার ধাবিত হইয়াছে, সাধু ভাবের প্রতি যাঁহার একবার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে, অন্যের কুৎসিত চরিত্র দৃষ্টে তাঁহার চিত্তবলের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না। ইংরেজ কবি কাউপার ভিন্ন আকারে মানব-হৃদয়ে এই শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন;—

Nor can example hurt them; what they see
Of vice in others but enhancing more,
The charms of virtue in their just esteem.

আমিও শৈবলিনীর মানসিক দুর্ব্বলতা অনুমোদন করিতে প্রস্তুত নহি। তিনি যে তাঁহার দুর্ব্বলতার জন্য ঘৃণার পাত্র নহেন, তাঁহার দোষের জন্য যে তাঁহাকে তিরস্কার করা উচিত নহে, তাহাই বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল। যে উচ্চ ও গভীর প্রেম রমণী-হৃদয়ের ভূষণ, শৈবলিনীর দোষ সেই উচ্চ ও গভীর প্রেম হইতেই উৎপন্ন। আমরা যদি সামাজিক অন্যায় নিয়মের অধীন হইয়া লোকের পাপ-পুণ্যের বিচার না করিতাম, বর্ত্তমানে মানব সমাজের যেরূপ কুৎসিত গঠন তাহা না হইয়া যদি প্রশস্ত এবং উচ্চ নিয়মে সমাজ গঠিত হইত, তাহা হইলে শৈবলিনীর দোষ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত না। মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি সমাজ গঠিত হইত, তাহা হইলে শৈবলিনীর দোষ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত

না। মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যে সমাজ গঠিত হয়, যে নিয়মে স্বাভাবিক মনোবৃত্তি সমূহের পরিচালনের ব্যাঘাত জন্মায়, যে সমাজ এরূপ নিয়মে শাসিত, সে সমাজ কখনও সুখী হইতে পারে না। সমাজে নিয়ম সকল চিত্ত-বৃত্তি সমূহের স্বাধীন পরিচালনের যতই অনুকূল হইবে, সমাজ ততই অধিকতর সুখ-ভোগে সমর্থ হইবে। মনে করুন্ সংসার-সুখ-বিরাগী পরকাল-চিন্তা-প্রবণ মানব-স্বভাবানভিজ্ঞ কোন লোক-সম্প্রদায় এই নিয়ম করিলেন যে তাঁহাদের সমাজে স্ত্রী-পুরুষ-মধ্যে প্রেমানুরাগ-জনিত আসক্তি হইতে পারিবে না, কারণ এরূপ আসক্তি পরমেশ্বর-চিন্তার ব্যাঘাত জন্মায়। প্রেমানুরাগ মনুষ্য-মনের একটি দুর্দ্দমনীয় বৃত্তি; ইহার গতিরোধ মানুষের আয়ত্ত নহে। সুতরাং এই নিয়মের পুনঃ পুনঃ ভঙ্গ জনিত যে পাপ তাহা এই সমাজে সচরাচর ঘটিবে এবং সেইরূপ পাপাচরণ হইতে যে অসুখের উৎপত্তি তাহা এই সমাজকে সতত ভোগ করিতেই হইবে। এই স্থলে প্রেমানুরাগ বশতঃ কোন ব্যক্তি উল্লিখিতরূপ সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ব্যক্তির দোষই অধিক বলিব না, এইরূপ কুৎসিত সমাজ-গঠন-প্রণালীর দোষই অধিক বলিব। এ স্থলে সমাজ-গঠন-কর্ত্তাদিগকেই অধিক দোষী বলিতে হইবে। ইহাতে বুঝিতে হইবে না যে কোন সামাজিক নিয়ম দুষ্প্রতিপাল্য বা অন্যায় বোধ হইলে তাহা লঙ্ঘন করাতে পাপ নাই, আমি এইরূপ বলিতেছি। এরূপ নিয়ম-ভঙ্গ জন্য যত দিন সমাজের সুখ-সমষ্টির হ্রাস হইবে ততদিন এরূপ নিয়ম-ভঙ্গে অবশ্য পাপ আছে। এবম্বিধ পাপকে উদার-চিত্ত প্রশস্তান্তঃকরণ ব্যক্তিরা কঠোর চক্ষে দেখেন না, কঠোর চক্ষে দেখাও উচিত নহে, ইহাই আমার বলিবার ইচ্ছা। সমালোচককে উদারচিত্ত এবং প্রশস্তান্তঃকরণ হইতে নিষেধ করে জগতে এরূপ নিষ্ঠুর বিধি প্রচলিত নাই, থাকিলেও তাহা অশ্রদ্ধেয়। যে অসাধারণ ঔদার্য্য-গুণে চন্দ্রশেখর কুলত্যাগিনী শৈবলিনীকে পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন, মনুষ্যমাত্রেরই মন যে দিন সেই রূপ ঔদার্য্যে বিভূষিত হইবে, সে দিন যে মানব-সমাজ চরমোন্নতি লাভ করিবে, অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

পূর্ণ বাবুর বিশ্বাস প্রতাপের ন্যায় চিত্ত-সংযম থাকিলে, শৈবলিনী রমণী-রত্ন হইতে পারিতেন; আমি বলি প্রতাপের ন্যায় চিত্ত-সংযম না থাকিয়াও শৈবলিনী রমণী-রত্ন। প্রতাপ-রত্ন উজ্জ্বল, নির্ম্মল, কলঙ্ক-শূন্য; শৈবলিনী-রত্নও উজ্জ্বল, তবে শৈবলিনী-রত্ন নির্ম্মল নহে, তাহাতে একটী কাল রেখা পড়িয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া রত্নের যে আদর, এ রত্ন সে আদরের অনুপযুক্ত নহে; বিশেষতঃ এই রত্নের ঈষৎ মলিনতাই যখন অন্য রত্নের শোভা সমধিক পরিবর্দ্ধিত

করিবার কারণ, তখন কে বলিবে "শৈবলিনীর কলঙ্ক দূর কর, তাহাতে প্রতাপের যে মহত্ত্ব বাড়িয়াছে, তাহা কমিল কমিলই।"

ক্ষমার সহিত সমালোচকের সম্বন্ধ নাই, আমি এ মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না। কাব্যের রসাস্বাদন কিরূপে হয়; কাব্যান্তর্ভূত পাত্রগণ মধ্যে কাহাকে কিরূপ চক্ষে দেখা উচিত, কে ঘৃণার পাত্র, কে ক্ষমার উপযুক্ত; কোন্ পাত্রের চরিত দৃষ্টে মানসিক কোন্ বৃত্তি পরিচালিত হয়, এবং মানসিক বিভিন্ন বৃত্তির এইরূপ পরিচালন হেতু যে বিভিন্ন সুখের উৎপত্তি তাহা কিরূপে অনুভব করিতে পারা যায়; সাধারণ পাঠককে তাহা শিক্ষা দেওয়া যদি সমালোচকের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়, তবে তিনি ক্ষমার সহিত একেবারে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিতে পারেন কি প্রকারে আমি বুঝিতে পারি না। যেখানে দয়া করিতে হইবে, ক্ষমা দেখাইতে হইবে, সেখানে কি তিনি নিষ্ঠুরতা শিক্ষা দিবেন? সমালোচনব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইলেই কি কোন কোন মানসিক বৃত্তিকে উন্মূলিত করিয়া ফেলিতে হইবে? জানি না, পৃথিবীর সমালোচকগণ কোন্ পাপে পাপী, তাই মনুষ্য-মনের দুইটী মহতী বৃত্তি পরিচালনে যে সুখ তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত থাকিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয় সমাজের যেরূপ উন্নত অবস্থা, জুলিয়েটের সময়েও ঠিক সেইরূপ ছিল, আমিও তাহা বিশ্বাস করি না, কিন্তু বঙ্গে পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রণয় যেরূপ পাপের কথা, লজ্জার বিষয়, ইউরোপীয় সমাজে এরূপ ভাব কখন বিদ্যমান ছিল এমত বোধ হয় না। জুলিয়েট যে সেক্ষপীয়রের সৃষ্টি, সেই সেক্ষপীয়রের নাটকাবলীতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বকালেও ইউরোপে স্বাধীন ভাবে প্রণয়-স্থাপন চরিত্র-কলঙ্ক বলিয়া পরিগণিত ছিল না। তবে প্রভুত্বপ্রিয় পিতা মাতা কন্যাদিগের প্রণয়-পাত্র তাঁহাদের-মনোনীত না হইলে, অনেক সময়ে, সেই প্রণয়-পাত্রের সহিত তাহাদের প্রণয়-সম্মিলনের প্রতিবাদী হইয়া দাঁড়াইতেন। একে বাঙ্গালী-সমাজে বিবাহের পূর্ব্বে প্রেম দুরপণেয় কলঙ্ক, তাহাতে আবার জ্ঞাতি-সম্বন্ধ-হেতু শৈবলিনী প্রতাপের পরিণেতব্যা ছিলেন না। সমাজের অবস্থার কথা ছাড়িয়া দিলেও কোন ক্ষতি দেখিতে পাই না। চন্দ্রশেখর গ্রন্থের পুনঃ পাঠে যেরূপ দেখিলাম তাহাতে আমি সামাজিক-অবস্থাগত তর্ক ছাড়িয়া দিতেই ইচ্ছুক। কোন চিত্র সার্ব্বকালিক এবং সার্ব্বত্রিক হইতে হইলে সময় বিশেষ এবং সমাজ-বিশেষের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না; কারণ তাহা থাকিলে সেই সময়ের অবসানে এবং সেই সমাজ ভিন্ন অন্যত্র সেই চিত্র সর্ব্বাংশে স্বাভাবিক ও সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না। কালিদাস এবং সেক্ষপীয়ার কোন বিশেষ সমাজের বা বিশেষ সম-

য়ের চিত্রকর হইলে, চিরদিন তাঁহারা জগতে সমভাবে পূজিত হইতেন না। বঙ্কিম বাবু ও সে আধুনিক বাঙ্গলা সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার শৈবলিনীকে চিত্রিত করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না। প্রতাপকে শৈবলিনী হৃদয় মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; প্রতাপকে তিনি তাঁহার হৃদয়-সর্ব্বস্ব মনে করিতেন; প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে তাঁহার সুখ নাই ইহা তিনি জানিতেন। তথাপি প্রতাপ ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিণীত হইতে তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও আপত্তি করিলেন না, ইহা কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে। এই অস্বাভাবিকতা নিরাকরণ জন্য সুচতুর কবি সুকবিসুলভ যে কৌশল প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা এই:—প্রতাপ শৈবলিনী উভয়ই যখন জানিতে পারিলেন তাঁহাদের বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই; যখন বুঝিতে পারিলেন তাঁহাদের হৃদয়-যুগলে যে প্রেম-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছিল তাহা তাঁহাদের সুখের জন্য নহে; তখন উভয়ে পরামর্শ করিলেন, ভাগীরথীর জলে ডুবিয়া মরিবেন, ভাগীরথী প্রবাহে তাঁহাদের প্রেম-প্রবাহ মিশাইয়া তাহার লোপ-সাধন করিবেন। পরামর্শ স্থির হইলে, একদিন দুই জনে গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ করিতে করিতে তীর ছাড়িয়া অনেক দূরে গমন করিলেন; গিয়া প্রতাপ বলিলেন "শৈবলিনী এই আমাদের বিয়ে"। শৈবলিনী বলিলেন "আর কেন এই খানেই।" প্রতাপ জলমগ্ন হইলেন, কিন্তু শৈবলিনী ডুবিতে পারিলেন না। তাঁহার ভয় হইল। তিনি মনে ভাবিলেন "কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে আমি মরিতে পারিব না" বাল্যে মনুষ্য-হৃদয়ে ভয়ের প্রাবল্য অধিক। আবার পরিণত বয়সে আমরা প্রেমানুরাগ প্রভৃতি হৃদ্বৃত্তি সমূহের বেগ প্রকাশ্যে যেরূপ বোধ করিয়া থাকি, বাল্যে এরূপ কোন ভাব হৃদয়ে জন্মিলে ও বদ্ধমূল হইলেও সকল স্থলে তাহার প্রবলতা ততদূর অনুভূত হয় না। শৈবলিনী তখনও পরিণত-বয়স্কা নহেন, শৈবলিনীর স্বাভাবিক চিত্ত-দৃঢ়তাও প্রতাপের ন্যায় নহে; তাই তাঁহার চিত্তে ভয়ের প্রাবল্য হইল বলিয়া প্রতাপের প্রতি তাঁহার অনুরাগের বেগ ক্ষণ কালের জন্য স্থগিত দেখিতে হইল। শৈবলিনী তীরে উঠিলে যেমন তাঁহার ভয়ের কিঞ্চিৎ শমতা হইল, অমনি প্রতাপ-প্রণয়ের কথা মনে পড়িল, প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল, মরিতে পারিলেন না বলিয়া লজ্জিত হইলেন। ভয় ছাড়িয়া গেল, লজ্জা আসিয়া তাঁহার মন অধিকার করিল; তিনি প্রতাপকে মুখ দেখাইতে পারিলেন না। প্রথম ভয়ে, তাহার পর লজ্জায় শৈবলিনীকে কিছু দিনের জন্য প্রতাপের পর পর করিয়া তুলিল; শৈবলিনীর মন কেমন কেমন হইয়া উঠিল; শৈবলিনী আপনার মনের অবস্থা আপনি

ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। যখন শৈবলিনীর মানসিক অবস্থা এইরূপ, সেই সময়ে চন্দ্রশেখর তাঁহাকে বিবাহ করিলেন; শৈবলিনী কোন আপত্তি করিলেন না। তাহার পর দেবগ্রামে যখন প্রতাপের রূপ-বারি-সঞ্চারিত তেজ হেতু শৈবলিনীর দমিত-বর্দ্ধন শুষ্কভাবাপন্ন অথচ নিত্যজীবন প্রণয়াঙ্কুর পুনরায় সতেজ হইয়া উঠিল, তখনই তাঁহার হৃদয় যেন দুর্দ্দমনীয় ভাব ধারণ করিল। শৈবলিনী তখন পরিণত-বয়স্কা, শৈবলিনী তখন পূর্ব্ব-প্রণয়-স্মৃতিতে উত্তেজিত, শৈবলিনী তখন নব-রূপ-মোহে অভিভূত; তখন তাঁহার ভয় নাই, লজ্জা নাই, সুপথ কুপথ জ্ঞান নাই, প্রণয় তাঁহার হৃদয়ে তখন একাধিপত্য করিতে লাগিল।

শৈবলিনী-চরিত-সমালোচনার এক স্থানে আমি বলিয়াছি "আমি এক জনকে ভাল বাসিলেই সে আমাকে ভাল বাসিবে এই যদি প্রকৃতির নিয়ম হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর অনেক দুঃখ কমিয়া যাইত। বলিতে পারিনা, বোধ হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক সুখও উঠিয়া যাইত"। সুখ উঠিয়া যাইত কেন? সুখ উঠিয়া যাইত এইজন্য কোন রমণীকে এক সময়ে একাধিক পুরুষে ভাল বাসিতে পারে। প্রকৃতির নিয়ম—ভাল বাসিলেই ভাল বাসিতে হইবে; সুতরাং সেই রমণী এই পুরুষদিগের প্রত্যেককেই ভাল বাসিবে। শত শত পুরুষ থাকিতেও কোন রমণী বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত—এই চিন্তায় সেই ব্যক্তির যে সুখ, রমণী একাধিক পুরুষকে ভালবাসিলে তাহার সেই সুখ কখন হইতে পারে না। অনন্ত সর্ব্বব্যাপিনী ভালবাসার কথা বলিবেন; সে ভিন্ন কথা। বলিতে পারেন, যদি কোন রমণী এক সময়ে শত ব্যক্তিকে তাহার ভালবাসায় সুখী করিতে পারে, তবে তুমি তাহার প্রতিবাদী হইবার কে? কোন রমণী যদি এক সময়ে শত ব্যক্তিকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারে তবে তাহার হৃদয় তুমি তোমাতে আবদ্ধ রাখিতে চাও কেন? তুমি ক্ষুদ্রহৃদয় তাই তোমার এরূপ ইচ্ছা; তোমার এ ইচ্ছার মূলে অবশ্য নীচ স্বার্থপরতা রহিয়াছে। স্বীকার করি স্বার্থপরতা হইতেই এরূপ ইচ্ছার উৎপত্তি; সর্ব্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করি মনুষ্য-মনের সেই অবস্থা আসিয়া শীঘ্র উপস্থিত হউক যে অবস্থায় এরূপ স্বার্থজ্ঞান মনুষ্য-মন হইতে বিদূরিত হইবে। কিন্তু মনুষ্য-মনের এতদূর উন্নত অবস্থার অস্তিত্ব এখনও কল্পনাতেই রহিয়াছে। মানুষ এতদূর উন্নত হইতে পারে কিনা তাহা এখনও পরীক্ষাসাপেক্ষ। উক্ত কথা কয়েকটী লিখিবার সময় আমার মনে প্রধানতঃ যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, এখন দেখিতেছি ভাষায় সেই ভাব তত পরিস্ফুট হয় নাই। কোন ব্যক্তির ভাল বাসাই যদি তাহার প্রতি অন্যের ভাল বাসার এক মাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে যে প্রণয়-বিষয়-

ক সুখের অনেক হ্রাস হইত, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। আজি যে রমণীর ভালবাসার পাত্র হইতে ইচ্ছা করি, যাহার ভালবাসা আমার জীবনের প্রধান সুখ বলিয়া মনে করি, তাহার চিত্ত স্বতই আমার প্রতি আকৃষ্ট, আপনা-আপনি সে আমার প্রতি অনুরক্ত—এই চিন্তায় আমার যে সুখ, সেই রমণীকে আমি ভাল বাসিয়াছি বলিয়া সে আমাকে ভাল বাসে; তাহার ভালবাসা কৃতজ্ঞতা-মূলক এরূপ চিন্তায় যে সেই সুখ অনেক পরিমাণে কমিয়া যায় তাহার আর ভুল কি? শৈবলিনী-চরিত-সমালোচনার এক স্থানে দেখিলাম এই রূপ মুদ্রিত হইয়াছেঃ—"তিনি শৈবলিনীর প্রণয়ানুরাগ দেখিয়া, প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর প্রণয়ের দোষ ভুলিয়া গিয়াছেন।" প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর প্রণয়ের কোন দোষ আছে, এরূপ আমি কখনও মনে করি নাই; এখনও করিনা। বঙ্গদর্শনে "চন্দ্রশেখর" যে আকারে প্রকাশিত হয়, তাহাতে পাঠক প্রতাপ-শৈবলিনীর শৈশব-প্রণয়ের কথা প্রথমেই জানিতে পারেন না। তিনি শৈবলিনীকে স্বামিগৃহ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, মনে মনে তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করেন; পরে প্রতাপের প্রতি তাঁহার প্রেমানুরাগের উৎপত্তি কোন্ সময়ে এবং কিরূপ অবস্থায় হইয়াছিল যখন জানিতে পারেন, তখন শৈবলিনীর চরিত্র সম্বন্ধে, তাঁহার সমস্ত অপবিত্র ভাব অপনীত হয়; ইহাই আমি বলিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। আমার নিকট যে হস্তলিপি আছে তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে "তিনি শৈবলিনীর প্রণয়ানুরাগ দেখিয়া প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর শৈশব-প্রণয়ের কথা জানিতে পারিয়া, শৈবলিনীর দোষ (স্বামী-গৃহ-পরিত্যাগ-দোষ) ভুলিয়া গিয়াছেন।" প্রবন্ধটি আর্য্য-দর্শনে প্রকাশিত হইবার জন্য যে হস্তলিপি পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতে ভ্রমক্রমে যদি এই অংশ পরিবর্জ্জিত করিয়া দিয়া থাকি তাহা বলিতে পারি না।*

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

---

* শৈবলিনী-চরিত্র লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। উভয় পক্ষের যাহা কিছু বলিবার ছিল তাহা আমরা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বলিতে দিয়াছি। আর্য্যদর্শন তর্কবিষয়ক-স্বাধীনতা-প্রিয়। সুতরাং সকলেই সাধারণ বিষয়ে স্বাধীন ভাবে ইহাতে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। শৈবলিনী-চরিত্র সমালোচনেও উভয় পক্ষ স্বাধীন ভাবে আপনাদিগের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের অনুরোধ অতঃপর এবিষয়ে তাঁহারা ক্ষান্ত হউন্।

যে মূল বিষয় লইয়া এই আন্দোলন তাহা অতি সংক্ষেপে বর্ণনীয়।

পূর্ণবাবু ও তৎপক্ষ-সমর্থক লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু বলিতেছেন—শৈবলিনী সমাজের অতি পবিত্র নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন;

সুতরাং তিনি সামাজিক ঘৃণা ও শাসনের বিষয়। শৈবলিনী যদি প্রকৃত প্রস্তাবে অনুতাপিনী হইতেন—তাহা হইলে শৈবলিনীকে ক্ষমা করা যাইতে পারিত। কিন্তু শৈবলিনী প্রকৃত অনুতাপিনী হয়েন নাই; প্রতাপের প্রতি তাঁহার আশক্তি অবিচলিত থাকায় তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের কোনও মূল্য নাই। আর বিশেষতঃ ক্ষমা ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজের কর্ত্তব্য হইলেও, সমালোচকের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সমালোচক কোন চরিত্রকে যেরূপ পাইবেন, সেইরূপ বিচার করিবেন। দোষ দেখিলে তিরস্কার কবিবেন, গুণ দেখিলে প্রশংসা করিবেন।

লোকনাথ বাবু ইহার প্রত্যুত্তরে এই বলেন যে—শৈবলিনী সমাজের নিয়ম ভঙ্গ কবিয়াছেন সত্য, সে জন্য তাঁহার চরিত্রে একটী কলঙ্করেখা পড়িয়াছে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি দণ্ডনীয়া বা ঘৃণাস্পদ হইতে পারেন না, কারণ সমাজের নিয়ম অতি কঠোর ও ন্যায়বিগর্হিত না হইলে, তাঁহাকে ত সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ-জনিত পাপে পতিত হইতে হইত না। সমাজের নিয়ম উচ্চ নৈতিক আদর্শে গঠিত হইলে প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর প্রেম কথনই অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইত না। সুতরাং 'এই কঠোর ও অসঙ্গত নিয়মের ব্যভিচারের দণ্ড শৈবলিনীর স্কন্ধে আরোপিত করা অন্যায়। আর সমালোচক যখন সাধারণের শিক্ষক, তখন দয়া ও ক্ষমার সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সম্বন্ধ। তিনি অক্ষমা ও নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে, সাধারণ শিক্ষকতাভার গ্রহণের অনুপযুক্ত হইবেন।

গ্রন্থের নৈতিক ফল সম্বন্ধে পূর্ণবাবু ও তৎপক্ষসমর্থক লক্ষ্মীবাবু বলেন যে—শৈবলিনী-চরিত্রের কৃষ্ণভাগ অতিরঞ্জিত হওয়ায়, এ গ্রন্থের নৈতিক সমস্থিতি বিনষ্ট হইয়াছে। এগ্রন্থপাঠে পাঠকগণের মনে পাপের প্রতি বিরাগ অপেক্ষা পাপের প্রতি অনুরাগের প্রাবল্য হইয়া উঠে।

লোকনাথ বাবু বলেন—বঙ্কিম বাবু শেক্ষপীয়র ও কালিদাসের ন্যায় একজন সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদেশিক চিত্রকর। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীব অনুরাগ বঙ্গদেশে কি ভাবে গৃহীত হইবে সে চিন্তায় তিনি ব্যাকুল নহেন। বিশ্বব্যাপিনী নীতির আদর্শে শৈবলিনীর অনুরাগ অপবিত্র নহে—এইজন্য তাহার অতিরঞ্জনে তিনি কুণ্ঠিত হয়েন নাই; তবে প্রাদেশিক নীতির মূলে আঘাত করিতেও তিনি অনিচ্ছুক, এই জন্যই তিনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং শৈবলিনী-চরিত্র পাঠে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাদেশিক বা বিশ্বজনীন কোন নৈতিক সমস্থিতিই বিনষ্ট হইতেছে না।

স।

যোগ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পবনাভ্যাস যোগাভ্যাসের প্রথমাবস্থাতে সাত্বিকাচার ও সাত্বিকাহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যথা ক্ষীরাক্ত-প্রাসনং শস্তম্। শিবগীতা। ক্ষীরার্থ গোব্য দুগ্ধ, অক্তার্থ গোব্য ঘৃত, পান করা অতীব প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন মহাহবিষ্যান্ন কিম্বা হবিষ্যান্নও ভোজন করিতে পারে। এই যোগাভ্যাসের প্রথম দিবস কেবল গোঘৃত ও দুগ্ধ মাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য পান করিবে। যাঁহার দুগ্ধ আর ঘৃতে ক্ষুধা নিবারণ নাহয় তিনি মহা হবিষ্য করিবেন। তৎপর এক পক্ষ এই নিয়মে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া যোগ সাধনা করিবেন। তৎপর ৩ মাস পর্য্যন্ত হবিষ্যান্ন ও একাহার করিয়া অকষ্টে কাল যাপন করিবেন মাসত্রয়ের পর নাড়ী শুদ্ধ হইলে দুইবার হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে পারেন। তাম্বূল কি তাম্রকুট কি আসব দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রী-সম্ভোগ বিষয়েও সতর্ক হইবেন। এই প্রকারে অন্যান্য ভোগ সুখ যিনি বিসর্জ্জন করিতে পারেন তিনিই যোগসিদ্ধ হইতে পারেন। যিনি ইহাতে অপারগ হইবেন তিনি যেন এরূপ যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত নাহন। পুরুষাপেক্ষা প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী বিধবা স্ত্রীলোক যদি যোগ সাধনা করেন তবে তিনি বর্ত্তমান সময়ে অবিলম্বে যোগফল প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্ত্রীলোকের যেমন ইন্দ্রিয়-বৃত্তি প্রবল, তেমনি ধৈর্য্যবৃত্তিও বলবতী। বিশেষতঃ কুলকামিনী যাহাকে বলে, সেই কুলকামিনীরা সতীত্ব বলে না করিতে পারেন এমত সৎকর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় না। সীতা সাবিত্রীর ত কথাই নাই তাঁহারা সতীত্ববলে যাহা যাহা করিয়া গিয়াছেন তৎসমুদায় পুরাণে প্রকাশ থাকায় পৃথিবীতে অপ্রকাশ নাই, কিন্তু ইঁহারা পতি-সেবা-পরতন্ত্রা ছিলেন। বিধবা স্ত্রীলোকের, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যই প্রধান ধর্ম্ম ও ভূষণ। ইহার মধ্যে যিনি যোগ সাধন করেন তিনি অপ্রাকৃত মানবী। সংপ্রতি জানাগিয়াছে জনাই-নিবাসী ভূম্যাধিকারী মৃত বাবু রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীর একটি কুলবধূ অল্পকাল হইল বিধবা হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত যথাশাস্ত্র প্রতিপালন করত পবনাভ্যাস যোগ সাধনা করায়, অতি পরিশ্রমে যোগাভ্যাসের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ ফলও লাভ করিয়াছেন। তিনি ২।৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কুম্ভক করিয়া অক্লেশে থাকিতে পারেন। আর ঐ কুম্ভক সময়ে তাঁহার আসন, অল্প ভূশূন্য হইতে থাকে। তাঁহার আহার ঘৃত আর দুগ্ধান্ন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অনাহারে

কখন মুখ ম্লান হয় না। রোগ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে ক্ষমবান্ নহে। বোধ হয় তিনি অনতিবিলম্বেই সমাধিসাধনায় সিদ্ধ হইয়া ধর্ম্মের অন্তিম সীমায় উপস্থিত হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ মহিলা অতি দুর্ল্লভ। ইনি ভোগ-সুখ-স্পৃহা করিলে সকল সুখই ইহাঁর করতলস্থ হইতে পারিত। ইহাঁর তপঃপ্রভাবে পতিকুল পিতৃকুল অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিতেছে। ইহাঁকে দর্শন করিলে দেব দর্শনের ফল লাভ হয়। দুঃখের বিষয় এই যে এতদ্দেশের গৌরবাধিকারী আর্য্য পুরুষগণ এতাদৃশ যোগসুখে একেবারে বঞ্চিত। যাঁহাদিগকে কৃতবিদ্য বলা যায় তাঁহারা কেবল বাহ্যজগতীয় সুখের আশয়ে বৃথা জীবন ক্ষয় করিতেছেন।

* * * *

যাহাই হউক এক্ষণে বঙ্গদেশের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে হিন্দুজাতির পক্ষে প্রাচীন। আর্য্যাচার ব্যবহার করা প্রয়োজন হইতেছে। নচেৎ বিদেশীয় পাশ্চাত্যাচারে বঙ্গদেশ উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে। রোগ শোক পরিতাপ প্রভৃতি ক্লেশ যত বঙ্গদেশে দেখা যায় ভারতের অন্য কোন দেশে এত দুঃখ শুনাও যায় না। যে সকল রোগ বঙ্গদেশে বিরাজ করিতেছে দেখা বা শুনা যাইতেছে, ৬০। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে এ সকল রোগ দেখা যায় নাই। তাহার নিদান নির্ব্বাচন করিতে হইলে স্পষ্ট বোধ হয় ৬০। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে এখন যেমন পাশ্চাত্যাচার প্রবল তখন তাহা তত ছিল না। এ নিমিত্ত বিচিত্র রোগে ও অদ্ভুত চিকিৎসা দেখাও যায় নাই। এইক্ষণ সেই বঙ্গদেশে যে সকল বিকট রোগ প্রাদুর্ভূত হইতেছে তাহার নিদান পাশ্চাত্যাচার বৈ আর কিছুই বোধ হয় না।

যেমন রোগ, আবার ভাগ্যক্রমে তেমনি চিকিৎসা-প্রণালীও প্রচারিত হইতেছে। ইহাতে গৃহস্থ লোকের আর্থিক ও মানসিক যতদূর কষ্ট হইতে পারে তাহা ঘটিতেছে। বঙ্গবাসী বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহা যে বুঝেও বুঝেন না ইহাই আক্ষেপের বিষয় এজন্য বঙ্গ আর্য্যগণের সন্তান সন্ততিদিগকে আর্য্যাচার্য্যদিগের আচার ব্যবহার সুপরামর্শ হইতেছে এ বিষয়ে অধিক ব্যয়বাহুল্য নাই; কেবল সদ্গুরুর সংমিলন আবশ্যক। পুরাকালে এতদুভয় বিষয়ই সুলভ ছিল তজ্জন্য তৎকালে ঐ উভয়বিধ কার্য্যও সর্ব্বত্র প্রচলিত থাকায় লোক সকল সুখী ছিল ইহা বলা বাহুল্য।

* * * *

বিধিপূর্ব্বক সোমরস পান করিলে যে ফল লাভ হয় নিয়মানুযায়ী পবনাভ্যাস যোগ সাধন করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। সোমরস যোগীদিগের যে সেব্য তাহার সপ্রমাণ প্রয়োগ বলা যাইতেছে যথা—

যুগে যুগেঽপি কর্ত্তব্যো যোগিনো যোগসাধনে।

পিবেৎ সোমরসং ভদ্রে আয়ুর্ম্মেধাবলপ্রদং ॥

ইতি শিবসংহিতা ॥

সুশ্রুত ১৯ বিংশতি অধ্যায়।

অতি পূর্ব্বকালে-জরা-মরণ হরণ কারণ দেবতারা যেমন অমৃত সৃজন করিয়া দেবলোকের হিত সাধন করিয়াছিলেন তদ্রূপ মর্ত্ত্যলোকে মানবগণের হিতার্থ সোমরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সোম-রস কোন্ বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় তাহা বলা যাইতেছে। সোমলতা নামক এক প্রকার লতা আছে সেই সোমলতার মূল হইতে সোমরস নির্গত হয়। সোমরস দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত ও তরল। এই সোমরস যে প্রকারে নির্গত করাইতে হয় তাহা পরে বলা যাইবে। এখন সোমলতা কত প্রকার পৃথিবীতে সৃজন হইয়াছে তদ্বিরণ এই সোমলতা স্থান নাম ও আকৃতি ভেদে ২৪ বিংশতি প্রকার। যথা। অংশুমান ১ ভুঞ্জমান্ ২ চন্দ্রমা ৩ রাজত প্রভা ৪ দূর্ব্বাসীম ৫ কনীয়ান ৬ শ্বেতাক্ষ ৭ কনকপ্রভা ৮ প্রতানবান ৯ তালবৃন্ত ১০ করবীর ১১ অংশবান্ ১২ স্বয়ম্প্রভ ১৩ মহাসোম ১৪ গরুড়াহৃত ১৫ গায়-ত্র্যাত্রৈষ্টুভ ১৬ পাঙক্ত ১৭ জগতে ১৮ শাঙ্কর ১৯, অগ্নিষ্টোম ২০, রৈবত ২১, ত্রিপদীযুক্তা ২২, গায়ত্রী ২৩, এবং উড়ুপতি ২৪। এতাদৃশ বিভিন্ন নাম ও রূপধারী সোম বেদোক্ত নামে খ্যাত। ইহাদিগের উপাসনার নিয়ম পৃথক্ নহে। গুণ তাবতের সমরূপ।

—০০—

সোম সেবনের নিয়ম।

যত প্রকার সোমের কথা বলাহইল তাহার মধ্যে যে কোন সোম পান করিবে, তাহার সেবন-নিয়ম একই প্রকার। সোম সেবন করিতে হইলে সকল-প্রকা-র উপকরণ ও পরিচারক-বিশিষ্ট তিনটি আবরণে আবৃত একটি পরিষ্কৃত স্বাস্থ্যকর আশ্রম-গৃহ নির্ম্মাণ করাইবে। প্রশস্ত দিনে শরীর মার্জ্জিত ও পবিত্র করিয়া শুভ সময়ে অংশুমান্ নামক সোম গ্রহণ করিয়া-আশ্রম-গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যজ্ঞকর্ম্মলেপ অভিষেচন ও হবন করিবে। পরে কৃতমঙ্গল হইয়া সোম-মূল সুবর্ণ সূচী দ্বারা বিদ্ধ করত সুবর্ণ পাত্রে অঞ্জলি পরিমিত ক্ষীর গ্রহণ করিবে। সেই ক্ষীর অনাস্বাদিত ভাবে পান করিবে। তৎপর আচমন করিবে। আচমনানন্তর অব-শিষ্ট সোম রস যাহা থাকিবে তাহা জলে নিমজ্জিত করিবে। তদনন্তর যম নিয়ম দ্বারা মনঃ ও বাক্য সংযত করি-য়া সুহৃৎগণ, বেষ্টিত হইয়া নবাশ্রমের মধ্যে শুদ্ধ আমোদ প্রমোদের সহিত বাস করিবে। রসায়ণ সেবনানন্তর মন্দা-নিল-সঞ্চারিত স্থানে তন্মনা ও পবিত্র ভাবে বেড়াইবে, কিন্তু নিদ্রা যাইবে না।

সায়ংকালে সোমরস পান করিলে কুশ-শয্যায় কৃষ্ণাজিন বিস্তার করিয়া তাহাতে শায়িত ও সুহৃদ্গণে বেষ্টিত হইয়া থাকিবেক তৃষিত হইলে পরিমিত মাত্রায় শীতল জল পান করিবে। প্রাতঃ-কালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শান্তি শ্রবণ

করত কৃতমঙ্গল হইয়া গোস্পর্শ পূর্ব্বক আসনে আসীন হইবে। ভুক্ত সোম জীর্ণ হইলে বমন হইতে আরম্ভ হইবে। তৎকালে শোণিতাক্ত কৃমি-মিশ্রিত বমন হইলে সায়ংকালে পাককরা শীতল দুগ্ধ পান করিবে। তৃতীয় দিবসে কৃমিমিশ্রিত বিরেচন হইবে। তদ্দ্বারা শরীর সংশোধিত হইবে। তদনন্তর সায়ংকালে স্নান করিয়া পূর্ব্ববৎ দুগ্ধপান করিবে এবং শয্যাতে পট্টবস্ত্র বিস্তীর্ণ করিয়া শয়ন করিবে। চতুর্থ দিবসে শ্বয়থু জন্মে অর্থাৎ শোথ জন্মে তৎপর সর্ব্ব শরীর হইতে কৃমি নির্গত হইতে থাকে। এই দিবস ভস্ম বিকীর্ণ শয্যায় শয়ন করিবে পরে রাত্রিকালে পূর্ব্ববৎ শীতল দুগ্ধ পান করিবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসেও ঐ নিয়ম প্রতিপালন করিবে বিশেষ এই এদিবস শীতল দুগ্ধ দুইবার পান করিবে। সপ্তম দিবসে অস্থি-চর্ম্মসার শীর্ণ-কলেবর হইবে। এই দিবসে দেহে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সেচন করিবে এবং তিল জেষ্ঠ মধু আর শ্বেত চন্দন পিসিত করিয়া গাত্রে অনুলেপ করিবে। অষ্টম দিবসে প্রাতঃকালে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ গাত্রে সিঞ্চন ও শ্বেত চন্দন লেপন ও উষ্ণ দুগ্ধ পান করিয়া পাংশু শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পট্টবস্ত্রবিস্তৃত পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিবে। তৎপর দিবস হইতে গাত্রে মাংস বৃদ্ধি হইতে থাকিবে; কিন্তু পুরাতন দন্ত নখ কেশ ও রোম সকল পতিত হইবে। নবম দিবস হইতে অভ্যঙ্গে অনুতৈল ও গাত্রসেচনে সোমবল্ক অর্থাৎ শ্বেত-খদির-জল ব্যবহার করিবে। দশম একাদশ ও দ্বাদশ দিবস পর্যন্ত এই নিয়ম প্রতিপালন করিবে। ইহাতে ত্বকের স্থিরতা জন্মিবে। ত্রয়োদশ দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত কেবল মাত্র সোম-বল্কের কষায় পরিষেচন ব্যবহার করিবে। তৎপর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ দিবসে বৈদূর্য্য স্ফটিক তুল্য দৃঢ় দন্ত সমস্ত জন্মিবে।

পরে পঞ্চ বিংশতি দিন পর্য্যন্ত শালি তণ্ডুল সংযোগে দুগ্ধে যবাগু অর্থাৎ যবমণ্ড পাক করিয়া সেবন করিবে। পঞ্চবিংশতি দিবসের পর প্রাতে ও সায়াহ্নে শালি তণ্ডুলের কোমলান্ন দুগ্ধ সহযোগে ভোজন করিবে। পরে ২৬ দিন হইতে ৩০ দিন মধ্যে রক্তবর্ণ দৃঢ় নখ ও স্নিগ্ধলক্ষণ-সম্পন্ন কেশ সকল জন্মিবে এবং গাত্রের ত্বক্ নীলোৎপলের ন্যায় আভাবিশিষ্ট হইবে।

একমাস পরে কেশ মুণ্ডন করিয়া বেনা-মূল, চন্দন, কৃষ্ণ তিল পিসিয়া সর্ব্ব গাত্রে লেপন করিবে পরে গোব্য দুগ্ধে স্নান করিবে। ইহার সপ্ত রাত্রির পরে ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি জন্মিবে ইহার ৩ দিন পরে আশ্রম-গৃহের প্রথম আবরণ হইতে বাহির হইয়া মুহূর্ত্ত মাত্র অবস্থিতি করিয়া পুনর্ব্বার আশ্রম গৃহে প্রবেশ করিবে। তদনন্তর বেনা তৈল অভ্যঙ্গার্থে, পিষ্ট যব উদ্বর্ত্তনার্থে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পরিষেচনার্থে, শাল বৃক্ষের কষায় উৎপাদনার্থে সৌবীরা কুপো-

দক স্নানার্থ, চন্দন অনুলেপনার্থ, আমলক-রস-মিশ্রিত যূপ বা যুষ এবং দুগ্ধ ও যষ্টিমধু সংযোগে কৃষ্ণ তিল সিদ্ধ অবচারণার্থে প্রয়োজ্য। এই নিয়মে ১০ রাত্রি কাল অতিবাহিত করিয়া পরে ঐ নিয়মে আবার ১০ রাত্রি কাল আশ্রমের দ্বিতীয় পরিসরে অবস্থিতি করিবে। তৃতীয় পরিসরে আবার ১০ রাত্রি কাল মনঃ স্থির পূর্ব্বক অবস্থিতি করিবে। কিঞ্চিৎ আতপ ও বায়ু সেবন করিয়া পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ করিবে। দর্পণে আত্ম-দর্শন করিবে না। পরে আর ১০ রাত্রি কাল ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিয়া সকল প্রকার আহার করিবে।

বল্লী প্রাতনও ক্ষুপ এই সকল প্রকারের সোমবিশেষ ভক্ষণীয় ইহারদিগের সেবনের পরিমাণ সার্দ্ধ ৩ মুষ্টি। অংশুমান সোম সৌবর্ণ পাত্রে, চন্দ্রমা রজত পাত্রে, অভিষেচন পূর্ব্বক সেবন করিবে। ইহাতে অষ্টৈশ্বর্য্য ও ঈশানত্ব লাভ হয়। তদ্ভিন্ন সকল প্রকার সোম তাম্র পাত্রে বা মৃন্ময় পাত্রে সেবন করিবে। শূদ্রব্যতীত অপর ৩ বর্গ সোম পান করিতে পারিবে। সোম পান করিয়া চতুর্থ মাসে পৌর্ণমাসী তিথিতে পবিত্র দেশে ব্রাহ্ম সমূহের অর্চ্চনা করিয়া আশ্রম গৃহ হইতে নির্গত হইবে। ঔষধাধিপতি সোম বিধিমৎ সেবিত হইলে মানব নবীন দেহ ধারণ করিয়া দীর্ঘজীবী হয়। অগ্নি, জল, বিষ, শস্ত্র, ইহার কিছুতেই তাহার আয়ুঃ ক্ষয় করিতে পারে না। সহস্র কুঞ্জরের বল সোম সেবনে লাভ হয়। গতি অপ্রতিহত হয়। এমন কি ক্ষিরোদ সাগর ইন্দ্রালয় ও উত্তর কুরু পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে। কন্দর্পের ন্যায় রূপ ও চন্দ্রের ন্যায় কান্তি ধারণ করে। ইহার দর্শনে সকল লোকের মন আহ্লাদিত হয়। এতদ্ভিন্ন নিখিল সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ তাহার আয়ত্ত হয়। এইরূপ লোক সকল দেবতার ন্যায় অমোঘ-সংকল্প হইয়া অখিল জগতে বিচরণ করিতে পারে। সকল প্রকার সোমেরই পঞ্চ দশ পত্র জন্মে। সেই পত্র গুলি শুক্ল পক্ষে জন্মে, কৃষ্ণ পক্ষে পতিত হয়। শুক্ল পক্ষের প্রতি চন্দ্রে এক একটি পত্র জন্মে। কৃষ্ণ পক্ষের প্রতি তিথিতে ঐ পত্র গুলি পতিত হয়। শুক্ল পক্ষের প্রতি দিন এক একটি করিয়া পত্র জন্মিয়া পৌর্ণ মাসীর দিনে পঞ্চদশ পত্র সম্পূর্ণ হয়। কৃষ্ণ পক্ষের প্রতি পদ হইতে প্রতি দিন এক একটি করিয়া পত্র শীর্ণ হইয়া পতিত হয় আমাবস্যাতে কেবল লতা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। অংশুমান্ সোম ঘৃতগন্ধ-বিশিষ্ট, রজতপ্রভ সোমলতাকন্দ-বিশিষ্ট, সেই কন্দের আকার কদলীফলের-ন্যায়। ভুঞ্জবান্ সোম লশুনের ন্যায় পত্র-বিশিষ্ট, চন্দ্রমা সোম স্বর্ণাভাবিশিষ্ট, সর্ব্বদা জলে জন্মে। গরুড়াহৃত ও শ্বেতাক্ষ সোম উভয়েই দেখিতে সর্প-নির্ম্মোক-তুল্য বৃক্ষাগ্রলম্বিত হইয়া থাকে। অন্য সকল প্রকার সোম বিচিত্র বর্ণের মণ্ডলের দ্বারা চিত্রিত। সকলপ্রকার সোমের পঞ্চদশ পত্র ও ক্ষীর কন্দলতাও

বিবিধ-প্রকার পত্রবিশিষ্ট।

হিমালয়, সহ্য, মাহেন্দ্র, মলয়, শ্রীপর্ব্বত, দেবগিরি, দেবসহ, পারিপাত্র, বিন্ধ্য, এই সকল পর্ব্বতে ও দেব সুন্দ নামক হ্রদে বিতস্তা নদীর উত্তরে যে পর্ব্বত আছে সেই পর্ব্বতে এই সকল স্থানে সোম লতা পাওয়া যায়। চন্দ্রমা নামক সোম সিন্ধু নামক মহানদে হঠবৎ ভাসিয়া থাকে। সে স্থানে ভুঞ্জবান্ ও অংশুমান্ সোমও পাওয়া যাইতে পারে। কাশ্মীরে ক্ষুদ্র মানস নামে যে দিব্য সরোবর আছে তাহাতে গায়ত্র্যা, স্ত্রৈষ্টুভ, পাংক্ত, জাগত, ও শাক্কর এবং অন্যান্য সোমও পাওয়া যায়।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

ভারতের আশা।

১

ভারতের আশা? এ যে অলীক স্বপন!
যে আশা হৃদয়ে ধ'রে, অভাগা ভারত-নরে
এত দিন জীয়ে ছিল;—সে আশা-রতন
অতল জলেতে আজি হয়েছে মগন!

২

অনর্থক অশ্রুজলে ভাসাও বদন
হে পতিত আর্য্যসুত, কি ফল রোদনে এত?
জাননা কি তোমাদের অরণ্যে রোদন?
বিধাতঃ! দরিদ্র-ভাগ্য এতই পীড়ন!

৩

দরিদ্র, অধীন বটে ভারত-তনয়!—
কিন্তু তবু আজো তার হৃদয় অমিয়াধার;
আজো ধমনীতে আর্য্য রক্ত-স্রোত বয়!
আজো আর্য্য গর্ব্বে স্ফীত তাহার হৃদয়!

৪

যা কিছু পবিত্র, যাহা উন্নত, সুন্দর,
সেই দিকে আজোহায়! আর্য্যচিত্ত বেগে ধায়;
স্বাধীনতা চায় কিন্তু না চায় সমর!
শোণিতে প্লাবিতে ধরা হৃদয় কাতর!

৫

হে ভারত-বর্ত্তমান নিয়ামকগণ—
একথা রাখিও মনে, আর্য্যসুত কি কারণে—
নীরব রোদনে আজি আছে নিমগন!
পশুভাব তাহাদের নহেক সাধন!

৬

সভ্যতার উচ্চতম, আদর্শ রতন
আর্য্যসুত-লক্ষ্য ছিল, সে আশা দুরাশা হল;—
ব্যক্তি-গত স্বাধীনতা কোথায় এখন?
কোথায় সম্বাদপত্র-স্বাধীনতা ধন?

৭

এই যদি ছিল মনে কেন তবে হায়,
হেলায় মলিন ভাতি, শত কহিনুর পতি—
রতনে, প্রথমে তুলি পরিয়া গলায়,
আজি পদতলে তারে দলিলে ঘৃণায়?

৮

বারি আশে, শুষ্ক কণ্ঠ, নির্জ্জীব পতিত,
মরুমাঝে পথিকেরে, যতনে তুষিয়া করে,
সুশীতল বারি পাত্র করিলে প্রদান?—
কেন কাড়ি নিলে পাত্র না করিতে পান?

৯

ছিল আশা বৃটনের কেতন-ছায়ায়,
মৃতপ্রায় আর্য্যজাতি, পরিহরি অধোগতি—
আবার ধরণীতলে লভি অভ্যুদয়,
খেলিবে বিচিত্র খেলা নিজ মহিমায়!

১০

মহা অনুভব অহে বৃটন সন্ততি—
নাহি কি স্মরণে আর, ভুলায়েছ কতবার
আশার কুহক-চ্ছলে!—মরি কি দুর্গতি—
দেখায়েছ সুখ স্বপ্ন বিচিত্র-মূরতি?

১১

তোমরা না স্বাধীনতা-দ্বারেতে প্রহরী?—
যাক্ প্রাণ নাহি ভয়, তোমরা না এ ধরায়,
স্বাধীনতা-হারকের ভীমতম অরি?—
নেপোলিন্-বোনাপার্ট প্রচণ্ড-সংহারী?

১২

আবার পড়ে কি মনে দয়ার উচ্ছ্বাসে,
হইয়া বিমুগ্ধ-চিত, প্রকৃত বীরের মত,
ভীম যুদ্ধে পরিত্রাণ করেছিলে দাসে?—
দাস না বৃটিশ-রাজ্যে কোথা না নিবসে?

১৩

সে দিন বৃটিশ-কবি বীর বায়রণ—
গৈরিক নিস্রব প্রায়, হৃদি যার তেজোময়,
তীব্র-জ্বালা-ময়ী যার কবিতা সুন্দরী—
স্বাধীনতা তরে জন্মভূমি পরিহরি,

১৪

লঙ্ঘিয়া অনন্ত বারি চির নীলোজ্জ্বল,
—স্ফটিক-দর্পণ-কায়া, ধরে বীর চিত্ত ছায়া
স্বাধীনতাদ্বারে যাঁরা অনন্ত প্রহরী,
ধৈর্য্যে বেগশালী চিত্ত এমনি তাঁদেরি—

১৫

বীর কবি বায়রণ, নাই কি স্মরণ,
পতিত গিরিশ দুঃখে, কাঁদিলেন মনো দুঃখে,
জাগালেন তূর্য্য-নাদে জড়েরো জীবন,—
বেড়িয়া জলধি, শৈল, ছাড়িল গর্জ্জন!—

১৬

আবার পতিত গ্রীশ হইল স্বাধীন!
এ দৃপ্ত কাহিনী-রাশি, স্মরি কি বৃটন-বাসী
চাহেরে পীড়িতে আর্ত্ত ভারত দুঃখিনী,
সভ্যতার শিশুদোলা, চির অভাগিনী?

১৭

অয়ি মাতঃ ভিক্‌টোরিয়ে! ভারত-ঈশ্বরি!
এই কি ছিল মা মনে, বিসর্জ্জিয়া দয়াগুণে—
সন্তানের প্রতি হলে হেন নিরদয়!—
কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা ত কভু নয়!

১৮

রাজ-ভক্তি পুরস্কার এই কি জননী?
ভক্তি-প্রীতি-ময় হারে, যে জাতি অর্চ্চনা করে
হৃদি যার তরঙ্গিনী, স্নিগ্ধ, সুবিমল,
বিধান পানীয় তার তীব্র হলাহল?

১৯

কোথা বার্ক, সেরিডেন্, বাগ্মী-কুলেশ্বর!
কে আজি জীমূত-মন্ত্রে, প্রতিধ্বনি কেন্দ্রে২
কাঁপাইয়া ধরাবাসী, করিবে দমন
তারে
ভারতের স্বাধীনতা হরে যেই জন।

২০

আশা আছে, জীবে আজো ব্রাইট্, ফসেট্!
তোমরা থকিতে ভবে, এদশা আবৃত রবে,
এই কি হে বাগ্মীবর হেরিবে নয়নে?—
কে করিবে প্রতিকার তোমারা বিহনে?

২১

না পার সাধিতে যদি এই প্রতিকার,
কৃষ্ণ বেশ অঙ্গে ধর, বিলাসিতা পরিহর,
মনোদুঃখে অশ্রুবারি কর বিসর্জ্জন,
ডুবিয়াছে বৃটনের গৌরব-তপন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

ইক্ষু।

ভারতবর্ষে যতপ্রকার আবাদ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ইক্ষুর আবাদ একটী বিশেষ লাভজনক এবং ইহার চাসের জন্য সকলের উচিত যে কিছু উৎসাহ প্রদান এবং যত্ন করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং পার্ব্বতীয় প্রদেশে ইহার বিশেষ সমাদর। কোন কৃষকেই প্রায় (অবশ্য যাহার কিছু সঙ্গতি আছে) ইহার আবাদের জন্য তাচ্ছল্য করে না কিন্তু সকলে জানেন যে এদেশের কৃষকেরা কৃষি-কার্য্যে নিতান্ত অজ্ঞ। যাহা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে তাহার অতিরিক্ত কিছু বৃদ্ধি করিব না, কেননা পূর্ব্ব পুরুষদিগের অপেক্ষা তাহারা কি এত বিজ্ঞ যে তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া উঠিব এই ভ্রমে পতিত হইয়াই হউক কিম্বা কোন নূতন ধারানুযায়ী করিলে পাছে শেষে বাঞ্ছিত ফল-লাভে বঞ্চিত হয় সেই ভয়েই হউক, অনেক কৃষক জানিয়াও অজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করে, কেননা একবার ব্যয় করিয়া তাহাতে বঞ্চিত হইলে পুনরায় আবার যে ব্যয় করে এমন ধনী কৃষক ত ভারতবর্ষের কোন স্থানে নাই। কিন্তু সেই জন্যই যে তাহারা কৃষিকার্য্যে অনাস্থা দেখায় তাহা নহে। তাহারা দারুণ পরিশ্রম সহকারে এই কার্য্য করিয়া থাকে। যদ্যাপি না করিবে ত উদর পূরণ কিসে হয় এবং অনেক বৃদ্ধ কৃষক নিতান্ত মূর্খ হইলেও কৃষিকার্য্য বহুকাল করা প্রযুক্ত এমন পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে যে অনেক নব্য সম্প্রদায় লোক রাশি২ পুস্তকের শ্রাদ্ধ করিয়াও তদ্রূপ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। কিন্তু যদ্যপি নব্য সম্প্রদায় কৃতবিদ্যেরা এই সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে যে তাঁহারা আমাদিগের মত অজ্ঞ লোকদিগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পারদর্শিতা লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও এখন অনেক কৃতবিদ্যদিগের উচিত হইতেছে যে তাঁহারা আর পরের চাকরি লালসায় পর্য্যটন না করিয়া ঐ সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাহা হইলে তাঁহারা যে কেবল আত্মপোষণে সক্ষম হইবেন এমত নহে, আপনার মনোবৃত্তি সকল স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিবার সুবিধাও পাইবেন। নিজের কার্য্য নহিলে নিজের বুদ্ধি খাটাইতে ভয় করে। আপনার কার্য্যের দাদ ফরিয়াদ নাই। লাভ নকসান নিজেই ভোগ করিব; কিন্তু পরের কার্য্যে তাহা হয় না তাহাদিগের কার্য্য বাঁধা অনুযায়ী করিতে হইবে। তাহাতে লাভ নকসান হয় তাহারাই ভোগ করিবে আমার তাহাতে

কিছুই নাই। তজ্জন্য বলিতেছি যে পরের চাকরিতে গেলে নিজের মানসিক বৃত্তি স্বাধীনভাবে চালনা করিতে পারা যায় না। অদ্য সহৃদয় পাঠকবর্গের নিমিত্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা হইল।—

ইক্ষুর চাস করিতে হইলে প্রথমে সমতল ভূমি দেখা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাহার পর ভূমির তারতম্য দেখিয়া তাহাতে বপন করা উচিত। উত্তর পশ্চিম এবং পার্ব্বতীয় বিভাগে কৃষকেরা যে ধারানুযায়ী ইহার আবাদ করিয়া থাকে আমি তাহাই লিখিতেছি এবং তাহাতে আয় ব্যয়ের একটী তালিকাও দিলাম এক্ষণে পাঠকেরা দেখিবেন যে কি লাভালাভ হয়। আমরা মতামত ইহাতে প্রকাশ করিতে চাহি না।

উত্তর পশ্চিম এবং পার্ব্বতীয় অঞ্চলে-ভূমি তিন প্রকার নামে আখ্যিত। তন্মধ্যে ডাঁকর (চিক্কণ মাটীবিশিষ্ট) সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্বিতীয় বোঁসলে (চিক্কণ এবং বালী মিশ্রিত। এবং তৃতীয় রেতলী (সম্পূর্ণ বালী বিশিষ্ট)। ইক্ষুর-চাষের নিমিত্ত ডাঁকর জমিই নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহার অভাবে বোঁসলে জমিতেও আবাদ হইয়া থাকে কিন্তু রেতলী জমিতে কখন ইক্ষুর চাস দিতে দেখা যায় না। জমির স্থিরতা করিয়া তাহাকে ৬। ৭ বার সম্পূর্ণ রূপে কর্ষিত এবং মায়েতা মৈই যন্ত্র দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে ঢেলা চূর্ণিকৃত করিয়া প্রত্যেক বিঘাতে ১৬০। ১৭০ মণ গবরের সার প্রয়োগ করে কিন্তু উক্ত সারের সহিত ইক্ষুর আবর্জ্জনা ভষ্ম প্রায় মিশ্রিত করিয়া দিতে দেখা যায়। এতদঞ্চলে ফাল্গুণ এবং চৈত্র মাসে ইহার আবাদ আরম্ভ করা হয়। জমি যখন ব্যবহারোপযোগী হইয়া যায় তখন কুড়ি (আলী) কাটিতে আরম্ভ করে কুড়ি গুলি প্রায় এক হাত অন্তর স্থিত। তাহার পর ইক্ষুর বীজ আনিয়া নালিতে রোপন করে (অনেকে মনে করিতে পারেন যে ইক্ষুর ফল ফলিয়া বীজ হয় এবং তাহাই বপন করে) কিন্তু তাহা নহে, কেবল এক গাছা ইক্ষুকে, চক্ষু অর্থাৎ গাঁইট গুলি রাখিয়া টুকরা টুকরা করিলেই বীজ হইল এবং এক এক টুকরার ২। ৩ গাঁইট থাকিলেও ক্ষতি নাই জমিতে বীজ রোপন করিবার সময়ে চক্ষু গুলি উপর দিকে করিয়া পাতিয়া দিয়া তাহার উপর ৪। ৫ অঙ্গুলি মাটী প্রক্ষেপ করে। ইত্যাবসরে এস্থানে বলা আবশ্যক যে বাঙ্গলার এ প্রকার বীজ রোপন পদ্ধতি নাই তথায় প্রথমে টুকরা গুলি কোন জলাশয়ের পঙ্ক স্থানে পুঁতিয়া দেওয়া হয় এবং সেই সকল অঙ্কুরিত হইয়া ৪। ৫ অঙ্গুলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে কোন বর্ষাকালীন উঠাইয়া লইয়া জমিতে রোপন করা হয়। এই প্রভেদের মূল আমার বিবেচনায় যে উত্তর পশ্চিম এবং পর্ব্বতীয় অঞ্চলে বাঙ্গালার অপেক্ষা শীতকালে তুষার অত্যন্ত পতিত হয় এবং শীত ও কিছু অধিক কাল ব্যাপী তজ্জন্য এতদঞ্চলে ফাল্গুণ এবং চৈত্র মাসে

জমি কদাচ শুষ্ক বোধ হয়। আরও এখানে মাঘ কিম্বা ফাল্গুণ মাসে একবার বিশিষ্ট রূপে প্রায় জল হইয়া যায় তাহাও একটা জমির সিক্ততার কারণ। আরও অনেক বলা যাইতে পারে কিন্তু তাহা আমার নিজের মত বলিয়া প্রকাশ করিতে সন্দেহ করি, কেন না তাহা অনেকের মনঃপূত না হইতে পারে। বাঙ্গলা এতদঞ্চলাপেক্ষা মধ্য কেন্দ্রের (Equator) নিকটবর্ত্তী, তজ্জন্য উত্তরায়ন আরম্ভেই সূর্য্য যত শীঘ্র উপরে উঠিতে থাকে তত শীঘ্র এখানে হইতে পারে না তজ্জন্য এখানে শীত অধিক-কাল-ব্যাপী। আর প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে বাঙ্গলাপেক্ষা (পার্ব্বতীয় অঞ্চল ত হইতেই পারে) উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে কিছু শীতাধিক্য হওয়া উচিত। তবে যে গ্রীষ্মকালে এখানে অত্যন্ত উষ্ণ বোধ হয় তাহার কারণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বাঙ্গালার ন্যায় উত্তরে পর্ব্বত দ্বারা, পশ্চিমে এবং পূর্ব্বে বন দ্বারা, দক্ষিণে সমুদ্র দ্বারা আবৃত নহে, আবার ভিতরে এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদীও নাহি। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এত বড় বড় মাঠ আছে যে চক্ষুর দ্বারা তাহার পরিধি করা যায় না। কেবল চারিদিগে সমতল মাঠই দেখ, মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-শূন্য গ্রাম। আরও এক কারণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী শীত কালে পর্ব্বতে যে সকল তুষার পতিত থাকে গ্রীষ্ম কালে তাহা জলরূপে পরিণত হইয়া ক্রমে নিচেই নামিতে থাকে, তজ্জন্য গ্রীষ্মকালে এতদঞ্চলে কুয়ার ৪। ৫ হাত নিম্নেই জল পাওয়া যায় কোন স্থানে কুয়া পরিপূর্ণও থাকে। তাহাতেই বোধ হয় যদিও বাঙ্গালাপেক্ষা এখানে জমি শুষ্ক দেখায় তত্রাচ নিম্নে সিক্ত থাকে, তজ্জন্য বাঙ্গলাপেক্ষা এ অঞ্চলে রবি খন্দ বিশিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যাহা হউক এতক্ষণ আমার উদ্দেশ্য প্রকাশ না করিয়া কতকগুলি প্রলাপ বকিলাম। এক্ষণে রোপণ কার্য্য শেষ হইলে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হইতে কালবিলম্ব হয় দেখিয়া এ প্রদেশের কৃষকেরা খালি কুড়ি গুলিতে স্বল্পকালস্থায়ী ফসল আবাদ করিয়া লয়—যেমন তামাক পলাণ্ডু ইত্যাদি।

ডেরাডুন এবং তন্নিকটবর্ত্তি জেলা সকলে খালের বন্দবস্ত থাকায় জল সেচন কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তজ্জন্য ইক্ষুর চাসে কৃষকেরা প্রায়ই লাভ পাইয়া থাকে। কিন্তু অপরাপর জেলা অপেক্ষা ডেরাডুন জেলায় জল সেচন সম্বন্ধে একটী বিশেষ অনিষ্ট আছে। এ জেলায় চা বাগিচা অনেক। তজ্জন্য মধ্যে২ জলের অনাটন প্রায়ই হইয়া থাকে। বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসের দারুণ শুষ্ক সময়ে নূতন রোপিত চায়ে এত জল সেচন প্রয়োজন হয় যে তাহা পূরণ করিয়া অপরাপর ক্ষেত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের একটু পক্ষপাতিতা দেখা যায়। যদিও সকলকে জলের সমান মূল্য দিতে হয়, বরঞ্চ ইক্ষু এবং ধান্যে অধিক হারে দিতে হয়,

তবে কেন অপর গরিব লোকে সুশৃঙ্খল রূপে আপন২ ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে পায় না। যাহা হউক উক্ত বিষয়ে আর অধিক বলা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে এই অসুবিধা বশতঃ প্রায়ই কৃষকেরা অনেক সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। আর ডেরাডুন জেলা ব্যতীত অপরাপর জেলার লোকেরা খাল আফিসের নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগের দৌরাত্মো কখন২ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ইক্ষু-ক্ষেত্রে জল সেচন ২০ দিন অন্তর হইলে ভাল। তবে অত্যন্ত বর্ষা হইলে না দিলেও চলে। বর্ষা কালে ইক্ষু সকল যখন ২। ৩ হাত বৃদ্ধি হয় তখন তাহার মূলে উক্ত কুড়ি সকল হইতে যথেষ্ট পরিমাণে মাটি ছড়াইয়া দেওয়া চাই। এমন কি উক্ত কুড়ি গুলির স্থানে নালিও হইয়া যায়। যখনই ক্ষেত্রে আবর্জ্জনা বৃদ্ধি হইবে তখনই পরিষ্কার কার্য্য চাই। বর্ষার প্রারম্ভে একবার খুরপী কিম্বা কোদালী দ্বারা ৩। ৪ অঙ্গুলি গভীর খোদন করিয়া দিলে ভাল হয়, বর্ষার পরে যখন ইক্ষু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপন ভরে ভূপতিত হইতে থাকে তখন ৪। ৫ গাছী একত্র করিয়া তাহাদিগের পত্র দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ভিতরে প্রয়োজন বশতঃ মজুরের যাইতে হইলে অসুবিধা হয় না, এবং শৃগাল কিম্বা ইক্ষুর অনিষ্টকারী জন্তু সকল ভিতরে যাইয়া নষ্ট করিলে ক্ষেত্ররক্ষকের অনায়াসে প্রতীয়মান হয়। শীত কালে জল সেচন সর্ব্বদাই চাই, বিশেষ পৌষ মাঘ মাসে যখন পালা (জমা শিশির) পড়িতে থাকে তখন ইক্ষু ক্ষেত্রের জমি শুষ্ক থাকিলে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে, কিন্তু নীচের জমি জল দ্বারা সিক্ত থাকিলে তাহা কখনই হইতে পারে না। এ অঞ্চলে ইক্ষু বিক্রয় বিষয়ে বড় সুবিধা। এখানে কোন সঙ্গতিপন্ন কৃষক নিজে ইক্ষুর আবাদ করিয়া থাকে এবং তৎসঙ্গে একটী পেষণ-যন্ত্রও রাখে, যখন মহাজনের গুড়ের প্রয়োজন হয় তখন উক্ত কৃষকের নিকট ঠিকা করিয়া যায় এবং উক্ত কৃষক আপন ঠিকা পূরণ করিবার জন্য নিজের ইক্ষু যত পেষণ করিয়া ফেলে এবং তৎসঙ্গে নির্দ্ধন কৃষকের ক্ষেত্র একেবারে মূল্য দিয়া ক্রয় করে। এই সুবিধা থাকা প্রযুক্ত সামান্য কৃষকদিগকে বিক্রয়ের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে হয় না। এই সকল কার্য্য কর্জ্জে চলেনা। সমুদায়ই নগদ টাকায়। মাঘ মাসে এ অঞ্চলে ইক্ষু কর্ত্তন করিয়া থাকে।

ইক্ষু রোপণ করিলে যে এক বৎসরেই তাহা সম্পন্ন হইয়া গেল তাহা নহে। যে ক্ষেত্রে গত বৎসরে ইক্ষু হইয়াছে সে ক্ষেত্রের ইক্ষু বিক্রয় হইয়া যাইলে ক্ষেত্রাধিকারী পুনরায় উহার মূলে রীতিমত সার প্রয়োগ এবং খনন কার্য্য শেষ করিয়া আগামী বৎসরের জন্য ইক্ষু প্রস্তুত করে। এই পরবর্ত্তী বৎসরে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ন্যায় ব্যয় পড়ে না। এমন কি অর্দ্ধেক ব্যয়েও সম্পন্ন হইয়া যায়। ইহাতে বিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে যে ইক্ষু একবার রোপণ

করিলে দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহার ফল ভোগ করা যায়।

নিম্ন-লিখিত তালিকায় ইহার লাভালাভ জানিতে পারা যাইবে।

এক বিঘা জমির ব্যয়।		আয়।	
জমিতে লাঙ্গল দেওয়া এবং প্রস্তুত করা	৮৲	প্রথম বৎসর বিক্রয়	৭০ টাকা
সার এবং সার প্রয়োগ	৪৷৷০		
কুড়ি কাটা ...	৵০		
বীজ ...	১৮৲		
বীজ রোপণ ...	৵০		
জল ...	৩৲		
আবর্জ্জনা পরিষ্কার (৫ বার)	৫৲		
জমির খাজনা ...	৬৲		
একবৎসরের ব্যয়	৪৬৲ টাকা		

ব্যয়		আয়	
	৪৬৲ টাকা		৭০৲ টাকা
দ্বিতীয় বৎসরের ব্যয়		দ্বিতীয় বৎসরের বিক্রয়	৯০
			১৬০ টাকা
সার এবং সার প্রয়োগ	৫৲	ব্যয় বাদ	৭০
জল ...	৩৲	মোট লাভ	৯০
আবর্জ্জনা পরিষ্কার এবং খনন	১০৲		
জমির খাজনা ...	৬৲		
	২৪টাকা		
মোট ব্যয়	৭০টাকা		

উপরের তালিকায় দৃষ্ট হইতেছে যে প্রথম বৎসরে সুন্দর ফসল হয় না। কিন্তু তাহা নহে, পতিত জমি আবাদ করিয়া ইক্ষু রোপণ করিলে প্রথম বৎসর দ্বিতীয় বৎসর অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যুন হয় বটে, কিন্তু চলিত জমিতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যে তালিকা দেওয়া গেল তাহা অনেক প্রাচীন কৃষকের মতানুসারে এবং আমার হস্তে করা প্রযুক্ত তাহার বিশেষ হিসাব থাকায় উক্ত তালিকার ব্যয়ের অংশ অধিক ধরা হইয়াছে।

এবৎসরে যে দুর্ম্মূল্যে ইক্ষু-ক্ষেত্র বিক্রয় হইয়াছে তাহাতে যে আয় ধরা হইয়াছে তাহা অর্দ্ধেক মাত্র। এক এক বিঘা ১৫০। ১৬০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

একজন চাসা।

বিষবৃক্ষ *।

যে গুণে বঙ্কিম বাবু বঙ্গীয় আখ্যায়িকা-লেখকদিগের শীর্ষ স্থানীয় হইয়াছেন, যে গুণে তিনি বঙ্গের প্রতি গৃহের প্রতি হৃদয়ের উপাস্য দেবতা-স্বরূপ হইয়াছেন, তাহা চরিত্র চিত্রন। আভ্যন্তরীণ চরিত্র চিত্রনে তাঁহার ক্ষমতা অসীম। বাল্মীকি ও ব্যাস, ভবভূতি ও কালিদাস, এবং বাণভট্টের পর ভারতে এরূপ চিত্রকর অল্পই জন্মিয়াছেন। কিন্তু যে চিত্রে তিনি এই অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন তাহা হৃদয়ের একটী মাত্র ভাবের। যে ভাবে মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই ভাবের। যে ভাবে পিশাচ পিশাচীও দেব দেবী হয় সেই ভাবের। মানুষের সুখ ও দুঃখের প্রধান নিয়ন্তা, সেই প্রণয়-ভাবের চিত্রনেই বঙ্কিম বাবুর বিশেষ পারদর্শিতা। সেই প্রণয়ের বিভিন্ন বিভিন্ন আবর্ত্তনে মনুষ্য হৃদয়ে যে সকল তরঙ্গ উত্থিত হয়, বঙ্কিম বাবুর আখ্যায়িকা গুলিতে তাহাই পরিব্যক্ত। তাঁহার আয়েষা ও তিলোত্তমা, মৃণালিনী ও মনোরমা, কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতী, শৈবলিনী ও দলনী, সূর্য্যমুখী ও কুন্দ, বিমলা ও কমলমণি, হীরা ও রজনী; এবং তাঁহার জগৎসিংহ ও ওসমান, হেমচন্দ্র ও পশুপতি, নবকুমার ও নগেন্দ্র, প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর, অমরনাথ ও শচীন্দ্র—সমস্তই প্রণয়ের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রতিকৃতি। বঙ্কিম বাবু সেক্‌পীয়ার, সিলার, ফীল্‌ডিং প্রভৃতির ন্যায় প্রতিহিংসা, দ্বেষ, দুরাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি অসংখ্য নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির; এবং স্বজাতিপ্রেম, মানবপ্রেম, দয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির, উত্তেজনায় মানবহৃদয়ে যে অসংখ্য বিবর্ত্ত উত্থিত হয়, মানব-কর্ত্তৃক যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার চিত্র দেখান নাই বটে; কিন্তু প্রণয়কে ভারতচন্দ্রের জঘন্য ইন্দ্রিয়পরতা হইতে উত্তোলিত করিয়া অতি উচ্চ ও পবিত্র স্বর্গীয় সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া, বঙ্গদেশে অতর্কিতভাবে একটী চমৎকার নৈতিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর আখ্যায়িকা প্রচারিত হওয়ার পর অল্প বঙ্গীয় নর নারীকে বিদ্যাসুন্দর ও পাঁচালীর কুৎসিত প্রেম-চিত্রের অনুশীলন করিতে দেখা যায়।

মনুষ্য জাতিকে উন্নত করার প্রধান উপায় প্রণয়। 'ভাল বাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্ম্মল এবং অবিনশ্বর সুখ।

* শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বঙ্গদর্শন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৶০।

ভাল বাসাই মনুষ্য-জাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্য মাত্রে পরস্পরে ভাল বাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না'। যিনি লোককে পবিত্র ও নিঃস্বার্থভাবে ভাল বাসিতে শিখাইতে পারেন—তিনি জগতের একজন প্রধান শিক্ষক ও মঙ্গলদাতা। যে সূত্রেই হউক আত্মবিসর্জ্জন শিক্ষা একবার আরম্ভ হইলে, তাহা আধার হইতে আধারান্তরে ক্রমেই প্রসৃত হইয়া পড়ে। প্রণয়-মাহাত্মো যিনি একবার একজনের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, অন্যের জন্য আত্মবিসর্জ্জন তাঁহার পক্ষে অতি সহজ হইয়া দাঁড়ায়। যিনি সেই আত্মবিসর্জ্জন শিক্ষা দেন, তিনি মানবজাতির পরম বন্ধু সন্দেহ নাই। এই জন্যই আমরা বঙ্কিম বাবুকে বঙ্গীয় যুবক যুবতীর প্রিয় বন্ধু ও প্রধান শিক্ষক বলিয়া মনে করি।

যৌবনের প্রারম্ভে যখন ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল উত্তেজিত হয়, তখন বঙ্কিম বাবুর আখ্যায়িকা সকল যুবক যুবতীগণকে জঘন্য ভোগলালসা হইতে আত্মবিস্মৃতিতে ও আত্মবিসর্জ্জনে লইয়া যায়, যাহাকে ভাল বাসি তাহার সহিত সম্ভোগের ইচ্ছা হইতে, তাহার সুখের জন্য আত্মসুখ বলিদান দিতে অগ্রসর করে। হৃদয়ের সেই দুর্ব্বলতার সময় এরূপ শিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়।

শাস্ত্রকর্ত্তার কঠোর নিয়ম, ও ধর্ম্মোপদেষ্টার দুর্লঙ্ঘ্য শাসন লোকের মনকে ভোগলালসা হইতে ফিরাইতে কখনই সমর্থ হয় নাই। কারণ প্রণয়বৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা তাঁহাদিগের লক্ষ্য। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর লক্ষ্য ভোগলালসার মূলে কুঠারাঘাত করা; প্রণয়-বৃত্তির মূলে নহে। বঙ্কিম বাবু জানেন যে প্রণয় মানুষকে দেবতা করে, আত্মবিস্মৃত করে, পরসুখে আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিখায়; প্রণয় যত পরিপুষ্ট হইবে, ততই জগতের মঙ্গল; ভোগলালসাই মানুষের যত অনিষ্টের মূল; ভোগলালসা হইতেই তাঁহার "বিষবৃক্ষের" সৃষ্টি। সুতরাং ভোগলালসার সংযমন করিতে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার আখ্যায়িকা সকলের নৈতিক উদ্দেশ্য। বিষবৃক্ষে এই নৈতিক লক্ষ্য বিশেষরূপে প্রতিভাত। নগেন্দ্রের ভোগলালসা দমন করার শিক্ষার অভাবই বিষবৃক্ষের অঙ্কুর।

বঙ্কিম বাবু যে কয়খানি আখ্যায়িকা রচনা করিয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল ও বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন তাহার মধ্যে "বিষবৃক্ষ" আমাদিগের মত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভাবের গভীরতায় ও রচনার শিল্প-পারিপাট্যে ইহা বঙ্গভাষায় প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত।

এই চিত্রপটে ছয়টী ছবি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। দুইটী পুরুষের। নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্রের; চারিটী স্ত্রীলোকের সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, কমলমণি ও হীরার। শ্রীশ এ পুষ্পস্তবকের নবীন পল্লবমাত্র। আমরা এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে এক একটী করিয়া কয়টী

ছবির স্বতন্ত্র ফটোগ্রাফ তুলিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া পাঠকদিগকে পরিতৃপ্ত করিব।

—oo—

নগেন্দ্রনাথ।

নগেন্দ্রনাথ দত্ত গোবিন্দপুরের বিপুল-ঐশ্বর্য্যশালী জমিদার। যে সময়ে বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয় সে সময় নগেন্দ্রের বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বর্ষমাত্র। প্রকৃতি নগেন্দ্রনাথকে অশেষ সুখের অধিকারী করিয়াছিলেন। অনুপম কান্তি, অতুল ঐশ্বর্য্য, সুস্থ শরীর, সর্ব্বশাস্ত্রাবগাহিনী বিদ্যা, শান্ত ও বিনীত চরিত্র, পতিপ্রাণা প্রেমময়ী ভার্য্যা—এসমস্তই তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। নগেন্দ্রের বিমল ও উদার চরিত্রগুণে নগেন্দ্র আশৈশব নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি সত্যবাদী অথচ প্রিয়ভাষী, পরোপকারী অথচ ন্যায়পরায়ণ, দানশীল অথচ মিতব্যয়ী, স্নেহশীল অথচ কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তিনি পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত, ভার্য্যানুরক্ত, শত্রুমিত্রসমদর্শী, আশ্রিতপ্রতিপালক, বন্ধুর হিতকারী এবং ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান্ ছিলেন। তিনি পরামর্শে বিচক্ষণ, কার্য্যে উদ্যমশীল, আলাপে বিনয়ী এবং রহস্যে বাক্‌পটু ছিলেন। এরূপ নির্ম্মল ও উদার চরিত্রের পরিণাম—নিরবচ্ছিন্ন বিমল সুখ। নগেন্দ্রও আশৈশব তাহার অধিকারী ছিলেন।

নগেন্দ্রের জীবন-স্রোতে এতদিন কোন তরঙ্গ উঠে নাই। যে ঘাত-প্রতিঘাতে মনুষ্য-জীবনে ভীষণ বিবর্ত্ত উত্থিত হয়, নগেন্দ্রের জীবনে এতদিন তাহা ঘটে নাই। যাহা বাঞ্ছনীয় নগেন্দ্রের সমস্তই ছিল—দেশে সম্ভ্রম, বিদেশে যশ; ভার্য্যার অবিচলিত, অপরিমিত ও অকলুষিত প্রেমরাশি; দাস দাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা; প্রজাগণের প্রগাঢ় ভক্তি; এবং বিপুল-ঐশ্বর্য্য-জনিত ভোগরাশি—নগেন্দ্র এক সময়ে এ সমস্তই ভোগ করিতেছিলেন। অভাব কি এবং তজ্জনিত দুঃখ কি নগেন্দ্র এতদিন তাহা জানিতে পারেন নাই। অভাবজনিত দুঃখ দূর করণের ইচ্ছাই লালসা। নগেন্দ্রের এতদিন কোন অভাব ছিল না, সুতরাং তজ্জনিত দুঃখ, এবং সেই দুঃখ দূর করণের লালসাও জন্মে নাই। এতদিনে সেই অভাব দেখা দিল। বয়স সহকারে সূর্য্যমুখীর রূপের হ্রাস হইতে লাগিল। সূর্য্যমুখীতে এতদিন নগেন্দ্রের রূপতৃষ্ণা ও প্রেমতৃষ্ণা উভয়ই নিবারিত হইতেছিল; কিন্তু রূপতৃষ্ণা এখন আর সম্পূর্ণ নিবারিত হইল না। এতদিনে নগেন্দ্র অন্তরে কিঞ্চিৎ অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্র বিষবৃক্ষের বীজ ধারণক্ষম হইল। ক্ষেত্র কৃষ্ট হইল, এক্ষণে বীজের অপ্রতুল। তাহাও শীঘ্র সংযোজিত হইল।

নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে কলিকাতায় আনিয়া যখন তাহার মাতৃষ্বস্‌পতির বাটীর অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন নিরাশ্রয়া আশ্রিতা বালিকার প্রতি

তাঁহার মমতা জন্মিল। কুন্দের রূপ বীজরূপে তাঁহার কৃষ্ট হৃদয়-ক্ষেত্রে পতিত হইল। বীজ যে উপ্ত হইল, তাঁহার প্রিয়বন্ধু হরদেব ঘোষালকে তিনি যে পত্র লিখেন, তাহাতে পরিব্যক্ত আছে। পত্রখানি এই ;——

"বল দেখি কোন্ বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী? তুমি বলিবে চল্লিশ পরে, কেন না তোমার ব্রাহ্মণীর আরও দুই এক বৎসর হইয়াছে। কুন্দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম, তাহার বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয়, যে এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবন সঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যে রূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকেনা। এই কুন্দের সরলতা চমৎকার; সে কিছুই বুঝে না। আজিও রাস্তার বালকদিগের সহিত খেলা করিতে ছুটে, আবার বারণ করিলেই ভীতা হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হয়। কমল তাহাকে লেখা পড়া শিখাইতেছে। কমল বলে, লেখা পড়ায় তাহার দিব্য বুদ্ধি। কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝে না। বলিলে, বৃহৎ, নীল, চক্ষু দুইটী—শরতের পদ্মের মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটী-চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে, কিছু বলে না আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারিনা। তুমি আমার মতিস্থৈর্য্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে, বিশেষ তুমি বাতিকের গুণে গাছ কয় চুল পাকাইয়া ব্যঙ্গ করিবার পরওয়ানা হাসিল করিয়াছ; কিন্তু যদি তোমাকে সেই দুইটী-চক্ষের সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারি, তবে তোমারও মতিস্থৈর্য্যের পরিচয় পাই। চক্ষুদুইটী যে কিরূপ, তাহা আমি এপর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার একরকম দেখিলাম না; আমার বোধ হয় যেন এ পৃথিবীর সে চোখ্ নয়; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখেনা, অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে। কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখন দেখি নাই। বোধ হয় যেন, কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী-ছাড়া কিছু আছে, রক্ত মাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয়না। অতুল্য পদার্থটী, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন শান্তভাব-ব্যক্তি—যদি স্বচ্ছ সরোবরে শরচ্চন্দ্রের কিরণ সম্পাতে যে ভাব ব্যক্তি তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভূত করিতে পারিবে। তুলনার অন্য সামগ্রী পাইলাম না।"

অলৌকিক সুশীলতা ও সরলতার প্রতিবিম্ব কুন্দনন্দিনীর রূপ যেরূপ রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহার ঘাত প্রতিহত করা নগেন্দ্রের অসাধ্য হইল।

নগেন্দ্র নিভৃতে ও সযত্নে সে রূপ হৃদয়ে পোষিত করিলেন। সূর্য্যমুখীর অনুরোধানুসারে কুন্দকে বাটী আনিলেন; তারাচরণের সহিত কুন্দের বিবাহ দিলেন। তিন বৎসরের মধ্যেই কুন্দ বিধবা হইলেন। বিধবা কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহে আবার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এতদিন নগেন্দ্রের কুন্দ-লালসা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অদৃশ্য ও অভিভূত ছিল। আবার তাহা ক্রমে ক্রমে সন্ধুক্ষিত হইতে লাগিল। যে বীজ নগেন্দ্র এতদিন সযত্নে লালিত করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা এত দিনে অঙ্কুররূপে পরিণত হইল। কুন্দ-লালসা নগেন্দ্রের মনে ক্রমেই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কুন্দের বয়স এখন ১৭।১৮। কুন্দের রূপলাবণ্যে এখন জগৎ আলোকিত হইয়াছে—নগেন্দ্রের হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়াছে। অভাবের পরিপূরণ না হইলে যে দুঃখ—নগেন্দ্র এখন তাহা অনুভব করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র এ দুঃখের পরিহার জন্য চিত্ত সংযমনে প্রাণপণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্তসংযমনের চেষ্টা সূর্য্যমুখীর পত্রে অতি সুন্দর রূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে:——"আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সে দিকে নয়ন ফিরাণ না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি, তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। তাহাকে বিনা দোষে ভৎর্সনাও করিতে শুনিয়াছি"। নগেন্দ্র এইরূপে কুন্দলালসা উন্মূলিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। সূর্য্যমুখী তাঁহার প্রত্যেক স্খলন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কখন কখন কুন্দের জন্য অন্যমনে নগেন্দ্রের চক্ষু এদিক্ ওদিক্ চাহে; সূর্য্যমুখীকে দেখিলে নগেন্দ্র অমনি চক্ষু ফিরাইয়া লন; কুন্দের কণ্ঠধ্বনি শুনিবার জন্য নগেন্দ্র হাতের গ্রাস হাতে করিয়া কাণ তুলিয়া থাকেন; হাতের ভাত হাতে থাকে, কি মুখে দিতে কি মুখে দেন, তবু কাণ তুলিয়া থাকেন, আবার কুন্দের স্বর কাণে গেলেই বড় জোরে হাপুস হুপুস করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন; এবং অন্যমনস্ক হইয়া সকল কথাতেই "হুঁ" দেন। নগেন্দ্রের এই কুন্দময়তা সূর্য্যমুখীর নিকট অবিদিত রহিল না। কুন্দের বৈধব্য ও অনাথিনীত্ব অন্যের মুখে শুনিলে নগেন্দ্রের কষ্ট হইত। তিনি তথা হইতে বেগে চলিয়া যাইতেন। তাঁহার মধ্যে মধ্যে গোত্রস্খলন হইত। কুমুদ নামে একজন দাসীকে ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলিতেন। আর সর্ব্বদাই অপ্রতিভ ও কুণ্ঠিত হইতেন। ক্রমে নগেন্দ্রের কুন্দতৃষ্ণা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি কুন্দকে বিবাহ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত আসিলে তাঁহাদিগের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রণীত বিধবাবিবাহ

বিচার নামক পুস্তক লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেন। যাঁহারা বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা স্বীকার করিতেন তাঁহাদিগকে সবিশেষ পুরস্কৃত করিতে লাগিলেন। কুন্দময়-জীবিত নগেন্দ্র ক্রমে পতি-প্রাণা সূর্য্যমুখীর অনাদর আরম্ভ করিলেন।

চিত্তসংযমে অক্ষম হইয়া নগেন্দ্র কুন্দস্মৃতি বিলোপের জন্য আর এক উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি মদ্যপ হইলেন। ভাবিলেন মদ্যে তিনি কুন্দকে ভুলিবেন। যদি তাহা নিতান্ত অসাধ্য হয়, মদ্যপ হইয়া অন্ততঃ তিনি তাঁহার প্রতি সূর্য্যমুখীর অবিচলিত ভক্তি টলাইবেন। তাহা হইলে অন্ততঃ তাঁহার হৃদয়ের যাতনা অনেক কমিবে। কিন্তু তিনি এই দুই লক্ষ্যেই অকৃতকার্য্য হইলেন। মদ্যে কুন্দস্মৃতিরও বিলোপ সাধন হইল না, সূর্য্যমুখীরও ভক্তি টলিল না। ঘাত প্রতিঘাতে নগেন্দ্রের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। নগেন্দ্র ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। নগেন্দ্রের বিষম দায়, আর থাকে না। একদিন সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের দুইটী চরণে হাত দিয়া কষ্টে অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া নগেন্দ্রকে বলিলেন "কেবল আমার অনুরোধে, ইহা ত্যাগ কর"। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "দোষ কি?" সূর্য্যমুখী বলিলেন "দোষ কি, তাহাত আমি জানি না। কেবল আমার অনুরোধ"। নগেন্দ্র প্রত্যুত্তর করিলেন "সূর্য্যমুখী! আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও, নচেৎ আবশ্যক করে না"। একদিন তিন চারি হাজার প্রজা নগেন্দ্রের কাছারির দরওয়াজায় করযোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—"দোহাই হুজুর—নায়েব গোমস্তার দৌরাত্ম্যে আর বাঁচি না। সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। আপনি না রাখিলে কে রাখে?" যে নগেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে একজন গোমস্তা এক জন প্রজাকে মারিয়া একটী টাকা লইয়াছিল বলিয়া তাহার বেতন হইতে দশটী টাকা কাটিয়া লইয়া প্রজাকে দিয়াছিলেন, সেই প্রজাবৎসল কারুণিক নগেন্দ্র আজ কি না হুকুম দিলেন "সব হাঁকায় দেও"। নগেন্দ্র যে উচ্চ চরিত্র হইতে দিন দিন স্খলিত হইতেছিলেন তাহা তিনি নিজে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হরদেব ঘোষালের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন "আমার উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি"।

নগেন্দ্র যখন দেখিলেন যে মদ্যপানেও কুন্দস্মৃতি বিলুপ্ত হইল না, প্রাণপণে চিত্ত সংযমনেও কুন্দলালসা দমিত হইল না, তখন তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া সেই অতৃপ্ত লালসা চরিতার্থ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। স্থির করিলেন কুন্দের নিকট হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটিত করিয়া ও বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিয়া তাহাকে বিবাহে সম্মত করিবেন। এক দিন প্রদোষ কালে, উদ্যান-মধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দনন্দিনী আত্ম অদৃষ্ট ভাবিতে ছা

বিতে নিরতিশয় কাতর হইয়া দেহ বিসর্জ্জনে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্বপ্নদত্ত মাতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ যেমন ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে অতি ধীরে ধীরে আসিয়া কুন্দের পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কুন্দ! কালি কলিকাতায় যাইবে?" কুন্দ কোন উত্তর করিল না—চক্ষু মুছিল। নগেন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কুন্দ! ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছ?" কুন্দ আবার চক্ষু মুছিল—কোন উত্তর দিল না। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কুন্দ!—কাঁদিতেছ কেন?" কুন্দ এবার কাঁদিয়া ফেলিল! নগেন্দ্রের ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল। এতদিন নগেন্দ্র যে হৃদয় অতি কঠোর শাসনে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ কুন্দের হৃদয়োচ্ছ্বাসে সেই হৃদয়ের কপাট সহসা উৎঘাটিত হইল। নগেন্দ্র অবারিত ভাবে কুন্দকে তথায় প্রবেশ করিতে দিলেন। বলিলেন "শুন কুন্দ! আমি বহুকষ্টে এতদিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি কষ্টে যে বাঁচিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি। মদ্যপ হইয়াছি। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন কুন্দ! এখন বিধবা-বিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করি। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"

কুন্দ এবার কথা কহিল, বলিল "না"। আবার নগেন্দ্র বলিলেন "কেন কুন্দ! বিধবাবিবাহ কি অশাস্ত্র?" কুন্দ আবার বলিল "না"। নগেন্দ্র আবার বলিলেন, "তবে না কেন? বল—বল—বল—আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভাল বাসিবে কি না?" কুন্দ পুনরপি বলিল "না।" জ্ঞানবান্ নগেন্দ্র অজ্ঞানা বালিকার নিকট পরাস্ত হইলেন। নগেন্দ্র লজ্জিত হইলেন। তাঁহার কুন্দলালসা এবার পরিতৃপ্ত হইল না; কিন্তু এই প্রতিঘাতে সেই লালসানল নির্ব্বাপিত না হইয়া উদ্দীপিত হইল। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের শ্রদ্ধা বাড়িল—প্রেম খরতর হইল।

ইহার অনতিপরে একটী ঘটনায় নগেন্দ্রের কুন্দ-প্রেম প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। হরিদাসী বৈষ্ণবী-রূপী দেবেন্দ্রের সহিত কুন্দের নির্জ্জনালাপ দেখিয়া একদিন সূর্য্যমুখী কুন্দকে কুলটা সম্ভাবনা করিয়া বিশেষ তিরস্কার করেন। কুন্দ সহিতে না পারিয়া রজনীযোগে নগেন্দ্রের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। নগেন্দ্র শুনিলেন কুন্দনন্দিনী সূর্য্যমুখীর তিরস্কারেই দেশত্যাগিনী হইয়াছেন। নগেন্দ্রের মস্তক ঘুরিল। বিষের জ্বালায় তাঁহার শরীর জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যমুখীকে নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছিলে?" সূর্য্যমুখী কথাটা প্রথমে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, বলিলেন

"কি বলিয়াছিলাম?" নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন দুর্ব্বাক্য?" সূর্য্যমুখী তখন আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি কাতর ভাবে কুন্দের কলঙ্ক সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন পূর্ব্বক স্বামীর নিকট আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন "তোমার বিশেষ অপরাধ নাই। তুমি যেরূপ কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন্ ভদ্র লোকের স্ত্রী তাকে মিষ্ট কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে? কিন্তু একবার ভাবিলে ভাল হইত যে, কথাটা সত্য কি না? তুমি তারাচরণের কোন্ দিনের ঘরের খবর না জানিতে? কুন্দের সঙ্গে যে প্রকারে দেবেন্দ্রের যেরূপ তিন বৎসরের আলাপ, তাই কোন্ না শুনিয়াছ? তবে মাতালের কথায় বিশ্বাস করিলে কেন?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন "তখন সে কথা ভাবি নাই। এখন ভাবিতেছি"। নগেন্দ্র বলিলেন "ভাবিলে না কেন?" সূর্য্যমুখী উত্তর করিলেন, "আমার মনের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল"। সে ভ্রান্তির মূল যে ঈর্ষা—সূর্য্যমুখী স্বামীর নিকট ইহা অকপটে স্বীকার করিবেন বলিয়া নগেন্দ্রের চরণযুগল দুই হস্তে ধারণ করিয়া অগ্রে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "তোমায় বলিতে হইবে না। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত"। সূর্য্যমুখী অকপটে তাহা স্বীকার করিয়া আত্মকৃত কর্ম্মের জন্য গভীর অনুশোচনা ব্যক্ত করিলেন। নগেন্দ্র অনেক ক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, শেষ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সূর্য্যমুখী! অপরাধ সকলিই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা। যথার্থই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে—কি বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্ত দমনের চেষ্টা করি নাই; এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা, আমার চিত্ত বশ হইল না"। সূর্য্যমুখী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া কাতরস্বরে নগেন্দ্রকে বিরত হইতে বলিলেন। নগেন্দ্র শুনিলেন না; আবার বলিতে লাগিলেন—"না। তা নয়, সূর্য্যমুখী! আরও শুনিতে হইবে। যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি—কেননা অনেক দিন হইতে বলি বলি করিতেছি। আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আমার সুখ নাই। [illegible] আমার আর সুখ [illegible] অযোগ্য স্বামী। আমি আর ক[illegible] থাকিয়া তোমাকে ক্লেশ দিব না। কুন্দ-

নন্দিনীর সন্ধান করিয়া আমি দেশ দেশান্তরে ফিরিব। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিধবা—যাহার স্বামী এরূপ পামর, সে বিধবা নয়ত কি? কিন্তু আমি পামর হই আর যাই হই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না। আমি অন্যাগত প্রাণ হইয়াছি—সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব না এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনাকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব! নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ"।

এই নিষ্ঠুর বাক্য পতিপ্রাণা সূর্য্যমুখীর হৃদয়ে কিরূপ শেলসম বাজিবে তাহা নগেন্দ্র একবার ভাবিয়া দেখিলেন না। তিনি আত্মসংযম করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজ তাঁহার সকলই পণ্ড হইল। আযৌবন সূর্য্যমুখীর সহিত তাঁহার যে প্রেম গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছিল, সেই প্রেমতরু আজ তিনি স্বহস্তে উন্মূলিত করিলেন। তাঁহার অদ্যকার চিত্তচাঞ্চল্য হইতেই বিষবৃক্ষের ফলোৎপত্তি। তিনি যে কুন্দের জন্য আজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিলেন. তাঁহার অদ্যকার নিষ্ঠুরতা তাহার মৃত্যুর বীজ বপন করিল। তিনি যে সূর্য্যমুখীকে এতদিন প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিয়াছিলেন, তাহার ভবিষ্য অমানুষোচিত যন্ত্রণার আজ তিনি সূত্রপাত করিলেন। তিনি যে অমৃততরু স্বহস্তে জলসিঞ্চন দ্বারা পরিপোষিত করিয়াছিলেন, আজ তাহা স্বয়ং অর্দ্ধছিন্ন করিলেন। সূর্য্যমুখীর অশেষ যন্ত্রণা ও কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর দায়িত্ব আজ তিনি নিজ মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

নগেন্দ্র মনে করিলেই—কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেই—ইহার প্রতিকার করিতে পারিতেন; সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী উভয়কেই বাঁচাইতে পারিতেন। সূর্য্যমুখী স্বামীর চরণ ধরিয়া বলিলেন,—"এক ভিক্ষা"। নগেন্দ্র বলিলেন "কি?।" সূর্য্যমুখী বলিলেন "আর একমাস মাত্র গৃহে থাক। ইতিমধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া যায়, তবে তুমি দেশত্যাগ করিও। আমি মানা করিব না"। নগেন্দ্র মৌনভাবে ব্যক্ত করিলেন তিনি একমাস অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত, এবং অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সূর্য্যমুখী যেদিন সহসা কুন্দের সাক্ষাৎ পাইলেন সেই দিন কুন্দকে বলিলেন "কুন্দ? এসো—দিদি এসো! আর আমি তোমায় কিছু বলিব না"। এবার সূর্য্যমুখীর সঙ্কল্প, কুন্দের হস্তে প্রাণপ্রতিম স্বামীকে অর্পণ করিয়া নিজে সন্ন্যাসিনী হইবেন। কমলমণিকে পত্র লিখিলেন "তুমি কুন্দনন্দিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। তাহাকে পাওয়া গিয়াছে—শুনিয়া সুখী হইবে—ষষ্ঠীদেবতার পূজা দিও। তাহা ছাড়া আরও একটা খোসখবর আছে—কুন্দের সঙ্গে আমার স্বামীর বিবাহ হইবে। এ বিবাহে আমিই ঘটক। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রে আছে—তবে দোষ

কি? দুই এক দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে। তুমি আসিয়া জুটিতে পারিবে না—নচেৎ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতাম। পার যদি তবে ফুলশয্যার সময়ে আসিও। কেন না তোমাকে দেখিতে বড় সাধ হইয়াছে"। কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্র এই সংবাদে চমকিত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া নগেন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিলেন। নগেন্দ্র তাহার প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিলেন, তাহা এই :—

"ভাই! আমাকে ঘৃণা করিও না। অথবা সে ভিক্ষাতেই বা কাজ কি? ঘৃণাস্পদকে অবশ্য ঘৃণা করিবে। আমি এ বিবাহ করিব। যদি পৃথিবীর সকলে আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব। নচেৎ আমি উন্মাদগ্রস্ত হইব—তাহার বড় বাকিও নাই। এ কথা বলার পর, আর বোধ হয় কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। তোমরাও বোধ হয়, ইহার পর আর আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন কথা বলিবে না। যদি বল, তবে আমিও তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি। "যদি কেহ বলে যে, বিধবা-বিবাহ হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই, যেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবাবিবাহশাস্ত্রসম্মত; তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে? আর যদি বল, শাস্ত্রসম্মত হইলেও ইহা সমাজসম্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইব; তাহার উত্তর, এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য? যেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আমার আবার সমাজচ্যুতি কি? তথাপি আমি তোমাদিগের মনোরক্ষার্থে এ বিবাহ গোপনে রাখিব—আপাততঃ কেহ জানিবে না।

"তুমি এসকল আপত্তি করিবে না। তুমি বলিবে, দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ কাজ। ভাই, কিসে জানিলে, ইহা নীতিবিরুদ্ধ কাজ? তুমি এ কথা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছ, নচেৎ ভারতবর্ষে এ কথা ছিল না। কিন্তু ইংরেজেরা কি অভ্রান্ত! মুসার বিধি আছে বলিয়া ইংরেজদিগের এ সংস্কার—কিন্তু তুমি আমি মুসার বিধি ঈশ্বরবাক্য বলিয়া মানি না, তবে কি হেতুতে এক পুরুষের দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বলিব?

"তুমি বলিবে, যদি এক পুরুষের দুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর দুই স্বামী না হয় কেন? উত্তর—এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা; এক পুরুষের দুই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে সন্তানের পিতৃনিরূপণ হয় না—পিতাই সন্তানের পালনকর্ত্তা—তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিতে পারে। কিন্তু পুরুষের দুই বিবাহে সন্তানের মাতার অনিশ্চয়তা জন্মে না। ইত্যাদি আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে।

"যাহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকারক তাহাই নীতি-বিরুদ্ধ। তুমি

যদি পুরুষের দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বিবেচনা কর, তবে দেখাও যে, ইহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকর।

"গৃহে কলহাদির কথা বলিয়া তুমি আমাকে যুক্তি দিবে। আমি একটা যুক্তির কথা বলিব। আমি নিঃসন্তান। আমি মরিয়া গেলে, আমার পিতৃকুলের নাম লুপ্ত হইবে। আমি এ বিবাহ করিলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা—ইহা কি অযুক্তি?

"শেষ আপত্তি—সূর্য্যমুখী। স্নেহময়ী পত্নীর সপত্নী-কণ্টক করি কেন? উত্তর—সূর্য্যমুখী এ বিবাহে দুঃখিতা নহেন। তিনিই বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে উদ্যোগী। তবে আর কাহার আপত্তি? তবে কোন্ কারণে আমার এই বিবাহ নিন্দনীয়?"

নগেন্দ্র পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ হইয়াও ভ্রমে পতিত হইলেন। দ্বিবিবাহ বা বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যে প্রধান আপত্তি গৃহে কলহাদি—তাহার কথা তিনি তুলিলেন বটে কিন্তু সে আপত্তি'ত খণ্ডন করিলেন না।

আর তিনি ভাবিলেন সূর্য্যমুখী এ বিবাহে দুঃখিতা নহেন—কারণ? সূর্য্যমুখীই এবিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন—তিনিই ইহাতে উদ্যোগী। কিন্তু সূর্য্যমুখীর হৃদয় যে এবিবাহের পক্ষপাতী নহে, তাহা তিনি বুঝিয়াও বুঝিলেন না। নগেন্দ্র, যৌবনের প্রারম্ভ হইতে সূর্য্যমুখীর সহিত একত্রে বাস করিয়াও সূর্য্যমুখীর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিলেন না।

সূর্য্যমুখী কুন্দের সহিত স্বামীর বিবাহ দিয়া কমলমণিকে আনাইয়া তাঁহার নিকট মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে রজনীযোগে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। নগেন্দ্রের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

যে কুন্দের জন্য নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী হেন ভার্য্যাকেও পায় ঠেলিয়াছিলেন, আজ সূর্য্যমুখী বিরহে সেই কুন্দও নগেন্দ্রের চক্ষুঃশূল হইলেন।

সূর্য্যমুখীর পলায়নের পর প্রদোষে নগেন্দ্র শয়ন করিয়া আছেন—কুন্দনন্দিনী শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। আর কেহ নাই অথচ দুই জনেই নীরব। কুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিলে, যেমন ছিল, তেমনই হয়?" "কি করিলে সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে?"

নগেন্দ্র উত্তর করিলেন "ঐ কথাটি তুমি মুখে আনিও না। তোমার মুখে সূর্য্যমুখীর নাম শুনিলে আমার অন্তর্দাহ হয়—তোমারই জন্য সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল"। কুন্দ একথায় মর্ম্মে ব্যথিত হইয়া নীরবে ব্যজন করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কুন্দ! কথা কহিতেছ না কেন? রাগ করিয়াছ?" কুন্দ বলিল "না"। নগেন্দ্র কহিলেন "কেবল একটি ছোট্টো "না"

বলিয়া আবার চুপ করিলে? তুমি কি আমায় আর ভাল বাস না?" কুন্দ বলিলেন "বাসি বই কি?" নগেন্দ্র কহিলেন "বাসি বই কি?" এ যে বালক ভুলান কথা। কুন্দ! বোধ হয়, তুমি আমায় কখন ভাল বাসিতে না'। কুন্দ বলিলেন "বরাবর বাসি"। নগেন্দ্র—সরলা বালার এই সরল ও স্বল্পবাক্ প্রেমকাহিনীর গম্ভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমাকে সূর্য্যমুখী বরাবর ভাল বাসিত। বানরের গলায় মুক্তার হার সহিবে কেন?—লোহার শিকলই ভাল"। আজিকার মর্ম্মপীড়ায় অনাথিনী কুন্দ মৃত্যুপথে অর্দ্ধেক অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন। মৃত্যুদিবসের পূর্ব্বে কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের আর দেখা হয় নাই। আজ কুন্দের সুখের শেষ দিন।

সূর্য্যমুখীর পলায়নে নগেন্দ্রের মনে সূর্য্যমুখী প্রেম দ্বিগুণতর বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সূর্য্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের যে প্রগাঢ় অনুরাগ দুই দিনের জন্য কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সে আবরণ অপসারিত হওয়ায়—আজ সেই অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত ঔজ্জ্বল্যের সহিত নগেন্দ্রের মনে প্রতিভাত হইল। সূর্য্য অস্ত গেলেই লোকে বুঝিতে পারে যে সূর্য্যদেবই সংসারের চক্ষু—সূর্য্য বিনা সংসার আঁধার; আর আজ সূর্য্যমুখীকে হারাইয়া নগেন্দ্র বুঝিলেন—যে সূর্য্যমুখী বিনা তাঁহার সংসার আঁধার—সূর্য্যমুখীই তাঁহার আঁধার ঘরের একমাত্র দীপ। নগেন্দ্র যে কুন্দকে ভাল বাসেন নাই বা বাসেন না এরূপ নহে, কিন্তু সে ভালবাসা অনেকটা রূপবতীর রূপভোগ-লালসা, প্রকৃত ও নিঃস্বার্থ প্রেম নহে। "চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই" এ সে ভালবাসা নহে। এ রূপজ মোহমাত্র। সুন্দরীর রূপ দর্শনে যে চিত্ত-বিকৃতি উপস্থিত হয়, রূপ-ভোগে শীঘ্রই তাহার তীক্ষ্ণতা অপনীত হয়। ভোগে সে রূপ তৃষ্ণার শীঘ্রই পরিতৃপ্তি জন্মে। নগেন্দ্র আজ পোনর দিন মাত্র কুন্দকে বিবাহ করিয়াছেন। এই পোনর দিনের ভোগেই নগেন্দ্রের কুন্দরূপতৃষ্ণা অনেক পরিমাণেই উপশমিত হইয়াছিল। এই জন্যই সূর্য্যমুখীর পলায়নের পর অতি দ্রুতবেগে কুন্দচ্ছায়া নগেন্দ্রের হৃদয়াকাশ হইতে অপসারিত হইল। এ প্রেম গুণজনিত প্রেম হইলে, এত শীঘ্র ইহার পরিতৃপ্তি হইত না। প্লাবনের জলের ন্যায় এত শীঘ্র ইহা নগেন্দ্রের চিত্তক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইত না।

গুণজনিত প্রণয় যেমন বহুকালসাধ্য, তেমনই বহুকাল-স্থায়ী। 'প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা, আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গ-ফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন,—যে প্রেম ক্রমে এই সোপানাবলী দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করে, তাহাই প্রকৃত প্রণয়; তাহা বহু-

কাল-সাধ্য হইলেও অনন্তকালস্থায়ী; মধ্যে মধ্যে তাহার বিচ্ছেদ ঘটিলেও, তাহার বিলয় অসম্ভব। সূর্য্যমুখীর সহিত বহুদিনের সহবাসে নগেন্দ্রের সেই প্রেম জন্মিয়াছিল। এই জন্য কিছুদিনের বিচ্ছেদে সেই প্রেমের বিলয়সাধন হইল না। ইহা মেঘোন্মুক্ত শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় আবার অপূর্ব্ব জ্যোতি ধারণ করিল। সেই চন্দ্রের আবির্ভাবে সূর্য্যমুখীকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া নগেন্দ্র অনুতপ্ত হইলেন। সূর্য্যমুখীর পলায়নের পর নগেন্দ্র প্রিয় বন্ধু হরদেব ঘোষাল'কে যে পত্র লিখেন, তাহার অক্ষরে অক্ষরে এই অনুতাপ পরিব্যক্ত। সে পত্র খানি এই—

"তুমি লিখিয়াছ যে, আমি এ পৃথিবীতে যত কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা, সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক কাজ। ইহা আমি স্বীকার করি। আমি এই কাজ করিয়া সূর্য্যমুখীকে হারাইলাম। সূর্য্যমুখীকে পত্নী ভাবে পাওয়া বড় জোর কপালের কাজ। সকলেই মাটী খোঁড়ে, কহিনুর একজনের কপালেই উঠে। সূর্য্যমুখী সেই কহিনুর। কুন্দনন্দিনী কোন্ গুণে তাঁহার স্থান পূর্ণিত করিবে?

"তবে কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলাম কেন? ভ্রান্তি! ভ্রান্তি! এখন চেতনা হইয়াছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল মরিবার জন্য। আমারও মরিবার জন্য এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। এখন সূর্য্যমুখীকে কোথায় পাইব?

"আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমি কি তাহাকে ভাল বাসিতাম? ভাল বাসিতাম বৈ কি—তাহার জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইতে বসিয়াছিলাম—প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে কেবল চোকের ভালবাসা। নহিলে আজি পনের দিবস মাত্র বিবাহ করিয়াছি—এখনই বলিব কেন, "আমি তাহাকে ভাল ভাসিতাম? ভাল বাসিতম কেন? এখনও ভালবাসি—কিন্তু আমার সূর্য্যমুখী কোথায় গেল? * *"

নগেন্দ্রের কুন্দপ্রেম অনেকটা রূপজ মোহ বটে, কিন্তু ইহাতে গুণজ প্রেমও কিঞ্চিৎ মিশ্রিত ছিল। রূপজ মোহরূপ খাদ পুড়িয়া ভস্ম হইল, কিন্তু গুণজ প্রেমরূপ সুবর্ণকণিকাটুকু গলিয়া নির্ম্মল হইয়া পড়িয়া রহিল। এই জন্যই নগেন্দ্র হৃদয় হইতে কুন্দস্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়াও বলিতে বাধ্য হইলেন—"এখনও ভাল বাসি"। কিন্তু সেই নগেন্দ্রের কুন্দপ্রেম-সুবর্ণকণাটুকু যেই সূর্য্যমুখীর প্রেমসাগরের নিকটে আনীত হইল, অমনি সেই অতল জলে পড়িয়া ডুবিয়া গেল, অমনি সূর্য্যমুখীস্মৃতি প্রবল হইয়া উঠিল—আর নগেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু আমার সূর্য্যমুখী কোথায় গেল?"

হরদেব ঘোষাল প্রত্যুত্তরে নগেন্দ্রকে অনেক বুঝাইলেন; অনেক উপদেশ

দিলেন, বলিলেন "তুমি নিরাশ হইও না। সূর্য্যমুখী অবশ্য পুনরাগমন করিবেন—তোমাকে না দেখিয়া তিনি কতকাল থাকিবেন? যতদিন না আসেন, তুমি কুন্দনন্দিনীকে স্নেহ করিও। তোমার পত্রাদিতে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হইয়াছে, তিনিও গুণহীনা নহেন। রূপজ মোহ দূর হইলে, কালে স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে। এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তবে তাঁহাকে ভুলিতেও পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠা তোমাকে ভাল বাসেন। ভাল বাসায় কখন অযত্ন করিবে না। * *"

"তদলব্ধপদং হৃদি শোকঘনে প্রতিযাতমিবান্তিকমস্য গুরোঃ।" কিন্তু সেই গভীরভাবপূর্ণ সারগর্ভ উপদেশগুলি শোকাভিভূত নগেন্দ্রের অন্তরে স্থান না পাইয়া যেন বন্ধুবরের নিকট প্রত্যাগমন করিল। নগেন্দ্র উত্তরে লিখিলেন, "তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা সকলই বুঝিয়াছি এবং তোমার পরামর্শ যে সৎপরামর্শ, তাহাও জানি। কিন্তু গৃহে মন স্থির করিতে পারি না। একমাস হইল, আমার সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইলাম না। তিনি যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাইবার কল্পনা করিয়াছি। আমিও গৃহ ত্যাগ করিব। দেশে দেশে তাঁহার সন্ধান করিয়া বেড়াইব। তাঁহাকে পাই, লইয়া গৃহে আসিব; নচেৎ আর আসিব না। কুন্দনন্দিনীকে লইয়া আর গৃহে থাকিতে পারি না। সে চক্ষুশূল হইয়াছে। তাহার দোষ নাই—দোষ আমারই—কিন্তু আমি তাহার মুখদর্শন আর সহ্য করিতে পারি না। আগে কিছু বলিতাম না—এখন নিত্য ভর্ৎসনা করি—সে কাঁদে,—আমি কি করিব? আমি চলিলাম।"

নগেন্দ্রের এক্ষণে চিত্তোন্মাদ জন্মিয়াছে। তাঁহার স্বাভাবিক প্রিয়ম্বদতা ও দয়ার্দ্র-চিত্ততা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি সামান্য দাস দাসীর প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, আজ অভাগিনী কুন্দের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার করিতেও অনিচ্ছুক। তিনি দুঃখিনী কুন্দকে সেই শূন্য পুরীতে হীরার হস্তে সমর্পণ করিয়া ও বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দাওয়ানের উপরে ন্যস্ত করিয়া অচিরাৎ সূর্য্যমুখীর অন্বেষণার্থ নির্গত হইলেন।

নগেন্দ্র নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া সূর্য্যমুখীর কোন অনুসন্ধান না পাইয়া অবশেষে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। তথায় পৌঁছিয়া গোবিন্দপুরে দাওয়ানকে সংবাদ দিলেন। দাওয়ান তাঁহার নামীয় যত চিঠিপত্র তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি ব্রহ্মচারীর পত্রে সূর্য্যমুখী মধুপুরে হরমণি নাম্নী এক বৈষ্ণবীর আলয়ে মৃত্যুশয্যায় শয়ান—এই সংবাদ পাইলেন।

নগেন্দ্রের মস্তকে বজ্র পড়িল। তিনি কাতরস্বরে জগদীশ্বরের চরণে এই ভিক্ষা চাহিলেন—"জগদীশ্বর! মুহূর্ত্ত জন্য

আমার চেতনা রাখ।" নগেন্দ্রের সে প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল,—ক্ষণেকের জন্য নগেন্দ্রের চৈতন্য বিলুপ্ত হইল না। সেই অবসরে তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন "আজ রাত্রেই আমি রাণীগঞ্জ যাত্রা করিব—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তুমি তাহার বন্দবস্ত কর।"

কর্ম্মাধ্যক্ষও প্রভুর নিয়োগ পালন করিতে গেলেন—নগেন্দ্রও অনাচ্ছাদিত ভূমিতলে শয়ন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

সেই রাত্রেই নগেন্দ্র মধুপুর যাত্রা করিলেন। শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর পত্র অনেক দিন পরে পৌঁছিয়াছিল বলিয়া নগেন্দ্রের মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা হইতে লাগিল। তাঁহার মনে স্বতঃ এইরূপ তর্ক উঠিল—আজও কি সূর্য্য-মুখী সেইখানেই আছেন? যদি না থাকেন তবে "এখন সূর্য্যমুখী কোথায়?"

নগেন্দ্র অনেক কষ্টে পাল্কীযোগে মধুপুরে আসিয়া কবিরাজ রামকৃষ্ণ রায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট একটী একটী করিয়া প্রশ্ন করিয়া ক্রমে ক্রমে এই অনুমানে উপনীত হইলেন যে গৃহদাহে সূর্য্যমুখীর মৃত্যু হইয়াছে।

বাতাহত কদলীর ন্যায় নগেন্দ্র চেয়ার হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। দারুণ আঘাতে মস্তিষ্ক আলোড়িত হইল—মূর্চ্ছা ক্ষণকালের জন্য তাঁহার যাতনা হরণ করিল। কবিরাজ নগেন্দ্রের শুশ্রূষায় নিরত হইলেন।

নগেন্দ্রের অদৃষ্টে কি শেষে এই ছিল? কে ভাবিয়াছিল যে তাঁহার দুঃখে আজ পাষাণও বিগলিত হইবে? তিনি অতুল সম্পত্তি, অনন্ত গুণরাশি, দুর্লভ স্ত্রীরত্নের অধিকারী হইয়াও—কেন আজ পথের কাঙ্গালীরও শোচ্য? তাঁহার কোনও অভাব ছিল না, তথাপি একটী অভাবের সৃষ্টি করায় আজ তাঁহাকে সকল থাকিতে বলিতে হইল—"আমার এত দিনে সব ফুরাইল"।

"আমার এতদিনে সব ফুরাইল"—এই ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্র সেই দিনই সন্ধ্যাকালে পাল্কীযোগে মধুপুর হইতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সূর্য্যমুখীর প্রাপ্তির আশার সহিত নগেন্দ্রের আজ সব ফুরাইল। তিনি "গোবিন্দপুরে গৃহে বাস করিতে চলিলেন না; গৃহধর্ম্মের নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে চলিলেন। সে অনেক কাজ। বিষয় আশয়ের বিলিব্যবস্থা করিতে হইবে। জমীদারী, ভদ্রাসন বাড়ী, এবং অপরাপর স্বোপার্জ্জিত স্থাবর সম্পত্তি ভাগিনেয় সতীশচন্দ্রকে দানপত্রের দ্বারা লিখিয়া দিবেন—অস্থাবর সম্পত্তি সকল কমলমণিকে দান করিবেন—সে সকল গুছাইয়া কলিকাতায় তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। কিছুমাত্র কাগজ আপনার সঙ্গে রাখিবেন—যে কয় বৎসর তিনি জীবিত থাকেন, সেই কয় বৎসর তাহাতেই তাঁহার নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। কুন্দ-

নন্দিনীকে কমলমণির নিকট পাঠাইবেন। আর সূর্য্যমুখী যে খাটে শুইতেন, সেই খাটে শুইয়া একবার কাঁদিবেন। সূর্য্যমুখীর অলঙ্কার গুলিন লইয়া আসিবেন। সে গুলি কমলমণিকে দিবেন না—আপনার সঙ্গে রাখিবেন। যেখানে যাবেন, সঙ্গে লইয়া যাবেন। পরে যখন সময় উপস্থিত হইবে তখন সেই গুলি দেখিতে দেখিতে মরিবেন। এই সকল আবশ্যকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, নগেন্দ্র জন্মের শোধ ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দেশ পর্য্যটন করিবেন। আর যতদিন বাঁচিবেন, পৃথিবীর কোথাও এক কোণে লুকাইয়া থাকিয়া দিন যাপন করিবেন"। নগেন্দ্র মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিতে করিতে শিবিকারোহণে গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

আজ সূর্য্যমুখী যদি নগেন্দ্রের এই সঙ্কল্প জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত দুঃখ দূর হইত!

নগেন্দ্রনাথ শিবিকায় শয়ন করিয়া আপনার অতীত জীবন-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া অনুশোচনাবিদ্ধ হইতে লাগিলেন—মনে মনে বলিলেন "সব আমারই দোষ। আমার তেত্রিশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছে। ইহারই মধ্যে আমার সব ফুরাইল। অথচ জগদীশ্বর আমাকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহার কিছুই ফুরাইবার নহে। যাহাতে যাহাতে মনুষ্য সুখী, সে সব আমাকে ঈশ্বর যে পরিমাণে দিয়াছিলেন, সে পরিমাণে প্রায় কাহাকেও দেন না। ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, মান, এ সকল ভূমিষ্ঠ হইয়া অসাধারণ পরিমাণে পাইয়াছিলাম। বুদ্ধি নহিলে এ সকলে সুখ হয় না—তাহাতে বিধাতা কার্পণ্য করেন নাই। শিক্ষায় পিতা মাতা ত্রুটি করেন নাই—গোবিন্দপুরে আমার তুল্য সুশিক্ষিত কে? রূপ, বল, স্বাস্থ্য, প্রণয়শীলতা, তাহাও প্রকৃতি আমাকে অমিত হস্তে দিয়াছেন। ইহার অপেক্ষাও যে ধন দুর্ল্লভ—যে একমাত্র সামগ্রী এ সংসারে অমূল্য—অশেষ প্রণয়শালিনী সাধ্বী ভার্য্যা—ইহাও প্রসন্ন কপালে ঘটিয়াছিল। সুখের সামগ্রী পৃথিবীতে এত আর কাহার ছিল? আজি এত অসুখী পৃথিবীতে কে? আজি আমার ধন সম্পদ্ মান, রূপ যৌবন বিদ্যা বুদ্ধি, সর্ব্বস্ব দিলে, যদি আমি আমার শিবিকার একজন বাহকের সঙ্গে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে স্বর্গসুখ মনে করিতাম। বাহক কি? এই দেশের রাজকারাগারে এমন কে নরঘ্ন পাপী আছে, যে আমার অপেক্ষা সুখী নয়, আমা হতে পবিত্র নয়? তারাত অপরকে হত করিয়াছে। আমি সূর্য্যমুখীকে বধ করিয়াছি। আমি ইন্দ্রিয় দমন করিলে, সূর্য্যমুখী বিদেশে আসিয়া কুটীরদাহে মরিবে কেন? আমি সূর্য্যমুখীর বধকারী—কে এমন পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন আছে যে, আমার অপেক্ষা গুরুতর পাপী? সূর্য্যমুখী কি

আমার কেবল স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য! আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?"

সূর্য্যমুখী! আজ নগেন্দ্রের প্রেমসাগরে তোমার প্রেম-তরঙ্গিণী বিলীন হইল। আজ প্রেমপ্রদর্শনে নগেন্দ্রের নিকট তুমি পরাস্ত হইলে। তোমার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী রমণী জগতে আজও জন্মে নাই। কালিদাসের নায়িকা শকুন্তলার জন্য দুষ্মন্ত এবং ইন্দুমতীর জন্য অজ, কখন এমন গভীর প্রেমরাশি দেখাইতে পারেন নাই। এরূপ প্রণয়িনীময় স্বামীর আদর্শ রামচন্দ্র ভিন্ন আর কোন প্রণয়ী কখন দেখাইয়াছেন কি না জানি না। কবি এখানে তাঁহার ভাবুকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

নগেন্দ্রের প্রেমপ্রদর্শন শুদ্ধ চিন্তায় আবদ্ধ রহিল না। পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল যে সূর্য্যমুখী পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াই পীড়াগ্রস্তা হইয়াছিলেন—অমনি নগেন্দ্র পাল্কী হইতে নামিয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। পদব্রজে যাইতে যাইতে মনে করিলেন "ইহ জীবন এই সূর্য্যমুখীর বধের প্রায়শ্চিত্তে উৎসর্গ করিব। কি প্রায়শ্চিত্ত? সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া যে সকল সুখে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন—আমি সে সকল সুখভোগ ত্যাগ করিব। ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, দাস, দাসী, বন্ধু, বান্ধবের আর কোন সংশ্রব রাখিব না। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া অবধি যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, আমিও সেই সকল ক্লেশ ভোগ করিব। যে দিন গোবিন্দপুর হইতে যাত্রা করিব, সেই দিন হইতে আমার গমন পদব্রজে, ভোজন কদন্ন, শয়ন বৃক্ষতলে বা পর্ণকুটীরে। আর কি প্রায়শ্চিত্ত? যেখানে যেখানে অনাথিনী স্ত্রীলোক দেখিব, সেইখানে প্রাণ দিয়া তাহার উপকার করিব। যে অর্থ নিজ ব্যয়ার্থ রাখিলাম, সে অর্থে আপনার প্রাণধারণ মাত্র করিয়া অবশিষ্ট সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সেবার্থে ব্যয় করিব। যে সম্পত্তি স্বত্ব ত্যাগ করিয়া সতীশকে দিব, তাহারও অর্দ্ধাংশ আমার যাবজ্জীবন সতীশ সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যে ব্যয় করিবে, ইহাও দানপত্রে লিখিয়া দিব। প্রায়শ্চিত্ত! পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়। দুঃখের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই। দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত

কেবল মৃত্যু। * * *" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্র পদব্রজে রাত্রি দুই প্রহরের সময় কলিকাতায় শ্রীশচন্দ্রের বৈটকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র বৈটকখানায় বসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "সূর্য্যমুখী কোথায়?" নগেন্দ্র বলিলেন "স্বর্গে"। নগেন্দ্র পূর্ব্বে স্বর্গ মানিতেন না; কিন্তু এখন প্রেম ও বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। "সূর্য্যমুখী কোথাও নাই" এ চিন্তা তিনি সহিতে পারিতেন না বলিয়া, "সূর্য্যমুখী স্বর্গে আছেন" বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন। নগেন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের মুখে তাঁহার অনুসন্ধানে ব্রহ্মচারীর গোবিন্দপুর ও কলিকাতায় আগমন, এবং ব্রহ্মচারীর মুখে শ্রুত সূর্য্যমুখীর বাটী হইতে বহির্গমন দিন হইতে যাবতীয় কষ্ট বিবরণ শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন; অনেক যত্নে চৈতন্য সঞ্চার হইলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "সূর্য্যমুখী! প্রাণাধিকে! কোথায় তুমি?" নগেন্দ্রের চক্ষে এতদিন জল ছিল না; আজ সেই সংরুদ্ধ স্রোত প্রবল বেগে বহিল। 'নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বালকের মত বহুক্ষণ রোদন করিলেন। ইহাতে যন্ত্রণার অনেক উপশম হইল।'

নগেন্দ্র গোবিন্দপুরে প্রত্যাগমন করিয়া হৃদয়বেগ সংরুদ্ধ করিয়া ধীর ও প্রশান্তভাবে পৌরবর্গের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন। সূর্য্যমুখীর কথাও মুখে আনিলেন না। তাঁহার গম্ভীর শোকে সকলেই কাতর হইল। নগেন্দ্র সকলের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা কহিলেন "কেবল একজনকে মনঃপীড়া দিলেন। চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না"।

নগেন্দ্রের আদেশানুসারে দাসীরা সূর্য্যমুখীর শয়নমন্দিরে নগেন্দ্রের শয্যা প্রস্তুত করিয়াদিল। নগেন্দ্রনাথ নিশীথকালে, সকলে নিদ্রা গেলে, একাকী সেই শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সে শয়নমন্দিরের উপমান এ জগতে নাই। কবির মানসী সৃষ্টি বিধাতার সৃষ্টিকে পরাজিত করিয়াছে। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর অমানুষ প্রেম এই শয়নমন্দিরেই প্রতিভাত। এ মন্দির—ইন্দ্র ও শচী, মদন ও রতি, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, হর ও গৌরীর জন্যই যেন নির্ম্মিত হইয়াছিল; সেই দম্পতিনিচয়ের কোনটী যেন মানবশরীর ধারণ করিয়া নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

'নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। * * খাটের পার্শ্বে আর একটী দ্বার খোলা ছিল—সে দ্বার দিয়া বাতাস আসিতেছিল না, সে দ্বার মুক্ত রহিল'। নগেন্দ্র একটী সোফার উপর বসিয়া অনেক কাঁদিলেন; উজ্জ্বল দীপালোকে সূর্য্যমুখীর অভিমত ছবিগুলি দেখিতে লাগিলেন। গৃহের দেউলে একস্থানে সূর্য্যমুখীর স্বহস্তলিখিত এই অক্ষরগুলি দেখিতে পাইলেন—"১৯১০ সম্বৎসরে ইষ্টদেবতা স্বামীর স্থাপনা জন্য এই মন্দির তাঁহার দাসী সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত হইল"। অশ্রুজলে নগেন্দ্রের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। ক্রমে দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইল—নগেন্দ্র শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন। অকস্মাৎ ঝটিকা প্রবল হইয়া উঠিল—সেই ক্ষীণ দীপ ক্ষীণতর হইল। সেই অন্ধকারময় আলোতে নগেন্দ্র এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলেন। খাটের পার্শ্বস্থ' সেই মুক্ত দ্বারপথে ক্ষীণালোকে এক ছায়াতুল্য মূর্ত্তি দেখিলেন। ছায়া স্ত্রী-রূপিণী। * * স্ত্রী-রূপিণী মূর্ত্তি, সূর্য্যমুখীর অবয়ববিশিষ্টা'। নগেন্দ্র অমনি পর্য্যঙ্ক হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ছায়াপ্রতি ধাবমান হইলেন। অমনি ছায়া অন্তর্ধান করিল। ক্ষীণ দীপালোকও নির্ব্বাণ হইল। নগেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

ছায়াময়ী মূর্ত্তি মূর্চ্ছিত নগেন্দ্রকে উরুদেশে রাখিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে নগেন্দ্রের চৈতন্য সঞ্চার হইল। তিনি কোমলতায় উপাধানকে রমণীর উরুদেশ বুঝিতে পারিয়া কুন্দনন্দিনী সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?"। রমণী কোন উত্তর দিলেন না। দুই একবিন্দু অশ্রুজল নগেন্দ্রের গাত্রে পতিত হইয়া তাঁহাকে জানাইল যে রমণী কাঁদিতেছেন। নগেন্দ্র তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিয়া সূর্য্যমুখী বলিয়া বোধ হওয়ায় চমকিত হইলেন। সূর্য্যমুখী অনেক দিন মরিয়াছেন, তাঁহার আগমন কিরূপে সম্ভব? বুঝিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিলেন। রমণী ধীরে ধীরে দ্বারোদ্দেশে চলিলেন। স্ত্রীমূর্ত্তি ক্ষণকাল দাঁড়াইল। নগেন্দ্র সেই দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তির চরণতলে পতিত হইয়া কাতরস্বরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন, "তুমি দেবতাই হও, আর মনুষ্যই হও, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমার সঙ্গে একবার কথা কও। নচেৎ আমি মরিব"।

রমণী এবার কথা কহিলেন—কি কহিলেন নগেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু স্বরসংযোগে সূর্য্যমুখী বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তীব্রবেগে দাঁড়াইয়া দণ্ডায়মানা রমণীকে হৃদয়ে ধারণ করিতে গেলেন। কিন্তু শরীর ও মন অবসন্ন হওয়ায় বৃক্ষচ্যুত লতার ন্যায় রমণীর চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন। আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রমণী আবার উরুদেশে মস্তক রাখিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রত্যুষে নগেন্দ্রের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু না চাহিয়া বলিলেন, "কুন্দ তুমি কখন আসিলে? আমি আজি সমস্ত রাত্রি সূর্য্যমুখীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নে দেখিতেছিলাম সূর্য্যমুখীর কোলে মাথা দিয়া আছি। তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে পারিতে, তবে কি সুখ হইত?" রমণী অমনি বলিয়া উঠিলেন, "সেই পোড়ার মুখীকে দেখিলে যদি তুমি এত সুখী হও, তবে আমি সেই পোড়ার মুখীই হইলাম"। নগেন্দ্র চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন। তাঁহার মন ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল। তিনি আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কি পাগল হইলাম—না সূর্য্যমুখী বাঁচিয়া আছেন? শেষে এই কি কপালে ছিল?

আমি পাগল হইলাম!" এই বলিতে বলিতে নগেন্দ্র ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়া অধোমুখে কাঁদিতে লাগিলেন।

এবার রমণী আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বামীর চরণযুগল ধরিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন, "উঠ, উঠ! আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! মাটী ছাড়িয়া উঠিয়া বসো। আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ, উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি"।

নগেন্দ্রের ভ্রম বিদূরিত হইল। তিনি উঠিয়া সূর্য্যমুখীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার বক্ষে মুখ রাখিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া অশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। পরে উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া কত রোদন করিলেন। একটী কথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হইল না!

ইহা বলা বাহুল্য যে এই ছায়ানামক পরিচ্ছেদটী উত্তররামচরিতের ছায়ানামক অঙ্কের আদর্শে গঠিত। সে অঙ্কে তিরস্করিণী বিদ্যাপ্রভাবে রাম সীতাকে দেখিতে পাইতেছেন না, অথচ সীতা রামকে দেখিতেছেন। সংস্পর্শে রাম সীতা বলিয়া বুঝিতেছেন, অথচ সীতাকে দেখিতে পাইতেছেন না। এই জন্য আপনার উন্মাদ আশঙ্কা করিতেছেন। তিরস্করিণীর অভাবে এখানে কবির নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের অবতারণা করিতে হইয়াছে। অন্ধকারময় আলোকে নগেন্দ্র ছায়াময়ী সূর্য্যমুখীকে চিনিতে পারেন নাই। ছায়া দেখিয়া প্রথমে তিনি মূর্চ্ছা যান। মূর্চ্ছাভঙ্গে স্পর্শে সূর্য্যমুখী বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু সূর্য্যমুখী বাঁচিয়া আছেন বলিয়া নগেন্দ্র জানিতেন না। এই জন্য স্পর্শেন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সীতা বাঁচিয়া আছেন বলিয়া রামও জানিতেন না, এই জন্য তাঁহারও স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রতি প্রত্যয় জন্মে নাই। পূর্ব্বদিকে যখন প্রভাতোদয় হইতে লাগিল, তখন নগেন্দ্র স্ত্রীমূর্ত্তিকে কতক কতক দেখিতে পাইলেন। শেষে রমণীর স্বর শুনিলেন—যত নগেন্দ্রের সন্দেহ ভঞ্জন হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মনে বিস্ময় ও ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। মৃতা সূর্য্যমুখী কোথায় হইতে আসিলেন? ভয়ে ও বিস্ময়ে তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতা মৃতা বলিয়া রামচন্দ্রেরও সংস্কার ছিল, এই জন্য শুদ্ধ সীতাসংস্পর্শে রামচন্দ্রেরও সীতাজ্ঞান জন্মে নাই।

দ্বিতীয়বার মূর্চ্ছাভঙ্গে অর্দ্ধ-বিভ্রান্ত নগেন্দ্র নিমীলিত নয়নে অঙ্কাশ্রয়দায়িনী রমণীকে কুন্দ মনে করিয়া যখন বলিতে লাগিলেন তখনও তিনি সূর্য্যমুখীর মৃতোত্থান সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন নাই। তাহার পর যখন সূর্য্যমুখী "আমি সেই পোড়ারমুখীই হইলাম" বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন তখনও নগেন্দ্রের চৈতন্য হইল না। নগেন্দ্র কেবল আপনাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদে নগেন্দ্রের এরূপ

অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে তিনি সম্মুখবর্ত্তিনী মূর্ত্তিকে উন্মাদবিজৃম্ভিত ভিন্ন আর কিছু বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। রমণী চরণপ্রান্তে পতিত হওয়াতেই কেবল সেই ভ্রম বিদূরিত হইল।

অনেকক্ষণ পরে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের নিকট বিচ্ছেদকালের সমস্ত আত্মবিবরণ বলিলেন। সমস্ত গোবিন্দপুর আনন্দে উথলিয়া উঠিল। সূর্য্যমুখীর সুখের আর ইয়ত্তা রহিল না। কিন্তু পৃথিবীর সুখ সকলই অনিত্য। সূর্য্যমুখী সুখসোপানে পা দিয়াছেন মাত্র এমন সময় এরূপ একটী ঘটনা ঘটিল যাহাতে নগেন্দ্র ও তাঁহার সুখ কিছুদিনের জন্য ব্যাহত হইল। কুন্দ নগেন্দ্রের অনাদরে বিষপান করিলেন।

—০০—

নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র।

আমরা বিষবৃক্ষের সেই প্রকাণ্ড গুণ হইতে নগেন্দ্র চিত্রের স্বতন্ত্র ফটোগ্রাফ্ তুলিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে ধারণ করিলাম। নগেন্দ্রই বিষবৃক্ষের পুরুষচরিত্রের শিরোভূষণ। নগেন্দ্রের হৃদয় অতি উচ্চ ও উদাত্ত ভাবে পরিপূরিত। প্রণয়ই নগেন্দ্র-হৃদয়ের প্রবল ভাব। দেবেন্দ্রের প্রণয়ের ন্যায় নগেন্দ্রের প্রণয় কলুষিত ছিল না। নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র উভয়েই কুন্দনন্দিনীর অলোকসামান্য রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন; উভয়েরই চিত্ত অনিবার্য্য বেগে কুন্দের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রের পঙ্কিল স্বভাব নানা অসৎ উপায়ে কুন্দকে গৃহত্যাগিনী করিয়া সামান্য বেশ্যার অবস্থায় পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। নগেন্দ্র কুন্দকে করায়ত্ত পাইয়াও পাছে কুন্দচরিত্রে কলঙ্কারোপ হয় এই জন্য নিয়ত চিত্তসংযম করিয়াছিলেন। যখন চিত্তসংযমে অক্ষম হইলেন—তখন অসংখ্য বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়াও কুন্দকে বিবাহ করিলেন। নগেন্দ্রের ন্যায় সুবিধা পাইলে দেবেন্দ্র হয়ত কুন্দকে হীরার অবস্থায় পরিণত করিতেন। নগেন্দ্র ঘটনাস্রোতে অবনত একটী উচ্চ ও উদাত্ত হৃদয়ের প্রতিকৃতি, দেবেন্দ্র প্রণয়ে হতাশ একটী অধঃপতিত হৃদয়ের ছবি। মনস্বী ব্যক্তি একবার স্খলিতপদ হইলেও আবার উঠিতে পারেন—নগেন্দ্র তাহার নিদর্শন। দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি একবার পড়িলে ক্রমেই নিম্ন হইতে নিম্নতম বাটতে থাকে—দেবেন্দ্র তাহার দৃষ্টান্ত। চিত্তসংযমে অক্ষম যুবা পুরুষ প্রেমময়ী ভার্য্যায় বঞ্চিত হইলে কতদূর অধঃপাতে যাইতে পারে—দেবেন্দ্র তাহার নিদর্শন। প্রেমময়ী ভার্য্যাসত্বেও ক্ষণিক চিত্তসংযমাভাবে মনীষীরও স্খলন অসম্ভব নয়—নগেন্দ্র তাহার দৃষ্টান্ত।

দেবেন্দ্র পড়িয়া নারকী, নগেন্দ্র উঠিয়া উজ্জ্বলতর দেবতা। তুলনায় নগেন্দ্র-চরিত্রের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনার্থই দেবেন্দ্রের সৃষ্টি। দেবেন্দ্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অতিঘোর ও দীর্ঘকালব্যাপী, নগেন্দ্রের স্খলনের দণ্ড অতি কোমল ও ক্ষণিক।

শ্রীশ চন্দ্র।

যেমন নবীন শ্যামল পত্রদল একটী পুষ্পস্তবকের শোভা সম্বর্দ্ধন করে, সেইরূপ শ্রীশচন্দ্র এই গল্পের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছেন। দেবেন্দ্রের হতাশ প্রণয় ও নগেন্দ্রের প্রতিহত প্রণয়ের মধ্যস্থলে শ্রীশচন্দ্রের সন্তভুক্ত ও অপ্রতিহত প্রণয়ের ছবি অতি সুন্দর। শ্রীশ—পত্নীগতপ্রাণ একটী নব্য বাঙ্গালী বাবুর প্রতিকৃতি। তিনি কমলমণির হস্তে একটী ক্রীড়নক মাত্র। কমলমণি উঠ বলিলে শ্রীশচন্দ্র উঠিতেন, বস বলিলে বসিতেন। কমলমণি যেথানে শ্রীশও সেইখানে। কমলমণির বুদ্ধির নিকট তাঁহার বুদ্ধি নিষ্প্রভ হইত। কমলমণির সহৃদয়তার নিকট তাঁহার হৃদয় হার মানিত। কমলমণির প্রবলতর চরিত্রের নিকট তাঁহার ক্ষীণতর চরিত্র বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিত। কমলমণির ন্যায় প্রবলতর চরিত্রের যে তিনি উপাস্য দেবতা হইয়াছিলেন, * ইহা অপেক্ষা শ্রীশের গুণের অধিকতর পরিচয় দিবার আর কিছুই নাই ?

শ্রীশচন্দ্রের চরিত্রে কোন প্রবল দোষও নাই। যে সকল সামাজিক ও পারিবারিক গুণ থাকিলে মনুষ্য সুখে স্বচ্ছন্দে ও নির্ব্বিবাদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, শ্রীশে কেবল সেই সকল গুণ ছিল। কিন্তু যে সকল দোষ থাকিলে মানুষ সামাজিক ও পারিবারিক সুখে বঞ্চিত হয়, শ্রীশে সে সকল দোষ কিছুই ছিল না। শ্রীশের জীবন প্রশান্ত ও সুন্দর শীতকালের স্রোতস্বিনী।

দেবেন্দ্রের চরিত্র বর্ষাকালীন স্রোতস্বিনীর ন্যায় আবিল। দেবেন্দ্রে যে সকল সামাজিক গুণ ছিল, যে টুকু সহৃদয়তা ছিল, তাহাতে কমলমণির মত সহৃদয়া প্রেমময়ী ভার্য্যা পাইলে হয়ত তিনি শ্রীশের ন্যায় একটী সামাজিক সাধু লোক হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে পারিতেন, কিন্তু কি শ্রীশ কি দেবেন্দ্র—কেহই নগেন্দ্রের অত্যুচ্চ চরিত্রের নিকটেও যাইতে অক্ষম।

—০০—

সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী।

বঙ্কিমবাবু পুরুষচরিত্রে যেমন নগেন্দ্রে স্বর্গীয়, শ্রীশে পার্থিব, ও দেবেন্দ্রে নারকীয় প্রেমের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন; সেইরূপ স্ত্রী-চরিত্রে সূর্য্যমুখী ও কুন্দে স্বর্গীয়, কমলমণিতে পার্থিব এবং হীরাতে নারকীয় প্রেমের ছবি দেখাইয়াছেন।

সূর্য্যমুখী ও কুন্দ স্বর্গীয় প্রেমের দুইটী বিভিন্ন আকৃতি। উভয়েরই হৃদয় স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ। উভয়েরই হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেব নগেন্দ্র। এ জগতে নগেন্দ্র ভিন্ন উভয়েই আর কিছুই জানিতেন না।

সূর্য্যমুখীর প্রেম অনন্ত ও অসীম, কুন্দের প্রেম অতলস্পর্শ। সূর্য্যমুখী একটী বিকসিত কুসুম, কুন্দ একটী কুসুম-কোরক। সৌরভে উভয়েই জগজ্জনমনোরঞ্জন। একজন হৃদয়ের প্রত্যেক দল খুলিয়া সকলকে দেখাইতেছেন, আর একজনের হৃদয়দল লজ্জায় আকুঞ্চিত।

একজন লজ্জাবতী লতা, আর একজন বন-জ্যোৎস্না নবমালিকা। একজন প্রগল্‌ভা, একজন মুগ্ধা। একজন সাহসিনী, একজন ভয়বিহ্বলা। একজন বাক্‌পটু, একজন বাক্‌বিধুরা। একজন লৌকিকজ্ঞা, একজন সংসারানভিজ্ঞা। যে সাবিত্রীচিত্রে ব্যাস ও যে সীতাচিত্রে বাল্মীকি জগৎ চমকিত করিয়াছিলেন, এবং যে ডেস্‌ডিমোনা চিত্রে সেক্ষপীয়র জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন; সূর্য্যমুখী সেই চিত্র। এবং যে শকুন্তলাচিত্রে কালিদাস এবং যে মিরান্দাচিত্রে শেক্ষপীয়র জগতের আরাধ্য হইয়াছেন, কুন্দ সেই শ্রেণীর চিত্র। আয়েষা-চিত্রে যে সৌন্দর্য্য সূর্য্যমুখীতে তাহা বর্ত্তমান, কপালকুণ্ডলার যে সৌন্দর্য্য কুন্দে তাহা বিদ্যমান। আয়েষা রেবেকার প্রতিবিম্বন, রেবেকা পাশ্চাত্য রমণীর প্রতিকৃতি; সূর্য্যমুখীতেও পাশ্চাত্য-রমণীর প্রগল্‌ভতা ও সাহস বিদ্যমান। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতিদুহিতা, সভ্যতার প্রৌঢ়াবস্থার ছবি নহে, জাতীয় শৈশবের ছবি—সুপ্তোত্থিত ভারতেই এ চিত্রের অস্তিত্ব সম্ভব; সেই কপালকুণ্ডলার সংসারানভিজ্ঞতা, মুগ্ধতা ও সরলতা কুন্দে বিদ্যমান। সূর্য্যমুখী সীতা ও ডেস্‌ডিমোনার সংমিশ্রণ, কুন্দ শকুন্তলা ও মিরান্দার সংমিশ্রণ। সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্রময়তা—সূর্য্যমুখীর প্রতি কার্য্যে ও প্রতি কথায় পরিব্যক্ত; কুন্দের নগেন্দ্রময়তা কুন্দের হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে নিগূহিত। নগেন্দ্রকে দেখিলে আগ্নেয়গিরির ধাতুনিঃস্রবের ন্যায় সূর্য্যমুখীর হৃদয় উচ্ছলিত হইয়া সহস্র স্রোতে বাক্যে প্রবাহিত হইত; কুন্দের হৃদয়ে ঘোরতর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ভূমিকম্প উৎপাদন করিত—নগেন্দ্রকে দেখিলে ভাবপ্রাবল্যে কুন্দের হৃদয় ফাটিবার উপক্রম হইত। উদ্যমশীলা ও বাক্যপটু সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রকে যতখানি ভাল বাসিতেন, তাহা কার্য্যে ও বাক্যে প্রকাশ করিতেন; ভাবময়ী ও বাক্যবিধুরা কুন্দ নগেন্দ্রের প্রতি ভালবাসা নগেন্দ্রের নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর হৃদয়ের প্রতি অক্ষর পড়িতে পাইতেন; কিন্তু কুন্দ-হৃদয়ের জলন্ত বর্ণ গুলিও তিনি দেখিতে পাইতেন না। সূর্য্যমুখীর হৃদয় শরৎকালীন পূর্ণ শশধর—নির্ম্মল, উজ্জ্বল ও স্থূলদৃষ্টিরও গোচর; কিন্তু কুন্দের হৃদয় শারদীয় তারকা—নির্ম্মল, উজ্জ্বল কিন্তু—যদিও অন্য জগতের প্রকাণ্ড সূর্য্য—সূক্ষ্মদর্শনেরও সম্পূর্ণ গোচর নহে। নিরাবরণ পরীদেহের যে সৌন্দর্য্য, সূর্য্যমুখী-হৃদয়ের সেই সৌন্দর্য্য—তৃপ্তিপ্রদ, অতুল ও মুগ্ধকর; অবগুণ্ঠনবতী সুন্দরীর যে সৌন্দর্য্য কুন্দহৃদয়ের সেই সৌন্দর্য্য—সাকাঙ্ক্ষ, অনুপম ও উন্মাদক।

—০০—

সূর্য্যমুখী।

সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্রময়তা প্রতিবাক্যে পরিব্যক্ত। "পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, ত সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার

কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; * * পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ।" "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল তুমিই আমার পরকাল। তোমার কাছে কেন লুকাইব? কখন কোন কথা তোমার কাছে লুকাই নাই, আজ কেন একজন পরের কথা তোমার কাছে লুকাইব?" এই সকল বাক্যের প্রতি অক্ষরে নগেন্দ্রময়তা দেদীপ্যমান।

সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্রময়তা শেষে আত্মোৎসর্গে ও আত্মবিসর্জ্জনে পরিণত হইয়াছিল। নগেন্দ্রের স্বার্থ, নগেন্দ্রের সুখ, নগেন্দ্রের জ্ঞান হইতে সূর্য্যমুখীর স্বতন্ত্র স্বার্থ, স্বতন্ত্র সুখ ও স্বতন্ত্র জ্ঞান ছিল না। "তুমি যাহা জান না, তাহা আমিও জানি না।" এইখানে আত্মজ্ঞানের অপলাপ। "কি বলিব তোমায়? আমি যে দুঃখ পাইয়াছি—তাহা কি তোমায় বলিতে পারি? মরিলে পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে, এই জন্য মরি নাই—," "আমার সর্ব্বস্বধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড়, না আমি বড়?" "আমি কে? একবার তোমার দাদাকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস; তখন জানিবে তোমার দাদা আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার এত সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন্ সুখের আশায় তাঁকে অসুখী রাখিব? যাঁহার এক দণ্ডের অসুখ দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে, দেখিলাম, দিবারাত্র তাঁর মর্ম্মান্তিক অসুখ—তিনি সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দেশত্যাগী হইবার উদ্যোগ করিলেন—তবে আমার সুখ কি রহিল? বলিলাম, 'প্রভো! তোমার সুখেই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর—আমি সুখী হইব,—তাই বিবাহ করিয়াছেন।'" —এইগুলি আত্মস্বার্থ ও আত্মসুখ জীবিতসর্ব্বস্ব নগেন্দ্রের চরণে উৎসর্গ করার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। বাল্মীকির সীতা ও ব্যাসের সাবিত্রী ভিন্ন আর কোন আর্য্য কবির মানসী কন্যা আত্মোৎসর্গের এরূপ পরিচয় দিয়াছেন কি না জানি না।

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মানুষে যেমন দেবতাকে সর্ব্বোৎকর্ষের আদর্শ বলিয়া বিবেচনা করে, সূর্য্যমুখী সেইরূপ নগেন্দ্রকে সর্ব্বোৎকর্ষের আদর্শ বলিয়া জানিতেন। নগেন্দ্র তাঁহার চক্ষে অপাপবিদ্ধ দোষস্পর্শশূন্য একটী আদর্শ পুরুষ। সূর্য্যমুখী যখন পত্রে কমলমণির নিকট আপনার হৃদয়ের যাতনা ব্যক্ত করিতেছেন—তখন পাছে সেই যাতনাপ্রদাতার উপর কমলমণির ক্রোধ উদ্দীপিত হয়, পাছে কমলমণি ভাবেন সূর্য্যমুখী আত্মযাতনা ব্যক্ত করিয়া যাতনাপ্রদাতাকে প্রকারান্তরে তিরস্কার করিতে-

ছেন—এই আশঙ্কায় সূর্য্যমুখী লিখিলেন, "তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না।"

নগেন্দ্র যখন সূর্য্যমুখীকে পায় ঠেলিলেন, তখনও সূর্য্যমুখী ভাবিয়া নগেন্দ্রর দোষ পাইলেন না, আত্ম-অদৃষ্টের উপরও সন্দেহ করিতে পারিলেন না—কমলকে বলিলেন, "আমার কপালের চেয়ে কার কপাল ভাল? কে এমন ভাগ্যবতী? কে এমন স্বামী পেয়েছে? রূপ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্—সে সকলও তুচ্ছ কথা—এত গুণ কার স্বামীর? আমার কপাল জোর কপাল—তবে কেন এমন হইল?" সূর্য্যমুখী আপনার দুঃখের কারণ নগেন্দ্র ও নিজ অদৃষ্ট ভিন্ন আর কিছু স্থির করিলেন।

নগেন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর গুণবানের অস্তিত্ব সম্ভব বলিয়া সূর্য্যমুখীর বোধ ছিল না। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কমলমণির নিকট বিদায় গ্রহণ কালে রোদন করিতে করিতে সতীশকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয় গুণে গুণবান্ হও। ইহার বাড়া আশীর্ব্বাদ আমি আর জানি না।"

স্বামীর প্রেমই সূর্য্যমুখীর ইহকাল ও পরকাল। যে দিন তিনি সেই স্বামি-প্রেমে বঞ্চিত হইলেন—যে সময় তিনি নগেন্দ্রের মুখে শুনিলেন "তোমাতে আমার আর সুখ নাই। * * আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি—" সেই দিন সেই সময় সূর্য্যমুখীর হৃদয়ে শেল বিঁধিল, তিনি বলিলেন, "যাহা তোমার মনে থাকে, থাক্—আমার কাছে আর বলিও না। তোমার প্রতি কথায় আমার বুকে শেল বিঁধিতেছে।" এত দিনে সূর্য্যমুখীর আত্মস্মৃতি বলবতী হইল। এতদিনে সূর্য্যমুখী জানিলেন নগেন্দ্র হইতে সূর্য্যমুখী পৃথক্—সূর্য্যমুখীর সুখ আর নগেন্দ্রের সুখ এক নহে। তখন সূর্য্যমুখী নগেন্দ্র যে সুখের প্রত্যাশী তাঁহাকে সেই সুখে সুখী করিয়া দেশত্যাগিনী হইলেন। যাইবার সময় একখানি পত্রে মনের কথা সমস্ত লিখিয়া কমলমণির জন্য রাখিয়া গেলেন। এই পত্রখানিতে সূর্য্যমুখীর তদানীন্তন হৃদয়ের ছবি সম্পূর্ণ প্রতিবিম্বিত। পত্রখানি এই :—

"যে দিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে, আমাতে আর তাঁর কিছু মাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনে মনে মনে সংকল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখন পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব। কেন না আমার স্বামী

কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্ব্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম। *

"কালি বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতাম। কিন্তু স্বামীর যে সুখের কামনায় আপনার প্রাণ আপনি বধ করিলাম, সে সুখ দুই একদিন চক্ষে দেখিয়া যাইবার সাধ ছিল। * * আমার যিনি প্রাণাধিক, তিনি সুখী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি এখন চলিলাম।

* * *

"আমার যে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, এমন ভরসা নাই। কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এদেশে আসিব না—এবং আমার সন্ধানও পাইবে না। আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম—ভিখারিণী-বেশে দেশে দেশে ফিরিব—ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব—আমাকে কে চিনিবে? * আমার স্বামী, আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম—সোণা রূপা সঙ্গে লইয়া যাইব?

"তুমি আমার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। * তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও যে, তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখন তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখন করিব না। যাঁহাকে মনে হইলেই আহ্লাদ হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি তাহাই রহিল, যতদিন না মাটীতে এ মাটী মিশায়, ততদিন থাকিবে; কেন না তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখন ভুলিতে পারিব না। এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি তাঁহার দাসী। এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্ব্বত্যাগিনী হইতেছি।

"তোমারও কাছে জন্মের মত বিদায় লইলাম * * আরও আশীর্ব্বাদ করি, যে, যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃ শেষ হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।"

এই পত্রে সূর্য্যমুখীর বলবতী আত্মস্মৃতি ও প্রবল আত্মজ্ঞান জাজ্বল্যমান। যতদিন সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের আদরিণী ছিলেন, ততদিন এ পৃথিবী সূর্য্যমুখীর নিকট স্বর্গ বোধ হইয়াছিল এবং নগেন্দ্র সেই স্বর্গের দেবতা বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন; ততদিন সূর্য্যমুখী নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছিলেন; নগেন্দ্রের জীবনে, নগেন্দ্রের সুখে—তাঁহার জীবন, তাঁহার সুখ বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তখন

তিনি জানিতেন যে নগেন্দ্রকে সুখী করিতে পারিলেই তাঁহার সুখ, কারণ নগেন্দ্র তাঁহারই, সুতরাং নগেন্দ্রের সুখ তাঁহারই সুখ। এইজন্য তিনি নগেন্দ্রের সুখবর্দ্ধনে নিরত ছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল—আত্ম-স্মৃতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল। তিনি দেখিলেন নগেন্দ্র যাহাতে সুখী, সে সূর্য্য-মুখী নহে—কুন্দনন্দিনী। তিনি নগেন্দ্রকে প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন বলিয়া নগেন্দ্রের সে সুখ দুই এক দিন চক্ষে দেখিলেন—দেখিয়া পরিতৃপ্তি জন্মিল। এতদিন নগেন্দ্রের সুখ দেখিয়া সূর্য্যমুখীর পরিতৃপ্তি জন্মে নাই, কারণ এতদিন সে সুখের অর্দ্ধাংশভাগিনী তিনি স্বয়ং ছিলেন। আজ পরিতৃপ্তি জন্মিল, কারণ আজ সে সুখের অর্দ্ধাংশভাগিনী কুন্দ।

আজ সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগিনী, কারণ আজ নগেন্দ্রের স্বার্থ—সূর্য্যমুখীর স্বার্থ নহে। এতদিন পরে আজ সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রে সহস্র গুণের সহিত একটী দোষ দেখিলেন, কারণ আজ নগেন্দ্র তাঁহার প্রতি বিমুখ। আজ সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্রময়তার সহিত তাঁহার স্বার্থপরতার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। স্বার্থপরতা বিজয়িনী হইল—সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগিনী হইলেন। কি স্বার্থসাধনোদ্দেশে সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগিনী হইলেন? নিজের সুখ? না—কারণ নগেন্দ্র বিনা সূর্য্যমুখীর সুখ কোথায়? তবে কি জন্য? নিজের সুখের ব্যতিঘাতে পরের সুখের উৎপত্তি দেখিতে অসমর্থতা নিবন্ধন। তবে সূর্য্যমুখী কি নগেন্দ্র-সুখ-দর্শন-কাতরা হইয়াছিলেন? না—নগেন্দ্রের সুখ তিনি অম্লান বদনে দেখিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু সে সুখের সহিত কুন্দের সুখ তাঁহার অসহনীয়। যে সপত্নী-দ্বেষ স্ত্রী-সাধারণে বিদ্যমান, সূর্য্য-মুখীর অপার্থিব হৃদয় সে পার্থিব ভাবকে আজ জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। এ পরাজয়ের কারণ আত্মবিশ্লিষ্ট ভাবে নগেন্দ্রকে ভাল বাসা তাঁহার কখনই শিক্ষা হয় নাই। যখনই তিনি নগেন্দ্রকে ভাল বাসিয়াছেন, তখনই জানিতে পারিয়াছেন—নগেন্দ্র তাঁহার। নগেন্দ্র তাঁহা ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারেন—এ ভাব ইহার পূর্ব্বে সূর্য্যমুখীর মনে আর কখন উদিত হয় নাই। এ জন্য সহসা এ ভাব-পরিবর্ত্তন তাঁহার অসহনীয় হইল।

আয়েষা যখন জগৎসিংহকে প্রথমে দেখেন তখন হইতেই তিনি জানিতেন জগৎসিংহ হিন্দু, তিনি নবাব-দুহিতা; জগৎসিংহ তাঁহার নহেন এবং কখনও হইতেও পারেন না। এই জন্য তিনি যখন মনে মনে জগৎসিংহকে পতিত্বে বরণ করেন, তখনই প্রস্তুত হন যে এ জীবন জগৎসিংহকে শুদ্ধ ভাল বাসিয়াই অতি-বাহিত করিবেন—এ প্রেমের প্রতিদান পাইবেন না। আশা ছিল না বলিয়াই আয়েষার স্বর্গীয় প্রেমের পার্থিব ভাবের সহিত কখন কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। সূর্য্যমুখীর আশা ছিল, এবং তাঁহার

মনে আশাভঙ্গের সম্ভাবনা পর্য্যন্তও কখন উদিত হয় নাই; এই জন্য আশাভঙ্গে যে চিত্তস্থৈর্য্যের আবশ্যকতা—তাঁহার তাহা শিক্ষা হয় নাই। এই জন্য নগেন্দ্রের সহিত কুন্দকে সংশ্লিষ্ট দেখিয়া আশাভঙ্গে আজ তিনি গৃহত্যাগিনী হইলেন। এই-জন্য আজ জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-সমাগমে আয়েষার ন্যায়, সূর্য্যমুখী নগেন্দ্র-কুন্দ-সমাগমে চিত্তের গাম্ভীর্য্য ও স্থৈর্য্য দুই দিনের অধিক রক্ষা করিতে পারিলেন না। নিঃস্বার্থ ও নিরাশ প্রণয়ে যে স্বর্গ হইতেও উচ্চতর ভাব, স্বর্গের সুখ অপেক্ষাও পবিত্রতর সুখ, আজ সে ভাবে ও সে সুখে তিনি বঞ্চিত হইলেন। নিরবচ্ছিন্ন-দেবভাব-পূর্ণ আয়েষার নিকট দেব-মানব-ভাবপূর্ণ সূর্য্যমুখী আজ পরাস্ত হইলেন। নিরভিসন্ধি ধর্ম্মের নিকট স্বার্থসংশ্লিষ্ট ধর্ম্ম পরাজিত হইল। এই পরাজয় হইতেই উপন্যাসের অবশিষ্ট ঘটনা প্রসূত। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ, তদনুসন্ধানার্থ নগেন্দ্রের দেশপর্য্যটন, নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর অশেষ কষ্ট যন্ত্রণা, সূর্য্যমুখী-প্রেমপ্রাবল্যে নগেন্দ্রের কুন্দের প্রতি অনাদর, সেই অনাদরে কুন্দের বিষপান—এই সমস্ত ঔপন্যাসিক ঘটনাই এই পার্থিব ভাবের নিকট স্বর্গীয় ভাবের পরাজয়ের ফল। যদি সূর্য্যমুখী নিরাশ ও নিরাকাঙ্ক্ষ প্রণয়ের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিতেন, তাহা হইলে শুদ্ধ নগেন্দ্রকে দেখিয়াই তাঁহার অতুল আনন্দ জন্মিত—নগেন্দ্রের সুখ দেখিয়া তাঁহার পর্য্যাপ্তি বোধ হইত না; তিনি গৃহে থাকিয়া শুদ্ধ নগেন্দ্রকে দেখিয়াও সুখী হইতেন, এবং নগেন্দ্রের সুখে নিজ হৃদয় ভরিয়া ফেলিতেন; সে সুখ ছাড়িয়া তিনি কখনই গৃহত্যাগিনী হইতেন না। তিনি সীতার ন্যায় বলিতেন "আমাকে সামান্য প্রজাভাবে দেখিলেও আমি চরিতার্থ হইব" †। তাহা হইলে নগেন্দ্রেরও বৈরাগ্য অবলম্বন করার প্রয়োজন হইত না, কুন্দকেও বিষপান করিতে হইত না। কিন্তু তাহা হইলে সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র কুন্দ, কমলমণি ও হীরা এ কয়টী চিত্রই অপরিপুষ্ট থাকিত; ঘটনা-বৈচিত্র্যাভাবে কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি বিষবৃক্ষ একটী সামান্য উপন্যাসরূপে পরিণত হইত।

নগেন্দ্রের সহিত সূর্য্যমুখীর অনেক দিন দেখা না হওয়ায় সূর্য্যমুখীর আত্মস্মৃতি আবার বিলুপ্ত হইল। নগেন্দ্রময়-জীবিতা সূর্য্যমুখী আবার আত্ম ভুলিয়া নগেন্দ্র-ধ্যানে নিরতা হইলেন। এবার সূর্য্যমুখী আত্মবিশ্লিষ্ট ও অন্যাসংশ্লিষ্ট ভাবে নগেন্দ্রকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছিলেন। এবার ভালবাসার প্রতিদাননিরপেক্ষ হইয়া সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রকে ভাল বাসিতে লাগিলেন। তিনি নগেন্দ্রের হৃদয়েশ্বরী না হইতে পারেন,

† নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনং যৎ
স এব ধর্ম্মো মনুনা প্রণীতঃ।
নির্ব্বাসিতাপ্যেবমতস্ত্বয়াহং
তপস্বিসামান্যমবেক্ষণীয়া ॥
রঘুবংশম্।

কিন্তু নগেন্দ্র ত তাঁহার হৃদয়েশ্বর—এই ভাবে তিনি এবার হৃদয়ে নগেন্দ্রপূজা আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যমুখী এখন কেবল নগেন্দ্রের দর্শনমাত্র-পিপাসু হইলেন। নগেন্দ্র যাহারই হউন না কেন নগেন্দ্র-দর্শনেই সূর্য্যমুখীর স্বর্গলাভ। সূর্য্যমুখী পাতিব্রত্যধর্ম্মজনিত পুণ্যের এক মাত্র ফলস্বরূপ নগেন্দ্রদর্শনের ভিখারিণী হইলেন। তিনি ব্রহ্মচারীর পত্র প্রেরণের পর হৃদয় ভরিয়া জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে পরমেশ্বর! যদি তুমি সত্য হও, আমার যদি পতিভক্তি থাকে, তবে যেন এই পত্র খানি সফল হয়। আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন কিছুই জানি না—ইহাতে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে আমি স্বর্গ চাহি না। কেবল এই চাই, যেন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি"।

সূর্য্যমুখী পত্রের উত্তর প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না। নগেন্দ্র দর্শনলালসা তাঁহাতে এতদূর প্রদীপ্ত হইল যে তিনি ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে করিয়া গোবিন্দপুরাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে নগেন্দ্র তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকক্ষে শয়ান, দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ, এই অবস্থায় ছায়ারূপে নগেন্দ্রকে দেখা দিলেন। মৃত্যু সংবাদ শ্রবণের পর হঠাৎ পূর্ণ দর্শনে আনন্দাতিশয্যে নগেন্দ্রের শারীরিক ও মানসিক অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে—এইভাবে সূর্য্যমুখী কবির অদ্ভুত কৌশলে কেমন ধীরে ধীরে নগেন্দ্রের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া অবশেষে এই বলিয়া নগেন্দ্রের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন, যে তিনি মরেন নাই এবং তাঁহার সম্মুখেই উপস্থিত—"উঠ! উঠ! আমার জীবনসর্ব্বস্ব! মাটী ছাড়িয়া উঠিয়া বসো। আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ! উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি"।

বিচ্ছেদে সূর্য্যমুখীর ঈর্ষানল নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, আত্মবিশ্লিষ্ট ভাবে নগেন্দ্রকে ভাল বাসিতে শিখায়, কুন্দের অস্তিত্ব আর সূর্য্যমুখীর ক্লেশকর বোধ হইল না। যে সূর্য্যমুখী গৃহপরিত্যাগ কালে কমলকে লিখিয়া গিয়াছিলেন "কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এদেশে আসিব না এবং আমার সন্ধানও পাইবে না", সেই সূর্য্যমুখী আজ গৃহে প্রত্যাগতা হইয়া কমলের কাণে কাণে বলিলেন, "চল, তোমায় আমায় একবার কুন্দকে দেখিয়া আসি। সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই—বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী"।

যে সূর্য্যমুখী একদিন কুন্দকে স্বামিপ্রেমের অংশ দিতে কাতর হওয়ায়, "আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি কে? যদি কখন স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে

সূর্য্যমুখী পত্রের উত্তর প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না। নগেন্দ্র-দর্শন-লালসা তাঁহাতে এতদূর প্রদীপ্ত হইল যে তিনি ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে করিয়া গোবিন্দপুরাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে নগেন্দ্র তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকক্ষে শয়ান, দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ, এই অবস্থায় সূর্য্যমুখী ছায়ারূপে নগেন্দ্রকে দেখা দিলেন। মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণের পর হঠাৎ পূর্ণ দর্শনে আনন্দাতিশয্যে নগেন্দ্রের শারীরিক ও মানসিক অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে—এইভয়ে সূর্য্যমুখী কবির অদ্ভুত কৌশলে কেমন ধীরে ধীরে নগেন্দ্রের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া অবশেষে এই বলিয়া নগেন্দ্রের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন, যে তিনি মরেন নাই এবং তাঁহার সম্মুখেই উপস্থিত—"উঠ! উঠ! আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! মাটী ছাড়িয়া উঠিয়া বসো। আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ! উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি"।

বিচ্ছেদে সূর্য্যমুখীর ঈর্ষানল নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। আত্মবিশ্লিষ্ট ভাবে নগেন্দ্রকে ভাল বাসিতে শিখায়, কুন্দের অস্তিত্ব আর সূর্য্যমুখীর ক্লেশকর বোধ হইল না। যে সূর্য্যমুখী গৃহপরিত্যাগ কালে কমলকে লিখিয়া গিয়াছিলেন "কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এদেশে আসিব না এবং আমার সন্ধানও পাইবে না", সেই সূর্য্যমুখী আজ গৃহে প্রত্যাগতা হইয়া কমলের কাণে কাণে বলিলেন, "চল, তোমায় আমায় একবার কুন্দকে দেখিয়া আসি। সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই—বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী"।

যে সূর্য্যমুখী একদিন কুন্দকে স্বামি-প্রেমের অংশ দিতে কাতর হওয়ায়, "আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর. আমি কে? যদি কখন স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, যে আমি ঐ খানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন।"—পতিপরায়ণতার এই অলৌকিক ভাব ব্যক্ত করার পরও, কমলমণি কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন; "তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে তোমার অন্তর্দাহ হতেছে। তবে কেন বল 'আমি কে?' তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?"—সেই সূর্য্যমুখী আজ কুন্দকে লইয়া স্বামীর ঘর করিতে স্বীকৃতা হইলেন। কিন্তু নায়িকা কুন্দের প্রতি পাঠকবর্গের মনকে অধিকতর শোক-প্রবণ করিবার জন্য, তাঁহাদিগের হৃদয়ে কাব্যের নৈতিক ফল রুধিরাক্ষরে অঙ্কিত করিবার জন্য, এবং কবির অলৌকিকী মানসী কন্যা সূর্য্যমুখীও পাছে

[illegible] সংস্কার নিবন্ধন স্ত্রী-স্বভাব [illegible]দ্বেষাদির বশবর্ত্তিনী হইয়া স্বর্গীয় ভাব হইতে বিচ্যুত হন—এই জন্য কবি সূর্য্যমুখীর গৃহে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই স্বসৃষ্টা ও স্বহস্তলালিতা অনাথিনী কুন্দকে বিষপান করাইয়া মারিয়া ফেলিলেন। অপার্থিব সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের নিকট রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "কুন্দকে আমি বালিকা বয়স হইতে মানুষ করিয়াছি; এখন সে আমার ছোট ভগিনী, বহিনের ন্যায় তাহাকে আদর করিব সাধ করিয়া আসিয়াছিলাম। আমার সে সাধে ছাই পড়িল। কুন্দ বিষপান করিয়াছে।" অবিদ্বেষের ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই চিত্তসংযম আর কিছুদিন পূর্ব্বে ঘটিলে, সূর্য্যমুখীর চরিত্রশশধর নিষ্কলঙ্ক থাকিত, এবং সূর্য্যমুখীর স্বর্গীয় হৃদয় বিন্দুমাত্রও পার্থিব-ভাব-মিশ্রিত হইত না। সূর্য্যমুখী কাঁদিতে কাঁদিতে কুন্দের নিকট গিয়া কথঞ্চিৎ রোদন সম্বরণ করিয়া কুন্দের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ভাগ্যবতী! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক। আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করি।" ইহা অপেক্ষা আদর্শসতীর প্রার্থনা আর কি হইতে পারে?

কুন্দনন্দিনী।

সূর্য্যমুখী সততভুক্ত ক্ষণমাত্র-বিচ্ছিন্ন অসীম ও অনন্ত প্রেমের ছবি, কুন্দ সতত নিরাশ ক্ষণমাত্রভুক্ত গভীর ও অতলস্পর্শ প্রেমের প্রতিকৃতি। সূর্য্যমুখী চিরদিন স্বামিসোহাগিনী ছিলেন, কুন্দচ্ছায়ায় সে সোহাগ কেবল কয়দিন মাত্র আবরিত হইয়াছিল; কুন্দ কয়দিন মাত্র নগেন্দ্র-প্রেমের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। অভাগিনীর জীবন চিরদিনই নিরাশ প্রণয়ের অন্তর্দাহে ভস্মীভূত হইয়াছিল। সূর্য্যমুখী গৃহিণী, আদরিণী, সকল বিষয়েই তাঁহার অধিকার, কুন্দ নিরাশ্রয়া নগেন্দ্র-প্রতিপালিতা অনাথা বিধবা, সুতরাং নগেন্দ্র-প্রাপ্তির আশাও হৃদয়ে লালিত করিতে অক্ষম। অথচ ধীরে ধীরে বালিকার সেই হতাশ হৃদয়ে নগেন্দ্রপ্রেম অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। সরলা সংসারানভিজ্ঞা বালিকার হৃদয়ও প্রেমের অস্পৃশ্য নহে। বহ্নিমুখ-বিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় সরলা নগেন্দ্রপ্রেমানলে ঝাঁপ দিলেন। নগেন্দ্রের কারুণ্যপূর্ণ দেবমূর্ত্তি কুন্দের হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠাপিত হইল। দেব যেমন মানবীর অলভ্য ও উপাস্য, নগেন্দ্রও কুন্দের নিকট সেইরূপ অলভ্য ও উপাস্য মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইলেন। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর হৃদয়াকাশের চন্দ্র, কুন্দের হৃদয়াকাশের সূর্য্য। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের সহস্র গুণের সহিত একটী কলঙ্করেখাও দেখিতে পাইতেন; কিন্তু নগেন্দ্রের ঔজ্জ্বল্যে কুন্দের দৃষ্টি প্রতিহত হইত। সূর্য্যমুখী

প্রাণ ভরিয়া নগেন্দ্রকে দেখিতেন, যত বার দেখিতেন অমৃতরসে অভিষিঞ্চিত হইতেন; কুন্দদৃষ্টি নগেন্দ্রকে ধারণা করিয়া উঠিতে পারিত না। সূর্য্যমুখী তুলনা করিয়া নগেন্দ্রকে পুরুষরত্ন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; কুন্দ পৃথিবীতে নগেন্দ্রের তুলনা আছে বলিয়া জানিতেন না। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর পূজ্য আদর্শ পুরুষ, কিন্তু কুন্দের উপাস্য দেবতা। দেবচরিত্র যেমন মানবের অনালোচ্য, নগেন্দ্রচরিত্র সেইরূপ কুন্দের অনালোচ্য ছিল; নগেন্দ্রের দোষ-গুণ-গ্রাহে কুন্দের কখন সাহস হয় নাই। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর আদর্শ মানব, সুতরাং নগেন্দ্রের সহস্র গুণ ও একটী দোষও সূর্য্যমুখীর পর্য্যবেক্ষণ এড়াইতে পারে নাই। সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্রপ্রেম প্রধানতঃ বুদ্ধি-বৃত্তিমূলক; কুন্দের নগেন্দ্র-প্রেম সর্ব্বথা হৃদ্‌বৃত্তিমূলক। সূর্য্যমুখী জানিতেন নগেন্দ্রকে তিনি কেন এত ভাল ভাসেন—নগেন্দ্রের যত গুণ এত গুণ মানবে দুর্ল্লভ; কিন্তু কুন্দ জানিতেন না যে নগেন্দ্রের প্রতি তাঁহার হৃদয় কেন এত অনিবার্য্য বেগে আকৃষ্ট হয়—কুন্দবুদ্ধি নগেন্দ্রকে দেখিলে জড়ীভূত হইয়া নগেন্দ্রের দোষ-গুণ-বিচারে অসমর্থা হইত। 'প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা, আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গ-ক্রমে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন' ইহা দ্বারা বঙ্কিমবাবু যে প্রণয়ের উল্লেখ করিয়াছেন,—এবং ভবভূতি "অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্বব- স্থাস্থ যদ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ। কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতম্ * *।" 'যে প্রেম সুখ ও দুঃখ এবং সকল অবস্থায় অবিচলিত, যাহাতে হৃদয়ের বিশ্রাম, বার্দ্ধক্যে যাহার বিলয় নাই; যে প্রেম বহুকাল-সংসর্গে লজ্জাভয়াদি সঙ্কোচকারণের অপগমে স্নেহসারে পরিণত হয়'—এই শ্লোকে ভবভূতি যে প্রণয়ের প্রসঙ্গ করিয়াছেন, সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্রবিষয়ক প্রেম সেই প্রেম। আর—"ভূয়সা জীবিধর্ম্ম এষ যদ্রসময়ী কস্যচিৎ ক্বচিৎ-প্রীতিঃ * * তমপ্রতিসংখ্যেয়মনিবন্ধনং প্রেমাণমামনন্তি। অহেতুঃ পক্ষপাতো যস্তস্য নাস্তি প্রতিক্রিয়া। সহি স্নেহাত্মক-তন্তুরন্তর্ম্মাণি সীব্যতি॥"—'দেখিতে পাওয়া যায় কাহার প্রতি কাহারও হৃদয় স্বতঃই প্রীতিপ্রবণ হয়; সেই প্রণয়ের মূল অনুসন্ধান করা দুরূহ, তাহাকেই নিষ্কারণ প্রেম বলা যাইতে পারে। যে প্রেম নিষ্কারণ, তাহা অপ্রতিবিধেয়; সেই প্রণয় দুইটী হৃদয়কে অনুস্যূত করিয়া দেয়'—ইত্যাদি দ্বারা ভবভূতি যে অহেতু ও অপ্রতিবিধেয় প্রেমের উল্লেখ করিয়াছেন, কুন্দের নগেন্দ্রবিষয়ক প্রেম সেই প্রেম। বঙ্কিমবাবু কুন্দে এই প্রেমের ছবি দিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রেমের বিশ্লেষণ ও বিবরণস্থলে এই অহেতু ও অপ্রতিবিধেয় প্রেমের কোনও উল্লেখ করেন নাই, তাঁহার মতে—সকল প্রেমই সহেতু; রূপ

হইতে গুণ হইতে বা উভয় হইতেই প্রেমের উৎপত্তি সম্ভবপর, বিনা রূপ গুণ মোহে প্রেমোৎপত্তি অসম্ভব। কিন্তু তিনি নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দের প্রেম কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা বলেন নাই। সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রের পরস্পরপ্রেম গুণজ, নগেন্দ্রের কুন্দপ্রেম রূপজ—কিন্তু কুন্দের নগেন্দ্র-প্রেম কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহার তিনি কিছু উল্লেখ করেন নাই। দুইটী রমণীকে দেখিলাম, একটী পরমা সুন্দরী, অপরাটী অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টা, উভয়েরই গুণ আমার নিকট অবিদিত; অথচ নিকৃষ্টার প্রতি আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইল—বঙ্কিম বাবু এরূপ ঘটনার রহস্যোদ্ভেদ করিতে চেষ্টা করেন নাই। ভবভূতি তাহার রহস্যোদ্ভেদে অক্ষম হইয়া সেই প্রেমকে অকারণ বা অলৌকিক-কারণজনিত বলিয়া স্বীকার করিয়াগিয়াছেন।

জ্বলনোন্মুখ বহ্নির ন্যায় নগেন্দ্র-প্রেম কুন্দের হৃদয়ে প্রধূমিত হইতেছিল, আজ কমলমণি দ্বারা সেই ধূমায়মান প্রেম কিঞ্চিৎ সন্ধুক্ষিত হইল। নগেন্দ্রকে ভালবাসেন—কুন্দ এ কথা এতদিন কাহাকেও বলেননাই; সেই প্রেম কুন্দ এতদিন হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে নিগূহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ কমলমণি কুন্দ হৃদয়ের সেই গূঢ়তম প্রদেশ হইতে সেই কথা টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই দাদাকে বড় ভালবাসিস্।—না?" সহসা এই প্রশ্নে কুন্দের হৃদয় ভাববেগে উচ্ছলিত হইল; কুন্দ কমলের হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না। আজ এ প্রশ্নে কুন্দের হতাশাপীড়িত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল, কুন্দের মনে হইল—নগেন্দ্র তাঁহায় ভাল বাসেন, তাই কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসে কি না জানিবার জন্যই আজ কমলমণির এই প্রশ্ন। এইজন্য কুন্দনন্দিনী মস্তকোত্তোলন করিয়া কমলের মুখ-প্রতি স্থির-দৃষ্টি হইয়া রহিলেন। কমলমণি প্রশ্ন বুঝিলেন, বলিলেন "পোড়ার মুখী চোকের মাথা খেয়েছ? দেখিতে পাও না যে দাদা তোকে ভালবাসে?"

এ আশাতীত সংবাদ আজ কুন্দের ভগ্নাশ হৃদয়ের পক্ষে অতিশয় বলবান্ হইল। বাতাহত তরুশিরের ন্যায় ঘুরিয়া 'কুন্দের সেই উন্নত মস্তক আবার কমলমণির বক্ষের উপর পড়িল। কুন্দনন্দিনীর অশ্রুজলে কমলমণির হৃদয় প্লাবিত হইল। কুন্দনন্দিনী অনেক ক্ষণ নীরবে কাঁদিল—বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল।' কমল যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কুন্দের নীরব ক্রন্দনে তাহার পূর্ণ উত্তর পাইলেন। সব দিক্ বায় দেখিয়া কুন্দকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কুন্দ অনেক ভাবিয়া অশ্রু মুছিয়া বলিলেন "যাব।" কুন্দনন্দিনী

পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল।' কুন্দ আপনার মঙ্গল একবার ভাবিলেন না, কারণ 'কুন্দনন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না।' 'দাদা তোকে ভালবাসে'—কমলের এই কথা কুন্দের হৃদয় আলোড়িত করিল। এতদিন কুন্দ নগেন্দ্রকে শুদ্ধ ভালবাসিয়াই সুখিনী ছিলেন। তিনি এতদিন নিরাশ প্রণয়ের মোহমন্ত্রে মুগ্ধ ছিলেন। ভালবাসার প্রত্যর্পণ পাইবার আশা তাঁহার মনে একবারও উদিত হয় নাই। নগেন্দ্রকে শুদ্ধ দেখিয়াই জীবন অতিবাহিত করাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। নগেন্দ্র তাঁহার হইতে পারেন এ ভাব কেবল তাঁহার মনে আজ উদিত হইল। কিন্তু আবার অদৃষ্টের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিল। তিনি কাতর হইয়া একদিন প্রদোষে নগেন্দ্রের উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া এই ভাবিতে লাগিলেন "ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া? জলে ডুবিয়া? বেশ ত? মরিলে নক্ষত্র হব—তা হলে—হব ত! দেখিতে পাব—রোজ রোজ দেখিতে পাব—কাকে? কাকে, মুখে বলিতে পারিনে কি? আচ্ছা নাম মুখে আনিতে পারিনে কেন? এখন ত কেহ নাই—কেহ শুনিতে পাবে না। একবার মুখে আনিব? কেহ নাই—মনের সাধে নাম করি। ন—নগ—নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, আমার নগেন্দ্র! আমলো! আমার নগেন্দ্র? আমি কে? সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র। কতই নাম করিতেছি—হলেম কি? আচ্ছা—সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো—দূর হউক—ডুবেই মরি। আচ্ছা যেন এখন ডুবিলাম—কাল ভেসে উঠ্‌বো—তবে সবাই শুন্‌বে, শুনে নগেন্দ্র—নগেন্দ্র! নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র—আবার বলি—নগেন্দ্র নগেন্দ্র নগেন্দ্র! নগেন্দ্র শুনে কি বলিবেন? ডুবে মরা হবে না—ফুলে পড়িয়া থাকিব—দেখিতে রাক্ষসীর মত হব। যদি তিনি দেখেন, ত বিষ খেয়ে ত মরিতে পারি? কি বিষ খাব? বিষ কোথা পাব—কে আমায় এনে দিবে? দিলে যেন—মরিতে পারিব কি? পারি—কিন্তু আজি না—একবার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মনে করি—তিনি আমায় ভাল বাসেন। আচ্ছা, সে কথা কি সত্য! কমল দিদি ত বলিল—কিন্তু কমল জানিল কিসে? আমি পোড়ারমুখী জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। ভাল বাসেন? কিসে ভাল বাসেন? কি দেখে ভাল বাসেন, রূপ না গুণ? রূপ—দেখি?—দূর হউক যা নয় তা ভাবি কেন? আমার চেয়ে সূর্য্যমুখী সুন্দর, আমার চেয়ে হরমণি সুন্দর; বিশু সুন্দর; মুক্ত সুন্দর; চন্দ্র সুন্দর; প্রসন্ন সুন্দর; বামা সুন্দর; প্রমদা সুন্দর; আমার চেয়ে হীরা দাসীও সুন্দর। হীরাও আমার চেয়ে সুন্দর?

হাঁ; শ্যামবর্ণ হলে কি হয়—মুখ আমার চেয়ে সুন্দর। তা রূপ ত গোল্লাই গেল—গুণ কি? আচ্ছা দেখি দেখি ভেবে।—কই, মনে ত হয় না। কমলের মন রাখা কথা—আমায় কেন ভালবাসিবেন? তা, কমল মন রাখা কথা বল্‌বে কেন? কে জানে! কিন্তু মরা হবে না, ঐ কথা ভাবি। মিছে কথা! ত মিছে কথাই ভাবি। মিছে কথাকে সত্য বলিয়া ভাবিব। কিন্তু কলিকাতায় যেতে হবে যে, তা ত যেতে পারিব না। দেখিতে পাব না যে। আমি যেতে পার্‌ব না পার্‌ব না—পার্‌ব না। তা না গিয়েই বা কি করি? যদি কমলের কথা সত্য হয়, তবে ত যারা আমার জন্য এত করেছে, তাদের ত অসুখী করিতেছি। সূর্য্যমুখীর মনে কিছু হয়েছে, বুঝিতে পারি। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কাজে কাজেই আমায় যেতে হবে। তা পারিব না। তবে ডুবে মরি। মরিবই মরিব। বাবা গো! তুমি কি আমাকে ডুবিয়া মরিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলে;”—

এই টুকুর মধ্যে কুন্দের হৃদয়ে কত বিপরীত তরঙ্গ উত্থিত হইল—কমলের কথা একবার সত্য বলিয়া বোধ হইল, আবার তাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। একবার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা বলবতী হওয়ায় কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল, আবার নগেন্দ্রের অদর্শনজনিত যাতনা মনে হইল—আবার সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। যখন কৃতজ্ঞতা ও নগেন্দ্রপ্রেম উভয়ই প্রবল হইয়া উঠিল, তখন ডুবিয়া মরাই স্থির হইল। কুন্দ যখন এই শেষ সঙ্কল্প সাধনে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন নগেন্দ্র পশ্চাৎ হইতে অতি ধীরে ধীরে কুন্দের পৃষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলেন। কুন্দ তাঁহাকে চিনিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কুন্দ! কালি কলিকাতায় যাইবে?” কুন্দ উত্তর দিলেন না—কেবল চক্ষু মুছিলেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন “কুন্দ! ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছ?” কুন্দ আবার চক্ষু মুছিলেন—কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি বলিলেন “কুন্দ! কাঁদিতেছ কেন?” এবার কুন্দের হৃদয় ফাটিল—তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি এতদিন নগেন্দ্রের নিকট আত্মগোপন করিয়া আসিয়াছিলেন, আজ নির্ব্বাক্ রোদনে তাঁহার হৃদয়দ্বার নগেন্দ্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল। এই বিশ্বাসের প্রত্যর্পণ জন্যই যেন নগেন্দ্র আজ কুন্দের নিকট আপনার হৃদয় খুলিলেন। নগেন্দ্রের হৃদয়ের সমস্থিতি আজ বিনষ্ট হইল, কিন্তু কুন্দ রোদন সম্বরণ করিয়া আবার চিত্তসংযমে কৃতকার্য্য হইলেন। আজ বালিকার নিকট মনীষী পরাজিত হইলেন। আজ নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, কিন্তু কুন্দ বলিলেন “না।”

তাহার পর একদিন সূর্য্যমুখীর তিরস্কারে

কুন্দ রজনীযোগে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। সূর্য্যমুখী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুন্দ-পতঙ্গ নগেন্দ্র-বহ্নি পরিত্যাগ করিয়া অধিকদূর যাইতে পারিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার নগেন্দ্রের অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে আসিয়া বসিল।

কুন্দের যাইবার দিন নগেন্দ্র যে সাসী খুলিয়া আলোকপটে প্রতিবিম্বিত নিজ মূর্ত্তি কুন্দকে দেখাইয়াছিলেন; আবার যে সাসী বন্ধ করিয়া নগেন্দ্র সরিয়া গেলে কুন্দ মনে মনে বলিয়াছিলেন 'নির্দ্দয়! ইহাতে কি ক্ষতি! না, তোমার রাত্রি জাগিয়া কাজ নাই—নিদ্রা যাও—শরীর অসুস্থ হইবে। কুন্দনন্দিনী মরে মরুক। তোমার মাথা না ধরে, কুন্দনন্দিনীর কামনা এই'—আজ তিনি নগেন্দ্রের উদ্যানে আসিয়া সেই সাসীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার মানস নগেন্দ্র উঠিয়া বাতায়ন-সমীপে দাঁড়াইলে তাঁহাকে দেখিয়াই ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু আজ অভাগিনীর সে মনোরথ পূর্ণ হইল না। তিনি নগেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু পুষ্পচয়ন-ব্যগ্রা সূর্য্যমুখীর নয়নপথে পতিত হইলেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। সূর্য্যমুখী এবার নিজে উত্তর-সাধক হইয়া নগেন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহ দিয়া নিজে নিরুদ্দেশ হইলেন। অভাগিনীর সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

কুন্দ আজ আশাতীত সুখের অধিকারিণী হইয়াও অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন—মনে ভাবিলেন "সূর্য্যমুখী আমাকে অসময়ে রক্ষা করিয়াছিল—নহিলে আমি কোথায় যাইতাম—কিন্তু আজি সে আমার জন্য গৃহত্যাগী হইল। আমি সুখী না হইয়া মরিলে ভাল ছিল।"

নিজ স্বার্থের সহিত পর স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে কুন্দ পরস্বার্থের নিকট নিজ স্বার্থ বলিদান করিতেন। যে দিন প্রথম নগেন্দ্র সেই বাপীতটে প্রাণ খুলিয়া প্রণয়-পূরিত বাক্যে তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি উপকর্ত্রীর দুঃখ ভাবিয়া চিত্ত-সংযম করিয়া বলিয়াছিলেন "না।" কিন্তু যখন সূর্য্যমুখী স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তাঁহার বিবাহ দিলেন, তখন উপকর্ত্রীকে অসুখিনী করিব বলিয়া কুন্দের কোন আশঙ্কা হয় নাই। সূর্য্যমুখীর তাৎকালিক হৃদয়ভাব—ঝটিকার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশান্তভাব—চির-সহচর নগেন্দ্রই বুঝিতে পারেন নাই, সরলা বুঝিবে কিরূপে? তিনি নগেন্দ্রকে শুদ্ধ দেখিয়াই জীবন কাটাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, নগেন্দ্রের পত্নী হইবেন সে আশা তিনি একদিনও করেন নাই। তিনি নগেন্দ্রেরই, কিন্তু নগেন্দ্র যে তাঁহার—তিনি একদিনও তাহা ভাবিতে সাহস করেন নাই। কেবল সেই দিন মাত্র

প্রদোষকালে বাপীতটে বসিয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন "আমার নগেন্দ্র!" কমলমণির মুখে 'দাদা তোকে ভাল বাসে'' এই কথা শোণার পরই তাঁহার এরূপ সাহস হইয়াছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের, অমনি বলিয়া উঠিলেন "আমলো! আমার নগেন্দ্র? আমি কে? সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র।" কিন্তু আজ তাঁহার সে দুরাশাও পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি কুন্দ দুঃখিনী। কুন্দ যে সুখ অনন্ত অসীম ও অপরিমিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সে সুখে পদার্পণ করিতে না করিতেই তাহার সীমা অবধি ও পরিমাণ দেখিলেন। যাঁহাকে লইয়া তাঁহার সুখ তিনি আজ সূর্য্যমুখী-বিরহে নিরতিশয় কাতর।

সূর্য্যমুখীব পলায়নের পরদিন প্রদোষে নগেন্দ্রকে ব্যজন করিতেছেন, আর কেহ নাই--অথচ দুইজনেই নীরব। কুন্দ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া আজ মুখ ফুটিয়া নগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিলে, আবার যেমন ছিল, তেমনই হয়?" নগেন্দ্র সন্দেহ করিলেন যে কুন্দ বিবাহজন্য অনুতাপিনী। কুন্দ ইহাতে ব্যথা পাইলেন। বলিলেন, "তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া যে সুখী করিয়াছ—তাহা আমি কখন আশা করি নাই। আমি তাহা বলি না—আমি বলিতেছিলাম যে, কি করিলে, সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে"। নগেন্দ্র—সূর্য্যমুখীর নাম গ্রহণে কুন্দের অধিকার নাই—কুন্দকে এইরূপ তিরস্কার করায় কুন্দ কাতর হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, "এটি কি তিরস্কার? আমার ভাগ্য মন্দ—কিন্তু আমিত কোন দোষ করি নাই। সূর্য্যমুখীইত এ বিবাহ দিয়াছে।" আমরাও বলি কুন্দত কোন দোষ করেন নাই। 'বিবাহের অগ্রে, বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভাল বাসিয়াছিল—কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার কোন বাসনা করে নাই—আশাও করে নাই, আপনার নৈরাশ্য আপনি সহ্য করিত। তাকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া হাতে দিল কে?' বস্তুতঃ সূর্য্যমুখীই কুন্দকে এই আশাতীত সুখে সুখিনী করিয়াছিলেন। তিনি অনাথিনীকে স্বয়ং সুখিনী করিয়া আজ দুঃখপারাবারে ভাসাইয়া গেলেন, কিন্তু সে দোষ তাঁহার নহে—নগেন্দ্রের। নগেন্দ্র কুন্দ-নন্দিনীকে বিবাহ করিয়াও যদি সূর্য্যমুখীকে পায়ে না ঠেলিতেন—যদি সূর্য্যমুখীর অলৌকিক ঔদার্য্য ও অতিমানুষ আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য বুঝিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন—তাহা হইলে "বিষবৃক্ষ" অঙ্কুরে বিদলিত হইত, গোবিন্দপুর স্বর্গধাম হইত, সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী উভয়েই নগেন্দ্র-দেবের সেবায় নিরত হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইল না। ভবিতব্যের দ্বার কে রোধ করে? কুন্দকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া নগেন্দ্র ভাবিলেন কুন্দ

রাগ করিয়াছেন। রাগ করিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "না"। নগেন্দ্র ছোট্‌টো "না" কথাটী ঔদাসীন্য ও ভালবাসার অভাবের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিলেন। ভাল বাস কি না জিজ্ঞাসা করায় কুন্দ বলিলেন "বাসি বইকি?" এই সরল হাবশূন্য অকৃত্রিম প্রণয়খ্যাপনে নগেন্দ্র বিরক্ত হইলেন। যে নগেন্দ্র—সূর্য্যমুখীর—"আমার সর্ব্বস্বধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি" "তুমি আমার পরকাল" ইত্যাদি অসংখ্য হৃদয়দ্রাবক প্রেমখ্যাপনা শুনিয়াছেন, তিনি আজ সরলার এই সংক্ষিপ্ত প্রণয়েতিহাসে কেন পরিতৃপ্ত হইবেন? নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কুন্দ! বোধ হয় তুমি আমায় কখন ভাল বাসিতে না।" কুন্দ আবার সরলভাবে উত্তর দিলেন "বরাবর বাসি।"

'নগেন্দ্র বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে এ সূর্য্যমুখী নয়। সূর্য্যমুখীর ভাল বাসা যে কুন্দনন্দিনীতে ছিল না—তাহা নহে—কিন্তু কুন্দ কথা জানিতেন না। তিনি বালিকা, ভীরু-স্বভাব, কথা জানেন না, আর কি বলিবেন? কিন্তু নগেন্দ্র তাহা বুঝিলেন না'। এই কথা না জানাই কুন্দের ধ্বংসের মূল হইল, কুন্দ নগেন্দ্র-পত্নী হইয়া অধিক দিন নগেন্দ্র প্রণয়িনী থাকিতে পারিলেন না। যতদিন দুরত্ব-জনিত মোহ ছিল—ততদিন কুন্দ নগেন্দ্র-প্রেমের অধিকারিণী ছিলেন, বিবাহ হইলে সে দূরত্ব গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে সে মোহও অপনীত হইল। নগেন্দ্রের নিকট কুন্দ সূর্য্যমুখীর সহিত তুলনার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন না। কুন্দ এখন নগেন্দ্রের চক্ষুঃশূল হইলেন। নগেন্দ্র কুন্দকে ফেলিয়া সূর্য্যমুখীর অন্বেষণে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন।

'কুন্দনন্দিনী ভগ্ন পুতুলের ন্যায়, নগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একাকিনী সেই বিস্তৃত পুরী মধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন।'

নগেন্দ্রনাথ বিদেশ হইতে দেওয়ানকে পত্রাদি লিখিতেন—কিন্তু অভাগিনী কুন্দকে একখানিও পত্র লিখিতেন না। কুন্দ দাওয়ানের কাছে সেই গুলি চাহিয়া আনিয়া পড়িতেন, পড়িয়া, আর ফিরাইয়া দিতেন না। সেই গুলির পাঠ তাঁহার গায়ত্রীজপ হইয়াছিল। সেই বিপুল পুরীমধ্যে একাকিনী কুন্দ নগেন্দ্রবিরহে যে কি যাতনা পাইতেছিলেন তাহা কে জানিবে? নগেন্দ্রের অনাদরে সূর্য্যমুখীর যে যাতনা হইয়াছিল কুন্দের এ যাতনা তাহা অপেক্ষা বিন্দুমাত্রও ন্যূন ছিল না।

'সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম! প্রকাশের শক্তি নাই বলিয়া, তাহা কুন্দের নিরুদ্ধ বায়ুর ন্যায় সতত সে হৃদয়ে আঘাত করিত।' কুন্দ রাত্রিদিন ভাবিতেন—সূর্য্যমুখী আকাশের চাঁদ হাতে দিয়া কি দোষে তাহা কাড়িয়া লইলেন? 'কি দোষে তাকে

নগেন্দ্র পায়ে ঠেলিয়াছেন? ভাল নগেন্দ্র নাই ভাল বাসুন—তাকে ভাল বাসিবেন কুন্দের এমন কি ভাগ্য—একবার কুন্দ তাঁকে দেখিতে পায় না কেন? শুধু তাই কি? তিনি ভাবেন কুন্দই এই বিপত্তির মূল; সকলেই ভাবে কুন্দই অনর্থের মূল।' কিন্তু অভাগিনী বুঝিয়া স্থির করিতে পারিতেন না কি দোষে তিনি সকল অনর্থের মূল, বুঝিতে না পারিয়া কেবল দিন রাত্রি রোদন করিতেন।

আবার কখন কখন কুন্দ সমস্ত দোষ নিজ মস্তকে লইতেন, ভাবিতেন "সূর্য্যমুখীর এই দশা আমা হতে হইল। সূর্য্যমুখী আমাকে রক্ষা করিয়াছিল—আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিত—তাহাকে পথের কাঙ্গালিনী করিলাম; আমার মত অভাগিনী কি আর আছে? আমি মরিলাম না কেন? এখনও মরি না কেন?" অমনি নগেন্দ্রের দেবমূর্ত্তি তাঁহার স্মৃতিপটে প্রতিবিম্বিত হইত—অমনি নগেন্দ্র-দর্শনলালসা প্রদীপ্ত হইত—আবার ভাবিতেন, "এখন মরিব না। তিনি আসুন—তাঁকে আর একবার দেখি—তিনি কি আর আসিবেন না?" নগেন্দ্রদর্শনই কুন্দের স্বর্গ—নগেন্দ্রদর্শন ভিন্ন কুন্দ আর কোন সৌভাগ্যেরই প্রার্থিনী নহেন। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসিলে, নগেন্দ্রকে দেখিয়া, সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র, সূর্য্যমুখীকে প্রত্যর্পণ করিয়া মরিব। আর তার সুখের পথে কাঁটা হব না।—কুন্দ অবশেষে তাহাই স্থির করিলেন।

নগেন্দ্র বাটী আসিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই সেই রাত্রিতেই সূর্য্যমুখী দেখা দিলেন। 'বাটী আসিয়া নগেন্দ্র কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ আপন শয়নাগারে, উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি রোদন করিল। যদি কেহ কাহাকে বাল্যকালে অকপটে আত্মসমর্পণ করিয়া, যেখানে অমূল্য হৃদয় দিয়াছিল, সেখানে তাহার বিনিময়ে কেবল তাচ্ছিল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে সেই এ রোদনের মর্ম্মচ্ছেদকতা অনুভব করিবে।' নগেন্দ্রের অনাদরে কুন্দের পরিতাপ জন্মিল, কুন্দ ভাবিলেন, "কেন আমি স্বামিদর্শন-লালসায় প্রাণ রাখিয়াছিলাম। এখন আর কোন্ সুখের আশায় প্রাণ রাখি?" কুন্দ এইরূপ চিন্তায় সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় ও রোদনে যাপিত করিলেন। প্রত্যূষে হীরা আসিয়া দেখিল 'কুন্দের চক্ষু ফুলিয়াছে, বালিশ ভিজিয়াছে'। হীরা জিজ্ঞাসা করিল, "একি? সমস্ত রাত্রিই কেঁদেছ না কি? কেন বাবু কিছু বলেছেন?" কুন্দ বলিলেন "কিছু না"। এই বলিয়া কুন্দ আবার দ্বিগুণিত বেগে কাঁদিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র আসিয়া তাঁহার সহিত কি কথা বার্ত্তা কহিলেন হীরা তাহা জানিতে চাহিল। কুন্দ বলিলেন, "কোন কথা বার্ত্তা বলেন নাই।" হীরা বলিল "সে কি মা। এক দিনের পর দেখা হলো!

কোন কথাই বলিলেন না?"। কুন্দ বলিলেন, "আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।" এই শেষ কথা বলিতে কুন্দের হৃদয় ফাটিয়া গেল, উচ্ছ্বলিত শোকবেগে কুন্দ কাঁদিয়া ফেলিলেন। হীরা হাসিয়া বলিল, "ছি মা! এতে কি কাঁদ্‌তে হয়? কত লোকের বড় বড় দুঃখ মাথার উপর দিয়া গেল—আর তুমি একটু দেখা করার বিলম্ব জন্য কাঁদিতেছ!"। ইহা অপেক্ষা "বড় বড় দুঃখ" আর কি হইতে পারে কুন্দ তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। হীরা বলিল, "আমার মত যদি তোমাকে সহিতে হইত—তবে এত দিন তুমি আত্মহত্যা করিতে"।

"আত্মহত্যা" এই অশুভসূচক ধ্বনি কুন্দের কর্ণ-কুহরে বজ্রধ্বনির ন্যায় বাজিয়া উঠিল। কুন্দ সে আঘাতে শিহরিয়া উঠিলেন। কে যেন তাঁহার কাণে কাণে আসিয়া বলিল "তুমি আত্মঘাতিনী হইতে পারিবে? এ যন্ত্রণা সহা ভাল, না মরা ভাল?" ভূতাবিষ্টার ন্যায় কুন্দ কিরূপে আত্মঘাতিনী হইবেন কেবল এই ভাবনায় নিমগ্ন হইলেন। সুবিধাও জুটিয়া গেল। হীরা যে বিষের কৌটা ফেলিয়া গিয়াছিল, কুন্দ তাহা হইতে বিষের মোড়ক চুরি করিয়া বিষপান করিলেন।

সূর্য্যমুখী কমলকে সঙ্গে করিয়া কুন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কুন্দের ঘরে প্রবেশ করিয়া কুন্দের অবস্থা দেখিয়া শিরে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। এদিকে কমল ভয়বিহ্বল বদনে কুন্দের ঘর হইতে বাহির হইয়া নগেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নগেন্দ্র আসিলে তাঁহাকে কুন্দের ঘরে যাইতে বলিলেন। নগেন্দ্র তথায় গিয়া দেখিলেন সূর্য্যমুখী কাঁদিতেছেন।

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?"। সূর্য্যমুখী বলিলেন "সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" নগেন্দ্র ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 'কুন্দনন্দিনীর মুখে কালিমা ব্যাপ্ত হইয়াছে। চক্ষু হীনতেজ হইয়াছে, শরীর অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে'।

আজ এই শেষ দিনে অনাথিনীর সাহস বাড়িল—আজ প্রথম ও শেষ দিনে দুঃখিনী কুন্দ হৃদয়-নিগূহিত গভীর প্রেম বাক্য ও কার্য্যে প্রকাশ করিলেন, নগেন্দ্র নিকটে আসিলে অশ্রুজল দরবিগলিত ধারায় তাঁহার গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ছিন্নমূল লতার ন্যায় নগেন্দ্র-চরণে লুণ্ঠিতশির হইলেন। নগেন্দ্র স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন, "একি এ কুন্দ! তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?"

কুন্দ নগেন্দ্রকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন, তিনি আপনাকে নগেন্দ্রের কথার উত্তরপ্রত্যুত্তর দিবার যোগ্য বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু আজ কুন্দ শেষ দিনে নির্ম্মুক্তভাবে তাঁহার কথার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। কুন্দ কুসুম শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে ক্ষণেকের জন্য ঈষৎ প্রস্ফুটিত হইল। কুন্দ বলিলেন

"তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?"

নগেন্দ্র অবাক্ হইয়া নতশিরে কুন্দের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কুন্দ তখন আবার বলিলেন, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে, তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্প দিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না"।

এই প্রণয়পূরিত হৃদয়-বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া নগেন্দ্র বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন। নগেন্দ্রের মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

আজ কুন্দ সূর্য্যমুখী অপেক্ষাও বাক্‌পটু। আজ কুন্দের প্রেমবহ্নি আধারস্বরূপ হৃদয় ভস্মসাৎ করিয়া বাহিরে জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষণপ্রভার বিলসনের ন্যায় ইহা আজ জগৎ আলোকিত করিল। কুন্দ বলিলেন "ছি! তুমি অমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিও না। আমি তোমার হাসি-মুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম তবে আমার মরণেও সুখ নাই"।

পতিপ্রেমের ইহা অপেক্ষা প্রবলতর দৃষ্টান্ত সূর্য্যমুখীও দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু আজ এ প্রেমখ্যাপনে কুন্দের কি লাভ? অথবা লাভ নাই বলিয়াই আজ কুন্দ সাহসিনী—স্বার্থসাধনের সন্দেহ স্পর্শিতে পারে না বলিয়াই আজ কুন্দ নগেন্দ্রের সম্মুখে হৃদয় খুলিলেন। ভালবাসা দেখাইলে নগেন্দ্র ভাল বাসিবেন—এ আশার সহিত আজ কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই আজ কুন্দ এত নির্ম্মুক্ত ভাবে নগেন্দ্রকে ভাল বাসা দেখাইলেন।

নগেন্দ্র এতদিন কুন্দের প্রেমের গভীরতা ও নিঃস্বার্থতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আজ শেষদিনে উপলব্ধি করিয়া মর্ম্মপীড়িত হইয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "কেন তুমি এমন কাজ করিলে? তুমি আমায় একবার কেন ডাকিলে না?"

কুন্দ সৌদামিনী-বিলসনের ন্যায় মৃদু মধুর হাসিয়া বলিলেন, "তাহা ভাবিও না। যাহা বলিলাম তাহা কেবল মনের বেগে বলিয়াছি। তোমার আসিবার আগেই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, তোমাকে দেখিয়া মরিব। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, দিদি যদি কখন ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব—আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম—তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।"

নগেন্দ্রকে দেখিলে কুন্দের মরিতে ইচ্ছা হয় না—এই টুকুতেই কুন্দের প্রেমের মাহাত্ম্য। নগেন্দ্রদর্শনেই কুন্দের পরিতৃপ্তি। নগেন্দ্রভোগলালসা কুন্দকে কখনই পার্থিব করিয়া তুলিতে পারে নাই। নু-

গেন্দ্র আজ কুন্দের সেই অপার্থিব প্রেমের নিকট পরাজিত হইলেন। আজ নগেন্দ্র চিরমুগ্ধা বালিকার বাক্যগাম্ভীর্য্যে ও বাক্য-মাহাত্ম্যে পরাস্ত হইলেন।

কুন্দ ক্ষণকাল বিশ্রামের পর আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার কথা কহিবার তৃষ্ণা নিবারণ হইল না—আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম—সাহস করিয়া কখন মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই। আমার সাধ মিটিল না—আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে—আমার মুখ শুকাইতেছে—জিব টানিতেছে—আমার আর বিলম্ব নাই।" এই বলিয়া কুন্দ পর্য্যঙ্কাবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া, ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া, নগেন্দ্রের অঙ্কে মস্তক রাখিয়া মুদিত-নয়ন ও নীরব হইলেন। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া কুন্দ সূর্য্যমুখী ও কমলকে দেখিতে চাহিলেন। তাঁহারা আসিলে কুন্দ তাঁহাদিগের চরণ-রেণু মস্তকে গ্রহণ করিয়া স্বামীর চরণযুগল মধ্যে মুখ লুকাইলেন। ক্রমে ক্রমে বিগতচেতনা হইয়া, স্বামীর পদযুগল মধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীন বয়সে কুন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

কুন্দ-কুসুম মুহূর্ত্তমাত্র ঈষৎ বিকসিত হইয়া অস্থের মত শুকাইয়া গেল। সেই ঈষদ্বিকসনের সৌন্দর্য্যে—সেই অনতিপরিস্ফুট কোরকের সৌগন্ধ্যে—সহৃদয় পাঠকবর্গের মানসক্ষেত্র আজও সমুজ্জ্বলিত ও সুরভিত হইয়া রহিয়াছে। চিরদুঃখিনী অনাথিনী নিরপরাধিনী নগেন্দ্রময়জীবিতা কুন্দের দুঃখে—কুন্দের মৃত্যুতে পাষাণেরও হৃদয়ে সহানুভূতি উদ্দীপিত হয়, রক্তমাংসনির্ম্মিত মানবের হৃদয়ে যে সহানুভূতি উদ্দীপিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কুন্দের দুঃখ ও কুন্দের মৃত্যু সংঘটিত না হইলে "বিষবৃক্ষের" হৃদয়দ্রাবণী শক্তির অর্দ্ধেক বিনষ্ট হইত।

—০০—

কমলমণি।

যেমন সূর্য্যালোক বিনা সৌধরাজি-বিভাসিত নগরনগরী-খচিত জগৎ আঁধার, যেমন দীপালোক বিনা রত্নরাজি-খচিত কারুকর্ম্ম-বিচিত্রিত স্ফটিক-নির্ম্মিত গৃহেরও শোভা হয় না, সেইরূপ কমলমণি না থাকিলে এই বিচিত্র-চিত্রনিচয়-খচিত "বিষবৃক্ষ"ও তমসাচ্ছন্ন হইত। চন্দ্রকিরণ যেমন হাঁসিয়া হাঁসিয়া দরিদ্রের কুটীর হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত সমস্ত আলোকিত করে, কমলের হৃদয়-জ্যোৎস্নাও সেইরূপ দীন দুঃখীর অন্তর হইতে ধনীর অন্তর পর্য্যন্ত সকলই উজ্জ্বলিত করিত।

কমলের জীবনে কোন অভাব ছিল না। ধনবান্ ও গুণবান্ ভ্রাতা, ঐশ্বর্য্যশালী ও তদায়ত্ত-প্রাণ স্বামী এবং দাম্পত্য-গ্রন্থি প্রাণাধিক পুত্র—কমলের এ সমস্তই ছিল। সংসারিণী যে সকল সুখের প্রার্থিনী কমল সে সকল সুখেরই অধিকারিণী ছিলেন। কমলের নিজের

অভাব, নিজের দুঃখ ছিল না বলিয়াই, কমল পরের অভাবে, পরের দুঃখে এত সহানুভূতি করিতেন। যে নিজের অভাবে, নিজের দুঃখে অভিভূত, সে পরের অভাবে ও পরের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিত অবসর ও সুবিধা পায় না। যাহার নিজের অভাব ও দুঃখ নাই, সে যদি দয়া ও স্নেহের আধার হয়, সে যত অপরের অভাব ও দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইবে, অপরে তাহা পারিবে না। কমলের নিজের কোন অভাব ও দুঃখ ছিল না, এবং তাঁহার হৃদয় অপরিমিত দয়া ও স্নেহের আধার ছিল. এইজন্য কমল সকলেরই শান্তিদায়িনী ছিলেন। নগেন্দ্রের বিশ্বপ্রেমিকতা ও ঔদার্য্য কমলেও অনেক পরিমাণে ছিল। এইজন্য কমল আপন পর বড় বিবেচনা করিতেন না। কমল শ্রীশের, কমল নগেন্দ্রের, কমল সতীশের, কমল সূর্য্যমুখীর, কমল কুন্দের, কমল দাস দাসী প্রভৃতি সকলেরই। কমল যাহারই সংমিশ্রণে আসিতেন, তাহারই সুখে ও দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিতেন। সংঘর্ষ পায় নাই বলিয়া কমলের দয়া, কমলের স্নেহ, কমলের বিশ্বপ্রেমিকতা, কমলের ঔদার্য্য কখনই অত্যুচ্চ উৎকর্ষ-শিখরে আরোহণ করে নাই বটে; কিন্তু প্রতিক্রিয়ায় আবার নিম্ন হইতে নিম্নতর প্রদেশেও কখন অবনমিত হয় নাই। সেই সকল কোমলতর বৃত্তিনিচয় কমলের হৃদয়াকাশে বাসন্ত মলয়ানিলের ন্যায় সতত মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইত। কমলের কোমলতর বৃত্তিনিচয়ের সেই মৃদুমন্দ প্রবাহে যেই পতিত হইত, তাহারই শোক তাপ ও অভাব দুঃখ দূর হইত। হাস্যময়ী যে দিকে একবার তাকাইতেন, অন্ধকার সে দিক্ হইতে পলায়ন করিত। আনন্দময়ী যেখানে যাইতেন, সেই খানেই যেন আনন্দ ছড়াইয়া পড়িত। রসিকতা, সহৃদয়তা ও গাম্ভীর্য্যের এরূপ সংমিশ্রণ অতি অল্পই দেখা যায়। কমলমণির পতিপ্রেম নিতান্ত সাধারণ ছিল না। তবে সূর্য্যমুখী ও কুন্দের পতিপ্রেম বাধা পাইয়া যেরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছিল এবং ভক্তির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যেরূপ স্বর্গীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল, কমলের প্রেম সেরূপ পরিপুষ্ট ও স্বর্গীয়-ভাব-পূর্ণ হয় নাই।

প্রকৃতি যেমন কমলকে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন, কমলের পিতাও তাঁহাকে আহার্য্য শোভায় শোভিত করিতে যত্নের ত্রুটী করেন নাই। পিতার বিশেষ যত্নে কমল রীতিমত লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। কমল পিতার সাধের একমাত্র কন্যা ছিলেন বলিয়া কিঞ্চিৎ আদরিণী ছিলেন। যৌবনেও এ আদরিণী-ভাব তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। [illegible] আদরিণী-ভাবের সহিত যৌবনে বালিকাসুলভ চপলতা ও সরলতা সংমিশ্রিত হওয়ায়, কমলচরিত্র

অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। কমল সকলের সহিতই হাস্য কৌতুক করিতেন; বালিকার নির্ব্বিকার হাস্য কৌতুকে যেমন সকলেই আনন্দিত হয়, সেইরূপ কমলের হাস্য কৌতুকে সকলেই প্রীত হইতেন। সংসারানভিজ্ঞের সরলতা ও ঘোরতর সংসারীর বুদ্ধিপ্রখরতা—কমলে এই দুই বিরুদ্ধ ভাব অতি সুন্দররূপে সংমিশ্রিত ছিল।

নগেন্দ্র অপরিচিত বালিকা কুন্দকে কমলের হস্তে সমর্পণ করিয়া যেই পশ্চাৎ ফিরিলেন অমনি 'কমল কুন্দকে কোলে তুলিয়া লইয়া দৌড়িলেন। একটা টবে কতকটা অনতিতপ্ত জল ছিল, অকস্মাৎ কুন্দকে তাহার ভিতর ফেলিলেন। কুন্দ মহাভীতা হইল। কমল তখন হাসিতে হাসিতে স্নিগ্ধ সৌরভযুক্ত সোপ হস্তে লইয়া স্বয়ং তাহার গাত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন।' 'কমল স্বহস্তে কুন্দকে মার্জ্জিত এবং স্নাত' করাইয়া 'তাহাকে অমল শ্বেত চারু বস্ত্র পরাইয়া, গন্ধতৈল সহিত তাহার কেশরচনা করিয়া দিলেন; এবং কতকগুলিন অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "যা, এখন দাদা বাবুকে প্রণাম করিয়া আয়। আর দেখিস্—যেন এবাড়ীর বাবুকে প্রণাম করে ফেলিস্ না—এবাড়ীর বাবু দেখিলেই বিয়ে করে ফেলিবে।"' এটুকু কমলের কৌতুকপ্রিয়তা ও সহৃদয়তার কেমন সুন্দর ছবি!

সূর্য্যমুখী যখন নগেন্দ্রের হৃদয় কুন্দাসক্ত বলিয়া সন্দেহ করিয়া কমলের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন, কমল তখন তাহার প্রত্যুত্তরে এইরূপ লিখিয়াছিলেন:

"তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয় প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না, আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার—তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি দড়ি কলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।"

সতীর আদর্শ সূর্য্যমুখীও এখানে পতিভক্তিতে কমলের নিকট পরাস্ত হইলেন। কমল স্বামীর হৃদয়কে অবিশ্বাস করাও স্ত্রীলোকের পক্ষে পাপ বলিয়া মনে করিতেন।

শৃঙ্গাররসের তিনটী ভাগ—পূর্ব্বরাগ সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। পূর্ব্বরাগ ও বিপ্রলম্ভেই হৃদয়ের মহতী বৃত্তি নিচয় উদ্দীপিত ও পরিপুষ্ট হয়। ভবভূতির সীতায় শুদ্ধ বিপ্রলম্ভ; কালিদাসের শকুন্তলায় পূর্ব্বরাগ, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ; বঙ্কিমের সূর্য্যমুখীতে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ; কুন্দে পূর্ব্বরাগ ও বিপ্রলম্ভ, কমলমণিতে শুদ্ধ সম্ভোগ—চিত্রিত হইয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা রমণীর পূর্ণ চিত্র বটে—রমণীসুলভ তিন অবস্থায় রমণী-

ন্মের কিরূপ বৈচিত্র্য সংঘটিত হয় তাহার ছবি প্রকাশ করায় কালিদাসের শকুন্তলা সর্জ্জনশীল কবিত্বের অতুল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ থাকিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভবভূতির সীতা ও বঙ্কিমের সূর্য্যমুখী ও কুন্দের ন্যায় কখন এতদূর হৃদয়দ্রাবণী হইবে না। কুন্দ ও সূর্য্যমুখীর মধ্যে কুন্দ আবার সূর্য্যমুখী অপেক্ষাও অধিকতর হৃদয়দ্রাবণী, কারণ সূর্য্যমুখীর প্রেম সম্ভোগপর্য্যবসায়ী, কিন্তু কুন্দের প্রেম চির-বিপ্রলম্ভ-পর্য্যবসায়ী। কমলের প্রেমের উন্মাদকী শক্তি আছে বটে; কিন্তু হৃদয়দ্রাবণী শক্তি কিছুই নাই, যে হেতু ইহা আমূলসম্ভোগাত্মক। ইহাতে স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস নাই বটে, কিন্তু ইহা পার্থিবসুখহিল্লোলে ঈষন্নর্ত্তনশীল। 'মহাসমর' নামক পরিচ্ছেদে এইপ্রেমের ছবি অতি সুন্দর প্রদত্ত হইয়াছে।

কমল সূর্য্যমুখীর পত্র পাইয়া যখন গোবিন্দপুরে গমন করিলেন, তখন তিনি সূর্য্যমুখী ও কুন্দ উভয়েরই প্রতি অতি চমৎকার ব্যবহার করিলেন। তাঁহার আগমনেই নগেন্দ্রের গৃহ আলোকিত হইল, তাঁহার সহাস্য বদন দেখিয়া সূর্য্যমুখীরও নয়ন-জল শুকাইল। নগেন্দ্রের মেঘাচ্ছন্ন মুখমণ্ডলেও কমলের হৃদয়-জ্যোৎস্না প্রতিবিম্বিত হইল। কমল সূর্য্যমুখীর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে গিয়া—কুন্দের দুঃখে কাতর হইয়া পড়িলেন। সূর্য্যমুখীর কণ্টকোদ্ধার করিতে গিয়া, সে কণ্টক যত্ন করিয়া নিজের হৃদয়ে তুলিয়া লইলেন। কুন্দ যখন কমলের নিকট ছিলেন, কমলের চিরপ্রেমময়ী প্রকৃতি তখন হইতেই তাঁহাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, মধ্যে কয় বৎসর অদর্শনে কতক কতক ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে 'কমলের স্বভাবগুণে, কুন্দেরও স্বভাবগুণে, সেই ভালবাসা আবার নূতন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল'।

কুন্দের সহিত কমলের প্রথম সম্ভাষণ এইরূপ হইল "ওলো কুঁদী মুদী চুঁদী—ভাল আছিস ত কুঁদি?" কুন্দ অবাক্ হইয়া রহিলেন। কিছুকাল ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর স্থির করিয়া বলিলেন, "আছি"। কমল বলিলেন 'আছি দিদি, আমায় দিদি বল্‌বি—না বলিস্‌ত ঘুমিয়া থাকিবি আর তোর চুলে আগুণ ধরিয়ে দিব।' আর নহিলে গায়ে আরসুলো ছাড়িয়া দিব।"

কমল কুন্দের চুল বাঁধিতে বসিলেন। 'চুল বাঁধা সমাপ্ত হইলে কুন্দের মাথা তুলিয়া, কমল তাহার মস্তক আপনার কোলে রাখিলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। এই সব কাজ শেষ করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুঁদি, কাঁদিতেছিলি কেন?"

কুন্দ বলিল, "তুমি যাবে কেন?"

কমলমণি একটু হাসিলেন। কিন্তু ফোটা দুই চক্ষের জল সে হাসি মানিল না—না বলিয়া কহিয়া তাহারা কমলমণির গণ্ড বাহিয়া হাসির উপর আসিয়া পড়িল।

কমলমণি বলিলেন, "তাতে কাঁদিস কেন?"

কুন্দ। তুমিই আমায় ভাল বাস।

কম। "কেন—আর কেহ কি ভাল বাসে না?" "কে ভাল বাসে না? বউ ভাল বাসে না—না "দাদা ভালবাসে না?"

কিছুতেই কুন্দের উত্তর নাই। কমল আবার বলিলেন, "যদি আমি তোমায় ভাল বাসি—আর তুমি আমায় ভাল বাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না?" কুন্দ এবারও নিরুত্তর। কমল নাছাড়, আবার বলিলেন—"যাবে?" এবার কুন্দের ঘাড় নড়িল বলিল—"যাব না"।

চতুরা কমল কুন্দের হৃদয় বুঝিলেন, তথাপি কুন্দের মুখ হইতে তাঁহার মনের কথা বাহির করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই দাদাকে বড় ভাল বাসিস—না?"

কুন্দ নীরবে কমলের হৃদয় মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে কাঁদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার চুল ভিজিয়া গেল। ভাল বাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ মধ্যে, কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইল। কুন্দনন্দিনীর চক্ষু মুছিয়া কহিল, "কুন্দ! আমার সঙ্গে চল।" কুন্দের চক্ষে আবার জল পড়িতে লাগিল। কমল বলিল, "রহিলে তুই বয়ে গেলি, দাদা বয়ে গেল, বউ বয়ে গেল—সোণার সংসার ছারখার গেল।" কুন্দ কাঁদিতে লাগিল। কমল বলিলেন "যাবি? মনে করিয়া দেখ্—দাদা কি হয়েছে, বউ কি হয়েছে?"। প্রেমময়ীর করুণার্দ্র ভাবের এখানি রমণীয় ছবি।

কমল এক মুহূর্ত্ত শ্রীশের বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না। শ্রীশ আফিসে গেলে কমলের সে টুকুও পতিবিরহিণী হইয়া গৃহে থাকা কষ্টকর বোধ হইত। কমল একদিন সতীশের কাছে এই বিরহাসহিষ্ণুতা কেমন সুন্দররূপে ব্যক্ত করিতেছেন দেখুনঃ——

"অ, সতুবাবু, মানুষে আপিসে যায় কেন, বলিতে পার?" সতুবাবু উত্তর দিলেন, "ইলি—লি—বি।"

ক। "সতুবাবু তুমি কখন আপিসে যেও না।"

সতু বলিল "হামু!"

কমলমণি বলিলেন, "তোমার হাম্ করবার ভাবনা কি? তোমাকে হাম্ করার জন্য আপিসে যেতে হবে না। আপিসে যেওনা—আপিসে গেলে বৌ দুপর বেলা বসে বসে কাঁদবে।"

কমলের বুদ্ধির নিকট শ্রীশের বুদ্ধি পরাজিত হইত। শ্রীশ অপেক্ষা যে কমল অধিকতর লোকচরিত্র-রহস্যোদ্ভেদসমর্থ ছিলেন, নিম্নে প্রদত্ত চিত্রে তাহা পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে—

সূর্য্যমুখী স্বয়ং নগেন্দ্রের সহিত কুন্দের বিবাহ দিবেন এইরূপ মর্ম্মে কমলকে একখানি পত্র লিখেন। কমল

পত্র খানি শ্রীশের হাতে দিলেন, শ্রীশ পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এটা তামাসা!"

'ক। কোন্‌টা তামাসা? তোমার কথাটা না পত্র খানা?

'শ্রীশ। পত্র খানা।

'কম। আজি মন্ত্রিমশাইকে ডিশ্চার্জ করিব। ঘটে এ বুদ্ধি টুকুও নাই? মেয়ে মানুষে কি এমন তামাসা মুখে আনিতে পারে?'

কমল সূর্য্যমুখীকে একদিন শিখাইয়াছিলেন—যে পতির প্রতি অবিশ্বাসিনী হওয়া রমণীর পক্ষে ঘোরতর পাপ। আজ সূর্য্যমুখীর পত্র পাইয়া গোবিন্দপুরে গিয়া সূর্য্যমুখীকে শিখাইতেছেন যে পতি পায়ে ঠেলিলেও স্ত্রীর পতিপ্রেম বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কমল বলিলেন,—

'তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে তোমার অন্তর্দাহ হয়েছে। তবে কেন বল "আমি কে?" তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?'

কমল সূর্য্যমুখীকে তিরস্কার করিলেন, কিন্তু সূর্য্যমুখীর কাতরতায় তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। 'সূর্য্যমুখী কাঁদিলেন। কমল তাঁহার মাথা আপন হৃদয়ে আনিয়া হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কথায় সকল কথা ব্যক্ত হইতেছিল না—কিন্তু অন্তরে অন্তরে কথোপকথন হইতেছিল। অন্তরে অন্তরে কমলমণি বুঝিতেছিলেন যে সূর্য্যমুখী কত দুঃখী।'

কমলের নির্ম্মল স্ফাটিক হৃদয়ে আপন পর সকলেরই দুঃখই প্রতিবিম্বিত হইত। সকল সময়েই কমল পরদুঃখে কাতর হইতেন। বিশেষতঃ সূর্য্যমুখীকে ও কুন্দকে তিনি অতিশয় ভাল বাসিতেন। ইহাঁদের দুঃখে সততই কাতর হইতেন একদিন মাত্র এই ভাবের ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল। একদিন, 'প্রণয়ের নৈরাশ্যের সময়, কমলমণি তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইয়া, তাঁহাকে কোলে লইয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়াছিলেন' বলিয়া আজ কুন্দ নগেন্দ্রের তিরস্কারে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া সহৃদয়া, স্নেহময়ী কমলমণির নিকট আত্মবেদনা জানাইতে গিয়া কিছু বলিতে নাপারিয়া বিবশা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। 'কমলমণি কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন—কুন্দকে কাছে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কিছু বলিলেন না। কুন্দ তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়া, কাঁদিতে লাগিলেন। কমলমণি কিছু বলিলেন না; জিজ্ঞাসাও করিলেন না, কি হইয়াছে। সুতরাং কুন্দনন্দিনী আপনা আপনি চুপ করিলেন। কমল তখন বলিলেন, "আমার কাজ আছে," অনন্তর উঠিয়া গেলেন।'

কিন্তু সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসম্বাদ শুনিয়া কমল যখন গোবিন্দপুরে আসিলেন, 'দেখিয়া কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, আবার আকাশে একটী তারা উঠিল। যে অবধি সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই অবধি কুন্দনন্দিনীর উপর কমল-

মণির দুর্জ্জয় ক্রোধ, মুখ দেখিতেন না। কিন্তু এবার আসিয়া কুন্দনন্দিনীর শুষ্ক মূর্ত্তি দেখিয়া কমলমণির রাগ দূর হইল—দুঃখ হইল।’ তিনি কুন্দনন্দিনীকে প্রফুল্লিত করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন—‘নগেন্দ্র আসিতেছেন, সম্বাদ দিয়া কুন্দের মুখে হাসি দেখিলেন’।

সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসম্বাদে প্রথম প্রথম কমল অনেক কাঁদিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় শোকের অধিগম্য ছিল বটে, কিন্তু ইহা শোকে অভিভূত হইত না। স্ত্রীসাধারণের ন্যায় তিনি শোক-বিধুরা হইয়াও কর্ত্তব্যবিমুখা হইতেন না। তিনি পরে ভাবিলেন, “কাঁদিয়া কি করিব? আমি কাঁদিলে শ্রীশচন্দ্র অসুখী হন—আমি কাঁদিলে ত সূর্য্যমুখী ফিরিবে না, তবে কেন এদের কাঁদাই? আমি কখন সূর্য্যমুখীকে ভুলিবনা; কিন্তু আমি হাসিলে যদি সতীশ হাসে, তবে কেন হাসব না।”

আনন্দময়ীর চরিত্রে দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব অতি অন্তরূপে সংমিশ্রিত ছিল। তিনি কখন গাম্ভীর্য্যবতী প্রগলভা গৃহিণী, কখন নর্ত্তনশীল চঞ্চলা বালিকা। কখন পরদুঃখকাতরা সহৃদয়া প্রৌঢ়া গৃহিণী, কখন পরসুখে সুখিনী আহ্লাদিনী বালিকা। এদুইএক চরিত্র বলিয়া অনেক সময় সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমরা শেষোক্ত হৃদয়-ভাবের একটী পরিচয় নিম্নে প্রদান করিতেছি:—

‘সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসিলে—‘সকলকে বেড়িয়া বেড়িয়া কমলমণি শাঁক বাজাইতেছেন, ও হুলু ধ্বনি দিতেছেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতেছেন—এবং কখন কখন এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, এক একবার নৃত্য করিতেছেন।’

হীরা।

যেমন রামায়ণের ঘটনাস্রোতের মূল অভিনেত্রী মন্থরা, সেইরূপ বিষবৃক্ষের ঘটনাস্রোতের মূল অভিনেত্রী হীরা। চরিত্রের দৃঢ়তা বিষয়ে হীরা বিষবৃক্ষের সকল পাত্র পাত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হীরা সকলকেই কার্য্যে অধিনীত করিত, নিজে কাহারও দ্বারা অধিনীত হইত না, জীবনে কেবল একবারমাত্র দেবেন্দ্র দ্বারা অধিনীত হইয়াছিল। আত্মবিস্মৃতি কাহাকে বলে হীরা তাহা জানিত না; জীবনে কেবল একবার মাত্র দেবেন্দ্রের নিকট আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। স্বার্থপরতা, প্রতিহিংসা ও প্রেম—হীরার হৃদয়ে এই তিনটী বৃত্তিই অতি বলবতী ছিল। কিন্তু স্বার্থপরতা ও প্রতিহিংসা এ দুইটী বৃত্তি হীরার প্রেমবৃত্তির সহচরী মাত্র ছিল। প্রেম ভিন্ন হীরার আর কিছু স্বার্থ ছিল না; সেই প্রেমরূপ স্বার্থ সাধনের জন্য হীরা সহস্রলোকের স্বার্থ বলিদান করিতে প্রস্তুত ছিল; সেই স্বার্থসাধনে হতাশ হইয়া হীরা প্রতিহিংসাপরায়ণা হইয়াছিল। পতিকে বড় করার বলবতী ইচ্ছা যেমন লেডি ম্যাক্‌বেথের সমস্ত কার্য্যের নিয়ামক ছিল, দেবেন্দ্রকে লাভ করার ইচ্ছা সেই

রূপ হীরার সমস্ত কার্য্যের নিয়ন্ত্রী ছিল। যেমন সেই অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য লেডি ম্যাক্‌বেথ সহস্র নরহত্যা ও ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতাতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই, সেইরূপ দেবেন্দ্র-প্রাপ্তির ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য হীরা আশ্রয়দাত্রী সূর্য্যমুখীর সর্ব্বনাশ করিতে ও নিরপরাধিণী কুন্দের প্রাণবিনাশের উপায় স্বরূপ হইতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় নাই।

হিংসা—অন্য-শুভদ্বেষ—হীরার একটী স্বাভাবিকী বৃত্তি। কবি হীরার সেই বৃত্তিটী কেমন সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন:—"আচ্ছা! সূর্য্যমুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন? সে ত কখন আমার কিছু মন্দ করে নাই; বরং ভালই বাসে, ভালই করে। তবে রাগ কেন? তা কি হীরা জানে না? হীরা না জানে কি? কেন, বলবো? সূর্য্যমুখী সুখী, আমি দুঃখী, এই জন্য আমার রাগ। সে বড় আমি ছোট, সে মুনিব, আমি বাঁদি। সুতরাং তার উপরে আমার বড় রাগ। যদি বল ঈশ্বর তাকে বড় করিয়াছেন, তবে দোষ কি? আমি তার হিংসা করি কেন? তাতে আমি বলি, ঈশ্বর আমাকে হিংসুকে করেছেন, আমারই বা দোষ কি?"

কিন্তু হীরা এই স্বাভাবিকী বৃত্তিকে সংযত করিতে জানিত। হীরা বিনা স্বার্থে হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিত না। তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য প্রেম—দেবেন্দ্রলালসা। সেই দেবেন্দ্রলালসা চরিতার্থ করার প্রধান অন্তরায় দাসাবৃত্তি। কারণ হীরার বিশ্বাস ছিল "আমরা গতর খাটিয়ে খাই; আমরাও যদি ভাল খাই, ভাল পরি, পটের বিবির মত ঘরে তোলা থাকি, তা হ'লে আমরাও অমন হতে পারি।" দাস্যবৃত্তি ছাড়িয়া ভাল খাইলে পরিলে কুন্দের মত হইতে পারিব—তাহা হইলে কুন্দের ন্যায় দেবেন্দ্রের প্রণয়পাত্রী হইতে পারিব—এই আশায় হীরা হিংসাবৃত্তিকে স্বার্থসাধনে নিয়োজিত করিল; বলিল "কিন্তু যদি তার মন্দ করিলে আমার ভাল হয়, তবে না করি কেন? আপনার ভাল কে না করে? তা হিসাব করিয়া দেখি, কিসে কি হয়। এখন আমার হলো কিছু টাকার দরকার, আর দাসীপনা পারি না। টাকা আসিবে কোথা থেকে? দত্তবাড়ী বই আর টাকা কোথা? তা দত্তবাড়ীর টাকা নেবার ফিকির এই—সবাই জানে যে, কুন্দের উপর নগেন্দ্র বাবুর চোখ পড়েছে—বাবু এখন কুন্দ মন্ত্রের উপাসক। বড় মানুষ লোক, মনে করিলেই পারে। পারে না কেবল সূর্য্যমুখীর জন্য। যদি দুজনে একটা চটাচটি হয়, তা হলে আর বড় সূর্য্যমুখীর খাতির করবে না। এখন যাতে একটু চটাচটি হয়, সেইটা আমায় করিতে হবে।

পাপিষ্ঠা হীরা এই সঙ্কল্পসাধনে কৃতকার্য্য হইল। সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রে মনান্তর বাধাইয়া দিয়া কুন্দকে নগেন্দ্রের সহিত মিলিত করিল এবং সূর্য্যমুখীকে গৃহত্যাগিনী করিল।

দেবেন্দ্র হীরার হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হীরা শয়নে স্বপনে কেবল দেবেন্দ্রেরই ধ্যানে নিরতা ছিল। দেবেন্দ্রের জন্য হীরা উন্মাদিনী—বিবশা। দেবেন্দ্রদর্শনের পূর্ব্বে হীরা ভাল বাসা কাহাকে বলে তাহা জানিত না, 'ভালবাসার কথা শুনিলে' হাসিত। বলিত, 'ও সব মুখের কথা, লোকে একটা প্রবাদ আছে মাত্র।' শেষে পরের চোর ধরতে গিয়া হীরা আপনার প্রাণটা হারায়। হরিদাসী বৈষ্ণবীর সন্ধান করিতে গিয়া যে দিন দেবেন্দ্রের সহিত হীরার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই দিন হইতেই হীরা দেবেন্দ্রগত প্রাণা হইল। কেবল একবার হীরা ধর্ম্মভয়ে দেবেন্দ্রপ্রেম ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল—"দূর হোক্, ও সব কথা যাক্। ও পথেও ত ধর্ম্মের কাঁটা। ইহ জন্মের সুখ দুঃখ অনেককাল ঠাকুরদের দিয়াছি। * * "

কিন্তু যে রাত্রি দেবেন্দ্র কুন্দের অনুসন্ধানে আসিয়া হীরার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন, সে রাত্রি হীরার সে ধর্ম্মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে রাত্রি 'ক্ষণকালের জন্য হীরার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। সে যে হীরা, এই যে দেবেন্দ্র, তাহা ভুলিয়া গেল। মনে করিতেছিল, ইনি স্বামী আমি পত্নী। মনে করিতেছিল, বিধাতা দুই জনকে পরস্পরের জন্য সৃজন করিয়া, বহুকাল হইতে মিলিত করিয়াছেন, বহুকাল হইতে যেন উভয়ের প্রণয়সুখে উভয়ে সুখী। এই মোহে অভিভূত হীরার মনের কথা মুখে ব্যক্ত হইল। দেবেন্দ্র হীরার মুখে অর্দ্ধব্যক্ত স্বরে শুনিলেন যে, হীরা দেবেন্দ্রকে মনে মনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে।' পরে হীরার চৈতন্য হইল। সে উন্মাদিনীর ন্যায় দেবেন্দ্রকে বলিল, "আপনি শীঘ্র আমার ঘর হইতে যান"। হীরার উন্মাদিতা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া দেবেন্দ্র পরিহাস করিয়া বলিল 'একেই বলে স্ত্রীচরিত্র।' এই পরিহাসে হীরার ক্রোধানল উদ্দীপিত হইল, বলিল "স্ত্রীচরিত্র? স্ত্রীচরিত্র মন্দ নহে। তোমাদিগের ন্যায় পুরুষের চরিত্রই অতি মন্দ, তোমাদের ধর্ম্মজ্ঞান নাই—পরের ভাল মন্দ বোধ নাই—কেবল আপনার সুখ খুঁজিয়া বেড়াও—কেবল কিসে কোন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবে, সেই চেষ্টায় ফের। নহিলে কেন তুমি আমার বাড়ীতে বসিলে? আমার সর্ব্বনাশ করিবে, তোমার কি এ অভিপ্রায় ছিল না? তুমি আমাকে কুলটা ভাবিয়াছিলে, নহিলে কোন্ সাহসে বসিবে? কিন্তু আমি কুলটা নহি। আমরা দুঃখী লোক, গতর খাটাইয়া খাই—কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই—বড় মানুষের বউ হইলে কি হইতাম বলিতে পারি না", পরে মদনশরাসনের ন্যায় দেবেন্দ্রের ভ্রূযুগল বঙ্কিমভাবে হীরার অভিমুখে লক্ষীকৃত হইলে হীরা বিবশা হইয়া কোমলতর স্বরে দেবেন্দ্রকে বলিতে লাগিল, "প্রভো! আমি আপনার রূপ গুণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। কিন্তু আমাকে

কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি আপনাকে দেখিলেই সুখী হই। এজন্য আপনি আমার ঘরে বসিতে চাহিলে বারণ করিতে পারি নাই বলিয়া কি আপনার বসা উচিত হইয়াছে? আপনি মহাপাপিষ্ঠ, এই ছলে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখন আপনি এখান হইতে যান্"।

দেবেন্দ্র ইহাতে আবার উপহাস করিলে হীরা মর্ম্মাহত হইয়া রুষ্ট ও কাতর স্বরে বলিল "আমি আপনার উপহাসের যোগ্য নই—আপনাকে অতি অধম লোকে ভাল বাসিলেও, তাহার ভাল বাসা লইয়া রহস্য করা কর্ত্তব্য নয়। আমি ধার্ম্মিক নহি, ধর্ম্ম বুঝি না—এবং ধর্ম্মে আমার মন নাই। তবে যে আমি কুলটা নই বলিয়া স্পর্দ্ধা করিলাম, তাহার কারণ এই, আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা আছে, আপনার ভাল বাসার লোভে পড়িয়া কলঙ্ক কিনিব না। যদি আপনি আমাকে একটুকুও ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে আমি এ প্রতিজ্ঞা করিতাম না—আমার ধর্ম্ম-জ্ঞান নাই, ধর্ম্মে ভক্তি নাই—আমি আপনার ভালবাসার তুলনায় কলঙ্ককে তৃণজ্ঞান করি। কিন্তু আপনি ভাল বাসেন না—সেখানে কি সুখের বিনিময়ে কলঙ্ক কিনিব? কিসের লোভে আমার স্বাধীনতা ছাড়িব? আপনি যুবতী স্ত্রী হাতে পাইলে কখন ত্যাগ করেন না, এজন্য আমার পূজা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু কাল আমাকে হয়ত ভুলিয়া যাইবেন নয় ত যদি স্মরণ রাখেন, তবে আমার কথা লইয়া দলবলের কাছে উপহাস করিবেন—এমন স্থানে কেন আমি আপনার অধীন হইব? কিন্তু যে দিন আপনি আমাকে ভাল বাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণ সেবা করিব।"

এই দেবেন্দ্রময়তাই হীরার কৃষ্ণ চরিত্রের একমাত্র উজ্জ্বল রেখা। দেবেন্দ্রই হীরার তীর্থধর্ম্ম, দেবেন্দ্রই হীরার নীতি কর্ম্ম। দেবেন্দ্রই হীরার ইহকাল, দেবেন্দ্রই হীরার পরকাল। দেবেন্দ্রই হীরার হৃদয়াকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা। দেবেন্দ্রের জন্যই হীরা কলঙ্কিনী। হীরার হিংসা, হীরার দ্বেষ, হীরার নরদ্রোহিতা সমস্তই দেবেন্দ্রের জন্য। দেবেন্দ্র ভিন্ন হীরার অন্য কোন স্বার্থ ছিল না। দেবেন্দ্র ভিন্ন হীরার জীবনের আর কোন লক্ষ্য ছিল না। হীরা দেবেন্দ্রকে সহস্র দোষের অধিকারী জানিয়াও, তাহার পক্ষপাতিনী। হীরা দেবেন্দ্রকে বিশ্বাসঘাতক লম্পট জানিয়াও, তাহার পক্ষপাতিনী। রমণীর সতীত্বনাশ দেবেন্দ্রের নিত্য ব্রত জানিয়াও হীরা তাহার জন্য উন্মাদিনী। নগেন্দ্রপ্রেমে হতাশ হইয়া সূর্য্যমুখী দেশত্যাগিনী, নগেন্দ্র প্রেমে বঞ্চিত হইয়া কুন্দ প্রাণত্যাগিনী, কিন্তু দেবেন্দ্র প্রেমে হতাশ হইয়া হীরা উন্মাদিনী। প্রণয় প্রতিহত হওয়ায় সূর্য্যমুখী ও কুন্দের হৃদয়ের স্বর্গীয় ভাব সকল পরিস্ফুট হইল, প্রণয় প্রতিহত হওয়ায়

হীরার হৃদয়ের নারকীয় ভাবসকল প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিল। প্রণয়-প্রতিঘাতে হীরা রাক্ষসী, প্রণয়-প্রতিঘাতে সূর্য্যমুখী ও কুন্দ দেবী। প্রত্যাখ্যান করিয়াও নগেন্দ্র—সূর্য্যমুখী ও কুন্দের উপাস্য, প্রণয়ের অবমান করায় দেবেন্দ্র হীরার প্রতিহিংস্য। নগেন্দ্রপ্রেমে বঞ্চিত হইয়াও সূর্য্যমুখী ও কুন্দ নগেন্দ্রের শুভাকাঙ্ক্ষিণী দাসী, দেবেন্দ্রপ্রেমে বঞ্চিত হইয়া হীরা দেবেন্দ্রের অমঙ্গলে উল্লাসিনী প্রতিহিংসা-পরায়ণা রাক্ষসী। এই নরক ও স্বর্গের একত্র সংমিশ্রণে স্বর্গেরই শোভা অধিকতর সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে।

—০০—

উপসংহার।

"বিষবৃক্ষ' একটী রমণীয় উদ্যান। এই উদ্যানে প্রবেশ করিলে নানা-জাতীয় পুষ্পের সৌরভে ভ্রমণকারীর চিত্ত স্বতঃই উন্মাদিত হয়। ইহাতে এত সৌরভ স্বতঃ-প্রসৃত হইতেছে, যে সুগন্ধ আঘ্রাণ করিবার জন্য কাহারও ফুলের মালা বা ফুলের তোড়া কিনিতে অভিরুচি হয় না। তথাপি এত ফুলের সমাবেশ দেখিয়া কোন্ মালাকর মালা না গাঁথিয়া বা তোড়া প্রস্তুত না করিয়া থাকিতে পারে?

এই নন্দনকাননে কোন জঞ্জাল নাই বা পরিপাট্যের কোনও ত্রুটি নাই, আমরা তাহা বলিতে প্রস্তুত নহি। কোন্ কানন সম্পূর্ণ জঞ্জালশূন্য, কোন্ উদ্যান নির্দ্দোষ পারিপাট্যের আধার? আমরা সেই সকল সামান্য দোষ ও সামান্য ত্রুটির উল্লেখ করিয়া আপনাদিগের অসহৃদয়তার পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি না।

সমাপ্ত।

নিশীথ-পাপিয়া।

শারদ নিশি—হাসিছে দিশি,
উগরি জোছনা, বিকাশ মুখে;
অযুত তারা, গগণ ভরা
খসিছে কেহবা, আবেস সুখে।
জ্বলিছে চাঁদ, নিছুনি ছাঁদ,
সুশীত জুড়ানী, স্ফুরিত স্নেহে;
চম্ চম্ চম্, কান্তার নিগম,
তাহার মাঝারে তুমি ও কে হে?
ছাড়িছ তান, ভরিয়া প্রাণ
উছলি হৃদয় আবেগ ছুটে;
ঝমক ঝমি, বিজনে চমি,
সুদূর পবনে সে ধ্বনি টুটে।
আকুলি দিক্, উথলি দিক্,
উঠিছে উঠিছে উঠিছে গান;
চোক্ গেল বা, (নিষাদে সে রা)
ষড়জ হইতে চড়িয়া তান।
প্রবহ পবনে, বিস্তৃত বিজনে,
স্বরগে মরতে তোমারি রব;
জীবিত যেন, নিশীথে হেন,
তুমিই পরাণি তোমাতে সব।

বিজয়ী বেশ শাসিছ দেশ,
প্রভাবে জগৎ আয়ত্তি নিয়ে;
আদেশ রায়, কম্পিত বায়,
প্রতিনাদে দিক্ উঠিছে চিয়ে।
আহা——
ধন্যরে পাখি, কিবা এ দেখি.
কোথা বা তুই লঘু'ত সেই,
কোথা সে কণ্ঠ, ক্ষীণ সে কণ্ঠ,
নিনাদে তারি কি চমক এই ?
লঘু সে কায়, দেখা না যায়,
প্রভাবে সে তার জগৎ টুটে.
ক্ষীণ স্থল ছাড়ি, উঠি তান-কারী
আবহ প্রদেশে স্বেচ্ছায় ছুটে !
আহা ——
যেই কণ্ঠ সে, ক্ষীণ তম সে,
হউক না কেন হউক সে যত,
সংস্থানে হেন, না দিবে কেন,
বিজয়ী তানের মাধুরী এত ?
নাহি সে কেহ, অপর কেহ,
কেবল সে তুই জগৎ আর,
নিশীথি আজি, ঘটকী সাজি,
মিলায়েছে বর তোরে সে তার।
চাইছে দিক্, পুত্তলী দিক্,
জীবন্ত বরণে চিত্রিত যেন,
নিস্পন্দ ভোর, প্রেমেতে তোর,
অবাক্ অবশ দেখি সে হেন।

পাতার পুঞ্জে, হৃদয় কুঞ্জে,
শাখায় শাপটি বাঁধিয়া তোরে,
আবেশ পবনে, শীৎকার স্বনে,
থর থর সীধু তুহিন ঝোরে।
আহা——
কোন কণ্ঠ সে, ক্ষীণতম সে,
হউক না কেন, হউক না যত,
সংস্থানে হেন. না দিবে কেন,
হৃদি ভেদী-তান মাধুরী এত।—
জগতের প্রেম. ভাবনার প্রেম,
মনসিজ যাহা স্বপন বাজী,
প্রত্যক্ষ তাই, দেখিতে পাই,
উথলে স্বরগ তোতে সে আজি।
আহা——
ধন্য রে পাখি, আজি কি দেখি,
তুইই ভাগ্যধর জগতে একা;
দেখিনি যা, দেখালি তা,
অনন্ত প্রেমের মিলন দেখা।
আঃ, রে সাম শান্তি!
কে লঘু তোয়, কে ক্ষুদ্র তোয়.
ক্ষুদ্র লঘু সহ তুই সে একই;
তুই সে শক্তি, লঘু সে শক্তি,
অখণ্ড বিজয়ী আজি এ দেখি।

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মীরা বাই।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মীরা বাইর কার্য্যপরম্পরা, অনির্ব্বচনীয় দেবভক্তি ও অনির্ব্বচনীয় স্বার্থত্যাগের একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মীরা বাই অবলা-হৃদয়ের অধিকারিণী ও অবলাসুলভ কমনীয়তা প্রভৃতি গুণের আস্পদ হইয়াও যেরূপ কঠোর ব্রতধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মনে করিলে হৃদয় ভক্তি ও প্রীতিতে উছলিয়া উঠে। যে সকল কামিনী কুলবধূ নামে পরিচিত, যাহারা ক্লেশের সামান্য একটুকু আঘাত পাইলেই দুগ্ধফেননিভ পর্য্যঙ্কে বাতচুলিত লতার ন্যায় ঢুলিয়া পড়েন, যাহাদের নবনীতনিন্দি দেহ তপনের একটুকু তাপেই উনিয়া পড়ে, যাহাদের নিকট নিদ্রার নাম পরিশ্রম, আলস্যের নাম উৎসাহ, এবং নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকার নাম স্বার্থত্যাগ, তাহাদের সহিত মীরা বাইর অনেক প্রভেদ। মীরা বাই ঈশ্বর-ভক্তি ও ঈশ্বর-প্রেমের নিমিত্ত যেরূপ কঠোর ব্রত প্রতিপালন করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখে তাচ্ছিল্য দেখাইয়া মূর্ত্তিমতী সারস্বতী শক্তির ন্যায়, যেরূপ তদ্গতচিত্তে স্বীয় বরণীয় দেবতার গুণ গান করিয়াছেন, অবলা-প্রকৃতিতে সেরূপ তপস্বি-ধর্ম্ম প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠে সেই ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ভক্তিপরায়ণতার বিষয় কথঞ্চিৎ অনুমিত হইবে।

মীরা বাই মেরতা নামক একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের জনৈক রাঠোর-বংশীয় রাজার কন্যা। মীবারের রাণা কুম্ভের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কুম্ভ ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে মীবারের পৈত্রিক গদিতে আরোহণ করেন। মীরা অনুপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে পড়েন নাই। সাহস, পরাক্রম ও শাসন-দক্ষতায় কুম্ভ মীবারের ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। যে গৌরবসূর্য্য কাগার নদের তীরে অনন্ত-প্রসারিত শোণিতসাগরে নিমগ্নপ্রায় হইয়াছিল, দুরন্ত পাঠানরাহুর পরাক্রমে যাহার প্রচণ্ড কিরণ অন্ধকারে পরিণতি পাইয়াছিল, রাণা কুম্ভের শাসনপ্রভাবে তাহা ধীরে ধীরে সমস্ত মীবার আলোকিত করিয়া তুলে। কুম্ভ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল মীবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তিনি অসামান্য পরাক্রমে ও অসামান্য সদাশয়তায় তৎসমকালীন অনেক রাজাকে অধঃকৃত করিয়াছিলেন। খিলিজি বংশের অভ্যুদয়ে কয়েকটী মুসলমান রাজ্য দিল্লীর অধীনতাশৃঙ্খল উচ্ছেদ করিয়া স্বপ্রধান হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে মালব ও গুজরাটের অধিপতি সমবেত হইয়া কুম্ভের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়েন। ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে মালবের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কুম্ভ এক লক্ষ সৈন্য ও চতুর্দ্দশশত হস্তীর সাহায্যে

তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজধানী চিতোরে প্রত্যাগমন করেন। এই যুদ্ধে মালবের অধিপতি রাণা কুম্ভের বন্দী হয়েন। কুম্ভ পতিত শত্রুর প্রতি অসৌজন্য দেখান নাই। তিনি বীরধর্ম্ম ও বীরপদ্ধতি অনুসারে সমরে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের আশায় অতুল পরাক্রমের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরিশেষে বিজয়ী হইয়া সেই বীরধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই, এবং বীর-পদ্ধতির গৌরবহারী হয়েন নাই। কুম্ভ মালবের অধিপতিকে অনেক অর্থ দিয়া বন্দিত্ব হইতে বিমুক্ত করেন। এই কার্য্যে কুম্ভের একদিকে যেরূপ বীর্য্যবত্তা প্রকাশ পাইতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ সৌজন্য ও সদাশয়তা পরিস্ফুট হইতেছে।

কুম্ভ কেবল রণদক্ষতা দেখাইয়াই নিরস্ত হয়েন নাই। তিনি মিবারে অনেক গুলি জয়স্তম্ভ ও অনেকগুলি গিরি-দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মীবার রক্ষার্থ যে চৌরাশীটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়, তাহার মধ্যে চৌত্রিশটী রাণা কুম্ভ সংগঠিত করেন, কুম্ভ-মির (প্রচলিত নাম কমলমিয়র) রাণা কুম্ভের অসাধারণ কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই দুর্গ শত্রুসমষ্টির অভেদ্য বলিয়া চিরকাল রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। রাণা কুম্ভের গুণ গৌরব কেবল এই সমস্ত কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয় নাই। সুবিদ্বান্ ও সুকবি বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়। কুম্ভ বঙ্গের কবিকুল শিরোমণি জয় দেবের প্রণীত গীতগোবিন্দের একখানি টীকা প্রস্তুত করেন। এই টীকা এক্ষণে সচরাচর পাওয়া যায় না। যাহাহউক, মীরা বাই কিরূপ সৌভাগ্যলক্ষ্মীর ক্রোড়ে সমর্পিত হইয়াছিলেন, আমরা তাহাই পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত এই সুযোদ্ধা, সুরাজ ও সুবিদ্বানের বিষয়ে এতকথা কহিলাম। মীরা বাই পতির এই সৌভাগ্য শ্রীর কতদূর অংশভাগিনী হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই বিবৃত হইতেছে।

ভক্তি হৃদয়ের সঞ্জীবনী শক্তি। যদি ক্ষণকালের তরেও ভক্তির কার্য্য স্থগিত হয়, তাহাহইলে হৃদয় বিশুষ্ক ও বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় নিতান্ত শোভাহীন হইয়া পড়ে। ভক্তি নিয়ত উর্দ্ধগামিনী। গতি ও উত্থান বিষয়ে ইহা কল্পনাকেও অধঃকৃত করিয়া থাকে। যাহার হৃদয় সর্ব্বদা ভক্তিরসে পরিপ্লুত থাকে তিনি মানব হইয়াও দেবলোকের পবিত্রতম সুখ সম্ভোগ করেন এবং মর্ত্ত্য হইয়াও অমর জনভোগ্য পবিত্র সুধার রসাস্বাদ করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোমদ এবং যাহা কিছু প্রীতিপ্রদ, তৎসমুদয়ই এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া নিয়ত তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। ভক্তি কখনও কোন প্রকার পার্থিব পঙ্কে কলুষিত হয় না। ইহা পবিত্রসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় নিয়তই স্বচ্ছ, আবিলতাবর্জ্জিত ও

জীবন তোষিণী। যথার্থ ভক্তিমান ব্যক্তি কখনও নীচতা ও হীনতার কর্দ্দমে নিমগ্ন থাকেন না। তাঁহার হৃদয় বীচি-বিক্ষোভশূন্য স্বচ্ছ সলিলা জাহ্নবীর ন্যায় নির্ম্মল ও কমনীয় থাকে। তিনি ভ্রমর চুম্বিত প্রভাত কমলের মনোহর মাধুরী দেখিয়া যেরূপ পরিতৃপ্ত ও সুখী হয়েন, সেইরূপ অনন্ত জড় জগতের অনন্ত শক্তির বিকাশ দেখিয়াও সুখী ও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। তরঙ্গায়িত সাগরের অট্ট হাস্য, মেঘ পটলের প্রগাঢ় নীলিমা, জলদ জলনিঃসৃত চল সৌদামিনীর অপূর্ব্ব বিকাশ, উত্তুঙ্গ শৃঙ্গশোভী ভূধর মালার গম্ভীর দৃশ্য. দিগ্‌দাহকারী দাবানল এবং প্রলয় ঝঞ্ঝাবায়ু প্রভৃতিতে তাঁহার হৃদয় সেই অনন্ত শক্তির অনন্ত স্রোতের সহিত মিশিয়া যায়। তিনি সংসারী হইয়াও যোগী, মানব হইয়াও দেবলোকবাসী এবং সংসার সমুদ্রের নগণ্য জল বুদ্‌বুদ্ হইয়াও মহীয়সী শক্তির অদ্বিতীয় অবলম্বন। এ নশ্বর জগতে এ জীবলোকের ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিক বিকাশে তাঁহার তুলনা সম্ভবে না।

যথার্থ ভক্তি এইরূপ পবিত্র ও অনবদ্য, যথার্থ ভক্তি মানবের হৃদয় এইরূপ উচ্চতম গ্রামে সমারূঢ়। ভক্তি অনেক বিষয়ের দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে দেবতার দিকে যে ভক্তি প্রধাবিত হয়, মীরা বাই তাহার জন্যই সকলের নিকট শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইতেছেন। দেবভক্তি অপূর্ণকে পরিপূর্ণ ও অসুন্দরকে সৌন্দর্য্যের রেখা পাতে সুশোভিত করে। মনুষ্য এই জড়জগতে ক্ষুদ্রতম জীব। প্রতি মুহূর্ত্তেই ইহার অস্থায়ি শরীরের স্থিরাংশের ধ্বংস হইতেছে। জলবিম্ব যেমন কিয়ৎক্ষণ লীলা করিয়া জলধির অনন্ত বারি রাশির সহিত মিশিয়া যায়, ঊর্ম্মিমালা যেমন গৌরবে কিয়ৎক্ষণ বক্ষস্ফীত করিয়া জলগর্ভে বিলয় পায়, বিদ্যুল্লতা যেমন মুহূর্ত্ত মাত্র প্রভা বিকাশ করিয়া নবজলধর পটলে অন্তর্হিত হয়, নশ্বর মানব ও সেইরূপ এই নশ্বর জগতে কিয়ৎক্ষণ লীলা করিয়া কালের অনন্ত স্রোতে বিলীন হইতেছে। অপূর্ণ অস্থায়ী জীব ভক্তির সাহায্যে সহজেই সেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পরাৎপরে সংযতচিত্ত হইয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান সংসারের অস্থায়িত্ব ও নিজের অস্তিত্বের অস্থায়িত্ব ভাবিয়া মনুষ্য আপনা হইতেই অনন্ত শক্তিমান্ দেবতার শরণ লয়, এবং এই দেবভক্তির বলে সৌন্দর্য্যের উচ্চতম গ্রামে আরোহণ করিয়া পবিত্র আনন্দের রসাস্বাদ করিতে থাকে। কেহ শিখায় না, কেহ বলিয়া দেয় না, তথাপি এই ভক্তি ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইয়া মনুষ্যকে উচ্চতম বরণীয় দেবতার স্বরূপ চিন্তায় নিয়োজিত করে। এইজন্য সাধনা বলবতী হয়, এবং এই জন্যই তপস্যা মহীয়সী হয়। তরঙ্গিণী যেমন সাগরের দিকে অবিরাম-গতি প্রবাহিত হয়; জীবন্ত ভক্তির প্রবলবেগে সাধনা ও তপস্যাও সেইরূপ পর-

মাত্মার দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে। কেহই এই অসীম ভক্তির গতি রোধে সমর্থ হয় না। যিনি শক্তিতে অসীম, দয়ায় অসীম, পরিমাণে অসীম, অসীম ভক্তি-স্রোতঃ যখন তাঁহাকে পাইবার জন্য তাড়িত বেগকেও উপহাস করিয়া ধাবমান হয়, তখন সঙ্কীর্ণশক্তি, সঙ্কীর্ণবুদ্ধিও সঙ্কীর্ণসীমাবদ্ধ সামান্য মনুষ্য কিছুতেই সেই ভক্তিস্রোতঃ আপন ক্ষমতার আয়ত্ত করিতে পারে না। এরূপ স্থলে মানবী শক্তি আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া আইসে এবং কুর্ম্মের ন্যায় আপনাতেই আপনি লুক্কায়িত হইয়া থাকে।

মীরা বাই এই জীবন্ত দেবভক্তির উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রকার পার্থিব ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিধাতা যদিও তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার গুণসম্পন্ন ও সর্ব্বপ্রকার ধনসম্পত্তির অধিপতি পতি দিয়াছিলেন, তথাপি মীরার ভাগ্যে রাজ্যের ভোগসুখ ঘটিয়া উঠে নাই। মীরা নিতান্ত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা ছিলেন। তিনি স্বামিগৃহে যাইয়া পরম বৈষ্ণবী হইয়া উঠিলেন, এবং আত্মসংযত ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া রণছোড় নামক আরাধ্য কৃষ্ণমূর্ত্তির আরাধনায় রত হইলেন। কিন্তু এদিকে তাঁহার স্বামির অন্যান্য পরিবারবর্গ প্রগাঢ় শক্তিউপাসক ছিলেন। এতন্নিবন্ধন স্বামিগৃহে গমনের অব্যবহিত পরেই মীরার সহিত তাঁহার শ্বশ্রূর ধর্ম্মবিষয়ে উৎকট বিবাদ আরম্ভ হইল। মীরার শ্বশ্রূ মীরাকে বিষ্ণুউপাসনায় বিরত ও শক্তি উপাসনায় প্রবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হইল না। মীরা যে ভক্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, রাজমাতা সে স্রোত নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। এই জন্য রাজমাতা মীরাকে গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিলেন *। মীরা গৃহ-বহিষ্কৃত হইলেন বটে, কিন্তু ভক্তি হইতে স্খলিত হইলেন না। তিনি যে ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, প্রগাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে তাহা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বোধ হয় রাণা কুম্ভ মীরার আবাসের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান ও ভরণ পোষণের নিমিত্ত কিছু অর্থও নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া-

* শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্তজের উপাসক সম্প্রদায়ে লিখিত আছে, রাণা মীরাকে গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করেন। কিন্তু এদিকে কর্ণেল টড লিখিয়াছেন, রাণা কুম্ভ গীতগোবিন্দের একখানি টীকা প্রস্তুত করেন। কলিকাতা রিবিউর লেখকের মতেও গীতগোবিন্দ রাণার প্রিয়তম গ্রন্থ ছিল। রাধা কৃষ্ণের প্রতি কিছু শ্রদ্ধা না থাকিলে গীতগোবিন্দের প্রতি এতদূর আস্থা হওয়া সম্ভাবিত নয়। অনুমান হয়, মীরার শ্বশ্রূই ধর্ম্মবিবাদনিবন্ধন মীরাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। অধ্যাপক উইলসনও উল্লেখ করিয়াছেন রাজমাতার সহিত বিবাদ হওয়াতে মীরা রাণার অন্তঃপুর হইতে তাড়িত হয়েন।

ছিলেন। যাহা হউক, মীরা স্বামী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া রণছোড়ের আরাধনায় রত হইলেন। অনেক নিরাশ্রয় বৈরাগী তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। মীরা এইরূপে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়ভূমি হইয়া দয়াধর্ম্মপরায়ণা তপস্বিনীর ন্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি মথুরা ও দ্বারকা তীর্থে গমন করেন। কথিত আছে মীরা যৎকালে দ্বারকায় ছিলেন, তৎকালে রাণা স্বীয় অধিকারস্থ বৈষ্ণবদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। কয়েকজন ব্রাহ্মণ এই অবসরে মীরাকে আনয়ন করিবার জন্য দ্বারকায় প্রেরিত হয়। মীরা দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আপনার আরাধ্য দেবের নিকট বিদায় হইবার নিমিত্ত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন। উপাসনা সমাপ্ত হইলে কৃষ্ণমূর্ত্তি দ্বিধা বিভক্ত হইল, এবং মীরা তাহাতে প্রবেশ করিবামাত্র উহা পূর্ব্ববৎ অবিভক্ত হইয়া গেল। এই অবধি মীরা বাই চিরকালের মত ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অদ্যাপি মীবারে রণছোড় নামক কৃষ্ণমূর্ত্তির সহিত মীরা বাইর পূজা হইয়া থাকে। কিম্বদন্তী এরূপ নির্দ্দেশ করে যে, এই পূজা রণছোড়ের অভ্যন্তরে মীরা বাইর অন্তর্দ্ধানের স্মরণসূচক ব্যতীত আর কিছুই নহে। কথিত আছে, মীরা বাই স্বীয় ইষ্ট দেবতার নিকট এই শেষ বিদায় প্রার্থনার নিমিত্ত নিম্ন লিখিত ভাবে দুটী পদ রচনা করেন :—

১ পদ। "রাজন্, রণছোড়! দ্বারকায় আমায় স্থান দাও, এবং তোমার শঙ্খ চক্র, গদা, পদ্ম দ্বারা যমভয় নিবারণ কর। তোমার পবিত্র মন্দিরে নিত্য শান্তি বিরাজ করিতেছে, এবং তোমার শঙ্খ ও করতালধ্বনিতে পরম আনন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি আপনার রাজ্য, সম্পত্তি, পতি প্রেম সমুদয়ই বিসর্জ্জন দিয়াছি। তোমার দাসী মীরা তোমার শরণার্থিনী হইয়া আসিয়াছে তুমি তাহাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ কর।"

২ পদ। "তুমি যদি আমায় নির্দ্দোষ জানিয়া থাক, তবে গ্রহণ কর। তোমা-বিনা আমায় দয়া করে এমন আর কেহ নাই। আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষুধা, ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা, ও অস্থিরতায় যেন আমার শরীর ভগ্ন না হয়। হে মীরা-পতি! হে প্রিয় গিরিধর! মীরাকে গ্রহণ কর। তোমার সহিত যেন আর কখনও আমার বিয়োগ না হয়।"

(উপাসক সম্প্রদায় হইতে উদ্ধৃত।

এই পর্য্যন্ত মীরা বাইর পরিচয়। অভাগা দেশের দোষেই হউক, অথবা কোন বিপ্লব-ঘটনাতেই হউক, মীরা বাইর কোন ধারাবাহিক জীবনচরিত বর্ত্তমান নাই। এক্ষণে মীরার সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত ঘটনাই উপকথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। মীরা পরম সুন্দরী—ছিলেন সৌন্দর্য্য গরিমায় তৎকালে প্রায় কেহই তাঁহার তুলনীয়া ছিল না। কিন্তু তাঁহার

দেহের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা হৃদয়ের সৌন্দর্য্য অধিক ছিল। তাঁহার যতটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ঈশ্বরভক্তি ঈশ্বরপ্রেম ও স্বার্থত্যাগের জাজ্বল্যমান চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। মীরা দেবভক্তির নিমিত্ত অতুল রাজত্বসুখ ও অতুল ভোগবিলাস পা দিয়া ঠেলিয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহার কিছুমাত্র মনঃক্ষোভ উপস্থিত হয় নাই। প্রগাঢ় সাধনা ও প্রগাঢ় তপস্যায় তাঁহার হৃদয়ে অনুক্ষণ পবিত্র আনন্দের তরঙ্গ ক্রীড়া করিত। মীরা বাইর অন্তর্দ্ধানঘটনা যদিও নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক ও অবিশ্বাসযোগ্য, তথাপি উহা তাঁহার উৎকট সাধনার পরিচয় দিতেছে। বস্তুতঃ মীরা বাই যে আপনার সাধনায় অনেকাংশে সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সাধনা ও তপস্যার জন্যই তিনি আজ পর্য্যন্ত অনেকের নিকট দেবীভাবে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

মীরা বাই সুকবি ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ভক্তির প্রবাহে উচ্ছ্বলিত হয়, কবিতার মোহিনী মাধুরী সহজেই তাঁহার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া থাকে, পবিত্র ভক্তির মহিমায় মীরার কবিতাও হিমাচল-নিঃসৃতা পবিত্রসলিলা জাহ্নবীর ন্যায় অবিরল ধারায় নির্গত হইত। মীরা বাইর রচিত পদাবলি অনেকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। নানকপন্থী ও কবিরপন্থী প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপাসনাপদ্ধতি মধ্যে তাঁহার অনেক গীত পাওয়া যায়। রচনানৈপুণ্য ব্যতীত মীরা বাইর সংগীত শাস্ত্রেও অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। কথিত আছে, সুপ্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট্ আকবরসাহ মীরা বাইর অসামান্য সংগীত শক্তির বিবরণ শুনিয়া প্রসিদ্ধ সংগীতবিৎ তানসেনকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট গমন করেন, এবং তদীয় কোমলকণ্ঠবিনিঃসৃত সুমধুর গীতাবলি শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন। ভক্তমালগ্রন্থে লিখিত আছে মীরা বাই আকবর সাহের সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন। এই নির্দ্দেশ সমীচীন বোধ হয় না।

মীরা বাইর নামে একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা মীরা বাই এবং তাঁহার ইষ্টদেব রণছোড়কে বিশিষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। মীরা বাই সম্প্রদায়কে বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের একটী শাখা বলিলেও বলা যায়।

মীরা বাইর কৃত অনেক গুলি পদ আছে। আমরা এই স্থলে একটী উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে তাঁহার প্রগাঢ় ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

" মেরে গিরিধর গোপাল দূসরো ন কোঈ।
যাকে শির মোর মুকুট মেরে পতি সেঈ ॥
কৌস্তুভ মণি কণ্ঠপরিকউরসি দেখ জোঈ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমাল সোঈ ॥
মৈতো আই ভক্তি জানি যুক্তি দেখি মোঈ।
আঁসুআন জল সীচি সীচি প্রেম বীজ রোঈ ॥

সাধুন্ সঙ্গ বৈঠি বৈঠি লোক লাজ খোঈ ॥
অবতো বাত ফযল গয়ী জানে সব কোঈ।
প্রেমকী মথানী মথি যুক্তি সে বিলোঈ।
মাখন ঘৃত কাড়ি নেত ছাঁছ্ পিয়ে কোঈ ॥
রাজন ঘর জন্ম নেত সবে বাত হোঈ।
মীরা প্রভু লগত লগী হোনি হো সো হোঈ ॥"

"গিরিধর গোপালই আমার; দ্বিতীয় কেহ নাই। যাঁহার মস্তকে ময়ূরমুকুট তিনিই আমার পতি। তাঁহার গলায় কৌস্তভ মণি ও বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদ চিহ্ন দেখা যায়। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ও কণ্ঠমালায় সুশোভিত। আমি তো ভক্তি জানিয়া আসিয়াছি। যুক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। অশ্রুজল সেচন করিয়া প্রেমবীজ বপন করিয়াছি; সাধুগণের সহিত উপবেশন করিয়া লোক লজ্জা ক্ষয় করিয়াছি। এখন তো কথা প্রচার হইয়াছে, সকল লোকেই জানে। প্রেমরূপ মন্থনদণ্ড দ্বারা যুক্তিপূর্ব্বক মন্থন করিয়া আমি মখিন ঘৃত বাহির করিয়া লইয়াছি, যে হয় ঘোর খাক্। রাজগৃহে জন্ম গ্রহণ করিলে সকল সুখ সম্ভোগই হইতে পাবে। কিন্তু প্রভুর প্রতি মীরার প্রেমানুরাগ হইয়াছে; ইহাতে যা হবার তা হউক।"

উপাসক সম্প্রদায় হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীরঃ

আমাদের আর কি আছে!

ভারতের স্বতবাক্শক্তি সম্বাদ-পত্র-সম্পাদকগণ প্রস্তাব শীর্ষে "আমাদের আর কি আছে" দেখিয়া মনে মনে বলিবেন, "আমাদের আর কি আছে;" রাজকার্য্যাদির স্বাধীন সমালোচনা-রূপ যে অস্ত্র লইয়া ভারতের হিতব্রত সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। ভাঙ্গিয়া যাইবে কে মনে করিয়াছিল; ভারতের উন্নতিস্রোত এরূপে প্রতিহত হইবে কে জানিয়াছিল; ভারত-বক্ষে অকস্মাৎ এ বজ্রপাত হইবে কে জানিত? শাসন-প্রণালীর দোষগুণ প্রদর্শন এবং উচ্চভাবে উত্তেজিত করিয়া নিস্তেজ ভারতবাসিকে মনুষ্যত্বে উন্নয়নের স্বাধীনতাই আমাদের সর্ব্বস্ব। প্রভূত-বলশালী রাজা দুর্ব্বলের এই সর্ব্বস্বাপহরণ করা মহত্ত্ববিহীনতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর সাম্যবাদী উচ্চমনোভিমানী ইংরেজ বুঝিলেন না, দুঃখীর ক্রন্দনের, উৎপীড়িতের আর্ত্তনাদের, অধঃপতিতের উন্নতি-চেষ্টার স্বাধীনতা মানুষের প্রাকৃতিক স্বত্ব; বুঝিলেন না ক্ষমতার অযথাব্যবহারে দুঃখিনী ভারতের আজ কি সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইল; বুঝিলেন না স্বহস্তরোপিত বৃক্ষের জীবনবারির উৎস এক ফুৎকারে

শুষ্ক করিয়া দিয়া কি অনন্ত অপযশ কিনিলেন—অধঃপতিত ভারতসন্তানকে পূর্ব্ব গৌরবে উঠাইতে গিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপিত করিতেছিলেন পলকের মধ্যে তাহা কিরূপে বিনষ্ট করিলেন। স্বকর্ত্তব্য-সম্পাদন জন্য যে শক্তি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহা হারাইলাম। আমাদের আর কি আছে; আমরা কি লইয়া জীবন ধারণ করিব? ——ভারতের করপীড়িত দরিদ্র প্রজা-সমূহের হৃদয় নিষ্পিষ্ট করিয়া এই বাক্য প্রতি-হৃদয়ের দুঃখনিঃশ্বাসে প্রতিধ্বনিত হইবে। প্রতি হৃদয় কাঁদিয়া উঠিবে, প্রতিহৃদয় বলিয়া উঠিবে, নির্জ্জনে যাহা বলিয়া কতবার ক্রন্দন করিয়াছি, কে আজ স্পষ্ট করিয়া সেই কথা বলিতে বসিল; এ চিরদুঃখীর মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত কোন্ ব্যক্তি আজ সকলের নিকট বলিতে উপস্থিত, 'ভারতের প্রজার অনন্ত দুঃখ, ভারতের প্রজার স্বোপার্জ্জিত অর্থ পর-সুখ-বর্দ্ধনেই নিঃশেষিত। ভারতের প্রজা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে তাহা মহাজনের তহবিল-পূরণে এবং জমিদারের উদর পোষণেই ব্যয়িত। তাহার আর কি আছে? দিন দিন তাহার উপর নূতন কর স্থাপিত করিয়া কেন তাহার মর্ম্মবেদনা বৃদ্ধি কর? কেন তাহাকে উদরান্নে বঞ্চিত কর?' শীতের শিশিরে, বর্ষার কর্দ্দমে শরীরশোণিত জল করিয়া মস্তক-স্বেদ পায়ে ফেলিয়া যে সামান্য উপার্জ্জন করিয়া থাকি তাহা হইতে আবার প্রতি বৎসর কিছু কিছু পথকর না দিলে হইবে না; বৃষ্টি হইলে সিক্ত শয্যায় শয়ন করা আমার জন্মে ঘুচিল না. আমাকেই আবার পূর্ত্তকার্য্যের ব্যয়ভারের অংশ গ্রহণ করিতে হইবে যাহার গৃহে নিত্য দুর্ভিক্ষ বিরাজমান, তাহাকেই আবার ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণ এবং গত দুর্ভিক্ষের ব্যয়-সঙ্কুলান করিবার জন্য রাজকোষের অর্থ বৃদ্ধি করিতে হইবে; স্ত্রীপুত্রদিগকে যে অর্দ্ধাহার দিয়া জীবিত রাখিতেছি, সেই অর্দ্ধাহার হইতেও আবার কিঞ্চিৎ কমাইতে হইবে। ইহার উপর আবার নিত্য-ভক্ষক দুর্ব্বলপীড়ক জমিদার রক্ত শোষণ করিতেই আছেন। বিধাতঃ; সুখীর সুখবর্দ্ধন জন্যই কি তুমি অসুখীকে সৃষ্টি করিয়াছিলে? ধনীর ধনকোষ পূর্ণ করিবার জন্যই কি নির্ধনীর জন্ম হইয়াছিল? বলশালীর বলপ্রয়োগ জন্যই কি দুর্ব্বল-সৃষ্টির প্রয়োজন বুঝিয়াছিলে?"——

ক্ষীণবুদ্ধিবৃত্তি বীতভোগস্পৃহ গতকার্য্য-শক্তি ভারতবৃদ্ধগণ ভাবিবেন, তাঁহাদের সমদুঃখী কোন ব্যক্তি আজ আর্য্যদর্শনে তাঁহাদেরই দুঃখের কথা বলিতে উপস্থিত। মনে মনে বলিবেন, "আমাদের আর কি আছে?' যৌবনের বুদ্ধি নাই, যৌবনের স্পৃহা নাই, যৌবনের শক্তি নাই; আর সেরূপ সুখের আকাঙ্ক্ষা, যশের লিপ্সা কর্ত্তব্যের জ্ঞান অন্তরকে উৎসাহিত করে না, কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মায় না। যৌবনে যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, তাহার আদর যৌবনেই ছিল; এখন আর তাহার

সেরূপ আদর নাই, তাহার সেরূপ কার্য্যকারিতাও নাই, বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতাও তিরোহিত হইয়াছে। যৌবনে যেরূপ উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ সুখানুভব করিয়াছি, কার্য্যে সেরূপ উৎসাহ আর হয় না, সেরূপ সুখ আর অনুভব করিতে পারি না। যৌবনে কত কি আশা করিয়াছিলাম, কত কি করিব ভাবিয়াছিলাম। যাহা করিব সংকল্প করিয়াছিলাম, তাহা করিবার সুযোগ হইল না; যাহা হইবে আশা করিয়াছিলাম তাহা দেখিতে পাইলাম না। কার্য্যের আর শক্তি নাই; আশার সফলতা সম্বন্ধে আর বিশ্বাস নাই। দুঃখেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, দুঃখেই জীবন শেষ হইল। আশা পূর্ণ হইল না বলিয়া, আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম না বলিয়া, চিরকাল আত্মসত্বে বঞ্চিত থাকিলাম বলিয়া, যে অনলে আজন্ম জ্বলিতেছি, এখনও সেই অনলে মন প্রাণ বিদগ্ধ হইতেছে;—পুড়িতেছি কিন্তু ক্লেশের মাত্রা পূর্ণ এখনও হয় নাই বলিয়াই বুঝি মরিতেছি না। এই অসীম দুঃখের জীবনে স্ত্রীপুত্রাদির মুখদর্শনে যে কিছু শান্তি পাইতাম, যমযন্ত্রণায় তাহাতেও বঞ্চিত হইয়াছি। অচিরাৎ ভারতের ধ্বংস সংসাধিত হইবার জন্যই বুঝি দুর্ভিক্ষ-জ্বর-রোগে এবং ওলাউঠায় ভারত নিরবচ্ছিন্ন প্রপীড়িত হইতেছে। যাহারা দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে রক্ষা পাইতেছে, তাহারা আবার বিষম জ্বর-রোগের আক্রমণ ওলাউঠায় বধ্য হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে।"——বস্তুতঃ আর্য্যদর্শন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের দুঃখের কথা লইয়া আজ সাধারণ-সমক্ষে উপস্থিত নহে। এই বিস্তীর্ণ ভারত-মহাশ্মশানে আত্মসত্ববোধসম্পন্ন স্বজাতি-গৌরব-জ্ঞানসমন্বিত প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের হৃদয় যে অনলে পরিদগ্ধ হইতেছে, যে দুঃখে প্রত্যেক হিন্দুসুতের হৃদয়-দেহ জর্জ্জরিত করিতেছে; আমরা আজ আবার সেই অনলের জ্বালা হৃদয়ে ধরিয়া, সেই দুঃখের অশ্রু চক্ষে করিয়া, ভারতবাসীর নিকট দণ্ডায়মান। আজ আবার আর্য্যসন্তানের নিকট সেই অপার অনন্ত দুঃখের কান্না কাঁদিতে প্রবৃত্ত। জানি না কাঁদিয়া লাভ কি, জানি না কাঁদিয়া কোন ফল হইবে কি না, জানি না কত দিনে ভারতবাসী ভারতহৃদয়ের এ অনল নিবাইতে চেষ্টা করিবে। হৃদয়-বেগ সম্বরণ করিতে পারি না, তাই কাঁদিতে বসিয়াছি, মায়াবিনী আশার কুহকে না ভুলিয়া থাকিতে পারি না, তাই তাঁহার মৃদু নিনাদের অনুগামী হইতেছি। ভারতবাসীর এ অনন্ত দুঃখের জীবনে আশা-প্রদীপ যে দিন নির্ব্বাপিত হইবে, জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত করা সেই দিন আর মহাপাপ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিব না।

ভারত-গৌরব আর্য্যজাতির কি ছিল না? বল বল, বীর্য্য বল, সাহস বল,—বীরোচিত এ সকল গুণের কোন্ গুণে আর্য্যজাতির অপকর্ষ বিদিত? একদা

বল, স্বজাতিপ্রেম বল, স্বদেশানুরাগ বল;—কোন্ সময়ে কোন্ দেশে হিন্দু-জাতি অপেক্ষা এ সকলের উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হইয়াছে? জ্ঞান বল, ধর্ম্ম বল, নীতি বল,—পৃথিবীর কোন্ জাতি এ সকলে পূর্ব্বতন আর্য্যগণকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে? সাহিত্য বল, দর্শন বল, অঙ্কশাস্ত্র বল;—ইহার কোন্‌টিতে হিন্দুজাতি অন্যজাতি হইতে ন্যূন ছিল? সভ্যতা বল; রাজনীতি বল, সমাজতত্ত্ব বল;—এ সকলের অনেক বিষয়েই কি পূর্ব্বকালীন আর্য্যগণ, এখনও পৃথিবীর উপদেশ-স্থল নহেন? কোন্ বিষয়ে আর্য্যজাতির গৌরব ছিল না? কোন্ গুণে আর্য্যগণ জগতে পূজিত না হইয়াছিলেন?

কতিপয়মাত্র আর্য্যসন্তান আসিয়া প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশে অবস্থান করেন। এই অল্পসংখ্যক আর্য্যসুত ভারতক্ষেত্রে ক্রমে কি কীর্ত্তি স্থাপিত না করিয়াছিলেন? কোন্ সুখের অধিকারী না হইয়াছিলেন? তৎকালীন আর্য্যদিগের শৌর্য্য, অধ্যবসায়, একতা, স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি গুণের আলোচনা করিলে, বিস্ময়ে পূর্ণ হইতে হয়। অসাধারণ সাহস, আশ্চর্য্য একতাবন্ধন, অনুপম বীরত্ব ছিল বলিয়াই, কতিপয় মাত্র আর্য্য অসুর-রাক্ষসাধিষ্ঠিত এই ভারতভূমে একাধিপত্য স্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন; সসাগরা ভারতভূমির একেশ্বর হইতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী সেই আর্য্য-জাতির সন্তানগণের আজ কি হীনাবস্থা! কি কলঙ্কিত জীবন! আর্য্যসন্তান আজ বল-বীর্য্য-বিহীন ভীরুস্বভাবসম্পন্ন বলিয়া জগতে ঘৃণিত। ভারত-সন্তান আজ তেজোহীনতার প্রতিমূর্ত্তি, একতাবিহীনতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। আর্য্য বীরগণ! এক সময়ে তোমরা বীরদর্পে পদভরে পৃথিবীকে বিকম্পিত করিয়াছিলে; আজ তোমাদের সন্ততিগণ পরপদতলে দলিত, মনুষ্যত্ব-বিহীন কাপুরুষ বলিয়া পৃথিবীসমীপে ঘৃণিত। আজ তোমাদের কুসন্তানগণ পৃথিবীস্থ সকলেরই নিন্দাবাদে তিরস্কৃত, সকলেরই পদাঘাতে অবনত। বীরোচিত সদ্গুণে ইংরেজজাতি ভুবনবিখ্যাত, স্বজাতিপ্রেমে ইংলণ্ডবাসীর ন্যায় পৃথিবীতে আজ দ্বিতীয় নাই। আজ তিনশত বৎসর হইতে চলিল, ভারতবাসী এই ইংরেজের সহবাসে রহিয়াছে, আজ কিঞ্চিদূন তিন-শত বৎসর ধরিয়া, ইংরেজ হিন্দুসন্তানের শিক্ষক স্বরূপ ভারতে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু হিন্দুসন্তান ইংরেজের সাহসের, ইংরেজের বীরত্বের, ইংরেজের একতার, ইংরেজের স্বজাতিপ্রেমের কণামাত্রও শিখিতে পারিল না। দুস্তর সাগরপার হইতে এই একতার, এই জাতীয় সৌহার্দ্দের অনুকরণ-আদর্শ ভারতবাসীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত, তথাপি ভারতবাসী নিশ্চিন্ত নিরুদ্যম। ভারত-সন্তান! সম্মুখে এরূপ উজ্জ্বল আদর্শ পাইয়াও যদি স্বজাতি-সমাজ না শিখিলে, একতাবন্ধনের উপকারিতা না বুঝিলে, তবে এখনও

জীবিত রহিয়াছ কেন? আর্য্যনামের কলঙ্ক বৃদ্ধি করিতেছ কেন? ঘৃণিত জীবন হইতে মরণ কি সহস্রগুণে আদরণীয় নহে?

জ্ঞান-ধর্ম্মনীতির জন্য পূর্ব্বকালীন আর্য্যগণ এখনও জগতীতলে পূজিত; এখনও তাঁহাদের জ্ঞান-ধর্ম্মনীতি পৃথিবীর পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট অতি আদরের সামগ্রী। আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞানের অনন্ত উৎস; আর্য্য ধর্ম্মের বিস্তীর্ণতার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য; আর্য্য-নীতির গূঢ় তাৎপর্য্য যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি সবিস্ময়ে আর্য্যবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। আর্য্যসন্তান জ্ঞান-ধর্ম্মনীতি-বিষয়ে যদিও পূর্ব্বগৌরব একেবারে হারাইয়াছেন, তথাপি আর্য্যগৌরব যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের নিকট তিনি ঘৃণার পাত্র নহেন। পূর্ব্বপুরুষের যে গৌরবের জন্য হিন্দুসন্তান আদরের অযোগ্য হইয়াও পরকর্ত্তৃক আদৃত, হিন্দুসন্তান নিজে সেই গৌরবের আদর করিতে শিখিলেন না, যে গৌরব হারাইয়াছেন তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য যত্নবান্ হইলেন না।

দেবভাষা হিন্দুজাতির মাতৃভাষা। আজ হিন্দুসন্তান সেই দেবভাষার পরিশীলনে বিরত। সংস্কৃত যাহার মাতৃভাষা আজ তাহার নিকট সংস্কৃতের আদর নাই, আজ সংস্কৃতের আদর ভিন্ন দেশে। সংস্কৃত এখন আর হিন্দুর ভাষা নহে, সংস্কৃত এখন জর্ম্মাণের ভাষা। জর্ম্মাণজাতি আজ "শর্ম্মণ" "শর্ম্মণ" এর অপভ্রংশ বলিয়া আর্য্যনামে পরিচিত হইতে প্রয়াসী; ভারতীয় হিন্দুগণ প্রকৃত আর্য্যসন্তান নহে —ইহাই প্রমাণ করিতে অগ্রসর। সংস্কৃত সাহিত্য সম্পূর্ণ পরিরক্ষিত হয় নাই। যবন-হস্তে ইহার অনেকাংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি কোন্ জাতীয় সাহিত্যের তুলনায় সংস্কৃত সাহিত্য নিকৃষ্ট? গ্রীকের হোমার, রোমানের ড্যান্টি, ইংরেজের মিলটন যে সকল মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, ব্যাসের ভারত, বাল্মীকির রামায়ণ, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মহাকাব্য। যে সেক্ষপিয়র ইংরেজি সাহিত্যের গৌরবস্থল, যে গেটি জর্ম্মাণ কাব্যের চরম শোভার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, ভারতের কালিদাস সে সেক্ষপিয়র সে গেটি অপেক্ষা ন্যূন নহেন। সংস্কৃত দর্শনের ন্যায় ব্যাপক দর্শনশাস্ত্র আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইউরোপীয় আধুনিক দার্শনিকগণ যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া যশের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতেছেন, সংস্কৃত দর্শন অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় সেই সকল তত্ত্ব কত শত বৎসর হইতে কোন না কোন আকারে আবিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। গণিত-শাস্ত্রে আর্য্যজাতি সর্ব্বাগ্রগণ্য। আর্য্যজাতিই গণিতের প্রথম স্রষ্টা, আর্য্যজাতি হইতেই পৃথিবীর গণিত শিক্ষা। ইউরোপে যে জ্যোতিষের এত উন্নতি হইয়াছে, তথাপি শত শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন ঋষিগণ জ্যোতির্বিদ্যায় যেরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে তাহা দেখিয়া নিস্তব্ধ

হইতে হয়। আর্য্যগণ যে সকল জ্যোতিষিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বহুচিন্তায় উদ্ভাবিত, বহু যত্নে সুনির্ম্মিত যন্ত্রনিচয়ের ব্যবহারে এখন কেবল সেই সকল তত্ত্বের পুনরাবিষ্কার হইতেছে মাত্র। সূর্য্য কেন্দ্র, এই কেন্দ্র পরিবেষ্টন করিয়া গ্রহগণ স্ব স্ব গতিপথে অনবরত ভ্রমণ করিতেছে; পৃথিবী গোলপিণ্ড এবং শূন্যে অবস্থিত; পৃথিবী চতুর্দ্দিকেই আকাশ-বেষ্টিত, সুতরাং পৃথিবীর পড়িবার স্থান নাই; পৃথিবীর আকর্ষন-শক্তি আছে বলিয়াই শূন্যে নিক্ষিপ্ত বস্তু ভূতলে পতিত হয়,—এ সকল নূতন কথা নহে; এ সকল সত্যের প্রথম আবিষ্কার ইউরোপে হয় নাই। হিন্দুপণ্ডিতদিগের নিকট এ সকল সত্য অবিদিত ছিল না; এ সকলই তাঁহারা জানিতেন। এ সকল বিদ্যা বুদ্ধিত আমাদের নাইই, আমাদের শ্লাঘা করিবার যে এই সকল গৌরবের কথা রহিয়াছে তাহাও আমরা জ্ঞাত নহি।

স্বার্থত্যাগ এবং পরহিতব্রতে জনসাধারণের সুখবৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা যদি সভ্যতার উচ্চতম লক্ষণ হয়, তাহা হইলে হিন্দুজাতির ন্যায় সভ্যজাতি এখনও পৃথিবীতলে জন্ম গ্রহণ করে নাই। প্রাচীন আর্য্যগণ স্বার্থত্যাগ যতদূর করিতে শিখিয়াছিলেন, যতদূর করিতে পারিতেন, আধুনিক সমাজনিচয়ের কুত্রাপি সেরূপ স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় না। পরহিতের জন্যই জীবন ধারণ, যে আর্য্যগণ বিশ্বাস করিতেন; জীব মাত্রেই দয়াপ্রকাশ, যে আর্য্যগণ কর্ত্তব্য বলিয়া মানিতেন; সেই আর্য্যগণ যে মানব প্রকৃতির পশুভাবকে সম্পূর্ণ পরাজয় করিয়াছিলেন, দেব ভাব যে তাঁহাদের অনেক দূর অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক মিল্ মানবোন্নতির যে কল্পিত চরমের জন্য শেলিকে সর্ব্বোচ্চ কবি বলিয়া গিয়াছেন, হিন্দু সন্তানের যে এত দূর অধঃপতন হইয়াছে তথাপি হিন্দু-হৃদয় হইতে সেই কল্পিত চরমের (Beau ideal) এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। এখনও হিন্দু মতে জীব মাত্রেই দয়া প্রকাশ, মনুষ্য মাত্রেই ভ্রাতৃভাব, ধার্ম্মিকতার পরাকাষ্ঠা। সেই হিন্দুজাতি আজ অসভ্য বলিয়া পরিচিত, সভ্যতা জানেন না বলিয়া, সেই হিন্দু সন্তানের আজ সভ্য সমাজে মিশিবার অধিকার নাই। প্রাচ্য নৃপতিগণ প্রজাপীড়ক এবং যথেচ্ছাচারী বলিয়া অসভ্য; রুষরাজ রাজ্য-শাসন-বিষয়ে স্বেচ্ছা মত কার্য্য করিতে পারেন বলিয়া, রুষগণ এখনও সভ্যনামের সম্পূর্ণ যোগ্য নহে; ব্রিটিশ রাজ্য এবং আমেরিকার সম্মিলিত প্রদেশ-সমূহ প্রজাসাধারণের মত গ্রহণে শাসিত হয় বলিয়া, এই দুই রাজ্যের অধিবাসিগণ সভ্যতার উচ্চ পদে অবস্থিত; রাজতন্ত্র সমাজের সুখবর্দ্ধনের, সকলের প্রতি সমান ন্যায় ব্যবহারের, অন্তরায় বলিয়া, ফরাসিগণ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া প্রজাতন্ত্র সংস্থাপনে

প্রবৃত্ত; অন্যান্য সভ্য দেশের ভূপতিগণ. স্বাধীন ভাবে চলিলে, স্বেচ্ছাচারী-সহিষ্ণু প্রজাগণ কর্ত্তৃক পাছে পদচ্যুত হয়েন এই ভাবিয়া ভয়ে বিব্রত। পুরাতন ভারত রাজতন্ত্রে শাসিত হইত বটে, কিন্তু সে রাজতন্ত্রে এরূপ অসুখ-চিন্তার কারণ কিছুই ছিল না। হিন্দু-রাজতন্ত্র উচ্চ প্রণালীতে গঠিত হইয়াছিল। হিন্দুরাজাগণ প্রজার সুখ-চিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকিতেন, প্রজার সুখবর্দ্ধনের চেষ্টাই একমাত্র কর্ত্তব্য কায বলিয়া মনে করিতেন। হিন্দু নৃপতিগণ দেবতার ন্যায় প্রজা শাসন করিতেন, তাই প্রজাগণ তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। প্রজাপীড়ন কাহাকে বলে হিন্দু রাজাগণ জানিতেন না, রাজার প্রতি অভক্তিও হিন্দু প্রজাগণের মনে স্থান পাইত না। সমাজ-তত্ত্বের অজ্ঞতা জন্যও হিন্দু-সমাজ সামাজিক সুখে বঞ্চিত ছিল না।

সকল বিষয়েই, হিন্দুজাতির গৌরব ছিল, এখন কোন বিষয়েই নাই। কুরুক্ষেত্র যে জাতির রণভূমি, কর্ণার্জ্জুন যে জাতির বীর-পুরুষ, সেই জাতি আজ গৃহপ্রাঙ্গনের বহির্গমনেও ভীত; সেই জাতি আজ পীপিলিকা দংশনেও অস্থির, শত্রু-পদতলে দলিত হইলেও নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ। যে জাতির বিজয়পতাকা একদিন সুদূর আমেরিকা দেশেও উড্ডীন হইয়াছিল, সেই জাতির [illegible] আজ [illegible] তাহার ইচ্ছা সেই বিজয়-পতাকা উড়াইতেছে, তাহাতে কাহারও বেদনা বোধ নাই, আপত্তি নাই, প্রতিরোধের ইচ্ছা নাই। যে জাতি একদিন বীরদর্পে সমস্ত পৃথিবীকে বিকম্পিত করিয়াছিল, সেই জাতি আজ এক জন বীর পুরুষ দেখিলে ভয়ে বিকলচিত্ত। যে জাতির কয়েক জন মাত্র আশ্চর্য্য যুদ্ধ-কৌশলে এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমে একাধিপত্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই জাতির কোটি কোটি লোক আজ আত্মরক্ষায় অসমর্থ। যে জাতির বীরত্বের নিকট এক দিন সমস্ত পৃথিবী অবনত হইয়াছিল, সেই জাতি আজ সকলের চরণ-তলে। যে জাতি এক দিন ভারতকে জগতের শিরোভূষণ করিয়া স্বদেশানুরাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই জাতি আজ আত্ম-সুখচিন্তায় নিমগ্ন, স্বদেশের হিতাহিতে উদাসীন। যে জাতির হৃদয়নিকর এক সময়ে স্বজাতি-প্রেমের দৃঢ় বন্ধনে এক হৃদয়ের ন্যায় কার্য্য করিত, যে জাতির এক জনের গায়ে কেহ আঘাত করিলে, সমস্ত জাতি বীরদর্পে গর্জ্জিয়া উঠিত. সেই জাতি আজ আপন ভ্রাতাকে শত্রু-পদতলে দলিত হইতে দেখিলেও বেদনা বোধ করে না, প্রতিকার-বাসনায় উত্তেজিত হয় না। যে জাতির জ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিলে পৃথিবীর পণ্ডিত-মণ্ডলীকে নিস্তব্ধ হইতে হয়, সেই জাতির সন্তানগণ আজ কর্ত্তব্যজ্ঞানবিহীন। যে জাতি এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর

ধর্ম্মশিক্ষকের পদে অধিরোহণ করিয়াছিল, শাক্যসিংহ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যে জাতির ধর্ম্ম-প্রচারক, সেই জাতি সভ্য-ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া খৃষ্টীয় যাজকগণ ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রদানে প্রয়াসী। যে জাতির প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যেক কাজের সহিত নীতির সম্বন্ধ, শত্রুকেও অন্যায় উপায়ে পরাভূত করা যে জাতি অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত, আজ বণিক্‌মুখে শুনিতে হইল সেই জাতি নীতি-বিরহিত, জাল, মিথ্যা ব্যবহারাদি সেই জাতির আত্মরক্ষার এবং পরানিষ্টসাধনের অস্ত্রস্বরূপ। রামায়ণ মহাভারত, শকুন্তলা উত্তর-চরিত যে জাতির কাব্য-গ্রন্থ; ব্যাস বাল্মীকি, কালিদাস ভবভূতি যে জাতির কবিরত্ন, সেই জাতির কবিগণ আজ ইংরেজ কবির অনুকরণে প্রবৃত্ত, কোন ইংরেজ কবির নাম অভিহিত হইলে পুলকিত-চিত্ত। গৌতম কপিল প্রভৃতি যে জাতির দার্শনিক, আজ ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র না হইলে সেই জাতির দর্শন শিক্ষা হয় না। ভাস্করাচার্য্য আর্য্যভট্ট-প্রভৃতি যে জাতির জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ, সেই জাতির জ্যোতির্ব্বিদ্যায় প্রকাশ পঞ্জিকাগণনে, সেই জাতির জ্যোতিষ-শিক্ষা ইউরোপীয় জ্যোতিষিক গ্রন্থপাঠে। যে জাতির ভাস্করাচার্য্য সর্ব্বপ্রথমে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই জাতির মাধ্যাকর্ষণ-শিক্ষা-স্থল নিউটনের ফল-পতন-বিচার। যে জাতির জন্ম-ভূমি [illegible] বত্তীর বিজন-ভূমি, লীলাবতীর লীলা-স্থান, সেই জাতির সন্তানগণ আজ বিদ্যার জন্য পরমুখাপেক্ষী, সেই জাতীয় রমণী-কুল আজ অনক্ষর অজ্ঞান। যে জাতি এক সময়ে জগতের সভ্যতামার্গের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই জাতি আজ জগতের নিকট অসভ্য বলিয়া পরিচিত। যে জাতির ভূপতিগণ প্রজারঞ্জনার্থ স্বীয় প্রিয়তমা ভার্য্যাদিগকেও বনবাস দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, আজ সেই জাতির তরলমতি কর্ত্তব্যজ্ঞানবিহীন বালককে কুক্কুর-হত্যার জন্য কারাবাস করিতে হয়। যে জাতি এক সময়ে গগনস্পর্শী হিমশৃঙ্গ-বৎ উচ্চে অবস্থান করিত, আজ সেই জাতি ভূকেন্দ্র-স্পর্শন-প্রয়াসী মহাসমুদ্র-বৎ গভীর পতন-খাতে পতিত। যে জাতি এক সময়ে রাজরাজেশ্বরের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল, আজ সেই জাতি পথের ভিখারী। যে জাতির মাতৃভূমি রত্ন-প্রসবিনী বলিয়া ভুবন-বিখ্যাত, আজ সেই জাতি অন্নের কাঙ্গালী। আর সে কর্ণ নাই, সে অর্জ্জুন নাই, সে ভীম নাই, সে অভিমন্যু নাই; সে আর্য্যবীরত্ব নাই, আর্য্য-সাহস নাই, আর্য্যজাতির স্বদেশানুরাগ নাই, স্বজাতিপ্রেম নাই; আর্য্যসন্তান আজ বীরত্বে মেষপ্রায়, সাহসে ভীরুতার প্রতিশব্দ। আর সে বৃহস্পতি নাই, সে অত্রি নাই, সে আর্য্য-জ্ঞান নাই, সে আর্য্য-বুদ্ধি নাই; আর্য্য-সন্তান আজ কর্ত্তব্যজ্ঞানবিহীন, আর্য্য-সন্তান আজ বুদ্ধিতে দিশাহারা। আর সে কালিদাস নাই, সে ভবভূতি নাই,

সে গৌতম নাই সে কণাদ নাই, সে খনা নাই সে লীলাবতী নাই; সে আর্য্য-কবিত্ব নাই। আর্য্য-দার্শনিক-অনুসন্ধান নাই, সে আর্য্য-রমণীরত্ন নাই; আর্য্য-সন্তানের আজ কবিত্ব-প্রকাশ কুৎসিত-নাটক-প্রণয়নে এবং দর্শন-প্রয়োগ আপনার যথেচ্ছাচার সমর্থনে, আর্য্যনারীর আজ গুণপ্রকাশ কন্দল-করণে এবং গৃহ-বিচ্ছেদ-সংঘটনে। আর সে রাম নাই, সে যুধিষ্ঠির নাই; সে আর্য্য-রাজনীতি নাই, সে আর্য্য-ন্যায়পরতা নাই; আর্য্যনারীর আর সেরূপ আদর নাই, সেরূপ মান মর্য্যাদা নাই; আর্য্যসন্তানগণ এ সকলই হারাইয়াছেন। আর সে আর্য্য-গৌরব নাই, সে আর্য্যসুখ নাই, সে আর্য্য শান্তি নাই; আর্য্য-সন্তান আজ অধঃপতনের শেষ সীমায় উপনীত; আর্য্য গৌরবসূর্য্য আজ একেবারে অস্তমিত। দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর অদৃষ্টে কি সে সূর্য্যের পুনরুদয় ঘটিবে না? জড়প্রকৃতি ভারতসন্তান কি সে সূর্য্যের পুনরুদয় দেখিবার চেষ্টা করিবে না? আর্য্য-সন্তান আর জড় পদার্থ এ উভয় চিরকালই কি এক অর্থে ব্যবহৃত হইবে? রোম গ্রীসের অধঃপতন হইয়াছিল, তাহাদের পুনরুত্থান হইল; বনপর্ব্বতবাসী কত অসভ্যজাতি আজ সুসভ্য বলিয়া পরিচিত; ভারতই কি কেবল চিরকাল এই ঘৃণিত অবস্থায় থাকিবে? ভারতেরই কি কেবল দুর্ভাগ্য ইহজন্মে ঘুচিবে না? দুর্ভাগ্য! এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী-তলে তোমার ক্রীড়াস্থল কি আর মেলে না? তোমার কার্য্য-ক্ষেত্রের কি ইহ জন্মে পরিবর্ত্তন হইবে না?—ভারতবাসি! পৃথিবী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ, কে আজ উচ্চ পদে উঠিতে সচেষ্ট নহে; কে আজ জাতীয় গৌরব স্থাপনে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে না। দেখ, তোমাদের ন্যায় নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল, সজীবতাবিহীন জাতি পৃথিবীর আর কোন্ দেশে দেখিতে পাও? ভ্রাতৃগণ! সিংহের সন্তান হইয়া আর কতদিন শৃগালের বেশে জীবন ধারণ করিবে? দেবসন্তান হইয়া পশুবৎ নিকৃষ্টভাবে আর কতকাল থাকিবে? একবার ভাবিয়া দেখ কি ছিলে কি হইয়াছ! দেখ, দেবকান্তি উজ্জ্বল মুখ কতদূর বিকৃত হইয়াছে! আর উদাসীন থাকিবার সময় নাই। ভ্রাতাকে ভাল বাসিতে শেখ; দুঃখিনী জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিতে যত্নবান্ হও।

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

যোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যোগিরা সর্ব্বপ্রকার যোগসাধনাতে যেমন সোমরস সেবন করিয়া শরীরস্থ যাবতীয় রোগ বিনষ্ট করিয়া বলিষ্ঠ শরীর দৃঢ় কায় শ্রীমান্ আয়ুষ্মান ও নিরোগী হন, সোমাভাবে পার্থিবামৃত সেবা করিতে পারিলেও সোমসেবার কতক ফল লাভ করিয়া থাকেন। পার্থিবামৃত শব্দে যে জল বুঝায় তাহা অমরকোষাভিধান আর ঋক্‌বেদে বিবৃত আছে।

পয়ঃ কিলালমমৃতমিত্যমরকোষঃ॥

অপ্স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপ্সু তেজঃ প্রশস্তয়ে দেবা ভবত বাজিনঃ। ঋক্‌বেদ। ১। ২৩। ১৯॥

অর্থ। জলের মধ্যে অমৃত ঔষধ ও তেজঃ পদার্থ আছে। অতএব পুরোহিত সকল আপনারা সত্বর হইয়া জলের আরাধনা করুন।

অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবং আপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ॥ ১। ২৩। ২০। ১১। ব।

সোমদেব আমাকে বলিয়াছেন যে জলের মধ্যে তাবৎ প্রকার ঔষধ ও অমৃত এবং তেজঃ সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন জল যে পাপনাশক তাহাও ঐ বেদে লিখিত আছে। যথা।—

ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতং॥

হে জল-সমূহ! আমার শরীরে যে কোন পাপ থাকে অথবা যদি আমি কোন লোকের অনিষ্ট আচরণ করিয়া থাকি, যদি বা সাধু লোককে শাপ দিয়া থাকি, কিম্বা কোন সময়ে মিথ্যা কথা বলিয়া থাকি সেই সকল পাপ আমার দেহ হইতে দূর কর। ১। ২৩। ২২।

এইক্ষণ কিপ্রকারে যোগিদিগের পক্ষে জল সেব্য হইয়াছে তাহা লেখা যাইতেছে স্নানে পানে জল যেমন সেবনীয়, অন্তর্ধৌতে সেইরূপ বিশেষ প্রয়োজনীয়। যেরূপে অন্তর্ধৌত করিতে হইবে তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত বলা যাইতেছে। যোগিরা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিবে। পরে বিহিতাচমন করত "প্রিয়দত্তায়ৈ শুভে নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক চরণ ক্ষেপণ করিবে। পরে "ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিঃ রাহু-কেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং"। এই মন্ত্র পাঠ ও মন্ত্রার্থ চিন্তা করিবে। মন্ত্রার্থ এই—সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কর্ত্তা যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, আর দিবাকর ও নিশানাথ, আর মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু ইহারা আমার পক্ষে সুপ্রভাত করুন অর্থাৎ শুভদিন করুন।" পরে কিঞ্চিৎ কাল মৌন হইয়া আত্ম চিন্তা করিবে।

যথা "অহং দেবো নচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্ সচ্চিদানন্দরূপোহং নিত্য-মুক্তস্বভাববান্।" অর্থ। আমাতে যে আত্মা বিদ্যমান আছেন তিনি পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নহেন, এতাবতা আমিই ব্রহ্ম, যিনি কোন শোকে আচ্ছন্ন হন না আর যিনি সৎ চিৎ ও আনন্দ রূপ ধারণ করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা মুক্ত-স্বভাব-বিশিষ্ট পরব্রহ্ম, তৎপর ঐ পরমাত্মার নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিবেন। যথা "লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসার-যাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে"।

হে লোকেশ হে চৈতন্য দেব হে আদিকারণ হে শ্রীকান্ত হে বিষ্ণুদেব আমি আপনার অনুজ্ঞাক্রমে আপনার তৃপ্তি জন্য সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত হইলাম। অর্থাৎ নিয়মনুযায়ি সংসার-কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পরে নিশাজল অর্থাৎ সন্ধ্যা-সময়ে কোন একটা পাত্রে জল রাখিয়া সেই জল ৪ দণ্ড রাত্রি থাকিতে উভয় বা একটি নাসা-রন্ধ্র দিয়া ক্রমেক্রমে পান করিবে। তৎপর আর যেন নিদ্রাগম না হয়। পরে যখন অধিক পরিমাণে জল পান করিতে ক্ষমবান্ হইবে তখন ঐ পান করা জল হয় বমি না হয় ক্রম-বিশেষের দ্বারা গুহ্য দেশ দিয়া নিভৃত স্থানে অথবা জল মধ্যে ক্রিয়া নির্গত করিবে। এপ্রকার করিতে পারিলে অল্পকালের মধ্যে কুম্ভক করিতে কোন কষ্ট হইতে পারে না। ইহার দ্বারা ইড়াপিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী পরিষ্কার হয়। ইহাকে ধৌতি-যোগ বলে।

ক্রমাগত ৬ মাস কাল এ কার্য্য করিতে পারিলে নাড়ী-শুদ্ধি হইয়া কুম্ভক সিদ্ধ হইতে পারে। সিদ্ধ-কুম্ভক ব্যক্তি যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ শ্বাস ধারণ করিয়া নিরুদ্বেগে আত্মাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া মানব-জন্ম সফল করিতে পারে। ইহাকেও আত্মমনঃসংযোগ বা সমাধি বলা যায়।

নিশাজল নিয়ম পূর্ব্বক ৬ মাস পান করিলে আর কিছু হউক বা নাই হউক শরীর ব্যাধি-বিবর্জ্জিত ও হৃষ্ট পুষ্ট ও শ্রীমান্ ও বলবান হইবেই হইবে। শরীর রোগ-শূন্য ও বলবান্ হইলে যোগ-সাধনা সহজ হইয়া উঠে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিশাজল পান করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বাটীর কিম্বা বাসার কিঞ্চিৎ অন্তরে নির্জ্জন প্রদেশে পরিষ্কৃত স্থানে বিধিবৎ মল মূত্র পরিত্যাগ ও জল শৌচাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে নদ্যাদিতে গমন পূর্ব্বক বৈধ স্নান করিবে। পরে প্রাতঃ সন্ধ্যা ও তর্পণ ক্রিয়া সমাপন করত গৃহে কিম্বা বাসায় আসিয়া যোগ-গৃহে প্রবেশ করিবে।

যোগ-গৃহে প্রবেশ করত বিধিমত পাদ প্রক্ষালণ করত যোগাসনে বসিয়া পদ্মাসন করিবে। পদ্মাসনের বিষয় পূর্ব্বে বলাহইয়াছে বলিয়া এখানে বলা হইল না। তৎপর আচমন করিবে। ইহার ক্রম—

পূর্ব্বাস্থ কি উত্তর-মুখীন হইয়া হাসকণা-

ইএর ত্রিগুণ জল দক্ষিণ হস্তের ব্রাহ্ম তীর্থ দ্বারা ৩ বার পান করিবে। পরে হস্ত প্রক্ষালণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অলোম পৃষ্ঠ দ্বারা অলোমক, ওষ্ঠদ্বয় দুই-বার মার্জ্জন করিবে। পরে তর্জ্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সংযুক্ত অগ্রভাগ উভয় নাসায় স্পর্শ করিবে। তৎপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ও মধ্যমার সংযুক্ত অগ্রভাগ উভয় চক্ষে, তার পর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ও অনামার সংযুক্তাগ্রভাগ উভয় কর্ণের মধ্যে, তৎপর ঐ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আর কনিষ্ঠার সংযুক্তাগ্রভাগ নাভি-কূপে স্পর্শ করাইয়া হস্ত প্রক্ষালণ করিবে। ইহা সংক্ষেপাচমন। ইহার পর প্রাণায়াম। ইহা-র ক্রম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রাণায়ামের সময় যেমন নাসাগ্র দর্শন করিবে তেমনি পূর্ণব্রহ্ম চিন্তা করিবে। ওঁকারার্থ অতি সহজ ও সামান্য নহে, তবে সামান্যাকারে চিন্তা করিতে করিতে প্রকৃতার্থ অন্তরে প্রকাশ হইতে পারে। ইহার মূলার্থ সত্বরজস্তমো গুণ। যাঁহার ক্রিয়া তাঁহাকে ভাবিবে। অনন্তর যোগী সকল প্রত্যহ প্রাণায়ামের সময় কুণ্ডলিনীকে চিন্তা করেন। ইহা তান্ত্রিক মত। যোগী প্রকৃতি দেবীকে কুণ্ডলিনী জ্ঞান করিয়া আপনি অর্থাৎ স্বদেহস্থ জীবীকেও কুণ্ডলিনী ভাবিবেন। ইহার প্রমাণ "স্বয়ং তাবৎ তথা ভবেৎ"। অর্থ—আপনিই ইষ্ট দেবতা হইবে। যোগ সাধনা -কালীন ক্রমে ক্রমে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সংস্থান ও বিলয় করত জীবাত্মা ও কুণ্ডলিনীকে একীভূত করিয়া পরমাত্মায় মিশ্রিত করিতে হয়। তখন সাধ্য সাধক ও লক্ষ্য প্রভেদ থাকে না। এইরূপ চিন্তা যখন যোগীর হইবে, তখন তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইবেন। এই অবস্থার অব্যবহিত পূর্ব্বে ষট্‌চক্র ভেদ করিবে। ষটচক্র ভেদ আর ভূত-শুদ্ধি একই অর্থ। সেই ভূত-শুদ্ধির সংক্ষেপ বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মানব শরীর মিশ্রিত পাঞ্চভৌতিক মাত্র। সেই ভূত সকলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ একত্রিত হইলে প্রারব্ধ কর্ম্ম বশতঃ পঞ্চ কোষ জন্মিয়া পরমাত্মাকে আবরণ করিলে লিঙ্গ শরীর অর্থাৎ অবিনাশী অতীন্দ্রিয় শরীর হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করত জীব-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ইহা আর্য্যদিগের জ্ঞান-শাস্ত্রের মত। সেই পঞ্চ কোষ বিলক্ষণা-ক্রান্ত ভোগ দেহের আধার স্থূল দেহ। স্থূল দেহ ক্ষণ-ভঙ্গুর। লিঙ্গ দেহ প্রলয়-পর্য্যন্ত-স্থায়ী। সেই পঞ্চ কোষের বিশেষ বিশেষ নাম ও যে যে কোষ যে যে কার্য্য-কারী তাহার বিষয়। ঐ কোষ সকল বিভিন্ন বিভিন্ন থাকায় পৃথক্ পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথম পার্থিব কোষ। যে কোষ আত্মাকে আবরণ করিয়া রাখে তাহার নাম অন্নময় কোষ। এইরূপ অপরাপর ভৌতিক কোষ সকলের নাম যথা—প্রাণ-ময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ। অন্নময় কোষের গুণ এই যে ইহা শরীরকে হ্রাস বৃদ্ধি করায়, প্রাণময় কোষের গুণ—প্রাণনক্রিয়ার দ্বারা শরীর সজ্জীবে জীবিত থাকে। মনোময় কোষ হেতু ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ

শব্দ জ্ঞান হয়। বিজ্ঞানময় কোষ হেতু সদসৎবিবেচেনা করত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করা যায়। আনন্দময় কোষ হেতু কেবল আনন্দ অনুভব হয়। ঐ সকল কোষ সদোষ হইলে বিপরীত ফল জন্মে। পঞ্চদশী শাস্ত্র এইরূপ বলিয়াছেন। তন্ত্র বলেন প্রকৃতি হইতে তাবৎ কার্য্য হয়। সেই প্রকৃতিকে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বিধ্বংস করত পরমাত্মাতে বিলীন করিতে পারিলে মোক্ষ লাভ হয়। প্রকৃতির অর্থ কুণ্ডলিনী কিম্বা জীবাত্মা হয়। তন্ত্র মতে প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব, মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে ভৌতিক জগৎ উৎপন্ন হয়। যেমন অনুলোম ক্রমে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বিলোম ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তন্ত্র মতে যোগিগণ যেরূপে কুণ্ডলিনীকে ভাবনা করেন তাহা বিবৃত করা যাইতেছে। যথা “মূলাধারে মহোৎপলে অরুণরুচৌ বাসন্তবর্ণান্বিতে সম্যক্ বেদদলে পরাৎপরগৃহে সার্দ্ধত্রিবৃত্তান্বিতা সুপ্তা। ব্রহ্মময়ী শিবৈকনিলয়ারাধ্যা জগন্মোহিনী” ।১॥ তন্ত্র দেখ। মূলাধারে গুহ্যদেশে। মহান্ উৎপলে অর্থাৎ রক্তবর্ণ চতুর্দ্দল পদ্মে। পরম শিব-মন্দিরে স্বয়ম্ভু লিঙ্গে। জগন্মোহিনী কুণ্ডলিনী। তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে লিঙ্গ মূলে ষড়্দলপদ্মে আনয়ন করিবে। এস্থানের ও অপরাপর পদ্মের বৃত্তান্ত পরে বলা যাইবে। সম্প্রতি ঐ সকল পদ্ম যাহা অবলম্বন করিয়া আছে আর কুণ্ডলিনী যাহাতে থাকিয়া ষট্‌পদ্ম ভেদ করতঃ পরমাত্মায় মিলিত হন তাহার যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত প্রকাশ করা যাইতেছে।

মানব দেহ একটি মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া আছে সেই মেরুর মধ্য স্থানের বামে ইড়া, মধ্যে সুষুম্না, দক্ষিণে পিঙ্গলা নামে তিনটি নাড়ী বীণাযন্ত্রের তারের ন্যায় লম্বমান আছে। সেই মধ্যা নাড়ী সুষুম্নার মধ্যে যে ছিদ্র আছে তাহাতে মৃণাল-তন্তুর ন্যায় কুণ্ডলিনী ষট্‌চক্র ভেদ করত ব্রহ্ম-রন্ধ্রে যাতায়াত করেন। ইহার প্রমাণ ষট্‌চক্র ভেদ প্রকরণে। যথা—“ঝিল্লীরবাক্তমধুরং কূজন্তি সততোত্থিতা”। ইহার অর্থ মধ্য রাত্রিতে যেমন মনুষ্য পশু পক্ষী সকল নিদ্রায় অচৈতন্য হইলে ঝিল্লীরব শুনা যায়, তদ্রূপ সুষুম্না-নাড়ীস্থ কুলকুণ্ডলিনী আশ্চর্য্য মধুর ঝিল্লীরব করত মূলাধার হইতে অন্যান্য চক্র ভেদ করত সহস্র পদ্মে পরম শিবের সহিত মিলিত হন। যোগিদিগের ইত্যাকার চিন্তাকে কুণ্ডলিনী চিন্তা বলা যায়। মেরুদণ্ডকে ৬ ভাগ করিলে যে সকল ভাগ হয়, তাহার প্রত্যেক ভাগের নাম বলা যাইতেছে। প্রথম ভাগের নাম মূলাধার। এই মূলাধার গুহ্যদেশে, তদূর্দ্ধে স্বাধিষ্ঠান, ইহা লিঙ্গমূলে। তদূর্দ্ধে মনিপুর, ইহা নাভিতে। তদূর্দ্ধে অনাহত, ইহা হৃদয়ে। তদূর্দ্ধে বিশুদ্ধ, ইহা কণ্ঠ-মূলে। তদূর্দ্ধে আজ্ঞাখ্য, ইহা ভ্রূমধ্যে। এই সকল স্থানাতিরিক্ত সহস্রার নামক আর এক পদ্ম আছে তাহা

মূর্দ্ধতে। এই সকল পদ্মের আকার প্রকার পরে বিবৃত হইবে। কেবল পবনাভ্যাসযোগিরা যে ষট্‌চক্র চিন্তা করিবেন এমত নহে, সাধক মাত্রেরই ষট্‌চক্র ভাবনা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

বর্ত্তমান সময়ে আকাশ-কুসুম-তুল্য ষট্‌চক্র চিন্তা করা কি সম্ভবপর হইতে পারে? যে কালের লোক সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণের পক্ষপাতী হইয়া বাহ্য-জগতীয় সৌন্দর্য্যে বিমোহিত তাঁহাদিগের অন্তরে আধ্যাত্মিক চিন্তার স্থান পাওয়া কঠিন। যে স্থানের শিক্ষা বলে আধ্যাত্মিক বিষয়কে শশ-বিষাণ বলিয়া অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, সেই পাশ্চাত্য দেশের নবীন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-মণ্ডলীতে আধ্যাত্মিক পদার্থের আবির্ভাব হইতেছে ইহা দেখা বা শুনা যাইতেছে। অতীত কালে ভারতীয় আর্য্য-প্রবর হস্তামলক-নামা একজন যোগ-সাধক মুনি ছিলেন। তিনি জগতের অন্তর্ব্বাহ্য এরূপ জ্ঞাত ছিলেন যে কোন লোক ধাত্রীফল হস্তে লইয়া দৃষ্ট করত তাহার বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তদ্রূপ এই জগতের অন্তর্ব্বাহ্য তাবৎ বিষয় জানিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হস্তামলক হইয়াছিল।

যোগের যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি বলা হইল সেই গুলি নিয়ম মত প্রতিপালন, আর যে সকল ঔষধির কথা বলা হইল তাহা রীতি মত সেবন করিতে পারিলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশ্বাস জন্মিবেই জন্মিবে।

ইতি বেদ ও তন্ত্রোক্ত যোগ সাধনা প্রকরণে প্রথম পাদ।

শ্রীকালীকমল
সার্ব্বভৌম।

স্বর-বিজ্ঞান।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত সমুদয় বিবরণ সংক্ষেপে একটী প্রস্তাবে সমালোচনা করিয়াছি। তদ্ভিন্ন নাট্য ও নৃত্য সম্বন্ধে দুইটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার কণ্ঠ-সঙ্গীত সম্বন্ধে কতিপয় প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই সকল প্রবন্ধে বিলুপ্তপ্রায় ঋষি-প্রণীত এবং সঙ্গীতাচার্য্য-গণদ্বারা নির্দ্দিষ্ট বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সারাংশ সমুদ্ধৃত হইবে এবং ইহার আলোচনা দ্বারা পাঠকগণ ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

গানকরা মনুষ্য মাত্রের প্রকৃতিসিদ্ধ। গান মনুষ্যের সুখের সামগ্রী। গীত-রস পশুপক্ষী প্রভৃতিকেও আর্দ্র করে, এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে—

"শিশুর্বেত্তি পশুর্বেত্তি বেত্তি গীতরসং ফণী"
শিশু, পশু, অধিক কি সর্প যে এমন ক্রূর

জাতি, তাহারাও গীতরসে মুগ্ধ হয়।

"অজ্ঞাতবিষয়াস্বাদো বালঃ পর্য্যঙ্কশায়ী যঃ।
রুদন্ গীতামৃতং পীত্বা হর্ষোৎকর্ষং প্রপদ্যতে॥"

কোন বিষয়েরই আস্বাদ জানেনা, ঈদৃশ পর্য্যঙ্কশায়ী শিশুও রোদন করিতে করিতে গীতামৃতে শান্ত হয় এবং আহ্লাদে মগ্ন হয়।

এই গীতরস জীব মাত্রের আস্বাদ্য হইলেও তাহার বিশেষ আছে। যে অংশ উহার বিদ্যা, সে অংশের আস্বাদ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন ভোগ করিতে পারেন না, এবং তজ্জন্যই পণ্ডিতেরা নানা গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন যথা—

"ব্রহ্মেশ-নন্দি-ভরত-দুর্গা-নারদ-কোহলাঃ।
দশাস্য-বায়ু-রম্ভাদ্যাঃসঙ্গীতস্য প্রকাশকাঃ॥"

—আদি শরীরী ব্রহ্মা, তৎপরে নন্দী, তৎপরে ভরত, দুর্গাদেবী, নারদ, কোহল, রাবণ, বায়ু বা বায়ু-পুত্র হনুমান, রম্ভা ইঁহারা সঙ্গীত বিদ্যার সম্প্রদায় কর্ত্তা। নিম্নতল সঙ্গীতাচার্য্যদিগকে ইঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই চলিতে হইয়াছে। নব আচার্য্যেরা সঙ্গীত বিজ্ঞানের কোন নূতন বীজ সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহারা পুরাতন সঙ্গীত বিদ্যাকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন মাত্র। অতি আদিম কালের গীত একপ্রকার ছিল, এখন তাহার আকার পরিবর্ত্ত হইয়াছে। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। এখন যেরূপ তান, গমক (স্বরের কম্পন), মূর্চ্ছনা (স্বর হইতে স্বরান্তরে প্রবেশ), কোমল, তীব্র (ত্রিস্বর), প্রভৃতি নানা পরিচ্ছদে বিভূষিত গীত উচ্চারিত হইয়া থাকে, আদিকালে এরূপ ছিলনা। শুদ্ধ স্বরকে কিরূপে বিকৃত করিয়া ঐ সকল নূতন নূতন আকার নির্ম্মাণ করা যায়, তাহার কৌশলও বোধ হয় তাৎকালিক লোকেরা জ্ঞাত ছিলেননা। সেই জন্যই আদিম কালের গান এখন আর কাহারও চিত্ত হরণ করিতে পারেনা।

আদিম কালে শুদ্ধ স্বর অবলম্বন করিয়াই গীত হইত। ইউরোপীয় জাতির গান এবং আমাদের বৈদিক গান তাহার সাক্ষী। ইউরোপীয়গণ বরং কিছু উন্নতি করিয়াছেন, কেননা, তাঁহারা শুদ্ধ স্বর ও বিকৃত স্বর ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা গমক (স্বরের কম্পন) কৌশল জানেননা এবং রীতিশুদ্ধ মূর্চ্ছনাও জ্ঞাত নহেন। আমাদিগের বেদগান আর উন্নত হইলনা, লৌকিক গানই সমধিক উন্নত হইয়াছে। বৈদিক গান কেবল হাং হীং বুহা, ইউরোপীয়গণের গানেও হাউ হাউ হু উচ্চ মধ্যম বা স্বরিত স্বরমাত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাতে গমক মুর্চ্ছনাদি নাই।

বেদ গানে ৩টি মাত্র স্বর লাগে। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। কিন্তু লৌকিক গানে ইহার নাম গন্ধও নাই। বৈদিক গানে দেখা যায়, ৩টি স্বর; কিন্তু লৌকিক গানে ৭টী স্বর স রি গ ম প ধ নী অর্থাৎ ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম,

পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ। পুরাতন কালের উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিতের সঙ্গে এখন কার স রি গ ম প ধ নির সঙ্গে যে কিরূপ যোগ আছে, তাহা বুঝা ভার। কেননা, কোন সঙ্গীতগ্রন্থে উদাত্ত অনুদাত্তের উল্লেখ নাই। নব্যতম লৌকিক গানের পুস্তকে উদাত্তাদির নাম লক্ষণাদি না থাকায় কেহ কেহ অনুমান করেন এবং বলেন, পূর্ব্বকালের উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত আর কিছুই না, উহা স্বরোচ্চারণের স্থান বিশেষ মাত্র। আমরা এখন যাহাকে উদারা মুদারা তারা বলিয়া থাকি, তাহাই পূর্ব্বকালের উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত। এ কথা বা এ সিদ্ধান্ত আমাদিগের ভাল বোধ হয় না। কারণ স্বর-বিচার স্থলে কাশিকাকার বলিয়াছেন যে,

"উচ্চৈরিতিচ শ্রুতিপ্রকর্ষো ন গৃহ্যতে।
উচ্চৈর্ভাষতে উচ্চৈঃপঠতীতি।"

উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেছে, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছে, এই রূপ কর্ণগোচর উচ্চতাকে উদাত্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই।

অপিচ, উদারা, মুদারা তারা; এই ত্রিবিধ স্বরের প্রত্যেকটিতে স রি গ ম প ধ নি অনুগত আছে; কিন্তু বৈদিক উদাত্তে তাহা নাই এবং থাকিবার সম্ভাবনাও দেখা যায় না।

কেহ কেহ বলেন, উহা স্বরের পরিমাণ বিশেষের নাম। ইংরাজিতে ইহাকে টোন্ কহে। বৈদিক স্বরে যেমন ৩প্রকার পরিমাণ দেখা যায়, ইংরাজিতে সেইরূপ ৩ প্রকার টোন্ আছে। মেজার টোন্ (১), মাইনর্‌টোন (২), এবং সেমী টোন (৩)। এই কল্পনা কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা যায় না। পরন্তু এ বিষয়ে আমরা নিম্ন-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিতে চাহি।

শিক্ষাগ্রন্থে ২ দ্বিশ্রুতি স্বরকে উদাত্ত-জাতীয় বলা হইয়াছে। যথা—

"উদাত্তৌ নিষাদ-গান্ধারৌ" শিক্ষা।

ত্রিশ্রুতি স্বরকে অনুদাত্ত জাত বলা হইয়াছে যথা—

"অনুদাত্তৌ ঋষভ-ধৈবতৌ।" শিক্ষা।

আর ৪ শ্রুতি স্বরকে স্বরিত বলা-হইয়াছে। যথা—

"স্বরিত-প্রভবাহ্যেতে ষড়্‌জ-মধ্যম-পঞ্চমাঃ।" শিক্ষা।

কিন্তু সঙ্গীত শাস্ত্রে স্বরের পরিমাণ এইরূপ আছে যথা—

স—৪ শ্রুতি।
রি—৩ শ্রুতি।
গ—২ শ্রুতি।
ম—৪ শ্রুতি।
প—৪ শ্রুতি।
ধ—৩ শ্রুতি।
নি—২শ্রু।*

নি—২শ্রুতিতে গঠিত সুতরাং নি গ উদাত্তের পুত্র,

রি,ধ অনুদাত্ত-জাত। স ম প স্বরিত

* "চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়্‌জমধ্যমপঞ্চমা দ্বে দ্বে নিষাদগান্ধারৌ ত্রিস্ত্রিঋষভধৈবতৌ॥ (সঙ্গীতশিক্ষা-সারসংগ্রহ)।"

প্রস্তাব। যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে ইহাই জানা যাইতেছে যে, বৈদিক স্বরত্রয় ভাঙ্গিয়া লৌকিক সপ্ত স্বর নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈদিক কালের গান ত্রিস্বরেই গীত হইত, অথবা বিকৃত স্বর গুলি গান কালে প্রকাশ পাইত, কিন্তু তাহা বৈদিক কালের হিন্দুগণ ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন না।

পাণিনীয় স্বর-বিচারে বৃত্তিকার উদাত্তাদির লক্ষণ যাহা দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকটিত করিতেছি।

(উচ্চৈরুদাত্তঃ পা, ৪, ২, ২৯)

বৃত্তি—উদাত্তাদিশব্দঃ স্বরে বর্ণধর্ম্মে লোকবেদয়োঃ প্রসিদ্ধঃ। উচ্চৈরুপলভ্যমানো যোচ্ স উদাত্তসঙ্গো ভবতি। উচ্চৈরিতি চ শ্রুতিপ্রকর্ষো ন গৃহ্যতে। উচ্চৈর্ভাষতে উচ্চৈঃ পঠতীতি। কিং-তর্হি? স্থানকৃতমুচ্চত্বং সংজ্ঞিনোবিশেষণম্। তাল্বাদিষু হি ভাগবৎসু স্থানেষু বর্ণা নিষ্পদ্যন্তে। তত্র যঃ সমানে স্থানে ঊর্দ্ধভাগনিষ্পন্নোঽচ্ স উদাত্তসঙ্গো ভবতি। যস্মিন্নুচ্চার্য্যমাণে গাত্রাণামায়মো নিগ্রহো ভবতি। রুক্ষতায় অস্নিগ্ধতা স্বরস্য। সংবৃততা কণ্ঠবিবরস্য।

অর্থ—উদাত্ত, অনুদাত্তাদি শব্দ, স্বরের এবং বর্ণের ধর্ম্ম। যাহা উচ্চ বলিয়া বোধহয় তাহাই উদাত্ত। এই উচ্চতা শ্রবণ-গত উৎকর্ষ অর্থাৎ বড় শব্দ হইলেই যে উদাত্ত হয় তাহা নহে। তবে কি? কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানের ঊর্দ্ধভাগ অবলম্বন করিয়া উচ্চতম প্রযত্নে যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাই উদাত্ত স্বর। উদাত্ত স্বর উচ্চারণ করিতে গেলে শরীরে নিগ্রহ উপস্থিত হয়, টান পড়ে (কষ্টহয়), স্বরটি বা ধ্বনিটি রুক্ষ ও তীব্র অর্থাৎ অস্নিগ্ধ ভাবে প্রকাশ পায় (স্নিগ্ধতা স্বর থাকে না)। কণ্ঠ-বিবর সঙ্কোচ করিয়া ইহা উচ্চারণ করিতে হয়।

পাঠকগণ! এখন বুঝিয়া লউন যে উদাত্ত স্বরটি কি?

অনুদাত্ত—"নীচৈরনুদাত্তঃ" (ঐ, ৩০)

বৃত্তি—নীচৈরুপলভ্যমানো যোঽচ্ সোঽনুদাত্তসঞ্জ্ঞো ভবতি। নীচভাগে নিষ্পন্নো যোঽচ্ স অনুদাত্তঃ। যস্মিন্নুচ্চার্য্যমাণে গাত্রাণামন্বসর্গোভবতি। অন্বসর্গো মার্দবম্ (স্বরস্য) মৃদুতা স্নিগ্ধতা কণ্ঠবিবরস্য উরুতা মহত্তাচ।

অর্থ—যাহা অনুচ্চ বা নীচু বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই অনুদাত্ত। ইহাও ছোট স্বর হইলে হইবে না। উচ্চারণ স্থানের নিম্ন বা নীচ ভাগ অবলম্বন করিয়া উঠাইলে তবে তাহা অনুদাত্ত হইবে। ইহার উচ্চারণ কালে শরীর শিথিল ভাব অর্থাৎ মৃদুতা প্রাপ্ত হয়। স্বরটি মৃদু অর্থাৎ স্নিগ্ধ লাগে। কণ্ঠ অনুদাত্ত স্বর কি? তাহা এতদ্দ্বারা বুঝিয়া লউন বিবর বড় হয় (হাঁ করিতে হয়)।

স্বরিত—"সমাহারঃ স্বরিতঃ।" (ঐ, ৩১)

বৃত্তি—উদাত্তানুদাত্তস্বরসমাহারঃ স্বরিতঃ। তৌ সমাহ্রিয়েতে যস্মিন্ তস্য স্বরিত-ইত্যেষা সংজ্ঞা।

অর্থাৎ যাহাতে কথিত দুই স্বরের (অনুদাত্ত ও উদাত্ত) সংগ্রহ হয়, দুই স্বরের সমাবেশ বা সংযোগ হয়, তাহাই স্বরিত।

"তস্য আদিত উদাত্তমৰ্দ্ধহ্রস্বম্" (ঐ, ৭২)

এই স্বরিত স্বরের প্রথমে অৰ্দ্ধমাত্রাত্মক অংশ উদাত্ত হইয়া অবশিষ্ট অনুদাত্ত হইবে। অর্থাৎ উদাত্ত স্বরে আরম্ভ এবং অনুদাত্ত স্বরে সমাপ্তি। আরম্ভের পরেই গণকের (কম্পন) মত ভঙ্গ থাকিবে।

এতদ্ভিন্ন আর এক স্বর আছে, তাহার নাম "এক শ্রুতি স্বর" ইহাতে উদাত্তানুদাত্ত স্বরিতের বিভাগ থাকে না। অবিভাগে গীত হয়। দূর হইতে আহ্বান করিবার কালে ও রোদন সময়ে এই "একশ্রুতি" স্বর প্রকাশ পাইয়াথাকে। স্বরিত স্বরটিও এতদ্দ্বারা বুঝিয়া লইবার বিচিত্র নাই।

কথিত আছে যে বৈদিকগান হইতেই লৌকিক গান নির্ম্মিত, তাহা সম্ভব বটে। আদিম কালের ত্রৈস্বর্য্যগান উন্নত হইয়াই ক্রমে উনবিংশস্বর হইয়াছে। —(শুদ্ধস্বর ৭, বিকৃত ১২)। এবং তাহার কোমল তিওর, তদুপরি গমক মূর্চ্ছনাদির পরিপাটী বৃদ্ধি হওয়াতে লৌকিক গান এত মধুর হইয়াছে। পর পর উৎকর্ষ সাধনই হইয়া থাকে।

বৈদিক কালের উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরের কথা এখন আর সঙ্গীতব্যবসায়িদিগের মুখে শুনা যায় না। তাঁহাদের গ্রন্থে ইহার নাম গন্ধও নাই। তাঁহারা গান কালে যে প্রতি নিয়তই উদাত্ত অনুদাত্তের ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহারা জানেন না যে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরটী কিরূপ।

নব্যসঙ্গীত গ্রন্থে উহার নামোল্লেখ না থাকিলেও বৈদিক শিক্ষা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, লৌকিক গানের ৭টিস্বর বৈদিক ত্রিস্বর হইতে লব্ধ অর্থাৎ উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর হইতেই স রি গ ম প ধ নি, এই সপ্ত স্বর গঠিত হইয়াছে।

"উদাত্তৌ নিষাদ-গান্ধারৌ।
অনুদাত্তৌ ঋষভ ধৈবতৌ।
স্বরিত-প্রভবাহ্যেতে—
ষড়জ-মধ্যম-পঞ্চমাঃ॥"

উদাত্ত স্বর লইয়া নিষাদ ও গান্ধার (নি, গ) স্বর গঠিত হইয়াছে। অনুদাত্ত হইতে রি, ধ, অর্থাৎ ঋষভ ধৈবত; আর স্বরিত স্বর হইতে সা, ম, প অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বর উৎপন্ন হইয়াছে।

উদাত্ত=নি—গ। অথবা গ=নি।
অনুদাত্ত=রি—ধ। অথবা ধ=রি।
স্বরিত=সা—ম প। এইরূপ হইবে।

(।) এইরূপ চিহ্নটিতে, উদাত্ত সঙ্কেত, ইহা বেদের মন্ত্রের উপরে থাকে।—এই চিহ্নটী উপরে থাকিলে স্বরিত এবং উহা নিম্নে থাকিলে অনুদাত্ত।

বৈদিক স্বর উচ্চারণ করিবার নিয়ম যথা—

নিখিলা দুহিৎ হুতাশো [illegible]

সমুচ্চারয়েচ্ছ্রুং হস্তেন চ মুখেন চ ॥
যথৈবোচ্চারয়েদ্ বর্ণাং স্তথৈবৈনান্
সমাপয়েৎ। নারদীয় শিক্ষা।

অর্থাৎ হস্তাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া, শাস্ত্রার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, যুগপৎ হস্ত ও মুখ উভয় দ্বারাই উদাত্ত অনুদাত্তাদি ক্রমে উচ্চারণ করিবে। যে ক্রমে বর্ণের উচ্চারণ করিতে হয়, সেই ক্রমেই হস্ত দ্বারা সমাপ্ত করিতে হয়। *

বেদের মন্ত্র গুলি যদি শিক্ষা-কথিত নিয়মে অর্থাৎ উদাত্ত অনুদাত্তগুলিকে স রি গ ম প্রভৃতি সুরে উপনীত করিয়া গান করা যায় তাহা হইলে শুনিতে মন্দ হয় না এবং তাহাকে সপ্তস্বর্য্যগান বলাযায়। এই সপ্তস্বর্য্য গানই লৌকিক গানের বীজ। ত্রিস্বর্য্য গানের পরেই এই সপ্ত স্বরের সৃষ্টি এবং সেই সপ্ত স্বরেই গান হইত। কুশী-লব যখন রাম-সভায় রামায়ণ গান করিয়াছিলেন, তখন তাহা শুদ্ধ সপ্তস্বরেই গীত হইয়াছিল। বিকৃত ১২ স্বর যোগ ছিল কি না সন্দেহ।

বাল্মীকি রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়া কুশীলবকে শিক্ষা দিলে আচার্য্য ভরত তাহাতে স্বর-যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। যথা

মূল—"তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্ব্বা-
চার্য্যবিনির্ম্মিতাম্।"

টীকা—গাথকানাং গান-সিদ্ধয়ে পূর্ব্বা-
চার্য্যেণ ভরতেন নির্ম্মিতাম্।

ককুৎস্থবংশজ রাম সেই অশ্রুত-পূর্ব্ব কাব্য গান শুনিতে পাইলেন, যাহা সঙ্গীতাচার্য্য ভরত নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

এস্থলে দেখিতে হইবে যে বাল্মীকি-রচিত কাব্যকে কবি ভরত-রচিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সুতরাং ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বাল্মীকি-রচিত কাব্যে ভরতের স্বর সন্নিবেশ করা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার নির্ম্মাণ সম্ভবে না।

পুনশ্চ "অপূর্ব্বাং পাঠ্য-জাতিঞ্চ
গেয়েন সমলঙ্কৃতাম্।
প্রমাণৈর্ব্বহুভির্ব্বদ্ধাং তন্ত্রীলয়সমন্বিতাম্।"

টীকা—পাঠ্যজাতিং পাঠ্যস্য গেয়স্য জাতিং ষড়জাদিস্বররূপাম্। গেয়েন গানধর্ম্মেণ স্বরবিশেষেণ সমলঙ্কৃতাং। প্রমাণৈধ্বনি-পরিচ্ছেদসাধনৈঃ দ্রুতমধ্যবিলম্বিতাবৃত্তিভির্ব্বহুভির্ব্বহু প্রকারাভির্ব্বদ্ধতাম্।"

কথিত শ্লোকটির এতাদৃশ ব্যাখ্যায় জানা যাইতেছে যে রামায়ণটি গান ধর্ম্ম যাবৎ স্বরে গীত হইয়াছিল। কিন্তু অন্য এক টীকাকারের ব্যাখ্যায় জানা যায় যে, তাহা ষড়জাদি স্বর ভিন্ন অন্য কোন বিকৃত স্বরের যোগে গীত হয় নাই। কেননা পাঠ্যজাতি শব্দকে গানাধার শব্দরাশি স্বরূপ উচ্চারণ এবং গেয় শব্দে গান ধর্ম্ম ষড়জাদিস্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে দেখা যায়। ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে বাল্মীকির রামায়ণ-কাব্যখানির সহিত ভরতের সম্বন্ধ আছে ইহাতে আর সংশয় নাই;

* আমরা দেখিয়াছি, ইহা এক-প্রকার [illegible] বিশেষ। এই হস্ত নিয়ম হইতেই [illegible] ও ঐক্যতানের সৃষ্টি।

বিকৃত স্বরগুলির ব্যবহার থাকিলেও তৎকাল সে সকলের বিশেষ বিশেষ নাম ও তাহা সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে ধর্ত্তব্য ছিলনা বলিয়াই বোধ হয়।

এইরূপে ত্রিস্বর হইতে সপ্তস্বর এবং সপ্তস্বর হইতে ক্রমে আর ১২ স্বর জন্মিয়া এক্ষণে সংগীতটি পূর্ণাবয়ব হইয়াছে। এক মাত্র ধ্বনি অবলম্বন করিয়া তাহাকে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত প্রভেদ করিবার যে কৌশল, তাহা হইতে সপ্তস্বর এবং সেই সপ্তস্বর হইতে অন্যবিধ ১২ স্বর প্রভেদ করিবারও সেই কৌশল। কৌশল এক হইলেও আদিম মানব হৃদয়ে তাহার সর্ব্বাংশ স্ফূর্ত্তি পায় নাই বলিয়াই একবারে ১৯ স্বরের জন্ম হয় নাই। ইহাও ক্রমে হইয়াছে।

কি প্রকারে এক মাত্র ধ্বনি অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ স্বর ও বিকৃত স্বর নির্ম্মাণ হইয়াছে, তাহা বলা যাইতেছে।

সকলেই জানেন যে, সেতার বা বীণাতন্ত্রীতে আঘাত পাইলেই ধ্বনি উত্থিত হয়, বংশীতে ফুৎকার দিলেও ধ্বনি হয়। এইরূপ দেহদণ্ডের অভ্যন্তর যন্ত্রে আঘাত পাইলেও ধ্বনি হয়। কে আঘাত করে? তাহাতে সংগীত বিজ্ঞানে লিখিত আছে বা নির্ণীত আছে।:—

"আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহ্নিমাহন্তি দেহজম্।
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ॥
পাবকপ্রেরিতঃ সোঽয়ং ক্রমাদূর্দ্ধপথে চরন্॥
অতিসূক্ষ্মধ্বনিং নাভৌ হৃদি সূক্ষ্মং গলেপুনঃ
পুষ্টং শীর্ষেত্বপুষ্টঞ্চ কৃত্রিমং বদনে তথা।

আত্মার প্রযত্ন (উচ্চারণেচ্ছা) বশতঃ দৈহিক তাপ বা উষ্মতা (তড়িত্) কে বেগযুক্ত করে, সেই বেগ উদর কন্দরের বায়ুকে আঘাত বা প্রেরণা করে, তদুভয়ের সংঘর্ষে উদরাকাশে নাদ বা সূক্ষ্ম ধ্বনি উৎপন্ন হয়। সেই ধ্বনি গল-গহ্বরে আসিয়া পুষ্ট (মোটা) বা স্থূল হয় এবং বাগ্ যন্ত্র (জিহ্বা, দন্ত তালু প্রভৃতি) দ্বারা তাহা কৃত্রিম স—রি—গ—ম ইত্যাদি নানা আকারে পরিণত হয়। যেরূপ বংশীর বা সেতারের এক মাত্র সরল ধ্বনিতে বংশীর ছিদ্র চাপিয়া, কি সেতারের পর্দ্দা চাপিয়া চাপিয়া তাহাকে কৃত্রিম (নানা আকার) করা যায়, গল-গহ্বরের ধ্বনিও সেইরূপ নানা আকারে পরিণত করা যায়।

সেতারের তারে আঘাত করিলে যে ধ্বনি হয়, প্রথম সপ্তকের ১ম পর্দ্দা চাপিয়া আঘাত করিলে তদপেক্ষা উচ্চ ধ্বনি হইবে। এই উচ্চতার নাম ওজন। এইরূপ নিয়মে ত্রিস্বরের (উদাত্তাদির) বন্ধন হইয়াছিল। হৃদয়, কণ্ঠ, মূর্দ্ধা, বা নাভি, কণ্ঠ ও তালুর উচ্চতা বা ওজনের জনক বা নিরূপণ স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ ধ্বনির নামান্তর মন্দ্র, মধ্য, তার। এতদনুসারে এক্ষণে উদারা, মুদারা, তারা নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

মন্দ্র অর্থাৎ যে ওজন, মধ্যস্বর তাহার

দ্বিগুণ এবং তারস্বর তাহার দ্বিগুণ। যথা—

"দ্বিগুণঃ— — —পূর্ব্বস্মাদ্বুত্তরোত্তরঃ।"

সঙ্গীত দর্পণ বলেন—

"হৃদি মন্দ্রো গলে মধ্যো।
"মূর্দ্ধ্নি তার ইতি ক্রমাৎ।
দ্বিগুণঃ পূর্ব্ব পূর্ব্বস্মাৎ
অয়ংস্যাদুত্তরোত্তরঃ॥
এবং শারীরবীণায়াং দারুব্যাঞ্চ বিপর্য্যয়ঃ।"

প্রযত্ন দ্বারা উর্দ্ধভাগ চাপিয়া নাভি বা হৃদয়-কন্দর হইতে ধ্বনি বাহির করিলে তাহা মন্দ্র, উর্দ্ধ অধঃ চাপিয়া কেবল গল-গহ্বর বিস্তৃত করিয়া ধ্বনি করিলে তাহা মধ্য, হৃদয় পর্য্যন্ত চাপিয়া (প্রযত্ন দ্বারা) তালু স্থান হইতে ধ্বনি বহির্গত করিলে তাহা তার। ইহারা পর পর দ্বিগুণ-ওজন-যুক্ত কিন্তু কাষ্ঠ-রচিত বীণায় ইহার ব্যতিক্রম জানিতে হইবে। শরীর যন্ত্রের নীচে হইতে উপরে উঠিলে দ্বৈগুণ্য হয় কিন্তু সেতার বা বীণার উপর হইতে নীচে অসিলে তবে তাহার দ্বিগুণিত হইবে।

এক মাত্র খাড়া ধ্বনিকে এইরূপ প্রভেদ করিয়া আদিম কালে ত্রৈস্বর্য্য গান প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্রমে এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া তৎপরবর্ত্তী কালে সপ্তস্বরের সৃষ্টি হয়। যথা কোহলীয় সঙ্গীত গ্রন্থে—

তং নাদং সপ্তধাহকার্ষীত্তথা ষড়্জাদিভিঃ স্বরৈঃ।"

সেই আহত ও অনাহত দ্বিবিধ নাদ নামক ধ্বনিকে ৭ সপ্ত প্রকারে ভেদ করিয়া তাহাতে ষড়্জাদি স্বরের (স—রি—গম—প—ধ—নি—) ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই—ষড়্জাদি স্বরগুলি স্থূল, ইহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ওজন ঘটিত অংশ গুলি শ্রুতি। *

সংগীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, যে নাদাত্মক ধ্বনি হইতে শ্রুতি নির্ণয় করিয়া তাহার দ্বারাই ষড়্জাদি স্বরের শরীর গঠিত হইয়াছে এবং সেই স্বর হইতে মূর্চ্ছনাদির জন্ম হইয়াছে। যথা—

"নাদাচ্চ শ্রুতয়ো জাতা স্ততশ্চ জাদয়ঃ স্বরাঃ।
তেভ্যশ্চ মূর্চ্ছনাঃ প্রোক্তাস্তানাখ্যা গ্রামসম্ভবাঃ॥"

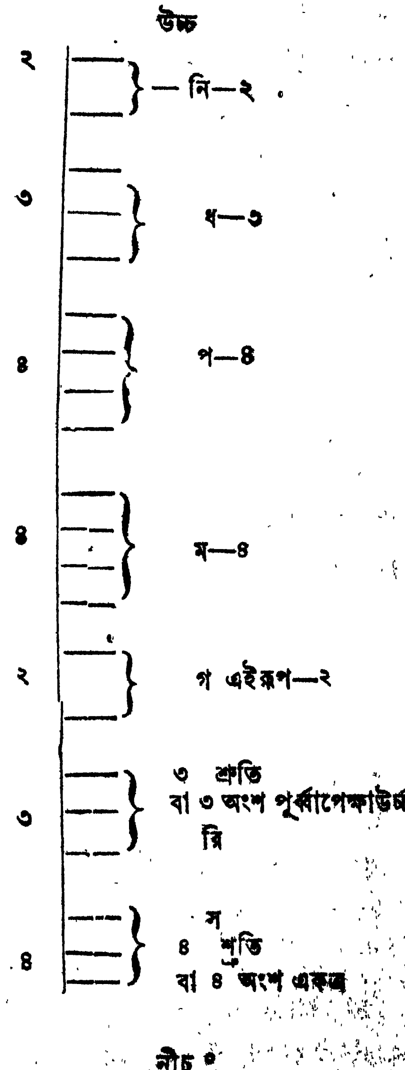
নাদাত্মক ধ্বনি হইতে কিপ্রকারে শ্রুতি জন্মিল এবং শ্রুতি হইতেই বা কি প্রকারে ষড়্জাদি স্বর নির্ম্মিত হইল তাহা সরল ভাবে বলা যাইতেছে।

* শ্রুতি কি? তাহা দেখান যায় না। সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিরা সংগীত অনুশাসন করিতে করিতে তাহা অনুভব করিতে পারেন মাত্র। কারণ তাহা অতি সূক্ষ্ম। স্বরের আয়তনের নহে, ওজনের অংশ। অথবা তাহা শ্রবণ-গ্রাহ্য স্বর-ধর্ম্ম বিশেষ। যথা—

"স্বরূপমাত্র শ্রবণাৎ নাদোঽনুরণনাত্মকঃ।
শ্রুতিরিত্যুচ্যতে ভেদাস্তস্যা দ্বাবিংশতির্ম্মতাঃ॥"

*শ্রবণাৎ শ্রুতিঃ।

যত নীচু হইতে পারে তত নীচু হইতে আরম্ভ করিয়া যত উচ্চ হইতে পারে তত উচ্চ একটি ধ্বনির রেখা কল্পনা করিলে দেখা যাইবে যে ৭ ভাগ ভিন্ন অধিক বা অল্প ভাগ করিলে স্বর-প্রস্তার নির্ম্মাণ করা যায় না। ঠিক সাতভাগ করিলে (উচ্চ উচ্চক্রমে বা আ-রোহ ক্রমে) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতীয় ৭ টি স্ব-র স্থিতি লাভ করে, কিন্তু সেই ৭ স্বর পর-স্পর সমান্তরাল বা উত্তরোত্তর সমগুণিত উচ্চ হয় না। সমান করিতে গেলে ভাল লাগে না বা কোন বিশেষ-জাতীয় স্বর বলিয়া প্রতীতি হয় না। এজন্য উচ্চতা বা ওজনের তারতম্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত অখণ্ড দণ্ডায়মান ধ্বনি-রেখাকে ২২ ভাগ করিয়া তাহার ২। ৩। ৪ অংশ একত্র করিয়া স্বরের ওজন ঠিক করিলে তাহাতে আর কোন গোল হয় না এবং এতদ্দ্বারা এই একটি ফল হয় যে সেই শ্রুতির হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া লইলে সেই সেই স্বর বিকৃত হইয়া এক একটি অভিনব অকারের স্বর (কোমল তীওর প্রভৃতি) হইয়া দাড়ায়, এবং শ্রুতি ১২ সংখ্যক হয়। অত-এব কি মনুষ্যকণ্ঠ কি বীণাতন্ত্র কি অন্য কোন বস্তু-জাত ধ্বনির নীচ হইতে পরাকাষ্ঠাউচ্চতা-যুক্ত ধ্বনি-রেখাকে ২২ অংশ করিয়া ২২ শ্রুতি অবধারিত আছে। এই ২২ শ্রুতিতে ৭ স্বর শুদ্ধ এবং তাহার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া বিকৃত ১২ স্বর রচনা করিবার প্রথা নিম্নলিখিত রেখা দৃষ্টে অনুভব করা যাইতে পারে।



এই সকল শ্রুতির "তীব্রা" "আ-য়ত্তা" ইত্যাদি নাম আছে। তাহা

* এই রেখাটিকে লেভার মনে করিলে উচ্চ স্থানে নীচু ও নীচস্থানে উচ্চ লেখা [illegible]।

উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। "তাভ্যাঃ শ্রুতয় স্বর-রূপেণ জায়ন্তে" সেই সকল শ্রুতি (সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধ্বন্যাংশ) সংযুক্ত হইয়া পুষ্ট ও স্বর রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বস্তুতঃ শ্রুতির ঠিক্ আকার নিরূপণ করা যায় না। সেই জন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে "শ্রুতি স্থানে স্বরান্ বক্তুং নালং ব্রহ্মাপিতত্বতঃ। জলেষু চরতাং মার্গো মীনানাং নোপলভ্যতে॥" অর্থাৎ জলেতে মৎস্য বিচরণের পথ যেমন উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ স্বর মধ্যে শ্রুতি সঞ্চারণ লক্ষ্য হয় না।

২২ শ্রুতিতে ৭ স্বরের গঠন হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন্ স্বরে কত শ্রুতি আছে? তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রমাণ যথা—

সা	৪	
রি	৩	"চতুর্থ্যো জায়ন্তে ষড়্জো
গ	২	মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা। দ্বাভ্যাং
ম	৪	দ্বাভ্যাং গনী জ্ঞেয়ৌ রিধৌচ
প	৪	ত্র্যাত্মকৌ তথা।"
ধ	৩	
নি	২	
২২		

দোহা

"ধরজ মধ্যম পঞ্চম চারি।
দোহো গান্ তার নিখাদ বিচারি॥
রিখব্ ধৈবত তিনো জান।
বাওইস শোরত ব্যাসাই জান॥"

অতএব ৭ স্বর বিশেষ বিশেষ স্থানে উচ্চারিত হয় বলিয়া অর্থাৎ মন্দ্র, মধ্য, তার-স্থান অবলম্বনে উচ্চারিত (উত্থান) হয় বলিয়া ইহার ৩ প্রকার কল্পনা হয়। সে পক্ষ ধরিলে ২১ বিশুদ্ধ স্বর বলা যায়।

যথা—

"শুদ্ধাঃ সপ্ত স্বরাস্তে চ মন্দ্রাদি স্থানতস্ত্রিধা। শুদ্ধাঃ শ্রুত্যাদিভেদেন বিকৃতা দ্বাদশাপ্যমীঃ॥"

(দামোদর)

শ্রুতি অর্থাৎ প্রত্যেক স্বরের সূক্ষ্মাংশ কমবেশী করিয়া লইলে তাহা বিকৃত স্বর। তাহার সংখ্যা ১২। "শ্রুত্যাদি ভেদেন" অর্থাৎ কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্বরের নির্দ্দিষ্ট শ্রুতি ভাঙ্গিয়া লইয়া অন্য এক স্বরে যোগ করিলে তাহা বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয় (তাহা এক্ষণে কোমল তীওর নামে চলিতেছে)। সেই বিকৃত স্বর ১২ টির অধিক হয় না যথা "তএব বিকৃতাবস্থা দ্বাদশ-প্রতিপাদিতা" [সঙ্গীত রত্নাকর]। তন্মধ্যে স ২ প্রকার (চ্যুত, অচ্যুত—ইহার নামান্তর কোমল, তিওর)

রি	১	প্রকার
গ	২	ঐ
ম	২	ঐ
প	২	ঐ
ধ	১	ঐ
নি	২	ঐ

সঙ্গীত রত্নাকর এই বিষয়টি বিশদ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—

"তত্রৈব বিকৃতাবস্থা দ্বাদশ প্রতিপাদিতাঃ।

চ্যুতোঽচ্যুতো দ্বিধা ষড়্জো দ্বিশ্রুতি বিকৃতো ভবেৎ॥
সাধারণে কাকলিত্বে নিষাদস্য চ দৃশ্যতে॥
সাধারণে শ্রুতিং ষাড়্জী মৃষভশ্চেৎ সমাশ্রয়েৎ।
চতুঃশ্রুতিত্বমায়াতি তদৈকো বিকৃতো ভবেৎ॥
সাধারণে ত্রিশ্রুতিঃ স্যাদন্তরত্বে চতুঃ শ্রুতি।
গান্ধার ইতি তদ্ভেদৌ ছৌনিঃ শঙ্গেন কীর্ত্তিতৌ॥
মধ্যমঃ ষড়্জবদ্দ্বেধাঽন্তরঃ সাধারণাঃ শ্রয়াৎ।
পঞ্চমো মধ্যমগ্রামে ত্রিশ্রুতিঃ কৌশিকে পুনঃ॥
মধ্যমস্য শ্রুতিং প্রাপ্য চতুঃ শ্রুতি রিতি দ্বিধা।
ধৈবতো মধ্যম গ্রামে বিকৃতঃ স্যাচ্চতুঃ শ্রুতিঃ॥
কৌশিকে কাকলিত্বে চ নিষাদ স্ত্রি শ্রুতি চতুঃ
প্রাপ্নোতি বিকৃতৌ ভেদৌ দ্বাবিতি দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥
তৈঃ শুদ্ধৈঃ সপ্তভিঃ সার্দ্ধং ভবত্যেকোনবিংশতিঃ॥

এই সকল শ্লোকের সংক্ষেপার্থ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে। ফল, এই শ্রুতিবিকার ঘটিত বিকৃত স্বর গুলি কণ্ঠ-নীতে . সহজবোধ্য নহে। সেতারের পর্দ্দায় ইহা স্পষ্ট বুঝা গিয়া থাকে। যথা-শ্রুত ও যথানিয়ম অনুসারে আবদ্ধ ২৭ খানি পর্দ্দার ত্রিসপ্তকের ২১ খানি শুদ্ধ স্বর দিতে হয়। সাধারণতঃ মূ-চ্ছর্না অর্থাৎ মিড়দিয়া বিকৃতস্বর আনয়ন করা হয়; কিন্তু বিশেষ বিশেষ রাগে পর্দ্দা সরাইয়া (কোমল বা তিওর ক-রিয়া) লইতে হয়। তাহাই এই উল্লিখিত বিকৃত স্বর বুঝিবার প্রধান স্থল। পর্দ্দা সরান দৃষ্ট করিলে প্রতীত হইবে যে সকল পর্দ্দা সমান পরিমাণে অন্তর করা হয় না। কোন্ পর্দ্দা কতখানি অন্তর করিলে ঠিক হইবে তাহা শ্রুতিজ্ঞ ব্যক্তির সুবোধ্য।

উল্লিখিত ১ শ্লোকের অনুসারে স=২ শ্রুতি বিকৃত হইয়া দুই প্রকার হয়। কিন্তু তাহা যথাক্রমে সাধারণ ও কাকলী প্রয়োগের কালে।

১। ২ শ্লোক.........রি—সুর যদি স—সুরের ১ শ্রুতি আপনাতে মিশ্রিত করে তবে তাহা ৪ শ্রুতির রি (তিওর রিখব) হয়। রি এতদ্ভিন্ন অন্য-প্রকার হয় না।

৩। ৪.........গ সুরকেও দুই প্রকার করাযায় (কোমল ও তিওর)। গ নিজে ২ শ্রুতি, পূর্ব্বের শ্রুতি লইলে ত্রিশ্রুতি, প-রের লইলে ৪ শ্রুতি হইয়া যাইতে পারে।

৫ শ্লোক—ম—ষড়জ সুরের ন্যায় ২ প্রকার হয়।

৬।৭ শ্লোকের অনু...... পঞ্চম (মধ্যম গ্রাম) মধ্যমের শ্রুতি লইয়া এবং নিজের

এক শ্রুতি হীন হইয়া ২ প্রকার হয়।

৮। শ্লোকের...... ধ স্বর (মধ্যম গ্রামে) বিকৃত হইয়া ৪ শ্রুতি পরিমাণ হইলে তাহা এক প্রকার বিকৃত স্বর। তিনি নিজে ৩ শ্রুতি। এতাবতা কোমল ধৈবত নাই তিওর ধৈবতই আছে।—

৮।৯ শ্লোকের—— নিস্বর ৩।৪ শ্রুতি (পূর্ব্বের ও পরের) পরিমিত হইয়া ২ প্রকারই হয়।—

সেতারের পর্দ্দায় ইহা উত্তম বুঝা যায়। সেতারের পর্দ্দা গুলিও সম অন্তর বাঁধা নহে। স্বর গুলি সম—অন্তর নয় বলিয়াই পর্দ্দা সকল সমান্তর বাঁধা যায় না। কোন্ কোন্ স্বর ৪ শ্রুতি এবং কোন্ কোন্ স্বর ২।৩ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সেতার

:—স (৪ মাথার)
:—রি (৩ শ্রুতির মাথার)
:—গ (২ মাথার)
:—ম (৪ মাথার)
:—প (৪ মাথার)
:—ধ (৩ মাথার)
:—নি (২ মাথার)
:—সা (৪ মাথার)

পর্দ্দা সরাইয়া বিকৃত (কোমল তিওর) কর—সা নি—স্বরের ১ শ্রুতি ল-ইতে পারে। তাহা অচ্যুত ষড়জ। তীব্র পর্দ্দা খানি সা র দিকে ১শ্রুতি সরাইয়া লইলেই উহা সম্পন্ন হয়। আর এক শ্রুতি ত্যাগ (নিম্ন দিকে) করিলে তাহা চ্যুত ষড়জ। এই রূপে শুদ্ধ ৭ স্বর, তৎপরে তাহার বিকার ১২ স্বর, সমুদায়ে ১৯স্বর, গীত হইত। তৎপরে ক্রমে রাগ রাগিণীর সৃষ্টি। রাগ রাগিণী আর কিছুই না কেবল উল্লিখিত স্বর শ্রেণীকে ছন্দঃ ও অলঙ্কারাদির দ্বারা এক একটি আকৃতি নির্ম্মাণ করা। তাহা কর্ণে প্রবেশ করিলে মন মোহিত হয় ও অনুরক্তি জন্মে বলিয়া রাগ নাম হইয়াছে।

এইস্বরের মধ্যে আবার ৪ প্রকার ভেদ আছে। বাদী (১) সংবাদী (২) বিবাদী (৩) অনুবাদী (৪) যথা—

তে বাদি-সম্বাদি-বিবাদ্যনুবাদ্য স্ত্রিধাঃ
পুনঃ।
স্বরাশ্চতুর্বিধাঃ প্রোক্তাস্তত্র স বাদী
কথ্যতে॥
প্রচুরো যঃ প্রয়োগেষু রক্তি রাগাদি-
নিশ্চয়ম্
সমশ্রুতিশ্চ সম্বাদী শঙ্কনস্য সমঃ
ক্বচিৎ॥
গণী বিবাদিনৌ স্যাতাং রিধয়ো র্বাতু
তৌ তয়োঃ।
অনুবাদী ভবেচ্ছেষ ইতি পণ্ডিত-
সম্মতম॥

অর্থাৎ গীত প্রয়োগ সময়ে যে স্বরের প্রাচুর্য্য হেতুক রাগের বোধ হয়, তাহা বাদী স্বর। পঞ্চমের সম শ্রুতি স্বর সম্বাদী। ইহা কদাচিৎ নাও হয়। গান্ধার আর নিষাদ, ঋষভ ও ধৈবতের

বিবাদী; এইরূপ ঋষভ ও ধৈবতের, গান্ধার আর নিষাদ বিবাদী। এতদ্ভিন্ন সমস্তই অনুবাদী।

(এই নিয়ম মধ্য কালের-নায়ক ও কলাবৎদিগের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। বিবাদী স্বর লাগিলে রাগ নষ্ট হয় বা গানের রস ভঙ্গ হয় দেখিয়াই এই বিজ্ঞান টুকু বাহির করা হইয়াছে।)

সংগীতনাভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করেন যে, উচ্চ উচ্চ স্বর হইলেই উচ্চ উচ্চ গ্রাম হয় বস্তুতঃ তাহা নহে, গ্রামের একটু নিয়ম আছে। সংগীত-দর্পণ-কার তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। যথা—

স্বরাণাং সুব্যবস্থানাং সমূহো গ্রাম উচ্যতে।

তত্রচ

পঞ্চশ্চেন্নির্বিকারী ষড়জগ্রামস্তদোচ্যতে।

সোপান্ত-শ্রুতি-সংস্থোয়ং গ্রামঃস্যান্মধ্যমস্তথা॥

দর্পণ-কার বলেন—

গ্রামঃ স্বর-সমূহঃ স্যান্মূর্চ্ছনাদেঃ সমাশ্রয়ঃ।

তৌ দ্বৌ ধরাতলে তত্র স্যাৎ ষড়জ গ্রাম আদিমঃ॥

দ্বীতয়ো মধ্যগ্রাম স্তয়ো র্লক্ষণ মুচ্যতে।

ষড়জগ্রামঃ পঞ্চমে চ চতুর্থশ্রুতিসংস্থিতে॥

স্বোপান্তশ্রুতি সংস্থেঽস্মিন্ মধ্যম-গ্রাম ইষ্যতে।

রিমযোঃ শ্রুতিমেকৈকাং গান্ধারশ্চেৎ সমাশ্রয়েৎ।

ধধাধশ্রুতিষড়জো মধ্যম স্চাপি ত্রিশ্রুতিঃ।

পশ্চ বৈকশ্রুতিং নিদ্বিশ্রুতী সেকশ্রুতিংশ্রিতঃ।

গান্ধারগ্রামমাচষ্টে তদা তং নারদো মুনিঃ।

প্রবর্ত্ততে স্বর্গলোকে গ্রামোঽসৌ ন মহীতলে।

অর্থ—মূর্চ্ছনাদির আশ্রয়ভূত স্বর সমূহের নাম গ্রাম। তন্মধ্যে ধরাতলে ২ গ্রাম, আদিম ষড়জ গ্রাম, ২ য় মধ্যম গ্রাম। এই দুইয়ের লক্ষণ উক্ত হইতেছে। যথা পঞ্চম শ্রুতিতে থাকিলে অর্থাৎ নির্বিকার থাকিলে তদ্ঘটিত স্বর সমূহ, ষড়জ গ্রাম, আর সেই পঞ্চম উপান্ত-শ্রুতিস্থ হয়, তবে তদ্ঘটিত স্বর সমূহ মধ্যম গ্রাম।

রি ও ম স্বরের এক এক শ্রুতি যদি গস্বরের আশ্রিত হয়, কিম্বা ধ ৩ শ্রুতি, ষড়জ ও মধ্যম ও ত্রিশ্রুতি, নি ২ শ্রুতি নি র ১ শ্রুতির আশ্রিত হয় তবে তাহা গান্ধার গ্রাম। নারদ বলেন ইহা স্বর্গলোকে প্রচলিত।

স্বর ও স্বর গ্রামের নির্ণয়ান্তর মূর্চ্ছনার জন্ম। মূর্চ্ছনা প্রতি গ্রামে অবলম্বিত সাত সাতটি। ক্রম বদ্ধ করিয়া স্বর সমূহের আরোহণ, অবরোহণ রূপ বিকারের নাম বা গতির নাম মূর্চ্ছনা। সেতার ও বীণা যন্ত্রে যে মূর্চ্ছনা ব্যবহৃত হয় তাহা এক্ষণে "মিড়" নামে কথিত

হইয়া থাকে। কোহলীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার বিবরণ বিশেষ-রূপে দৃষ্ট হয়। যথা—

সপ্তৈর মূর্চ্ছনাশ্চাত্র প্রতিগ্রামং প্রকীর্ত্তিতাঃ।
আদি দ্বিত্রিচতুঃ পঞ্চ ষট্ সপ্তস্বপি তা মতাঃ॥
ষড়জাদিনিষাদপর্য্যন্তং নিষাদাদ্ধৈবতান্তকম্।
ধৈবতাৎ পঞ্চমান্তন্ত পঞ্চমান্মধ্যমান্তকম্॥
ঋষভাৎ সান্তমিত্যাহুঃ ষড়জগ্রামস্য মূর্চ্ছনাঃ॥

অস্যোদাহরণানি

স রি গ ম প ধ নি, নি স রি গ ম প ধ, ধ নি স রি গ ম প, প ধ নি স রি গ ম, ম প ধ নি স রি গ, গ ম প ধ নি স রি, রি গ ম প ধ নি স।

অর্থ—সঙ্গীতে প্রতি গ্রামে সাতটি মূর্চ্ছনা কথিত আছে। তাহা প্রথম, দ্বি, ত্রি, চতুঃ, পঞ্চ, ষট্ ও সপ্ত স্বরে অনুগত। ষড়জ হইতে নিষাদ পর্য্যন্ত—নিষাদ হইতে ধৈবত পর্য্যন্ত—ধৈবত হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত—পঞ্চম হইতে মধ্যম পর্য্যন্ত—মধ্যম হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত—গান্ধার হইতে ঋষভ পর্য্যন্ত—ঋষভ হইতে পুনরপি সা পর্য্যন্ত। এইরূপ স্বর-চালনাত্মক মূর্চ্ছনাকে ষড়জ গ্রামের মূর্চ্ছনা বলে। উপরের লিখিত উদাহরণ দেখ।

অনন্তর মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

অথোচ্যন্তে পুরোধায় মধ্যমগ্রাম-মূর্চ্ছনা।
মাদ্গান্তং গাচ্চর্ষভান্তং ঋষভাৎ সান্ত-মিষ্যতে॥
সাদ্যন্তং নে ধৈবতান্তং ধাৎ প্রান্তং পাচ্চ মান্তকম্।

অস্যোদাহরণানি।

ম প ধ নি স রি গ, গ ম প ধ নি স রি, রি গ ম প ধ নি স, স রি গ ম প ধ নি, নি স রি গ ম প ধ, ধ নি স রি গ ম প, প ধ নি স রি গ ম।

অর্থ—এক্ষণে অগ্রে উদাহরণ স্থাপনা করিয়া মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা বলিতেছি। ম হইতে গ পর্য্যন্ত, গ হইতে রি পর্য্যন্ত, রি হইতে সা পর্য্যন্ত, সা হইতে নি পর্য্যন্ত, নি হইতে ধ পর্য্যন্ত, ধ হইতে প পর্য্যন্ত, প হইতে ম পর্য্যন্ত। এইরূপ স্বরক্রিয়াঘটিত মূর্চ্ছনা মধ্যম-গ্রামীয় মূর্চ্ছনা। উপরের লিখিত উদাহরণ দেখ। গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা লৌকিক গীতের অনুপযোগী, এবিষয়ে তাহার উদাহরণ প্রাচীন গ্রন্থকারেরা স্পষ্ট করিয়া প্রদান করেন নাই। "প ম প ধ নি সরীতি গান্ধার গ্রাম মূর্চ্ছনা" এইরূপ সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন।

অপিচ সঙ্গীত শাস্ত্রে এই স্বর মূর্চ্ছনার নাম কল্পনা করা আছে। যথা—

"ললিতা মধ্যমা চিত্রা রোহিনী চ সপ্তরূপা।
সৌবীরা মধ্যমধ্যাচ ষড়জ-মধ্যাচ পঞ্চমী॥
মৎসরী মৃদুমধ্যাচ [illegible] কলাবতী।

তীব্র-রৌদ্রী তথা ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী
খেচরা-চরা।
সদাবতী বিশালাচ ত্রিষু গ্রামেষু
মূর্চ্ছনা ॥
একবিংশতি রিত্যুক্তা মূর্চ্ছনা শচন্দ্র-
মৌলিনা ॥

ইহার অর্থ সহজ, মূর্চ্ছনার নাম ভিন্ন অন্য কিছু নাই। এই এক বিংশতি মূর্চ্ছনা প্রধান, ইহা ভিন্ন বহুতর মূর্চ্ছনার উল্লেখ আছে।

কোহল-কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ অপেক্ষা সঙ্গীত-দর্পণে কিছু এই সকল বিষয়ের বৈশদ্য দেখা যায়। ভারতবর্ষে এক সময়ে সঙ্গীত ও সংস্কৃত ভাষার কি পর্য্যন্ত চর্চ্চা হইয়াছিল তাহা বোধগম্য করাইবার নিমিত্ত দর্পণোক্ত মূর্চ্ছনা-নিয়ামক কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ক্রমাৎ স্বরাণং সপ্তানামারোহশ্চাব-
রোহণম্।
মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামত্রয়ে তাঃ সপ্ত
সপ্ত চ ॥
স্থান-ত্রয়-সমাযোগে মূর্চ্ছনারম্ভসম্ভবঃ ॥
তত্র মধ্যস্থ-ষড়্জেন ষড়্জ-গ্রামস্য
মূর্চ্ছনাঃ ॥
পূর্ব্বমারভ্যতে নেস্ত নিষাদাদ্যৈরধ-
স্তনৈঃ।
মধ্য-মধ্যম মারভ্য মধ্যমগ্রাম মূর্চ্ছনাঃ ॥
আদ্যা নেস্ত দধোধস্তঃ স্বরানারভ্য ষট্
ক্রমাৎ।
ষড়্জেতুত্তর-মন্দ্রাদ্যা রজনী চোত্তরা-
য়তা ॥
শুদ্ধষড়্জা মৎসরী কৃতাশ্বক্রান্তাভিরু-
দগতা।
সৌবেরী মধ্যমগ্রামে হারিণাশ্বা ততঃ-
পরম ॥
স্যাৎ কলোপলতা শুদ্ধা মধ্যমার্গীচ
সৌরবী।
হৃষ্টকা সপ্তমী প্রোক্তা মূর্চ্ছনেত্য-
ভিধা ইমাঃ ॥
নন্দা বিশালা সুমুখী বিচিত্রারোহিণী
সুখা।
আলাপাচেতি গান্ধার-গ্রামে স্যুঃ সপ্ত
মূর্চ্ছনাঃ ॥
পৃথক্ চতুর্বিধাঃ শুদ্ধাঃ কাকলীকলিতা-
স্তথা।
যদা নিষাদ-সংজ্ঞেকঃ শ্রুতি-দ্বন্দ্বং
সমাশ্রয়েৎ।
তদূর্দ্ধমাষ্য কাকলী তদা সা কথ্যতে
বুধৈঃ ॥
যদাশ্রয়তি গান্ধারো মধ্যমস্য শ্রুতি-
দ্বয়ম্।
তদাসাবন্তরঃ প্রোক্তো মুনিভির্ঋতু-
সন্ধিবৎ ॥
মূর্চ্ছনায়াং যাবত্তিথৌ ভবেতাং ষড়্জ-
মধ্যমৌ।
গ্রাময়ো স্তাবত্তিথ্যেব মূর্চ্ছনা সা প্রকী-
র্ত্তিতা ॥
প্রথমাদি স্বরারম্ভাদেকৈকা সপ্তধা
ভবেৎ।
আদ্যুচ্চার্য্যান্ত্যস্বরান্ তান্ পূর্ব্বাদ্যুচ্চা-
রয়েৎ ক্রমাৎ ॥

তে ক্রমাঃ কথিতা স্তেষাং সংখ্যা নেত্রাঙ্করামতঃ ॥

নেত্রাঙ্ক রাম অর্থাৎ ৩১৯।

পূর্ব্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তদ্দ্বারাই এই সকল শ্লোক গতার্থ হইয়াছে। সুতরাং ইহার আর বাঙ্গালানুবাদ দিলাম না। ফল,

"যত্র স্বরো মূর্চ্ছিত এব রাগতাং
প্রাপ্তশ্চ তামাহ অতশ্চ মূর্চ্ছনাম।
গ্রামোস্তবাস্তৎ স্বর-সম্প্রযুক্তা স্তানা
ভবেয়ুঃ পুনরেকবিংশতিঃ।

যেহেতু স্বর সকল মূর্চ্ছিত অর্থাৎ বর্দ্ধিত ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়াই রাগভাব প্রাপ্ত হয়, এই হেতু ইহার নাম মূর্চ্ছনা। আবার এইরূপ স্বর প্রয়োগের প্রভেদ হইতেই তানের উৎপত্তি, এবং তাহারও সংখ্যা প্রধানতঃ ২১ একবিংশতি।

ক্রমে সুরের তরঙ্গ হইতে তানের জন্ম। এই তান দ্বিবিধ। শুদ্ধ ও মিশ্র। তাহারই ভেদ অপূর্ণ তান ও পূর্ণ তান।

যদাতু মূর্চ্ছনাঃ শুদ্ধাঃ ষাড়বৌড়বিতীকৃতাঃ।
তদাতু শুদ্ধতানাখ্যাঃ মূর্চ্ছনাশ্চাত্র ষড়্জগাঃ ॥
সপ্ত-ক্রমাৎ যদা হীনাঃ স্বরৈঃ সরিপসপ্তমৈঃ।
তদাষ্টাবিংশতি স্তানাঃ ষাড়বাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

অর্থ—মূর্চ্ছনা যখন শুদ্ধ থাকে, ষাড়ব ঔড়ব করা হয় তখনই শুদ্ধ তান এবং এই শুদ্ধ তানে ষড়জ-গামিনী মূর্চ্ছনা থাকে। ক্রমে স রি গ ও সপ্তম স্বর দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া তাহার সংখ্যা অষ্টাবিংশতি হয়। এই ২৮ ষাড়ব তান।

যদা তু মধ্যমগ্রামে মূর্চ্ছনা, সরিগোজ্ঝিতাঃ।
সপ্ত ক্রমাৎ যদা তানা স্তদাস্বেক বিংশতিঃ ॥

মর্ম্মার্থ।

যখন মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা সরি গ বর্জ্জিত হয় তখন ক্রম অনুযায়ী ২১ তান হয়।

একমেবোনপঞ্চাশন্মিলিতাঃ ষাড়বা মতাঃ।
সপাভ্যাং দ্বিশ্রুতিভ্যাঞ্চ রিধাভ্যাং সপ্তবর্জ্জিতাঃ ॥
ষড়্জগ্রামে পৃথক্ তানা এক-বিংশতি-রৌড়বাঃ।

মর্ম্মার্থ। ষাড়ব তান একুনে ৪৯। স প ও দ্বিশ্রুতি স্বর রি ও ধ দ্বারা সপ্তম হীন করিলে ষড়জ গ্রামের ভিন্নবিধ ঔড়ব তান হয়। তাহার সংখ্যাও ২১।

ত্রিশ্রুতিভ্যাং দ্বিশ্রুতিভ্যাং মধ্যম-গ্রাম-মূর্চ্ছনাঃ।
যদা হীনা স্তদা তানাশ্চতুর্দ্দশ-সমীরিতাঃ ॥
ঔড়বা মিলিতাঃ পঞ্চ ত্রিংশৎ গ্রামদ্বয়ে স্থিতা ॥
সর্ব্বে চতুরশীতিঃ স্যুর্মিলিতাঃ ষাড়বৌড়বাঃ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। ৩ শ্রুতি ও ২ শ্রুতি দ্বারা যখন বর্জ্জিত করা হয়, তখন তাহাতে ১৪ তান উদ্ভব। একুনে ৩৫ তান। এইরূপে ২ গ্রামেতে ৮৪ টি শুদ্ধ তান আছে।

অসম্পূর্ণাশ্চ সম্পূর্ণা ব্যুৎক্রমোচ্চারিতাঃ স্বরাঃ।

মূর্চ্ছনাঃ কূটতানাঃ স্যুরিতিশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ।

তাৎপর্য্য—ব্যুৎক্রমে (উলটা দিক্ থেকে—উপর থেকে নীচে) উচ্চারিত স্বর শ্রেণী অসম্পূর্ণ বা সম্পূর্ণ রূপের মূর্চ্ছনা-যুক্ত হইলে গীত শাস্ত্রের নির্ণয় এই যে তাহাই কূট তান।

পূর্ণাঃ পঞ্চসহস্রানি চত্বারিংশ-যুতানি চ।

একৈকস্যাং মূর্চ্ছনায়াং—

এক এক মূর্চ্ছনাতে ৫০৪০ পাঁচ হাজার চল্লিশটি করিয়া পূর্ণ তান আছে, অপূর্ণ তান ইহার অনেক অধিক। ফল তান অসঙ্খ্য।

প্রধান মূর্চ্ছনার নাম। ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিণী, মতঙ্গজা, সৌবীরা, মধ্যমধ্যা ষড়্জমধ্যা, পঞ্চমী, মৎসরী, মৃদুমধ্যা, শুদ্ধান্তা, কলাবলী, তীব্রা, রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, খেচরী, চরা, নদাবতী, বিশালা, (২১)

স্থায়ি প্রভৃতি বর্ণ।

কাব্যে যেমন স্থায়ী ভাব সঞ্চারী ভাব প্রভৃতি আছে, গান মধ্যেও তাহা আছে। কাব্যের যেমন রস আত্মা, গানেরও তদ্রূপ। সুতরাং গান-কার্য্যেও স্থায়ী আদি লক্ষণ আছে।

বর্ণদ্বারা গান-ক্রিয়া উক্ত হয়, সেই বর্ণ ৪ প্রকার নিরূপিত আছে। স্থায়ী, অবরোহী, আরোহী, ও সঞ্চারী। যথা—

গান-ক্রিয়োচ্যতে বর্ণৈঃ স চতুর্দ্ধা নিরূপিতঃ।

স্থায্যারোহ্যবরোহীচ সঞ্চারীত্যথ লক্ষণম্॥

স্থায়ীবর্ণের লক্ষণ এই যে,

স্থিত্বা স্থিত্বা প্রয়োগঃ স্যাদেকৈকস্য স্বরস্য যঃ।

স্থায়ী বর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবন্বর্থনামকৌ॥

এতৎসম্মিশ্রণাদ্বর্ণঃ সঞ্চারী পরিকীর্ত্তিতঃ॥

থাকিয়া ২ এক এক স্বরের প্রয়োগ হইলে তাহা স্থায়ী বর্ণ বলিয়া জান। আরোহী ও অবরোহী বর্ণের লক্ষণ এই যে উহার যেমন নাম তেমনি অর্থ (অর্থাৎ কার্য্যেও আরোহী অবরোহী)। ইহা মিশ্রিত করিয়া লইলে তাহা সঞ্চারী নামে কথিত হয়।

স্থায়ী বর্ণের আর একটি স্পষ্ট লক্ষণ আছে তাহা এই—

যত্রোপবিশ্যতে রাগঃ স্বরঃ স্থায়ী স কথ্যতে।

রাগটি যে আকারে বা যাহাতে উপবেশন করে সেই স্বর স্থায়ী নামে উক্ত হয়।

গ্রহাদি

গীতাদৌ স্থাপিতা যস্তু স গ্রহস্বরউচ্যতে।

ন্যাসস্বরস্তু বিজ্ঞেয়ো যস্তু গীত-সমাপিকা।

বহুলত্বং প্রয়োগেষু স অংশস্বর উচ্যতে।

অর্থাৎ গীতের প্রারম্ভে যে স্বর স্থাপনা করা যায় তাহাই গ্রহস্বর। যে

স্বরে গিয়া গীতটি সমাপ্ত হয় তাহাকে ন্যাসস্বর এবং প্রয়োগ কাল মধ্যে যে যে স্বর প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে অংশস্বর বলে। আবার কাব্যের ন্যায় গানেও অলঙ্কার আছে। গানের অলঙ্কার কি তাহা গীতানভিজ্ঞদিগের বোধগম্যের নিমিত্ত এস্থলে তাহার আংশিক লক্ষণ ব্যক্ত করিতেছি।—

বিশিষ্ট-বর্ণ-সন্দর্ভমলঙ্কারং প্রচক্ষতে।
একৈকস্যাং মূর্চ্ছনায়াং ত্রিষষ্টিরুদিতা বুধৈঃ॥

বিশেষ ২ বর্ণ (স্থায়ি প্রভৃতি) সন্দর্ভের নাম অলঙ্কার। সংগীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে এক এক মূর্চ্ছনাতে ৬৩টি করিয়া সেই সন্দর্ভ অর্থাৎ অলঙ্কার আছে।

অলঙ্কারের প্রস্তরে অর্থাৎ সাজান নিয়মের নিদর্শন স্বরূপ একটি উদাহরণ এই :—
সরি সরি গ, রিগ রিগ ম, গম গম প, মপ মপ ধ, পধ পধ নি, ধনি ধনি স। স স রি রি গ গ ম ম প প ধ ধ নি নি স স।

(এইটি দ্বিতীয়)

এইরূপ স্বর-প্রস্তরের নাম অলঙ্কার। কলাবতেরা ইহা অত্যধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। অলঙ্কারের অত্যধিক ব্যবহারে কি মনুষ্য, কি কাব্য, কি সঙ্গীত কাহারও শোভা থাকে না।

শ্রীরামদাস সেন।

ম্যাটসিনি ও নব্য ইতালী।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

দ্বাদশ অধ্যায়।

"নব্য ইতালী" পত্রিকায় ম্যাট্‌সিনি-লিখিত প্রবন্ধ গুলি ভিন্নও অন্যান্য সভ্য-লিখিত অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাধা, বিপত্তি, উৎপাত ও নির্বাসনের মধ্যেও নব্য ইতালী সমাজের সভ্যগণের লেখনী অপ্রতিহত ছিল। ম্যাট্‌সিনির ভিন্ন অন্যান্য সভ্যগণের যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—

"জেকোপো রুফিনি লিখিত—"মধ্যেকার সারী নরপতির নিকট কৃত বিশ্বাসঘাতকতা-বিষয়ক শপথ"; পিট্রো জিয়ানোনি-লিখিত—"য়ুনা বেরিটাস্"; গুইসেপি-লিখিত—"ইংলিস নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী"; টাইথীরিয়ো-লিখিত—"রোমীয় চর্চ্চের অধীনস্থ ষ্টেট্ সকলের রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ"; লুইগি আমেডিও মেলগারি লিখিত দুইটী প্রবন্ধ—একটী "পোপীয় গবর্ণমেণ্ট" সম্বন্ধে, অপরটী "১৮৩১ খৃষ্টাব্দের অভ্যুত্থান কালে মধ্যবিত্ত দল (Moderates) কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ভ্রমপ্রমাদ" বিষয়ে; ইলিয়া বেনজা লিখিত—"বিপ্লববিষয়িণী

চিন্তা” বিয়োনারোত্তি-লিখিত—“বিপ্লব-কালে লৌকিক শাসনপ্রণালী” পেয়োলো পলিয়া-লিখিত “ইতালীয় ধর্ম্মোপজীবীর চিন্তা” কুন্‌সিনি-লিখিত—“লম্বার্ডীতে অষ্ট্রিয়া।”

ইতালীয় যুবকমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধগুলি নব্য ইতালী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্নও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিত হয়;—তন্মধ্যে মডেনা লিখিত “সংক্ষিপ্ত কথোপকথনাবলীই” অতি উৎকৃষ্ট। এতদ্ব্যতীত বৈদেশিক লেখকগণের রচনার অনুবাদ, এবং প্রাদেশিক উত্তেজনার জন্য প্রাদেশিক পত্রিকাও প্রকাশিত হইত। প্রাদেশিক পত্রিকা গুলির মধ্যে লিউগেনোনগরে শুদ্ধ লম্বার্ডগণের উদ্দেশে প্রকাশিত “ট্রিবিউন” পত্রিকাই বিশেষ-উল্লেখ-যোগ্য।

ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের পরিশ্রমের ফল এতদিনে ফলিতে আরম্ভ হইল। জাতীয় স্বভাবজ্ঞান উদ্বোধিত হইল। ইতালীর প্রত্যেক প্রদেশের যুবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিশেষ উৎসাহের সহিত বৈপ্লবিক একতা বীজ-স্বরূপ গৃহীত হইল।

প্রিন্স কানোজা, সাম্বিনিয়াত্তেলী, এবং “ভয়েস্ দেলা ভেরিতা” নামক পত্রিকার সম্পাদক প্রভৃতি যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির প্রতিপোষকগণ ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের বিরুদ্ধে একবারে লিখিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অযৌক্তিক ও নিষ্ঠুর আক্রমণে ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের ক্ষতি না হইয়া বরং বন্ধুসংখ্যাই বাড়িতে লাগিল।

মেতার্নিক্ নব্য ইতালী সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা পুস্তিকাদির বহুমূল্যতা উপলব্ধি করিলেন এবং উপলব্ধি করিয়া মিলানের মেন্‌জকে লিখিলেন যে “আমি নব্য ইতালী পত্রিকার দুইটী পূর্ণ সংখ্যা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি; শুনিলাম ইহার পাঁচ খণ্ড বাহির হইয়াছে। আমি গেরিল। যুদ্ধপ্রণালী-বিষয়ক পত্রিকা খানির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি”।

অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ সকল ক্রমে নব্য ইতালী সমাজের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। কার্লো বিয়াঙ্কোর অধিনেতৃত্বাধীনে “আপোফাসিমেনি” (Apofasimeni) নামক সমাজ নব্য ইতালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইল; কার্লো বিয়াঙ্কো স্বয়ং নব্য ইতালী সমাজের কমিটির সভ্য হইলেন।

“ভেরি ইতালিয়ানি” নামক সমাজ—যাহা এখন পর্য্যন্তও রাজতন্ত্র-পক্ষপাতী হয় নাই—নব্য ইতালী সমাজের সহিত সম্মিলন-প্রার্থী হইল। এবং প্রাচীন কার্ব্বোনারো সম্প্রদায়ের অবশেষ সকল ক্রমে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

যে উদার নেতা কার্ব্বোনারিদলকে ক্যারিগ্নান লুই ফিলিপের রাজত্বকালে

একটী শক্তিরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, এবং যিনি জর্ম্মাণী ও অন্যান্য দেশের গুপ্ত সমাজ সকলের ভক্তিভাজন ও পত্রপ্রেরক ছিলেন, সেই বোনারতিই (Buonarroti) ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের সহিত বন্ধুভাবে ও নিয়মিত রূপে চিঠি পত্র লেখালিখি করিতে লাগিলেন।

বোনারত্তির ন্যায় নবপ্রতিষ্ঠাপিত ফরাশি সাধারণতান্ত্রিক সমাজ-সকলের প্রধান প্রধান সভ্যগণ এবং ট্রিবিউন ও ন্যাসানেল পত্রিকার সাহসী সম্পাদকদ্বয় প্রভৃতি নব্য ইতালী সমাজের সভ্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন। বিখ্যাত-নামা লাফেতী ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতিকে উৎসাহবাক্য প্রেরণ করিলেন এবং স্বেচ্ছা নির্ব্বাসিত পোলিসগণের অধিনায়কগণও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

ক্রমে ইতালীয় উন্নতি-উপাদান ইউরোপের অনেক স্থলে প্রকৃত উন্নতি-সাধক বলিয়া পরিগৃহীত হইল। এদিকে ইতালীয়গণ ভয়ে ব্যক্ত করিতে না পারুন, অন্ততঃ অন্তরে সকলেই নব্য ইতালী সমাজের মতের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগের মধ্যে নব্য ইতালী সমাজ—লম্বার্ডী, জেনোয়া, টস্‌কানী ও পোপের রাজ্যে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। টস্‌কান্‌ ক্ষেত্রে বিশেষরূপে, গোয়েরাট্‌জি, বিনি, এবং এন্‌রিকো মেয়ার অতিশয় কার্য্যতৎপর ছিলেন। পাইসা, সীনা, লুকা, এবং অরেন্‌স-স্থিত শাখাসমাজসকলও তাঁহাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল। এন্‌রিকো মেয়র নব্য ইতালী সমাজের দূতরূপে রোমে গমন করেন; তথায় তিনি কেবল সন্দেহমাত্রে কারারুদ্ধ হন। অবশেষে কিছুদিন পরে কারামুক্ত হইয়া তিনি মার্সেলিসে ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের সহিত মিলিত হন ম্যাট্‌সিনির যত বন্ধু ছিলেন, তন্মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম তদ্গত-প্রাণ ও তৎপ্রতি অকৃত্রিম-স্নেহপরায়ণ ছিলেন।

অধ্যাপক পলো কর্সিনি, মণ্টেনেলি, সিনেটর কার্লো মজিইসি, মন্ত্রিপুত্র সেস্পেনি প্রভৃতি অসংখ্য সম্ভ্রান্ত লোক লেগ্‌হরণ সভায় সহযোগিতা করিতে লাগিলেন।

পোমার্ডাবেসী অষ্ট্রীয় কমিটির অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। রোম্যাগ্‌নায় যাঁহারা—ধনে ও রাজসম্মানে অতি উচ্চপদবীস্থ, -তাঁহারাই তৎকালে ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের দলপুষ্ট করিতে লাগিলেন। বলোনার শ্রমজীবীরাও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

রোমেও একটী কমিটি সংস্থাপিত হইল। নেপল্‌সে কার্লো পীরিও, বেলিনি, লিয়োপার্ডি ও তাঁহার বন্ধুগণ একটী স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা নব্য ইতালী সমা-

জের দূতগণের দ্বারকত ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহারা প্রয়োজন হইলেই তাঁহাদিগের সহিত সহকারিতা করিতে প্রস্তুত আছেন; এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত সাঙ্কেতিক ভাষায় চিঠিপত্র লেখালিখি করিতে লাগিলেন।

জেনোয়ার শুদ্ধ বণিক্‌-সম্প্রদায়ের যুবকগণ নহেন, ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদিগকে একটী সংঘাত শক্তিসমষ্টি বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

পীড্‌মণ্টে সভার কার্য্য কিঞ্চিৎ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু ইহার শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকেই বিস্তারিত হইয়া পড়িল। অধিক কি কানাভীজের সাহসিক অধিবাসীগণও ক্রমে এই সভার সভ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠিলেন।

আরও অনেক পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত লোক—যাঁহাদিগের নামের তালিকা এখানে দেওয়া অনাবশ্যক—তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইতে লাগিলেন যে যদি তাঁহারা বিশেষ পারদর্শিতা ও বীর্য্যবত্তার সহিত বিপ্লবকার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা নানা প্রকারে তাঁহাদিগের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

করায়ত্ত উপাদান-সামগ্রীর উপর নির্ভর করিয়া, "যড়যন্ত্রী" ও "প্রচারক" এই উভয় গ্রন্থের সমকালীন উদ্যাপনের বিপদ্ ভাবিয়া, এবং বিলম্বে পরিকল্পনার বিস্তু- সাহবহ্নি নির্ব্বাণজলাভিষেচনে পাছে নির্ব্বাপিত হয় এই আশঙ্কায়, নব্য ইতালী সমাজ আশু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন।

সার্ডিনীয় রাজ্য বৈপ্লবিক সেনাকে আলেসাণ্ড্রিয়া ও জেনোয়া নামক স্থানকে বিপ্লব-কেন্দ্র করিতে অনুমতি দিলেন। এই দুই স্থানেই আবার নব্য ইতালী সমাজের সভ্য শ্রেণীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল; সুতরাং তাঁহাদিগের কার্য্যের অনেক সুবিধা হইল। কাহারও কাহারও মতে এই বিপ্লব-কেন্দ্র মধ্যস্থলে হওয়া উচিত ছিল। ম্যাট্‌সিনি বলেন মধ্যস্থলকে বিপ্লবকেন্দ্র করা সহজ হইত বটে, কিন্তু তাহাতে সাহায্য পাইবার আশা অতি অল্প ছিল। এই জন্য ম্যাট্‌সিনি ও সহচরবৃন্দ সার্ডিনিয়া রাজ্যে সর্ব্ব প্রথমে বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিতে, এবং জেনোয়া ও আলেসাণ্ড্রিয়া নামক নগরদ্বয়কে বৈপ্লবিক কেন্দ্র করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

তাঁহারা সৈনিকগণের হৃদয় পরীক্ষা করিলেন। উচ্চপদবীস্থ সৈনিক পুরুষেরা তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নিম্নস্থ সৈনিকেরা ইতালীতে একটী অখণ্ড সাধারণতান্ত্রিক একতা প্রার্থনীয় বোধে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহারা প্রায় সকল রেজিমেণ্টের সহিত সংশ্রবযুক্ত সংস্থাপিত করিলেন। কিন্তু জেনোয়া ও আলেসাণ্ড্রিয়ার কারাগার

রক্ষকদিগের সহিতই তাঁহাদিগের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল।

সৈনিক কর্ম্মচারীর মধ্যে কর্পোরাল্ সার্জেণ্ট এবং ক্যাপ্‌টেন্—ইহাদিগকেই তাঁহারা বিপ্লবসেনা-কর্ম্মচারী মনোনীত করিতে লাগিলেন। কারণ উচ্চ কর্ম্মচারিগণ অপেক্ষা সামান্য সৈনিকগণের সহিত অধিকতর সংস্রবে আসায়, উচ্চ কর্ম্মচারিগণ অপেক্ষা ইহাঁরাই সামান্য সৈনিকগণের অধিকতর প্রীতি ও বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন।

কোন কোন সেনানায়ক প্রতিশ্রুত হইলেন যে বৈপ্লবিক সেনার প্রাবল্য দেখিলেই তাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিবেন। এই সকল কারণে তাঁহাদিগের বিশ্বাস জন্মিল যে বৈপ্লবিক সেনা প্রবল হইলে অধিকাংশ ইতালীয় সৈন্যই ইহার সহিত মিলিত হইবে; যাহারা মিলিত হইবে না, তাহারাও অতি সামান্য বাধা প্রদান করিবে।

ম্যাট্‌সিনি এই জন্য দ্রুত আক্রমণ প্রস্তাব করিলেন, এবং নব্য ইতালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত সভ্য সকলের নিকট আবশ্যকীয় অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং সাহায্যও প্রদত্ত হইল—কিন্তু যে সাহায্য আসিল, তাহা প্রয়োজনের অনেক ন্যূন। "ইহা অতি দুঃখকর হইলেও সত্য যে, যাঁহারা আবশ্যক হইলে অকাতরে স্বকীয় রক্ত মোক্ষণ করিতেও প্রস্তুত, তাঁহারাও সেই অর্থ-সাহায্য দানে কুণ্ঠিত, যে অর্থ-সাহায্যে সেই রক্ত মোক্ষণ নিবারিত হইতে পারে।"

ম্যাট্‌সিনি প্রস্তাবিত অভিযানের সাধারণ প্ল্যান জেনোয়া, আলেসাণ্ড্রিয়া, ভার্সেলি, টুরিন্ এবং লোমেলিনা প্রভৃতি নগরস্থিত বন্ধু বান্ধবদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, সেভয় আক্রমণের উপাদান-সামগ্রী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত মার্সেলিস্ পরিত্যাগ করিয়া জেনোয়ায় গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জেনোয়ায় যাইবার পূর্ব্বে ফরাসি সাধারণতান্ত্রিকদিগকে গূঢ়-সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

ক্যাভেগ্‌নাগ্ এবং ট্রিবিউন্ পত্রিকার দল কোন বহিশ্চর-উত্তেজনা-সাপেক্ষ ছিলেন না; তাঁহারা স্বতঃই কার্য্য-পিপাসু ছিলেন। কিন্তু ন্যাসানেল্ পত্রিকার দল সেরূপ ছিলেন না। অপরাপরের আশা লিয়নসের শ্রম-জীবিদিগের উপরই সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল, কিন্তু ন্যাসনেল্ পত্রিকার দলের তাহাদিগের উপর কোনও বিশ্বাস ছিল না। ম্যাট্‌সিনি বিখ্যাত সাধারণ তান্ত্রিক অধিনায়ক কারেল্‌কে মার্সেলিসে আসিতে অনুরোধ করিলে, তিনি আসিলেন। ক্যাভেগ্‌ন্যাগ্ ইত্যবসরে লিয়ন্সে গমন করিলেন।

ক্যারেলের সহিত ম্যাট্‌সিনির এই

গূঢ় সন্ধি হইল—যে ইতালী যদি বৈপ্লবিক সেনা বিপ্লব-সময়ে অবতারিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ক্যাভেগন্যাগের সহিত মিলিত হইয়া অতি দ্রুত নীরবে বিপ্লব-পতাকা উড্ডীন করিবেন।

গোপনে গোপনে এইরূপ উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় একটী সামান্য ঘটনায় তাঁহাদিগের সমস্ত প্ল্যান আমূল উন্মূলিত হইল।

পুলিশের প্রখর অনুসন্ধান অতিক্রম করিয়া নব্য ইতালী সমাজের পত্রিকাদি সাধারণ জনসমাজে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া, ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ জন্মিল যে সার্ডিনীয় রাজ্যে গুপ্তভাবে যে বিপ্লব কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা উপেক্ষণীয় নহে। অনেক মাস ধরিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সমাজের কোন সূত্র ধরিয়া কেন্দ্রে উপনীত হইবার অশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতেছেন না। তাঁহারা সমাজের ঊর্দ্ধতন বিভাগ ও ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ষড়যন্ত্রীদিগকেই বিপ্লব-কেন্দ্র বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহাদিগের অনুসন্ধান ফলোপধায়ক হয় নাই। তাঁহাদিগের একবারও মনে হয় নাই যে, যে সমাজের প্রসর এত বিস্তীর্ণ এবং যে সমাজ পুলিশের এরূপ তীক্ষ অনুসন্ধানও অতিক্রম করিতে সমর্থ, সে সমাজের অধিনেতৃবৃন্দ অজ্ঞাত-নামা [illegible] মাত্র যুবাপুরুষ, যাহাদিগের অনুপম কার্য্যদক্ষতা এবং অবিচলিত অধ্যবসায় ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তি বা অবলম্বন ছিল না।

নিরপরাধীকে শাস্তি দিলে পাছে প্রকৃত ষড়যন্ত্রীরা সতর্ক হয়, এই ভয়ে গবর্ণমেণ্ট সন্দিগ্ধ উচ্চশ্রেণী ও ১৮২১ সালের ষড়যন্ত্রিদিগকে শাস্তি দিতে সাহস করিলেন না। সুতরাং নিরাপদে ও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই অভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হইতে পারিত।

কিন্তু একটী ঘটনায় অভ্যুত্থান অঙ্কুরে বিদলিত হইল। এই সময় দুই জন আর্টিলারি-কর্ম্মচারী একটী স্ত্রীলোক লইয়া বিবদমান হইয়া এক জন অপরকে ষড়যন্ত্রী বলিয়া ধরাইয়া দিব বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছিল, এমন সময় এক জন পথিক শুনিয়া এই কথা গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া দেয়। গবর্ণমেণ্টও এই সূত্র ধরিয়া ষড়যন্ত্রের মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

বারাক ও আর্টিলারি গৃহে খানাতল্লাশি করিয়া নব্যইতালীসমাজ-প্রচারিত খানকতক পত্রিকা পাওয়া যায়। সেই পত্রিকার অধিবাসিগণ এবং অল্প দিন পরেই তাঁহাদিগের বন্ধুগণও কারারুদ্ধ হন। তাঁহাদিগকে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, যেন কেহ কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে না পরস্পরের সহিত চিটিপত্র লেখালিখি করিতে না পারে। গবর্ণমেণ্টের [illegible]

মুখচ্ছবি সতর্ক ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। যাঁহাদিগের মুখে কোন প্রকার দুশ্চিন্তা, বিমর্ষ, বা অস্বাভাবিক বিবর্ণতার ভাব পরিদৃষ্ট হইল; তাঁহারাই কারারুদ্ধ হইতে লাগিলেন।

শুদ্ধ জেনোয়ায় এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল এরূপ নহে। টিউরিন্, আলেসাণ্ড্রিয়া এবং চ্যাম্বের কারাগার সকল "সন্দিগ্ধ"গণে পরিপূর্ণ হইতেলাগিল। প্রথম ও দ্বিতীয় দলের কারারোধের অভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ সময় প্রদত্ত হইত। যাহাতে দ্বিতীয় দল ভাবে, বুঝি প্রথম দলের বিশ্বাসঘাতকতাই তাহাদিগের কারারোধের মূল।

বাস্তবিক কতকগুলি কারারুদ্ধ বর্ত্তমান যন্ত্রণায় ও ভবিষ্য যন্ত্রণার ভয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছিল। প্রত্যেক বন্দীরুদ্ধকে বলা হইল যে হয় সে সঙ্গীদিগের নাম ব্যক্ত করুক, অথবা প্রাণদণ্ড গ্রহণ করুক্। তিন জন সৈনিকপুরুষ ও এক জন সিবিলিয়ান্ ভয়ে সঙ্গীদিগের নাম বলিয়া ফেলিল। কতকগুলি উচ্চতর চরিত্রের লোক আপনাদিগের দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু সঙ্গীদিগের নাম বলিল না। ইহার ফল এই হইল যে যাঁহারা তাহাদিগের বন্ধু বান্ধব বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা অচিরাৎ ধৃত হইলেন।

এইরূপ নির্য্যাতন প্রথমে ষড় যন্ত্র কারীদের আরম্ভ হইয়া, অবশেষে নাইস্, [illegible] জার্ম্মেনি ও [illegible]

তুরি নগরে প্রসৃত হইল।

চতুর্দ্দিকে ভীতিস্রোত প্রবাহিত হইল। অনেক সভ্য পলায়ন করিলেন, কতক গুলি লুকায়িত রহিলেন। সমাজের অধিনেতৃবৃন্দ নির্য্যাতনের আরম্ভের পর অভ্যুত্থানের আরব্ধির ঔচিত্যবিষয়ে সন্দিহান হইলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যে বিপ্লবের আরব্ধি অসম্ভব হইয়া উঠিল। বারাক সকল চতুর্দ্দিকে এরূপ সতর্কতার সহিত পরিরক্ষিত হইতে লাগিল, যে জনপ্রাণী তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না।

যে সময়ে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগের আত্মীয় স্বজনকে বলা হইতেছিল যে তাঁহাদিগের ব্যাকুল হইবার বিশেষ কারণ নাই, যেহেতু তাঁহাদিগের কারারুদ্ধ বন্ধুবান্ধবদিগকে শীঘ্রই কারামুক্ত করা যাইবে, সেই সময়েই কারাগারের প্রাচীরের অভ্যন্তরে লোমহর্ষণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছিল। যাহাদিগকে সন্দেহমাত্রে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে আপন মুখে দোষ স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য, গবর্ণমেণ্ট অসংখ্য নারকীয় উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কতকগুলিকে তাঁহারা অর্থদ্বারা বশীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কতকগুলিকে বক্র প্রশ্ন দ্বারা জালে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, প্রথমেই হউক বা পরেই হউক সকলের প্রতিই ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কাহাকে কাহাকে বা আট্রোপিন, [illegible] মাদক

ঔষধ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান হইয়াছিল; ইহাতে বুদ্ধি অতি ক্ষীণ হয়; সুতরাং আত্মসংযম না থাকায় রোগী সহজেই মনের কথা বাহির করিয়া ফেলে। যাহারা ভীত বলিয়া পরিজ্ঞাত, তাহাদিগকে এইরূপ বলা হইল:— "আমরা জানি যে তোমরা দোষী; এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গুলি করিয়া তোমাদিগকে মারিতে হুকুম পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও যদি তোমরা সহচরদিগের নাম বলিয়া দাও, তাহা হইলেও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পার"।

যাঁহারা ধার্ম্মিক ও সাহসী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগকে এইরূপ বলা হইত—"আমরা তোমাদিগের জন্য অন্তরের সহিত দুঃখিত হইয়াছি। তোমরা ভাবিয়াছিলে যে তোমরা একটী সৎ কার্য্যে আত্ম সমর্পণ করিয়াছ, কিন্তু তোমরা যাহাদিগের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতেছ, তাহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এইরূপ মৌন অবলম্বন করিয়া তোমরা বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত বন্ধুদিগের প্রাণরক্ষা করিতেছ না; কিন্তু যাহারা তোমাদিগের নাম বলিয়া দিয়াছে—তাহাদিগের জন্য আপনাদিগকে ও পরিবারবর্গকে অকারণ বিসর্জ্জন দিতেছ। দেখ! তোমাদিগের বিরুদ্ধে তাহাদিগের সাক্ষ্য এই। কেন তোমরা ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়া কারামুক্ত হইয়া গৃহে গিয়া আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে শান্তি বিতরণ না করিবে? কেন না—এরূপ অবাধ্য ভাবে মৌনী রহিলে, নিশ্চয় তোমাদিগের মৃত্যু"। এই কথা শুনিয়া কারাবাসীর মন যখন সন্দেহ ও ভয়ে আলোড়িত হইত, তখন বন্ধুবান্ধবদিগের জালনাম-স্বাক্ষরিত পরিত্যাগপত্র তাহাদিগের সম্মুখে ধরা হইত। জ্যাকোপো রুফিনির প্রতি এই কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল।

যাহাদিগের মুখ হইতে কেবল নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লওয়ার প্রয়োজন, তাহাদিগের সঙ্গে একজন করিয়া কপট ষড়যন্ত্রী আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। এই কপট ষড়যন্ত্রী ক্রমে বিশ্বাস-ভাজন হইয়া সহবাসী কারাবাসীর কষ্ট যন্ত্রণার সময় তাহার মুখ হইতে হৃদয়-নিগূহিত সমস্ত গুপ্ত কথা বাহির করিয়া লইত।

মিগ্নিও নামক একজন সার্জেণ্ট জেনোয়ার একজন কপট ষড়যন্ত্রীর সহিত একত্র কারারুদ্ধ হন। উক্ত কপট ষড়যন্ত্রী সাশ্রুজলে মিগ্নিয়োকে বলিল যে "আমি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম বলিয়া আমার আজ এই দুর্দ্দশা! আর তুমি যদি বাটীতে পত্র দ্বারা মনের কথা জানাইতে চাও, তাহা হইলে আমি বিশ্বস্ত লোক দ্বারা তোমার সেই পত্র পাঠাইয়া দিতে পারি"। মিগ্নিও এই কথায় প্রতারিত হইয়া আপনার শিরা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া সেই রক্ত দিয়া মনের ভাবপূর্ণ একখানি পত্র লিখিয়া বাটীতে প্রেরণ করিবার জন্য উক্ত ষড়যন্ত্রীর হস্তে প্রদান করেন। এই পত্র পাঠ শেষে মিগ্নিওর

বিরুদ্ধে প্রধান প্রমাণ স্বরূপ অবতারিত হয়।

প্রত্যেক কারাবাসীর জন্য নূতন নূতন কষ্ট প্রদানের উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল,—প্রত্যেকটীই নৃশংস নিষ্ঠুর ও লজ্জাকর।

একজন কারাবাসীর কারাগৃহের গবাক্ষের নিম্নে একজন গবর্ণমেণ্ঠ চীৎকারক অপর কারাবাসিদিগের শীর্ষচ্ছেদ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল।

আর একজন কারাবাসী, যে গৃহে তাঁহার বন্ধু আবদ্ধ রহিয়াছেন, তাহার সম্মুখবর্ত্তী গৃহে আবদ্ধ হয়েন। এই দুই ঘরের মধ্যে কেবল একটী পথ ছিল। বন্ধুর মৃত্যু নিকট এই সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হইল। তাহার পরক্ষণেই তিনি শুনিতে পাইলেন যে কতকগুলি সৈনিক পুরুষ উক্ত আগার হইতে তাঁহার বন্ধুকে লইয়া যাইতেছে—তাহার অব্যবহিত পরেই গুলির শব্দ বন্ধুর অদৃষ্টবার্ত্তা তাঁহাকে শুনাইল। জিও ভানি রে আত্মখ্যাপনে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

"সার্জ্জেণ্টগণের বধের পর তাহারা আমাকে পিয়ানাভিয়ার বধবিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিল। এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইল, সর্ব্বদা গান করা পিয়ানাভিয়ার অভ্যাস ছিল; একদিন রবিবারে হঠাৎ তাঁহার গান বন্ধ হইল। সেই রবিবারে সেই কারাগৃহের দ্বারপথে অভিক্রান্ত লোকজনের যাতায়াতের শব্দ আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। গবর্ণর আসিলেন, আসিয়া তাঁহার সহিত অনেক ক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বেলা তিন ঘটিকার সময় আলেসাণ্ড্রিয়া দুর্গের জেনেরাল কমাণ্ডেণ্ট কতকগুলি কর্ম্মচারি-পরিবেষ্টিত হইয়া এবং ঘাতকাকৃতি একজন পুরোহিত সঙ্গে করিয়া আমার অন্ধকূপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে তাঁহারা যেন আমার দুঃখে অতিশয় কাতর, অশ্রুজল সম্বরণ করা তাঁহাদিগের পক্ষে যেন অসাধ্য। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন আমার মন প্রশান্ত আছে কি না; আমি কহিলাম 'আছে'। তাহার পর তিনি বাহির হইয়া গেলেন, আমাকে গুটিকত কথা বলিবার জন্য পুরোহিতকে রাখিয়া গেলেন। সমস্ত রাত্রি সেই গোলযোগ চলিতে লাগিল। প্রত্যূষে আমার বোধ হইল যেন পিয়ানাভিয়াকে বারাণ্ডা দিয়া লইয়া যাইতেছে—ইহার পর তিনটী গুলির শব্দে অবগত হইলাম যে পিয়ানাভিয়ার প্রাণবধ হইল। যে পিয়ানাভিয়ার বিশ্বাস-ঘাতকতার অনেকগুলি ভ্রাতা প্রাণ হারাইলেন, তাহার জন্যও আমি করুণভাবে রোদন করিতে লাগিলাম।"

বস্তুতঃ পিয়ানাভিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় নাই। জিওভানি রেকে ভয় দেখাইবার জন্যই এরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। কতকগুলি কারাবাসীর কারাকূ-

পের বাহিরে দিবারাত্র এরূপ ভীষণ শব্দ-তরঙ্গ উত্থাপিত ও পরিরক্ষিত করা হইত, যে তাহাদিগের পক্ষে নিদ্রা যাওয়া অসম্ভব হইত। তিন চারি রাত্রি এইরূপ দুর্ব্বিষহ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করার পর তাহাদিগকে নানাপ্রকার প্রশ্ন ও পরীক্ষা দ্বারা এতদূর উদ্বেজিত ও উৎপীড়িত করা হইত যে যাহারা তাহা সহ্য করিয়াছে, তাহারা ব্যতীত আর কেহই তাহা কল্পনায় ধারণ করিতে সমর্থ নহে। অবশেষে এইরূপ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়া যখন কারাবাসীর নৈতিক সাহস অবসন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইত, তখন "স্বয়ং দোষ স্বীকার করিলে প্রাণদান পাইবে" তাহাকে এইরূপ প্রলোভন দেখান হইত। শুদ্ধ প্রলোভন নয়—তাঁহারা পারিবারিক প্রণয়ের পবিত্রতা নষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না; তাঁহারা কারাবাসীর সম্মুখে বৃদ্ধ জনক জননীকে আনাইয়া গুপ্ত কথা বাহির করিয়া দিবার জন্য তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক কারাবাসিগণকে অনুরোধ করাইতেও লজ্জাবোধ করিতেন না।

এই সকল নির্য্যাতনে অনেকে অবনত হইল, কতকগুলি বিচলিত হইলেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ড হইল। একজন কেবল যাঁহার বয়স নবীন এবং হৃদয় এত উচ্চ ও পবিত্র যে কোন প্রলোভনেই ভীত বা বিচলিত হইবার নহে—আপনাকে প্রবঞ্চকদিগের প্রলোভন-জাল হইতে এবং অন্যকে অত্যাচারিদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার নাম জেকোপো রুফিনি। ইনি এক রজনী-যোগে তাঁহার কারাগৃহের দেউল হইতে একটী পয়াল উপড়াইয়া, তাঁহার গ্রীবার একটী রক্তবাহিনী শিরা খুলিয়া দিলেন। যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে এইরূপ ভীষণ প্রতিবাদ করিয়া, সেই নবীন যোগী দেশহিতৈষণায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ও অপাপবিদ্ধ ছিল। তাঁহার প্রকৃতি অতি মধুর, তাঁহার হৃদয় পবিত্রতম ও স্থিরতম প্রণয়ে পরিপূরিত ছিল। তিনি স্বদেশকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন, এবং ইতালীর ভবিষ্যৎ ব্রতের গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিতেন। তাঁহার—সর্ব্ব ধর্ম্মের আদর্শ জননীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, ভ্রাতৃগণের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, এবং প্রিয়বন্ধু ম্যাট্‌সিনির প্রতি অবিচলিত প্রেম ছিল। তিনি ম্যাট্‌সিনির শৈশব-সহচর ও যৌবন-সুহৃৎ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্র অধ্যয়ন কাল হইতে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় নাই। তাঁহারা সহোদর ভ্রাতার ন্যায় পরস্পরের সহবাসে কালাতিপাত করিতেন। কেবল সেই সময় প্রথমে কারাবাস ও শেষে নির্ব্বাসন তাঁহাদিগকে জন্মের মত পরস্পর-বিচ্ছিন্ন করে। জ্যাকোপো রুফিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এবং ম্যাট্‌সিনি ব্যবহার-বিজ্ঞানে দীক্ষিত হইতেছিলেন। উভয়েরই ... সাহিত্য

সাধারণে অনুরাগ এবং হৃদয়ে স্বাভাবিকী সহানুভূতি—এই কয়টী উপাদানে তাঁহাদিগের বন্ধুত্ব ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়াছিল।

"যখনই নির্য্যাতন আরম্ভ হইল, তখনই জ্যাকোপো বুঝিলেন যে তাঁহার জীবন সংশয়। বুঝিয়া তিনি প্রশান্ত ভাবে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছে এই সংবাদ দিয়া যখন বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে পলায়ন করিতে অনুরোধ করেন তিনি পলায়নে অস্বীকৃত হন। যখন সকলে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন যে যাহাদিগের দৃষ্টান্তে অপরে বিপৎসাগরে ঝাঁপ দিয়াছে, তাহাদিগেরই সর্ব্বপ্রথমে জীবন প্রদান করা উচিত। যখন ধৃত হইয়া তিনি নানাপ্রকার প্রশ্নে উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন, তখন তিনি কোন-প্রকার উত্তর না দিয়া কেবল মৃদু মৃদু হাঁসিতে লাগিলেন। কিন্তু অবিশ্রান্ত কষ্ট যন্ত্রণায় ও নিরন্তর ভয় প্রদর্শনে পাছে পরে চিত্তদৌর্ব্বল্য ঘটে, এই ভয়ে জ্যাকোপো আত্মা অপাপবিদ্ধ থাকিতে থাকিতে আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার হৃদয় যেমন গভীর ছিল, বুদ্ধিও তেমনই প্রখরা ও ক্ষিপ্রা ছিল। যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠরূপে জানিতেন, তাঁহারা অদ্যাপি তাঁহাকে ঋষির ন্যায় মনে করেন, এবং ভক্তিভাবে তাঁহার স্মৃতি স্মরণে ধারণ করিয়া থাকেন।"

চার্লস আল্‌বার্ট রক্তপানে এতদূর উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে তিনি একজন কর্ম্মচারীকে বলিয়াছিলেন যে "সামান্য সৈনিকের রক্তে পর্য্যাপ্ত হইবে না, তুমি সৈনিক কর্ম্মচারিদিগকেও ধরিয়া দিতে চেষ্টা করিবে"।

যাহারা গয়েন্দাগিরি স্বীকার করিল, তাহাদিগের জীবন ছাড় দেওয়া হইল। কিন্তু এই গয়েন্দাদিগের স্বাক্ষ্য পরস্পর-বিসম্বাদি হইতে লাগিল। এই জন্য একদিন দুইজন গয়েন্দাকে এক গারদে পুরিয়া রাখা হইল। তাহার পর তাহাদিগের স্বাক্ষ্য গৃহীত হইল, আর বিসম্বাদ রহিল না। এই জঘন্য নরাধমদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া অনেক নির্দ্দোষী ব্যক্তিরও প্রাণদণ্ড হইল।

কারাবাসিদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা ছলনা ও বিড়ম্বনা মাত্র। কারাবাসিদিগের পক্ষসমর্থকদিগকে যে সকল কাগজ পত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহা আসল হইতে নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত, আর তাঁহাদিগকে যে সময় প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাতে মকদ্দমার অবস্থা সবিশেষ বিবেচনা করাও সম্ভবপর ছিল না। পক্ষসমর্থকেরা প্রায় সকলেই সেনানিবিষ্ট। তাঁহারা এই দুঃসাহসিকতার জন্য অচিরাৎ সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হন।

অসংখ্য লোকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রচারিত হইতে লাগিল। যাহারা পীড়মণ্টীয় গবর্ণমেণ্টের

বিরুদ্ধে লিখিত কোন প্রকার পত্রপত্রিকাদি প্রচার করিয়া বেড়াইত, তাহাদিগের অধিকাংশেরই উপর চিরদাসত্ব-দণ্ড ব্যবস্থাপিত হইল. কোন কোন স্থলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তও আদিষ্ট হইল। যে একটী ষড়যন্ত্রী ধরিয়া দিবে তাহার প্রতি একশত মুদ্রা পারিতোষিক নির্দ্দিষ্ট হইল।

যে সকল লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, তাঁহাদিগের নামের তালিকা প্রদান করিতে শোণিত শুকাইয়া যায়। অনেক সৈনিক কর্ম্মচারী ও ব্যবহারাজীব এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

যাঁহাদিগের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা উদ্ঘোষিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি কৌশলে মুক্তি লাভ করেন। ম্যাট্‌সিনির বিরুদ্ধেও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হয়, কিন্তু তিনি প্রিন্স আল্‌বার্টের রাজ্য-বহির্ভূত থাকায় কেহই তাঁহার কেশ স্পর্শ করিতে পারে নাই।

অবশিষ্ট কারবাসিদিগের কাহারও প্রতি বিশ বৎসর, কাহারও প্রতি দশ বৎসর, কাহারও প্রতি পাঁচ বৎসর, কাহারও প্রতি তিন বৎসর, কাহারও প্রতি দুই বৎসর, এবং কাহারও প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ব্যবস্থাপিত হইল। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কতকগুলি লোককে স্বাধীনতা প্রদান করা হইল।

এই লোকের জীবন-মরণ-নির্ণয়ন রূপ ভয়ঙ্কর কার্য্য—ন্যায়ের বাহ্য আড়ম্বর বা আইনের ক্রমের দিকেও দৃষ্টি না রাখিয়া অতি দ্রুত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা বিভীষিকা ও ক্রোধান্ধতার রাজত্ব কাল। এরূপ যথেচ্ছাচারের তৎকালে কোন অনিবার্য্য প্রয়োজনও ছিলনা। কেবল চার্লস আল্‌বার্টের রক্ত-পিপাসা নিবারণ করিবার জন্যই এতদূর রক্তপাত করা হইয়াছিল। আল্‌বার্টের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ন্যায়ের একমাত্র আশ্রয়স্থল বিচারকগণ ঘাতকরূপে এবং ধর্ম্মাধিকরণ সকল বধ্যভূমিরূপে পরিণত হইয়াছিল।

ঘাতকগণ রাজ-প্রসাদের প্রার্থী হইয়া নিষ্ঠুরতায় আপন রাজাকেও পরাজিত করিতে লাগিল। ইহার বিশদীকরণে একটী দৃষ্টান্তই পর্য্যাপ্ত হইবে। একদিন তাহারা ভচীরী নামক এক জন কারাবাসীকে তাহার বাটীর সম্মুখ দিয়া যথার্থ বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছিল। ভচীরীর গৃহে গর্ভবতী স্ত্রী, স্নেহময়ী ভগিনী ও শিশু সন্তানদ্বয় বাস করিত। তাহাদিগের যন্ত্রণা পরিহার করিবার জন্য ভচীরী ঘাতকদিগকে অন্য পথ দিয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুনয় করিলেন। ঘাতকেরা তাঁহার কথা শুনিল না। তাঁহার ভগিনী তাঁহার অবস্থা দেখিয়া উন্মাদগ্রস্তা হইলেন, পতিপ্রাণা স্ত্রী পাগলিনীবেশে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে স্বামীর বধকার্য্য দেখিলেন। অধিকক্ষণ দুঃখে পড়িয়া অনর্থ

শিশুগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

চার্লসের সেনাপতি মরা, কুনিওর গবর্ণর ফেবার্গ এবং আলেসাণ্ড্রিয়ার গবর্ণর-জেনেরাল্ গালাটেরি প্রভুর সন্তোষ বিধানার্থে নৃশংসতায় পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুরতমের উপর চার্লস সর্ব্বোচ্চ রাজ-সম্মান প্রদান করিতে লাগিলেন।

নেপাল্‌স, ভিনিস্ এবং রোমের সাধারণ-তান্ত্রিকেরা জঘন্য প্রতিহিংসায় হৃদয় কলুষিত এবং ভ্রাতৃস্থানীয় নাগরিকদিগের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করা অপেক্ষা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গমন করা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর মনে করিলেন।

ম্যাট্‌সিনি এই সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দ্রুত কার্য্য আরম্ভ করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন। ষড়যন্ত্রিদিগের চিন্তা ও কার্য্যে বিসম্বাদ ঘটাতেই যে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। ইতালীতে নব্য ইতালী সমাজের বৈপ্লবিক মত সকল সমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই মত সকলের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে অতি অল্প লোকই প্রস্তুত ছিলেন। এই জন্য ম্যাট্‌সিনি নব্য ইতালী সমাজের সভ্যগণের মধ্যে এই নৈতিক শিক্ষার অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি স্থির করিলেন যে নিজের দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইবেন যে যাঁহারা কোন নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহার মূল সূত্র অনুসারে কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, যাঁহারা অপরের জীবন মরণের দায়িত্ব আপন মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের সকল বাধা বিপত্তির সম্মুখেও আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখা উচিত। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের উদ্দেশ্য যতই কেন উচ্চ ও উদার হউক না, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

এই জন্য ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দ ইতালীর বাহিরে সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ম্যাট্‌সিনি দেখিলেন দ্রুত কার্য্য আরম্ভ করিলে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব নহে। তিনি দেখিলেন যে কার্য্য আরম্ভ না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে জানা যাইবে না যে কত লোক নব্য ইতালী সমাজের অনুকূল। যাহারা এখনও ভগ্ন হৃদয়ে ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস-শূন্য হইয়া ভবিষ্য-কর্ত্তব্য বিষয়ে মন্থর রহিয়াছে, সাহস ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলে, তাহারা নিশ্চয়ই মিলিত হইয়া আরব্ধ কার্য্যে যোগ দিবে। এই অলক্ষিত ও অপরিজ্ঞাত উপাদানের সংখ্যা ম্যাট্‌সিনির বিশ্বাসে অগণ্য ছিল।

প্রিন্‌স অ্যাল্‌বার্টের পূর্ব্বোক্ত নিষ্ঠুরতায় সমস্ত ইতালীবাসীর ঘৃণা ও ক্রোধ তাঁহার বিরুদ্ধে উদ্দীপিত হইয়াছিল। ম্যাট্‌সিনি দেখিলেন এই সময়ে কার্য্য আরম্ভ করিলে তাঁহারা অসংখ্য ইতালী

বাসীর সহকারিতা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

ম্যাট্‌সিনির আশা যে অমূলক নহে, তাহা প্রমাণ করিতে শুদ্ধ এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে তাঁহাদিগের এই মন্তব্য উদ্ভাবিত হইবামাত্র জেনোয়ার বিচ্ছিন্ন উপাদান সকল সমবেত হইয়া জেনোয়াকেই কার্য্যকেন্দ্র করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। অধিনেতৃবৃন্দের বয়সের নবীনতা ও অদূরদর্শিতাই এই প্রকাণ্ড উদ্যমের ভবিষ্য অকৃতকার্য্যতার নিদান। বিখ্যাতনামা গ্যারিবল্‌ডিও এই উদ্যমে যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কেবল পলায়ন দ্বারা প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন মাত্র।

ম্যাট্‌সিনি দ্রুত কার্য্য আরম্ভ করিবার মানসে মার্সেলিস্‌ পরিত্যাগ করিয়া জেনিভা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যে রাজ্যকে কার্য্যক্ষেত্র করিতে হইবে সেই রাজ্যের ভৌগোলিক ও অন্যান্য অবস্থা ম্যাট্‌সিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে জেনিভীয় গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের সশস্ত্র অভ্যুত্থান নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবেন। এই জন্য তিনি ফেজি প্রভৃতি কতিপয় জেনিভীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত আত্মীয়তা করিলেন। আত্মীয়তা করিয়া জানিলেন যে যদিও জেনিভীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রতিরোধ করিবেন, সে প্রতিরোধ নাম মাত্র হইবে; আর জেনিভীয় লোক সাধারণের তাঁহাদিগের উদ্যমের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

ম্যাট্‌সিনি বিপ্লব আরব্ধ হইলে যাহাদিগ দ্বারা কোনওপ্রকার উপকারের সম্ভাবনা ছিল, তাহাদিগের সকলেরই সহিত মৈত্রী সংস্থাপন করিলেন; সেভয়ের উদ্ধারের মুখযন্ত্র-স্বরূপ "লা ইউরোপ সেণ্ট্রাল" নামক এক খানি সম্বাদপত্র বাহির করিলেন; এবং সেভয়ের অধিবাসিদিগের সহিত গুপ্ত চিটি পত্র লেখালিখি করিয়া এমন একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা উপেক্ষা করিয়াও কার্য্য আরম্ভ করা অত্যন্ত সম্ভব বলিয়া মনে করিলেন।

সেভয় তৎকালে অতিশয় উৎপীড়িত অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহ-প্রবণ ছিল। ম্যাট্‌সিনি চ্যাম্ব্রে, আনেন্সী, থনন্‌, বনিভিল্‌, ইড্‌রেন্‌, এবং অন্যান্য সেভয়স্থ নগরের সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। অভ্যুত্থান কৃতকার্য্য হইলে তাঁহারা সেভয় সম্বন্ধে কি করিবেন, উক্ত নাগরিকগণ ম্যাট্‌সিনিকে এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন—অধিবাসিগণের ইচ্ছানুসারে সেভয় হয় ইতালীর সহিত, নয় ফ্রান্সের সহিত, অথবা সুইস্‌ সাধারণতন্ত্রের সহিত মিলিত হইবে; তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য হইলে তিনি সুইস সাধারণতন্ত্রের সহিতই ইতালিকে মিলিত করিতে পারিবেন। কাভুর চরিত্রও,

সাদৃশ্য ও ভৌগোলিক অবস্থানুসারে রাজ্যের ভাগ যদি প্রকৃতসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সুইজ সাধারণতন্ত্রের এক সীমা সেভয় ও অন্য সীমা জার্ম্মাণীর টাইরল হওয়া উচিত। ম্যাট্‌সিনির বিশ্বাস ছিল যে যদি সুইজর্ল ও—ইতালী ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক গ্রস্ত না হয়, তাহা হইলে কালে ইহার সীমা ঐরূপই হইবে।

কার্য্যের উপাদানের অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু সেই উপাদান সকলকে—নির্ব্বাসিত ইতালীয়দিগকে— ফ্রান্সের নানা স্থান হইতে আনিয়া একত্র সমবেত করা বহুব্যয়সাধ্য বলিয়া তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় সেভয়ে অনেকগুলি জার্ম্মাণ ও পোলিস্‌ নির্ব্বাসিত উপস্থিত ছিলেন। ম্যাট্‌সিনি ইহাঁদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অতি সংগোপনে অভ্যুত্থানোপযোগী শিক্ষা বিধান করিতে লাগিলেন, এত গোপনে যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের লক্ষ্য ও কার্য্যপ্রণালী কিছুই জানিতে পারিলেন না।

ইতালীয় উদ্যাপনীয় ব্রতের সহিত অন্যান্য দেশের উৎপীড়িতদিগের ব্রতের একীকরণে কৃতকার্য্য হওয়ায় ম্যাট্‌সিনি বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যে নব্য ইতালী সমাজের অনিবার্য্য ও ন্যায়সঙ্গত পরিণাম—'নব্য ইউরোপ' সমাজের প্রতিষ্ঠাপন। আজ তাহা কার্য্যে পরিণত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

ইতালীয় আভ্যুত্থানিক সেনা ইউরোপীয় জাতীয় সেনার বীজ স্বরূপ হইল। জার্ম্মাণীয় ও পোলিস্‌ নির্ব্বাসিতেরা জয়ধ্বনির সহিত ম্যাট্‌সিনির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সামরিক আয়োজনে বিশেষ তৎপর হইলেন। কার্লো বিয়াঙ্কো, জেন্‌টিলিনি স্কোবাট্‌লি প্রভৃতি কয়েক জন সামরিক পুরুষ সেনা দীক্ষিত করার বিষয়ে ম্যাট্‌সিনিকে বিশেষ সহায়তা করেন।

ম্যাট্‌সিনি "হোটেল্‌ ডি লা নাবিগেসেন, অ পাকুইস্‌" নামক হোটেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই হোটেল তৎকালে বৈদেশিক নির্ব্বাসিতগণে পরিপূর্ণ ছিল। ষড়যন্ত্রিদিগের এক-প্রকার সম্পূর্ণ করায়ত্ত থাকায়, সেই হোটেল পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের অনুসন্ধিৎসার অনধিগম্য হইয়া উঠিল। জিয়াকোমো সিয়ানির বিশেষ যত্নে সেভয়স্থিত ধনী লম্বার্ডদিগের অধিকাংশই তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। গাসপেয়ার বেলক্রেডি নামক এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ম্যাট্‌সিনির সহিত যোগ দিলেন। ইনি একজন প্রধান কার্য্যকারক ষড়্‌যন্ত্রী হইলেন। নব্য ইতালী সমাজের মূলমন্ত্রে ইহাঁর বিশ্বাস কখনই বিচলিত হয় নাই এবং ইনি আজীবন

ম্যাট্‌সিনির একজন বিশ্বস্ত ও প্রিয় বন্ধু ছিলেন।

তাঁহারা সেভয়নিবাসী গাস্‌পেয়ার রোসেল্‌ নামক একজন ধনী লম্বার্ডের নিকট প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিলেন, সেণ্ট্‌ এটীন্‌ ও বেল্‌জিয়ম্‌ হইতে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ক্রয় করিলেন, এবং সকলে সমবেত হইয়া মনের হর্ষে ও অশ্রান্ত যত্নে কার্টুর্চ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় যুদ্ধ-সামগ্রী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

সকল কার্য্য সন্তোষজনক রূপে চলিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্র কার্য্য আরব্ধ করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। দুর্ভাগ্য ক্রমে এই সঙ্কট সময়ে অন্তশ্চর কমিটি সকল এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ—যাঁহারা অর্থ-সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন, এমন একটী আপত্তি তুলিলেন যে তাহাতে সঙ্কল্পের ধ্বংস সম্ভাবনা না হউক, কিন্তু সঙ্কল্প সাধনে গুরুতর বিলম্ব পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

তাঁহারা একটী "নাম" চাহিলেন। তাঁহারা আভ্যুত্থানিক সেনার এমন একজন অধিনায়ক চাহিলেন, যিনি শুদ্ধ যুদ্ধবিশারদ মাত্র হইবেন এরূপ নহে, যাঁহার নাম ও খ্যাতির মোহিনী শক্তি থাকিবে।

তাঁহারা সেনাপতি রামোরিণোকে বৈপ্লবিক সেনার অধিনেতৃত্ব প্রদান করিতে ম্যাট্‌সিনিকে অনুরোধ করিলেন। রামোরিণো পোলিস্‌ বৈপ্লবিকদিগের রক্ষার্থ ফরাশি পোলিস্‌ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পোলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পোলণ্ডে তাঁহার ব্যবহার যদিও প্রশংসনীয় হয় নাই, যদিও তাঁহার বিরুদ্ধে পোলিস্‌ স্বদেশ-হিতৈষিগণকে অভিযোগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি পোলিসদিগের স্বাপক্ষ্যে যুদ্ধ করায় জন্মভূমি সেভয়ে ও বাসভূমি ফ্রান্সে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এই জন্য সকলেরই ইচ্ছা যে তাঁহাকেই সেনাপতিত্ব প্রদান করা হয়।

ম্যাট্‌সিনি ইহাতে বিশেষ আপত্তি করিলেন। তিনি পোলিস্‌ নির্ব্বাসিতগণের মুখে তাঁহার চরিত্র ও রণকৌশল সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহাতে রামোরিণো সম্বন্ধে তাঁহার মত স্বতন্ত্র ছিল। এ আপত্তি করার তাঁহার আরও একটী কারণ ছিল—তিনি জানিতেন যে নূতন অবস্থায় নূতন লোকের প্রয়োজন; ঘটনা লোক প্রস্তুত করিয়া দেয়, লোক কর্ত্তৃক ঘটনা প্রস্তুত হয় না। তিনি বলিলেন যে বিপ্লবের দুইটী যুগ—প্রাথমিক অভ্যুত্থান, ও তাহার পরিণামস্বরূপ ভাবী সমর। এই আভ্যুত্থানিক কালের অধিনেতৃত্ব বিপ্লবস্রষ্টৃগণের হস্তে থাকাই সর্ব্বথা প্রার্থনীয়; অভ্যুত্থান কৃতকার্য্য হইয়া যখন সমরযুগ উপস্থিত হইবে, তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেনাপতির হস্তে অধিনেতৃত্ব প্রদান করায় কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই।

ম্যাট্‌সিনির আপত্তি অগ্রাহ্য হইল।

নিয়মের শক্তি অপেক্ষা নামের গৌরব প্রবলতর হইল। তাঁহারা ম্যাট্‌সিনিকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া পাঠাইলেন যে রামোরিণোকে সেনাপতি না করিলে উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। ম্যাট্‌সিনি বুঝিলেন তাঁহার অভিপ্রায়ের নিঃস্বার্থতা বিষয়ে ইহাঁদিগের সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাঁহারা সন্দেহ করিতেছেন যে ম্যাট্‌সিনি আত্মোন্নতিপরবশ হইয়া আপনাকে সিবিল্‌ ও মিলিটারী উভয়প্রকার অধিনেতা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই সন্দেহের আশঙ্কায় ম্যাট্‌সিনি নিতান্ত কাতর হইলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে যদি কেহ এ সন্দেহের অযোগ্য হন, সে তিনি।

ম্যাট্‌সিনি অগত্যা স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে পরিণামে বিশেষ অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। তিনি রামোরিণোকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রামোরিণো তাঁহাদিগের কার্য্যপ্রণালীর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিলেন, শুনিয়া সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ম্যাট্‌সিনি ও তিনি স্থির করিলেন যে আক্রমণ-সেনা দুই স্তম্ভে বিভক্ত করিতে হইবে। প্রথম স্তম্ভের শৃঙ্খলাবদ্ধকরণের ভার ম্যাট্‌সিনি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন; এই স্তম্ভ জেনিভা হইতে বহির্গত হইবে। দ্বিতীয় স্তম্ভের শৃঙ্খলাবদ্ধকরণের ভার রামোরিণো গ্রহণ করিলেন; এই স্তম্ভ লিয়ন্‌স হইতে বহির্গত হইবে। কারণ, তিনি বলিলেন যে লিয়ন্‌সে তাঁহার বিশেষ প্রভাব। তিনি দ্বিতীয় স্তম্ভের আহরণের মূল্য স্বরূপ ম্যাট্‌সিনির নিকট হইতে চল্লিশ সহস্র ফ্রাঙ্ক মুদ্রা চাহিলেন, তাহাই প্রদত্ত হইল। এইরূপ স্থির হইল যেন নবেম্বর মাস (১৮৩৩) তাঁহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না দেখিয়া অতীত না হয়। রামোরিণোর কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য ম্যাট্‌সিনি একজন বিশ্বস্ত মডেনীস্‌ যুবককে তাঁহার সেক্রেটারী করিয়া দিলেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষে, সেভয় অভিযানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আণ্টোনিয়ো গালেঙ্গা নামক একটী যুবা পুরুষ পূর্ব্বোক্ত "নাভিগেসন" হোটেলে ম্যাট্‌সিনির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মেলিগারি নামক ম্যাট্‌সিনির কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট হইতে একখানি পরিচায়ক পত্র আনিয়াছিলেন। ইনি ম্যাট্‌সিনিকে বলিলেন যে যেদিন তিনি শুনিলেন যে প্রিন্স আলবার্ট অসংখ্য ভ্রাতার রুধিরে হস্ত কলঙ্কিত করিতেছেন, সেই দিন হইতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে গুপ্তহত্যাদ্বারা প্রিন্স আল্‌বার্টের বধ সাধন করিবেন। তিনি ম্যাট্‌সিনির নিকট হইতে কেবল কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য ও একখানি পাস মাত্র চাহেন। অনেক পরীক্ষার পর ম্যাট্‌সিনি তাঁহাকে সহস্র ফ্রাঙ্ক ও পাস দিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিলেন।

এই সময় ম্যাট্‌সিনি সর্দ্দার অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে এক্তেজিমি নামক এক

ব্যক্তিকে টিউরিণে প্রেরণ করেন। এঞ্জেলিনি অজ্ঞাতভাবে টিউরিণের যে গলিতে গ্যালেঙ্গা বাসা করিয়াছিলেন, সেই গলিতে ও সেই বাড়ীর নিকটে একটী বাড়ীতে বাসা করেন।

এঞ্জেলিনি এত গুপ্তভাবে আসিয়াছিলেন যে টিউরিণের সভ্যেরাও তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক এঞ্জেলিনি অসাবধানতাবশতঃ পুলিসের সন্দেহ উদ্দীপিত করায়, পুলিসকর্ম্মচারীরা সেই গলিতে আসিয়া তাঁহার বাটী ঘিরিয়া ফেলিল। এদিকে সমাজের সভ্যেরা ভাবিলেন বুঝি গ্যালেঙ্গার অভিপ্রায় পুলিস জানিতে পারিয়াছে—এই ভাবিয়া তাঁহারা গ্যালেঙ্গাকে তথা হইতে সরাইয়া দিলেন—বলিলেন পূর্ব্বকথামত এ রবিবারে একার্য্য হইল না, আর এক রবিবারে হইবে, তাঁহারা সম্বাদ দিলে তিনি টিউরিণে প্রত্যাগমন করিবেন।

কতিপয় রবিবার পরে তাঁহারা গ্যালেঙ্গার অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু গ্যালেঙ্গা নিরুদ্দেশ, তাঁহার আর সন্ধান হইল না। গ্যালেঙ্গা ইতালী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। অনেক দিন পরে সুইজর্লণ্ডে ম্যাট্‌সিনির সহিত তাঁহার আর একবার সাক্ষাৎ হয়। গ্যালেঙ্গা শেষে পুস্তক পত্রিকাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লেখনী নব্য ইতালী সমাজ ও ম্যাট্‌সিনির স্বাপক্ষ্যে ও বিপক্ষে সমভাবেই চালিত হইতে লাগিল। আবার ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ম্যাট্‌সিনির দলে মিলিত হন। ১৮৪। খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্‌সিনি যখন ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ইতালী যাত্রা করেন গ্যালেঙ্গা তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহা সহিত গমন করেন। মিলানে আসিয় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিব বলিয় ম্যাট্‌সিনিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়া তিনি পার্ম্মায় গম করিলেন। পার্ম্মায় গিয়া লম্বার্ডী ও পীড্‌মণ্টের সম্মিলনের স্বাপক্ষ্যে অনেক ব ক্তৃতা করিলেন। এবং পীডমণ্ট রাজ্যে প্রশংসাপূর্ণ পত্রাদি প্রকাশ করায় পীড্‌মণ্ট গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জর্ম্মাণীতে কো দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করেন। রোমে পতনের পর ম্যাট্‌সিনির সহিত তাঁহার আবার জেনিভায় সাক্ষাৎ হয়।

কিছুদিন পরে ম্যাট্‌সিনি যখন লণ্ডনে প্রত্যাগত হন তিনি দেখিলেন যে গ্যালেঙ্গাও তথায় আসিয়া উপস্থিত। লণ্ডনে আসিয়া গ্যালেঙ্গা মিলানবাসিদিগের নিন্দাসূচক একখানি পত্র প্রচার করেন এই পত্রে তিনি সেই সাহসিক নাগরিকগণকে কাপুরুষ পর্য্যন্ত বলিয়াও গালি দিয়াছিলেন, ম্যাট্‌সিনি ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত ও ব্যথিত-হৃদয় হইয়া এবার প্রতিজ্ঞা করিলেন যে এখন হইতে তাঁহার আর মুখ দর্শন পর্য্যন্ত করিবেন না।

১লা অক্টোবরের মধ্যে ম্যাট্‌সিনির সমস্ত প্রস্তুত হইল। কিন্তু রোমানিয়োর আজও কোন সম্বাদ নাই। ম্যাট্‌সিনি তাঁহাকে জবাবের চিঠি লিখিতে আরি-

লেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। কিন্তু ম্যাট্‌সিনি সেই সেক্রেটারির নিকট হইতে হতাশাজনক সম্বাদ পাইতে লাগিলেন। সেক্রেটারির পত্রে অবগত হইলেন যে রামোরিণো দ্যূতক্রীড়ার ব্যসনে সম্পূর্ণ গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ঋণে জড়িত হইয়াছেন, সৈন্য সংগ্রহের চিন্তা পর্য্যন্তও মনে আনেন না। ম্যাট্‌সিনি তাঁহার নিকট দূতের পর দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রামোরিণোর ভ্রূক্ষেপ নাই। অবশেষে সবিশেষ উত্তেজিত ও তিরস্কৃত হইয়া তিনি আরও কিছু সময় চাহিলেন, বলিলেন অতর্কিতপূর্ব্ব প্রতিবন্ধকাবলী উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার এইরূপ বিলম্ব হইল। ম্যাট্‌সিনি অগত্যা নবেম্বর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নবেম্বরও চলিয়া গেল, তথাপি রামোরিণোর দেখা নাই। রামোরিণো ম্যাট্‌সিনিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যে সহস্র সৈনিক সংগ্রহ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহার একশত সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে; কারণ পারিসের পুলিস্ কি সূত্রে এই সঙ্কল্পের আভাস পাইয়াছে। তাহারা তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি কথঞ্চিৎ তাহাদিগের হাত এড়াইয়াছেন; তথাপি তাহাদিগের সন্দেহ অপনীত হয় নাই; তাহারা তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপে দৃষ্টি রাখিয়াছে; সুতরাং তিনি এসময়ে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালনে অক্ষম হইলেন। এই বলিয়া তিনি যে চল্লিশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দশ সহস্র মাত্র ফিরাইয়া পাঠাইলেন। ম্যাট্‌সিনি তাহার পর বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলেন যে ফরাশি গবর্ণমেণ্ট ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া রামোরিণোকে হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। ফরাশি গবর্ণমেণ্ট রামোরিণোর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। রামোরিণোর নিকট হইতে গুপ্ত মন্ত্রণা সকল বাহির করিয়া লওয়া ফরাসি গবর্ণমেণ্টের তত অভিপ্রেত ছিল না। রামোরিণো ব্যতীত সেভয়-অভিযান অকৃতকার্য্য হইবে বলিয়াই ফরাসি গবর্ণমেণ্ট রামোরিণোকে করতলস্থ রাখিলেন।

ইত্যবসরে অভ্যুত্থানের সুবিধা সকল এক একটী করিয়া সমস্ত বিনষ্ট হইতে লাগিল। অভ্যন্তরে আভ্যুত্থানিক দল বিনষ্ট, ভগ্নাশ, ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। যে গুপ্ত বিষয় অসংখ্য বহিশ্চর ইতালীয়, ফরাশিস্, পোল, সুইস প্রভৃতির হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, তাহা বহু দিন সেই সেই দেশের পুলিশের অগোচর থাকিবার নহে। চতুর্দ্দিক্ হইতে পুলিশ কর্ম্মচারিগণ জেনোয়ায় আসিয়া পড়িতে লাগিল। তাহারা তাঁহাদিগের প্রতি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত গুপ্তচর সকল নিয়োজিত করিতে লাগিল; তাঁহাদিগের পথে প্রতিবন্ধক বর্ত্তি

বিকীর্ণ করিতে লাগিল, এবং জেনিভীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিল তাঁহারা যেন জেনিভীয় ক্যাণ্টনে সমবেত নির্ব্বাসিতদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। ম্যাট্‌সিনি ইহা জানিতে পারিয়া সমবেত নির্ব্বাসিতদিগকে দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেন, এতদূরে যাহাতে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ ও সন্দেহ উদ্দীপিত হইতে না পারে। কিন্তু শাসনকেন্দ্র হইতে এরূপ দূরে অবস্থিতি, তাহাদিগকে যথেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিল। ক্রমাগত বিলম্বে ও চির-অপ্রতিপালিত প্রতিশ্রুতিতে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া তাহারা সর্ব্বপ্রকার শাসনের অতীত হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা কর্ম্মের অনুসন্ধানে আপন ইচ্ছায় যথা তথা আসিতে যাইতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে অতি দীন যাহারা, তাহারা মাধ্যমিক ধনাগারে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিল; এইরূপে কার্য্যের জন্য যে ধন সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়িত হইতে লাগিল।

অন্যান্য দেশস্থিত নির্ব্বাসিতেরা ক্রমাগত ম্যাট্‌সিনির নিকট লোক পাঠাইতে লাগিলেন—বলিলেন যে যদি শীঘ্র কার্য্য আরব্ধ না হয় তাহা হইলে তাঁহারা হয় বিচ্ছিন্ন হইবেন অথবা স্বাধীন ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিবেন। ম্যাট্‌সিনি দেখিলেন উভয়ই বিপৎসঙ্কুল। ফরাশি ভূক্ত সকল পোলণ্ডীয় নির্ব্বাসিতদিগকে ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইতে স্বীকৃত হইলে ক্ষমা, পাশ, ও পাথেয় দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই কথা শুনিয়া এদিকে সুইস কমিটি তাঁহাদিগের অর্থ-সাহায্য বন্ধ করিলেন। ইঁহাদিগকে হস্তগত রাখিবার জন্য অগত্যা ম্যাট্‌সিনিকে ইঁহাদিগকে অর্থসাহায্য প্রদান করিতে হইল।

ম্যাট্‌সিনি চতুর্দ্দিকে মহাবিপদ্ দেখিলেন। রামোরিণো এই অভিযানে যোগ না দিলে অনেকেই অর্থ-সাহায্য করিবেন না, রামোরিণো অধিনেতৃত্বপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন একথা শুনিলে লোকে ভাবিবে তবে এ অভিযানের কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা নাই—নহিলে রামোরিণো ইহাতে যোগ দিলেন না কেন। আবার যদি তিনি রামোরিণোর বিশ্বাসঘাতকতা ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে লোকে ভাবিবে তিনি নিজে সেনাপতি হইবেন বলিয়া রামোরিণোর বিরুদ্ধে লোকের মনে এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহার উপর আবার তাঁহার নিকট এমন কাগজ পত্র ছিল না, যদ্দ্বারা তিনি রামোরিণোর দোষ নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণীকৃত করিতে পারেন।

ইহার উপর আবার তাঁহাদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। বোনারোতি এতদিন ম্যাট্‌সিনির সহিত একমতে কার্য্য করিতেছিলেন। যে দিন হইতে ম্যাট্‌সিনি লম্বার্ড বনিবৃন্দের সহিত আত্মীয়তা করেন, সেই দিন হইতে তিনি ম্যাট্‌সিনির উপর চটিয়া যান। বোনারোতি পূর্ণ সৌরতান্ত্রিক ছিলেন। তাঁহার সন্দেহ জন্মিল যে ম্যাট্‌সিনি ক্রমে

লোকতান্ত্রিকতা হইতে স্খলিত হইতেছেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে ম্যাট্‌সিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, তিনি সকল শ্রেণীকে লইয়াই উঠিতে চান, সম্প্রদায়-বিশেষের উপর তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না।

যাহা হউক বোনারোতি ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে তাঁহাদিগের সমূহ ক্ষতি হইল। কারণ অভিযানের সুইস উপাদান প্রধানতঃ কার্ব্বোনারো; বোনারোতি স্বইস কার্ব্বোনারোদিগের অধিনেতা। সুতরাং ম্যাট্‌সিনিকে বোনারোতির সহিত তাঁহাদিগকেও হারাইতে হইল।

কি ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত ম্যাট্‌সিনিকে এই সকল বিপদের উপর বিপদ্‌ সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত। তিনি আবার সুইস্‌ সভ্যগণকে বশীভূত করিলেন; তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক এক করিয়া বোনারোতির আধিপত্য হইতে ফিরাইলেন। আবার নূতন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিলেন। পোলণ্ডীয় নির্ব্বাসিতদিগের ফ্রান্সে প্রত্যাগমন নিবারণ করিলেন। এবং লিয়ন্‌সে সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য কর্ম্মচারিগণ ও তৎসহ প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ করিলেন। লিয়ন্‌সের সেনাবিভাগের সৈনাপত্য রোসেল্‌, নিকোলো, আর্ড্‌ইনো, এবং আন্সেলমাণ্ডি এই কয় জনের উপর অর্পিত হইল।

এ অভিযান যে কৃতকার্য্য হইবেই হইবে, ম্যাট্‌সিনির এরূপ বিশ্বাস ছিল না। তবে তিনি কেন এ অসমসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইলেন? অকৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা দেখিয়া কেন তিনি ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইলেন? তিনি জানিতেন যে সকল বহিশ্চর ও অন্তশ্চর সাধারণতান্ত্রিক তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতীক্ষায় আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন—যাঁহারা শুদ্ধ এই অভিযানসজ্জার জন্য বিপুল অর্থ চাঁদা দিয়াছেন এবং যাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে, আজ তাঁহাদিগকে যদি হঠাৎ বলা যায় যে অভিযানবার্ত্তা অলীক ও স্বপ্নমাত্র, তাহা হইলে সেই দলের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়—যে দলের উপর ইতালী উদ্ধারের একমাত্র আশা ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি জানিতেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলেও তত ক্ষতি নাই, তাহাতে আর কিছু না হউক অন্ততঃ সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভবিষ্য অভ্যুত্থানের পথ পরিষ্কৃত রাখা যাইতে পারিবে। আর একটী কথা এই যে যাঁহারা বৈপ্লবিক ইতিহাস বিন্দুমাত্রও অবগত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে অভ্যুত্থানের অনুকূল ঘটনা সকল একবার সৃষ্ট হইলে অভ্যুত্থান নিবারণ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, তখন সেই স্রষ্টৃগণই স্বসৃষ্ট ঘটনাবলী দ্বারা সম্পূর্ণ অধিনীত হইয়া থাকেন, তখন ইচ্ছা হইলেও কার্য্যক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই নূতন পরিশ্রমে সমস্ত নবেম্বর

ও ডিসেম্বর অতীত হইল। বিশ্বব্যাপী অবিশ্বাসের ভাব ও কোষশূন্যতা নিবন্ধন অবিলম্বিত কার্য্যারম্ভ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ম্যাট্‌সিনি জানুয়ারীর শেষ কার্য্যারম্ভের সময় নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং লিয়ন্‌সের সেনানায়কদিগকেও ঠিক সেই সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

ম্যাট্‌সিনি রামোরিণোকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যেকোন মূল্যে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অতএব তিনি যদি ইচ্ছা করেন এখনও আসিয়া সৈনাপত্য গ্রহণ করুন্‌। এই বলিয়া তিনি ২০ এ জানুয়ারী অভিযান-যাত্রার দিন স্থির করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

ম্যাট্‌সিনি রামোরিণোর উত্তরের আশায় রহিয়াও, অভিযানের আবশ্যকীয় সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদলের নিজ নিজ কেন্দ্র হইতে বহির্গত হওয়ার দিন স্থির হইল। যে যে পথ দিয়া গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে হইবে, যে যে উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং যে যে আস্থান হইতে অগ্রদূত পাঠাইতে হইবে, এ সমস্তই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে স্থিরীকৃত হইল।

যাহারা লিয়ন্‌ হইতে নির্গত হইবে, জেনিভা হ্রদের তীরে তাহাদিগের জন্য অস্ত্রাগার সকল প্রস্তুত করিয়া রাখা হইল। হ্রদ পার হইবার জন্য তাহাদিগের নিমিত্ত নৌকা ও ভেলা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইল। জেনিভায় আসিয়া জুটিলে গবর্ণমেণ্ট বাধা দিতে পারেন, এই জন্য তাহাদিগকে একেবারে কারুজ নগরে যাইতে আদেশ দেওয়া হইল। যাহারা জেনিভা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতে আসিবে, কারুজ নগরে তাহাদিগের জন্য অস্ত্রাগার সকল প্রতিষ্ঠিত হইল। যুদ্ধের অন্যান্য অবান্তর আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত হইল। সেনাপতি সকল স্থিরীকৃত হইল, ঘোষণাপত্র সকল প্রচারিত হইল।

আনেস্সীর গমন-পথে অবস্থিত সেণ্ট জুলিয়ানই কার্য্যকেন্দ্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। সেভয়-নিবাসী ষড়যন্ত্রিদিগকে আদেশ করা হইল তাহারা যেন সেণ্ট জুলিয়নে উপস্থিত হইয়া অভ্যুত্থান-সঙ্কেত প্রদান করেন। বৈপ্লবিক সেনা সংখ্যায় এত বাড়িয়াছিল, যে সেণ্ট জুলিয়ানে তাহার গতি প্রতিরোধ করা বড় সহজ হইত না।

রামোরিণোর আগমন-প্রতীক্ষায় বৈপ্লবিক সেনার অনর্থক অনেক কালবিলম্ব হইয়া পড়িল। ম্যাট্‌সিনি ভাবিলেন যে রামোরিণো তাঁহার শেষ পত্র পাইয়া অবিলম্বে আসিয়া নিশ্চয়ই সৈনাপত্য গ্রহণ করিবেন। অবিলম্বে আসিবেন—এই আশায় ম্যাট্‌সিনি প্রবঞ্চিত হইলেন। রামোরিণো ম্যাট্‌সিনির পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে তিনি অবিলম্বে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত

হইতেছেন। এই আশায় তাঁহাদিগের অপরিমিত বিলম্ব হইয়া পড়িল। এই বিলম্বই তাঁহাদিগের ভাবী পরাজয়ের মূল। রামোরিণো প্রতি আস্থানে পৌঁছিয়া শীঘ্র আসিতেছেন বলিয়া দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রতি আস্থানে অকারণ বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এইরূপে ৩১ এ জানুয়ারী অতীত হয়, এমন সময় রামোরিণো দেখা দিলেন। রামোরিণো দুই জন সেনানায়ক, এক জন এডিকঙ্গ ও একজন ডাক্তার লইয়া রঙ্গস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ম্যাট্‌সিনি তাঁহাকে দেখিলেন; তাঁহার দুরভিসন্ধি যে সকলেই জানিতে পারিয়াছে—রামোরিণো যে তাহা অবগত আছেন, তাঁহার মুখের সলজ্জ ও বিনত ভাব দেখিয়া তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন। ম্যাট্‌সিনির সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার সময় তাঁহার নয়নদ্বয় মৃত্তিকা হইতে একবারও উত্তোলিত হয় নাই। ম্যাট্‌সিনি তখনও জানিতে পারেন নাই যে রামোরিণো ফরাশি গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন-প্রকার গূঢ় সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি ভাবি দর্শনে দেখিলেন যে রামোরিণো তাঁহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন। এই জন্য ম্যাট্‌সিনি রামোরিণোকে সেণ্টজুলিয়ান্ পর্য্যন্ত একবারও নয়নের অন্তরাল করিলেন না, এবং সেণ্টজুলিয়ান্ পৌঁছিয়া সৈনাপত্য যাহাতে রামোরিণোর হস্তে পতিত না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সযত্ন হইলেন। ম্যাট্‌সিনি মনে মনে ভাবিলেন যে আভ্যুত্থানিক সেনা একবার নিজ বল বুঝিতে পারিলে, রামোরিণোর নামে আর ততদূর মুগ্ধ হইবে না।

ম্যাট্‌সিনি অতীত বিষয়ে একটী কথাও কহিলেন না। ম্যাট্‌সিনি তাঁহার হস্তে সৈন্যের একটী তালিকা ও যুদ্ধের কার্য্যপ্রণালীর একখানি নকসা প্রদান করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যাঁহাদিগকে সেনানায়ক করা হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহার অভীপ্সিত কি না। রামোরিণো কোন বিষয়েই কিছু আপত্তি করিলেন না। কিন্তু তিনি স্বয়ং সৈনাপত্য গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ম্যাট্‌সিনি সেণ্টজুলিয়ান্ পৌছন পর্য্যন্ত তাঁহাকে সৈনাপত্য প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

১লা ফেব্রুয়ারী (১৮৩৪) তাঁহারা সেণ্টজুলিয়ানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জেনিভা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের গতি রোধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদিগের নৌকা সকল ধৃত হইল; তাঁহারা যে হোটেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সশস্ত্র পুরুষ দ্বারা তাহা ঘিরিয়া ফেলা হইল, এবং শিরস্ত্রাণ বা অস্ত্রাদির আকৃতি দ্বারা যাহাদিগকে বৈপ্লবিক সেনার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ জন্মিল, তাহাদিগকে ধৃত করা

হইল। কিন্তু সাধারণ অধিবাসিগণ অনেক দিন হইতে বৈপ্লবিকদিগের প্রতি সহানুভূতি করিতে শিখিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহারা মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন। আর গবর্ণমেণ্টের সৈনিকপুরুষ ও সৈনিক কর্ম্মচারিগণ অন্তরে অন্তরে তাঁহাদিগের সহিত সহানুভূতি করিতেন, সুতরাং তাঁহারা নাগরিকদিগের তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুসরণ ও নির্যাতন হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

সমস্ত লোক নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইল, সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইল; ক্রমে ক্রমে সকলেই নৌকা ও ভেলাযোগে হ্রদ পার হইল; ম্যাট্‌সিনি রুফিনি ও কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে সর্ব্বশেষে রজনীতে একটী ভগ্ন তরীতে আরোহণ করিয়া হ্রদ পার হইলেন। হ্রদ পার হইয়া তিনি শিবিরে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন আনন্দ, উৎসাহ ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস—সকলেরই মুখমণ্ডলকে সমুজ্জ্বলিত করিয়াছে। কিন্তু এ আনন্দ ও হর্ষ চিরস্থায়ী হইল না; ভীষণতর বিঘ্নপরম্পরা প্রতিপদে তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে লাগিল।

জর্ম্মাণীয় নির্ব্বাসিতেরা—বারন্‌ ও জুরিক হইতে আসিয়া যাঁহাদিগের যোগ দিবার কথাছিল—এই কার্য্য অতি লঘু বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা উৎসাহোন্মাদে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে সুইস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের কার্য্যের অন্তরায় হইতে পারেন। ভুলিয়া বৃহৎ দলে বিভক্ত হইয়া বৈপ্লবিক শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া, সেই শিরস্ত্রাণের উপর বিজয়-চিহ্নস্বরূপ ওক-পত্র উড়াইয়া যেন করতস্থ জয়-লক্ষ্মীকে আনিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নির্গমনস্থান হইতে গন্তব্য স্থান অতি দূরবর্ত্তী; সুতরাং তথায় পৌছান অনেক-সময়সাপেক্ষ এই সময় পাইয়া সুইস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের গতিরোধের বিশেষ আয়োজন করিতে পারিলেন। ছোট ছোট দল গুলি গবর্ণমেণ্ট সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল, কতকগুলি ছত্রভঙ্গ হইল, কতকগুলি সমস্ত বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল, কিন্তু তাঁহাদিগকে এত ঘুরিয়া আসিতে হইয়াছিল যে তাঁহারা যথাসময়ে নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এটী অভ্যুত্থানের কৃতকার্য্যতার পক্ষে একটী অত্যন্ত অশুভ ঘটনা।

পোলিশ দল লিয়ন্‌ হইতে হ্রদ পার হইল। রামোরিণো গ্রাবস্কি নামক ব্যক্তিকে ইহার অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। গ্রাবস্কি শস্ত্র ও শস্ত্রী পৃথক্‌ করিয়া অতি গুরুতর প্রমাদ করেন। সুইস্‌ সৈন্যদল সর্ব্ব-প্রথমে আসিয়া অস্ত্রের ভেলা দখল করে, তাহার পর অক্লেশে সৈন্যদিগকে কারারুদ্ধ করে।

এইরূপে শুদ্ধ যে আভ্যুত্থানিক সেনার ত্রি-চতুর্থ ভাগ বিধ্বস্ত হইল এরূপ নহে, ইহা অপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্ট এই

হইল যে রামোরিণো এতদিন যে ছল খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, এতদিনে সেই ছলের মূল প্রাপ্ত হইলেন।

যাঁহাদিগের বিন্দুমাত্রও বৈপ্লবিকী প্রতিভা আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে এখনও হতাশ হইবার কোন কারণ ছিল না; তাঁহারা সেই ভগ্নাবশিষ্ট সেনা লইয়াও সেণ্ট জুলিয়ান্ অধিকার করিতে পারিতেন। কারণ সেণ্ট জুলিয়ানে একজনও সৈনিকপুরুষ ছিল না। পীড্‌মণ্টিস গবর্ণমেণ্ট সেণ্টজুলিয়ান্ রক্ষা অসম্ভব মনে করিয়া ইহা পরিত্যাগ করিয়া আনেনসীর রক্ষার জন্য মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছাউনি করিয়া ছিলেন। আনেন্‌সী দখল করিতে পারিলে তাঁহাদিগের পক্ষে লোক-সাধারণের সহানুভূতি দ্বিগুণিত হইত, গবর্ণমেণ্টকে ভীত হইয়া অন্যান্য আভ্যুত্থানিক দলকে মুক্ত করিতে হইত, তাহারা মুক্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতে পারিত।

পীড়মণ্টিস্ সেনা সেণ্টজুলিয়ান্ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে—এই সম্বাদ রামোরিণোকে প্রদান করা হইল। এখনও রামোরিণো আপনার প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিতে পারেন—এই আশায় ম্যাট্‌সিনি সৈনাপত্য তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া নিজে একটী বন্দুক মাত্র হস্তে লইয়া পদাতিক সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেন; কিন্তু রামোরিণো আনেন্‌সীর অভিমুখে যাত্রা না করিয়া সৈন্যদিগকে হ্রদের ধার দিয়া অকারণে ক্রমাগত চব্বিশ ঘণ্টা হাঁটাইয়া লইয়া গেলেন। কেন যাইতেছেন, কোথায় যাইতেছেন কাহাকেও কিছু বলিলেন না। ইহাতে সৈন্যগণ ভগ্নহৃদয়, ক্লান্তশরীর, ও উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব হইয়া উঠিল।

এতদিনে ম্যাট্‌সিনির শরীর ভাঙ্গিল। বিগত তিন মাস ধরিয়া তিনি যে রাত্রি দিন অশ্রান্ত খাটিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর অন্তঃসারশূন্য হইয়া ছিল। গত সপ্তাহে তিনি একবারও শয়ন করেন নাই, দশ পনর মিনিট করিয়া কখন কখন নিদ্রা গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা চেয়ারে বসিয়াই। চিন্তায় জর্জ্জরিত, বিজয়-বিষয়ে বিশ্বাসশূন্য, বিশ্বাসঘাতকতার পূর্ব্ব লক্ষণে মর্ম্মাহত, অভাবনীয় রূপে প্রতারিত, এইরূপ মানসিক অবস্থাতেও আবার সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য সহাস্যবদন, কার্য্যের গুরুত্বজ্ঞানে প্রপীড়িত—ম্যাট্‌সিনির শারীরিক ও মানসিক বীর্য্য একেবারে বিনষ্ট হইল।

যখন তিনি পদাতিক সৈন্যে প্রথম প্রবিষ্ট হন, তখন হইতেই জ্বরে তাঁহাকে ভস্ম করিতেছিল। যদি উভয়পার্শ্বস্থ সৈনিকেরা তাঁহাকে ধরিয়া না রাখিত, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি পড়িয়া যাইতেন। সে রাত্রিতে ভয়ানক শীত হইয়াছিল, এবং ম্যাট্‌সিনি অনবধানতাবশতঃ তাঁহার কোট ভুলিয়া

আসিয়াছিলেন। শীতে তাঁহার দন্তে দন্তে ঘর্ষণ হইতেছিল, তিনি যেন স্বপ্নাবস্থায় চলিতে লাগিলেন। এক জন সৈনিক পুরুষ তাঁহার ক্লেশ দেখিয়া কাতর হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠ নিজ ক্লোক দ্বারা আবৃত করিলেন—ম্যাট্সিনির এমন শক্তি ছিল না যে তিনি মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ম্যাট্সিনি যদিও অচৈতন্যাবস্থায় গমন করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার সময়ে সময়ে সংজ্ঞা উপস্থিত হইয়া বোধ হইতেছিল যে তাঁহারা সেণ্ট জুলিয়ানের অভিমুখে যাইতেছেন না। বোধ হওয়ায় তিনি প্রাণপণে ক্ষণকালের জন্য চৈতন্য পরিরক্ষিত করিয়া দৌড়িয়া রামোরিণোর নিকট গমন করিলেন—বলিলেন 'তুমি যদি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথে গমন না কর, তাহা হইলে ঈশ্বরের অভিসম্পাত তোমার মস্তকে পড়িবে"। রামোরিণো বার বার তাঁহার নিকট 'নির্দ্দিষ্ট স্থানেই যাওয়া হইবে' বলিয়া শপথ করিলেন।

যে সময় তিনি রামোরিণোর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র অগ্রদল হইতে একটী শব্দ হইল। ম্যাট্সিনি অবশেষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল মনে করিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে শব্দ-স্থানে গমন করিলেন। তাহার পর কি হইল ম্যাট্সিনির কিছুই মনে ছিল না। তাঁহার ক্ষীণ দৃষ্টি রহিত হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

একটী মূর্চ্ছার অপগমন ও দ্বিতীয় মূর্চ্ছার অভ্যুত্থানের মধ্যবর্ত্তী কালে একবার তাঁহার স্মরণ ছিল যেন গুইস্পি লাম্বার্ত্তি আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন 'তুমি কি খাইয়াছ?' তিনি যে পদগুলি দ্বারা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'তুমি কি খাইয়াছ বা কি লইয়াছ' সে গুলির অর্থ এদুইই হইতে পারে। ম্যাট্সিনি পদগুলিকে শেষোক্ত অর্থেই গ্রহণ করিলেন। শত্রু-হস্তে পতিত হইয়া তাহাদিগের উৎপীড়নে পাছে সমস্ত গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া ফেলেন—এই ভয়ে ম্যাট্সিনি সর্ব্বদা পকেটে করিয়া উগ্র বিষ রাখিতেন। তাঁহার বন্ধু লম্বার্ত্তির সন্দেহ হইয়াছিল যে ম্যাট্সিনি বুঝি সেই বিষ পান করিয়াছেন। এই সন্দেহ করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তুমি কি খাইয়াছ?" অভিযানের অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া ম্যাট্সিনির দলের কোন কোন লোকের সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে ম্যাট্সিনি শত্রুদিগের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সন্দেহে ম্যাট্সিনির মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছিল, তিনি সেইজন্য ভাবিলেন বুঝি লম্বার্ত্তিও সেই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "তুমি কি লইয়াছ?" যেই এই ভাব তাঁহার মনে উদিত হইল, অমনি তিনি আবার মূর্চ্ছিত

হইলেন। সেই রাত্রির ন্যায় ভীষণ রাত্রি ম্যাট্‌সিনি জীবনে আর কখন অনুভব করেন নাই।

রামোরিনো যখন ম্যাট্‌সিনির এই অবস্থা শুনিলেন, তখন তাঁহার প্রধান অন্তরায় দূর হইল বলিয়া মহাহৃষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার অশ্ব আনিতে আদেশ দিলেন, এবং সৈন্যদিগকে বিচ্ছিন্ন হইবার আদেশ প্রদান করিয়া, অশ্বারোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। সৈন্যেরা বিচ্ছিন্ন না হইয়া কার্লো বিয়াঙ্কোকে সৈনাপত্যে বরণ করিতে চাহিল; কিন্তু তিনি এরূপ সময় এরূপ গুরুতর দায়িত্ব মস্তকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। সুতরাং তাহারা অগত্যা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

চৈতন্য লাভের পর ম্যাট্‌সিনি দেখিলেন তিনি একটী বারিকে বৈদেশিক সৈনিকবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন তাঁহার প্রিয় বন্ধু এঞ্জেলো উসিগ্‌লিয়ো তাঁহার সমীপে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় রত রহিয়াছেন। ম্যাট্‌সিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আমরা কোথায় রহিয়াছি?" তিনি অতি মৃদু ও শোকাকুল স্বরে বলিলেন "সুইজর্লণ্ডে"। ম্যাট্‌সিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাদের সেনাদল কোথায়?"। আবার উত্তর পাইলেন "সুইজলণ্ডে"।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

রজনী।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

লর্ড লিটন বোধ হয় তাঁহার পুষ্পনারীর কল্পনা শেলি হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। শেলির সুকোমল কবির হৃদয় একটি সুকোমল রমণীরত্ন সৃষ্টি করিয়া তাহাকে কোমলতর লজ্জাবতীর কুসুমকাননে স্থাপিত করিয়াছিল। তাঁহার সুকুমার করস্পর্শে কোমলতর বৃন্ত ও কুসুমাবলি লালিত হইত এবং কেবল লজ্জাবতীই জানিতে পারিত কে তাহার সুখবর্দ্ধন সম্পন্ন করিতেছে। এই পুষ্পনারী যেন লজ্জাবতীর সোহাগিনী ছিল। লজ্জাবতী তাহাকে দেখিয়া যেন প্রফুল্ল হইত, তাহার করস্পর্শে যেন সুখিনী হইত। এরূপ সুকুমারী নারীরত্নের কল্পনা কেবল শেলির ন্যায় কবিরই সম্ভবে। লর্ড লিটন বোধ হয় এই কল্পনাকে কোমলতর মানসিক গুণে বিভূষিত করিয়াছেন, এবং সেই লজ্জাবতীলতার ন্যায় নিডিয়ার হৃদয় কভু সঙ্কুচিত, কভু বিস্ফারিত, কভু প্রফুল্লিত করিয়া দেখাইয়াছেন। নিডিয়া সকলের সুন্দর কুসুম-কানন পরিসেবিত ও সুশোভিত করিতেন। কুসুম সকল তাহার করস্পর্শে ক্রমে সুন্দরতর হইয়া

ফুটিত। শেলির পুষ্পনারী লজ্জাবতীর কুসুম-কাননে বনদেবী রূপে প্রতীত হইত। নিডিয়াও গ্রকসের সুন্দর কুসুম-কাননের বনদেবী। বঙ্কিমবাবুর রজনী কিন্তু তাহা নহে। তাহাকে কোন খানে বনদেবী রূপে প্রতীত হয় না। বোধহয় এতদ্দেশীয় সাহিত্যে এত বন-দেবীর কল্পনা আছে যে তিনি রজনীকে আর বনদেবী রূপে দেখাইতে চাহেন নাই। নিডিয়ার চরম কল্পনা কালিদাসের শকুন্তলা দেখাইয়াছেন। শকুন্তলা পুষ্পনারীর অতি পরিস্ফুট কল্পনা। সেই শকুন্তলাতে আবার কেমন কতকগুলি এতদ্দেশীয় মধুর, সলজ্জ, কোমল ভাব আছে যাহা নিডিয়াতে নাই। থাকিবার সম্ভাবনা নহে। যে হেতু নিডিয়া ইংরাজী কল্পনা। শকুন্তলা ভারতের মাধুরী কল্পনা। বঙ্কিমবাবু জানিতেন, কালিদাসের এই সুন্দরী শকুন্তলার নিকট তিনি কখনই যাইতে পারিবেন না। শকুন্তলা ভারতের কবিত্ব পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। কাদম্বরীও শকুন্তলার কাছে যাইতে পারেন নাই। বনবাসিনী সীতাও রামাশ্রমে এমত মোহিনীবেশে বিচরণ করিতে পারেন নাই। ইহার কাছে শেলি পরাভূত, লর্ডলিটনও পরাভূত। ভারতবাসীর হৃদয়ে বনবাসিনী শকুন্তলার মোহিনী কল্পনা যতকাল বিরাজিত থাকিবে, ততকাল কোন নিডিয়াই তাহার চিত্ত হরণ করিতে পারিবে না। বঙ্কিমবাবু ইহা বিলক্ষণ জানিয়া রজনীকে কেবল মালা গাঁথিতে দিয়াছেন, কুসুম-কাননে তাহাকে বিচরণ করিতে দেন নাই। একজন পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া দিতেন, রজনী কেবল মালা গাঁথিয়া দিতেন। নিডিয়ার ন্যায় তিনি কুসুমকাননে জলতরঙ্গের মত প্রতি কুসুমতরুর সমক্ষে গিয়া পুষ্প চয়ন করিতেন না, শকুন্তলার ন্যায় আলবালে জলসেচন করিতেন না, সহকারের সহিত মাধবীর বিবাহ দিতেন না. শেলির পুষ্পনারীর ন্যায় কোমল বৃন্ত সকলকে করস্পর্শে আনন্দিত করিতেন না, এবং কুসুমের ও কোমল বৃন্তের কীট হরণ করিতেন না। তিনি কেবল মাত্র পুষ্পচয়ন করিতে জানিতেন। কুসুমই তাঁহার আনন্দ এবং কুসুম গ্রন্থনই তাঁহার বিনোদন।

নিডিয়া হইতে রজনী যে যে বিষয়ে বিভিন্ন, তাহা আমরা অনেক দূর আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই সমস্ত বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও স্থূল বিষয়ে ইহাদিগের কত সৌসাদৃশ্য তাহাও সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক পরিমাণে প্রতীত হয়, রজনী আর কিছুই নহে, ইহা বঙ্কিমের নিডিয়া। কিন্তু এই বঙ্কিমের নিডিয়া যে গুণে লিটনের নিডিয়া হইতে একেবারে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সে গুণের বিষয় এখনও আলোচিত হয় নাই। এই গুণে রজনী নিডিয়া হইতে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

যেমন ভগিনীদ্বয়ে অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও, তাহাদিগের বৈসাদৃশ্য এত অধিক ও উজ্জ্বল যে তাহাদিগকে দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া বিলক্ষণ চেনা যায়, রজনীকে তদ্রূপ নিডিয়া হইতে বিলক্ষণ পৃথক্ করা যায়। বঙ্কিমবাবু রজনীতে এমত একটি নিজভাব প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে রজনী আর নিডিয়া নাই, তাহা বঙ্কিমবাবুর রজনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে গুণ রজনীর চিন্তাশীলতা, তাহা রজনীর শ্রেষ্ঠতর-প্রতিভা-সমুৎপন্ন নৈতিক তত্ত্ব দেখিবার আশ্চর্য্য শক্তি।

প্রতিভা, নিডিয়ারও ছিল। নিডিয়া সেই প্রতিভা বলে পার্থিব ঘটনার উপর জয়লাভ করিতেন। তিনি প্রতিভালোকে বিপদের মাঝে পথ দেখিয়া লইতেন। তাঁহার নিকট বাহ্যজগৎ অন্ধকারময় ছিল বটে, কিন্তু অন্তর্জগৎ পূর্ণ আলোকিত ছিল। তিনি সেই আলোকে বাহ্যজগৎ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন। যাহা আয়ন, গ্লকস দেখিতে পাইতেন না, তিনি তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেন, আয়নকে সাবধান ও সতর্ক করিয়া দিতেন, আর বেসিসের কুহকজাল ভেদ করিতে পারিতেন, গ্লকসের ভবিষ্য বিপদ্ অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেন। এই প্রতিভা রজনীরও ছিল। তিনি এই প্রতিভাপ্রভাবে হীরালালের উপর জয়লাভ করিয়াছেন। এই প্রতিভাপ্রভাবে তিনি সাহসভরে গোপালের সহিত বিবাহ অতিক্রম করিয়া নিজ প্রেমের ও হৃদয়ের বিমলতা এবং সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতিভা, তাঁহাকে অজ্ঞানতঃ সৎপথে রাখিয়াছে। প্রতিভা, তাঁহাকে অজ্ঞানতঃ অমরনাথের প্রতি কর্ত্তব্য এবং শচীন্দ্রের প্রতি কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিয়াছে। রজনীর প্রতিভা শুদ্ধ ইহাতেই নিবদ্ধ নহে, নিডিয়ার প্রতিভা অপেক্ষা তাহা কিছু শ্রেষ্ঠতর ছিল, সেই শ্রেষ্ঠতায় তাহা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। যে প্রতিভালোকে যোগী ও ঋষিগণের হৃদয়ে অপূর্ব্ব সত্য সকল, অপূর্ব্ব ভাব সমুদায় উদিত ও প্রতিভাত হইত, রজনীরও মনে সেই প্রতিভালোকে অপূর্ব্ব চিন্তাপরম্পরা উদিত হইয়া নৈতিক রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদায় প্রকাশিত করিত। তাঁহার প্রতিভা প্রতি ঘটনায় তাঁহাকে অপূর্ব্ব চিন্তাপথে লইয়া যাইত। নির্জ্জন শান্তিপথাবলম্বী সংসারবিরাগী বিষণ্ণ ঋষিহৃদয়ের যে চিন্তাপ্রণালী, রজনীহৃদয়ে সেই চিন্তাপ্রণালী কোথা হইতে অনুসৃত হইত। রজনী প্রতিভাবলে, সেই চিন্তাবলি দ্বারা অপূর্ব্ব রূপে নৈতিক রাজ্যের রহস্য সকল ভেদ করিতেন। তাঁহার রহস্যোদ্ভেদ দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার সেই চিন্তাশীলতায় একদা নির্জ্জনতা, বিষণ্ণতা, ও শান্তহৃদয়ের পরিচয় দেয়। নিডিয়া অপেক্ষা তাঁহাকে অধিকতর নির্জ্জন, বিষণ্ণ, ও শান্তপ্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়। প্রতিভাসম্পন্ন সহৃদয় ব্যক্তিগণ অন্ধকারে নক্ষত্রের মত নিগূঢ় নৈতিক তত্ত্বসকল দেখিতে পান। রজনীর চিন্তা-

শীলতায় যেন সেইরূপ এক একটী নক্ষত্র ফুটিত। জীবনের বিষণ্ণ ঘটনার উপর রজনী চিন্তা করিতেন,—সরল প্রতিভাসম্পন্ন বিষণ্ণ হৃদয়ের চিন্তা। এচিন্তা সকল স্বাভাবিক সেই ঘটনা হইতে পর পর উদিত হইত। অথচ সেই সকল চিন্তা একদা প্রতিভা, কোমল সহৃদয়তা, বিষণ্ণতা এবং অপূর্ব্ব অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়। এই দেখুন সেই অন্ধ যুবতী, একাকিনী জনহীনা রাত্রিতে যেখানে হীরালাল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল সেই দ্বীপে দাঁড়াইয়া, গঙ্গার কল কল জলকল্লোল শুনিতে শুনিতে কি ভাবিতেছেন :—

"হায় মানুষের জীবন! কি অসার তুই! কেন আসিস্—কেন থাকিস্—কেন যাস্? এ দুঃখময় জীবন কেন? ভাবিলে জ্ঞান থাকে না। * * * *। জীবন অসার—সুখ নাই বলিয়া অসার তাহা নহে। শিমুল গাছে শিমুল ফুলই ফুটিবে তাহা বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। দুঃখময় জীবনে দুঃখ আছে বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। কিন্তু অসার বলি এইজন্য, যে দুঃখই দুঃখের পরিণাম—তাহার পর আর কিছুই নাই। আমার মর্ম্মের দুঃখ আমি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল না—আর কেহ বুঝিল না—দুঃখ প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা শুনাইতে পারিলাম না—সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিলাম না। * * * *। এই সংসারে অনেক দুঃখী আছে, আমি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী কেন? এ সকল কাহার খেলা? দেবতার? জীবের এত কষ্টে দেবতার কি সুখ? কষ্ট দিবার জন্য সৃষ্টি করিয়া কি সুখ? মূর্ত্তিমতী নির্দ্দয়তাকে কেন দেবতা বলিব? কেন নিষ্ঠুরতার পূজা করিব? মানুষের এত ভয়ানক দুঃখ কখন দেবকৃত নহে—তাহা হইলে দেবতা রাক্ষসের অপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট। তবে কি আমার কর্ম্মফল? কোন্ পাপে আমি জন্মান্ধ?"

অন্য একস্থলে দেখুন প্রাকৃতিক দার্শনিক পণ্ডিতগণ যে তত্ত্ব অনেক পরীক্ষা ও গবেষণার পর সমুদ্ধার করিয়াছেন, রজনী কেমন সেই তত্ত্ব স্বাভাবিক প্রতিভা ও সহৃদয়তা প্রভাবে আপনাপনি দেখিতে পাইতেছেন :—

"তোমরা বুঝ না, বুঝাইবে কে? তোমাদের চক্ষু আছে, রূপ চেন, রূপই বুঝ। আমি জানি, রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র—শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে—নহিলে এক জনকে সকলেই সমান রূপবান্ দেখে না কেন? একজনে সকলে আসক্ত হয় না কেন? সেইরূপ শব্দও তোমার মনে। রূপ দর্শকের একটী মনের সুখ মাত্র; শব্দ শ্রোতার একটী মনের সুখমাত্র, স্পর্শ স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র। যদি আমার রূপসুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপ-

সুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্ব্বময় না হ-ইবে ?”

নিডিয়ার প্রতিভা এত তেজস্বিনী নহে। এই প্রতিভার সহিত নিডিয়ার প্রতিভা তুলনা করিলে তাহাকে তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি বলিয়াই প্রতীত হয়। রজনীর সুকুমার হৃদয়ে নৈতিক তত্ত্বের সৌকুমার্য্য স্বতঃই অনুভূত হইত। হৃদয়ের এতদূর সৌকুমার্য্য কেবল কামিনীরই সম্ভবে। এই সৌকুমার্য্য এতদূর কোমল যে তা-হাতে সুকোমল নৈতিক তত্ত্ব সকল প্র-তিভাসম্পন্ন প্রতীতির ন্যায় আপনাপনি উদয় হইত। তাহা অনুভব করিতে শিক্ষা অথবা উপদেশের আবশ্যক হইত না। চিন্তাপরম্পরায় তাহা একে একে সান্ধ্য-তারকাবলীর ন্যায় হৃদয়গগণে উদিত হইত। ইহাই প্রতিভা—হৃদয়ের এত-দূর সৌকুমার্য্য—যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান আপ-নাপনি অনুভূত হয় এবং স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রতীত হয়—ইহাই প্রতিভা। রজনীর এই-প্রকার সৌকুমার্য্য ও প্রতিভা ছিল; নিডিয়ার তাহা ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রজনীর চিন্তাশীলতা, বিষণ্নতা এবং শান্তভাবেও তাহাকে নিডিয়া হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে। নিডিয়াতে এই কতি-পয় গুণের বর্ণপ্রয়োগ করিয়া বঙ্কিম বাবু রজনীকে আপনার করিয়াছেন। নৈপুণ্য এই যে, এই গুণপরম্পরা রজনীর শরীরে স্বাভাবিকভাবে মিসিয়া গিয়াছে। চিত্র কোনস্থলে কাল্পনিক বোধ হয় না।

এই শান্তমূর্ত্তি রজনীর পার্শ্বে একটি স্বর্ণপ্রতিমা প্রভাসিত আছে—সে প্রতিমা উজ্জ্বল লবঙ্গলতার। উপন্যাস মধ্যে লবঙ্গ যেখানে উঠিয়াছেন সেই খানেই পাঠকের হৃদয়াম্বরে বিজলী খেলিয়াছে। সেই ভুবনেশ্বরী শুদ্ধ যে মিত্রজার পুরী লক্ষ্মীর ন্যায় আলোকিত করিয়াছিলেন এমত নহে, তিনি সকলের গৃহ আলো-কিত করিতে চাহিতেন, তিনি পাঠ-কের ও হৃদয় উজ্জ্বল গুণে আলোকিত করিয়াছেন। তিনি নবীনা যুবতী, কিন্তু তাঁহার যৌবন সুলভ চঞ্চলতা ছিল না। তাঁহার প্রকৃতিতে কেমন এক গম্ভীর ভাব আছে যাহাতে তাঁহাকে গৃহিণীর উপযোগিনী করিয়াছিল। অথচ তাঁহার গাম্ভীর্য্যে প্রফুল্লতা ছিল। বিষণ্নতা কেমন লবঙ্গলতা তাহা কখনই জানি-তেন না। তিনি বয়স গুণে প্রফুল্ল, অথচ আমোদিনী নহেন। ঈষৎ-হাস্য-বিস্ফারিত-বদন-বিভায় সকলকে মোহিত করিয়া তিনি কার্য্যোদ্ধার করিতেন।

লবঙ্গলতা বয়স ও প্রকৃতি-গুণে সর্ব্ব বিষয় শোভিত, সুন্দর, আশাপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ দেখিতে চাহিতেন। তিনি যে শুদ্ধ ভাল বাসিতেন বলিয়া বৃদ্ধ স্বামীকে নবীন সাজে সাজাইতেন, গ্রন্থকারের একথা সত্য নহে। তিনি ভাল বাসার রঞ্জনে যুবতীর ইচ্ছা মিশাইতেন। ইচ্ছা মিশাইয়া যাহাকে ভাল বাসিতেন তা-হাকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী শোভিত করি-তেন। ইহাই যুবতীর কার্য্য, ইহা লবঙ্গলতার প্রকৃতির গুণ। লবঙ্গ নিজে

সুখিনী পরদুঃখে দুঃখী করিতে ভালবাসিতেন। তিনি নিজের সুখে সন্তুষ্ট নহেন; চারিপার্শ্বে, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেখিতে চাহিতেন। তাঁহার সহৃদয়তা ও কৃপাময়ী প্রকৃতির এই অর্থ। সম্পত্তি ও সুখ নহিলে ললিত লবঙ্গলতা জন্মে না, বর্দ্ধিত ও পরিণত হয় না, ভুবনেশ্বরীও তদ্রূপ সমৃদ্ধিতে লালিত, ও প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন। দুঃখের ভয়ে তিনি সশঙ্কিত হইতেন, এই জন্য রজনীর সহিত শচীন্দ্রের বিবাহ দিতে এত ব্যস্ত ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। সুখ-প্রকৃতিতে দীনতার বিশুষ্ক বায়ু অসহ্য বোধ হইত। লবঙ্গলতা সমৃদ্ধির সরস মলয়-হিল্লোলে দুলিতে ও নাচিতে ভালবাসিতেন। তিনি সেইরূপ দুলিয়া দুলিয়া মিত্রজার আলয় সুখে পূর্ণ করিয়াছিলেন, রজনীর গৃহে আনন্দ সঞ্চার করিতে আসিতেন, অমরনাথের হৃদয় বিস্মৃতির আনন্দে দোলাইয়া দিতেন। "ললিত লবঙ্গলতা ভ্রূকুটী কুটিল করিয়া মধুর হাসিতে হাসিতে আহ্লাদায়িনী, রাজরাজেশ্বরী, ইন্দ্রাণীর" মত অমরনাথের সমক্ষে উপস্থিত হইতেন; অমরনাথ ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতির আনন্দে ডুবিয়া যাইতেন। লবঙ্গের সুখ, গঙ্গার তরঙ্গের ন্যায় সমুদায় হৃদয় ধারণ করিতে পারিত না; তাহা উথলিয়া পার্শ্বদেশ উর্ব্বর, সম্পত্তিশালী ও সুখী করিয়া দিত।

লবঙ্গের এই কৃপাময়ী পরসুখদায়িনী প্রবৃত্তি এত প্রবল ও উজ্জ্বল ছিল, যে ইহাতেই তাঁহাকে উজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার যৌবনের অনুরাগ এই স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছিল। বয়সের চঞ্চলতা এই স্রোতস্বিনীকে বেগবতী করিয়াছিল। তাহার এই প্রবৃত্তিজনিত কার্য্য-পরম্পরা ব্রত-পালিত বলিয়া তত বোধ হইত না, তাহা যেন স্বভাবজাত ও অনায়াসসাধিত বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি ইচ্ছা করিয়া এই কার্য্য পরম্পরায় প্রবৃত্ত হইতেন না; কিন্তু তাঁহার দয়াবতী প্রকৃতি ইচ্ছারও অগ্রগামিনী ছিল। তিনি কাণা-ফুলওয়ালী-গ্রথিত কদর্য্য মালার মূল্য দিবার সময় ডবল পয়সার সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা দিতেন। ফিরাইয়া দিতে গেলে সে ভুল অস্বীকার করিতেন। ইচ্ছা তাঁহার হস্তপদকে সৎপথে চালনা করিত না, কিন্তু তাঁহার হস্তপদ অভ্যাসপ্রভাবে সৎপথে আপনাপনি চালিত হইলে ইচ্ছা সে চালনার অনুমোদন করিত। লবঙ্গের দয়াপ্রবৃত্তি তাঁহার স্বভাবজাত অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছিল।

লবঙ্গ নিতান্ত পতি-অনুরাগিণী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দয়াবতী প্রকৃতি এত উজ্জ্বলা ছিল, যে তাঁহার অসাধারণ পতিভক্তি সে উজ্জ্বলতায় প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল। আমরা লবঙ্গকে তত পতিভক্তিশীলা বলিয়া জ্ঞান করি না, তিনি অনন্য সংস্কারে আমাদের হৃদয়ে উদিত

হয়েন। লবঙ্গের নাম করিবামাত্র দেখিতে পাই, একটি রমণীরত্ন হিতব্রতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার পতিভক্তি প্রবল ছিল বটে; কিন্তু তাঁহার স্নেহ, মমতা, দয়া প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তি সমুদায় বোধ হয় ততোধিক প্রবলা ছিল। যাহার বাহ্য বিকাশ অধিকতর তাহাই খ্যাতি লাভ করে; সুতরাং তাঁহার পতি পরায়ণতা দয়ার নিকট প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার সতিনীর প্রতি কুব্যবহার কোন স্থলেই দৃষ্ট হয় নাই। তিনি সতিনীপুত্র শচীন্দ্রকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তাঁহার মমতা এত মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত যে তাঁহার মুখরতা সেই মমতারই অঙ্গ বলিয়া বোধ হইত। যে ভালবাসে সেই আপনার ভাবিয়া কটু কহিতে পারে। লবঙ্গের মুখরতা সেই মমতারই চিহ্ন বলিয়া প্রকাশ পাইত। লবঙ্গের সহিত যাহারই আলাপ পরিচয় হইত, তাহাকেই আপনার জ্ঞান করিতেন। আপনার জ্ঞান করিতেন বলিয়াই বিষময় বাক্য-প্রয়োগে সাহসিনী হইতেন। তিনি বোধ হয় জানিতেন না যে সেরূপ বাক্য প্রয়োগে পরের মনোবেদনা ঘটে। যদি জানিতেন, তবে তাহা কোন মঙ্গলময় উদ্দেশ্যের কৌশল বলিয়া তৎপ্রয়োগে নিরত হইতেন। যে কারণে তাহা প্রয়োগ করিতেন, সে কারণ হৃদয়ে অধিকতর প্রবল, প্রবল কিন্তু, নিতান্ত প্রচ্ছন্ন। এইজন্য রজনী কত গালি খাইয়াছেন, অমরনাথ নিদারুণ চোর-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছেন। বাল্য-চাপল্যে ক্রীড়া-কৌতুকিনী হইয়া তিনি অমরনাথের প্রতি যে অযোগ্য নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য চিরজন্ম অনুতাপিনী ছিলেন। একদিন সে অপরাধের জন্য অমরনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুমহান্ অমরনাথও পূর্ব্ব-ভালবাসার অনুরোধে তাহা ক্ষমা করিয়াছিলেন।

লবঙ্গ বহুরূপিণী। তিনি রাম-সদয়ের নিকট আদরের আদরিণী, শচীন্দ্রের নিকট জননী, অপরের নিকট গৃহিণী, এবং অমরনাথের নিকট সুরসিকা পতিপ্রাণা রমণীরত্ন। যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার সমুচিত, লবঙ্গ তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। লবঙ্গ বহুরূপিণীর ন্যায় ক্ষণিকের মধ্যে আপনাকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন। এই মাত্র রজনীর সহিত কর্ত্রীর মত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, যেই অমরনাথ উপস্থিত, অমনি আপনাকে অমরনাথের উপযোগিনী করিয়া লইলেন। কর্ত্রীর রূপ পরিত্যাগ করিয়া রসিকা যুবতী সাজিলেন। এই মাত্র রাজচন্দ্রের স্ত্রীর নিকট গৃহিণীরূপে সম্ভাষণ করিতেছেন, পরক্ষণেই দেখি শচীন্দ্রের নিকট পরম স্নেহময়ী জননী সাজিয়াছেন। এই মাত্র দেখি রাম সদয়ের নাক ডাকিলে, লবঙ্গ ছুর গাছা মল বাহির করিয়া, পরিয়া ঘর-

ময় ঝম্ ঝম্ করিয়া, রামসদয়ের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিতেছেন; প্রাচীন পতিকে রাশি রাশি ফুল কিনিয়া, যুবতী নাতিনীর মত সাজাইতেছেন; পরে দেখি ফুলওয়ালী রজনী সঙ্গে বিলক্ষণ গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাকে গালি দিয়া কাঁদাইতেছেন। বাস্তবিক তিনি উপাখ্যান মধ্যে কখন জননী, কখন গৃহিণী, কখন সুরসিকা যুবতীর কার্য্যাদি সুন্দর-রূপে অভিনয় করিয়া যাইতেছেন; তদ্দূর চাতুরী ও নৈপুণ্য আমরা এমন নবীনা যুবতীর নিকট প্রত্যাশা করি নাই। তিনি যুবতীর অঙ্গে জননীর প্রৌঢ়তা মিশাইয়াছিলেন, নবীনার অঙ্গে গৃহিণীর গাম্ভীর্য্য মিশাইয়াছিলেন, এবং গৃহিণীর অঙ্গে যুবতীর রঙ্গরস মিশাইয়াছিলেন। তিনি যৌবনের সহিত বয়সের পরিণতি চপলতার সহিত গাম্ভীর্য্য, কর্কশতার সহিত মধুরতা, এবং তরুণবয়সের সহিত বিজ্ঞতা ও কৌশল অতি সুন্দরভাবে মিশাইয়া আপনাকে এক অদ্বিতীয়া রমণীরত্ন করিয়াছিলেন।

কিন্তু লবঙ্গ গর্ব্বিতা ছিলেন। এ গর্ব্ব, যৌবন ও রূপের গর্ব্ব নহে। সাধুতা ও সদ্‌গুণের যে গর্ব্ব মনে আপনাপনি উদয় হয়, উদয় হইয়া অন্তরে অন্তরে মনকে ফুলাইয়া রাখে, প্রকৃতিকে তেজস্বিনী করে, বাঙ্গালিনীকেও সাহসিনী করে এবং কুলবধূকেও ঈষৎ স্বাধীনতা দেয়, সেই গর্ব্ব লবঙ্গলতার ছিল। লবঙ্গ এই গর্ব্বে ফুলিয়া আত্ম-কার্য্যে গরবিণীর ন্যায় যথা তথা বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন, ধর্ম্মবলে বলবতী হইয়া অমরনাথের সমক্ষেও উদয় হইতেন, তাঁহার তেজস্বিনী প্রকৃতি কিছুতেই ভয়ভীতা হইত না। জানিতেন, স্বামী তাঁহাকে এতদূর বিশ্বাসিনী জানেন, যে সেই স্বামীর ভয় রাখিবার কিছুই নাই। আদরিণী স্পর্দ্ধা করিয়া ভাবিতেন, পুরুষ আবার রমণীর কর্ত্তা কি? রমণীই পুরুষের আজ্ঞাদায়িনী।

লবঙ্গ এই জন্য তেজস্বিনী ছিলেন। তাঁহার সেই সেই তেজ অন্য কারণেও কথঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বৃদ্ধ পতির সোহাগ, ও শাসন-অক্ষমতায় লবঙ্গকে অদমনীয়া করিয়াছিল। তিনি নিজ সোহাগের গৌরবে এবং পতি-সোহাগের গর্ব্বে ফুলিয়া বেড়াইতেন। তিনি সেই সোহাগে মাতিয়া গৃহ মধ্যে "পুরা একখানি গৃহিণী"। নবীন বয়সে গৃহিণী হইলে এবং বৃদ্ধ পতির যুবতী সুন্দরী হইলে যেরূপ স্পর্দ্ধা বাড়িয়া থাকে, লবঙ্গের স্পর্দ্ধা সেই রূপই বাড়িয়াছিল। তিনি এই স্পর্দ্ধায় মাতিয়া, সরল মনে যাহা উদয় হইত, তৎক্ষণাৎ বলদর্পিত উক্তিতে লোককে তেজ-বাক্য তাহাই প্রয়োগ করিতেন। শাসন কিরূপ, লবঙ্গ তাহা জানিতেন না। শাসন করিবার, তাঁহার কেহই ছিলনা; থাকিলেও লবঙ্গের তেজস্বিনী প্রকৃতিকে শাসন করিতে পারিত কি না সন্দেহ। লবঙ্গ যদি

কোন শাসন জানিতেন, তাহা আত্মশাসন, তাহা লবঙ্গের চমৎকার ও অদ্বিতীয় আত্ম শাসন। তিনি এই শাসনে প্রকৃতির উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন, অমরনাথের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন, জয়লাভ করিয়া অমরনাথের সমক্ষে অনায়াসে উপস্থিত হইতেন, উপস্থিত হইয়া আর একবার প্রকৃতিকে ছাড়িয়া দিতেন, তাঁহার চিরদমিত সোহাগ আর একবার উদ্দীপ্ত হইত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ লবঙ্গ যেন আত্মবল পরীক্ষা করিবার জন্যই আবার আত্ম-শাসনের রশ্মি দৃঢ়-সংযত করিয়া লইতেন। তিনি প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করিতেন। প্রকৃতি যেখানে লবঙ্গের শাসনে না আসিত, সেখানে অবাধে স্বাধীনভাবে ক্রীড়া করিত; তাহাতে লবঙ্গের কিছু দমন ছিল না। লবঙ্গ নির্দ্দোষিতায় ও সরলতায় সাহসিনী এবং আত্মরক্ষিণী ছিলেন।

অদমনীয়া, কিন্তু অপাপপ্রবণ। তাঁহার ধর্ম্মবল দেখিয়া পাপ নিকটে আসিতেও শঙ্কিত হয়। একবার চির-অঙ্কিত চোরনামে কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। অমরনাথের চোর-কলঙ্কের অর্থ এই। সে কলঙ্ক লবঙ্গকে সুন্দরবর্ণে স্পষ্টাভিধানে প্রকাশিত করিয়াছে। যে বল লবঙ্গলতার ভিত্তি স্বাধীনতার দুর্গ, এবং অদমনীয়তার শক্তি, অমরনাথের চোরকলঙ্ক সেই বলের পরিচয়। এ দাগ রিপুর শাসন, যুবাজনের শিক্ষা, পাপের নাম, এবং পাপীর কলঙ্ক। লবঙ্গ এই দাগে শুদ্ধ অমরনাথকে শাসন করেন নাই, সমগ্র পাপজগৎকে শাসাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

কবিত্ব।

* মৃত্যু পরে মর্ত্ত্যে যারা অমরত্ব পায়,
অনন্ত যাদের গুণ গণা নাহি যায়,
আকল্প যাদের বাক্য ভুবন ভুলায়,
কেন না বন্দিবে হেন কবি-সম্প্রদায়?

সত্য যুগ হইতে আজি পর্য্যন্ত চির-কালই লোকে কবিদিগের পূজা ও তাঁহাদিগের বাক্যামৃত পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছে। যে সম্প্রদায়ের এত মান, এত মর্য্যাদা, সেই সম্প্রদায়-ভুক্ত হইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? এই নিমিত্ত সর্ব্বদা আমরা অসংখ্য লোককে কবিতা লিখিতে দেখি। পল্লীগ্রামের গুরুমহাশয়,

* "দিবমপ্যুপযাতানামাকল্পমনল্পগুণগণো যেষাং।"
রমযন্তি জগন্তি গিরঃ কথমপি কবয়ো ন তে বন্দ্যাঃ॥

বিদ্যালয়ের বালক-অন্তঃপুরের কামিনী, যে-সে সকলেই কবিতা লিখিতেছে—কিন্তু যে কবিতা লেখে, সেই কি কবি? কবিতা লিখিলেই যদি কবি হইত, তাহা হইলে প্রাবৃটের পিয়ারার মত কবির বাজার খুব সুলভ হইয়া পড়িত। প্রকৃত কবি কম্মিনূ হইতেও দুর্লভ। প্রতিভা না থাকিলে কবি হইবার যো নাই।

প্রতিভা অসাধারণ মানসিক ধর্ম্ম। যাঁহার প্রতিভা থাকে তাঁহার রুচি সর্ব্বদা এক-বিষয়িণী, তিনি একমাত্র বিষয়ের আলোচনাতেই সুখানুভব করেন—বিষয়ান্তরে চিত্ত-নিবেশ করিতে তাঁহার ক্লেশ বোধ হয়। কাজেই তিনি আজীবন প্রিয় এক বিষয়ের অনুধ্যানে জীবনাতিপাত করিতে থাকেন। কায়মনে অনুক্ষণ যে বিষয়ের অনুশীলন করা যায়, সে বিষয়ে অবশ্যই কৃতকার্য্যতা ও দক্ষতা লাভ হয়। প্রতিভা-বিশিষ্ট ব্যক্তি আপনার ইষ্ট বিষয়ে অনায়াসে যে প্রকার অব্যাহতরূপে অভিনিবিষ্ট হইবেন, সাধারণ লোকে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেও তাহা কদাচ পারিবেন না। কোন এক বিষয়ে বিবেচনা ও কল্পনার প্রগাঢ় সংযোগকে অভিনিবেশ বলে এবং অভিনিবেশ হইতেই কার্য্যকারিতা উৎপন্ন হয়—বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ সংযোগেই ক্ষমতার উৎপত্তি—জল ও অনলে বাষ্প জন্মে, সেই বাষ্প আমাদের কার্য্যসাধক অধিকাংশ যন্ত্রের মৌলিক বল। এবং বিবেচনা ও বিভাবনা-প্রসূতা ক্ষমতাই কবির চমৎকারিণী কবিত্ব শক্তি। প্রতিভা না থাকিলে এই শক্তি কদাচ জন্মে না। চেষ্টা করিলে লোকে কষ্টকবি হইতে পারেন, কিন্তু প্রতিভা না থাকিলে কেহ শ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারেন না।

কেহ কেহ বলেন, কেবল কল্পনাই কবিত্বের মূল—যাহার বিভাবনা যে পরিমাণে তেজস্বিনী, তিনি সেই পরিমাণে কবিত্ব লাভ করিতে পারেন। যদি কেবল কল্পনাই কবিত্বের প্রসূতি হইত, তাহা হইলে বালক ও বাতুলেরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিতে পারিত, কেননা শিশু ও উন্মত্তের কল্পনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রখরা ইহা চির-প্রসিদ্ধ। বালকের কল্পনা অন্ধকারে জুজু দেখায়, লতায় কড়ি ও বৃক্ষে পিষ্টক ফলায়, পাগলের কল্পনা কেবল ঘোরতর বিভীষিকা উৎপন্ন করে, কিন্তু কবির কল্পনা আমরা যাহা চাহি, যাহা ইচ্ছা করি, তাহাই আমাদের সম্মুখে আনিয়া ধরে, কবির কল্পনা মর্ত্ত্য-হৃদয়ে স্বর্গের সুখ আনিয়া দেয়। কবি সুধার সৃষ্টি করেন। তাঁহার কল্পনা বিবেকাশ্রিতা বলিয়াই তিনি এই প্রকার অসাধারণ ক্ষমতাশীল হন।

অধিকাংশ লোকের এই প্রকার সংস্কার যে সভ্যতার উন্নতি হইলে কবিতার অবনতি হয়—সত্য-সন্ধায়ী বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে, অসত্য-সন্ধায়ী কবিত্ব প্রভাহীন হইয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই? বাস্তবিক কি বিজ্ঞান ও কাব্য